হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৬২ সংখ্যা ১ ১৪০৯

ড. সৌমেন সেন তাঁর 'মধ্যবিত্ত লোকসংস্কৃতি' নিবন্ধে 'লোক'-এর নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে লোকসংস্কৃতি নির্মাণে মধ্যবিত্ত এলিটদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি চিহ্নিত করেছেন।

এস ওয়াজেদ আলীর সমগ্র রচনাবলি অবলম্বনে তাঁর ধ্যানধারণার পর্যালোচনা করেছেন ড. বিজিত কুমার দত্ত।

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের ধারাবাহিক সন্দর্ভে 'প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবন' নিয়ে এবারের মুখ্য আলোচ্য বৃহৎ নদী বাঁধ নির্মাণের সর্বনাশা কুফল এবং সে সম্পর্কে পাশ্চাত্য দেশগুলির চৈতন্যোদয়।

'আত্মঅভিজ্ঞতার বিবর্তন' প্রবন্ধে আধুনিক মালায়লম কবিতায় বিস্তৃত বিশ্লেষণধর্মী বিবরণ উপস্থাপনা করেছেন প্রসিদ্ধ মালায়ালম কবি কে. সচ্চিদানন্দন। ইংরেজিতে লেখা মূল প্রবন্ধটির অনুবাদ করেছেন কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়।

সাম্প্রতিক গ্রুপ থিয়েটার জগতের অন্দরমহলের কিছু অকথিত কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন প্রবীণ নাট্যবিদ ড. বিষ্ণু বসু।

স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা।

মৃণাল সেনের 'আমার ভুবন' এবং বহুরূপী ও গান্ধারের সাম্প্রতিক নাট্য নিয়ে পর্যালোচনা।

RKBK

RADHAKRISHNA BIMALKUMAR LIMITE

216, ACHARYA JAGADISH CHANDRA BOSE ROAD
KOLKATA-700 017

Phone : 2470818/2403939
TLX : 5480 RKBK IN
FAX : 247-3564/2407084

EXCELLENCE !

We have it in our fibre.

r over three decades we have been spinning high quality synthetic yarns the finest fabrics.

IREELON : The Nylon yarn that makes beautiful Sarees and winsome dress material for women in the know.

IREESTER : The Polyester yarn that makes suiting and shirtings for men on the go.

KON : The most attractive yarn instead of natural silk, used in Benarasi Saree and Bengal Handloom Sarees.

Mfd. by —

SHREE SYNTHETICS LIMITED

31, Chowringhee Road,

Kolkata – 700 016.

OFFICES ALL OVER INDIA.

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র

প্রকাশিত

পুস্তক ও ক্যাসেট তালিকা

লোকায়ন চর্চার ভূমিকা	অরুণকুমার রায়,	৩০ টাকা
লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব	পবিত্র সরকার,	২৫ টাকা
সাঁওতাল কাহিনী বনবীর গাথা	লোকনাথ দত্ত (অরুণ চৌধুরী সম্পাদিত)	৫০ টাকা
লোককথা	দিব্যজ্যোতি মজুমদার	৪০ টাকা
ছৌ	ইন্দ্রাণী দত্ত সৎপথী	৪০ টাকা
ডোমনি	সুবোধ চৌধুরী	৬০ টাকা
লোকসংস্কৃতি গ্রন্থ ও নিবন্ধপঞ্জি	পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত	১০০ টাকা
লোকশিল্প বনাম উচ্চমার্গীয় শিল্প	ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৬০ টাকা
গ্রাম নামের উৎপত্তি : বাঁকুড়া	রামশংকর চৌধুরী	২৫ টাকা
ভাওয়াইয়া	সুখবিলাস বর্মা	১২৫ টাকা
বস্তুবাদী বাউল	শক্তিনাথ ঝা	২০০ টাকা
গ্রামীণ গীতি সংগ্রহ	দিনেন্দ্র চৌধুরী	২০০ টাকা
ঝুমুর	নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৭০ টাকা
টুসু	শান্তি সিংহ	১৫০ টাকা
'লোকশ্রুতি' প্রবন্ধ সংকলন	মিহির ভট্টাচার্য সম্পাদিত	২০০ টাকা
'সুধী প্রধান' স্মারক গ্রন্থ	মালিনী ভট্টাচার্য সম্পাদিত	২০০ টাকা
লোকশ্রুতি - ১২, ১৩, ১৪	প্রতিটির দাম	২৫ টাকা
লোকশ্রুতি ১৫		৪০ টাকা
Santhal Architecture		Rs. 200/-

**** ক্যাসেট - ঝুমুর গান ১ ও ২, লালনের গান ১ ও ২,**

মরমী গান, ভাওয়াইয়া ** প্রতিটির মূল্য : ৩৫ টাকা

স্মারক নং ৪৯২৩/২০০২/তথ্য ও সংস্কৃতি

বর্ষ ৬২ সংখ্যা ১
১৪০৯

প্রবন্ধ

মধ্যবিত্ত লোকসংস্কৃতি ❖ সৌমেন সেন ৫

এস ওয়াজেদ আলীর প্রাসঙ্গিকতা ❖ বিজিতকুমার দত্ত ১৪

কবিতা ❖ ২০-২৭

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ❖ আনন্দ ঘোষহাজরা
পরিমল চক্রবর্তী ❖ অজিত বাইরী ❖ দেবাঞ্জন চক্রবর্তী ❖ রঞ্জনা দত্ত
জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ❖ মেঘ মুখোপাধ্যায়

ধারাবাহিক

প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবন ❖ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৮

গল্প

অমৃতার পুত্র ❖ স্বপ্না গুহ ৩৭

প্রতিবেশী সাহিত্য

আত্মঅভিজ্ঞানের বিবর্তন : আজকের মালয়ালাম কবিতা : কে সচ্চিদানন্দন ৪২

সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি

থিয়েটারের এখন, তখন ❖ বিষ্ণু বসু ৫২

স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটগল্পে সমকালীন সমাজভাবনা ❖ নাজিমূল হক ৬০

গ্রন্থসমালোচনা ❖ ৬৫-৮৩

অমিতাভ রায় ❖ শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ❖ অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়
বেণু গুহঠাকুরতা ❖ সুস্নাত দাশ ❖ হাবিব রহমান ❖ গৌরী সেন
হেদায়েতুল্লাহ ❖ বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ❖ অরূপরঞ্জন প্রধান

চলচ্চিত্র-নাট্য সমালোচনা

মৃণাল সেনের আমার ভুবন ❖ অধৃষ্য কুমার ৮৪

একালের "আখেটিক পালা" ❖ তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৮

চারদুয়ার ❖ মেঘ মুখোপাধ্যায় ৯০

স্মরণে ❖ ৯৩

অন্নদাশংকর রায় ❖ ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মূল্য: ১৫ টাকা
ডাকে: ১৮ টাকা
শিল্প পরিকল্পনা: রণেন আয়ন দত্ত

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ইম্প্রেশন হাউস, ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা - ৯ থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা — ১৩ থেকে প্রকাশিত
অক্ষর বিন্যাসে — নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা — ৬

দূরভাষ : ২৩৭-৩৭৭০
সম্পাদক : আবদুর রাউফ

শত্রু যখন সাম্প্রদায়িকতা প্রতিবাদ না করাই তখন অপরাধ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই.সি.এ. ৪৯২৩/২০০২/তথ্য ও সংস্কৃতি

প্রবন্ধ

মধ্যবিত্ত লোকসংস্কৃতি

সৌমেন সেন

প্রবন্ধের শিরোনামটি পড়ে কেউ আঁতকে উঠতে পারেন। মনে হতে পারে এ-তো সোনার পাথরবাটির মতো শোনাচ্ছে— মধ্যবিত্ত ও লোকসংস্কৃতি দুই-ই আমাদের চেনা— একের সঙ্গে অন্যটি মেলে কি? লোকসংস্কৃতি বলতে আমরা যা বুঝি, তার সৃষ্টি ও প্রসারে তো মধ্যবিত্তের কোনও ভূমিকা থাকার কথা নয়। তা হলে? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্যই এই প্রবন্ধ। আর, গোড়াতেই বলে রাখা ভাল যে একটি উত্তর, সদর্থকই, আছে বই কি!

সেই উত্তরে পৌঁছবার আগে দু'টি বিষয় জানা দরকার। এক, উনিশ ও বিশ শতকের চর্চার অভিজ্ঞতার পর, একুশ শতকে পৌঁছে, লোকসংস্কৃতির যে সংজ্ঞা আমরা পাই, তার স্বরূপটি কী। দুই, আবির্ভাব কাল থেকে আজ অবধি মধ্যবিত্তের অবস্থান ও লক্ষণটি কী।

আর এই বিষয় দুটি স্পষ্ট করার জন্য আমি যে যুক্তিগুলি আনব, মহাজনদের যুক্তি, আমার পাঠ ও অভিজ্ঞতা-নির্ভর যুক্তি, তা সবার গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। সমাজ-বিজ্ঞানে এমনটা তো হামেশাই হয়। হোক। আলোচনা তো থেমে থাকে না। এই কথাগুলি বলার অর্থ কিন্তু এই নয় যে আমার যুক্তি ও সমর্থন সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। বরং উল্টোটাই, না হলে আর এই রচনা ফাঁদা কেন। তবু এই বিনয়-বচন, কারণ শিরোনাম থেকে শুরু করে এই আলোচনার যুক্তি ও সিদ্ধান্ত আমাদের অনেকের অনেক অভ্যস্ত ধারণায় আঘাত করতে পারে।

লোকসংস্কৃতির যে-সংজ্ঞাটি নির্দিষ্ট হয় উনিশ শতকের মধ্যাহ্নে (১৮৪৬), যার অর্থ জনসাধারণের (Folk বা People এর) প্রজ্ঞা (wisdom বা lore)' এবং যা মূলত একটি তালিকা[১], শতাধিক বছরেও তার গ্রহণযোগ্যতা খুব কমেনি। একশো বছর পর একটি কোষগ্রন্থে[২] পাওয়া যায় প্রায় তিরিশটি সংজ্ঞা যা বস্তুত ১৮৪৬-এর সংজ্ঞাটির ব্যাখ্যা বা সম্প্রসারণ। তখন পর্যন্ত লোক-এর অর্থ জনসাধারণ (People) যাঁরা মূলত গ্রামীণ কৃষিজীবী ও কৃষিনির্ভর মানুষজন আর তাঁদের সৃষ্টি কিছু সাংস্কৃতিক উপাদানের সমষ্টি লোকসংস্কৃতি। যে সংস্কৃতি তাঁদের প্রজ্ঞা। আদিম অবস্থা থেকে সভ্যতা পর্যন্ত সমাজবিবর্তনের যে স্তরগুলি তখন চিহ্নিত, সেই উল্লম্ব প্রক্রিয়ার মাঝামাঝি কোথাও এই 'লোক'-এর অবস্থান। সভ্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিপরীতে তাঁরা অশিক্ষিত সম্প্রদায়, যাঁরা তাঁদের শ্রুতি-স্মৃতি আচারে বহন করছেন যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, তাই-ই লোকসংস্কৃতি। এবং শহুরে সভ্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহারে তার কিছু রেশ থেকে গেলেও তাঁদের সংস্কৃতি আলাদা ও 'পরিশীলিত'। সমাজ বিবর্তনের উল্লম্ব প্রক্রিয়ার সবচেয়ে নীচের স্তরে যাঁরা তাঁরা অসভ্য, তাঁদের সংস্কৃতি প্রান্তিক। তাঁরা লোকসংস্কৃতির 'লোক' নন, যেমন নন শহুরে শিক্ষিত সভ্য সম্প্রদায়।

'লোক' সম্পর্কে এমন একটি ধারণা গড়ে নেওয়ার পর অন্য একটি ধারণা তৈরি হল যে লোকসংস্কৃতি মৌখিক, স্মৃতি ও শ্রুতিবাহিত; ঐতিহ্য তার প্রাণশক্তি এবং তা বংশপরম্পরায় প্রবাহিত। অর্থাৎ পুঁথিগত শিক্ষার অভাব বা অক্ষরজ্ঞানহীনতার সঙ্গে তার সম্পর্ক। অতীতে যে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক রাজসভা বা দরবার, পরবর্তীকালে মধ্যবিত্ত বৈঠকখানা, যে সাহিত্য পুঁথিগত বা মুদ্রণনির্ভর, তা লোকসংস্কৃতির আঙিনার বাইরে বা যথার্থ বলতে গেলে, 'সংস্কৃত' সংস্কৃতির চৌহদ্দির বাইরে লোকায়ত আঙিনায় যে গোষ্ঠীবদ্ধ সংস্কৃতি তা-ই লোকসংস্কৃতি।

এই ধারণাতেই আমরা সাধারণত অভ্যস্ত এবং আমরা, যাঁরা এই ধারণা গড়ে তুলেছি, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন ধাপে স্থিত। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে এবার একটু চিনে নেওয়া যাক। মধ্যবিত্ত বলতে যে একটি শ্রেণীভুক্ত কিছু মানুষকে আমরা শনাক্ত করি, সে ধারণাটি কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। মনে রাখা ভাল, মধ্যবিত্ত ইংরেজ মিড্‌ল ক্লাস-এর তর্জমা। মধ্যবিত্ত সম্পর্কে ধারণা আর তার পরিচয় কালক্রমে গড়ে উঠেছে ইউরোপে। যেমন সামাজিক ক্লাস বা শ্রেণী বলতে আজ যা বুঝি তার বয়সও খুব বেশি কিছু নয়। অক্সফোর্ডের অভিধানে দেখছি শব্দটি এই অর্থে ও তার তিনটি বিভাজন, উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন, প্রথম চিহ্নিত হয় ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। তখন ইউরোপীয় সমাজে তাদের অবস্থান বাস্তব। তাই বাধ্য হয়েই আমাদের তাকাতে হয় ইউরোপের ইতিহাস ভূগোলে — ঘটনা পরম্পরায় সেই গোকুলেই বেড়ে উঠেছিল আদি মধ্যশ্রেণী। যখন সেখানে ফিউডাল অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, বাণিজ্য ও শিল্প ক্রমশ বাড়ছে, বেড়ে যাচ্ছে শহর অঞ্চল, তখনই

একটি শ্রেণী গড়ে উঠল যাদের দাবি আরও আর্থিক, আইনি ও সামাজিক অধিকার। এরাই আদি মধ্যশ্রেণী যাদের অবস্থান তখন সামন্ত-ভূস্বামী ও বিত্তহীন চাষি মজুরের মাঝখানে। পুঁজিবাদী সমাজের আদিপর্বে ভূস্বামীকুল, কৃষক ও ভূমিদাসদের মধ্যবর্তী এই শ্রেণীর নির্দিষ্ট আর্থনীতিক ভূমিকা ও স্বার্থ ছিল। তখন ইউরোপে এদের পরিচয় ছিল Mittelstand বা Intermediate Estate। পরে ধীরে ধীরে যখন middle class বা মধ্যশ্রেণীর ধারণা জন্মাল তখন একদিকে প্রাক্তন ভূস্বামীরা হৃতসম্পদ ও হৃতমান আর অন্যদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শেকড় শক্ত হয়ে উঠল— ফলে সমাজকাঠামো আরও জটিল হয়ে উঠছে। অর্থস্বার্থগোষ্ঠীগুলির মধ্যে জন্মাল নানা সংঘাত, প্রতিঘাত। এই সংঘাত-প্রতিঘাতের টানাপোড়েনে আদিমধ্যবিত্তের দখলে এসে গেল পুঁজি ও প্রতিপত্তি আর সেই বলয়ে তৈরি হল একটি সহায়ক স্তর, যা ক্রমে রূপ নিল একটি শ্রেণীর, যাকে আজ আমরা চিনি মধ্যবিত্ত নামে। আসলে মধ্যবিত্তের ধারণাটা সব সময়েই একটু গুরুচণ্ডালি, ওঠানামার পালা চলছেই। মধ্যবিত্তের বিকাশের ধারাটি যদি মনে রাখা যায় তা হলে জানা যাবে যে একসময় যাঁরা মধ্যবিত্ত ছিলেন তাঁরাই এখন বুর্জোয়া আর এখনকার মধ্যবিত্ত পাতিবুর্জোয়া যারা ধনতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহায়ক নানা বৃত্তিজীবী। আর তার একটি বড় অংশ অবশ্যই বুদ্ধিজীবী, নানা বৃত্তির। এঁদের মধ্যে আবার সব সময়েই তৈলাক্ত লাঠি ও বাঁদরের অঙ্কের খেলা চলছে। কেরানি বাপের পুত্র নিম্নবিত্তের কাঁথা-বালিশে শুয়ে হঠাৎ যখন সাউথব্লকে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী হয়ে যান তখন তিনি নিজেকে যে শুধু উচ্চবিত্তই মনে করেন তা নয়, বুর্জোয়া কালচারটাকেই নিজস্ব বলে ভাবতে শুরু করেন। কিন্তু তাতে কি তাঁর শ্রেণীউত্তরণ ঘটে? তিনি মধ্যই থাকেন। এঁরা ইদানীং এলিট বলেও চিহ্নিত। আবার তাঁরই কোনও ভ্রাতা ব্যারাকপুর বেল্টে শিফট ডিউটি করলেও নিজেকে কখনওই শ্রমিক ভাবতে পারেন না। বিত্ত ও বৃত্তির হিসাবে তিনি প্রোলেতারিয়েত হলেও মানসিকতায় মধ্যবিত্ত। অর্থাৎ ওঠা ও নামা কোনওটাই সহজ হচ্ছে না। আবার সদর-মফস্বল, নগর-শহর, শহর-গ্রাম, ইত্যাদি অবস্থানভূমিও এই শ্রেণীর আর একটি নিয়ন্ত্রণ-রেখা।[৪]

মাও-জে-দং এক সময় (১৯৬২) চিনের শ্রেণীবিন্যাস ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাতে তিনি তখনকার চিনা সমাজে পাঁচটি শ্রেণীর অস্তিত্ব খুঁজে পান : ভূস্বামী ও মুৎসুদ্দি, মধ্যবুর্জোয়া, পাতিবুর্জোয়া, আধা-প্রোলেতারিয়েত ও প্রোলেতারিয়েত। দুটি প্রান্তিক শ্রেণী, ভূস্বামী ও মুৎসুদ্দি আর প্রোলেতারিয়েতের মাঝখানে তিনটি, মধ্যবুর্জোয়া, পাতিবুর্জোয়া ও আধা-প্রোলেতারিয়েত। মধ্যবুর্জোয়া শ্রেণীতে ছিল ধনী চাষি, পাইকারি ব্যবসায়ী, ছোট কারখানা মালিক, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক ইত্যাদি। পাতিবুর্জোয়া হল সম্পন্নচাষি, সাধারণ বুদ্ধিজীবী, কারুশিল্পী, স্কুল শিক্ষক, কেরানি, নিম্নআদালতের উকিল, ছোট ব্যবসায়ী। আর আধা-প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীতে থাকছে অল্প জমির মালিক, সাধারণ চাষি, সাধারণ কারুশিল্পী, দোকান কর্মচারী ও হকার-ফেরিওলা ইত্যাদি।[৫] বাঙালি বা ভারতীয় মধ্যবিত্তকে চিনে নিতে আমরা মাও-এর মডেল অনেকটাই ব্যবহার করতে পারি। আমাদের উচ্চ ও নিম্নমধ্যবিত্তের ধারণা এমন হিসাবের সঙ্গে মেলে। এমনকী যাদের শ্রমিক বললে ভাল হয় তাঁরাও নিম্নমধ্যবিত্তের দলে ভিড়ে আছেন। ফলে মধ্যবিত্ত, বিশেষত বাঙালি মধ্যবিত্ত বলতে আমাদের সামনে হরেক মানুষ সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে যান, আমাদেরই প্রতিরূপ সব। তাঁদের বা নিজেদের চিনতে গেলে অনেক হিসাব নিকাশ করতে হয়, কখনও বিত্তের মাপে, কখনও বৃত্তির, কখনও বা বিচরণক্ষেত্রের ঠিকানায় আর অবশ্যই চেতনা, মানসিকতা আর বুদ্ধিমার্গের টানাপোড়েনে। উচ্চ ও নিম্নমধ্যবিত্ত যেমন এক ধরনের হিসাব, বিত্তের নিরিখে, তেমনই হিসাব থাকে পেশার আর নাগরিক, শহুরে, মফস্বলি ও গ্রামীণ মধ্যবিত্তের কথা ভাবতে হয় বিচরণ ক্ষেত্রের প্রভাব-প্রসারে।

মধ্যবিত্তের একটি অংশকে ইদানীং বলা হয় এলিট। এলিটদেরও আবার কয়েকটি রূপ — বিত্তের হিসাবে, প্রতিপত্তির হিসাবে, পেশার নিরিখে ও বুদ্ধি ও শিক্ষার মাপে। এদের একটি বড় অংশ বুদ্ধিজীবী। আমাদের এই আলোচনার প্রয়োজনে এই বুদ্ধিজীবীদের একটু চিনে নিতে হয় কারণ সংস্কৃতি-নির্মাণে এদের ভূমিকাই প্রধান। এবং মধ্যবিত্ত লোকসংস্কৃতি যা — তা মূলত এদেরই তৈরি। তথাকথিত 'এলিট' ও 'লোক'-এর দ্বন্দ্বের কথা মনে রেখেই বলছি। সমাজ-ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বুদ্ধিজীবী এলিটদের দুটি স্তরে চিহ্নিত করা হয় — প্রাক-আধুনিক ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক। বাংলায় অন্তত ঐতিহ্যবাহী (ট্র্যাডিশনাল) এলিটের বড় অংশ পুরোহিত শ্রেণী ও টোলের পণ্ডিতেরা, মুসলমান সমাজে মৌলবি ও মাদ্রাসা পরিচালকরা। এবং তাঁরা যে তাঁদের সময়ে সমাজের চেহারাচরিত্র অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করতেন তার খবর পাওয়া যায় ১৮৩০ সালে রচিত বাংলার শিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি রিপোর্টে।[৬] পুরোহিতদের স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসাবে দেখা যাবে কি না আর তাঁদের বুদ্ধিজীবী বলা যাবে কি না তা নিয়ে কারও সংশয় থাকতে পারে। ইউরোপীয় প্রেক্ষিতে অন্তত আনতোনিও গ্রামশি এঁদের স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসাবে দেখতে চান আর বলেন যে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিনিধি-স্থানীয় হল পুরোহিত শ্রেণী। তিনি আরও বলেন যে প্রথাগত বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশই কৃষকবংশোদ্ভূত।[৭] ভারতীয় প্রেক্ষিতেও গ্রামশির এই বিচার স্বীকার করলে উপকার হয়। অনেক ভারতীয় জনজাতিসমাজে, পৃথিবীর অন্যত্র যেমন, একই ব্যক্তি ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন

এবং নানা কারণেই তাঁদের বুদ্ধিজীবী (অন্তত প্রথাগত) বলতে বাধা নেই। একটি সমাজের আত্মপরিচয়, জীবন ও বিশ্বদর্শন (world view) মূলত এরাই নির্ধারণ করেন। নিয়ন্ত্রণও।[৮] দেড়শো বছর আগে বাংলার সামাজিক পরিস্থিতিও যে এমনটা ছিল তার খবর আমরা পেয়েছি উইলিয়াম অ্যাডামের রিপোর্টে (১৮৩০) ও বিনয় ঘোষের আলোচনায়। বাংলার ট্র্যাডিশনাল এলিট, তাঁদের বিচারে, একাধারে বুদ্ধিজীবী ও পুরোহিত।[৯] আধুনিক এলিটদের প্রাধান্য ততদূর এগোয় না, বুদ্ধিজীবী ও পুরোহিতদের ভূমিকা এখন আলাদা, কিন্তু, ভারতীয় সমাজে, সংস্কৃতি নির্মাণ ও প্রচারে, উভয়েরই প্রভাব থেকে যায়।

দুই

ইংরেজিতে যাকে বলা হয় স্টিরিওটাইপ বাংলায় তা হতে পারে 'মাপেকাটা' বা 'ছাঁচে ঢালা'। সামাজিক গোষ্ঠীগুলি সাধারণ ছাঁচে ঢালা, গোষ্ঠীচরিত্র, চৈতন্য, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রথা ও ব্যবহারবিধির মাপে। এবং এই সবের সমন্বয়েই গোষ্ঠী-সংস্কৃতি যার অন্য নাম একটি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও আত্মপরিচয়, যার ভিত্তি একটি বহমান পরম্পরা বা ট্র্যাডিশন। গোষ্ঠীসভ্যদের আচরণ, সংস্কার, বিশ্বাস, ভাবনা সাধারণত এই ট্র্যাডিশনের ছাঁচে ঢালা। যদিও, ট্র্যাডিশনের গ্রহণ-বর্জন, নির্মাণ-পুনর্নির্মাণও ঘটছে প্রতিনিয়ত।

একটি গোষ্ঠীর গড়ে ওঠা, সামাজিক, ভাষিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, ধার্মিক ইত্যাদি চাপে, যেমন একটা ছাঁচের জন্ম দেয়, তেমনই তাদের ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কেও একটি ধারণার ছাঁচ তৈরি হয়। এই ছাঁচ বা ছাঁচগুলি আমরা তৈরি করি বিশ্লেষণের স্বার্থে। এবং ক্রমশ আমরা এই ছাঁচে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়ি যে তার প্রয়োগ ঘটে নির্বিচারে, সময় ও সমাজের পরিবর্তনগুলি লক্ষ না করেই। সমাজ ও সংস্কৃতির যে বর্গীকরণে আমরা অভ্যস্ত তা-ও এমনই একটি ছাঁচ।

এই ছাঁচেই আমরা লোক বা folk লোক-সংস্কৃতি বা folklore কে চিনে আসছি। লোক বলতে আমরা বুঝেছি গ্রামীণ ও প্রধানত কৃষিনির্ভর জনসমষ্টি, যাঁদের সংস্কৃতির নাম লোকসংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি শিষ্ট সংস্কৃতি থেকে আলাদা। সংস্কৃতির এই এবং এমনই আরও বর্গীকরণের ব্যাখ্যা নানা সময় ও নানা ভাবে হয়ে থাকলেও, মূল কথাটি এই যে লোকসংস্কৃতি মূলত গ্রামীণ, ঐতিহ্যমণ্ডিত, কিঞ্চিৎ অশিষ্ট (তথাকথিত গ্রাম্য) কারণ তেমন পরিশীলিত নয়, তার নির্মাণ ও উপভোগ মূলত যৌথ এবং তার বহমানতা পরম্পরাগত ও বিশেষ পরিবর্তনশীল নয়। লোক ও লোকসংস্কৃতির যে সংজ্ঞা আমরা আগে আলোচনা করেছি তা এই ছাঁচেরই।

কিন্তু যদি বাস্তব পরিস্থিতি ও পরিবর্তনের মুখোমুখি হওয়া যায় তা হলে দেখা যায় সব ছাঁচই ঢিলেঢালা। লোক ও লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা ও ধারণা তাই বদলে গেছে।[১০] 'লোক' আর আগের 'স্টিরিওটাইপ' নেই, লোকসংস্কৃতিও না। লোক বলতে এখন বুঝি কোনও একটি গোষ্ঠী, যাকে খুঁজে পাওয়া যাবে নানা শ্রেণীতে, নানা পেশায়, ধর্মীয় ও জনজাতি বলয়ে। এই গোষ্ঠী গ্রামীণও হতে পারেন, নাগরিকও। তাঁদের বন্ধনসূত্র একটিই — নিজস্ব পরম্পরা, যা আছে তাঁদের গ্রহণে এবং প্রতিমুহূর্তের নির্মাণে। এবং এই যে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সংস্কৃতি, যাকে এখন লোকসংস্কৃতি বলা হচ্ছে, তার নির্মাণ সর্বদাই যে যৌথ হবে, তা না-ও হতে পারে; কোনও ব্যক্তির সৃষ্টি ক্রমে গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় যৌথ হয়ে ওঠে, যেমন কোনও লিখিত, মুদ্রিত উৎসও থাকতে পারে এই সংস্কৃতির—তা যে সর্বদা মৌখিক হতে হবে, সে ছাঁচ আর মানা হচ্ছে না। যেমন মানা যাচ্ছে না ঐতিহ্যের অতীত নির্ভরতা, তা একটি পরিবর্তনশীল প্রবাহ।

মধ্যবিত্তকেও তেমনই কোনও একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে মাপা যায় না। তার উদ্ভব ও বিকাশ একমাত্রিক নয়, নানা সময়ে, নানা দেশে, কোনও দেশের নানা অঞ্চলে তার নানা চেহারা। এবং এই মধ্যবিত্ত বলয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকে, একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির আওতায় নানা গোষ্ঠী-সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তার নিয়ন্ত্রক হতে পারে ভাষা-জাতি-ধর্ম-পেশা ইত্যাদি। ফারাক থাকে গ্রামীণ ও নাগরিক গোষ্ঠী-সংস্কৃতির মধ্যে যা আবার মিশে যায়, মিলে যায় কোথাও কোনও এক সাধারণ সংস্কৃতিতে— লোকসংস্কৃতিও তার অংশ।

এই পরিস্থিতি যদি আমরা মেনে নিই আর স্বীকার করি যে লোকসংস্কৃতি পরিবর্তনশীল, তা হলে দেখা যাবে যে 'লোক'-এর অভ্যস্ত স্টিরিওটাইপ আর মানা যাচ্ছে না আর 'লোক' ছড়িয়ে আছে অনেক শ্রেণীতেই, বিশেষত মাও-এর মডেলের মধ্যবুর্জোয়া, পাতিবুর্জোয়া, আধাপ্রোলেতারিয়েত ও প্রোলেতারিয়েতদের মধ্যে। মধ্যবিত্তের অবস্থান মূলত মধ্যবুর্জোয়া, পাতিবুর্জোয়া ও আধাপ্রোলেতারিয়েতের মধ্যে। এই বিচারে মধ্যবিত্তের নানা অংশ-ও 'লোক' এবং তাঁদের সংস্কৃতির একটি অংশ 'লোকসংস্কৃতি', নির্মাণে, প্রভাবে, গ্রহণে, প্রচার ও প্রসারে। বলাই বাহুল্য, আমি লোকসংস্কৃতির সেই সংজ্ঞাই স্বীকার করতে চাই যে সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠা করে যে লোকসংস্কৃতি মাত্র সাহিত্য-শিল্প নয়, তা একটি পরিকল্পিত শিল্পিত প্রসার (artistic communication) [১১] প্রক্রিয়া এবং সমাজনির্মাণ (social formation) [১২] প্রক্রিয়ার অংশ।

আসলে লোকসংস্কৃতিতে (বলা যায় যে কোনও সংস্কৃতিতেই) একটি দাতব্যের প্রবণতা থাকে, প্রজ্ঞার দাতব্য, কিছু বলতে চাই, প্রতিষ্ঠা করতে চাই বলেই তো নির্মাণ ও প্রসার। লোকসংস্কৃতিকে তাই অপরিকল্পিত স্বতঃস্ফূর্ত নির্মাণ হিসাবে মেনে নিতে

অসুবিধা হয়। এবং অনেক পরিকল্পিত নির্মাণেরই সর্বজনগ্রাহ্য স্বতঃস্ফূর্ত গ্রহণ ও আশ্রয় জোটে— লোকসংস্কৃতির জোরটা সেখানেই। তা-ই তার হয়ে ওঠা।

তিন

একটি বার্তা আন্তর্জাতিক লোকসংস্কৃতিচর্চায় এখন মোটামুটি মান্যতা পেয়ে গেছে যে 'লোক' ও 'লোকসংস্কৃতি'কে আর স্টিরিওটাইপে চেনা যাচ্ছে না। এদের অনেক বিস্তার ঘটে গেছে। এই সত্য স্বীকার করে এগোলে মানতে হয় লোকসংস্কৃতি নির্মাণে মধ্যবিত্তেরও একটি ভূমিকা থাকে। আগেও ছিল, এখনও আছে। এই ভূমিকাটি দু'রকম— একটি প্রত্যক্ষ এবং আর একটি পরোক্ষ।

একটি সত্য স্বীকার করে এগনো যাক— সংস্কৃতি নির্মাণে বুদ্ধির (এবং, বলাই বাহুল্য, বুদ্ধিজীবীর) একটি ভূমিকা থাকে। এই সত্য শুধু আজকের সত্য নয়, সমাজবিকাশের প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্বেই সত্য। নিরক্ষর আদিম সমাজ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত। আজ হয়ত আমরা বুদ্ধিজীবীদের স্বতন্ত্র অবস্থান ও মর্যাদা চিহ্নিত করি, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তাই-ই স্বাভাবিক, কিন্তু সমাজনির্মাণ প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত সংস্কৃতি ও বিশ্বদর্শন গড়ে তুলতে বুদ্ধির প্রয়োগ সব সমাজেই ছিল, আছে এবং থাকবে। লোকসংস্কৃতি এই প্রক্রিয়ার বাইরে নয়। এক তথাকথিত আদিবাসী (খাসি) সমাজের লোকসংস্কৃতি চর্চার তিন দশকের অভিজ্ঞতায় আমি সমর্থন জানাই গ্রামশির ব্যাখ্যায় যখন তিনি বলছেন : 'এমন কোনও মানবিক ক্রিয়া নেই যা থেকে বুদ্ধিগত অংশগ্রহণের সমস্ত সম্ভাবনা সম্পূর্ণ বর্জন করা যায়, যে মানুষ নির্মাতা ও যে মানুষ চিন্তাশীল তাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা যায় না। চূড়ান্ত বিচারে প্রত্যেক মানুষই তার পেশাগত ভূমিকার বাইরে কোনও না কোনও ধরনের বুদ্ধিগত ক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকে; অর্থাৎ সে তখন একজন 'দার্শনিক', একজন শিল্পী, একজন রুচিবান মানুষ, সে এক বিশ্বদর্শনে নিরত, তার মধ্যে রয়েছে নৈতিক আচরণের এক সচেতন বিধি, ফলে এক বিশ্ববোধকে লালন করা বা তার সংস্কার সাধনের কাজে, অর্থাৎ নতুন চিন্তা-পদ্ধতির জন্ম দেওয়ার কাজে তার ভূমিকা থাকে' (গ্রামশি, ১৯৯৩: ১৯৯)।

এই প্রসঙ্গে পুরোহিতদের কথা আসে। পুরোহিতরা যে বুদ্ধিজীবী (বিশেষত প্রথাগত) শ্রেণীর অংশ সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁরা যে সামাজিক সংস্কৃতি নির্মাণে মুখ্য ভূমিকা নেন তার প্রমাণ মিলবে তথাকথিত আদিবাসী সমাজেও যে সমাজ সাধারণত আজকের নিরিখে শ্রেণীবিভক্ত নয়। আর, কালক্রমে, সমাজ-নির্মাণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তনে, তাঁরাও একটি শ্রেণী, নিদেনপক্ষে একটি স্তরে, মধ্যস্তরে (middle strata), অবস্থান করেন। উদাহরণ দিই। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মেঘালয় রাজ্যে তথাকথিত আদিবাসী খাসিসমাজে ঔপনিবেশিক কালের আগে আধুনিক অর্থে শ্রেণী, এবং মধ্যশ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না কিন্তু প্রথার স্বীকৃতিতেই একটি স্তরবিন্যাস ছিল। সেই বিন্যাসে সমাজপ্রধান এবং শাসনপ্রধান সীয়েম ও অভিজাতকুল (বাখরাও) এবং জনসাধারণ (পাইদবা পাইদকার)-এর মাঝামাঝি ছিলেন পুরোহিতকুল (লিংডো) যাঁদের সান্নিধ্য ছিল বাখরাওদের সঙ্গে। যে কোনও সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে, বিশেষত আচার-উৎসবে, তাঁদের ভূমিকা ছিল সাম্মানিক। যা স্বাভাবিক। তাঁদের নির্দেশ ছিল মান্য। ফলে, লোক-সংস্কৃতির অনেকটাই, সামাজিক প্রথা, ধর্মাচরণ, বিশ্বদর্শন, পুরাণ, পুরাণ বর্ণনা, আচারবিধি ইত্যাদি ছিল তাঁদের নিয়ন্ত্রণে। খাসি-জয়ন্তিয়াদের দু'টি জাতীয় উৎসব, নংক্রেম ও বেডিয়েনখ্লাম পর্যালোচনা করলে এই সত্য জানা যায়। নংক্রেম উৎসবে দেখা যায় যে শাসন-প্রধান (সীয়েম) ও তাঁর পরিবার, অভিজাতকুল (বাখরাও), যাঁরা সীয়েমের দরবারের সদস্য ও মন্ত্রী এবং পুরোহিতরা এই উৎসব নিয়ন্ত্রণ করেন আর জনসাধারণ (পাইদবা-পাইদকার) অংশগ্রহণকারী মাত্র। অথচ এটি একটি লোক-উৎসব, জাতীয় উৎসব। জয়ন্তিয়া পাহাড়ে বেডিয়েনখলাম উৎসবেও শাসনপ্রধান (দলই) ও পুরোহিতের (লিংডো) প্রাধান্য। এই উৎসবের প্রধান আচার সম্পন্ন হয় পুরোহিতের বাড়ির আঙিনায় দলই-এর নেতৃত্বে। এ ক্ষেত্রেও জনসাধারণ অংশগ্রহণকারী মাত্র। প্রশ্ন উঠতে পারে যে আদিবাসী সমাজে তো এটাই স্বাভাবিক — প্রধান ও পুরোহিতরাও তো জনসাধারণেরই অংশ। কিন্তু যথার্থ বিচারে দেখা যায় যে খাসি-জয়ন্তিয়া সমাজে দীর্ঘকাল আগেই স্তরবিন্যাস ঘটে গেছে — তা প্রথাসিদ্ধ। নইলে, প্রধান (সীয়েম ও দলই), অভিজাতকুল (বাখরাও), পুরোহিত (লিংডো) ও জনসাধারণ (পাইদবা-পাইদকার) ইত্যাদি ধারণা প্রথার অন্তর্ভুক্ত হত না এবং প্রত্যেকটি স্তরের কর্তব্য ও অধিকার প্রথা-নির্দিষ্ট হত না।[১৩] জনসাধারণের প্রতি একটি উপদেশ-বাণীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : শাসন-প্রধান (সীয়েম), এলাকা প্রধান (বাসান) ও অভিজাতদের (বাখরাও) সম্মান করো, মান্য করো, তবেই তোমার দেশের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। হে সীয়েম, হে বাখরাও অনুগ্রহ করে তোমাদের সন্ততি জনগণকে, এই পাহাড়, এই উপত্যকাকে রক্ষা করো দিবারাত্র ও তাদের নেতৃত্ব দাও বিঘ্নে ও সমৃদ্ধিতে।[১৪] এই উপদেশটি আমরা পাই ১৯০৩ সালে প্রকাশিত (Berry 1903 : 31) একটি লোককবিতা (ফাওয়ার) সংগ্রহে— বলা হয়েছে সংগ্রহের কবিতাগুলি ঐতিহ্যের অন্তর্গত। যদি ধরেও নিই যে কবিতাটি ১৯০৩ সালেই রচিত যখন খাসি পাহাড়ে স্বল্প সংখ্যায় হলেও একটি সাক্ষর শিক্ষিত এলিট বা মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব হতে চলেছে এবং তাঁদেরই একজন, এই সংগ্রহের 'সংকলক', এর রচয়িতা, তবু দুটি সত্য মানতে হয় যে ততদিনে সমাজে স্তরবিন্যাস স্বীকৃত এবং কবিতাটি একজন মধ্যশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির

রচনা হলেও তা ঐতিহ্যের অন্তর্গত হয়ে যায়। লোকসংস্কৃতি এ ভাবেই গড়ে ওঠে, তার সবটাই 'লোক' বা 'জনসাধারণে'র স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি নয়; এর নির্মাণে সমাজের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা থাকে। খাসি সমাজে বাখরাওরা দরবারের সদস্য ও মন্ত্রীমণ্ডলী, তাঁরা শাসনপ্রধান ও সীয়েমকে মন্ত্রণা দেন, পুরোহিতরা আচার উৎসবের কেন্দ্রে থাকেন এবং তাঁরাই তো আজকের বিচারে খাঁটি বুদ্ধিজীবী ও মধ্যশ্রেণীভুক্ত। আরও উল্লেখযোগ্য পরবর্তীকালে খাসি পাহাড়ে যে আধুনিক বুদ্ধিজীবী মধ্যশ্রেণী শতাধিক বছরে গড়ে উঠেছে, প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের অনেকেই বাখরাওদের বংশোদ্ভূত। সীয়েম ও পুরোহিতও (লিংডো) অভিজাতরূপে স্বীকৃত। তা ছাড়া, যে কবিতায় জনগণকে শাসনপ্রধান ও অভিজাতদের প্রতি আনুগত্যের উপদেশ থাকে তা 'লোক' বা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত নির্মাণ বলে মানতে দ্বিধা হয়। যদি তা-ও মানতে হয় তা হলে মনে হয় জনগণের চেতনাও একটি ছাঁচে অভ্যস্ত, যে ছাঁচ তখন প্রথাসিদ্ধ, অর্থাৎ সামাজিক স্তর বিন্যাস প্রথার অনুমোদন পায়।[১৫] এবং প্রথা যে সমাজপ্রধানরাই নির্দিষ্ট করে দেন তা বলাই বাহুল্য।

এখন নেমে আসি পাহাড় থেকে সমতলে, মধ্যযুগের বাংলায়, মঙ্গলকাব্যের বাংলায়। প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে আমি সাহিত্যের ছাত্র নই, আমার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস জ্ঞান অপরিণত; তাই আমি কিছু প্রশ্ন তুলতে চাই মাত্র। বিদ্বৎজনেরা বিচার করবেন এই প্রশ্নগুলি অপ্রাসঙ্গিক কি না। এবং আমার সহায় কয়েকজন বিশেষজ্ঞের দেওয়া তথ্য, তাঁদের বিচার ও সিদ্ধান্ত।

প্রথম প্রশ্ন, মঙ্গলকাব্য কি লোকসংস্কৃতির অংশ লোকসাহিত্য: দ্বিতীয়, এই কাব্যগুলির রচয়িতা কি লোকসংস্কৃতির স্টিরিওটাইপ 'লোক'; এবং তৃতীয় প্রশ্ন, এর রচনা ও প্রচার কি মৌখিক? এই তিনটি প্রশ্নই কিন্তু পরস্পরযুক্ত। তিনটি প্রশ্নের উত্তরই যদি 'না' হয় তা হলে আমাদের সমস্যা মেটে, আমরা স্টিরিওটাইপের অভ্যাসে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। কিন্তু প্রথম প্রশ্নের উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয় তা হলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরও সদর্থক হতে বাধ্য; অন্যথায় 'লোক' ও 'লোকসংস্কৃতি'র স্টিরিওটাইপ্ সংজ্ঞা বর্জন করতে হবে এবং মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকেও 'লোক'—এর অন্তর্গত মানতে হবে; মানতে হবে যে পুঁথিসাহিত্যও কখনও লোকসাহিত্যের অংশ হতে পারে।

প্রথম প্রশ্নের একটি সদর্থক উত্তর, অন্তত মনসামঙ্গলের ক্ষেত্রে, পাচ্ছি আশুতোষ ভট্টাচার্যর রচনায়। তিনি বলছেন, 'যে সকল উপকরণের উপর ভিত্তি করিয়া সমগ্র বাংলায় একটি অখণ্ড লোক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, মনসা-মঙ্গল তাহাদেরই অন্যতম' (ভট্টাচার্য, ১৯৫৪)। এবং '... খৃস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী হইতেই মনসাদেবীর মাহাত্ম্য বাংলা পাঁচালীতেও কীর্তিত হইতে লাগিল। তখনই একটি অপূর্ব কাহিনী এই দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের অবলম্বন হইল—তাহাই বাংলাদেশে আজ পাঁচশত বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, ইহা বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী। এই কাহিনী অবলম্বন করিয়াই মধ্যযুগের বাংলার লোক-সাহিত্যের বিশিষ্ট একটি শাখা গড়িয়া উঠিয়াছে — তাহাই মনসা-মঙ্গল' (ভট্টাচার্য, ১৯৫৪ : ১৮)। এই উক্তিগুলি যদি মানা যায় তা হলে সমস্যা তৈরি হয় দ্বিতীয় প্রশ্নে, মঙ্গলকাব্যের রচয়িতাদের পরিচয়ে। আশিসকুমার দে জানাচ্ছেন, 'মধ্যযুগের কবিদের বেশির ভাগ ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁদের লেখাপড়া ছিল সংস্কৃত পুরাণ-শাস্ত্র-স্মৃতি ইত্যাদি। কাজেই দেবভাষার অপার প্রভাবকে তাঁরা এড়াবেন কি করে? এ তাঁদের শিক্ষার ভাষা কিংবা উচ্চতর সাহিত্যের ভাষার মানদণ্ড। যাদের কথা তাঁরা লিখছেন এবং যাদের কাছে গাওয়া হচ্ছে, সেসব মানুষের সংস্কৃতজ্ঞান ছিল না' (দে, ১৯৯৭ : ৬৬)। এবং, 'মানবজীবনের লৌকিক কণ্ঠস্বর তাঁরা কি যথার্থভাবে শোনাতে পারছিলেন?' (ঐ. পৃ: ৬৬) আশিসকুমার দে-র প্রশ্নটি অমূলক নয়। সংকট তৈরি হয় রচয়িতাদের পরিচয়, বিশেষত বংশপরিচয়, তাঁদের সাক্ষরতা, পাণ্ডিত্যের স্তর ইত্যাদি জানলে এবং তাঁদের কাব্যের ভাষা লক্ষ করলে। তাঁরা যে মূলত উচ্চবর্ণের মানুষ ছিলেন এবং তাঁদের বংশপরিচয় ও পাণ্ডিত্যের গর্বপ্রকাশ করেছেন তাঁদের আত্মপরিচয়ে তা তো জানা যায় মনসামঙ্গলের দুই কবি নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্তের কাব্যেই : 'নারায়ণ দেব কয় জন্ম মগধ। মিশ্র পণ্ডিত নহে ভট্টবিশারদ।। অতি শুদ্ধ জন্ম মোর কায়স্থের ঘর। মৌদগোল্য গোত্র মোর গাঁই গুণাকর।।'[১৬] 'পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূর্বে ঘন্টেশ্বর। মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর।। চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল। বৈদ্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল।। কায়স্থজাতি বসে তথা লিখনের শূর। অন্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর।। স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময়। হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয়।।'[১৭] এঁদের এই পরিচয় জেনে ওয়াকিল আহমদও বলছেন যে মঙ্গলকাব্য মূলত 'ভদ্রসাহিত্য' কারণ 'মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবমঙ্গল ব্রাহ্মণ কবিপণ্ডিতরাই রচনা করেছেন' (আহমদ ১৯৭৪ : ১৯)। 'লোক' ও 'লোকসংস্কৃতি'র অভ্যস্ত সংজ্ঞা মনে রাখলে, অর্থাৎ 'লোক' বলতে যদি বুঝি নিরক্ষর নিম্নবর্গের মানুষজন, 'লোক-সংস্কৃতি' যদি হয় মৌখিক, লোকসাহিত্যের ভাষা যদি হয় জীবনযাপনের কথোপকথনের ভাষা (বিশুদ্ধ বাংলা নয়), যদি রচয়িতার পরিচয় না জানা যায়, তা হলে মনসামঙ্গল সহ সব মঙ্গলকাব্যকেই কিন্তু লোকসাহিত্য বলা যাচ্ছে না। তার 'ভাষাপট ও ভাবকথা' আলাদা। কিন্তু আমাদের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরটা একটু জটিল — 'না' এবং 'হ্যাঁ'। মঙ্গলকাব্য মূলত পুঁথিসাহিত্য, মৌখিক নয়, কিন্তু তার প্রসার মৌখিক। এ-সত্য অস্বীকার করা যাবে না যে এই কাব্য,

বিশেষত মনসামঙ্গলের প্রসার লোকজীবনে ব্যাপক, সাময়িক ও স্থানিক উভয় মাপেই।

এই প্রসার ও প্রচারের কথা মনে রাখলে, অর্থাৎ লোক ও লোকসংস্কৃতির স্টিরিওটাইপ থেকে সরে আসতে পারলে এবং যদি মানা যায় (মানতে বাধা দেখি না) যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর (অবশ্যই তাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত) রচনা, পুঁথি নির্ভর হলেও, কবির পরিচয় জানা থাকলেও, লোকসাহিত্যের মর্যাদা পেতে পারে। এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাই নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যর বিবরণে : 'তাঁহার (নারায়ণ দেব-এর) কাব্যই সমস্ত মনসা-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে সর্বাধিকপ্রচারলাভ করিয়াছিল।ইহা খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বেই আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও সুর্মা উপত্যকা উভয়স্থানেই প্রচারিত হইয়াছিল, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ইহা আনুপূর্বিক মধ্যযুগীয় অসমীয়া ভাষায় পরিবর্তিত হইয়াছে এবং আসামবাসীগণ তাঁহাকে অসমীয়াভাষার আদিকবি বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। নারায়ণদেবের পুঁথি উত্তরবঙ্গে প্রচারলাভ করিয়াছিল, সেই পথেই তাহা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও পূর্ববঙ্গের পথে সুর্মা উপত্যকায় প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।ইহা এতদিনের কথা যে তাঁহার কাব্যে তাঁহার বাসস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আসামের ব্রহ্মপুত্র ও সুর্মা উভয় উপত্যকায়ই তাঁহার বাসস্থান সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়াছে। আসামের গোয়ালপাড়া, কামরূপ, মঙ্গল দৈ প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার বাসস্থান সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতি আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে। শ্রীহট্ট জিলায়ও তাঁহার বাসস্থান সম্বন্ধে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে' (ভট্টাচার্য ১৯৫৪ : ২)।

লোকসংস্কৃতির প্রকৃত মর্যাদা তাই এর রচনা ও নির্মাণেই মাত্র নয়, তার প্রচার, প্রসার ও গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপকতায়। এবং লোকসংস্কৃতি যে মাত্র স্টিরিওটাইপ 'লোক' এর নির্মাণ নয়, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাও যে এর নির্মাণে অংশ নিতে পারেন, তার প্রমাণ রইল বাংলা মঙ্গলকাব্যে। মনসামঙ্গলের রচয়িতা নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি পণ্ডিতকবিরা, তাঁদের শিক্ষার স্তর ও বংশপরিচয় নিয়ে যে মধ্যবিত্ত ট্র্যাডিশনাল এলিট বা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষ তা অস্বীকার করার উপায় কী! এবং তাঁদের রচনাই যে কালক্রমে বাংলার লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধ রচনা হিসাবে গৃহীত হয় ও মান্যতা পায় (শুধু বিশেষজ্ঞদের বিচারে নয়, জনজীবনেই) তা-ও অস্বীকার করা যায় না।

উদাহরণ বাড়তেই পারে কারণ তা খুব কম নয়। পুরাকাল থেকে মধ্যযুগ হয়ে, আধুনিক কাল পর্যন্ত, বিস্তীর্ণ ধারাবাহিকতায় আমাদের উদাহরণ বিস্তর এবং তার ব্যাখ্যায় আমার সিদ্ধান্তের, অর্থাৎ লোক ও লোকসংস্কৃতির স্টিরিওটাইপ থেকে সরে এসে এতদিন পর্যন্ত অগ্রাহ্য অনেক নমুনাকেই যে লোকসংস্কৃতি হিসাবে মান্যতা দেওয়া যায় আর মানা যায় যে 'লোক' ছড়িয়ে আছেন মধ্যবিত্ত সহ অনেক শ্রেণীতেই, তার সমর্থন দাবি করা যায়। কিন্তু এই প্রবন্ধের সীমার কথা ভেবে, সব উদাহরণের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে, উল্লেখ করি শুধু, যাতে বিশেষজ্ঞরা তাঁদের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

শুরু করা যাক বাংলার কবিয়ালদের নিয়ে কারণ তাঁরা এক সন্ধিক্ষণের কবিকুল যখন সাহিত্য রাজসভা থেকে জনসভার দিকে পা বাড়িয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের অবস্থানের যথাযোগ্য ব্যাখ্যা করেছেন বিনয় ঘোষ : 'অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাস হল প্রধানত বাংলার কবিয়ালদের ইতিহাস। এই সময় ইংরেজের প্রয়োজনে বাংলার নতুন রাজধানীরূপে কলকাতা শহর গড়ে উঠছে। তার সঙ্গে ইংরেজের অনুগ্রহে নতুন এক শ্রেণীর বাঙালী ধনিক বাংলার সমাজে দেখা দিচ্ছেন। ... এক বিচিত্র শ্রেণীবিন্যাস হচ্ছে বাংলার সমাজে, পুরাতন শ্রেণীবিন্যাসকে ভেঙেচুরে দিয়ে। ধীরে ধীরে হলেও, বাংলার সমাজে এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ হচ্ছে।... বাংলার কবিয়ালরা প্রধানত তাঁদেরই অনুগ্রহজীবী ছিলেন। ... এই কবিয়ালদের কবিসঙ্গীতের ধারাতেই বাংলার সন্ধিক্ষণের শ্রেষ্ঠ কবি ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল বাংলা সাহিত্যের আসরে আর কোনও উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন নি। .... বাংলার কবিয়ালরা ছিলেন কাব্যের ফিরিওয়ালা। এইদিক থেকে বিচার করলে কবিয়ালদের ইতিহাস সত্যিই যুগান্তকারী ইতিহাস। তাঁরা সাহিত্যের এক নবযুগের প্রবর্তক অথবা এক অভিনব নবযুগের প্রতিনিধি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তাঁদের নিয়েই শুরু। আমরা আধুনিক প্রকাশক ও সাধারণ পাঠকযুগের সাহিত্যিকরা বাংলার এই কবিয়ালদেরই বংশধর। .... যুগসন্ধিক্ষণের প্রতিনিধিরূপে কবিয়ালরা তাই স্মরণীয়। .... ভোলা ময়রা ও তাঁর সমসাময়িক কবিয়ালরাই এই কারণে আধুনিকযুগের প্রবর্তক, ভারতচন্দ্র নন। .... তাঁদের ভিতর থেকেই আমরা কবি ঈশ্বর গুপ্তকে পেয়েছি। .... ঈশ্বর গুপ্তই বাংলার প্রথম কবি যিনি রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতার মোহ ত্যাগ করে, জনসভার দিকে সাহস করে পা বাড়িয়েছিলেন। নতুন শিক্ষিত বাঙালী সমাজ ও বাবুসমাজ নিয়ে সেই জনসভা গঠিত ছিল' (বিনয় ঘোষ, ১৯৭৮ : ৩০-৩৫)।

সন্ধিক্ষণের এই কবিয়ালরা যেমন সাহিত্যের এক নবযুগের সূচনা করলেন, তেমনই তাঁরাই প্রবর্তক বাংলা লোকসংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট উপাদানের — কবিগানের। তাঁরা যে ঐতিহ্য গড়লেন সেই ঐতিহ্যেই বেড়ে উঠল, কালক্রমে নতুন রূপ পেল বাংলার কবিগান। যে ঐতিহ্য এখনও জীবন্ত। কিন্তু তার শুরুটা,

অন্তত তার ব্যাপকতার শুরু, নগর কলকাতার ক্রমবিকশিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাগররুচির চরিতার্থতায়। এই কবিয়ালদের পেট্রন তখন গ্রামীণ কৃষিসমাজ নয়, নগর কলকাতার মধ্যবিত্তশ্রেণীর জনসভা। তখন কবিগানের গ্রহীতা স্টিরিওটাইপ 'লোক' নয়, একটি নতুন শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী। কবিয়ালদের বলা যায় সেই সময়ের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবীরা মধ্যবিত্তের এক স্বীকৃত অংশ। রাম বসু, হরু ঠাকুর বা ভোলা ময়রাদের কি গ্রামীণ কৃষিজীবী 'লোক' বলা যাবে? তাঁরা বস্তুতই তখনকার মধ্যবিত্তশ্রেণীর অংশ হয়ে যান, নতুন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী হিসাবে, বুদ্ধিজীবী পেশাদার এই কবিকুল। তাঁরা শুধুই মধ্যবিত্তশ্রেণীর রুচি চরিতার্থ করেননি, সেই সূত্র ধরে, তাঁদের পেশার সূত্রেও, তাঁদের অবস্থান মধ্যবিত্ত শ্রেণীতেই।

আবার তাঁরাই বাংলা লোক সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তক। লোকসংস্কৃতির চিহ্ন যে স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতায় শুধুই নির্মাণে নয়, প্রসারে, তার উদাহরণ মিলছে কবিগানে। আর একটি তথ্য আমাদের এইসব সিদ্ধান্তের সহায়ক হতে পারে: আধুনিক কালের বিখ্যাত কবিয়ালদের বংশপরিচয়ের তথ্য। রমেশ শীলের পিতা ছিলেন পেশায় কবিরাজ (চৌধুরী, ১৯৯৩ : খ) গুরুদাস পালের পিতা ছিলেন জুটমিলের শ্রমিক, 'মেটিয়াবুরুজের ঘনবসতি এলাকাটি ছাড়িয়ে গিয়ে আধাশহর আধাগ্রাম বদরতলা'র বাসিন্দা (ভট্টাচার্য ও বাগচি, ২০০০ : ২০-২১), শেখ গুমানি মুর্শিদাবাদ জেলার জিনদিঘি গ্রামের দেওয়ান বংশের সন্তান (রাকিব, ২০০১ : ১০)। রাম বসু ভোলা ময়রাদের উত্তরসুরী, লোকসংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট ধারার বাহক এই কবিয়ালদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত বুদ্ধিজীবী বলতে বাধা দেখি না। এবং তাঁদের রচনাকে লোকসংস্কৃতি বলতেও বাধা নেই, যদি আমরা স্টিরিওটাইপগুলিকে সঙ্গীত অগ্রাহ্য করি।

এই প্রক্রিয়াতেই হাসন রাজা বা আববাসউদ্দিনের রচনা লোকসঙ্গীতের মর্যাদা পায়। হাসন রাজা যে জমিদার ছিলেন শুধু তাই নয়, ভোগী ও অত্যাচারী জমিদার ছিলেন, তা তো জানা তথ্য আর আববাসউদ্দিন যে সম্ভ্রান্ত 'সেখ' পরিবারের সন্তান এবং তাঁর পিতা ছিলেন আইনজীবী, তাও-তো আমাদের জানা। অথচ এঁদের রচিত গীতি যে লোকগীতি তাও-তো মানা হয়েছে। যদি 'লোক'-এর অভ্যস্ত সংজ্ঞা আমরা মানি তা হলে কিন্তু এই মেনে নেওয়া ভুল। আর যদি 'লোক'-এর ও 'লোকসংস্কৃতি'র পরিবর্তিত সংজ্ঞায় আস্থা রাখি তা হলে মানতে অসুবিধা দেখি না।

পৌঁছে যাই হাল আমলে। এই সময় মধ্যবিত্তেরা নানাভাবেই তাঁদের নিজস্ব লোকসংস্কৃতি গড়ছেন আর অন্য 'লোক'-এর সংস্কৃতিতে তাঁদের পরোক্ষ প্রভাব থাকছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় গণমাধ্যমের। এই মাধ্যম বস্তুতই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের নিয়ন্ত্রণে, বাণিজ্যিক, সরকারি, সামাজিক, যাই হোক না কেন। তার প্রভাবে স্বীকৃত লোকসংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটছে, ঘটবে, এই সত্য, একুশ শতকের গোড়ায়, বিশ শতকের অভিজ্ঞতার পর অস্বীকার করার উপায় নেই। লোকসংস্কৃতির পরিবর্তন তার স্বাভাবিক নিয়মেই যেমন ঘটে, তেমনই বাইরের চাপ ও প্রভাব কখনওই অস্বীকার করা যায় না। এই সংস্কৃতি সামাজিক ভাঙাগড়ার আওতার বাইরে — এই ধারণা ভুল। আধুনিককালে এই ভাঙাগড়া অনেক তীব্র ও দ্রুততর। যে কোনও সংস্কৃতির অন্তর্বলয় ও বহির্বলয়, উভয়ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তনের চাপ থাকবেই। লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই প্রক্রিয়া বাস্তব কারণ এই সংস্কৃতি স্থবির নয়, জঙ্গম; পরিবর্তন তার সজীবতার লক্ষণ। এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বাইরেও এক ধরনের চাপ থাকে; আধুনিক কালের গণমাধ্যম এই চাপ গড়ে দ্রুততর।

একজন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ মিহির ভট্টাচার্যর একটি উক্তি তাই খুব সত্য বলে মনে হয়: 'আধুনিক মাধ্যমের শারীরিক বিস্তারের চেয়ে তার চৈতন্যভেদী বশীকরণ সম্ভবত অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। অবশ্য ভারতীয় সমাজের এখন যে পরিস্থিতি তাতে ভোগ্যপণ্যের অন্যান্য বাজারের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বাজারের দ্রুতপ্রসার অবশ্যম্ভাবী'। এবং যেমন 'একদিকে দেখা যায় যে গ্রামীণ শিল্পীরাই বিষয়বস্তু এবং প্রয়োগ বদলে নিচ্ছেন সময়ের চাপে, অন্যদিকে লোকরীতি ব্যবহার করে কৃত্রিম ও মিশ্রিত একটি ঢং প্রচলিত হচ্ছে শহুরে প্রমোদ-বাজারের চাহিদায়। এই দুই প্রক্রিয়ার পিছনেই আছে সমাজব্যবস্থার নগরকেন্দ্রিক সংস্কৃতিধারণার চাপ' (ভট্টাচার্য ১৯৯৯ : ৪৭) এই চাপ তৈরি হয় মূলত গণমাধ্যমে আর নগরকেন্দ্রিক সংস্কৃতিধারণার কেন্দ্রে তো থাকেন পেশাদার বুদ্ধিজীবীরাই, যাঁরা অবশ্যই মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। এই প্রক্রিয়া আজ আমাদের এমন চেনাজানা যে উদাহরণ দেওয়া বাহুল্য মনে হয় যদিও উদাহরণ আছে বিস্তর। মিহির ভট্টাচার্য বাংলার বাউলসঙ্গীত ও আলকাপের কথা বলেছেন, আসামের বিহুগান ও নাচ, সেরাইকেলা ময়ূরভঞ্জের ছৌ ইত্যাদি নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন অনেকেই — দুশ্চিন্তা এই যে গণ মাধ্যমের দাবিতে ও চাপে এদের শুদ্ধতা বজায় থাকছে না — আমাদের বাউল সঙ্গীত নিয়ে এই দুশ্চিন্তা কম কিছু না। কিন্তু সময়ের চাপ কে আটকাবে? শুধু অভিকরণ শিল্প (Performing Arts) -ই তো নয়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তো এই প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়। এমনকী ধর্মাচারও বাদ পড়ে না। মন্দিরে সমবেত বা একক ধর্মসঙ্গীতের বদলে ক্যাসেটের ব্যবহারও দেখা যাচ্ছে।[১৭] ভারতবর্ষের, বিশেষত উত্তর ভারতের, তথ্য জানিয়ে উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ করেছেন পিটার ম্যানুয়েল।[১৮] লোকসংস্কৃতি যেমন মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে সর্বদা যুক্ত, হাল আমলে গণমাধ্যম প্রায় সে

ভাবেই যুক্ত — প্রত্যন্ত প্রদেশেও তার বিস্তার। ক্যাসেট, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি কি আজ আর মাত্র নাগরিক, গ্রামাঞ্চলেও কি তার প্রসার নেই? এবং শহরেই হোক, গ্রামেই হোক, মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এর প্রভাব থাকবেই। আর বলাই বাহুল্য, এই প্রভাবের কেন্দ্রে ও নিয়ন্ত্রণে থাকেন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা।

'লোক'-এর নতুন সংজ্ঞায় আস্থা রাখলে আমরা জানি যে মধ্যবিত্ত কিছু মানুষ ও গোষ্ঠীও তাঁদের নিজস্ব লোকসংস্কৃতি তৈরি করেন। এই সংজ্ঞাটি কী তা এই আলোচনার প্রথম অংশে আছে। ফলে, 'লোকসংস্কৃতি' সম্পর্কে আমাদের ধারণাও পালটাতে হচ্ছে। এই সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার কখনও সীমাবদ্ধ থাকে মধ্যবিত্ত মণ্ডলেই, আবার কখনও ছড়িয়ে যায় বৃহত্তর সমাজে। দু'টি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা যায়। একটি 'তামাশা কথা' (Joking Stories) আর অন্যটি 'ভোটসাহিত্য' অর্থাৎ নির্বাচনকেন্দ্রিক কথা; ছড়া, তামাশা ইত্যাদি। শুরু করি দু'টি সদ্যনির্মিত ও প্রচারিত তামাশা-কথা দিয়ে। প্রথমটি আমি শুনেছি 'পদক্ষেপ' পত্রিকার সম্পাদক সমীর বসুর বয়ানে : 'সম্প্রতি ইউরোপ আমেরিকায় অভারতীয়দের কাছে ভারতীয় রান্না খুবই জনপ্রিয় এবং ভারতীয় রেস্তোরাঁতে আমেরিকান ও ইউরোপীয়দের জববর ভিড়। মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতিরাও বাদ যান না। এমনি এক রেস্তোঁরায় গেছেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ। এবং তারিয়ে তারিয়ে খেয়েছেন ভারতীয় "কারি" ইত্যাদি। খাওয়া শেষ হলে তাঁর টেবিলের কাছে এল এক "ওয়েটার"। সে বেচারা সদ্য সদ্য দেশ থেকে এসেছে, তখন পর্যন্ত ইংরেজি ভাষণে রপ্ত হয়নি। সে তার অভ্যাসবশত বিশুদ্ধ হিন্দিতে জানতে চাইল, 'সাব, বিল লা দেঁ'। শুনেই বুশ সাহেব ঝটিতি এক লাফে রেস্তোরাঁর বাইরে এবং তাঁর ত্বরিত পলায়ন। তাঁর কর্ণকুহরে কী বার্তা পৌঁছেছিল তা অনুমান করা যায়; ঘটনাটি ঘটে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর।'

এই তামাশাটি যখন আমি শোনালাম আমার এক ভাই ও ভ্রাতৃবধূকে, তখন ভ্রাতৃবধূ, কেকা নন্দী, পেশায় শিক্ষয়িত্রী, শোনালেন আরও একটি তামাশাকথা : 'পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু চুল কাটেন বাড়িতে। নাপিত এসে কেটে দিয়ে যান। জ্যোতিবাবুর স্ত্রী লক্ষ করেন প্রতিবারই চুল কাটার সময় নাপিত জ্যোতিবাবুর কানে কানে কী যেন বলেন। কৌতূহল বশত জানতে চাইলে নাপিত বলেন, তিনি বিশেষ কিছুই বলেন না, শুধু বলেন "মমতা"। শুনে জ্যোতিবাবুর চুল খাড়া হয়ে যায়, তার কাটতে সুবিধে হয়।'

'কথা'দুটি কি তথাকথিত 'লোক' এর তৈরি ও তাঁদের বলয়ে প্রচারিত? নিশ্চয়ই না। এ 'কথা' মধ্যবিত্তের তৈরি ও মধ্যবিত্ত সমাজে প্রচারিত।

এই ধরনের তামাশাকথা বাংলায়, ভারতে বা বিশ্বের অন্যত্র আছে বিস্তর। রাজীব গান্ধী যখন অপ্রত্যাশিতভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন তখন ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজ বিস্মিত এবং তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেননি যে ভারতবর্ষের মতো দেশে তিনি প্রধানমন্ত্রী হবার যোগ্য। তখনই এই অবিশ্বাস, অনাস্থা ও সংশয়ের ফলে তৈরি হয় অনেক তামাশা কথা। এমন একটি আমি শুনেছিলাম দিল্লিতে ১৯৮৫-এর জানুয়ারি মাসে। এবং সে তামাশা যে কত দ্রুত ছড়িয়ে যায়, তা জানতে পারি একই 'কথা' যখন শুনতে পাই দশদিন পর আমার কর্মস্থল শিলংয়ে ফিরে। আমরা তো মধ্যবিত্ত, আমরাই শুনছি কারণ এ আমাদেরই কারও নির্মাণ এবং আমাদের সমাজেই প্রচারিত। রাজীব গান্ধী সম্পর্কিত এমনই আর একটি তামাশা নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন কিরিন নারায়ণ,[১৯] উৎসাহী পাঠক দেখতে পারেন। সর্দারজিদের নিয়ে তো আমাদের তামাশাকথা বিস্তর ও বহুল প্রচারিত। নিঃসন্দেহে তা মধ্যবিত্ত বলয়ে তৈরি ও প্রচারিত। ভারতের স্বাধীনতার পর প্রশাসনিক ও অন্যান্য স্তরে সর্দারজিদের ক্রম-উত্থান অন্যান্যদের যথেষ্ট উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারই অভিব্যক্তি এই সব তামাশাকথায়। এবং এই উদ্বেগ ও অভিব্যক্তি, দুইই, মধ্যবিত্তের।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ ভোটসাহিত্য। পশ্চিমবঙ্গে ভোটের ছড়া আমাদের খুবই পরিচিত। ১৯৫২-র প্রথম নির্বাচন থেকে আজ পর্যন্ত যত নির্বাচন হয়েছে তার প্রচারে ছড়া ও দেওয়াললিপি বড় অংশ জুড়ে থাকে, যখন খবরের কাগজের পাতার ওপর লাল নীল কালিতে পোস্টার লেখা হত তখন থেকেই। শুরু কিন্তু কলকাতা ও তার আশেপাশে। আজ তা ছড়িয়ে গেছে সর্বত্র। এবং এই ছড়ার রচয়িতা বেশির ভাগই নাগরিক ও শহুরে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, একটি ছড়ার উল্লেখ করি যা আজ অবধি মুখে মুখে ফেরে : 'ভোট দিয়েছ কিসে, কাস্তে ধানের শিষে।' আমার ভুল না হলে, এটি পূর্ণেন্দু পত্রীর একটি কবিতার অংশ। এখন যে কবির নাম কেউ মনে রাখেনি তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। উল্লেখ্য আমার প্রয়াত অগ্রজ, গণনাট্য সংঘের কর্মীশিল্পী, ব্যোমকেশ সেনের ভোট-ছড়ার। তিনি কবি ছিলেন না, তাঁর কোনও সাহিত্যকর্মের প্রকাশনা নেই, এমনকী তাঁর কোনও ছড়ার খাতারও হদিশ পাওয়া যায়নি। অথচ, আমৃত্যু তিনি ভোটের ছড়া লিখেছেন এবং তাঁর অঞ্চলে পার্টিকর্মীরা তা প্রতি নির্বাচনেই দেওয়ালে, পোস্টারে লিখেছেন।

আমাদের দেশে হয়ত এখনও তেমন দেখা যায়নি কিন্তু উন্নত দেশে, যেমন ব্রিটেনে, নির্বাচন প্রচারে যে লোককথা-তুল্য কাহিনি রচনা করা হয়, তার একটি কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা করেছেন গিলিয়ান বেনেট। তাঁর পর্যালোচনা এই যে আধুনিক

নির্বাচনে যাঁদের 'স্পিন ডক্টর' বলা হয়, অর্থাৎ নানা মার্গের পেশাদার বুদ্ধিজীবী, তাঁরা নির্বাচনের প্রচারে লোককথাতুল্য কাহিনি নির্মাণ করেন এবং তার বহুল প্রচার হয়।[২০]

এবার প্রবন্ধটি শেষ করার পালা। বলা যায় আমাদের কথাটি ফুরল, নটে গাছটি মুড়ল। এবং আশা করতে পারি যে লোকসংস্কৃতি নির্মাণ ও প্রসারে যে মধ্যবিত্তের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ দুই ভূমিকাই থাকে তা প্রতিষ্ঠা করা গেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নানা গোষ্ঠীও যে তাঁদের নিজস্ব 'লোকসংস্কৃতি' গড়েন তা-ও মেনে নিতে চাই। এই তথ্য ও তত্ত্বই এই প্রবন্ধের প্রস্তাব।

সূত্রনির্দেশ

১. ১৮৪৬ সালের ২২ আগস্ট লন্ডনের The Athenaeum পত্রিকায় একটি চিঠিতে William Thoms এই সংজ্ঞা প্রস্তাব করেন।

২. পুরাণ, কিংবদন্তী, লোককথা, গাথাকাব্য, ধাঁধাঁ, প্রবাদ, আচার, সংস্কার, প্রথা ইত্যাদি মূলত এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

৩. দ্র. Leach and Fried, 1949.

৪. এই প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনার জন্য দ্র. আমার কয়েকটি রচনা, ১৯৮২, ১৯৮৩, ১৯৮৪।

৫. দ্র. Mao Tsetung 1971 : 11-22.

৬. উইলিয়াম অ্যাডাম-এর এই রিপোর্টে বলা হয় : 'There is no class of persons that exercises a greater degree of influence in giving native society the tone, the form, and the character which it actually possesses than the body of the learned, not merely as the professors of learning, but as the priests of religion'. Benoy Ghose 1972 : 75.

৭. দ্র. আনতোনিও গ্রামশি, নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ, সম্পা. ও অনু. সৌরীন ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৩ : ৮

৮. ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মেঘালয় রাজ্যের খাসি-জয়ন্তিয়া জনজাতি সমাজে এই প্রক্রিয়া খুবই স্পষ্ট। এবং বলা যায় যে জনজাতি সমাজে এটাই প্রায় সাধারণ প্রথা। দ্র. Soumen Sen 1985.

৯. বিনয় ঘোষ বলছেন, 'The traditional elite of Bengal was both intellectual and religious elite, and as such the tone and the form of the Bengali society was given by them. দ্র. Benoy Ghose 1972 : 75.

১০. এই সংজ্ঞা পরিবর্তন নিয়ে গত কয়েক দশক অনেক আলোচনা হয়েছে। প্রসঙ্গত দ্র: আমার একটি প্রকাশিতব্য রচনা (লোকশ্রুতি ২০) — 'লোক-এর বিভাজন'।

১১. এই সংজ্ঞার আলোচনার জন্য দ্র. Ben Amos, 1971.

১২. খাসি-জয়ন্তিয়া জনজাতির সমাজ নির্মাণ প্রক্রিয়া ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে আমার আলোচনা (দ্র : Sen 1985) এই প্রসঙ্গে সহায়ক হতে পারে।

১৩. এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এই প্রবন্ধের সীমায় নেই। উৎসাহী পাঠকের মনোযোগ আমার কয়েকটি রচনার (১৯৮৫, ১৯৯৭ ও ১৯৯৯) প্রতি আকর্ষণ করি।

১৪. খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড়ে একটি লোককবিতার নাম ফাওয়ার এবং এই কবিতা রচিত হয় নানা উৎসব, খেলা বা প্রতিযোগিতা উপলক্ষে। উদ্ধৃত কবিতাটি এমনই একটি ফাওয়ার — আমার বাংলা অনুবাদে তা আর কবিতা থাকেনি অবশ্য, যদিও মর্মকথা অটুট আছে।

১৫. অনেক লোককাহিনি, বিশেষত পুরাণ বা মিথ যে স্বতঃস্ফূর্ত রচনা নয়, পরিকল্পিত ও নির্দিষ্ট, খাসি-জয়ন্তিয়া লোককাহিনির বিশ্লেষণে সে আলোচনা আছে আমার একটি প্রবন্ধে। দ্র. Sen, 2001.

১৬. দ্র. ভট্টাচার্য, ১৯৫৪ : ২।

১৭. দ্র. ঐ ২।

১৮. ম্যানুয়েল বলছেন, 'Cassettes have become the first and in many cases the only mass medium to represent the extraordinary diversity and richness of India's myriad forms or India's local religious song and discourse. ... Cassettes are not neutral mass medium. Clearly, in some contexts the spread of tapes has been at the expense of live performance. (Manuel 1996 : 129).

১৯. দ্র. Narayan, 1993 : 177-204.

২০. বেনেট জানাচ্ছেন, 'Certainly, story-like themes seem to be an inherent part of electioneering. .... To an increasing extent, too, an election is conceived and controlled by professional story-tellers .... their so–called "spin doctors" .... The story–isation of election can also be seen in the way both personalities and issues are made to fit folktale patterns' (Bennett 1995 : 22-23).

এস ওয়াজেদ আলীর প্রাসঙ্গিকতা

বিজিতকুমার দত্ত

প্রায় পাঁচশো বছর ধরে বাংলাদেশ মুসলমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটা একটা যুগান্তকারী ঘটনা। এই কারণে যুগান্তকারী যে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগেও যে বিদেশিরা এসেছিলেন সেই বিজয়ী জাতি বিজিত জাতির দেহে লীন হয়ে গিয়েছিলেন। কিছু ব্যতিক্রম আছে। এই মুহূর্তে যে দুটি সম্প্রদায়ের কথা মনে আসছে তারা হলেন পার্শি এবং খ্রিস্টান। মুসলমান বিজয়ের তাৎপর্য আরও গভীর এবং ব্যাপক। বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক। পাঠান মোগল রাজত্বে কখনও সহিংস কখনও অহিংস পথে অন্ত্যজ হিন্দুরা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন। ধীরে ধীরে এই হিন্দু-মুসলমান কোনও কোনও অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠতাও লাভ করে। অন্ত্যজ হিন্দুরা বর্ণহিন্দুদের কাছে প্রায় উপেক্ষিত ছিল।

বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে অন্ত্যজ হিন্দুদের সামাজিক বৈষম্য ছিল ব্যাপক। অন্ত্যজ হিন্দুদের এখনও নিচু বলতে কেউ কেউ বেশ গর্ব বোধ করেন এবং কেউ কেউ শেষোক্তদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্যও করেন। এই তুচ্ছতা থেকে সরিয়ে এনে ইসলাম অন্ত্যজদের কোল দিয়েছিল। এস ওয়াজেদ আলি ইসলামের অন্যতম অবদান বলতে অন্ত্যজদের উদ্ধারকে খুব বড় একটা স্থান দিয়েছেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার নির্মমতার প্রসঙ্গ এনে বলেছেন ইসলাম না এগিয়ে এলে এরা সেই সময়ে যে তিমিরে ছিল আজও সেই তিমিরেই থেকে যেত। ইসলাম যেন এদের কাছে Mesiaha, আল্লাহর দূত ছিল। সেই অন্ত্যজ হিন্দু মুসলমান হয়ে গেল। হিন্দুর মনোপলি নষ্ট হল। ধর্মের চেহারাটা বদলে গেল। চরিত্র বদলে গেল।

এস. ওয়াজেদ আলী নৈষ্ঠিক মুসলমান। তাঁর প্রায় প্রতিটি দীর্ঘ নাতিদীর্ঘ এবং ক্ষুদ্র রচনায় তিনি ইসলামের, আল্লাহর, পয়গম্বরের কথা বলেছেন। আল্লাহ তায়লার প্রতি আনুগত্য, বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল এস ওয়াজেদ আলীর মননে, অনুভবে। তিনি ভারতবাসী কিন্তু বাঙালির মঙ্গলচিন্তাই তাঁর ধ্যানে ছিল। আবার, বাঙালির চিন্তায় তাঁর লেখার সিংহভাগই ছিল বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা। এটাও স্বাভাবিক বলে মনে হয়। কেননা তিনি তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের নানা কষ্ট দুর্দশার কথা জানতেন, কুসংস্কারের কথাগুলিও ভাল করেই জানতেন। এবং ধর্মভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে কীভাবে স্বসম্প্রদায়ের উন্নতি সম্ভব তার আলোচনা করেছেন, বিশ্লেষণে এগিয়ে এসেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ইসলামধর্ম যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। খ্রিস্ট ধর্ম তা নয়। ইংরেজি শিক্ষিত ওয়াজেদ আলী যে যুক্তির পথে এগিয়ে যাবেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যদিও এস. ওয়াজেদ আলীর লেখায় রবীন্দ্রনাথের কথা প্রায় পাওয়াই যায় না (ব্যতিক্রম আছে) তবুও রবীন্দ্রচিন্তায় সমাজের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সমাজের শুভ এবং মঙ্গলবোধের তিনি ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী। ওয়াজেদ আলিকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করা অসমীচীন। তবু বলব আলী সাহেবের লেখায় রবীন্দ্রসমাজেরও প্রতিফলন দুর্লক্ষ নয়। পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী মুসলমান ধর্ম। ওয়াজেদ আলী 'পৌত্তলিক' (গুল-দাস্তা) গল্পে অনায়াসে স্থান করে দেন আলী হোসেনকে। আলী হোসেন একদিন দেখলেন কালির বরাভয় মূর্তি। মুসলমান পঞ্চায়েত বেত মারা, কান মলার ব্যবস্থা করল। আলী হোসেনের বক্তব্য শুনে এস ওয়াজেদ বিধান দিলেন, 'তোমার উপর যাতে কোন অত্যাচার না হয় সে চেষ্টা আমি করবো। আর, তুমিও একবার চেষ্টা করে দেখো সেই কল্পনার ছবি মন থেকে সরাতে পারো কি-না।' এইখানে আমরা এস ওয়াজেদ আলীকে তাঁর স্বরূপে দেখতে পাই। ঢাকা-কেন্দ্রিক শিখা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান আলী সাহেব। আলী সাহেব অবশ্য সমন্বয়ের কথা বলেননি কিন্তু সহনশীলতার উপর জোর দিয়েছেন। এটা যে খুব জরুরি ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যার বিশ্লেষণে ওয়াজেদ আলী সাহেবের মতামত লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন, 'প্রতিবেশিক সমাবেশের দরুণ হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের জীবন এমনই ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট যে, হয় তারা পরস্পরের জীবনকে সুভাবে প্রভাবান্বিত করবে, নয় কুভাবে প্রভাবান্বিত করবে; এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। সুতরাং হয় তারা পরস্পরকে ভালবাসবে, নয় ঘৃণা করবে; বাংলাদেশে ঔদাসীন্যের ভাব পরস্পরের প্রতি পোষণ করার মত এমন আবেষ্টনীর মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ঠিক বসবাস করে না'।

এর কারণ কী? ওয়াজেদ আলী দশদফা কারণ উপস্থিত করেছেন : (১) ইতিহাসশিক্ষা (২) ধর্মগুরুর আবঞ্ছনীয় প্রভাব

(৩) সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন সাহিত্য (৪) চাকুরিজীবীর অর্থনৈতিক সমস্যা (৫) চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধিপত্য (৬) অতীতকে ফিরিয়ে আনার দুরাশা এবং দুঃস্বপ্ন (৭) বিভিন্ন ধরনের জীবনযাপন প্রণালী (৮) সম্মিলিত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের অভাব (৯) ভবিষ্যতের জন্য সমবায়িক মনোভাবের অভাব (১০) বর্তমান বাঙালি জীবনে অবাঙালির অতিরিক্ত প্রভাব।

এস ওয়াজেদ আলীর বক্তব্য সঠিক ইতিহাস রচনা করতে হবে, ইতিহাসের সদর্থক চরিত্র বিবরণ বিশ্লেষণ বেশি করে পাঠ্য বইয়ে থাকবে। ইংরেজ রাজ্যও (উপনিবেশের কালে) ছিঁড়ে ফেলতে হবে। আর ধর্মগুরুদের সুবিধাবাদী কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে। নয়ত রাষ্ট্রের প্রগতিশীল চিন্তাকে তাঁরা বাধা দেবে। আমাদের প্রয়োজন সে বাধাকে অতিক্রম করা। সাহিত্যকে হতে হবে অসাম্প্রদায়িক। সাহিত্য প্রচারের বাহন নয়, কিন্তু সাহিত্যের পাঠক প্রচুর। তাদের চিত্তকে শুভবোধে উদ্রিক্ত করতে হবে। সাহিত্যই পারে, পরম অসহিষ্ণুতা, ঈর্ষা, ঘৃণাকে দূরীভূত করতে। ওয়াজেদ আলী জোর দিয়ে বলেন, 'এখন হিন্দু-মুসলমানের নিবিড় মিলনের প্রয়োজন আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করি। এখন প্রকৃতস্থ বাঙালী বোঝেন, হিন্দু-মুসলমানের আন্তরিক মিলন না হলে এদেশ রসাতলে যাবে, বাঙালী নিজ দেশে পথের ভিখারী হবে।' হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি, ঐক্যবোধ যাতে ফুটে ওঠে আমাদের সাহিত্যকর্মকে সেই দিকে সেইদিকে চালনা করতে হবে। এই সাহিত্যকে তিনি জাতীয় সাহিত্য বলেছেন। এখানে আমরা কি বলতে পারি হিন্দু-মুসলমানের এই সম্মিলিত চেষ্টাই জাতীয়তার আদর্শ? তা হলে, জাতীয় আদর্শ যদি ওই পথে চলে এবং প্রতিষ্ঠিত হয় তা হবে বাঙালি জাতির সাধনা। বাঙালি বলতে আমরা বুঝব বাঙালি হিন্দু-মুসলমান। মনে রাখতে হবে ১৯৪৩ সালে এস ওয়াজেদ আলীর এ সব লেখা প্রকাশিত হয়। যখন হিন্দুমুসলমান হিন্দুর ভেদ-বিভেদ প্রায় পাকাপাকিভাবে রাজনৈতিক নেতারা গ্রহণের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন। আলী সাহেবের দৃঢ়তা আরও প্রকাশ পেয়েছে যখন তিনি হিন্দু-মুসলমান বিভেদের বা বিরোধের কারণ বিশ্লেষণ করেন, 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে তাদের সামাজিক মিলনের বিরলতা, তাদের ভিন্ন ভিন্ন জীবনধারণের প্রণালী, তাদের বিভিন্ন রীতিনীতি'।

আলী সাহেব বলেছেন, এই বিভেদ অনেকটাই সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনে। যুগধর্মের প্রভাবেই এটা সম্ভব হয়েছে। আমাদের প্রয়োজন এখন এই মিলনের পথে এগিয়ে যাবার পথকে ত্বরান্বিত করা। ধর্মের ক্ষেত্রেও এই সংস্কারের ব্যবস্থা করা দরকার। পূজা, পার্বণ, অনুষ্ঠান ধর্মের এই উপাদানগুলির সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করেন আলী সাহেব।

আলী সাহেব, এমিল লাড উইকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'The form has changed. One condition, however, has been required through all the ages – courage, physical as well as moral. For the rest, every revolution creates new forms, new myths, new rites; and the would be revolutionist while using old traditions must refashion them. He must create new festivals, new gestures, new forms which will themselves in turn become traditional. The aeroplane festival is new to-day. In half a century it will be entrusted with patina of tradition. কাজটা অত্যন্ত দুরূহ। এস ওয়াজেদ আলীও তা জানতেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এ কাজে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কেই বুঝতে হবে জাতীয় ঐক্যই মূল কথা। কেবল মুখে নয়, কাজেও তা করে দেখাতে হবে। অনেকেই মুখোশ পরে থাকেন। ধর্মের এবং গোষ্ঠীর প্রচারেই তাঁরা অধিকতর উৎসাহী। ওই ভণ্ডামিকে আঘাত করা দরকার। আলী সাহেব ধর্ম, গোষ্ঠীকে মানেন। কিন্তু জাতীয় ঐক্যবিধানে আরও কিছু প্রয়োজন। ধর্মের প্রসঙ্গে ধর্মীয়তত্ত্ব কিংবা গোষ্ঠীর আলোচনায় গোষ্ঠীতত্ত্বের বিশ্লেষণ অবশ্যই থাকবে। কিন্তু জাতীয় ঐক্য স্বতন্ত্র কথা। জাতীয় ঐক্যের আলোচনায় জাতীয় কথাটির উপরই জোর দিতে হবে।

সর্বভারতীয় জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে তিনি সম্রাট আকবরকে প্রতিনিধিস্থানীয় পুরুষ রূপে গণ্য করেছেন। তাঁর ধ্যানের, মননের এবং বিচারের নিদর্শন তাঁরই রচিত আকবরের জীবনীর কথা মনে পড়ায়। বাঙালির ঐক্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি সিরাজদ্দৌলার নাম করেছেন। দেশবন্ধুর অবদানের কথাও স্মরণ করেছেন আলী সাহেব। গৌরকিশোর ঘোষ তার ত্রয়ী উপন্যাস জল পড়ে পাতা নড়ে, প্রেম নেই এবং প্রতিবেশীতে চিত্তরঞ্জন দাশের কথা বারবার স্মরণ করেছেন। সম্ভবত বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের রাজনীতির নায়ক বলে চিত্তরঞ্জনকেই গৌরকিশোর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আলী সাহেব নতুন নতুন উৎসব প্রবর্তনের কথা বলেছেন যেখানে হিন্দু-মুসলমান এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ মেলামেশার সুবিধা পাবে। এ যেন চৈত্রমেলা, হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠার কথা (যদিচ, হিন্দু নামটি মুসলমানদের পছন্দ হওয়ার কথা নয়)। এ প্রস্তাব নিঃসন্দেহে অভিনব। আজ বাংলাদেশে বোধ করি সবচেয়ে বড় উৎসব পয়লা বৈশাখের উৎসব। সম্মিলিত জাতির ওই উৎসব মিলনের প্রাঙ্গণ। আলী সাহেব বলেন, 'হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এখন বাঙালীর কাজ হচ্ছে, প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে, বাঙালীত্বের জীবনদায়ী আদর্শকে সম্মুখে রেখে নিজ দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়া; বিদেশীর বিষাক্ত প্রভাব থেকে, মাতৃভূমিকে মুক্ত করা। এই আদর্শের কল্যাণ স্পর্শই সাম্প্রদায়িকতার বিষ থেকে তার সমাজদেহকে মুক্ত করবে।'

দেশবন্ধুর স্বরাজ দল বারবার এ কথাই বলেছে। লক্ষ করতে হবে আলী সাহেব তাঁর জন্মভূমিকে মাতৃভূমি বলেছেন, এও তো সংস্কারমুক্ত মনের প্রকাশ।

আলী সাহেব রাজনীতির কথা বেশি বলেননি। তিনি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের কথা বলেছেন সংস্কৃতির দিক থেকে। রাজনৈতিক প্রচেষ্টার হালচাল তো তিনি দেখলেন। সেখানে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে ভেদবিভেদ যেন দিনে দিনে বাড়ছিল। লালা লাজপৎ রায়, হিন্দু মহাসভা অন্যদিকে মুসলিম লিগের বিরোধটিকে জটিল করে তুলেছিল। গোলাম মুরশিদ স্পষ্টই বলেছেন এই বিরোধই বৃহদাকার ধারণ করে দেশবিভাগের জন্ম দেয়। আলী সাহেব বলেন খাওয়া বসায়, খেলাধুলায়, মেলামেশায়, আনন্দ উৎসবে হিন্দু মুসলমান যখন একত্র হবে তখনই মনের মিল হবে। প্রত্যেকের ধর্মকে স্বীকার করে নিতে হবে।

এই অন্তরের মিল নিয়ে আসতে পারে সাহিত্য, ভাষা। আজকে ভাবতে ভালও লাগে যে আলী সাহেব বাংলা ভাষা সম্বন্ধে এমন জোরালো সওয়াল করেছিলেন সে সময়ে। আগেও বলেছি আলী সাহেব হিন্দু-মুসলমান ধর্মের পৃথগত্ব যেমন স্বীকার করেন তেমনই মানেন বাঙালি বলে একটা জাতি আছে। এই বাংলার কথা বলতে গিয়েই তিনি বলেছেন, 'বাঙ্গালা হচ্ছে আমাদের মাতৃভাষা। বাঙ্গলাতেই আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করতে হবে। অন্য কোন ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করলে সে চেষ্টা নিশ্চয়ই বিফল হবে।' ১৩৩২ ভাদ্রের এই লেখা বা অভিভাষণ (বাঙ্গালী মুসলমান) মুসলমান বাঙালির উদ্দেশে রচনা। সে জন্যই বোধ করি তিনি আধুনিক বাংলাভাষায় মুসলমানের অবদান প্রায় নেই বলে খেদ প্রকাশ করেছেন। এই ভাষা পুষ্ট লালিত হয়েছে হিন্দুদের দ্বারা। তার সৌন্দর্যও হিন্দুর সৃষ্টি। এখন সময় হয়েছে বাংলা ভাষাকে গড়ে পিটে মুসলমান ভাবনা, সংস্কৃতি, ধর্মকে প্রকাশ করা। এখানে লক্ষ করতে হবে মুসলমান সমাজে আশরাফ আতরাফের ফারাকই নয়, শহুরে এবং পল্লির মুসলমানদের মধ্যেও পার্থক্যের কথা। শহুরে মুসলমানরা সাধারণত উর্দু ব্যবহার করেন, আর পল্লির মুসলমান বাংলাই ব্যবহার করেন। আর পল্লিবেষ্টিত মুসলমানদের বাদ দিয়ে (যারা সংখ্যায় গরিষ্ঠ) শহরের দিকে তাকিয়ে উর্দু গ্রহণ করা কখনওই সম্ভব নয়। আমরা বলি আলী সাহেবের বাঙালি জাতি হিসাবে ধর্মে বিভক্ত হয়েও ভাষার ক্ষেত্রেই একটি বিপ্লব ঘটাতে পারে মিলনের জন্য। মুখ্যত আলী সাহেব ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পৃথক রূপে বিবেচনা করেছেন। উনিশ শতকেও মুসলমানি বাংলা বলে একটি ভাষা গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল। বলা বাহুল্য তা সফল হয়নি। একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন আলী সাহেব, এই ভাষাও হিন্দুর গড়া—মুসলমানের নয়। কী সংস্কার করতে চাইছেন আলী সাহেব? সবুজপত্রের লেখক, প্রমথ চৌধুরীর স্নেহধন্য আলী সাহেব কিন্তু কোনও ধর্মীয় বাতাবরণের কথা বলেননি। তিনি সহজ সরল বাংলা চেয়েছেন। চলতি বাংলাভাষাকেই গ্রহণ করতে বলেছেন। প্রয়োজনে শরৎচন্দ্রের ভাষাকেও তিনি অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তা হলেই ভাষা হয়ে উঠবে 'জীবনের শিল্প' (যে গ্রন্থে এই ভাষণটি ছাপা হয়েছে তার নাম 'জীবনের শিল্প'।) এবং আদরের জাতীয় সাহিত্য। আলী সাহেব জোর দিয়ে বলেছেন প্রাচীনকে আঁকড়ে থাকলে মুসলমান সমাজের উন্নতি কখনওই হবে না। নব্যতন্ত্রীদের স্বাগত জানাতে হবেই। এও যেন সবুজপত্রের আহ্বান। রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে সবুজের অভিযানের কথাই এস ওয়াজেদ বলেছেন। গতানুগতিকতাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। Orthodoxy কে পরিহার না করলে বাঙালি জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। নবীনের উদ্দাম জীবনস্রোতকে বন্দনা না করলে জাতি (বাঙালি জাতি) ভালকে হারাবে। ওয়াজেদ আলী বলেন, 'সোলতান আবদুল হামিদ ভালমন্দের বিচার না করে রাজবলে সমস্ত নূতন জিনিসকে, আটক রাখতে, আর সমস্ত জরাজীর্ণ পুরাণ-জিনিসকে জাগিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন'। এর জন্যে সোলতান অনেক অনাচার, অত্যাচারও করেছিলেন। আলী সাহেব প্রশ্ন করেছেন এর ফল কী হল? নবীন তুর্করা এর ফলে পুরাতনের সঙ্গে অনেক উৎকৃষ্ট বস্তুকেও বিসর্জন দিল। ওয়াজেদ আলী সাহেব তুর্কদের সমর্থন করেননি। প্রাচীনের দেয়াল ধবসিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কোনও বিহারি মুসলমান বলেছিল বিহারে 'হিন্দু উকিল, হিন্দু ডাক্তার, হিন্দু শিক্ষকে ছেয়ে গেছে কিন্তু মুসলমানরা তুলনায় যেই তিমিরে সেই তিমিরে।' উত্তরে আলী সাহেব বিশ্বে মুসলমানের জাগরণ, মুসলমানের শৌর্যবীর্যের উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন ভারতে বিশেষত বাংলাদেশে মুসলমান পিছিয়ে আছে সন্দেহ নাই। এর পরিবর্তনের জন্যই তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থাকে মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে বলেছেন। এখানে প্রগতিবাদী আলী সাহেবকে পাই আমরা। তাঁর 'ভবিষ্যতের বাঙ্গালী' গ্রন্থেও আলী সাহেব ওই ভাষাসমস্যার উপর জোর দিয়েছিলেন। বোঝা যায় উনিশ শতকের মুসলমান বাঙালি যে মুসলমানি বাংলার কথা বলে আসছিলেন তার সজীব রূপটা এখন যেন আরও জোরদার। এই গ্রন্থে তিনি বলেছেন, 'শহুরে মুসলমানদের বাংলা শিখতে হবে। পল্লীবাসীর নয়, কেননা বাংলা তাদের মাতৃভাষা।' এ সব কথা বলার অর্থ ওয়াজেদ আলী এই সমস্যা সমাধানের পথগুলি হয়ত জেনেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বাংলাদেশ ভারতের অংশ থাক কিন্তু ভারতবর্ষের রাষ্ট্রকাঠামো হোক যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক। বাঙালির স্বাতন্ত্র্য তাতে অটুট থাকবে। কী আশ্চর্য দেশবিভাগের প্রাক্কালে সুরাবর্দি, শরৎ বসু এঁরাও এই রকম ভেবেছিলেন। কিন্তু তাঁরা চেয়েছিলেন বাংলাদেশ

হবে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। সেটা হয়নি, কিন্তু আজ বাংলাদেশ সত্যিই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এখন বাংলাদেশের (উভয় রাষ্ট্রের) দায়িত্ব হচ্ছে সেই প্রাচীনতন্ত্রীদের ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেওয়া। আর 'ক্ষুধার জোরে সুধার জগৎ জয়' করতে হবে। নজরুল ইসলামের কথা আলী সাহেব বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র এমনকী রবীন্দ্রনাথের চিন্তাও তিনি গ্রাহ্য করেননি। রবীন্দ্রনাথের আজীবনের সাধনাকে সম্ভবত আলী সাহেব তলিয়ে দেখেননি। তিনি ইসলামের আদর্শের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ক্ষেত্রটিকে সন্ধান করেছেন।

এস ওয়াজেদ আলী বুদ্ধিচর্চার কথা বারবার বলেছেন। মননই মানুষের সংস্কারকে বিচার করতে পারে। আসলে সবুজপত্র তো বার করা হয়েছিল এই জ্ঞানচর্চার জন্যই। 'সাধনা' পত্রিকার জন্মও এই রকমই। শশধর তর্কচূড়ামণি, বঙ্গবাসীর দল, চন্দ্রনাথ বসু ইত্যাদির গোঁড়া মনোভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল 'সাধনা'। বঙ্গভঙ্গের নিষ্ফলতা (অন্তত রবীন্দ্রনাথ তাই মনে করেছিলেন) দেশকে আর একবার অন্ধভক্তির পথে নিয়ে যাচ্ছিল সেই সময়ে বের হল 'সবুজপত্র'। এস. ওয়াজেদ আলীও মুসলমান সমাজের ধর্মান্ধতাকে আঘাত করেছেন। তিনি ইসলামের ইতিহাসকে স্মরণ করেছেন। আরবের জাগরণের সময়ে গ্রিক দর্শন ও মনন প্রায় ভুলে যেতে বসেছিল সেখানকার মানুষ। কিন্তু মোতাজেলা সম্প্রদায় এই মনন ও দর্শনকে অবলম্বন করে বৌদ্ধিক জগতে এক বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিল। আলী সাহেব বলেছেন এঁরা ছিলেন জ্ঞানতাপস। কিন্তু রক্ষণশীলরা এঁদের শ্রদ্ধা করত না। রক্ষণশীলরাই জয়ী হয়েছিল। বলা বাহুল্য ওয়াজেদ সাহেব মোতাজেলাদেরই অনুকূলে রায় দিয়েছিলেন। ইসলামের আর একটি ধারা ইরানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁরা হচ্ছেন সুফি। ওয়াজেদ সাহেব এই মরমিয়া সাধকদের পরিচয় দিয়ে ভারতে তাঁদের আগমন এবং সুফি মতবাদের প্রচারের কথা বলেছেন। এই সুফি ধর্মের অনুরাগী ছিলেন সম্রাট আকবর। সুফিদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন সম্রাট। আমৃত্যু আকবর সুফি সাধকদের মতবাদের সঙ্গে নিজেকে সামিল করে নিয়েছিলেন। ওয়াজেদ সাহেব তাঁর 'প্রেমের ধর্ম' প্রবন্ধে খাজা মইনুদ্দিন চিশতি, নিজাম উদ্দীন আউলিয়া, শাহ সুফি-সুলতান, শাহ জালালের কথা বলেছেন। আমির খসরু, উরফি, ফায়জি, আবুল ফজল, কবির, সারমুদ প্রমুখ ব্যক্তি সুফি মত প্রচার করেছেন।

জালালুদ্দীন রুমির রচনা উদ্ধার করে প্রেমের আদর্শের কথা ওয়াজেদ সাহেব বলেছেন। পাণ্ডুয়ায় শাহ সুফি সুলতানের মাজারের সামনে দাঁড়িয়ে আলী সাহেব শুনলেন, খাদেম বা সেবাইত বলছেন, 'মুসলমানের যিনি খোদা তিনিই হিন্দুর ভগবান'। তাঁরই উদ্দেশ্যে নামাজের ডাক আর শঙ্খের হাঁক। সর্বশাস্ত্র তাঁরই মহিমা-কীর্তন করে; সেই প্রেমের ঠাকুরকে যিনি জেনেছেন বা চিনেছেন তার ভেদবুদ্ধি থাকতে পারে না।' এই শুনে ওয়াজেদ সাহেব অভিভূত। 'আমরা বাঙালী যদি এই প্রেমের ধর্মে অভিষিক্ত হতে পারতাম তাহলে সৌহার্দ্যে, প্রেমে, আত্মার আত্মীয়তায় এ দেশে কি শ্রেয়ঃ, শান্তি কল্যাণই না বিরাজ করত।' আলী সাহেব বলেছেন, 'ধর্মান্ধ লোকের প্ররোচনা না থাকলে, বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মিলন খুবই সহজ ছিল এবং এখনও আছে, আর ভাবীকালেও থাকবে।' আশাবাদী উদার মানবপ্রেমিক ওয়াজেদ সাহেব এই কথা বলেছেন যখন হিন্দু-মুসলমানের বিরোধটা নগ্নভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। তখন সওগাত পত্রিকা ওয়াজেদ সাহেবকে অভিনন্দন জানিয়েছিল এই মতবাদের জন্য (১৩৫১, অগ্রহায়ণ)।

ওয়াজেদ সাহেব হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেছেন। অনুন্নত মুসলমানদের শিক্ষা চাই, আর্থিক সঙ্গতি চাই, মনের প্রসার চাই। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন একজন বাঙালি হিন্দু মারাঠা হিন্দু বীরকে যত নিকটের ভাবে বাঙালি মুসলমানকে ততটাই দূরের ভাবে আর একজন মুসলমান একজন কাফ্রি মুসলমানকে যতটা নিকটের ভাবে একজন বাঙালি হিন্দুকে ততটাই দূরের ভাবে। এই অবস্থায় মিলনের পথ সুদূরপরাহত। বোধ করি কাজী নজরুল এর সমাধান দিয়েছিলেন। নজরুল ইসলামের মতামত এতই সুপরিচিত যে এখানে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মিশ্র সংস্কৃতির সজীব উদাহরণ নজরুল। ওদুদ, ওয়াজেদ আলী এই মিশ্র সংস্কৃতিকেই চেয়েছিলেন। এঁরা মুসলমান সংস্কৃতিকেও শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন আবার হিন্দু জাগরণকেও তারিফ করেছেন। যদিও ওয়াজেদ সাহেব মুসলমান সংস্কৃতির প্রসঙ্গই তাঁর লেখায় বারবার টেনে এনেছেন। এতে লাভই হয়েছে। সংস্কৃতির বিনিময়ের পথটি সুগমই হয়েছে। ওয়াজেদ সাহেব মসজিদের সামনে বাজনার প্রসঙ্গ তুলেছেন। গরু জবাইর প্রসঙ্গও বাদ দেননি। কিন্তু এই দুইকেই তিনি ভেদবুদ্ধির প্ররোচনামূলক বলে নিন্দা করেছেন। কলকাতায় যখন এই ঘৃণ্য দাঙ্গা বাধল তখন সচেতন, যুক্তিপ্রবণ হিন্দুমুসলমান একে নির্বোধের কাজ বলেছেন। শিক্ষিত ভেদবুদ্ধিরহিত হিন্দু মুসলমান পুরোহিততন্ত্র এবং উলেমা মোল্লাতন্ত্রকে অকপটে বিধবস্ত করতে চেয়েছেন। এখানেই আলী সাহেবের অবদান।

ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শের প্রবহমান ধারা সম্পর্কে ওয়াজেদ সাহেবের বিখ্যাত উক্তি "সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে"র সঙ্গে অধিকাংশ বঙ্গবাসী নিশ্চয় পরিচিত। কিন্তু আমরা ক'জনে, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায় তার এই জাতীয় আরও অসংখ্য লেখার সঙ্গে পরিচিত? ওয়াজেদ সাহেব গল্প, মহাপুরুষের জীবনী, মরমিয়া সাধকদের জীবনী রচনা করেছেন। বলতে দ্বিধা নেই সেই সব রচনার সঙ্গে পরিচিত হলে ওয়াজেদের আর একটা রূপ আমাদের সামনে ভেসে উঠবে। ওয়াজেদ সাহেব এইসব

রচনায় শিল্পী। জীবনের শিল্পরূপকে তিনি মূর্ত করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত নিবন্ধেপ্রবন্ধে, রচনায়। ভাষা ও সাহিত্যের ওপর তাঁর কেবল প্রীতিপক্ষপাতই ছিল না। সাহিত্যের প্রতি দাবি ছিল অনেকখানি। তিনি জানতেন সাহিত্যই মানুষের চিৎপ্রকর্ষ ঘটায়, সাহিত্যই মানুষকে সৌন্দর্যে দীক্ষা দেয়। সাহিত্যই মানুষের রুচিকে সৌন্দর্য-মণ্ডিত করে।

তিনি হাফেজের ওমর খৈয়ামের সঙ্গে একাত্ম বোধ করেন। হাফেজ চেয়েছিলেন একটি পাত্রপূর্ণ মদ, শাকি আর নারী। প্রেম মানুষের জীবনে কেবল কিংকর্তব্য তাই জানায় না নীলাকাশের চন্দ্রাতপে এক আনন্দের ছায়াঘন মায়াবি জগৎকে উদ্‌ঘাটিত করে। ঈশ্বরভজনা ভুলে গিয়ে হাফেজ যে এই সর্বনাশা প্রেমের সৌন্দর্যের অসীমকে সীমার সঙ্গে বাঁধতে চেয়েছেন তার জন্য সব কলঙ্ক গ্রহণ করতে নতজানু এই প্রেমিক। শিল্পের জন্ম তো এইখানে। এবারে ওয়াজেদ সাহেবের শিল্পী মহাশিল্পী থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধার করি। শিল্পীর প্রশ্ন মহাশিল্পীকে, 'আপনার শিল্পীর রচনায় কি প্রয়োজন? আপনি তো প্রয়োজনের উর্দ্ধে। মহাশিল্পী বললেন, কে বললে আমি প্রয়োজনের উর্দ্ধে? সমস্ত সৃষ্টিই তো আমার প্রয়োজনের অকাট্য প্রমাণ! শিল্পীর কল্পনা দিয়েই আমি রূপের ধ্যান করি; শিল্পীর কামনা দিয়েই আমি রূপের সাধনা করি, আর শিল্পীর তুলি দিয়েই আমি রূপের ছবি আঁকি।' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন জীবন মহাশিল্পী। এই মহাশিল্পীর ভাবনা আর শিল্পীর ভাবনা একবিন্দুতে মিলে যায়। মিশে যায়। জীবনের শিল্প প্রবন্ধে বার্কের কথায় তিনি বলেছেন, 'শিল্পীর সৃষ্টির উদ্দেশ্য কেবল সৌন্দর্যের সৃষ্টি নয়, সুন্দর এবং sublime উভয়ের সৃষ্টিই তার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।'

এস ওয়াজেদ জীবনকে সুন্দর বলেছেন—সে জন্য বাস্তবের কুরুচি এবং কুৎসিতকে তিনি তিরস্কার করেছেন। তিনি পোশাকে আশাকে, চলাফেরায় আচারআচরণে মানুষকে সুন্দর হতে বলেছেন। গুলবাগিচার সৌন্দর্য নজরুলকে টেনেছিল। নজরুল আত্মহারা হয়েছিলেন প্রকৃতি প্রেমে। এস ওয়াজেদের গুল দাস্তা, জীবনের শিল্প প্রবন্ধগ্রন্থে এই আত্মহারা কবির প্রকাশ দেখতে পাই। 'বাগান' নামে একটি প্রবন্ধে গোলাপ এবং সুগন্ধী ফুলের কথা বলেছেন। এ ফুল আরবের। তারাই এনেছিলেন এ ফুল ভারতবর্ষে। মোগল বাদশারা এ ফুলের চর্চা করেছেন সকলেই।

একরাম বা ইকবাল নিয়ে ছোট প্রবন্ধ ও বড় বই রচনা করেছিলেন এস ওয়াজেদ। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করে ইকবালকে বলেছেন দার্শনিক কবি আর রবীন্দ্রনাথকে কবি দার্শনিক। ইকবাল জার্মান ভাষায় সুপণ্ডিত, তিনি নিৎশের দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নিৎশে চেয়েছিলেন অতিমানবের (Super man) প্রতিষ্ঠা। এস ওয়াজেদ দেখিয়েছেন কোরানেই এই অতিমানবের কথা আছে। এস ওয়াজেদ বুঝেছিলেন ইকবালের অনুভূতিই তাঁকে যথার্থ সন্ধান দিতে পেরেছিল ক্ষমতা, অতিমানবের পথের শেষ কোথায়। মনন এবং অনুভূতি ইকবালকে দিয়েছিল এক ঋদ্ধ ভিশনারি-দ্রষ্টার মর্যাদা। ইকবালকে নিয়ে লেখা আলী সাহেবের 'ইকবালের পায়গাম' (১৩৪০) এ একের পর এক উদ্ধৃতি দিয়ে এই কবির তথা যথার্থ একনিষ্ঠ মানুষটির পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছেন। আমরা ওই গ্রন্থ থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

> চোখ চেয়ে একবার দেখ, দেখবার মত চোখ যদি তোর থাকে, জীবনীশক্তি নূতন এক বিশ্বসৃষ্টির কাজে রত আছে। পুরাতন এই মৃত্তিকা স্তূপের মধ্যে নূতন জীবনের বীজ আমি দেখতে পাচ্ছি। প্রত্যেক যে দানা (বীজ)টি এখনও মাটির জঠরে লুকিয়ে আছে, তার শাখা-প্রশাখা ফল-ফুল আমি দেখতে পাচ্ছি তার পরিপূর্ণ জীবন আমার চোখে দেখা দিচ্ছে। পর্বতকে আমি এক খণ্ড ঘাসের মত উড়তে দেখতে পাচ্ছি, তৃণখণ্ডকে আমি পর্বতের গাম্ভীর্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখতে পাচ্ছি।

অথবা,

> জীবন গতিশীল স্রোতস্বিনীর মত, আর চিরকাল গতিশীলই থাকবে। এই পুরাতন শরাব সদাই নূতন উত্তেজনায় ভরপুর আর সদাই তাই থাকবে। যা আছে, অথচ যার থাকা উচিত্ নয়, তাকে যেতেই হবে! যা নাই অথচ যার থাকা উচিত, তাকে আসতেই হবে।

অথবা,

> আমার গান আজমে (আরবের বাইরের দেশগুলিকে আজম বলা হয়) তার পুরাতন অগ্নিশিখাকে প্রজ্বলিত করেছে; আরবভূমি কিন্তু এখনও আমার অন্তরের জ্বালার সঙ্গে অপরিচিত (অর্থাৎ অমুসলিম আমার গান থেকে প্রেরণা লাভ করে কিন্তু মুসলিম আমার গানের মর্ম এখনও বুঝে নি)।

এই সবের জন্যই এস ওয়াজেদ আলী ইকবালকে গ্যেটের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ইকবালকে মহাকবি আখ্যা দিয়েছেন। ইকবালের বাণী চয়ন করতে আলি সাহেব ক্লান্তি বোধ করেননি। মানুষের ইচ্ছাশক্তি মানুষের কামনাকে ইকবাল কখনও ঢাকা দিতে চাননি। রবীন্দ্রনাথের মতোই বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি চাননি। বৈরাগ্যকে ইকবাল ভীরুতার লক্ষণ বলেছেন। ইকবাল বলেছেন, আল্লা এই সৃষ্টির জগতে মানুষকে পাঠাচ্ছেন মানুষের সম্যক হৃদয়বৃত্তির পরিস্ফুটনের জন্য এবং মানুষ শক্তিতে, সাহসে, বীর্যে সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করবে। মানুষকে মৃত্যুভয় জয় করতে

হবে। ওয়াজেদ আলী সাহেব দরদ দিয়ে ইকবালের বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন তোঘলক একজন হিন্দুকে বর্শার আঘাতে মেরে ফেললেন। তখন কাজির কাছে বিচারের জন্য তোঘলক এলেন। হয় মৃতব্যক্তির আত্মীয়ের হাতে মৃত্যুবরণ নচেৎ মৃতের আত্মীয়রা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পেয়ে যদি সুলতানকে ক্ষমা করেন তবেই সুলতান মুক্তি পাবেন। এই বিচারই ইসলামের আদর্শ। ইকবাল একে মেনে নিয়েছিলেন।

এবারে বাংলাদেশের মুসলমানদের জাগরণের দিকে লক্ষ করে আমরা ওয়াজেদ আলীর মূল্যবান মন্তব্য উদ্ধার করি। এই ক্ষেত্রে তিনি ইকবালের উক্তি স্মরণ করেছেন :

"যে মহাকবির কাব্যে এবং গানে বিংশ শতাব্দীর প্রাচ্য জগতে নবজাগরণের প্রচেষ্টা মূর্ত হয়ে দেখা দিয়েছে;আর সেই জাগরণের অন্তর্নিহিত রূহানী (আধ্যাত্মিক) শক্তি ও প্রেরণাকে অপূর্ব ভঙ্গিমায় সাহিত্যে ব্যক্ত করেছেন; আর সেই শক্তির দাবীকে যিনি প্রাচীনকালের একজন পায়গাম্বরের মতই বজ্র-নির্ঘোষে বিশ্বময় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে তুলেছেন— সেই যুগপ্রবর্তক মহামানবের পায়গামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করা আমাদের ব্যক্তিগত এবং জাতীয় কল্যাণের জন্য একান্তই প্রয়োজন"। প্রায় একই ভাষায় সত্যসন্ধানী উদার মানবপ্রেমিক "আকবরের রাষ্ট্রসাধনা" (১৯৪৯) গ্রন্থে লিখেছেন, "যিনি রাষ্ট্রের নায়ক তিনি সকলের আপনজন। প্রত্যেক ধর্মকে তিনি গ্রহণ করেন, প্রত্যেকের ধর্মকে তিনি ভালবাসেন। প্রত্যেকের দুঃখের সঙ্গে তিনি সমবেদনা অনুভব করেন, প্রত্যেকের আনন্দে তিনি যোগ দেন। সকলের যিনি ভগবান— তারই তিনি ভক্ত, সকলের যে ধর্ম— তারই সাধক এবং প্রতিভূ।" হিন্দুমুসলমানের যুক্ত সাধনার এর চেয়ে বড় আদর্শ আর কী হতে পারে?

মেঘ

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

তোমাকে মেঘের শরীর থেকে কি করে আলাদা করি বলো।
চুল থেকে,
চোখ থেকে,
বুক থেকে,
শুধু মেঘ আর মেঘ
কোথায় চলেছে উড়ে?
সামনের জন্মের দিকে, নাকি অনেক পেছনে, যেখানে
মেঘের আঙুল দিয়ে তোমার মেঘের কান্না আমি মুছিয়ে দিতাম
রোজ রাতে?
তোমার মেঘের ঘর উড়ে গেছে কবে, আমার মেঘের ঘর
কখনও কি ছিল?
কেন তবু ঘর দিয়ে বাঁধা, কেন মেঘ দিয়ে বেঁধে রাখা নয়?

লগ্নতা

আনন্দ ঘোষ হাজরা

তোমার সঙ্গে তেমনি আমি লগ্ন থাকব
যেমন থাকে জলের সঙ্গে জলের অণু
হাওয়ায় যেমন মিশছে হাওয়া দিগ্‌বিদিকে
রোদের সঙ্গে লিপ্ত হচ্ছে রোদের রেখা
তেমনি করেই তোমার সঙ্গে লগ্ন থাকব
যেমন থাকে বালির সঙ্গে বালির কণা।

তোমার ব্যাপ্ত সমগ্রতায় মগ্ন থাকব ভেবেছিলাম
কিন্তু এত ধ্বংসপ্রবণ জটিলতায়
সব কিছুকে গ্রাস করবার উন্মাদনা
আর কিছু নয়; তোমার এমন সর্বনাশা সর্বহরা
রূপের নদীর জলের ঢেউয়ে সব হারানো
কেমন করে ঘটাই বলো? আমার আমির চূড়ান্তকে
কেমন করে মেশাই বলো?
তোমার সঙ্গে লগ্ন থাকব ভেবেইছিলাম
যেমন করে লগ্ন থাকে জলের সঙ্গে জলের অণু।

কিন্তু নিজের ধ্বংস কে চায় বলতে পারো?

অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত

পরিমল চক্রবর্তী

যতই বয়স বাড়ে অভিজ্ঞতা তত বেড়ে যায়।
অভিজ্ঞতা যেন এক বয়সিনী নারীর মতন
আমাকে নির্মাণ করে তিলে-তিলে স্নেহ ও ক্ষমায়।
জীবনের পথে-পথে ঘুরে-ঘুরে অরূপরতন
যা-কিছু পেয়েছি খুঁজে, অভিজ্ঞতা-পরিশুদ্ধ সব;
সুখ বলো, দুঃখ বলো কিংবা সুখ-দুঃখের নির্যাস
যা কিছু করেছি জমা গর্ভবতী স্মৃতির কৌটায়,
যে-কটি স্বপ্নের বীজ বৃক্ষ হয়ে সুখের বৈভব
জীবনে ঘনিষ্ঠ করে, আমাকে বাঁচায় বারোমাস—
প্রচণ্ড ক্ষুধায় তারা অবগাঢ় অভিজ্ঞতা চায়।

যতই বয়স বাড়ে অভিজ্ঞতা তত দীপ্ত হয়।
হতে-হতে অবশেষে জ্বলে ওঠে, ঠিক যেন মণি
জীবন-সর্পের শিরে, অপরূপ আভায় অক্ষয়।

অভিজ্ঞতা জীবনের সারাৎসার, হিরণ্ময় খনি।।

তুমি কি শুধুই মুসলমান? শুধুই হিন্দু?

অজিত বাইরী

তুমি কি শুধুই মুসলমান?
মানুষ নও।
তুমি কি শুধুই হিন্দু?
মানুষ নও।

হানাহানি করে কেড়ে নাও
একে অপরের প্রাণ;
যেন বৃন্তের ফুল
ছিঁড়ে নাও অবলীলাক্রমে।

অস্ত্রের আঘাতে যে রক্ত
গড়িয়ে পড়ে মানচিত্রে,
হিন্দু মুসলমান ভেদে
তার বর্ণ কি ভিন্ন ভিন্ন?

ক্ষুধার আর শোকের উপলব্ধি
কি দু'রকম দুজনের ক্ষেত্রে?
মার কোলে শিশুর স্তন্যদানের দৃশ্য
দু'জনের চোখে নয় অভিন্ন?

প্রাণ-পাখি উড়ে গেলে পর
প'ড়ে থাকে যে দেহ
তা কি নয় একইরকম পচনশীল?
গোরে যাও কিংবা শ্মশানে
মুছে যায় পূর্ব-পরিচয়।

ধূমকেতুর মতো জেগে থাকে
একটিই প্রশ্ন :
তুমি কি শুধুই মুসলমান,
তুমি কি শুধুই হিন্দু,
মানুষ নও?

শুধুমাত্র

দেবাঞ্জন চক্রবর্তী

এ কেমন মন নিভে এল তুমি এলে রাস্তার ধারে
পথকে পিছনে স্থির রেখে হেঁটে যাও বীজধান মাঠ
ক্রমশই আলো নিভে আসে অন্ধকার দ্রুত জেগে ওঠে
তোমার দৃষ্টি কমে যায় সাহসী দু'চোখ জ্বালা করে

পথের পাশেই জলকাদা সেই মাটি গভীর সবুজ
ক'দিন সে থাকে পৃথিবীতে আয়ুমাত্র দুই তিন মাস
জল মাঠে তাকে দেখা যায় শব্দহীন তার কলরব
শূন্য কোনও ধর্ম নয় তার শুধু মাত্র পূর্ণ হয়ে ওঠা

স্রোতে, সন্তরণে

রঞ্জনা দত্ত

সে এখন রোদবিহনে
ছুটে যায় পুকুরপাড়ে,
যেখানে দীঘল ছায়া
ফেলে যায় বৃক্ষশাখা।
মাছেরা ছলাৎছল
ঘাই দেয় সঙ্গোপনে
করে মন কার উচাটন!
করে মন কার উচাটন?

কখনও হরিণশাবক
অতি ধীর, তৃষ্ণা-আতুর
ইতিউতি দৃষ্টিপাতে
আসে জল খেতেও বা যে
ভীরু মন উথাল পাথাল
বাঘেরা নিকট না কি
ঘন ওই দূর সবুজে!
কাছে কি বধ্যভূমি?

একী এ কী অনাচার!
তবে কি অন্য কোথাও
অতি দূর দ্বীপান্তরে
যাওয়া আর আসাই কেবল—

ছেড়ে এই শস্যভূমি,
জলাশয়, ছোট্ট বাড়ি—
পাতা দই সখ্যটিও!

কী জানে রাখালছেলে
কী জানে লতায়-পাতায়
মেয়েটির চোখের কোণে
কত প্রেম প্রত্ন-অতীত
কত ছবি স্বপ্ন-আশায়
কত ভুল কী কুয়াশায়
পাতে জাল দৃষ্টি-অতীত!

তাই সে স্রোতের টানে
ভেসে যায় অকূল পাথার
যেন কোন পাহাড়ঝোরা—
যেন কোন গহীনবনে—
কোনও এক মরুর দেশে
ভাসে আর ভাসায় কেবল
বহতা নদীর মতো—

সে এখন নদীর শরীর
সে এখন নদীর শরীর।

রাত্রির কোলাজ

জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সারিবদ্ধ আলোবিন্দু : দোকানঘরের
আচ্ছাদনে বাঁক নিচ্ছে অন্ধকার, সামাজিক ভুল
ওভারব্রিজের গাঢ় আবছায়া খুঁজে নিয়ে
মোহগ্রস্ত ঘ্রাণগুলো ধীরে উন্মোচিত
যুবকের ধৈর্যহীন চকিত আঙুলে ....

শব্দের ভেতরে দীর্ঘ ক্লান্তি জমে থাকে
পার হয় গম্ভীর ইঞ্জিন, তার অবসন্ন হুইসিল, ছায়া
ওভারহেডের তার ছিঁড়ে গিয়ে চলাচল বন্ধ ছিল যেন
এতক্ষণ, এইমাত্র আবার জেগেছে স্থির ধাতব লাইন
পিচ্ছিল কান্নার মতো সেখানে নেমেছে আজ
সাংকেতিক আলো
আমাদের দুঃখগুলো কোনও একদিন
নিটোল চাঁদের মতো হবে?

তুমি বলছ পৃথিবীটা তো ছোট্ট হয়ে এল
হাতের মুঠোতে, বসবার ঘরের জানালা দিয়ে ঢুকে
কখন যে একেবারে পাশটিতে এসে বসে আছে!
আমি ভাবতুম তুমি বুঝি ছেলেবেলার কথা বলছ
তখন তো রামধনুর রং এসে মিলে যেত এমনিভাবে
হুটোপুটি সাঁতারকাটা পুকুরের জলে

ধর্ম কি ওদেরও ধরে রাখে

মেঘ মুখোপাধ্যায়

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাব: পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতা। — শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা

ধর্মনদী বেয়ে কারা পাল তুলে প্রচণ্ড উল্লাসে
গুরু গুরু রবে ধেয়ে আসে
হাতে হাতে শূল ভল্ল খড়্গ কৃপাণ
বিলোল মশাল
হাতে হাতে মৃত্যুগোলা নিয়ে লোফালুফি
চোখে নরকের জ্বালা, রোমে রোমে লকলকে রোষ
জিভ বেয়ে পাগলাকুত্তার মতো ঝরে বিষরস
নদীর দু'পাড় কাঁপে ত্রাসে

পল্লিতে বস্তিতে নেমে রে রে শব্দে ধেয়ে যায় কাতারে কাতারে
ধর্মপাণ্ডা ছেয়ে ফেলে ধর্মক্ষেত্র, ধর্মধবজা শিরে
আগুনের গোলা ছোঁড়ে বিধর্মীর বিপণি কুটিরে
তালগোল পাকিয়ে মারে শিশুদেহ, বুড়ো হাড় ফাটে
ধর্ম মৃত্যু হানে
ধর্ম ধবংস হানে
বিধর্মী নারীকে ধর্ষে পরিতৃপ্ত কামে
ধর্ম জিভ চেটে নেয়, মুখ মুছে হাই তোলে দ্বিগুণ আরামে
ধর্ম উল্লোল মাতে এ ভোগের অন্যতর স্বাদে

ধর্মনদী বেয়ে যারা পাল তুলে মশাল জ্বালিয়ে
'মার' 'মার' রবে বাতাস কাঁপিয়ে ধেয়ে আসে
ধবংসের বীভৎস রসে কদাকার মুখগুলি ঝুলে থাকে
নরকের দিকে
পৃথিবী তাদের সহ্য করে! আজও পৃথিবী ওদের পেটে ধরে!
ধর্ম কি ওদেরও কোলেপিঠে পালে, ধরে রাখে?

যা দেখি গুজরাটে
মহল্লায় মহল্লায় প্রকাশ্য রাস্তায় তল্লাটে
এ ধর্ম কি দেখা যায় চোখে
এ ধর্ম কি রাখা যায় বুকে?
এ ধর্ম তোমাকে কেন এ ধর্ম আমাকে
কেন ঘোর শোকে ম্রিয়মাণ করে—
অমাবস্যা নিশি আনে শরতের ভোরে

ধারাবাহিক সন্দর্ভ

প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবন

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

বৎসর ত্রিশ পূর্বে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশানের রিফাইনারি বিভাগের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, "দেখুন, পরিবেশ সম্বলিত সব কথাবার্তা বিলকুল অসার।" উত্তরে আমি বলেছিলাম, "যতই আমরা উড়তে চাই না কেন, মানুষের economics কে প্রকৃতির economyর বশে থাকতেই হবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা লঙ্ঘন করে কোনও শিল্প বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। এই যে বিপুল ব্যয়ে রিফাইনারি গড়ছেন, তা-ও একদিন মানুষের ভুলের মাশুল দিতে প্লাবনের প্রকোপে অকেজো হয়ে যেতে পারে।" তখন বুঝিনি যে আমার অভিশপ্ত মুখের কথা অতি শীঘ্র ফলে যাবে। অল্প কিছুদিন পরে বিহারে গভীরতা-হারা গঙ্গায় প্লাবন এল, বারৌনি রিফাইনারির অনেকগুলি নির্মীয়মান অংশ জলমগ্ন হল, তেলের পুরু স্তরে গঙ্গার বিস্তৃত অংশ দুষিত হল। সকলকে মানতেই হল নদী যদি গভীরতা হারায়, তার অববাহিকায় যদি ভূমিক্ষয় হতে থাকে, তা হলে শিল্পপ্রতিষ্ঠান-ও চলতে পারে না।

মুম্বাই-বাসী আমার এক অতি প্রিয় বাঙালি বন্ধু গত দশ বৎসর ধরে প্রচণ্ড প্রত্যয় ও আবেগ নিয়ে তর্ক করে আসছেন যে পরিবেশকেন্দ্রিক অনুধ্যান দেশের উন্নতির পরিপন্থী। মনে হয় মুম্বাই-এর গরিব মানুষের সম্পর্করহিত কিছু পরিবেশবিলাসীর কার্যকলাপ দেখে তাঁর এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস, যাঁরা GDP র (Gross Domestic Product) মাপকাঠিতে বিকাশের পরিমাপ করেন, যাঁরা সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘুরে, খেতমজুর বা ভূমিহীন কৃষকের আঙ্গিনায় বসে এদের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ দেশের বৃহত্তর অংশের ভবিষ্যৎ কোন দিকে চলেছে সে বিষয়ে গভীর চিন্তা করার সুযোগ বা সময় পাননি, যাঁরা উচ্চবর্গীয়দের শ্রীবৃদ্ধিভিত্তিক জাতীয় বিকাশধারা ও অন্ত্যোদয়ী বিকাশধারার মধ্যে যে কী দুস্তর প্রভেদ আছে, তা উপলব্ধি করার চেষ্টা না করেছেন, তাঁদের কাছে বর্তমান পৃথিবীতে শক্তিশালী পশ্চিমি অর্থনীতিক মডেল ও প্রযুক্তিধারা বেশি আকর্ষণীয় হয়। তাঁদের কাছে নদীর বুকে বড় বড় বাঁধ, বৃহৎ শিল্প ও তাদের চালু রাখার জন্য দেশ জুড়ে বিরাট thermal power plant, nuclear power plant, express highways, sea port ও airport-এর প্রাচুর্য দেশের শক্তি ও উন্নতির পরিচায়ক।

গত ত্রিশ বৎসর ধরে আমি একটা concept চালু করার চেষ্টা করে আসছি। "যেমন GDP দেখছ, তেমন GDBR (Gross Destruction of Basic Resources) এর পরিমাপ কর, তবেই বোঝা যাবে দেশ মূলত বিকাশের পথে—কিংবা বিনাশের পথে এগুচ্ছে।" এই ধ্যানধারণা উচ্চবর্গীদের চেতনাস্তরে এতদিন সাড়া জাগাতে পারেনি। মনে হয়, আজ তার দিন এসেছে। তা ছাড়া প্রকৃতি-পরাজয়-অভিলাষী প্রযুক্তিবিদ্যা যে একাধারে আত্মঘাতী ও সমগ্রদর্শী বিজ্ঞানের (holistic science) পরিপন্থী, সে বিষয়ে অনেকের টনক নড়েছে। Fragmented science যে প্রকৃতপক্ষে অ-বিজ্ঞান, সেই সত্যের স্বীকৃতি ক্রমশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। নিম্নের এক একটি আলোচনা হবে তার প্রমাণ।

কেন তেহরিবাঁধে ধবংস লীলার সম্ভাবনা

গত সংখ্যায় প্রবন্ধ শেষ করেছিলাম তেহরি বাঁধের যে কী ভয়ঙ্কর পরিণতি হতে পারে, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে। সর্বনাশা পরিণতি সম্বন্ধে এ হেন সাবধানবাণীর কারণ আরও একটু

পরিষ্কার করে বলা দরকার। যে Plate movement এর উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে tectonic plate. ভূগর্ভে কঠিন আবরণে আবৃত চলমান ভূত্বক (crust) বিভিন্ন plate এ বিভক্ত। ভারতের অবস্থান Indo-Australian plate এর উত্তর পশ্চিমাংশে। সমগ্র অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ, ভারত মহাসাগরের বৃহৎ অংশ, ভারত ও কয়েকটি ছোট ছোট দেশ এই plate -এর অন্তর্ভুক্ত। এই চলমান plate বৃহত্তর Eurasian plate এর সঙ্গে সতত সংঘর্ষের ফলে পরোক্ত plate -এর তলদেশে প্রক্ষিপ্ত হচ্ছে। একের মহাকর্ষণ ও অন্যের সজোর অন্তর্প্রবেশের এই ক্রিয়া যেখানে চলে, ভূতত্ত্ববিদের ভাষায় তাকে বলে subduction zone. এই এলাকায় অন্তর্প্রবেশী plate এর উপরিস্থ ভূমিস্তর প্রতিনিয়ত উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। হিমালয় পর্বতের উৎপত্তি এবং তার ক্রমাগত উচ্চতাবৃদ্ধি এই উৎক্ষেপণের ফল। উথল-পাথলের ক্রিয়াশীল এই অঞ্চল যে ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্পের জন্মভূমি হবে সেটা প্রায় অবধারিত। সকলেই জানে, সাধারণ যে কোনও জায়গাতেই বিরাট জলস্তম্ভের সৃষ্টি করলে তা ভূপৃষ্ঠের উপর চাপ দেয়, যার ফলে ভূমিকম্প ঘটে যেতে পারে। সে প্রেক্ষিতে এ হেন ভূ-কম্পন-প্রবণ অঞ্চলে নদীর রূপান্তর ঘটিয়ে সুগভীর ও সুবিশাল জলস্তম্ভ সৃষ্টি করার পিছনে যে কী পরিমাণ দায়িত্বহীনতার মানসিকতা কাজ করছে, তা ভাবতে গেলে বাক-হারা হয়ে যেতে হয়।

সরকারের তরফ থেকে দুইটি সাফাই আছে, যদি-ও তা সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত নয়। একটি হচ্ছে-এই বাঁধের ফলে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে, যা শিল্পচালনায় ও নগরবাসীদের কাজে লাগবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এই জলাধার দিল্লি নগরীর জলসরবরাহে নিশ্চয়তা এনে দেবে। দুই সাফাই-ই যুক্তির বিচারে অগ্রাহ্য। প্রথম সাফাইটির সঙ্গে জড়িত কতকগুলি প্রশ্ন : কোন বা কী ধরনের শিল্পে ও কোন scale এর শিল্পে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন? তাদের কি high-concentration energy বিপুলভাবে প্রয়োজন? বিকল্প পদ্ধতিতে যথা run-of the way technique এ তৈরি বিদ্যুৎ কি তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারে না? যে সব শিল্প গড়ে উঠবে তাদের emission ও effluents সম্পর্কে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যাতে জল বা বায়ুদূষণ বাড়বে না বা মূল নদীই sewer -এ পরিণত হতে পারবে না? নদী sewer এ রূপান্তরিত হওয়ার প্রসঙ্গ কোনও কষ্টকল্পিত প্রশ্ন নয়, বাস্তবে সব নদীগুলিই কমবেশি sewer হতে চলেছে। বিকাশের নামে যে ধরনের শিল্পায়ন ও শহরায়ন চলছে, তাতে নদীসমূহের মৃত্যু অবধারিত।

নগর ও শহরের জল সরবরাহের জন্য বৃহৎ জলাধারের পরিকল্পনার কোনও প্রয়োজন নেই। বৃষ্টির জল ধরে রাখার (water harvesting) যে পদ্ধতি আছে, সে পদ্ধতিতে শহর ও নগরবাসীরা-ও একটু চেষ্টা করলেই এমন ব্যবস্থা করে নিতে পারে যে মন্দাবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির বৎসরগুলিতে-ও তাদের প্রয়োজন মিটে যেতে পারে। গত বৎসর দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবন সে পথ দেখিয়েছে। দিল্লির Centre for Science and Environment এর (CSE) উদ্যোগে বেশ কয়েকটি housing societies ভূগর্ভে জলধারণের কাঠামো বানিয়ে নিয়েছে। এই উদ্যোগের ব্যাপক বিস্তার প্রয়োজন। *

বাঁধ নিয়ে আমেরিকায় বোধোদয়

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নদীর বুকে আড়াআড়িভাবে বাঁধ নির্মাণ শুরু হয়। সেই পথ অনুসরণ করে সোভিয়েট ইউনিয়ন, ভারত, চিন ও অন্যান্য অনেক দেশ অতি উৎসাহে বাঁধ নির্মাণ শুরু করে। তাদের ধারণা হয়েছিল, বিজ্ঞানে ও পার্থিব সমৃদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ USA যখন সেচ, বন্যানিরোধ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও শহরে জল সরবরাহের জন্য এই ব্যবস্থা করেছে, তখন নিশ্চয়ই তা উৎকৃষ্ট পথ হবে। আজ সেই যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা ও তাদের বৈজ্ঞানিক সংস্থা-সমূহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে নদীর বুকে বাঁধ বাঁধলে লাভের চেয়ে ক্ষতি অনেক বেশি হয়। ফলে তৈরি করা বাঁধগুলি তারা ভাঙতে শুরু করেছে। পৌনে দুই বৎসর পূর্বে সঙ্কলিত সংবাদে জেনেছিলাম যে তারা ইতিমধ্যে নর্থ ক্যারোলিনায় Neuse নদীর বুকে কোয়েকার নেক বাঁধ, মেইন্‌স কেনেবেক নদীর বুকে এডওয়ার্ডস বাঁধ, ক্যালিফোর্নিয়ায় স্যাক্রামেন্টো নদীর এক উপনদীর বুকে ওয়েস্টার্ন ক্যানাল বাঁধ, ওঁরেগান রোগ (Oregan Rogue) নদীর বুকে Savage Rapids বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। সে দেশে সব চেয়ে বড় প্রজেক্ট (Project) গুলির অন্যতম Glen Canyon বাঁধ — যে বাঁধ Corps of Engineers এর গৌরব হিসাবে মান্যতা পেত— ভাঙার জন্য বাজেটে ৫২ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে Elwha বাঁধ ভাঙ্গার জন্য তো আগে থেকেই ব্যবস্থা ছিল। সে দেশের জনমত এবং বৈজ্ঞানিকদের এখনকার অভিমত যে সব নদীকেই তাদের আগেকার প্রবহমানতায় ও নিজস্ব বৈভবে ফিরিয়ে আনতে হবে। অবশ্য একবার নষ্ট করে দিয়ে প্রত্যেকের স্বকীয় বৈভবে কতটা ফিরিয়ে আনা যাবে, সে বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করেন। আমাদের দেশেও নকলবাজির নেশায় ভুলে বহু হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে যে সব বাঁধ বেঁধেছি, যে সব ঘর ও জনপদ ভেঙেছি, বনসম্পদ নষ্ট করেছি, তার মাশুল হিসাবে আবার বেশ কয়েক হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সেগুলি ভাঙার কাজ আমাদেরই করতে হবে। নতুবা পরিত্রাণের পথ থাকবে না। তেহরি বাঁধকেও একদিন ভাঙ্গতে হবে, যদি বাঁধটি তার আগেই নিজে burst করে অসংখ্য মানুষের প্রাণ নিয়ে না বসে।

CSE -এর ঠিকানা 41,Tughlakabad Institutional Area, New Delhi – 1100 62.

উত্তর ভারতের নদীগুলির বৈশিষ্ট্য

নদীর বুকে বাঁধ কতভাবে চরম সর্বনাশ ডেকে আনে, সে আলোচনায় একটু পরে আসা যাবে। হিমালয় পর্বত ভারতীয় জীবন কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং সে নিয়ন্ত্রণধারা না বুঝলে যে কী দুর্গতি হয়, তার প্রাথমিক পাঠে আমাদের প্রথমেই আসতে হয় কারণ সেই পাঠে আমাদের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক চিন্তাবিদদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়নি। তেহরি প্রসঙ্গে সে কথা এসেই পড়ে। উত্তর ভারতের নদীসমূহের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে ও সে কথা এসে যায়।

হিমালয় হচ্ছে পৃথিবীর কনিষ্ঠতম পর্বত। হিমালয় যেখান থেকে উঠেছে, সেখানে পূর্বে ছিল টেথিস (Tethys) সমুদ্র। সেই সমুদ্রের পলিমাটি (alluvium) দিয়ে তৈরি হিমালয়ের দেহ। উৎপত্তির বৈশিষ্ট্যের জন্যও বটে আবার কম বয়সের জন্যও বটে, হিমালয়ের শিলা বিশেষ শক্ত হতে পারেনি। আমরা বলি বটে পাথর, তবে এ পাথর বেশ নরম (uncompacted) থেকেই গেছে। কনিষ্ঠ হলেও কিন্তু হিমালয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত: বিস্তারেও বিরাট। উত্তর পশ্চিমমুখী মৌসুমি বাতাসের সাধ্য নেই একে ডিঙিয়ে যায়। তাই হিমালয় অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণও অত্যধিক। সুতরাং এখানে আছে তিনটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ—প্রচুর বৃষ্টি, বিরাট উচ্চতা থেকে তার প্রবল অবতরণ, নরম শিলারাশির গা' বেয়ে এই ঢল। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে উত্তর ভারতের সমস্ত নদ-নদী দ্রুততম siltation-এর শিকার। এই siltation হারের (rate) তুলনা পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যাবে না। গঙ্গা-সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্র ও তাদের উপনদী সমগ্র উত্তর ভারতজুড়ে যেখানে যত আছে, তাদের সকলের ভাগ্য যদি এই হয়, তাহলে এই বিস্তৃত জনপদের অর্থাৎ ভারতের বৃহত্তর অংশের অধিবাসীদের নদীসংরক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব থাকে। তথাপি ভারতের এতগুলি যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হয়ে গেল, তাদের কোথাও এই স্বীকৃতির কোনও চিহ্ন আছে কি? পরিবেশের মূল উপাদান বাদ দিয়েই আমরা প্ল্যান করি।

নদীসংরক্ষণের জন্য প্রথম দায়িত্ব ছিল স্পর্শকাতর এই অঞ্চলে বিশেষত পর্বতগাত্রে ঘন বন সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করা যাতে তার শিকড়ের জাল শিলারাশিকে আঁকড়ে রাখতে পারে কারণ জঙ্গলের ঘনত্ব কোথা-ও একটু কমলেই নরম শিলার ধবস নেমে আসবে। দ্বিতীয় কর্তব্য ছিল, নদীতে নিয়মিত dredging ব্যবস্থা চালু রাখা। অবশ্য অতি গোঁড়া পরিবেশবাদী বলবেন, 'যেখানে বিপুল পরিমাণ পলিমাটি (alluvium) অবিরাম জমছে, সেখানে মানুষ কত dredging চালাবে? তার চেয়ে নদী silted হওয়া ও বারে বারে গতিপথ বদলানো অনেক শ্রেয়।' বর্তমান লেখক এই অতি গোঁড়ামির সমর্থক নয়। যেহেতু মানুষ জলনিষ্কাশনের পথ (drainage channels) ও flood plains রোধ করে সর্বত্র লক্ষ লক্ষ ইমারত বানিয়েছে, সেহেতু এত বসতবাটি ভেঙে নতুনভাবে সব কিছু গড়ে তোলার স্বপ্ন আকাশকুসুম মাত্র। সে জন্য desiltation এর ব্যবস্থা ছাড়া অন্য উপায় নেই, তা সে dredge করেই হোক কিংবা শুকনো নদীর বুকে মানুষের শ্রমে মাটি কেটে হোক। চিনে মাও-সে তুং-এর আমলে ইয়াংসি নদীর শুকনো বুকে এক সময় অসংখ্য মানুষ কাজে নেমেছিল নদীর পলি স্থানান্তর করার কাজে। নিয়মিতভাবে তা করলে চাষের জমির উর্বরতা বাড়ত, আবার নদীর জলধারণের ক্ষমতা বাড়ত। ফলে বন্যা ও খরা দুই-ই রোধ করা সম্ভব হত।

তৃতীয় দায়িত্ব ছিল, পর্বতের পাদদেশ থেকে নদীর শেষপ্রান্ত অর্থাৎ বদ্বীপের শেষ স্থলভূমি পর্যন্ত নদীর দুই ধার ধরে বরাবর কমপক্ষে আধমাইল প্রস্থ জুড়ে ঘন বন সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করা, যাতে নদীতে সহজে ধস না নামে এবং বৃষ্টিহীন দিনগুলিতে দুইকূলের বনতলভূমিগর্ভে সঞ্চিত জলধারা ধীরসঞ্চারে ক্ষীণতোয়া নদীর বুকে নেমে এসে নাব্যতা বজায় রাখে। চতুর্থ দায়িত্ব ছিল, নদীপ্রবাহে বড় বাধাসৃষ্টিকারী কোনও স্থায়ী কাঠামো নদীবক্ষে যথাসম্ভব পরিহার করা।

এই সব দায়িত্ব উপেক্ষা করে, পর্বতগাত্রে ও নদী কিনারে অবাধে বন ধ্বংস করে, drainage channels রোধ করে, নদীবক্ষে অগণিত বিরাট বাধা গড়ে তুলে যে অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে, তার অনিবার্য পরিণতি জলাভাব মেটাতে নদীর অক্ষমতা আর বন্যাবৃদ্ধির প্রবলতা।

বাঁধ কীভাবে সর্বনাশ ডেকে আনে

নদীর গতিপথে আড়াআড়িভাবে বাঁধ বাঁধা মানেই নদীটিকে অন্তিমযাত্রার পথে বসানো। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগ করলেইএ কথার সত্যতা বোঝা যাবে।

(ক) নদী সাধারণত ২০ থেকে ৩০ ফুট গভীর হয়—অল্পস্থানে এর ব্যতিক্রম ঘটিয়ে নদী গভীরতর হতে পারে। যদি নদীর বুকে ১২০ কিলোমিটার বাউন্ডারি নিয়ে এক জলাধার তৈরি করা হয় যার গভীরতা ৩০০ ফুট আর প্রস্থের বিস্তার দেড় কিলোমিটার থেকে ২০ কিলোমিটার, তা হলে বাকি নদীটির থাকে কী? আর যে নদীতে—যেমন নর্মদার ক্ষেত্রে—উঠাউঠি কয়েকটি বিশাল জলাধারে বিপুল জলরাশি বন্দি করার প্ল্যান আছে, তার প্রবহমানতার অবশিষ্ট থাকে কতটুকু? এ হেন অবস্থায় নদী আপন বেগে চলার, মানুষের ঢেলে দেওয়া দূষণের ঢলে অক্সিজেন মিশিয়ে পরিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা প্রথমেই হারায়। তারপরে ঘটে যায় বহু প্রকার অনিষ্ট, যার মধ্যে মাত্র কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হল।

(খ) জলাধার থেকে জল ছাড়ার কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম থাকা সম্ভব নয়। কখনও বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনে সেচের প্রয়োজন উপেক্ষা করতে হয়। আবার কোনও সময় সেচের দাবিকে প্রাধান্য দিতে হয়। এই ভাবে জলাধার থেকে কখনও অধিক মাত্রায়, আবার কখনও ক্ষীণধারায় জল ছাড়ার ফলে নদীর বেলাভূমিতে (shorelines) প্রচণ্ড অভিঘাত (shock effects) সৃষ্ট হয়। ফলে নদীর দু'কূল ভাঙতে থাকে, নদীতল (river bed) উঁচু হতে থাকে; জলধারণের ক্ষমতা কমতে থাকে। নদীর ক্রমবর্ধমান siltation এর ফলে বর্ষায় প্লাবন ও খরায় জলশূন্যতার সম্ভাবনা বাড়তেই থাকে।

(গ) স্বতঃপ্রবাহী নদী তার অববাহিকায় ভূমির উপরিস্তরে জমে যাওয়া লবণ ও অন্যান্য দুষিত বা বিষাক্ত পদার্থ বহন করে সমুদ্রে নিয়ে যায়। বেঁধে ফেলা নদী সে ক্ষমতা হারায়। ফলে তার দু'ধারের ভূভাগ (basin) ক্রমশ নোনামাটিতে পরিণত হয়।

(ঘ) মুক্ত নদীর ধারা পলিমাটি বয়ে নিয়ে যেত নিরন্তর। পলির বেশির ভাগ সে পায় তার উৎস-সন্নিপে, পর্বতসঙ্কুল পথপরিক্রমায়। যখনই তার গতিপথে বাঁধ বাঁধা হয়, তখন পলি ওই বাঁধের গন্ডির মধ্যে বন্দি হয়ে জলাধারের গভীরে থিতিয়ে পড়ে। ফলে বাঁধোত্তর (downstream) নদীর জলে উর্বরতাদায়ী পলিমাটি প্রায় অনুপস্থিত থাকে; উপরন্তু সেখানে থাকে ক্ষতিকর লবণের ভার — Silt এর বদলে salt। কৃষির জন্য নদীজল যে সব জমিতে নিয়ে যাওয়া হয়, সেই সব সিঞ্চিত ক্ষেত্রে ভূমিগর্ভ থেকে capillary action প্রভাবে অসংখ্য লবণ কণিকা উঠে এসে ভূমির উপরিভাগে (surface) সঞ্চিত হতে থাকে। সেচের জল নদীতে প্রত্যাবর্তনের পথে সেই লবণকণিকারাশি বহন করে আনে। তার ফল downstream region-কেই ভোগ করতে হয়। সে কারণে নদীর গতিপথ বন্ধ করা বাঁধ upstream ও downstream অঞ্চলের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষের সূত্রপাত করে।

(ঙ) বড় বাঁধ ছোট ছোট বন্যা (floods) রোধ করে কিন্তু বহুক্ষেত্রেই মহাবন্যার সৃজক হয়ে দাঁড়ায়। দারুণ বৃষ্টির সময় যখন বর্ষণের প্রবল চাপ থেকে ত্রাণ পাওয়া প্রয়োজন, সেই সময়েই upstream থেকে অতিরিক্ত জলের ঢল এসে হাজির হয়। অতিবৃষ্টির সময় বাঁধবন্দি জলাধার জলে ভরে যায়, বাঁধ burst করে আশেপাশের জনপদ ডুবিয়ে দেওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি করে, তখন এই বিপদ রোধ করার জন্য বিপুল বেগে জল ছাড়তে বাধ্য হতে হয়। দামোদরের বাঁধ, হীরাকুন্ডের বাঁধ, ময়ূরাক্ষীর বাঁধ এই ভাবে বারে বারে অতিপ্লাবনের কারণ ঘটিয়েছে। কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকার মিসিসিপি (Mississipi) নদীর বাঁধ মহাবন্যার কারণ ঘটিয়েছিল।

(চ) মুক্তপ্রবাহী নদীর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে তার তটদেশে বালি, পলি ও clay পৃথকভাবে জমা হতে থাকে, যেন মানুষের সুবিধার জন্য প্রকৃতি নিজেই বাছাই করে দিতে থাকে। এগুলির ওজন বিভিন্ন, সে জন্য থিতিয়ে পড়ার সময় ও দূরত্ব বিভিন্ন। যে নদীর প্রবাহে কোনও স্থিরতাই নেই, সেখানে এই সুবিধাও চলে যায়।

(ছ) বাঁধ বাঁধলে জলাধারের অতি গভীরে অক্সিজেন প্রবেশ করতে পারে না। বাঁধ থেকে যখন দুর্বার গতিতে জল ছাড়া হয়, তখনও oxygen-এর ঠিক মিশ্রণ ঘটে না; আবার শ্লথগতি অগভীর জলও জলচর প্রাণীর জীবনের সহায়ক নয়। এই উভয় কারণেই বাঁধ-বাঁধা নদীতে সুস্বাদু মাছের বংশ লোপাট হয়। যে সব মাছ ডিম পাড়ার জন্য নুড়ি (gravel) খোঁজে, তারা বাঁধ পার হয়ে নুড়ি-প্রকীর্ণ অঞ্চলে পৌঁছাতে পারে না, ফলে সেই সব অতি-সুস্বাদু মাছের বংশও ক্ষয় হতে থাকে।

(জ) বাঁধবন্দি নদীর শেষপ্রান্তে (at the tail end) জলধারা অতি ক্ষীণ হয়ে আসে। সেখানে hydrostatic pressure অতি কম হয়ে যাওয়ায় সমুদ্রের লোনাজল বদ্বীপের ভূগর্ভে প্রবেশ করতে থাকে। ফলে বদ্বীপ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূমি অনুর্বর হয়ে ওঠে। এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, যে-গুজরাট আজ সর্দার সরোবর বাঁধ তৈরির জন্য পাগল হয়ে উঠেছে, ভবিষ্যতে সেই গুজরাটকেই অনুতাপ করতে হবে। সমুদ্রের লোনাজলের অনুপ্রবেশ তারাই ডেকে আনছে তাদের উর্বর জমিতে।

(ঝ) মুক্তপ্রবাহী নদীর মোহানা— যেখানে নদীর মিষ্টিজল ও সমুদ্রের লোনা জলের সঙ্গম হয়—সব সময় নবজীবনের উৎস। এই মিশ্রণজনিত উথল-পাথল ও মন্থনপ্রক্রিয়ার ফলে nutrient সমূহের উৎসেচন ঘটে; সৃষ্টির মহোৎসবে মেতে ওঠে মাছ, কাঁকড়া, ঝিনুক, জলকুক্কুট জাতীয় যাবতীয় প্রাণী; বিভিন্ন species এর বিপুল অভ্যুদয় ঘটে। ফলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্যসম্ভারে সমারোহ আসে। অপর পক্ষে বাঁধবাঁধা নদী মোহানায় চলে শীর্ণদশায়; মিষ্টিজলের ধারা ক্ষীণ হয়ে যাওয়ার ফলে সেখানে জীবনের সক্রিয়তা থাকে না। তাতে পুষ্টি ও ওষুধের ঘাটতি মানুষকেই ক্লিষ্ট করে। এতে যে শুধু জীবনবৈচিত্র্য (biodiversity) ক্ষুণ্ণ হয়, তাই নয়; সমগ্র অঞ্চল স্থায়ীভাবে জলবায়ুর ভারসাম্য হারায়।

(ঞ) বাধাবন্ধনহীন প্রবহমাণ নদী সবেগে সমুদ্রে গিয়ে মেশে সঙ্গে নিয়ে যায় পলিমাটি ও বহুপ্রকার জৈবিক পদার্থের ঘর্ষণক্লিষ্ট অবশেষ। সেইগুলিই সমুদ্র ও মহাসমুদ্রের phytoplankton সমূহের খাদ্য হিসাবে কাজে লাগে। বাঁধ বাঁধার ফলে যেহেতু মোহানায় পৌঁছানোর পূর্বে ক্ষীণ স্রোতস্বিনীর বিলয় ঘটে, সেহেতু phytoplanktons অনেকাংশে বিনষ্ট হবে। মনে রাখতে হবে,

পৃথিবীর অক্সিজেন সম্ভারের অধিকাংশ-ই এই phytoplanktons -এর অবদান। অক্সিজেন উৎপাদনে এই বাধার ফল যে কী মারাত্মক হতে পারে, সে বোধ আপাতত বাঁধ-উৎসাহীদের চেতনার বাইরে থেকে গেছে।

(ট) বাঁধ শুধু যে নদীর অপমৃত্যু, জলজ প্রাণীর ক্ষতি এবং মৎস্যব্যবসায়ী ও মৎস্যভোজী মানুষের রুজিরোজগারের ক্ষতি করে তাই নয়, স্তন্যপায়ী ও অন্যবিধ সকল প্রাণীর ক্ষতি করে। তার মধ্যে পড়ে পক্ষিজগতের ও পতঙ্গজগতের সমূহ ক্ষতি। নদীর কিনারা সমস্ত বন্যপ্রাণীর তৃষ্ণা মিটাবার স্থল; নদীপ্রবাহের ঠিক উপরে বায়বীয় স্তর বিভিন্ন পাখি ও পতঙ্গের ক্রীড়াভূমি। বাঁধোত্তর যুগে শ্লথগতি ও অতি দ্রুতগতি স্রোতের পালাবদলে তাদের খাদ্যের স্থায়িত্ব থাকে না; নদীকিনারে বৃক্ষশাখায় বাসাও অর্থহীন হয়।

পরিবেশতত্ত্বের দিক দিয়ে আরও অনেক কথা আছে যা নদীর গতি রুদ্ধ করে জলাধার সৃষ্টি করার বিরোধী। তন্মধ্যে মাত্র দু'টি দিকের উল্লেখ করে ক্ষান্ত হব। যেখানে জনপদের মধ্যে বিশাল জলাধার সৃষ্টি করা হয়, সেখানে malaria, sleeping sickness, schistosomiasis প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়। ফলে আশেপাশের মানুষ ও পালিত পশুর স্বাস্থ্য দারুণ ভাবে ভেঙ্গে পড়ে; বৎসরের অধিকাংশ দিনগুলি হাড়কাঁপুনি জ্বরে কাটাতে হয়।

বাঁধ-পরবর্তী (downstream) এলাকাগুলিতে যখন nutrients-এর অভাব তখন বাঁধবন্দি জলাধার nutrients এর অতিভারে ভারাক্রান্ত, ফলে সেখানে algal bloom-এর সমারোহ। এই algae পচনের ফলে জলাধারের উপরিস্তরে যদি বা কিছুটা অক্সিজেন থাকতে পারত, তা-ও নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে fungi, bacteria, sludge-worm এবং anaerobic (বায়ুহীন) জগতের যাবতীয় হীনতর প্রাণী আসর জাঁকিয়ে বসে। তার ফলে জলাধারতলে যে সব (মানুষের হিসাবে) উচ্চতর প্রাণী থাকত, তারাও বিনষ্ট হয়। কয়েক দশক পরে জলাধার হয়ে দাঁড়ায় নরককুণ্ড আর নদী হয়ে দাঁড়ায় sewer (ময়লাবাহী নর্দমা)।

পরিবেশতত্ত্ব বাদ দিলেও বড় বাঁধ আর এক কারণে পরিত্যজ্য। এর মধ্যে আছে মৃত্যুর হাতছানি, যে রকমটি থাকে যুদ্ধক্ষেত্রে। বিমান আক্রমণের মুখে দৃশ্যমান বড় বাঁধ খঞ্জ হংসের (lame duck) মতো অসহায়। বহিঃশত্রুর সহজ লক্ষ্যস্থল (target) হয় বড় বাঁধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানির Ruhr উপত্যকায় যে সব বাঁধ ছিল, আমেরিকান বিমানবাহিনী তার উপর বোমাবর্ষণ করায় বাঁধভাঙা জলরাশি তালবৃক্ষসম উচ্চতায় প্রাণপণে পলায়মান জনসমষ্টিকে মুহূর্ত মধ্যে গ্রাস করেছিল। তেহরি বাঁধ, ইন্দিরাসাগর, সর্দার সরোবরের তুলনায় সে সব বাঁধ ছিল অতি ক্ষুদ্র। তাদের যখন এই দশা হয়েছিল, তখন বিশাল বাঁধের উপর আক্রমণ হলে কত বড় বিপর্যয় ঘটতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। যেখানে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ঘাটতি আছে, সেখানে বড় বাঁধ নির্মাণ আত্মহত্যার নামান্তর।

মৌসুমি বর্ষণের বৈশিষ্ট্য : মানুষের দায়িত্ব

প্রশ্ন ওঠে : নদীর বুকে বাঁধ যদি এতই ক্ষতিকর হয়, তা হলে ইউরোপ, চিন ও অন্যান্য দেশে নির্মিত বাঁধ ভেঙে ফেলার হিড়িক পড়েনি কেন? ষাট বৎসর আগে তৈরি টেনেসি বাঁধ এখনও নরককুণ্ডের পর্যায়ে আসেনি কেন? আমাদের দেশে— যেখানে চারমাস বৃষ্টির পর ৮ মাস খরা থাকে, সেখানে—কি বৃষ্টিহীন দিনগুলির জন্য বাঁধ বেঁধে জল ধরে রাখা ছাড়া গত্যন্তর আছে?

মধ্য অক্ষাংশীয় দেশগুলির সঙ্গে আমাদের দেশের জলবায়ুর প্রভেদ আরও গভীরভাবে বুঝতে হবে। বিশ্ববিখ্যাত meteorologist ভারতীয় অধ্যাপক P. R. Pisharoty -র মতে নদীর বুকে যত বড় জলাধার তৈরি কর না কেন, আমাদের মৌসুমি বৃষ্টির অধিকাংশ সমুদ্রে চলে যাবে, তার ২৫—৩০ শতাংশের বেশি ধরে রাখা যাবে না। এ অঞ্চলের মৌসুমি বর্ষণ মধ্য অক্ষাংশীয় দেশগুলির মতো মিনমিনে বৃষ্টি নয়। শেষোক্ত দেশগুলিতে এক বড় বাঁধ তিন বৎসরের সমগ্র বৃষ্টিও ধরে রাখতে পারে। পক্ষান্তরে আমাদের দেশে দশ দিনের ঘনতম বর্ষণ ধরে রাখবে, এমন সাধ্য কোনও বাঁধবন্দি জলাধারেরই নেই, থাকতে পারে না। তার কারণ এখানে বৃষ্টির বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে শুধু চার মাস ধরে বৃষ্টি হয় না, বৎসরের সমগ্র বর্ষণের অর্ধেকটা ঘটে যায় মাত্র ২০ থেকে ৩০ ঘন্টার মধ্যে। এত মুষলধারে সেই বৃষ্টি।

এই বৃষ্টির মাঝারি সাইজের ফোঁটাগুলিও ইংল্যান্ডের ফোঁটাগুলির তুলনায় তিন গুণ থেকে পাঁচগুণ বড়; আর তাদের গতিবেগ (kinetic energy) ইংল্যান্ডের বারিবিন্দুর চেয়ে এক হাজার থেকে দু'হাজার গুণ। এই বৃষ্টির অধিক অংশ ধরে রাখতে পারে শুধু ঘন বন, নিবিড় তৃণভূমি, soil organic matter সমৃদ্ধ খেতি জমি, দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ farm ponds, percolation tanks, দু'ধারে বনসমৃদ্ধ গভীরতা-রক্ষিত নদী ও প্রতি পাহাড়ের পাদদেশে বৃত্তাকার গভীর পরিখা— এই সকল এজেন্সি একসঙ্গে মিলে। এই সমষ্টির কোনও বিকল্প নেই। স্বল্পবৃষ্টির এলাকায় মান্ধাতারকাল থেকে চলে আসছে যে সব ব্যবস্থা— যথা rooftop harvesting, বাড়ির basement -এ (ভূগর্ভে) নির্মিত জলাধারে জলধারণ, খেতিজমির মধ্যে গভীর কূপ ও তার চারদিক জুড়ে সিমেন্টে তৈরি Catchment ও জলপ্রবেশপথে পরিশোধন (filter) ব্যবস্থা, ভূমিগর্ভে বাষ্পীভবন (evaporation) সম্ভাবনামুক্ত অসংখ্য ক্ষুদ্র জলাধার— মানুষের সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে পারে অনেক কম খরচে।

অধ্যাপক পিশারোটির মতে কোনও এলাকায় যদি বৎসরে মাত্র ৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয় আর সেখানে পুকুরের surface area র ৫০ গুণ catchment area রাখা হয়, তা হলে শতকরা ৪০ ভাগ জল বাহিরে চলে যাবে (run-off) ধরে নিলেও ১০ মিটার গভীর জল থাকতে পারবে। গ্রীষ্মের তাপে ২ মিটার জল উবে যাবে ধরে নিলেও বাকি ৮ মিটার মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারবে। গ্রামের প্রয়োজন অনুযায়ী পুকুরের surface area সম্বন্ধে অবশ্যই গ্রামবাসীরা সিদ্ধান্ত নেবেন।

উল্লেখযোগ্য যে, গুজরাটের Land Development Corporation সর্দার সরোবরের বিকল্প হিসাবে সহস্রাধিক অনুক্রমিক (a series) চেক ড্যাম ও plug তৈরির পরিকল্পনা পেশ করেছিল, যাতে মাত্র দু'হাজার কোটি টাকা খরচ করে ১৬-১৭ মিলিয়ন acre feet জল পাওয়া যাবে। এই চেক ড্যামগুলির নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে বড় জোর দু'বৎসর লাগার কথা। যেখানে সর্দার সরোবরে ১৮ হাজার কোটি টাকা ও কয়েকsurface area বৎসর খরচ করে মাত্র ৯ মিলিয়ন একর ফিট জল পাওয়া যাবে, সেখানে এই অর্থ ও সময় ব্যয় তো নস্যির মতো অথচ জল প্রাপ্তির পরিমাণ অনেক বেশি। যেহেতু এই বিকল্পে বিপুল বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রতিশ্রুতি নেই, সেহেতু এই পরিকল্পনা গুজরাট সরকারের মনঃপূত হয়নি।

জল পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা লাভ করতে গেলে সর্বপ্রধান কাজ বনসম্পদ রচনা। গুজরাটে যে সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ এলাকা আজ মরুর মতো শুষ্কতার শিকার, সেখানে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত বিলগঙ্গা, সর্থি, ভর্তু, মনসুর ও ঘি নদী সারা বৎসর প্রবহমাণা ছিল। সৌরাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিমে মহুবা নামে পোতাশ্রয়ী শহরের কাছে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যেত—সমুদ্রে ভাঁটার জল পিছু হটতে থাকলে সমুদ্রের বেলাভূমিতে পাঁচটি মিষ্টি জলের ফোয়ারা জেগে উঠত। বন সাফ করে দেওয়ার পর এই সব নদী ও ফোয়ারা লুপ্ত হয়ে গেছে।

নদীর সাবলীলতার সঙ্গে ও জলসংরক্ষণের সঙ্গে বনের যে কী গভীর সম্পর্ক তা না বুঝে, নদীর দু'তীর ধরে বরাবর ঘন বনের প্রয়োজনীয়তা না বুঝে, প্রকৃতির নিয়ম লঙঘন করে আমরা বাঁধবন্দি জলাধার বানাই, বা ব্যারাজ বানাই। গঙ্গায় স্বাভাবিক নিয়মে যেখানে অঢেল জল থাকতে পারত, সে দিকটা না ভেবে পশ্চিমবঙ্গে ফরাক্কা ব্যারাজ তৈরি করা হয়েছিল। নদীতে ধস নামায় সে ব্যারাজের অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে আবার বহু গ্রাম নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। ফরাক্কা ব্যারাজ হুগলি নদীর নাব্যতা বজায় রাখতে পারবে না। ফরাক্কা ব্যারাজ নির্মাণের বিরুদ্ধে স্বর্গত কপিল ভট্টাচার্য মহাশয় তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী আজ সত্য হতে চলেছে; কিন্তু তিনি হিমালয় অঞ্চলে ঘনবন রক্ষা ও নদীর দু'কূল বরাবর বনরক্ষা/বনসৃষ্টির কথা বলেননি। ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ দিকে ২৪ পরগণার এক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (জাতিতে ইংরাজ) আক্ষেপ করে বলতেন "হুগলি নদীতে যথেষ্ট জল থাকছে না। আণবিক শক্তি দিয়ে হিমালয় পর্বতের হিমবাহ (glacir) গলিয়ে কি জল আনা যায় না?" এ সব উদ্ভট চিন্তার কোনও প্রয়োজন থাকত না উত্তর ভারতের নদীগুলির বৈশিষ্ট্য বুঝলে ও প্রকৃতি-অনুগ দায়িত্ব পালন করলে। ফারাক্কা ব্যারাজ নির্মাণের এই সমালোচনায় বাংলাদেশের কিছু লেখক উল্লাস বোধ করতে পারেন। তবে তাঁরা যে বিকল্পের কথা বলেছিলেন, তা অতীব মারাত্মক ও আত্মঘাতী। "ফারাক্কা ব্যারাজ না করে হিমালয়ে বিরাট জলাধার সৃষ্টি কর না কেন?" এই ছিল ভারতের কাছে তাঁদের প্রশ্ন। এই পথে গেলে সর্বনাশ ঘটত। এমনিতেই ব্রহ্মপুত্র নদের তলদেশ ভূকম্পসৃষ্ট অগণিত ফাটলে ক্ষতবিক্ষত। ভারত যদি এই পথে যেত, তা হলে ভূকম্পের প্রকোপে ও ব্রহ্মপুত্রের রুদ্রমূর্তিতে বাংলাদেশের অস্তিত্বই বিপন্ন হত; ভারতও বিধবস্ত হত।

জলসরবরাহে বেসরকারিকরণের পরিকল্পনা

প্রকৃতির নিয়ম লঙঘন করার ফলে ভারতের এক বিরাট অংশ জুড়ে মানুষ ও পশু খরার প্রকোপে, তাপের দহনে বুভুক্ষা ও তৃষ্ণার শিকার হয়েছে। অন্য অংশে সেই সময় প্লাবনের তাণ্ডব চলেছে। আবার এমনও দেখা যাচ্ছে যে একই এলাকায় এক মরশুমে প্লাবন, অন্য মরশুমে তীব্র জলাভাব। এই দুই ভয়ঙ্করতার উৎস কিন্তু একই—বন ধবংস, নদীর গতিবিজ্ঞান লঙঘন, রাসায়নিক সার ব্যবহারের মাধ্যমে ও অন্য প্রকারে ভূমির জৈবিক উপাদানের (soil organic matter) বিনাশ, সমুদ্র উপকূলে mangrove (গরান গাছের বন) বিনাশ, মোটরবাহী রাস্তা সম্প্রসারণের নামে সেতু ও culvert সৃষ্টিতে কৃপণতাহেতু খালবিনাশ, কৃষিভূমি ও বাসভূমি বাড়াতে গিয়ে বিলের (wetlands) সর্বনাশ।

প্লাবন ও খরা উভয়েই ব্যবহার্য জলের ও খাদ্যের সংকট আনে। প্লাবনের সময় চারিদিকেই জল, তবুও একবিন্দু পানীয় জল মেলে না—আর দারুণ খরার সময় তো মরুর দশা। এইভাবে অন্ন ও পানীয়ের অভাবের কারণ ঘটিয়ে আমাদের দেশ ও বিশ্বের বহু দেশই water policy র নামে privatisation শুরু করেছে অর্থাৎ মানুষকে জল কিনতে বাধ্য করতে চলেছে। "জলই জীবন নির্মল পানীয় জল পাওয়া বিশ্বের প্রতিটি ব্যক্তির মৌলিক অধিকার" এই সত্যকে নাকচ করে দিয়ে আজকের "বাজারি বিশ্ব" জলকে পণ্য বানিয়ে ছাড়ছে। এখানে এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি, আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা কীরূপ প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা বোঝাবার জন্য। আমি পূর্ব-দিল্লিতে যে housing society

তে বাস করি, সেখানে আমাদের উপরে ছয়টি ফ্ল্যাটের দুইটি ফ্ল্যাটে প্রতিদিন Kinley কোম্পানির 'bottled water' বিক্রি হয়। এক পরিবার সে জন্য প্রতিদিন ৮০ টাকা খরচ করে, অন্য পরিবার ৫০ টাকা। যেখানে মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ করা হয় সেখানে যেমন, যেখানে societies ভূগর্ভস্থ জল সরবরাহ করে সেখানেও তেমন, নিরাপদ পানীয় জলের নিশ্চয়তা কোথাও নেই, তাই শহরগুলিতে প্রাইভেট জল কোম্পানিগুলি এইভাবে আসর জাঁকিয়ে বসতে পারছে। কিছুদিন পরে এইভাবে গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকেদের মধ্যেও এই ব্যবস্থা চালু হবে। অবশ্য প্রাইভেট কোম্পানিগুলির bottled water যে নিরাপদ, তা-ও নয়। আহমেদাবাদের Education and Research Centre রাসায়নিক সমীক্ষা করে দেখেছে যে ১৩টি পরিচিত brand এর মধ্যে একটিও ব্যাকটিরিয়া-মুক্ত নয় যদিও অনেকেই শতকরা একশো-ভাগ ব্যাকটিরিয়া-মুক্ত ও জীবাণু-মুক্ত বলে দাবি করে থাকে। Bottled water এর ব্যবসা ভীষণ লাভজনক। যে বিশ্বব্যাঙ্ক বিভিন্ন প্রকৃতি-পরিপন্থী জল প্রজেক্টে সাহায্য দিয়ে নদীকে ময়লাবাহী নর্দমা বানিয়ে ছেড়েছে, সেই বিশ্বব্যাঙ্কই বিশুদ্ধ জলসরবরাহ সেবার নামে privatisation of water প্রকল্পে সাহায্য করছে ও ঋণ বিতরণ করছে। বিশ্বব্যাঙ্কের বিবেচনায় জলের বাজারে এক trillion (১,০০০,০০০,০০০,০০০) ডলার মূল্যের বিক্রয় ঘটবে। Coco-cola কোম্পানি প্রকাশ্যেই বলেছে যে তারা চেষ্টা করবে বিশ্বের ৫৬০ কোটি লোকের মধ্যে একজনও যাতে তাদের কোম্পানির উপর নির্ভরতামুক্ত থাকতে না পারে। উপভোক্তাদের এই সংখ্যাটি কয়েক বছর আগের। বলাবাহুল্য ইতিমধ্যে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রামের কিঞ্চিৎ-ধনী লোকেরা-ও bottled water এর পিছনে ছুটবে কারণ কৃষিতে কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভের জলও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। তবে প্রাইভেট কোম্পানির জল কী নিরাপত্তা দেবে, তার বিবরণ একটু দেখা যাক। ভারতের Research Foundation for Science, Technology and Ecology র কল্যাণে জানতে পারছি যে ১৯৯৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে privatised জল চালু হওয়ার পর দেখা গেল সে জলে *Giardia* ও *Cryptos* Poridium-এর অত্যধিক সংক্রামক বিদ্যমান। এই সব কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর সব ঝামেলা বন্ধ করার জন্য testing ব্যবস্থা-ও privatise করা হল; আর এই পরীক্ষার ফলগুলিও Confidential intellectual property হিসাবে গণ্য করার অধিকার কোম্পানিগুলি পেল। দূষিত জল-জনিত রোগে মৃত্যু কিন্তু নীরব থাকে না; সব মিথ্যা দাবির মুখোস খুলে দেয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে Natural Resources Defence Council ১৯৯৯ সালে ১০৩ টি brand এর bottled water পরীক্ষা করে দেখতে পেল যে এক-চতুর্থাংশ হচ্ছে স্রেফ tap water; এক তৃতীয়াংশে রয়েছে আর্সেনিক ও মারাত্মক E. coli ব্যাকটেরিয়া।

মূল কথায় ফিরে আসা যাক। কেন থাকবে না দূষণমুক্ত পানীয় জলের নিশ্চয়তা? নির্মল পানীয় জল পাওয়ার সর্বজনীন মৌলিক অধিকার কীভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায়? নদীর জল যাতে কর্দমাক্ত হতে না পারে, তার জন্য করতে হবে ব্যাপক বনবিস্তার ও ভূমিক্ষয় নিবারণ। বনবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মাটির গভীরে aquifer গুলি চাঙ্গা হয়ে উঠবে এবং নদীর জল আবিলতামুক্ত হবে। তা ছাড়া, নদীর জল যাতে পায়খানার ময়লাজলবাহী নর্দমা হতে না পারে, সে জন্য চাই সর্বব্যাপী কার্যকরী sewage treatment ব্যবস্থা; নদীর জলে যাতে chemicals ও heavy metals না আসতে পারে, সে জন্য চাই প্রতি কারখানায় বাধ্যতামূলক effluent treatment ব্যবস্থা। তা ছাড়া চাই খালবিলের পুনর্জীবন, যাতে তাদের seepage থেকে দুই পাশের subsoil স্তরে জলসরবরাহ বাড়ে ও অনতিগভীর টিউবওয়েলগুলি-ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। চাই রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈবিক সারের সার্বিক প্রচলন যাতে ভূগর্ভস্থ জল দূষণমুক্ত থাকতে পারে। বর্তমান "বিকাশধারায়" এ ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। দৃষ্টান্ত, গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার অভিযান। ১৫ বৎসর আগে এর শুরু হয়েছিল। বহু ব্যয় করার পর উন্নতি বিশেষ কিছু হয়নি। বর্তমান বিধানে ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠান জরুরি, তার emission control ও effluent পরিশোধন সমান গুরুত্ব পাবে না। বাসস্থান নির্মান জরুরি, তার sewerage নদীতে ছেড়ে দেওয়ার আগে সম্পূর্ণভাবে দূষণমুক্ত হোক, সে ব্যবস্থা সমান গুরুত্ব কখনও পাবে না। কৃষিতে chemical ব্যবহারের ফলে জলের যে দূষণ, সে বিষয়ে কারও মাথাব্যথা-ই নেই।

সব চেয়ে বড় কথা, এই কর্মপন্থাকে অগ্রাধিকার দিতে গেলে বৃহৎ শিল্পভিত্তিক শিল্পায়ন, express highways, নূতন নূতন বিমানবন্দর, পোতাশ্রয়, flyover, stadium, সুবৃহৎ (mega) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের agenda খর্ব করতে হবে। তার পরিবর্তে প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং প্রকৃতি-অনুরাগী বিকেন্দ্রিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা, বিকেন্দ্রিক শিল্পসংস্থান, polycultural কৃষির ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রকার ব্যবস্থায় দেশের স্থায়ী উন্নতি ও সর্বজনের সমৃদ্ধি ঘটবে। (কী প্রকারে তা সম্ভব, সে আলোচনা ভবিষ্যতে বিশদভাবে করা যাবে।) কিন্তু সে পথ নিলে দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ীশ্রেণী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে—প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে চিৎকার শুরু হয়ে যাবে। বিদেশি, যারা ফাটকা পুঁজির খেলা খেলে আমাদের currency র অবমূল্যায়ন ঘটিয়ে এ দেশের শিল্প ও সৌধসম্ভার জলের দরে কিনে নেওয়ার জন্য ওঁৎ পেতে বসে

আছে এবং সে জন্য globalisation, liberalisation, privatisation তন্ত্রের বুলি শিখিয়ে আমাদের ময়না বানিয়ে ছেড়েছে, তারা তারস্বরে পৃথিবী জুড়ে ভারতের পশ্চাতগামিতার কথা প্রচার করতে থাকবে। সে ধাক্কা সামলাতে হলে বিকল্প সভ্যতা এবং তার ভিত্তি হিসাবে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে বিকল্প প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে স্বচ্ছদৃষ্টি থাকা দরকার। আশা করব বাংলার মুক্তবুদ্ধি বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিশারদ ও সমাজসেবীগণ এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার জন্য সচেষ্ট হবেন। জীবনের প্রয়োজনে নির্মল পানীয় জলের অধিকার এবং বিকল্প সভ্যতাগঠন আজ এক হয়ে গেছে।

সম্প্রতি দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া দেশের জনগণ বিদেশি প্রাইভেট কোম্পানিগুলিকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হওয়ার পর বিভিন্ন দেশে নির্মল জলের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে কিছুটা সংগ্রামী চেতনা জেগে উঠেছে। সেই সঙ্গে জাগছে, পরিবেশ ও জীবনের যোগসূত্র সম্বন্ধে চেতনা। তবুও বলি, পরিবেশরক্ষা ও বিকল্প সভ্যতার যোগসূত্র সম্বন্ধে চেতনা না জাগলে বাজারি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বঘোষী মৃত্যু-সওদাগরদের আক্রমণ আবার ফিরে আসবে।

ভারত মহাসাগরের আকাশে বিপদের সঙ্কেত

জল সম্বন্ধে যখন আমরা আলোচনা করছি, তখন Indian Ocean Experiments (INDOEX) নামক এক আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানী দল জলবায়ু/আবহাওয়া সম্বন্ধে এক উদ্বেগজনক সংবাদ প্রকাশ করেছেন। ভারত মহাসাগরের উপকূল থেকে ১৬০০ কিলোমিটার দূরে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে শুরু করে তিন কিলোমিটার উর্ধ্ব পর্যন্ত দৃষ্টি ঝাপসা করে দেওয়া এক বিপুল aerosol স্তর সারা আকাশ জুড়ে রেখেছে। Aerosol এর অর্থ ভাসমান কণিকা (tiny particles of solids floating in the air)। ধূলিকণা, খনিজচূর্ণ, ঝুলকালি, sulphates, organic carbon, আগ্নেয়গিরি-উদগত পদার্থ ও সমুদ্রোত্থিত বায়ুতাড়িত জলকণিকার (spray) সমষ্টি এই aerosoal স্তর। INODEX প্রজেক্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিকরা এই ভাসমান কণিকাসমূহের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে দূষণের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষের কর্মের ফল। কয়লা, পেট্রোলিয়াম জ্বলনের emission, কল-কারখানার emission ও biomass (কাঠ, তুঁষ প্রভৃতি) জ্বলনের ফল। (পরিমাণ বিচারে কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক দ্বিমত পোষণ করেন।) এই aerosol এর গভীরতা ভারত মহাসাগরের দক্ষিণাংশে কম কিন্তু বিষুবরেখার উত্তরে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের উপরিভাগে দূষণ গুরুতর।

নিঃসন্দেহে মেঘসৃষ্টির উপর, বৃষ্টির উপর এই aerosol এর দারুণ প্রভাব পড়বে। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিকের মতে ভারতের পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অনাবৃষ্টি আরও প্রকট হবে এবং পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে বৃষ্টির প্রকোপ আরও বাড়বে। ফলে উভয় অঞ্চলে কৃষি ব্যাহত হবে; অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি উভয়েই বিপর্যয় ঘটাবে, আর হাঁপানির প্রকোপ বাড়বে।

এই ভাসমান কণিকারাশির একটি বিশেষত্ব, বিশ্বজুড়ে এর আনাগোনা। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের কলকারখানা যে sulphate aerosol সৃষ্টি করেছিল, সেই aerosol ১৯৮০ সালে আফ্রিকার Sahel অঞ্চলে ভীষণ অনাবৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গত ৩০ বৎসর ধরে সে অঞ্চলে শতকরা ২০ থেকে ৫০ ভাগ বৃষ্টি কমে গিয়েছে। মঙ্গোলিয়ায় অতিরিক্ত গোচারণ ও ভূমিকর্ষণের ফলে (oevrfarming and overgrazing) অতিরিক্ত ভূমিক্ষয় হয় এবং চুরা-মাটির ধূলার মেঘ চিন দেশের বেজিং এবং অন্যান্য শহরের উপর দিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় কলকারখানা থেকে উঠে আসা বিবিধ দূষণ সংগ্রহ করে কলেবর বৃদ্ধি করে।

Greenhouse gases (কার্বন ডায়ক্সাইড, মেথেন), Ozone hole এবং aerosol haze - এই ত্রয়ীর প্রভাবে পৃথিবীতে জীবন বিপন্ন হয়ে উঠছে ক্রমবর্ধমান ভাবে। প্রতিকার হিসাবে fossil fuel burning কমাতে হবে, পেট্রোলিয়াম বা coal gas চালিত যানবাহন কমাতে হবে; সৌরশক্তি চালিত বৈদ্যুতিক যান ও সাইকেল চালু করতে হবে; কলকারখানা থেকে নির্গত তাপ ও দূষণমূলক gas কমাতে হবে। আর তা শুধু নিজের দেশে করলেই হবে না; অন্য সকল দেশও যাতে কমায় বা কমাতে বাধ্য হয়, তার জন্য বিশ্বজুড়ে অভিযান চালিয়ে যেতে হবে। বাঁচতে হলে এই বিপুল পরিবর্তনের দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ নেই।

বিশ্বমত উপেক্ষায় আমেরিকার একগুঁয়েমি

দূষণের উপরি উক্ত উৎস প্রথমত কমাতে, পরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বন্ধ করতে চাইলে, সেখানেও আসে বিকল্প প্রযুক্তির কথা, বিকল্প জীবনধারার কথা, যে জীবন হবে সরল, সজীবতায় ভরপুর, অতি-ভোজ আর অতি-ভোগের অপচয় হতে মুক্ত। মুশকিল হচ্ছে, শুধু দেশের ভোগী সম্প্রদায় নয়, বর্তমান বিশ্বের সর্বাপেক্ষা পরাক্রমী শক্তি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভীষণভাবে তার বিরোধী। বর্তমানের দূষণব্যবস্থা থেকে একচুলও নড়তে চায় না। জাপানের কিয়োটো শহরে ১৯৯৭ সালের বিশ্বসম্মেলনে ঠিক হয়েছিল যে ধনী দেশগুলি তাদের ১৯৯০ সালের emission-এর শতকরা ৫ ভাগ মাত্র Carbon dioxide কমাবে ২০০৮-২০১২ সালের মধ্যে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ রাজি হলেও USA— যে দেশ একাই পৃথিবীর ৩০ ভাগ Co_2 ছড়ায়— এই সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করতে সরাসরি অস্বীকার করেছে। USA -এর ছুতা যে তা করতে গেলে তাদের দেশে বেকারত্ব বাড়বে, জীবনযাত্রার মান কমে যাবে। সেই জন্য পরিত্রাণকামী সব দেশ

মিলে USA—এর শিল্পমালিকদের এবং তাদের বশংবদ সরকারকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে এবং সেই অভিযানে আমেরিকার জনসাধারণকে সঙ্গে নিতে হবে।

সুখের বিষয়, প্রকৃতি-অনুরাগী যে সব প্রযুক্তিবিদ্যা বিদ্যমান, সেগুলি উৎপাদন পদ্ধতির বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাতে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা সাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করতে এবং সার্বজনিক সমৃদ্ধি আনতে বিশেষ উপযোগী। সে জন্য সেগুলি G-7 দেশগুলির এবং রাশিয়া ও চিনের জনগণকেও আগ্রহান্বিত করতে পারবে। বৃহৎ (mega) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও oligopolistic শিল্প-বাণিজ্যের বদলে co-generation ব্যবস্থা সমন্বিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা, micro-hydel, mini-hydel, সৌরশক্তি, wind energy, biofuels, fluidised bed technology এবং তৎ-সঙ্গত (compatible) বিকেন্দ্রিক শিল্পসংস্থান এবং agri-horti-flori-sylvi-pisciculture, poultry and animal husbandry সমন্বিত integrative farming সমবায়-ভিত্তিক, প্রকৃতির সঙ্গে অন্তর-আলাপী সভ্যতার বাহক হিসাবে সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে।

মুক্ত কণ্ঠে ও দৃঢ় প্রত্যয়ে বলা যায় যে যতদিন সভ্যতার আদর্শ থাকবে "বাজারি" ব্যবস্থা ও তার আনুষঙ্গিক হিসাবে থাকবে প্রকৃতি-বিজয়-অভিলাষী প্রযুক্তিবিদ্যা, ততদিন এই ভাবে সমগ্র জনসমষ্টিকে খাদ্য, জল ও বায়ুর সঙ্কটে দুর্নিবার গতিতে নিক্ষিপ্ত হতেই হবে, মৃত্যুর আলিঙ্গনে। তাই যারা মানুষের ক্ষুধার অন্ন, নিঃশ্বাসের বায়ু ও পিপাসার জল বিষাক্ত করছে, সভ্যতানামী সেই দস্যুবৃত্তির পোষকদের প্রতিটি ছলাকলা প্রতিহত করতেই হবে বাঁচার প্রয়োজনে। সেটা সম্ভব করতে হলে শুধু ধনতন্ত্র বা Market economy র সমালোচনা করে ক্ষান্ত হওয়া চলবে না: বিকল্প জীবনধারা ও বিকল্প প্রযুক্তির ধারণা চাই, যাকে সমস্ত রাজনীতিক দল এতদিন peripheral বলে অবজ্ঞা করে এসেছে, তলিয়ে দেখার চেষ্টা না করে।

বায়োটেকনোলজি নামের আড়ালে রাক্ষসী বিদ্যা

যেখানেই প্রকৃতিকে পরাভূত করে অতি লাভের লোভ প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানেই অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে, এ ধারণা অনতিস্পষ্টভাবে অনেকের মধ্যে এসেছে। কৃষিকে তার স্বাভাবিক চরিত্র থেকে হটিয়ে দিয়ে মূলত রাসায়নিক পদার্থ-নির্ভর করতে গিয়ে যে বিষম ক্ষতি হয়েছে, তা সাধারণভাবে সকলেরই জানা আছে। তবুও বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে এই কারণে যে এই বিপর্যয় থেকে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করা হয়নি। সে আলোচনা আমরা আগামী কোনও সংখ্যায় করব। এখানে শুধু এইটুকু বলা দরকার যে বাণিজ্যিক সভ্যতার যুগে প্রকৃতির রহস্যসন্ধানী, কৌতূহলী, সমগ্রদর্শী বিজ্ঞানীদের (philosopher scientist) চেয়ে বিজ্ঞানীনামী technicalist -দের চাহিদা বেড়েছে, আর আমরা তার বলি হচ্ছি।

কেমিক্যাল-নির্ভর কৃষি টেঁকসই হবে না দেখেও এই সব প্রকৃতি বিজয়-অভিলাষী technicalist ঈশ্বরের ভূমিকায় উত্তরণের আশা ছাড়লেন না। প্রকৃতির জগতে যে সব শস্য বা প্রাণী নেই, এমন প্রকার শস্য ও প্রাণী সৃষ্টির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলেন। সে জন্য সাধারণ মানুষের কল্যাণসম্ভবী bioscience কে hijack করে তাঁরা biotechnology র প্রাবল্য ঘটালেন। Bioscience ও biotechnology র মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। Bioscience (জীব-বিজ্ঞান) চর্চা হদিশ দিতে পারে প্রকৃতি-সৃষ্ট কোন পদার্থ কীভাবে, কী সহযোগে ব্যবহার করলে বিনা খরচায় বা স্বল্পমূল্যে নির্ধন ব্যক্তির জীবনেও স্বাচ্ছন্দ্য আসতে পারে (যেমন গত সংখ্যায় blue green algae, floating fern-এর উল্লেখ করেছি)। অন্যদিকে সাধারণত Biotechnology-র উদ্দেশ্য বাণিজ্যিক স্বার্থে ফ্যাক্টরিতে নতুন পদার্থের উৎপাদন যার অস্তিত্ব নেই প্রকৃতির জগতে। অবশ্য Biotechnology হিসাবে পরিচিত হলেও tissue culture বাঞ্ছনীয় এবং বিপন্ন species রক্ষার জন্য সীমিত পরিমাণে cloning সমর্থনযোগ্য। তবে Biotechnologyর নামে আজকাল trans-genetic engineering এর যে ঢেউ তোলা হয়েছে (এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় যার মোহাবিষ্ট হয়ে Bioscience চর্চা অবহেলা করছে) তার বিষময় পরিণতি সম্বন্ধে সজাগ হতে হবে। আজ শুধু এই কথা বলে শেষ করব যে এর পরিণতি জীবজগতের সার্বিক ধ্বংসে (biological holocaust) যা nuclear holocaust এর চেয়েও ভয়াবহ। প্রকৃতির মধ্যে জীবনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য যে কী বিস্ময়কর আয়োজন আছে, তা বুঝলে উৎপাদনবৃদ্ধির উপায় হিসাবে এই রাক্ষসী বিদ্যার ভাবনা মনে আনারও কোনও প্রয়োজন থাকত না।

(চলবে)

অমৃতার পুত্র

স্বপ্না গুহ

কোমরটা টনটন করছে। হয়ত বিছানায় পিঠটা পাততে পারলে ভাল লাগত। কিন্তু অমৃতা নড়তে পারছেন না বারান্দার চেয়ারটা ছেড়ে। বারান্দার নীচের দৃশ্যটা ছেড়ে। একতলার বাড়ির ছোট্ট ছেলেটা গেটের ভিতরের অপরিসর জায়গাটুকুর মধ্যে একটা চাকা-ওলা ঠেলা ঠেলে ঠেলে খেলছে তার আয়ার সঙ্গে। গেটের বাইরে রাধাচূড়া গাছটা হলদে ফুলে ভরে উঠেছে কুড়ি বছর আগের মতো। গাছটা তখন অনেক শীর্ণ ছিল। অপরিণত। অপ্রচুর ছিল তার মাথা ভরা ওই হলুদ ছোপ। কিন্তু বুলানকে চুম্বকের মতো টানত ওই গাছটা। নীচে খেলতে গেলে, গেট পেরিয়ে ওই রাধাচূড়া গাছের তলায় গিয়ে ফুল কুড়োবার জন্য অস্থির হত। আজকাল থেকে থেকেই বুলানের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায় অমৃতার। বুঁদ হয়ে থাকেন সেই সব দিনের স্মৃতিতে। বোধ হয় উটপাখির মতো। আজকের কোনও ঝড়ের সংকেতকে যেন অস্বীকার করেন বুলানের শৈশবের স্মৃতিতে মুখ ডুবিয়ে।

স্বামীর কাছে দ্বিতীয় সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন অমৃতা তেইশ বছর আগে, যখন তাঁর প্রথম আত্রেয়ীর বয়স ছিল চার। 'তোমার বীর্য নয়, তোমার অবিচল প্রত্যয় আমায় দাও — আমি ধারণ করি তোমার আমার মননের সন্তান-আমার গর্ভে নয়, হৃদয়ে।' অবশ্য, এই কাব্যিক সংলাপ অমৃতার সেদিনের সন্তান-প্রার্থনার প্রথম বয়ান ছিল না, ছিল উপসংহার। তরুণী অমৃতা সরল গদ্যেই তার যুবক স্বামীকে বলেছিল, 'একবার ভেবে দেখ তো, জন্ম নিয়ন্ত্রণের তাগিদে আজকাল শিক্ষিত সমাজে যে রকম পরিবার দেখতে পাও তা কি পরিবার হিসেবে খুব স্বাস্থ্যকর? ধরতে পারেনি সূর্যকান্ত - 'তার মানে?' আর একটু খোলসা করে বলে অমৃতা, 'সমাজসচেতন নাগরিক হিসেবে তুমি আমি কী চাইব? বড় জোর দুটি সন্তান? একটি হ'লে আরও ভাল — জনসংখ্যার চাপ যতটা লাঘব করা যায়! এই তো? কিন্তু একটি মাত্র সন্তানকে ঘিরে মা-বাবার স্নেহ ভালবাসার বন্যা, আর তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার চাপ একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করে না কি দু'পক্ষের জন্যই?' এবার সূর্যকান্তর চোখ মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়। অমৃতার ছোট্ট কোমরটি দু'হাতে বেষ্টন ক'রে তাকে বুকের একেবারে কাছে টেনে এনে সে বলে, 'সত্যিই তো! আমার অমুর জন্য মা ষষ্টির চাঁদের হাটটিকে মর্তে আনার পারমিশন তো ভারত সরকার দেবে না! আমাদের রেস্তোও কিন্তু সামাল দিতে পারবে না।' সূর্যকান্তর রসিকতায় যোগ না দিয়ে, গম্ভীর মুখে সে বলে, 'সে পারমিশন চাইতে যাচ্ছি না আমি। আপাতত দুই-কি-তিনের অনুমতি তো ভারত সরকার দিয়েই রেখেছেন। কিন্তু তোমার মন সায় দেয় সু? এমন করে সন্তান প্রজননে? এই দুর্দিনে, প্রতি দুটো মানুষের সংসার গড়ার সাধ মেটাতে আরও দু-তিনটে, নিদেন একটা ক'রেও নতুন জীবনের সৃষ্টি করা — একে কি সমর্থন করা যায়?' এবার একটু ধন্দ লাগে সূর্যকান্তর, 'কি বলতে চাইছ অমু?'

অমৃতা যখন বলে সে অনাথাশ্রম থেকে দত্তক নিতে চায় তার দ্বিতীয় সন্তানকে, সূর্যকান্ত কয়েক মুহূর্তের জন্য বোবা হয়ে চেয়ে থাকে তার দিকে। অমৃতার কথাগুলি সূর্যকান্তর কাছে এক হঠাৎ-আবেগ বা ইম্পালস বলে বোধ হয়। সূর্যকান্তর চোখের দৃষ্টি আর তার দুই ভুর সামান্য জড়ো হ'য়ে আসার মধ্যে অমৃতা কোনও 'সৃষ্টিছাড়া' প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া দেখতে পায়। কিন্তু অমৃতার বিশ্বাস সে পারবে। এ প্রস্তাব যে সৃষ্টিছাড়া নয় প্রথা-বিরুদ্ধ মাত্র — এ সিদ্ধান্ত যে গভীর বোধের শক্ত জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে — এ প্রস্তাবকে ভাবালুতা বলে উড়িয়ে দেবার মতো আপাত নিরেট যুক্তিগুলোই যে আসলে মূলহীন শ্যাওলা মাত্র, এ কথা নির্মলবুদ্ধি সূর্যকান্তকে স্বীকার করাতে পারবে অমৃতা।

মনে পড়ে, সে রাত্রে, যেন দাম্পত্য-আরম্ভের দিনগুলির মতো প্রায় সারারাত কথা হয়েছিল তাদের। সে যে কি আশ্চর্য এক অভিজ্ঞতা! একটা করে সংশয় প্রশ্ন হয়ে আসছে সূর্যকান্তর দিক থেকে - একটা ঢেউয়ের মতো। অনায়াসে তার সমাধান করছে অমৃতা দক্ষ সাগরবিলাসীর মতো। সেই ভাবনাসমুদ্রে অবগাহন সূর্যকান্তকেও আপ্লুত করতে লাগল। আর সেই মুহূর্তে অমৃতার অনুভব হল এক অভিনব মৈথুনে রত হয়েছে তারা — মননের মৈথুন! সৎ, দৃঢ়চেতা আর অনুভবী সূর্যকান্তর বোধের মধ্যে অমৃতা বপন করল এক বিশেষ ভাবনার বীজ। একে যদি মননের মৈথুন বলা যায় তবে সেই ফাল্গুন মাসের শুক্ল পক্ষের রাত্রি তিন প্রহরে উচ্চারিত সূর্যকান্তর স্বীকারোক্তিটিকে বলতে হয় তার সুখোচ্ছ্বাস।

'আ'য়্যাম কনভিন্সড অমু, আয়্যাম কনভিন্সড!' অমৃতার মাথাটা বুকে নিয়ে সূর্যকান্ত বলতে থাকে, 'নিজের রক্তে শিশু

সৃষ্টি করা আর পৃথিবীতে পৌঁছে থাকা শিশুকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করা, এ দু'এর মধ্যে শুধুই আমাদের মানসিক সংকীর্ণতার বাধা ছাড়া আর কিচ্ছু নেই।' মাথাটা সরিয়ে এনে ওর চোখে চোখ রেখে সেদিন অমৃতাও যেন সেই উত্তেজনার আলোটাই দেখতে পায় যা সূর্যকান্ত অমৃতার চোখে দেখতে পেয়েছিল বছর চারেক আগের এক রাত্রির আশ্লেষের মুহূর্তে। সে রাতে অমৃতার শরীরে সূর্যকান্ত সঞ্চারিত করেছিল প্রথম সন্তানের সম্ভাবনা! আজ একই ভাবে সূর্যকান্তর বোধের মধ্যে অমৃতা সঞ্চারিত করল তাদের দ্বিতীয় সন্তানের সম্ভাবনা। আর তখনই অমৃতা উচ্চারণ করে ওই কাব্যিক সংলাপ, 'তোমার বীর্য নয়, তোমার অবিচল প্রত্যয় আমায় দাও — আমি ধারণ করি তোমার আমার মননের সন্তান— আমার গর্ভে নয়, হৃদয়ে।'

সন্ধ্যা নেমে আসায় নীচের বাড়ির বাচ্চাটা বোধ হয় ঘরে ফিরে গেছে। অমৃতা উঠে দাঁড়ান কোমরটাকে দু'হাতে চেপে। ধীরে ধীরে ঠাকুর ঘরের দিকে এগোন। ঠাকুর ঘরে প্রদীপ জ্বালতে গিয়ে দেখেন তেলের শিশিটা একদম খালি। ভারি বিরক্ত লাগে তাঁর। সকালে পুজো করার সময় শিশিটা চোখে পড়েছিল, কেন যে তখন তেলটা ভরে রাখেননি! এখন কোমরটা —। শিশি নিয়ে, কোমরের অংশের শিরদাঁড়াটাকে তিন আঙুলে চেপে, উঠে দাঁড়ান। রান্না ঘরের দিকে যেতে গিয়েই ফুলকপি ভাজার চড়া গন্ধটা নাকে লাগল। বুকের মধ্যে কি যে করে উঠল। মনে হল সরস্বতীকে এক ধমক দিয়ে বলেন, 'আজ হঠাৎ ফুলকপি ভাজবার কী হ'য়েছিল?' কিন্তু নিজেকে সংযত করলেন অমৃতা, এ ধমক ওর পাওনা নয়। শিশিতে প্রদীপের তেল ভরে নিয়ে চুপচাপ ঠাকুর ঘরে চলে গেলেন। প্রদীপ জ্বালা হল, শাঁখ বাজানো, এমনকী মেঝেয় মাথা ঠেকিয়ে প্রণামও। কিন্তু সবই কেমন যান্ত্রিকভাবে। ঠাকুর প্রণামেও যেদিন মন বসে না সেদিন বড় অসহায় লাগে অমৃতার। মনে মনে বলতে থাকেন 'ক্ষমা করো ঠাকুর! মার্জনা করো আমার চিত্তবৈকল্যকে'। শোবার ঘরে গিয়ে মশা তাড়ানো ম্যাট জ্বেলে দিয়ে এবার বিছানায় কোমর পেতে শুয়ে বলেন 'আঃ'! স্বস্তিতে নয়, সন্নিবদ্ধ যন্ত্রণায়। আর রান্নাঘর থেকে নাকে লেগে থাকা এক সন্নিবদ্ধ সুগন্ধ যেন আবার ছড়িয়ে পড়ে শ্বাসের মধ্যে — ভাজা ফুলকপির গন্ধ।

অনেক দিক থেকে অনেক বাধা এসেছিল। অনেক সমালোচনা। সূর্যকান্তর সমর্থনে সমৃদ্ধ অমৃতা ক্ষেত্রবিশেষে বিতর্কে নেমেছিল, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে শুধু মৃদু হেসে প্রসঙ্গান্তরে ঘুরিয়ে নিয়েছিল আলোচনাকে।

দু'হাতে পেতে বুলানকে নিয়েছিল আশ্রমের সন্ন্যাসিনীর কোল থেকে। চোখের ইশারায় সূর্যকান্তকে বলেছিল কাছে আসতে। এক হাতে অমৃতার পিঠ বেষ্টন করে অন্য হাতে বুলানের ছোট্ট মুঠিটাকে মুঠোয় জড়িয়েছিল সূর্যকান্ত। সামনে স্নেহময়ী মা মেরির মূর্তি। এই ছিল সূর্যকান্ত-অমৃতার দ্বিতীয় সন্তানলাভ। ছোট্ট তাতুকে নিয়ে নার্সিং হোম থেকে যেমন বাপের বাড়িতে এসেছিল অমৃতা তেমনই ছোট্ট বুলানকে নিয়েও বাপের বাড়িতেই এল ওরা। শুধু মায়ের অভাব পুরিয়ে সেদিন দুয়ারে অপেক্ষারত ছিল অমৃতার ছোট বোন শমিতা। হাতে তার হলুদ চন্দন প্রদীপ দিয়ে সাজানো বরণডালা। দুই পাশে শাড়ি-পরা খুদে দিদি তাতু আর ধুতি পরা খুদে দাদা গুটলু — অমৃতার দাদার ছেলে। দাদা-বৌদি আর সূর্যকান্ত সহ বুলানকে কোলে নিয়ে আলপনা আঁকা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শঙ্খ আর ঝুরো ফুলের অভ্যর্থনায় অমৃতার দু'চোখে জল উপচে এসেছিল। সে কি ছোট বোনের প্রতি কৃতজ্ঞতায়, না মায়ের কথা মনে পড়ায়?- হয়ত বা দুই-ই।

এই অভ্যর্থনা-পর্বের গল্পটা ছোট্ট বুলানের ভারি প্রিয় ছিল। বুলান যে তার মা-বাবার কোলে এসেছিল পৃথিবীতে এসে পৌঁছাবার চোদ্দ দিন বাদে, এ'কথা তাকে জানানো হয় সাড়ে চার বছর বয়সে। তাতু অর্থাৎ আত্রেয়ী তখন ক্লাস থ্রিতে পড়ে। সূর্যকান্ত সেদিন সন্ধ্যা হবার আগেই আপিস থেকে ফিরেছিল। অমৃতার ঠেলাঠেলিতেই তাতুর যাওয়া, নইলে ওর মতে খেলা করার বয়স ওর মোটেই নয়। নীচে গিয়েও সুবালাদির সঙ্গে পুটুরপুটুর গল্প করেই সময় কাটাত তাতু। খেলাটা করত বুলান। আর দিদিদের চোখ এড়িয়ে, গেটের হুড়কো খোলা পেলেই যখন ছুট মারত বাইরের রাধাচূড়া গাছের দিকে, তাতু চিল চিৎকার দিত 'মা— দেখে যা—ও'। বারান্দায় এসে অমৃতা দেখতে পেল বুলানকে লেছড়ে টেনে আনছে সুবালা, আর বুলান ছটফট করে বলছে 'শুদ্ধু ফুল নেব আর কোনও দিকে যাব না। ঠিক বলছি।'

সেদিন হঠাৎ সকাল-সকাল বাবাকে আসতে দেখে উচ্ছ্বসিত বুলান ছুটে এসে বাবার ঊরুজোড়া বেষ্টন করে ঝুলে পড়ল। সূর্যকান্ত বুলানকে কোলে তুলে নিয়ে তাতুর হাত ধরে ওপরে উঠে এলে পর সুবালা চা-জলখাবার গুছিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেল। লুচির সঙ্গে আলু-ফুলকপি ভাজা। সূর্যকান্ত খেতে শুরু করলে অমৃতা আড়-চোখে ঠিক দেখতে পায় সূর্যকান্তর প্রতিটি লুচি, যেন একান্ত কাকতালীয়বৎ, শুধু আলুই জড়িয়ে তুলতে থাকে। আর বুলানও পায়ে-পায়ে এগিয়ে এসে, বাবাকে এক ঝুড়ি উটকো প্রশ্ন করার ফাঁকে-ফাঁকে, যেন একান্ত অন্যমনস্কভাবে, বাবার থালা থেকে একটি একটি ফুলকপির কুচি মুখে তুলতে থাকে। অমৃতা অতি কষ্টে হাসি চেপে কড়া গলায় বলে 'আ-মি দে-খ-তে পা-চ্ছি বুলান!' ভারি অপ্রস্তুত মুখে বুলান হেসে বলে, 'এ-মা-! এটা তো বাবার! আমি তো এত্ত খেয়েছি। না মা?, সূর্যকান্ত আর তাতু হেসে ওঠে। কিন্তু অমৃতা, ওই মায়াবি মুখখানাকে দু'হাতে তুলে ধরে চুমোয় ভরে দেবার ব্যাকুলতা বুকে চেপে রেখে, অপ্রসন্ন মুখে বলে, 'ছিঃ'

'ইচ্ছে ক'রে না মা, ইচ্ছে ক'রে না'-বুলানের ব্যাকুল সাফাই, 'বাবার সাথে কথা বলছি তো? কপি ভাজার গন্ধ নাকে লেগেছে! ভুল হয়ে গেল।'

সেই ছোট্ট বুলানের আজ দশাশই চেহারা। — রাধাচূড়ার মোহ নেই। — নেই তার দিদির সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে মায়ের আদর খাবার তাগিদ। কিন্তু সেই ফুল কপি-ভাজার গন্ধে আজও বুলানের 'সব ভু-ল হ-য়ে যা-য়!' মনের ভিতর থেকে জিভে এসে পড়ে কথা কটা। অমৃতা নিজের মনে মুচকি হাসেন। তারপর কোমরটা একটু ছেড়েছে বুঝে, বিছানা ছেড়ে উঠে আর একটা ধূপকাঠি জ্বালাতে নেন সূর্যকান্তর ছবির সামনে দেবার জন্য। ঠাকুরঘর থেকে এসেই এটা জ্বালেন অমৃতা, কিন্তু আজ কোমরটা একান্তই বিদ্রোহ করছিল সে মুহূর্তে। দু'বছর হয়ে গেল মানুষটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন, কিন্তু ছবির ওই হাসিমুখখানার দিকে চাইলেই একরাশ অভিমান যেন অমৃতার বুকের মধ্যে দাপাদাপি শুরু করে। ধূপটা জ্বেলে দিয়ে, ছবির মুখোমুখি রাখা ইজি চেয়ারটায় বসে পড়লেন অমৃতা একদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে। এই শুভ-দৃষ্টির আয়োজনটা মেয়ে তাতুর করে দেওয়া। সেবার সূর্যকান্তর পারলৌকিক ক্রিয়া সেরে, হায়দারবাদ ফেরার আগে এই চেয়ারটা কিনে এইখানে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সে।

সূর্যকান্তর লুচি খাওয়া হলে তাকে চা ছেঁকে দিয়ে বুলানকে কোলে টেনে নিয়েছিল অমৃতা। বুলান চট করে মায়ের মুখে চোখ রাখল একবার, তারপর চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে পড়ল মায়ের ছড়িয়ে পাতা কোলটাতে, 'কেন মা?' অমৃতা হেসে ফেলল, 'এমনি একটু ইচ্ছে করল।' তারপর, বুলানের শার্টে লেগে থাকা ধুলোটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'তোদের কস্তুরি মিস স্কুলে এসেছিলেন আজ?' বুলানের পত্রপাঠ জবাব, 'এখন কি করে আসবে? আগে পেটের থেকে বেবিটা বেরোক! হি-উ-জ পেটটা নিয়ে হাঁটতে পারে?' অমৃতার উচ্চ হাসিতে যোগ দিল সূর্যকান্তও।

হাসিটার জের টেনেই অমৃতা বলে উঠল, 'একটা মজার কথা জানিস, তুই আমার পেটের থেকে বেরসনি।' চূড়ান্ত অবিশ্বাসের সুরে বুলান বলল, 'ভ্যাট, তা আবার হয় নাকি? স-ব বাচ্চাই পেটের থেকে বেরয়, আমি কি জানি না?' অমৃত হাসে, 'সেটা একদম ঠিক জানিস তুই। পেটের থেকেই সবাই বেরয়, তুইও বেরিয়েছিলি, কিন্তু আমার পেটের থেকে নয়।' 'বাজে কথা', এবার যেন বুলানের কথায় প্রত্যয় একটু টিলে। বাবা আর দিদির দিকে চেয়ে সে বলে 'বাজে কথা বলছে মা, না বাবা?' সূর্যকান্ত ঝলমলে হাসি মাখা মুখে বলে, 'না রে বুলান, এটা একদম সত্যি! ওফ্ কী যে এক্সাইটিং ব্যাপার! মাকে বল, পু-রো-টা তোকে বলবে!' অমৃতার গায়ের কাছে সরে এসে বুলানের দিদি তাতুও, প্রিয় গল্প শোনার খুশি গলায় নিয়ে, বলে 'হ্যাঁ মা বলো বলো, দারুণ লাগে শুনতে!'

চোখ গোল-গোল করে বুলান শুনতে থাকে যেন রূপকথার গল্প। মা তো ঠাকুরকে বলেই খালাস যে তাদের এবার আর একটা বেবি চাই ... ছোট্ট তাতুর চাই একটা খেলার সাথী- ছোট্ট একটা ভাই। কিন্তু দিন যায় ... মাস যায় ... মার পেট আর ফোলে না! একদিন, হঠাৎ মা বাবাকে বলে, 'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে আমার ছেলেটাকে ঠাকুর অন্য কারো পেটের মধ্যে দিয়ে পাঠিয়েছেন?' বাবা বলে 'সত্যিই তো!' অমনি ছুট-ছুট-ছুট ...! কোথায় রয়েছে সেই অমৃতা-সূর্যকান্তর ছেলে! এই অবধি শুনে বুলান বাধা দেয়, 'ঠাকুর কখনও কারো ছেলেকে অন্যের পেটে দেয় নাকি? সবাই তো মায়ের পেটের থেকেই বেরয়!'

অমৃতা এবার বুলানের বট্‌ঠাকুমার সবজি-বাগানে দেখা বেগুন ফুলের থেকে বেরনো ছোট্ট বেগুনের দৃষ্টান্ত দিয়ে, বড় মানুষের শরীর থেকে ছোট্ট বেবি বার হবার প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করে। তারপর বলে, 'ফুলটা কি বেগুনের মা হয়?' বুলান আবিষ্কারের চোখে তাকায়। অমৃতা বলে, 'ফল সবজির তো আর ভাত খাওয়া নিয়ে বায়না — জল ঘেঁটে সর্দি বাধানো — কি স্কুল-ড্রেসে বাবল্‌গাম লাগিয়ে ফেলা, এ'সব থাকে না,' বুলানের কুলকুলিয়ে ওঠা হাসির মধ্যে দিয়ে অমৃতা কথা শেষ করে, 'তাই ওদের মা বাবা লাগে না, দিদি লাগে না, তাই না?' বুলান হাসতে-হাসতেই মাথা নেড়ে সায় দেয়। অমৃতা বলে, 'কিন্তু বড় মানুষের শরীর থেকে বেরনো বেবি মানুষটার তো মা বাবা লাগে? তাই এমনিতে মায়েরই শরীরের মধ্যে দিয়ে বেবিটাকে পাঠান ঠাকুর, ব্যাস, হয়ে যায়। কিন্তু কখনও-কখনও আবার অন্য একটা শরীরকে ফুলের মতো শুধু ফল ফলাবার কাজটুকু দেন। পরে মানুষ-ফলটা, মানে বেবিটাকে একটা জায়গায় যত্ন করে রাখা হয় যাতে তার মা-বাবা এসে চট করে নিজেদের বেবিকে খুঁজে পায়। মা যশোদার ছেলেও তো তাঁর নিজের পেট থেকে না বেরিয়ে অন্যের পেট থেকে বেরিয়েছিল, তুমি জানো তো?' বুলান শ্রীকৃষ্ণের গল্প থেকে নিজের গল্পে টেনে আনতে চাইল অমৃতাকে, 'কেমন ক'রে খুঁজে পেলে আমায়? ঠাকুর তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন?'

সেদিন গল্পের সব ক'টি শেষ হতে রাত হয়েছিল। শিশু বুলানের অভ্যর্থনার গল্পটা সবচেয়ে বেশি উপভোগ করে ও। তারপর থেকে কত হাজার বার যে ওই গল্পটা শুনতে চেয়েছে সে। এর পর যেমন যেমন বড় হয়েছে, নতুন নতুন ভাবনা যোগ হয়েছে নিশ্চয় ঘটনাটিকে ঘিরে। সমাজের কু-সংস্কারের বাতাস তো আছেই। দেহ-জনিত আর স্বেচ্ছা-চয়িত সন্তানের প্রসঙ্গে কতই না কাল্পনিক ভেদাভেদ। কখনও প্রশ্ন করেছে সে অমৃতাকে বা সূর্যকান্তকে। কিন্তু তা কোনও নিরাপত্তাহীনতার বা অস্তিত্ব-সংকটের সৃষ্টি করেনি। অমৃতার মনে হয়, খুব নিবিড় ভালবাসায় অমৃতার সাধের নীড়ের চার সদস্য যে স্বতঃস্ফূর্ততার ঠাসবুনুনিতে বাঁধা হয়ে আছে, সেটাই এক রক্ষা-কবচের কাজ করেছে। অবশ্য

এই রক্ষা-কবচের জোর সম্বন্ধে কতটুকু প্রত্যয় ছিল সেদিন অমৃতার? সেই, বুলানের বয়ঃসন্ধির সময়টাতে? অমৃতাকে বুলান এড়িয়ে চলছে ... তার শাসনে যেন একটু গুম হয়ে থাকছে ... স্কুল থেকে ফিরলে যেন একটু বেশি গম্ভীর থাকছে, এমনই নানান লক্ষণ দেখে যেদিন এক আতঙ্কের শিরশিরানি অমৃতার মেরুদণ্ড বেয়ে নেমেছিল! স্কুলের কিছু 'ডেঁপো ছেলে' কিশোর বুলানকে প্রভাবিত করছে। বিদ্রূপ করে তুলছে তাকে তার 'অ-জননী' মায়ের বিরুদ্ধে, এমনই সব কল্পনায় অমৃতা যেদিন বলে উঠেছিল, 'এখনও সময় আছে, আমি বুলানকে নিয়ে দার্জিলিং চলে যাব - এই পরিবেশে ওকে আর একটুও থাকতে দেব না আমি। আমার সেই মা-আঁকড়ানো ছেলেটা ... !' আজ কেমন এক সজল কৌতুক খেলা করে প্রৌঢ়া অমৃতার চোখে, কি ভুলই না হয়েছিল তাঁর! কী বিচিত্র এক সমস্যায় পড়েছিল বুলান! মায়ের ইচ্ছে মতো বিজ্ঞান নিয়ে পড়া তার একান্ত অপছন্দ, অথচ, মার কাছে সেই প্রতিবাদ জোরালো ভাবে করতে তার ভয়, পাছে মা এই ভেবে দুঃখ পান যে, 'পেটে ধরিনি ব'লে বুলান আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের তোয়াক্কা করে না!' অমৃতা আপ্লুত হয়েছিল তার কিশোরপুত্রের সূক্ষ্ম অনুভবের ছোঁয়ায়! শিশুর মতো অভিমানে বুলান বলেছিল, 'কেন আমায় পেটে ধরলে না মা? কেন আমার মনে সব সময় তোমায় আঘাত দেবার ভয় লেগে থাকে?' সে সময়ে, ফিরে-পাওয়া প্রত্যয়ে অমৃতা বুলানকে শান্ত করে বলেছিল, 'ও ভয়টা তুই একদম ছেড়ে দিতে পারিস। আমার পেটে-ধরা আর কল্পনায় ধরা দুটো সন্তানই আমায় অঢেল সুখ দিয়েছে, এই কনফেশনটা চুপিচুপি তোর কাছে করেই ফেলি।'

আজ মাস খানেক যাবত বুলানের কোনও ফোন পাচ্ছে না অমৃতা। মাসে একবার ফোন করত ও। একবার অমৃতা করতেন। এই ভাবে পাক্ষিক যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা বছর খানেক যাবত চলছিল কারণ চিঠিপত্র ব্যাপারটা অনিয়মিত হতে হতে শেষে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। গত মাসে অমৃতা নিজে ফোন করার পর এবার কিছুটা অপেক্ষা তো স্বাভাবিক। তা ছাড়া ওর ছুটি শুরু হতে আর মাত্র দশ দিন বাকি, আসার সম্বন্ধেও তো জানাবে কিছু!

এদিকে, তাতুর খবরটাও বিভ্রান্তিকর। মাস দুয়েক আগে কলকাতায় এসেছিল তাতু, বুলানেরই জন্য দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে। কথা বলতে বলতে বারবার কেঁদে ফেলছিল তাতু, 'কী হবে মা, সত্যি যদি ওই বয়সে-বড় মহিলাকে ও শেষ পর্যন্ত বিয়েও করতে চায়? অমৃতার শরীরের ভেতর একটা জ্বর-ভাব শিরশিরিয়ে উঠেছিল। তাতুর এ'বছরের রাখিটা নাকি ডাকের গোলমালে ফেরত আসে, অথচ বুলানের কোনও ফোন আসে না, এটাই তাতুকে দারুণ বিচলিত করেছে। সেই বুলান, যে রাখির আগের দিন থেকে ব্যস্ত হয় এখনও এসে পৌঁছল না কেন রাখি! সে কিনা রাখীর দিনে খালি হাত রয়ে গেল, তবু ফোন করে চোটপাট করল না!

পুনের সিম্বায়োসিস কলেজে বুলানের এক অধ্যাপক আছেন যাঁর শ্বশুরবাড়ি হায়দরাবাদে। তাতুদের পাড়াতেই। সেই সুবাদে সেই অধ্যাপকের স্ত্রী মীনাক্ষীর সঙ্গে তাতুর বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে। মীনাক্ষী অত্যন্ত ভদ্র মেয়ে। অনেক ইতস্তত করে সে বলেছিল কথাটা। শেষে বারবার বলেছে, সে পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি কথাটা, কিন্তু সে আত্রেয়ীর আর তার মা'র কথা ভেবেই এই অবগতিটুকু ওদের দিতে চাইছে ... অত দূরে রয়েছে ... একটা উঠতি বয়সের ছেলে ... নবীন প্রফেসরের যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার গল্পটার মধ্যে যদি কোনও সত্যতা থেকে থাকে! ভারি একটা শ্বাস ছেড়ে অমৃতা ভাবেন, থাকলেই বা করার কী আছে তাঁর! তেইশ বছরের ছেলে সাবালক ছেলে যা ভাল বুঝবে তা করবে। চারি দিকে তাকালে কোন ছেলেকে বা মেয়েকে দেখা যায়, যে মা-বাবার কথায় নিজের সিদ্ধান্ত বদল করে? তবু, অমৃতা যেন এই ক'মাস ধরে নিজের ভিতরে স্থির হতে পারছেন না কিছুতেই। বুলান যে তাঁর 'সেই ছেলেটা'! এই কাঁটা বুকে নিয়ে তেইশটা বছর কেটেছে। 'শুনলাম তোমরা অনাথাশ্রম থেকে একটা বাচ্চা এনে মানুষ করছ? ভাল, ভাল, খুব মহৎ কাজ।'

'মহৎ নয় বোধহয়, বিবেচনার কাজ মাত্র।'

'কিরে? তোর সেই ছেলেটা কেমন শেপ নিচ্ছে? হেরিডিটিকে কাটিয়ে এনভায়রনমেন্টকে কার্যকর করতে পারছিস তো? না হেরিডিটিটাই ফুটে বেরচ্ছে?'

'ওর হেরিডিটি কী-দোষে দূষিত তা কি আপনার জানা আছে বিধুকাকা? আমার কিন্তু জানা নেই।'

'ছেলেটা এত জেদি কেন? শাসন করিস না? অন্তত দিদির স-ং-স্প-র্শ-ও তো কাজে লাগা উচিত!'

'তোমার বড় ছেলের সংস্পর্শ প্লাস হেরিডিটি নিয়েও তোমার ছোট ছেলে যে স্রেফ জোচ্চোর হয়ে গেল লিলিমাসি। আমার ছেলের জেদটুকু নিয়ে তোমার এত ভাবনা?'

না, প্রশ্নগুলোর সঙ্গে যে জবাবগুলো মনে সেজে ওঠে তার একটিও উচ্চারিত হয়নি। 'জবাব' তাদের কারও পাওনা নয়, প্রশ্নগুলোই শুধু পাওনা অমৃতার, আর তার স্বামীর-তাদের 'সে-ই ছে-লে-টা'র জন্য! 'ছেলেটাকে এ সত্যটা বুঝতে দেওয়া যায় না। তাই অমৃতার বুকে জমতে থাকে এক মরিয়া ভাব- কেউ আঙুল তুলতে না পারে যেন তাঁর বুলানের দিকে। তাতু অবশ্য বলে থাকে, 'কেউ আঙুল তোলা'র আগেই নাকি ছোট্ট তাতুও হোঁচট খেত তার মায়ের শীতল অননুমোদনের সামনে। ভরসা পেত না সেই লক্ষ্মণরেখা ডিঙোতে। হতে পারে। পরিণত অমৃতা ... ব্যক্তিত্বে শৈথিল্য-আসা অমৃতা ... পথের প্রান্তে পৌঁছানো

অমৃতা আজ মানতে রাজি যে সফল সন্তান-প্রতিপালনের এক উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা আত্মপ্রত্যয় হয়ত সেদিন তাঁর ছিল। কিন্তু বুলানের জন্য যে ব্যগ্রতা, তার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয় ... আত্ম-প্রত্যয় নয় ... ছিল এক ডানা ছড়ানো ব্যাকুলতা। ওরে বুলান, তুই এমন কাজ করিস না যাতে ওরা বলতে পারে 'সেই ছেলেটা বুঝি এই বেরল!'

হাসি-মুখ সূর্যকান্তর ছবির মুখোমুখি অমৃতা, তাঁর ভেজা চোখ মুছে, টান হয়ে বসেন। দু'হাতে ঠেলে দেন সেই ভয়ের শিরশিরানি, সেই জ্বর-ভাব। 'বুলানকে আমি নিজেই ফোন করব সু। কেন আমি ভয়ে কাঁটা হ'য়ে আছি? এত দিনে এ'টুকু কি আমার দায়িত্বশীল সন্তানদের পাওনা হয়নি, যে আমরা বিশ্বাস করব ওরা যা করবে ভেবে চিন্তেই করবে? সত্যি যদি মাস্টারের স্ত্রীর প্রেমেই প'ড়ে গিয়ে থাকে আমার বুলান! কেমন সেই রশ্মি শর্মা, যার আকর্ষণ আমার বুলানের জন্য অপ্রতিরোধ্য? কোন যন্ত্রণায় সেই মেয়ের দাম্পত্যবন্ধন শ্বাসরোধক হয়েছিল, যার উপশম প্রকট হয়ে উঠেছে আমার বুলানের আন্তরিক যত্নে? আমি আজই ফোন করে পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করব ওকে ... অভয় দেব। বাড়িয়ে দেব সাহায্যের হাত ... পরামর্শ চাইলে পরামর্শও দেব। কি বল সু?' অমৃতা বিড়বিড় করে যেন সংকল্প নেন, আর ঠিক তখনই ফোনটা বেজে ওঠে। 'মা, আমি শনিবার পৌঁছচ্ছি।'

'বুলা—ন! কেমন আছিস বাবা?'

'খুব ভাল না মা, কদিন ধ'রে জ্বর চলছে।'

'সে কি রে? ঠাণ্ডা লাগালি নাকি?'

'না, এক্সার্শন। ম্যারাথন টিউটোরিয়াল চলছিল ছুটির আগে। তার পর গত সপ্তাহে বিরাট এক ফেয়ারওয়েল অ্যারেঞ্জ করতে হ'ল - আমাদের শর্মা স্যার এলাহাবাদ চলে গেলেন।'

অমৃতা ভেতরে-ভেতরে একটু চমকালেন, 'শ-র্মা-স্যা-র চলে গেলেন? সস্ত্রীক?'

'অবভিয়াসলি!'

'না, শুনেছিলাম ওঁদের ডিভোর্স হচ্ছে, তাই —।' এবার দু'সেকেন্ড নিরুত্তর রইল বুলান।

তারপর হো-হো করে হেসে বলল, 'শু-নে-ছি-লে? তা হলে তো আরও কিছু শুনেছিলে মাম্মাম? যাক্‌গে, ওঁদের গোলযোগ মিটে গেছে। চলে গেছেন ওঁরা, টু লিভ হ্যাপিলি এভার আফটার।'

বুলানের সেই ছেলেবেলার মাম্মাম ডাক ... তার গলার মৃদু বিষাদ-ভরা অমৃতার মধ্যে কি যেন করে। ব্যাকুল গলায় বলে ওঠেন, 'আর তুই? তুই কেমন আছিস বুলান?'

'আমি ঠিক আছি মা। শনিবার দেখা হবে।' ফোন রেখে দেয় বুলান। সরস্বতী ডাকতে আসে খাবার জন্য। খাবার ঘরের দিকে যেতে যেতে অমৃতা ভাবতে থাকেন, তবে কি ওটা গুজব, না সত্যি! বুলান কি ব্যথা পেয়েছে খুব? কতটা দাম দিতে হয়েছে বুলানকে বা রশ্মিকে, সেই 'বিচ্ছেদে'র দরজায় এসে দাঁড়ানো 'বিবাহ'কে মেরামত করে তুলতে? হঠাৎ, বিষাদের স্রোত ঠেলে মনের মধ্যে অন্য এক ভাবনার বুড়বুড়ি ওঠে। ভাজা ফুলকপির টুকরো দু'আঙুলে তুলে মুখে পুরতে পুরতে অমৃতা বিষণ্ণ হাসি হাসেন। আঙুল-তোলা সমাজ তবে এবারও বলার সুযোগ পেল না, 'অমৃতার সেই ছেলেটা নাকি শেষে এই বেরল!'

প্রবন্ধ

আত্মঅভিজ্ঞানের বিবর্তন : আজকের মালয়ালাম কবিতা

কে. সচ্চিদানন্দন

অনুবাদ – পবিত্র মুখোপাধ্যায়

মানবজীবনের একটি প্রেরণাদায়ক প্রবণতা হল স্থান ও কালের অভিজ্ঞতা অর্জন, নিজের ও অন্যের বিষয়ে জ্ঞান আহরণ, জীবনের সম্ভাবনা ও নশ্বরতা সম্বন্ধে বোধে পৌঁছনো, এই সব ক্ষেত্রেই পৃথিবীর সমগ্র নারী পুরুষের জীবন সম্পৃক্ত। এইসব অভিজ্ঞতার স্বরূপ উপলব্ধিই 'আধুনিকতা'। তা-ই আধুনিক যার সাহায্যে আমরা নিজেকে খুঁজে পাই, সেই পরিবেশ যেখানে থাকে নানা রোমাঞ্চকর কাজের প্রতিশ্রুতি, যা প্রাণে সঞ্চার করে শক্তি ও আনন্দ, করে সমৃদ্ধ, এনে দেয় বদলে যাবার অনুপ্রেরণা, যে অভিজ্ঞতা পারে পৃথিবীকেও বদলে দিতে এবং একই সঙ্গে বা একই সময়ে আমাদের অস্তিত্বকে সন্ত্রস্ত করতে পারে। আমরা যা জানি, বা জেনেছি, সবকিছুকেই ডিঙিয়ে যেতে সাহায্য করে এই অর্জিত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, এমনকী সে পারে ভৌগোলিক সীমারেখাকেও ছিঁড়ে খুঁড়ে দিতে। আধুনিক চেতনা আমাদের জাতিসত্তার সীমাপ্রসৃতি, শ্রেণী-চেতনা, জাতীয়তাবোধ, ধর্ম ও আদর্শের গণ্ডিকেও পার করে দিতে পারে, ফলত এই চেতনা পারে মানবজাতিকে সংহতিতে বেঁধে দিতে। আবার একে বলা যায় বিপরীতের ঐক্য বা সংহতি, অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান। অনৈক্যের স্থায়ী বদ্ধ জলাভূমিতে নতুন ভাবনার স্রোত বইয়ে দিতে পারে; সংগ্রাম ও সংঘর্ষে, সন্দেহ ও ক্রোধকেও জাগিয়ে দিতে পারে। আধুনিক হওয়ার অর্থ হল সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা। মার্কস যাকে বলেছেন — all that is solid melts into air.

মার্সাল বারম্যান এ ভাবেই আধুনিকতার আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাটিকে তাঁর দিক নিরূপক সৃষ্টি 'সমস্ত সান্দ্রর দ্রবীভবন' (All that is solid melts into air – Verso, London 1983) -এ গ্রন্থিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। আধুনিক জীবনযাপনে যে বিপুল ঝঞ্ঝাবর্তের সৃষ্টি হয়েছে তার কারণগুলো বারম্যান আহরণ করেছেন নানা ক্ষেত্র থেকে।

এদের মধ্যে রয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলি, যা ব্রহ্মাণ্ড ও তার প্রাণীজগতের অবস্থান সম্পর্কে যে ধারণা আমাদের ছিল, তাতে নিয়ে এসেছে আমূল পরিবর্তন। সমস্ত উৎপাদন পদ্ধতির শিল্পায়ন, যার ফলে নতুন একটি পার্শ্বিকতার সৃষ্টি হয়ে ক্ষমতা ও সংগ্রামের নবতর ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়া। এ ছাড়াও রয়েছে বিধ্বংসী নগরায়ণ, জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, জনসংযোগের ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ যা ভিন্ন ভিন্ন সমাজকে একসূত্রে গ্রথিত করে, ক্ষমতাবান ও ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্র নির্ভর সরকারসমূহ, এক পুঁজিনির্ভর আন্তর্জাতিক বাজারের সম্প্রসারণ এবং মানুষের নিরন্তর আন্দোলন কায়েমি স্বার্থবাজদের বিরুদ্ধে যাতে তারা নিজেদের জীবনকে ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণের কিছু অধিকার পায়।

এই আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে একইসঙ্গে ব্যক্তিগত ও বস্তুগতভাবে নানা ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যানধারণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করেছে। এই সবকেই সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে 'আধুনিকীকরণ' যা মানুষের শাশ্বত ক্রমোন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি পর্যায়। ভারতীয় জনমানসকে এই সব অভিজ্ঞতার আঘাত অনেক দেরিতে স্পর্শ করেছে। কবিতার ক্ষেত্রে এর অনুপ্রবেশ ছিল সশঙ্ক ও অবচেতন। গান্ধীযুগের সমাপ্তি, নবতর রাজনীতিতে জনগণের ক্রমবর্ধমান আশাভঙ্গ, সমস্ত দিক থেকে নৈতিকতার অধঃপতন, স্টালিন নির্দেশিত সাম্যবাদের প্রতি মানুষের আস্থার বিনষ্টি, গ্রামগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় বৃদ্ধি পাওয়া, নগরকেন্দ্রিক জীবন মানুষের কাছে দুঃসহ হয়ে ওঠা, ঔপনিবেশিক ধাঁচের শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে উত্তেজনার বাতাবরণ সৃষ্টি, ধর্ম এবং আদর্শে মানুষের আস্থার অভাব ও ফলস্বরূপ ব্যক্তিপরিচয় ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আসার সংকেত — ইত্যাদির সম্মিলিত ফল হিসাবে কবির মনোজগতে পৃথিবী সম্পর্কে এক নতুন চেতনা রূপ পরিগ্রহণ করতে থাকে, তার সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যের চলতি হাওয়া, বিশেষত মহাযুদ্ধ মধ্যবর্তী ও পরবর্তী বছরগুলিতে, যার পরেই আসে পেপারব্যাক বিপ্লব— কবিদের উৎসাহিত করে তোলে নতুন একটি আত্মউন্মেষের যোগ্য ভাষার সন্ধানে ব্যাপৃত হতে, যা দিয়ে তারা পরিবর্তিত বৌদ্ধিক অবস্থানটিকে যথার্থভাবে প্রকাশ করতে সমর্থ হবে।

এমন নয় যে ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষার ক্ষেত্রেই ঘটনাটি একইভাবে একই সময়ে সংঘটিত হয়েছে।

ঐতিহ্যবিচ্যুত হয়ে যে-সংস্কৃতিগুলো প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার

হয়ে গেল, সেগুলি ছিল মূলত সেই সংস্কৃতি যাদের মূল প্রোথিত ছিল জাতীয় চেতনাকেন্দ্রিক দর্শন ও মননে। এই কারণে এইসব সংস্কৃতিভুক্ত অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তিদের ভোগ করতে হল সবচাইতে নিষ্ঠুর আঘাত, যখন প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ তার সভ্যতার নির্বিশেষ রূপটি দিয়ে তাদের সপ্রাণ আন্তর্জগতটিকে ধ্বংস করে দিল। আধুনিক ভারতীয় কবিতায় এই প্রথম সূচনা হল মৌলিক আত্মঅভিজ্ঞানের অনুসন্ধান, যখন থেকে আমরা আধুনিক কবিদের পূর্বসূরিদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এলাম।

১

মালয়ালাম সাহিত্যের প্রথম পর্যায়, ভারতীয় অন্যান্য ভাষার মতোই শুরু হয়েছিল ব্যক্তিসত্তার অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে। মালয়ালাম সাহিত্যের প্রধান ঐতিহ্য সেই যোড়শ শতকের এজুথাককানের মহাকাব্য অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে রেনেসাঁসের কবি আসান (১৮৭৩-১৯২৪) পর্যন্ত প্রসারিত। ব্যক্তি-অস্তিত্বের সমস্যা তখনও এমনভাবে দেখা দেয়নি। ব্যক্তিক সত্তাকে তখন মনে করা হত বৈশ্বিকসত্তার অংশ অথবা সমাজসত্তার অঙ্গীভূত রূপে। তখন কবিতা ছিল অধ্যাত্মবাদ বা সামাজিক ক্রিয়ার উদাহরণ। ঈশ্বর রয়েছেন স্বর্গে, কবি তাঁর প্রতিনিধি এই পৃথিবীতে। পৃথিবী জৈবপদার্থের সন্নিবেশ মাত্র, সঙ্গতিময় এবং অর্থপূর্ণ। এই ধারণা আসান-পরবর্তী কবি ভিল্লোপিল্লি এবং এডাসেরি পর্যন্ত সত্য হয়ে বিরাজ করেছে। চাঙ্গালপুজা পিল্লাইয়ের মতন কবি (১৯১১-১৯৪৮) ঈশ্বরের সৃষ্ট জগৎ নিয়ে তেমন ভাবিত ছিলেন না। তিনি অনুভব করতেন যে পৃথিবী একটা প্রহেলিকামাত্র এবং মানুষের অস্তিত্বও অর্থহীন। অমঙ্গল, বাজে বিশ্বাস, নশ্বরতা, বিযুক্তি, প্রভৃতি দ্বারা তাঁর কবিতা অশুভ সময়ের তত্ত্ববিদ্যার রূপ নিয়েছিল যা তাঁর মৃত্যুর পরের এক দশকের মধ্যেই আধুনিক মনকে আক্রমণ করেছিল। তাঁর দীর্ঘ আত্মজীবনীমূলক কবিতা 'শয়তানের সঙ্গীত' ধরতে চেয়েছিল নাস্তিক্যবাদী এবং 'স্বয়ম্ভু' মানসিকতার দ্বান্দ্বিকতাকে, অসম তালের ভঙ্গি ও নারকীয় চিত্রকল্পের সাহায্যে। প্রথম পর্যায়ের আধুনিকতার অভিজ্ঞতা অর্জিত হল, ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতনতা, এবং বেরন হল প্রকৃত আত্ম-আবিষ্কারের সন্ধানে। ওই সময়ের বেশির ভাগ কবিই পল্লিজীবনের সারল্যের দিন পার হয়ে হৃদয়হীন নাগরিক পরিবেশে পরিযায়ী পাখির মতন হয়ে রইলেন, কিন্তু শৈশবের সবুজস্মৃতি হৃদয়ে বাঁধিয়ে রাখলেন। তাঁদের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য শহরের অসংখ্যের ভিড়ে হারিয়ে গেল। শহরের আকাশে ভাসমান মেঘের মতন অবস্থান করলেন তাঁরা, হয়ে রইলেন কেন্দ্রচ্যুত। আয়াক্কার পানিকর, এ এন কাকাড় এবং মাধবন আয়াপ্পান, সবার কাছে বীরচরিত্রগুলি মৃত বলে পরিগণিত হল। আয়াক্কার পানিকরের কুরুক্ষেত্রম (১৯৩০) কাব্যকে বলা হয় যে সেখানেই এই খণ্ডছিন্ন পৃথিবীর প্রকৃত ছবি চিত্রিত হয়েছে। ওই কবিতাটি 'গীতা' থেকেই বিষয়বস্তু বেছে নিয়েছে।

গীতার শুরুতে আছে-

> হে সঞ্জয়, বলো, আমার পুত্রগণ এবং
> পাণ্ডুপুত্রগণ যুদ্ধের জন্যে কুরুক্ষেত্রে সমবেত
> হয়ে কি করছে।

এই পুরনো প্রশ্নটিই মোহমুক্ত এক অন্ধ মানুষের চিরাচরিত প্রস্তাবনার আকারে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের মানবীয় উৎকণ্ঠারূপে উপস্থাপিত হয়েছে পানিকরের এই কবিতায়।

কবিতাটির প্রথম পর্বে অর্জুনের মানসিক যন্ত্রণাই যেন আধুনিক মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করেছে। হ্যামলেটের ভয়তাড়িত চিত্ত-চাঞ্চল্য প্রকাশের মতোই এখানেও অর্জুন বলছেন, 'আমি কে? কে আমার বন্ধু, কেই বা আমার শত্রু পৃথিবীতে? আমার অদৃষ্টেই বা কী হবে?'

এই সব প্রশ্নের ভিতর, দ্বিতীয় স্তরের প্রশ্ন ইংগিত করছে যে দার্শনিক চিন্তাধারায় এর উত্তর নেই।

তৃতীয় পর্যায়টি প্রচলিত নৈতিক মানদণ্ডকে জড়তাগ্রস্ত, অবাস্তব বলে পরিত্যাগ করেছে অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনা-প্রতিভার সমন্বয়ের মাধ্যমে। চতুর্থ প্রশ্নটির প্রকাশে আমরা দেখি অস্তিত্বের ছায়াময়তাকে বুঝে নিতে অতিপ্রাকৃতের কাছে আত্মসমর্পণ, যা আমাদের অলক্ষেই থেকে যায়। পঞ্চম পর্যায়ে এমনকী বিস্ময়ের জগৎকেও ত্যাগ করার প্রয়াস দেখি। উত্তেজনায় ভরা আত্মমগ্ন গীতিকবিতাটিতে শেষ পর্যন্ত আনন্দ অনুভব করা যায় তখনই যখন আত্মমগ্ন ব্যক্তিমানসের সান্ত্বনার স্থল খুঁজে পাই। বাজারের সেই চিত্রটি যেখানে 'নিজেদের আমরা কিনছি ও বেচছি'; যেখানে 'হাড় শুষে খাচ্ছে মজ্জাও', যেখানে 'চামড়া লেগে আছে হাড়ে' ইত্যাদি মৌলকেন্দ্রস্বরূপ দেখানো হয়েছে কবিতাটিতে। এটা শুধুই কবির সেই রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে শয়তানিতে ভরা প্রকাশভঙ্গি মাত্র নয়, এটা হল ধনতান্ত্রিক পৃথিবীর নিষ্ঠুর মরীচিকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, যেখানে মানুষ পরিণত হয় শুধু বস্তুতে, এবং মানসিক চেতনাকে উদবেগে, বুদ্ধিনাশ করে হটিয়ে দিচ্ছে। আত্মব্যবচ্ছেদের আকস্মিক তীব্র যন্ত্রণাবোধ কবির শ্রমবিযুক্ত মনের অবস্থাতে স্বাভাবিক ক্রিয়া, যার জন্ম হয়েছে বিশ্বাসের প্রগাঢ়তার বদলে পাথুরে যুগের উপস্থিতি অনুভব করে, যেখানে পুরোহিতের আদেশ অন্ধকারের পোশাকে ঢাকা।

গীতা এই চলমান সময়ের দাবি মেটাতে ব্যর্থ; চাণক্যের বুদ্ধিকে একটি কুশও উপহাস করে, ঈশ্বর যান ঘুমোতে, আদর্শগুলো যুদ্ধ আর অশ্রুর ইতর কর্কশ শব্দ বলে মনে হয়।

আয়াপপা পানিকরের পুরুরবা, প্রমিথিউসের মতন এক আর্ত আত্মা, যে চাইছে আগের মতোই স্বার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ গড়ে তুলতে,

উর্বশীর সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিত্বের সাহায্যে, কিন্তু এখন সে গন্ধমাদনে হামাগুড়ি দিচ্ছে। পুরুরবা হল আধুনিক যুগের মানুষের এক বিচ্ছিন্ন সত্তার প্রতিভূ, যে তার হারানো স্বর্গ খুঁজছে, যে স্বর্গ মানুষ ও প্রকৃতিকে নির্দেশ করে। 'মৃত্যুর প্রতি কবিতা' নামক কবিতাটিতে কবি ভবিষ্যতের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন ভূতের মতন। 'মৃতরাই সাধুসন্ত, আর পৃথিবীটা একটা শূন্যগর্ভ কিংবদন্তি মাত্র।'

ইতিহাস হল 'শুধু বেড়াল আর ইঁদুরের প্রাণ বাঁচানোর খেলা।' আগ্রাসী ইতিহাসের গল্পগাছায় শুধু শীতল মৃত্যুই আমাদের সান্ত্বনা উপহার দেয়। কবি সীতার মতোই পৃথিবীমায়ের কাছে আশ্রয় চান। কবির শুধু আশা, শেষ পর্যন্ত তাঁর বুকের উপর রাবণের নাচ, সীতাকে প্রাকৃতিক সুড়ঙ্গ থেকে তুলে আনবে।

পানিকর তাঁর 'বংশাবলী' কবিতায় আত্মপরিচয় লাভের জন্য নিজের বংশাবলীর ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। কিন্তু তিনি দেখেছেন যে তাঁর কীর্তিমান পূর্বপুরুষেরা বর্তমান প্রজন্মের জন্য সামান্য গৌরবই রেখে গেছেন। 'তারা পাশের বাড়ির ক্ষুধার্ত মেয়েটির পেট ভরাতে পারে না।' 'মানুষের আত্মাকে কতকগুলো নিরর্থক শ্লোগান দিয়ে ভাজা ভাজা করে চলেছে।' 'দিন রাত্তির' কবিতায় কবি মানুষের আত্মাকে আহবান করা 'ব্যর্থ প্রচেষ্টা' বলে এবং অতিসাধারণ কৌশল বলে মনে করেছেন।

এই ধরনের ভাঙাচোরা অনস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে এন. এন পানিকরের কবিতা 'পার্কের ভিতরে' এবং '১৯৬৩' কবিতায়। 'পার্কের ভিতরে' কবিতায় কবি লক্ষ করছেন এক যক্ষ বেতালের পিঠে চড়ে তার প্রাসাদে প্রবেশ করছে যা কিছু সুন্দর তার রক্ত শুষে খেয়ে। কবি দেখতে পেলেন যে তাঁর সত্তা একটি ছিন্ন ফুলের মতন মাটিতে পড়ে আছে, আর জনতা তাকে পায়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে, যখন শহরে সন্ধ্যা রঙিন বৃদ্ধা বারাঙ্গনার মতন নেমে আসছে। '১৯৬৩' কবিতায় তিনি পেছনের দিকে চেয়ে অনুসন্ধান করতে লাগলেন স্রোতের স্বচ্ছ জলে তাঁর অস্তিত্বের মূলকে।

রবি বর্মা নিজেকে কালিদাসের 'মেঘসন্দেশ' কাব্যের নির্বাসিত যক্ষের সঙ্গে শনাক্ত করেছেন তাঁর 'শহরে এক যক্ষ' কবিতায়। 'নিজের জন্যে' কবিতায় তাঁর স্বাতন্ত্র এ ভাবে আবিষ্কার করেছেন: 'যখন সব বাড়িগুলি পশ্চিমমুখের/ আমারটা পূবের দিকে মুখ করে;/ যখন সব ছেলেদের একজন করে চমৎকার মা রয়েছে/ আমার সেখানে অন্ধকার ও অসুন্দর বিরাজ করছে/ যখন সবাই হাঁটছে দ্রুততালে/ আমি সেখানে আলস্যমন্থর/ যখন সবাই হাসিতে ফেটে পড়ছে/ আমি সেখানে নিশ্চিতভাবে দুঃখে রয়েছি।' বিষ্ণু নারায়ণ নাম্বুদিরি খুব শঙ্কিত হয়ে পড়ছেন যখন দেখতে পেলেন একটি উৎসব মিছিল তাঁর শিল্পী বন্ধু পরিচালনা করছেন, যাদের ঘাড়ে মাথাই নেই। তিনি আড়াল থেকে শুনতে পেলেন, মিছিলের নেতারা একে অন্যকে চুপিচুপি বলছেন, 'তোমার মাথাটা কোথায়?' তার পর কবি নিজেই ছুটে গেলেন আয়নার সামনে, দেখে অত্যন্ত আঘাত পেলেন যে সার্টের কলারের ওপর তাঁর মাথাটাও নেই। (মাথাটা কোথায়?)

এম. এন পালুরের কাছে ঈশ্বর হলেন সেই সুলতান যিনি হাড়শুকনো মানুষের জীবন পাইপে ঠেঁসে ধূমপান করছেন (কাপুরুষ!) তিনি নিজেকে একজন বিদঘুটে কবিরূপে শনাক্ত করলেন, যিনি ধূমকেতু আর উড়োজাহাজের এনাসিন সেবন করে জীবন কাটাচ্ছেন। (বিমানঘাটিতে একজন কবি।)

মাধবন আয়াপ্পাথ শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ভাবছেন- 'কে আমার চোখের জল চুরি করে সুদৃশ্য বাক্সে জমিয়ে রেখেছে?' (আত্মজীবনীমূলক ভাবনা)। তিনি নিজে দোদুল্যমান নিঃসঙ্গ মানুষ, যে মরাসাপের পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে ঘড়ির কাঁটাকে পেছনে ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন (বিবাহবাসরে)।

ষাটের দশকের কবিরা সময়ের চরিত্র রূপ দেবার জন্য নতুন ভাষারীতি আনলেন। 'কুরুক্ষেত্রম' মিশ্র পর্বে রচিত গদ্যছন্দের কাব্য যেখানে চমকে দেবার মতন চিত্রকল্প ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন দোলনায় শব শুয়ে আছে, যেন জীবনে প্রবেশের জন্য অপেক্ষমাণ। আবার এখানে পরিহাস বা বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিকে একটা প্রধান স্টাইলের শৈল্পিক চেহারা দেওয়া হয়েছে। যেমন এই লাইনটিতে বলা হয়েছে-

'বৈদিক পাণ্ডিত্যকে কে রাঁধবে?

মশলা দিয়ে আমাদেরই কি ভাজা হচ্ছে?'

অথবা 'যে নতুন স্বপ্নের কথা ভাবি আমরা তা কি কোনও দিন সত্যে পরিণত হবে? বিশ্বব্যাঙ্ক কি আসল সত্য জানে?'

মাধবন আয়াপ্পাথ শুধু ছন্দকে মিশ্রণে নিয়ে যাননি, গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন ইংরেজি ও সংস্কৃত উদ্ধৃতির ব্যবহারে। এম গোবিন্দন বলিষ্ঠ ছন্দ ব্যবহার করেছেন, অনুপ্রাসনির্ভর বাক্যগঠন করেছেন, মালয়ালাম সারবান সংক্ষিপ্ত প্রবাদ এবং শিশুদের ছড়ার প্রয়োগ করেছেন অর্থময় এবং অর্থহীন বিষয়ের অদ্ভুত সীমানাকে অতিক্রম করবার জন্য। একটি দৃষ্টান্ত, 'একটি ফেলে যাওয়া চিতাবাঘ এক আঁটি ঘাস খেয়েছে।' ইত্যাদি।

শব্দ নিয়ে যখন তখন খেলেছেন তাঁরা। যেমন পানিকরের 'চোর' কবিতা; তাতে রয়েছে 'আমি যখন শুধুমাত্র চোরই ছিলাম তখন তুমি কি আমাকে দস্যু বলে সম্বোধন করোনি?' অথবা 'ইন্দন' কবিতায় এ ভাবে বলা হয়েছে, 'আমাদের পিতৃব্য ইন্দন ডান পা দিয়ে বাঁ পাকে ঘষতেন, আবার বাঁ পথা দিয়ে ডান পাকে, এবং তার বীর ....।' ইন্দন হয়ত একজন ভারতীয়, যার নামের আদ্যক্ষর অবলুপ্ত বা যে পরিচয়হীন; ডান ও বাঁ পায়ের ব্যবহারের উল্লেখ হয়ত সমকালীন রাজনীতির ছায়া। কুঞ্জুন্নির লিমেরিক

জাতীয় কবিতা আমাদের সময়ের ফাঁপা মানুষকে নিয়ে হেসেছে।

আমাকে একটা দেশলাই দাও/ একটা বাক্স দাও/
একটা বিড়ি দাও, একটা আঙুল, একটা ঠোঁট
দাও/ আমি ধোঁয়া ছাড়বার আনন্দ পাই।

অথবা

আমার ছেলে ইংরেজি শিখবে জন্ম মাত্রই,
আমি ইংল্যান্ডে আমার স্ত্রীর সন্তান
প্রসবের ব্যবস্থা করব।

সত্তরের দশকে তলে তলে একটি বেগবান পরিবর্তনের ধারা বইতে লাগল। কারণ সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়ের একটি নিজস্বতা অর্জন সামনে চলে এল কিন্তু শেকড়ের অনুসন্ধান চলতে লাগল। রাজনীতিতে এল স্পর্শকাতরতা যা পরিবেশ-পরিস্থিতি গড়ে তুলল, পেছনে কাজ করল ভারতে নতুন এক বামপন্থী শক্তির উত্থান, যেমন মহারাষ্ট্রে নিচুতলার মানুষের আত্মজাগরণ, যেমন দলিত-আন্দোলন, কর্ণাটকের বান্দা আন্দোলন, ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী ও নারী জাগরণের আন্দোলন, মূলাভিমুখী রাজনৈতিক উত্থান আফ্রিকায় লাতিন আমেরিকার মতো দেশগুলোতে : তা ছাড়া কবিতায় রাজনৈতিক চেতনার সফল প্রয়োগ, বিশেষ করে আধুনিক কবিতায়। মায়াকোভস্কি, লুই আরাগঁ, পল এ্যলুয়ার, পাবলো নেরুদা, বেরটোলট ব্রেখট, নাজিম হিকমত, সেজার ভালেহো, নিকোলাস গিলেন, লিওপান্ড সেন্ঘার প্রভৃতি কবির রাজনৈতিক চেতনাপূর্ণ কবিতা মালয়ালাম ভাষায় এই দশকজুড়ে অনুবাদের জোয়ার বইয়ে দিল। আরও পরিষ্কার করে বলা ভাল, তৃতীয় দুনিয়ার কবিতা বেশি অনুপ্রাণিত করল, নিকানো পারার 'অ্যান্টি পোয়েট্রি', নেরুদার ইমপিওর পোয়েট্রির চেতনা বিশেষ ভাবে। আমেরিকার বিটল্ এবং ব্রিটেনের গুপ্ত কবির দল পরোক্ষে প্রেরণা দিল।

এটাকে কোনও দুর্ঘটনা বলে মনে করা যায় না, কবি কে.জি. শংকর পিল্লাই-এর নতুন করে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরুর কথা, বেঙ্গল (১৯৭২) কাব্য-প্রকাশ পেল। যাকে বাতিল বলে মনে করা হত, সেই ভয়ংকর শ্রেণীসংগ্রামের প্রতীকী কবিতার আবির্ভাব হল তখন। কবিতাটি ধৃতরাষ্ট্রের স্বগত কথনের ভঙ্গিতে রচিত। অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র যিনি প্রভূত্ববাদী শ্রেণীর প্রতিনিধি স্বরূপ, একটি আসন্ন সিংহাসনচ্যুতির দুঃস্বপ্ন দেখে তার দ্বারা তাড়িত হলেন।

এই খরগ্রীষ্ম অদ্ভুত এক ভয়ে ভরে দিচ্ছে আমার মন
যদিও ঈষৎ ঠাণ্ডা বাতাসও বইছে,
শুকনো পাতারা গর্জন করবে,
ঝঞ্ঝা উঠবে অকস্মাৎ, ধবংস করে দেবে
সেই সব পাহাড় যারা
পথ রোধ করে আছে।

মহারাজ অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছেন, কারণ তাঁর জ্ঞাতিকুটুম্বরা রয়েছেন বাংলায়, বাংলা এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে; সেখান থেকে কোনও সান্ত্বনাদায়ক খবর আসছে না। পবিত্র গঙ্গা থেকে জেলেদের জালে উঠে আসা সেই সম্রাটের কাটামুন্ডুটির মতন তার ভাগ্যও হতে পারে ভেবে তিনি ভীত। এই ভীষণ গ্রীষ্মের সূর্য যেন তার শবদাহের আয়োজন করেছে, মনে হয়।

যাকে উদ্দেশ্ করে এই আত্মকথন, তিনি সেই সঞ্জয়, বুদ্ধিজীবী, যিনি নতুন যুগের আগমনবার্তা অনুভব করতে পেরেছিলেন আগেভাগেই।

এই নির্মম সত্যই অন্ধরাজকে বিদ্ধ করে : আমার দৃষ্টি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে, এখন থেকে আমি কেবলমাত্র ওই কামরার অন্ধকার ভেতরটা এবং তার পাশের জানলা দিয়ে দেখা যায় যে মৃত্যু উপত্যকার হাতছানি, ক্ষীণ স্রোতস্বিনী ও ভেঁড়ার পাল, সব আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে, শুধু মৃতের বিস্ফারিত চোখ অশোক চক্রের মতো। কেবল আমার সন্তান হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে আছে, আর ওই গান্ধীটুপির বাঁকানো পিছনের অংশ। বাঁদিকের জানালা দিয়ে ওই দেখা যায় সমুদ্রের পরিত্যক্ত বেলাভূমি যার উপর ইতস্তত ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মৃতদেহ। ওই উপসাগর ও আলোকস্তম্ভ, যেখানে আর কোনও প্রহরী নেই জেগে, কেবলমাত্র সেই প্রাচীন নাবিক রয়েছে বিনিদ্র। আছে উটগুলির যন্ত্রণাদায়ক উপস্থিতি। শতাব্দীর ধুলি গহবর থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলে উঠে আসছেন খোলা ঝকমকে তলোয়ার হাতে।

আগামীদিনের কবিতাকে দিশা দেখাবার রসদ রয়েছে 'বাংলায়'। কুরুক্ষেত্রের ধূ ধূ প্রান্তরে দেখছি— মৃত্যু-সহচরী এক অন্ধগায়িকা, যার গান সঞ্জয়ের কথায় বেজে উঠছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের তরুণ কবিদের কবিতাকে বিদ্যুৎঝলকের মতো জ্বলে উঠতে করছে অনুপ্রাণিত, পূর্বসূরিদের পেছনে ফেলে এগোচ্ছে তারা। 'বাংলা' আগামী দিনের কবিদের পথের দিশারী হবে, কারণ, কবিতাটির নাটকীয়তা, বর্ণনাধর্মিতা, ছন্দচর্চা এবং যতিপাত-রীতি, রাজনীতি ও ইতিহাসের কাব্যিক মিশ্রণ, অন্ধকারের ভীতি প্রত্যক্ষ করে তুলেছে।

শংকর পিল্লাইয়ের 'আনন্দন' কাব্যগ্রন্থ, মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছিল। 'নৈঃশব্দ' গ্রন্থে গৃহস্থ জীবনের নিঃশব্দ বিস্ময়ের প্রতিফলন ঘটেছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী প্রজন্মের যে ঘৃণা ও ক্রোধ নিষ্প্রভ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও ধিকধিক করে জ্বলছিল, তার বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণা ও উষ্মা প্রকাশ পেয়েছে এই কাব্যে। কবি কাদম্মনিত্তা রামকৃষ্ণকালের কবিতা, 'শেষ ছবি', কিরাতীকুরাতীর গল্প প্রভৃতি কবিতায় ভারতীয় জীবনের প্রান্তিক মানুষ, যারা উন্নয়নের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত

রয়েছে, তাদের হতাশা, ক্ষোভ ইত্যাদি ভাষা পেয়েছে। 'আমার ছেলেকে' কবিতায় কবি তাঁর সন্তানকে সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠার জন্য আবেদন জানিয়ে বলছেন, সে যেন তার বাবাকেও এই আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধনের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে চন্দন গাছের মতন পাথর ফাটিয়ে ঊর্ধ্বমুখে উঠতে সাহায্য করে। এ রকম আর একটি কবিতায় কবি একজন তিনি দুধের শিশুদের উদ্দেশে বলছেন, বিষাক্ত পুতনার ঘেরাটোপে যেন তারা আবদ্ধ না হয়। শাকাৎসুরা আজও বেঁচে আছে হাজার চক্রের মধ্যে, তার থেকে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে আর কালিন্দীর জল তাতে বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে।

আতুর রবিবর্মা 'transmutation-এ স্বপ্ন দেখেছে, এক মৃত পরিচারিকা ভীষণভাবে বদলে গিয়ে প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠেছে। সে ছিল একটা মাটির ঢেলার মতন, ঝাঁটার কাঠি, বা পুতিগন্ধময় ঘরপোছার ন্যাতার মতন। কবি আকুলভাবে চেয়েছেন, তাকে মুক্ত করতে ওই জীবন থেকে আর ক্ষুধার্ত বাঘের সঙ্গে তাকে বিঁধে দিতে। শিকারের চারপাশে ঘুরে বেড়ানো ক্ষুধার্ত নেকড়ের গলায়, বেঁধে দিতে চান তার মেয়ের রসনাকে।

'তার খিদে কি আমি বনের আগুনে রাখতে পারি/ যে আগুন পরিব্যপ্ত হয়ে শহর ও সম্পদকে জ্বালিয়ে দেয়, আর সেই সঙ্গে তার যন্ত্রণা/পড়ন্ত আকাশ থেকে পড়ে টপটপ করে পুঁজ আর রক্ত/আর আমি কি পারি তার অভিশাপে সূর্যকে প্রেরণা দিতে যে সে যেন উর্বরা শস্যখেতকে ঝলসে দেয়?'

যাই হোক, কবি এম. গোবিন্দন তাদের তিরস্কার করেছেন যারা 'বুদ্ধ'কে নির্বাসন দিয়ে মাও-এর রেডবুক উঁচুতে তুলে ধরেছেন। 'কুরুক্ষেত্রে ফিরে যাচ্ছি', 'জীবণে মরণে' প্রভৃতি কবিতায় তিনি স্বপ্ন দেখেছেন খাঁটি দেশীয় পদ্ধতিতে বিপ্লবের সম্ভাবনার 'গরল সঙ্গীত বিদায়' প্রভৃতি কবিতায় তিনি করেছেন বিদ্রূপে বিদ্ধ করার এক স্বদেশি শক্তিশালী প্রয়াস। 'বিদায়' কবিতায় দেশের মানুষ গান্ধীকে 'এয়ার ইন্ডিয়ার' প্যাকেটে পুরে এমন ভাবে বিদায় জানিয়েছেন, যাতে তিনি কোনওদিন শহিদ হয়ে দেশে ফিরে আসতে না পারেন।

১৯৭৫-এর জুলাই-এ আমাদের দেশে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ঘোষিত হবার মাঝখানেই মালয়ালাম সাহিত্যের আধুনিক কবিতায় এমন এক প্রতিরোধী রচনাশৈলীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে, যা যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে গণ্য হতে পারে। সত্তরের দশকে মালয়ালাম কবিতা যখন ব্যক্তিগত সংস্কার থেকে মুক্ত হতে যাচ্ছে, তখন থেকেই গীতিকবিতা থেকে নাটকীয় চরিত্র অর্জনের প্রবণতা প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে। ঋজু ও স্বচ্ছ গদ্য ভঙ্গিই তখন স্বাভাবিক ও উপযুক্ত মাধ্যমরূপে গৃহীত হল। এই সময়ে কবিতা আলংকারিক রীতি ও বিদ্রূপাত্মক চরিত্র থেকে বাইবেলীয় সংলাপ ধর্মিতা ও গদ্যভঙ্গিতে চর্চিত হতে শুরু করল। ব্যাজস্তুতিতেও রাজনৈতিক বিষয় উঠে এল। সেই সময়ে বিরুদ্ধ প্রকাশের দিনগুলোতে এম. গোবিন্দন প্রার্থনা করছেন ঈশ্বরের কাছে, যদি কেউ তাকে 'শব্দ' এবং 'মাথা' এ দুটোর মধ্যে একটাকে পছন্দ করতে নির্দেশ দেয় তবে ঈশ্বর যেন তাকে নরকে স্থান দেন। কবি আয়াপ্পা পানিক্কার, সেই জরুরি দিনগুলির সময়কালীন প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রকল্পগুলোকে গাছের শরীর থেকে বেরনো কটু তরল বিষের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

হে আমার প্রিয় জননী,
তুমি আমাকে মেরো না
আমি এই তরলরস পান করব
সবুজ শাদা ও লালরঙের।

তাঁর 'প্যাসেজ টু আমেরিকা' কবিতায় মহাদেশের মানচিত্রকে তুলনা করেছেন হাতের তালুর সঙ্গে, যেখানে আছে পাহাড়শ্রেণীর রেখাঙ্কন, নেই হৃদয়ের মানচিত্র। আতুর রবিবর্মা তাঁর মহাবিদ্যালয়কে দেখেছেন ক্যান্সারে ক্ষয়িষ্ণু শরীরের মতো যে শরীরকে শল্যচিকিৎসকও রোগ সংক্রমণ থেকে মুক্ত করতে পারবে না।

আধুনিক মালয়ালাম কবিতার তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে সামাজিক-রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অন্বেষণ। এই পর্যায়ে কবিতা নিল একটি নতুন বাঁক, যেখানে আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য এবং ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য রূপ পেল নতুন ভাবে। আঞ্চলিক ভাষা-রীতি হয়ে উঠল প্রভাবশালী। 'একটি লোক শহরে কাজ করবার জন্য গ্রামের আম জাম গাছ ও চাঁদের আলো ছেড়ে চলে যায়। তারপরে সে যে হোটেলে কাজ করত তার খদ্দেরদের রসনাতৃপ্ত করবার জন্য নানারকম খাবার বানিয়ে বেশ কিছু বছর কাটিয়ে দেয়। কিন্তু তার মনকে তার পল্লির সৌন্দর্য মাঝে মাঝেই টানতে থাকে, যদিও হোটেলের রান্নাঘরের বিশ্রীগন্ধ, বাসনপত্তরের ঠনঠন আওয়াজ তার আবিষ্ট-অনুভূতিকে গুলিয়ে দিতে থাকে। একদিন, সেই হোটেলের মালিক তার চেয়ারে বসে থাকা অবস্থাতেই মারা গেল। এই ঘটনায় অভ্যস্ত জগৎটা হারিয়ে ফেলল তার প্রাচীন সৌগন্ধ। পুরনো খদ্দেররা হোটেলে আসা বন্ধ করে দিল। নতুন নতুন খদ্দের আসতে লাগল, এল নতুন পাচক ও ভৃত্য, এল খাদ্যের নতুন তালিকা। ফলে, লোকটি মানাতে না পেরে, তিরিশ বছর পর ফিরে এল নিজের গ্রামে। এসে দেখল, তার পরিচিত আত্মীয়, প্রতিবেশী বা বন্ধুরা আর নেই। সেই পুরনো গাছপালা পশুপাখি তাকে চিনতে পারল না। নির্জন পাহাড়, শুকনো নদী আর স্থির শান্ত তারাগুলি এতদিনে তাকে ভুলেই গেছে। সে তখন সে কী হারিয়ে ফেলেছে সেই সব মনে করবার চেষ্টা করে। আর তখনই সে শুনতে পায় মন্দিরের ঢাকের বাদ্যি।

সে তখন বুঝতে পারে যে সব কিছু হারিয়ে যায়নি। সে খুঁজে পায় নিজেকে।' এই কবিতায় উল্লিখিত মানুষটি কবিরই দ্বিতীয় সত্তা বলা যায়। হোটেলের পরিবর্তনগুলো কবিতায় অনুভবের পরিবর্তনকে বোঝাচ্ছে। কবিতার ইংগিত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় যে এমন কিছু বিষয় আছে যা চিরদিন টিকে থাকে এবং নিরন্তর এগিয়ে চলতে থাকে।

আশির দশকে এসে মালয়ালাম কবিতার আধুনিক ধারা আশু-বিপ্লবের মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে এবং প্রবেশ করে অন্তর্মুখীনতার বিশেষ পর্বে। কবিরা আর আগেকার আত্মমগ্নতার তাড়নার দিনগুলোতে ফিরে যেতে চাইলেন না, বরং অঞ্চল ভিত্তিক সমবেত অবচেতনার গান শোনাতে আগ্রহী হলেন। এটা হল তাদের সংবেদনার-উপনিবেশবাদ থেকে মূলে ফিরে আসার প্রয়াস, অবশ্যই নতুন উপলব্ধির প্রয়োজনে। বর্তমান লেখকের সংকলিত কাব্য সংকলন Nervazhikal -এ ছ'জন কবির কবিতার উপস্থাপনের মাধ্যমে আধুনিক মালয়ালাম কবিতার এই আঞ্চলিক-স্বকীয়তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে বিশেষ অঞ্চলের সংস্কৃতির স্বকীয়তা (অভিন্নতা)-কে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। অন্যদিকে, আঞ্চলিক সংস্কৃতি হল ভারতীয় সংস্কৃতির নির্ভরযোগ্য ও জীবন্ত স্বরূপ, যা সংবাদমাধ্যমগুলিতে প্রদর্শিত এবং অপ্রামাণিক সংবাদ সংগ্রহ-দৃশ্য থেকে আলাদা চরিত্রের। এখানে আরও বলা হয়েছে যে উপনিবেশিকতার বিরোধিতা এবং জাতীয় গণসংস্কৃতির-উন্নয়নই কেবলমাত্র ভারতবর্ষের আপামর জনতাকে ঐক্য-সংহতি দিতে পারে। একই সঙ্গে এ ভাবে সতর্কীকরণ করা হয়েছে যে মৌল-জাতীয়তাবাদ কখনও সাংস্কৃতিক পুনরুত্থান হতে পারে না এবং আত্ম-শনাক্তকরণ-এর সন্ধানকে অতীতের মহিমা উপলব্ধির প্রভাব ভাবাও ঠিক হবে না।

প্রকৃতিগত কারণেই কেরলের সংস্কৃতি বহুজাতিক চরিত্রের, বহুধর্মেরও বটে। তার উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত সম্পদ হল নিচুতলার সংস্কার আন্দোলন, তার অনুসারী জাতীয় এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন। আঞ্চলিক ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার করার গভীর ভাবনায় আমাদের উদ্দীপ্ত হওয়া প্রয়োজন ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির হাত থেকে বাঁচবার জন্যই। এ কালের নতুন কবিতা সমস্ত আন্তর্জাতিক ও ভারতীয় উপাদানগুলোর হাত থেকে নিজেকে ছোঁয়াচমুক্ত রাখতে পারে না এবং তার কোনও প্রয়োজনও নেই। বরং সে সব উপাদান নিজসংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্য দরকার। তবে তা অবশ্যই নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা ও আবিষ্কারের সম্মুখীন হবে। এর মধ্যে অবশ্যই প্রবলভাবে প্রতিফলিত হবে আমাদের জাতীয় লোকায়ত ঐতিহ্য এবং সমকালের আশা উদ্দীপনা নিজ নিজ উপলব্ধিকে প্রকাশের জন্য উপযুক্ত আঙ্গিকে বা রচনা প্রকরণের মাধ্যমে।

আশি—নববুইয়ের প্রথম দিকের কবিতায় এই সব সাধারণ ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। কেরালার বিশেষ চরিত্রসম্মত বিষয়বস্তুর অভ্যুত্থান ঘটেছে এ সময়ের কবিতায় যদিও সংকীর্ণ অর্থে তা জাতিকেন্দ্রিক হতে পারেনি। কে. জি. শংকরপিল্লাইয়ের কবিতা 'কদমবনে কদমগাছ নেই' কে উদাহরণ রূপে ধরা যেতে পারে। কবি তাঁর গ্রামের নাম বলতে বুঝিয়েছেন, 'কদম্বনাড়ু' হল কদমের দেশ। তাঁর মা তাঁকে বলছেন, যে কোষ্ঠী অনুযায়ী তাঁর বিশেষ গাছ হল কদম্বগাছ। তিনি তাঁর বিশেষ গাছটিকে খুঁজছেন, কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন কালিন্দী নদীর তীরে অবস্থিত একটি কদমগাছকে। কিন্তু তিনি নিজ গাঁয়ের কোথাও তাকে দেখতে পাচ্ছেন না। অনেক বছর পরে তিনি একবার শহরে গিয়েছেন এবং দেখতে পেলেন একটি পার্কে বিশাল নীল কদম গাছ। সে যেন নির্জীব, চিন্তাহীন এক বৃদ্ধ পুলিশের মতো দাঁড়িয়ে আছে, তার বুকে ঝুলছেনামগোত্রবিহিন একটি টিনের চাকতি। কবিতাটির চূড়ান্ত মুহূর্তের শেষে এই ইঙ্গিত পাই আমরা যে এই সময়ে আমরা আমাদের আত্মগরিমা আবিষ্কার করছি, যার ইতিমধ্যেই বিকৃতি ঘটেছে, হয়েছে নির্বাসিত এবং বার্ধক্যজর্জরিত। 'কোচিন এবং বৃক্ষরাজি' কবিতায় শংকর পিল্লাই কোচিন এবং বৃক্ষরাজির রূপান্তরের প্রতীকে কেরলের সংস্কৃতি কীভাবে খণ্ডাংশে পরিবর্তিত হয়েছে, তারই ব্যঞ্জনা দিয়েছেন, মনে হয়। রাস্তাগুলোর দু'ধারে যে গাছগুলো রাজকীয়ভাবে এতকাল দাঁড়িয়ে থেকে টিপুসুলতান, ভাস্কো ডা গামার আসবার আগে থেকেই পথচারীদের ছায়াদান করে আসছে তারা যেন কেরালার সেই বিস্মৃতপ্রায় অতীতকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, সেই অতীতকে যেখানে জীবন ছিল সরলতায় পূর্ণ, বিশ্বাসে দৃঢ় ও সামঞ্জস্যে ভরা। পরবর্তীকালে ওই গাছগুলিই, উপাস্য দেবতা, আলোকস্তম্ভ অথবা মঞ্চ রূপ ধরে বস্তুভারাক্রান্ত যুগকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল এখানে। কবির উত্তরসুরিরা হারিয়ে যাওয়া সবুজতা ও তার সুর ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু গাছগুলোর স্থানে যে কারখানার চিমনি বসেছে তার ধোঁয়ায় তাদের পদচিহ্ন যাচ্ছে হারিয়ে। কবিতাটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে ধোঁয়াশার এক ভয়াবহ চিত্রে, সে ধোঁয়া গ্রাস করছে সব কিছুকে, এমনকী কবির দৃষ্টিশক্তিকেও : নানা ছুতোনাতার জ্বালানিকাঠের জ্বলন্ত চিতায় আমাদের জীবনভর পুড়তে থাকা।

কবি ব্যাজস্তুতির মাধ্যমে শেষ পর্বে বলেন :

'উঠে দাঁড়াবার জন্য তাড়াহুড়ো করো না। তার জন্য অনেক সময় পড়ে আছে।'

তাঁর সাম্প্রতিক কবিতা, যেমন 'বিচিত্র ভঙ্গির আলোক চিত্র' দর্শক, ঘোড়াগুলো গাধার মতন আচরণ করছে পাখিদের ডেকো না, যদি পারো এই ভাবে খেলো; আবৃত আকাশ' এ তিনি কেরালার

জনজীবনকে গভীরভাবে দেখেছেন, যে জীবন বাণিজ্যমুখী সংস্কৃতি, প্রচারমাধ্যমের বিপুল আক্রমণের মাধ্যমে উত্তর আধুনিক পর্বের সমালোচনা করে চলেছে।

কবি সচ্চিদানন্দ, 'প্রত্যাবর্তন', 'বদলে যাচ্ছে সংসার', 'ধ্বংস স্তূপের ভিতর দিয়ে মহাবলী হেঁটে যাচ্ছেন' প্রভৃতি কবিতায় আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, কী হারিয়েছে, প্রকৃতির মধ্যে অবিনশ্বর হয়ে আছে কোনগুলো, এবং কেরালার সংস্কৃতি এজুথাচ্চান থেকে ভিলোপিল্লি, কেরালার মালয়ালাম ভাষা, তার কিংবদন্তির নায়ক পজ্বাশি রাজা থেকে শ্রী নারায়ণগুরু, ধান, নারকেল, লংকা জাতীয় উদ্ভিদ, কেরালার প্রকৃতির বিশেষত্ব সমূহ; ইতিহাস, সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিয়ে কাজ করে চলেছেন।

নারী কবি বিজয়লক্ষ্মী, সাবিত্রী রাজীবন, ভি. এম গিরিজয়া, অনীতা টাম্পি, গীতা হীরণ্যন, এবং অন্যান্যরা প্রকাশ করে চলেছেন সার্কাসে আবদ্ধ পশুর মতন নারীর গৃহবন্দি জীবনের পোষ মানানো অবস্থাকে; রূপ দিয়েছেন কবিতায়। রান্নাঘরের সরঞ্জামের মতো মেয়েদের যন্ত্রে পরিণত করে দয়ার অথবা শক্তির আদর্শ হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টাকে মালয়ালাম কবিতায় তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মাত্রা এনে দিয়েছে। এখানে লিঙ্গভিত্তিক ব্যক্তিত্ব তার স্থান করে নিয়েছে। কোনও কোনও সময় নিজেকে খুঁজতে গিয়ে পৌরাণিক কাহিনি ও রূপকথাকে ব্যবহার করেছে। বিজয়লক্ষ্মীর 'কৌশল্যা', যযাতির প্রতি, অথবা 'ছুতোরের মেয়ে', 'সাবিত্রী চন্দ্রিকা' কবিতায়, ওই চরিত্রগুলোর সম্ভাবনাকে নতুন করে অনুসন্ধান করেছেন। এমনকী ঐতিহ্যসঞ্জাত বালামনি আম্মা এবং সুগতকুমারীর ঐতিহ্যকে পেছনে ফেলে সমাজের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকে প্রশ্ন করতে গিয়ে তাঁরা ওই পূর্বসূরিদের পেছনে ফেলে দিয়েছেন। এবং বলপ্রয়োগ ও হিংস্রতার যুক্তি খাড়া করে পুরুষের পৃথিবীকে পুনস্থাপনও করেছেন এঁরা। এই কবিদের অনন্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত অধিবিদ্যার অহংয়ের পুনপ্রয়োগ হল আর একটি কৌতূহল উদ্দীপক প্রবণতা। এটা অবশ্য আমাদের রকমফের আধ্যাত্মিকতা, কারণ এটা কোনও অর্থেই পুনরভ্যুত্থান নয়। এখানে বিশ্বের রহস্যের সঙ্গে আধিদৈবিকতার মিশ্রণকে বিস্মিত হয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

কবি বালাচন্দ্রনের 'মনের পরিবর্তন' কবিতায় বর্ণনার আড়ালে চরিত্র ও বিষয়বস্তুতে রয়েছে আধ্যাত্মিকতার স্বর। ডি বিজয় চন্দ্রনের কবিতায় আছে অন্তরালবর্তী প্রবল ভক্তির স্রোত, যে প্রবাহ কাদাম্মান্নিত্তা রামকৃষ্ণণের 'ঈশ্বর স্তোত্র' কবিতাকে মনে করায়।

সচ্চিদানন্দনের কবিতায় ধরা পড়েছে ভারতের দ্রোহী মনোভাবাপন্ন সন্ত কবি, কবীর, মীরা, টুকারাম, নামদেও, আক্কামহাদেবী, বাসব, লালদেব, চৈতন্য, ত্যাগরাজ, বুলে শাহ, আন্ডাল প্রভৃতির উত্তরাধিকার। আয়াপ্পনা পানিক্করের কবিতাগুলিতে সীমা-অসীমের সম্পর্কের গভীরতা বেজে উঠেছে মনে হয়। এই প্রবণতা কোনও এক স্তরে বিশ্বের ঐকতানের পুনরাবিষ্কারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে হয়। অন্যদিকে দলিতদের ব্রাহ্মণবিরোধী জাগরণে উদ্বুদ্ধ আন্দোলনেব কথাও মনে করিয়ে দেয়। এই আধ্যাত্মিকতা এখানে যেমন অতীতের আচারধর্মিতা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছে, তেমনই পুনরুত্থানধর্মী আদর্শকে ব্যবহার করে নতুন প্রেরণা অর্জন করে সেই শক্তিকে ভবিষ্যতের মানুষ ও পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে।

গত শতকের নববুইয়ের দশকের সৃষ্ট কবিতা নিয়ে কিছু কথা বলে আমি এই প্রবন্ধ শেষ করতে চাই। মালয়ালাম ভাষার এই দশকের কবিতাকে আমি তৃতীয়প্রজন্মের এবং সমকালের কবিতার পঞ্চম প্রজন্মের বলে চিহ্নিত করতে চাই। প্রথম প্রজন্মের কবিদের প্রতিনিধিত্ব করেন, বালামনি আম্মা, যিনি দার্শনিকতা ও গভীর নৈতিকতার দিক থেকে ক্লাসিক কবিদের সমগোত্রীয়। দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রতিনিধি বলা যায় ও. এন. ভি সুগতকুমারী। যাঁরা অসাধারণ গীতিকবি রূপে সম্মানিত। এঁরা 'কাল্পনিক' আন্দোলন থেকে উঠে এসেছেন, পরবর্তী সাহিত্য-সমৃদ্ধির দ্বারা অংশত তাঁরা প্রভাবিত বলা চলে। তৃতীয় প্রজন্মের প্রতিনিধি হলেন আধুনিকদের অগ্রদূত আতুর রবিবর্মা, কে সচ্চিদানন্দন, এবং কে. জি. শংকর পিল্লাই-এর মতন কবি, যাঁরা 'আধুনিক' হিসাবে শুরু করে আধুনিকতার বেড়াজাল অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আধুনিক মালয়ালাম কবিতায় কোনও একটিমাত্র কেন্দ্রীয় স্বর প্রধান নয়। এই সময়ে কবিতার জগৎ ছ'য়ের, সাতের দশকের কবিদের দ্বারা প্রভাবিত, যে কবিরা নতুন নতুন পথ খুঁজে চলেছেন, মেলে ধরতে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

নববুইয়ে দশকে বেশ কয়েকজন ভাল কবি এসেছেন। এই নববুইয়ে বিশিষ্ট কবিরা আদর্শগতভাবে নির্মোহ-দর্শনের স্রষ্টা, গুণগতভাবে বৈষম্যভরা, তবুও তাদের কবি-ক্ষমতা স্বীকার করতেই হবে। ষাটের সত্তরের 'কেরালার কবিতা' 'সমকালীন কবিতা' কে. আয়াপ্পা পানিকর এবং কে. জি. শংকর পিল্লাই যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেছেন। সম্প্রতি ত্রিবান্দ্রামের কয়েকজন তরুণ কবি একটি কবিতা পত্রিকা প্রকাশ করছেন, নাম 'কবি থাক্ক অরিন্দম' (কবিতার জন্যে একটি জমি)।

আগেকার আধুনিক কবিতার সংকলনগুলোর মতো পুথুমুদ্রাকল (বিষ্ণুনারায়ণ নামবুদিরি সম্পাদিত) : হরিশ্রী (কে. সচ্চিদানন্দন সম্পাদিত); কলিকাল-কবিতা (আতুর রবিবর্মা সম্পাদিত) এবং নার্ভাজিকল (সচ্চিদানন্দন সম্পাদিত), দুটো নতুন প্রজন্মের কবিদের কবিতাসংকলন প্রকাশিত হয়েছে—পুথুমজ্বি-

ভজ্জিফল (আতুর রবিবর্মা সম্পাদিত) এবং যুবকবিতাকোত্তম (কে. এম. বেনুগোপাল সম্পাদিত)। এদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ বের করেছেন। এদের মধ্যে অন্তত পনেরোজন ক্ষমতাবান কবি রয়েছেন, কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে এখানে করা যেতে পারে, যেমন পি. পি. রামচন্দ্রন, পি. রামন, টি. পি. রাজিবন, কে. আর. টনি এবং আনোয়ার আলি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই কবিবৃন্দ যখন কবিতা লিখতে শুরু করেন, তখন আধুনিকতা ও অস্তিত্ববাদ, দুটি ঢেউই স্তিমিত হয়ে আসছে। ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুনের বিরোধ, সব কালের মতোই পুরনোকে ভেঙে ফেলার প্রচেষ্টা, অবশ্য সমন্বয় ও সংহতিতেই শেষ পর্যন্ত পরিসমাপ্ত হয়।

ওই সব আলোড়ন অনুসরণ করে যে শান্ত স্থিতাবস্থায় শেষ পর্যন্ত এসেছিল, ঠিক সেই সময়ই এইসব তরুণ কবিদের আবির্ভাব ঘটে। এটা ছিল এ রকমই ঘটনা, যেন উৎসবের কাল অতিক্রান্ত, পরীক্ষা নিরীক্ষার আর কিছু বাকি নেই; সব ধরনের গদ্য ও ছন্দসিদ্ধির চর্চা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, অতীত একটা ছায়ায় পরিণত, বর্তমান যথেষ্ট উন্মাদনাকর, ভবিষ্যতের স্বপ্ন অনেকটাই বর্ণহীন মনে হচ্ছে। তাদের কবিতাগুলি সমকালীন পূর্বসূরিদের কবিতার প্রতিধ্বনি মনে হত, তাদের পক্ষে কঠিন ছিল প্রভাব অতিক্রম করে নিজেদের স্বর তুলে ধরা। সকলকে একসূত্রে বাঁধতে পারে এমন কিছু ছিল না ফলে একত্রিত হয়ে কোনও আন্দোলন তারা গড়ে তুলতে পারেনি। কোনও কারণহীন অগ্রগতির পুরোধা ছিলেন তাঁরা। এর ফলে তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বনিন্দুক হয়ে উঠলেন। উদাহরণ রূপে দেখানো যায় কে.আর. টনিকে (জ. ১৯৬৪), তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সামানিলা' যেখানে প্রতিফলিত হয়েছে নাক-উঁচু নিন্দুকের ভাব, নৈরাশ্য, সংশয় এবং নিজের প্রতি অবিশ্বাস, যা ছিল তাঁর প্রজন্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এক অর্থে তাকে বলা যায় অ-কবিতার কবি। তিনি মালয়ালাম কবিদের ঐতিহ্যকে উপহাস করে প্রশ্ন করেছেন; অন্যান্য কবিদের উক্তি বা চরণ উদ্ধৃত করেছেন, এবং ধবংসকামী বিদ্রোহীদের ধাঁচে অন্যান্যদের সঙ্গে নিজেকেও করেছেন অসম্মান।

তিনি প্রায়শই এঝজুথাককানকে নিয়ে প্যারোডি লিখেছেন, বিশেষত তাঁর নীতিমূলক কবিতা নিয়ে; ঠিক এঝজুথাক্কানের ছন্দ, যতি-নির্ভর কাঠামো এবং সংস্কৃতধর্মী ভাস্কর্যধর্মী প্রকাশকে অনুকরণ করে। প্রাচীনকালের কথার প্রতীকস্বরূপ বিপরীতমুখিতা তাঁর কবিতায় দেখা যায় প্রায়শই। যেমন —

সমস্ত খেলায় আমি যোগ দিই
কয়েকটিতে আমি জিতে যাই
ঠিক, সম্পাদকের কাছে কবিতা পাঠাবার মতোই
যা একবারই ছাপার মুখ দেখে। সাঙ্কি
বেশি পড়া বিপদ ঘটায়,
কখনও ঘুমের ব্যাঘাত করো না।
কাউকে টাকা ধার দিও না,
কারও সঙ্গে বিবাদ নয়, বন্ধুত্বও নয়।
তোমার উদ্‌বেগ ভুলতে
যোগাভ্যাসই ভাল।
পুটুভরসম (নতুন বছর)

টনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন : 'ভাগ্যে, আমি স্বাধীনতা আন্দোলনের কালে জন্মাইনি! আমার মুখ আধুনিকতার রক্তবর্ণ মুখও নয়। আমি কখনও জেলে যাইনি। আমি কি দেরিতে জন্মেছি?"

পি রামন হলেন একজন নির্ভীক পরীক্ষা নিরীক্ষায় নিমগ্ন কবি। তাঁর কবিতায় ব্যক্তিগত উপস্থিতি তেমন নেই। বিমূর্ততাই তাঁর প্রকাশ বৈশিষ্ট্য। তাঁর 'কানন' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন : 'এ ভাবে কোনও আদেশ মঞ্জুর করা হলে, যা নেই তার ভার যে আছে তারই বহন করা উচিত। সারাদিন ধরে এই দীর্ঘ অবসরকালে আমি এখন কাজের ভার বুঝতে শুরু করেছি। যে দুঃখের বোঝা আমি বহন করি না তাও অনুভব করতে পারি যখন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করি।' তাঁর কবিতা ক্রমশ সেকেলে হয়ে পড়ছে, কবি এই উদ্‌বেগ প্রকাশ করে একটি অনামী কবিতার শেষে বলছেন : 'যে তার দুঃখ ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না, তার দুঃখও কখনও অপ্রাসঙ্গিক হয় না।' এ রকম, আরও কিছু কিছু বক্তব্য রয়েছে তাঁর — 'মৃত্যু বিষয়ে কবিতা লেখা যেন গ্রানাইট পাথরকে মূক সম্বোধন করা মাত্র।' 'আমার পাত্র-ভরে নেবার জন্যে নদী চায় একটুকরো হাসি।' 'হে গভীরতা, মাছ তোর শরীর ছিঁড়ে খুঁড়ে চলেছে।'

রামন বড় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হননি বলে তাঁর কবিতায় এক ধরনের হতাশা কাজ করছে, কারণ জনশ্রুতিই কাজ করেছে তাঁর কবিতায়। তাঁর নিজের কবিতার উপমা প্রয়োগ করে দেখানো যায় যে তিনি এমন একজন 'যে বৃষ্টিকে কেবল জেনেছে জলাশয়ে বৃষ্টি পড়ার শব্দে।'

পি. পি. রামচন্দ্রণ (জন্ম ১৯৬২) টিকে আছেন তাঁর রচনা-দক্ষতা এবং ব্যাজস্তুতি সৃষ্টির ক্ষমতার জন্য, যাঁর জন্ম স্মৃতির জগৎ এবং অভিজ্ঞতার জগতের সংঘর্ষ থেকে। টনি অথবা রামনের বিপরীতে ঐতিহ্য খুব সদর্থকভাবে তাঁর মধ্যে উপস্থিত। তাঁর তীব্র ব্যঙ্গের লক্ষ্য যতটা না অতীত এবং পূর্বপুরুষরা, যাদের তিনি পরোক্ষভাবে সম্মানও করতেন, তার চেয়ে বরং তাঁর সমকালীন কবিরা। এই সব কারণে তাঁর কবিতা সমসাময়িক কবিদের থেকে একসময় স্মৃতিভারাতুর হয়ে পড়ে, কিছুটা পুরনো মেজাজেরও। মাঝে মাঝেই তার কবিতায় দেখা গেছে পুরনো

সুন্দর পৃথিবীর জন্য আকুলতা তিনি অতিক্রম করতে চেয়েছেন। মালয়ালি পাঠকবর্গ পি. কুন্হিরামন নায়ারের এই গৃহকাতরতার পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছেন। পি নায়ার ছিলেন একজন অননুকরণীয়, প্রকৃতি প্রেমিক কবি যিনি পাখির ভাষা সম্বন্ধে 'লালিথাম' (সরল) কবিতার মতো অলংকার, স্মৃতিকথাবর্জিত সরল কবিতা রচনা করেন—

একটি মধুর কান্না, যথেষ্ট
এখানে আমার উপস্থিতির পক্ষে যথেষ্ট
একটি পালক খসে পড়ল এইটুকুই
বলার পক্ষে যথেষ্ট : আমি এখানে
গভীর চিন্তার উষ্ণতা
যথেষ্ট প্রমাণ — আমি থাকব এইখানে
এর চাইতে সরল প্রকাশ
একটি পাখিও জানে না।

অনেক বছর পরে দুই বন্ধুর মিলন নিয়ে ব্যাজস্তুতিপূর্ণ কবিতা হল 'লোপাসন্ধি'। দুই বন্ধুই 'র‍্যাডিকাল', তাদের একজন এখন জীবনে প্রতিষ্ঠিত মানুষ; দাড়িকামানো ঝকঝকে মুখ তার, বসার ঘরে সোফা, এইসব দেখে কারও মনে পড়তে পারে সেই দিনের কথা যখন এই বন্ধুটি একমুখ দাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পাথরে বা কালভার্টের উপর বসে বিরামহীন তর্কে সে মেতে থাকত। এখন তাঁর গোফজোড়া দর্শনার্থীকে মনে পড়িয়ে দেয় চার্লি চ্যাপলিনকে, কিংবা স্মরণ করিয়ে দেয় হাসিবর্জিত হিটলারের মুখের কথা। এই আগন্তুক মানুষটির ঘরে তাদের কোনও ঠাঁই নেই জেনে দর্শনার্থীরা আজ ফিরে যায়। কবিতাটিতে উপস্থাপিত বিষয়টি অনেকটাই অতিব্যবহারে জীর্ণ, কিন্তু কণ্ঠস্বরে ধার্মিকমন্যতা রয়েছে, তবু আজও কবিতাটি পাঠযোগ্য কারণ এর ভিতরে লঘু হাস্যরস বর্তমান, ভাবমূর্তিও অনেকটা 'কথাকলি'কে মনে করায়।

টি.পি. রাজিবন (জন্ম : ১৯৫৯) হলেন নতুন প্রজন্মের আর একজন বিশিষ্ট কবি, দুটি কবিতাগ্রন্থের লেখক। তাঁর কবিতা জীবনের শান্ত কোমলভাব এড়িয়ে উলঙ্গ নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর অরু বিলাপম (একটি শোকগাথা) কবিতায় তিনি মৃত্যুসম্পর্কে নিরাবেগ স্বরে বলেছেন- 'প্রথমেই পিপড়ে আসবে মাথা নিচু করে স্মৃতির আর্দ্রতা ও মিষ্টত্বের খোঁজে, ভ্রু, চোখের পাতা, ঠোঁট, স্তনের বোঁটা, নিতম্বের উপর দিয়ে চলাফেলা করবে। তারপর আসবে রাস্তার কুকুর, শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ চিনতে না পেরে চিৎকার করে লম্ফঝম্ফ করবে। যখন সব শেষ হয়ে যাবে তখন শকুনিরা সবেগে নীচে নামবে, তারা ডানা ঝাপটাবে, ঠোঁট দিয়ে হৃদয়যন্ত্রের শক্তি আর চোখের গভীরতা পরীক্ষা করবে। যে কোনও দিক থেকে যে কোনও সময় পোকামাকড় আসতে পারে, এদের খিদে সারাটা পৃথিবীও মেটাতে পারে না। শেষ দর্শক হবে গাছের শেকড়গুলো, তারা প্রতিটি ক্ষতের মধ্যে ঢুকে পড়বে, প্রতিটি রহস্যের গভীরেও, সমস্ত যন্ত্রণা এবং তিক্ততা শুষে নেবে এবং হাসিতে ফেটে পড়বে।' শোকগাথা রাজনীতি নামক আর একটি কবিতায় রাজিবন মালয়ালাম কবিতার পরিসমাপ্তির কথা উল্লেখ করেছেন— 'ম্যানহাটানের একটি আদালত আয়াপ্পনা পানিকরকে কবিতায় অবৈধভাবে আফিম আমদানির অভিযোগে ফাঁসি দিয়েছে। শব্দের অরণ্যে যখন আতুর রবিবর্মা লুকিয়ে ছিলেন, তখন তারই নিজের পিঠে ঝোলানো ব্যাগে রাখা বোমায় তিনি হলেন নিহত, কে. জি. শংকর পিল্লাই নিহত হলেন আদর্শের গুপ্ত আস্তানায় একটি সংঘর্ষে,' সচ্চিদানন্দন, এ আয়াপ্পানান, বালচন্দ্রান চুল্লিকাভ, কাদম্বানিত্তা রামকৃষ্ণণ এবং ঠিক কিছু আগের পূর্বসুরিরা সকলেই আলাদা আলাদা ভাবে শেষ হয়েছেন, এবং এই ঘটনাগুলি তাঁদের কবিতার বিশেষ বিশেষ স্বাতন্ত্রকেই নির্দেশ করে। কবিতাটি শেষ হয়েছে এই বলে, 'ভাষার নির্জন নৈরাজ্যের রাস্তা দিয়ে সৈন্যরা পতাকা হাতে কুচকাওয়াজ করেছিল। কারফিউ বলবৎ হবার আগে পর্যন্ত কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি'।

'অঙ্গনে পোয়াভান' (যে মানুষটি ছেড়ে গেছে এভাবে) কবিতায় তাঁর সংগ্রহশালায় অতীতকে গচ্ছিত রেখে একটি মানুষের মূর্তি কল্পনা করেছেন। এই কবিতাটি ঐতিহাসিক স্মৃতিতে ভরা যার শেষে, জাদুঘরের মূর্তিগুলো, পরস্পরের মধ্যে হতাশার সুর বিনিময় করছে, বাইরের ভীতিপ্রদ ঘটনায় এতটুকুও বিচলিত হয়নি তারা।

বেড়াল, মাছ ও কচ্ছপ নিয়ে লেখা রাজিবনের কবিতাগুলো, প্রাণী নিয়ে সাধারণ লেখা থেকে উচ্চমানের, কারণ ইতিহাসবোধ ও বাস্তববোধের মিশ্রণ রয়েছে তাতে।

আনোয়ার আলি হলেন একমাত্র তরুণ কবি যিনি বর্ণনামূলক বিষয় নিয়ে দীর্ঘ কবিতা লিখতে সাহস করেন। তাঁর কবিতাগুলো প্রায়শই কথোপকথনের ভঙ্গিতে রচিত হয়েছে, যার ফলে সেগুলিতে সৃষ্টি হয়েছে উক্তি-প্রত্যুক্তির স্বাদ এবং হালকা উদাসীনতা। তাঁর সতীর্থ কবিদের মতন তিনিও ব্যঙ্গধর্মী হয়েছেন কখনও, কিন্তু তার প্রকাশ অনেক বেশি দেশীয়, কখনও বা গ্রাম্য।

একান্ততায়ুধে আম পাথু বর্ষামঙ্গল (নিঃসঙ্গতার পঞ্চাশবছর) কবিতায় তিনি স্বাধীন ভারতবর্ষের জীবনের উপরে তিক্ত বক্তব্য রেখেছেন। একজন দেশপ্রেমিকের মায়ের সঙ্গে টেলিভিশন সাক্ষাৎকারের ভঙ্গিতে কবিতাটি লিখেছেন রাঘবন, সময়টা ভারতের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বর্ষ। কবিতাটির বুনন শিল্পটি নানা যান্ত্রিক শব্দের আওয়াজ, নির্দেশক ও ফটোগ্রাফারের নানা মন্তব্যে এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যা মাঝে মাঝেই বিষন্ন মায়ের ব্যাখ্যাধর্মী যে মার সন্তান স্বগতোক্তিতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে,

স্বাধীনতার দিন থেকে যিনি কোমায় আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে আছেন।

রফিক আমেদের (জন্ম-১৯৬১) আছে এক চিন্তাশীল মানসিকতা, আছে শব্দ ও ছন্দের ওপর ভাল দখল যা তাকে প্রতিশ্রুতিমান কবি রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। পি. এন. গোপীকৃষ্ণণ হলেন একজন প্রচলিত মত-বিরোধীদের প্রতিভূ, মামুলি এক ধরনের কবিতা লেখেন তিনি যা প্রায়শই নীরস হয়ে দাঁড়ায়।

গীতা হিরণ্যন (১৯৫৬-২০০১) তাঁর 'অর্ধনারীশ্বরণ' কবিতায় মানুষের অকৃতজ্ঞ মনোভাবকে বিদ্রূপ করেছেন — শিব তাঁর অনেক স্ত্রী, তাঁর নিজের পিতা, এমনকী তার প্রেমিকাও হতে পারে; পার্বতীকে প্রশ্ন করছেন — শিবের জটায় গঙ্গা এখন অবস্থান করছেন কি না। তাঁর 'স্বর্গারোহণ' কবিতায় দ্বিতীয়বার রামায়ণ পড়ে দেখছেন, সরযূ নদীর তীরে যা ঘটেছিল তা হল অনুতপ্ত রাজা ও নীরব থাকার জন্য দোষী মানুষদের স্বেচ্ছায় গণমৃত্যুবরণ। 'ঘর সাজানো' কবিতায় তিনি নিজেকে 'বনসাই'এর সঙ্গে তুলনা করেছেন, মনে হয়েছে তাকে জোর করে গাছের মত বাড়তে ও পুষ্ট হতে দেওয়া হয়নি। তবুও গাছটি তাকে যেন বলছে, সে একটি গাছমাত্র, একটি নীতিবৃক্ষ সে কবিকে ভালবাসে এবং তাকেই আকাঙ্ক্ষা করে। ক্লান্তি এবং একঘেয়েমির— মুহূর্তগুলিতে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা তাকে সান্ত্বনা দেয়।

রোজমারির কবিতা স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষার কবিতা। রচনারীতি এবং ভাষার ওপরে এখনও দখল আসেনি যদিও। অন্যান্য কয়েকজন কবির মতোই তাঁরও সর্বনাশ হয়েছে বাগাড়ম্বরের জন্য। ভি. এম. গিরিজা হলেন একজন মৃত্যু-চেতনা, একাকিত্ববোধ ও অতৃপ্তকামনার কবি। গিরিজাকে সমাজের নিয়মাবলি ও সহজপ্রবৃত্তির মধ্যে বিরোধ হতবুদ্ধি করেছে। কালভিদু (পাথুরে বাড়ি) কবিতায় তিনি প্রকৃতিরাজ্য থেকে তাঁর চিত্রকল্প বেছে নিয়েছেন। বাতাস, সুগন্ধ, বৃষ্টি, নদী ইত্যাদি থেকে। কিন্তু মানুষের ভয়ংকর বাড়ি, পাথুরে দেওয়াল এবং প্রহরীদের উপস্থিতি তাঁকে শেষ করে দিয়েছে। এ যেন শুনতে পায় না, এমন পাথুরে মূর্তি। গিরিজার কবিতায় বন্য প্রকৃতির উপস্থিতি তাঁরই প্রকৃতিজাত সহজসত্তার রূপ, যে নৈতিক মূল্যবোধে লালিত মুক্তপ্রাণ প্রাণী।

অনিতা তাম্পির কবিতায় স্বপ্ন আছে, যা তার বৈশিষ্ট্য বা গুণ বলা যায়। তিনি নিজেকে ভাবতে থাকেন যে তিনি নিজেই একটি নৃত্যরত পথে রূপান্তরিত হয়েছেন, আর পাশের গাছগুলি রেলগাড়ির জন্য অপেক্ষায় ক্লান্ত, বিরক্ত; স্মৃতি একটি শীর্ণবালিকার মতো বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে (ওরমাকাল মারায়ান্মাথু—স্মৃতি যে পথে অদৃশ্য হয়ে যায়)। দুপুর নেমে আসে প্রচণ্ড তাপ ও বৃষ্টি সঙ্গে নিয়ে যেন একটা শয়তান, হাসি ও চিৎকারে উন্মাদ মাতালের মতো (উচা নুন); 'অন্ধকারে পিচ্ছিল রেলগাড়িতে যেন কবি বসে আছেন এবং জালে আঁটকে যাওয়া শব্দের মতো নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন' (কেকায়িল অরু থিভান্ডি)। 'মুত্তাম আদিকুমবল' কবিতাটিতে যখন তিনি সততা ও সরলতার সঙ্গে তাঁর বিষয়কে উপস্থাপন করছেন তখনই তিনি তাঁর সর্বোচ্চ মানে পৌঁছে যেতে পেরেছেন।

'যে মেয়েটি উঠোন ঝাঁট দেয় সে চলে যায় তার স্মৃতির জগতে; সে চিন্তা করতে থাকে আগের রাতের কথা; বৃষ্টি অবশ্যই হয়ে থাকবে এবং জল পেয়ে কেঁচোরা ঘুম ঝেড়ে ফেলে মাটির ঘর তৈরি করছে তখন; আর সকালে যখন সে উঠোন ঝাঁট দেবে তখন ঘরগুলো ধুলো হয়ে যাবে। যখন বাড়িটা জেগে উঠবে ঘুম থেকে; সে বিস্মিত হয়ে দেখবে যে তার পরিষ্কার উঠোনে একটিও পাতা বা পায়ের ছাপ আর নেই। ভোরবেলা যখন সংবাদপত্র দিতে কাগজওলা দরজায় টোকা মারবে, ঝাড়ুদার প্রভুর কাপের তলানিটুকুর জন্য অপেক্ষা করবে।'

কবিতাটি একটি সাধারণ জীবনের ছবি মাত্র। এখানে কোনও তারস্বরে প্রতিবাদ ঘোষিত হয়নি। বরং ঝাড়ুদারটির কাজের জন্য তার আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে কবিতাটিতে। শুধু এখানে সৃষ্টি হচ্ছে গভীর অনুভূতি যখন সে ঝাড়ুদারটির ভাগ্যের সঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত কেঁচোর ভাগ্য প্রায় একইভাবে ভাবতে পারছে।

অনেক তরুণ কবিই গত পাঁচ বছরে লিখতে এসেছেন। অনেক কাব্যসংকলনও প্রকাশ পেয়েছে। জনপ্রিয় পত্রিকার মাসিক কলমে বর্তমান লেখক অনেককে নিয়ে লিখেছেন, আবার অনেক তরুণই সাহিত্যপত্রে লিখতে শুরু করেছেন। বিজু কানহানগাড, ইন্দিরা অশোক, লক্ষ্মী দেবী, জানকী কুট্টি, রজনী মন্মাদিয়ার, দিবাকরণ বিষ্ণুমঙ্গলম, কানিমল, অসীম থানিমুড, এল. টমাসকুট্টি, এস বৈজু, শ্যামসুন্দর, এসি শ্রীহরি, এস. যোশেপ, সরযু ছান্তানুর সি. এস জয়চন্দ্রান, মনোজকুমার, ভিরামকুট্টি তাদের মধ্যে অন্যতম।

মালয়ালাম কবিতার ধারা চলেছে বয়ে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলা চলে যে তাতে মানুষের আশা নিরাশার স্মৃতিমেদুরতা, কল্পনাশক্তি, ক্ষত, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং মর্বিড উদ্‌বেগ, মালয়ালিদের মনস্তত্ত্বরূপ নিতে চাইছে। মালয়ালি কবিতা শুধু আনন্দদানের জন্য বাইরের দর্শক হয়ে বা ছন্দ-নির্ভরমাত্র হয়ে থাকতে চাইছে না। সমাজের বদলের জন্য যে সংগ্রাম চলছে তার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থাকতে গিয়ে দ্বন্দ্ব, উদ্‌বেগ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতিকে তা ব্যক্তি বা শ্রেণীগত রূপ দিতে বদ্ধপরিকর।

থিয়েটার এখন, তখন

বিষ্ণু বসু

থিয়েটারের পত্রিকার সঙ্গে আমার পরিচয় গন্ধর্বের আমলে— মানে ১৯৬২-৬৩ সালে। সে সময় ইন্দো-চিন সম্পর্ক নিয়ে বাম আন্দোলন কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে আছে, তখন থেকেই আমার গন্ধর্বের সঙ্গে যোগাযোগ। তখন নাটকের পত্রিকা হিসাবে গন্ধর্ব খুব ভাল পত্রিকা ছিল। আর কোনও তেমন নাট্যপত্র ছিল না। বহুরূপী বেরত— তাও বছরে দুটো কি তিনটে সংখ্যা। গণনাট্য প্রকাশ পায়-১৯৬৪তে। আমি তখন নাটক নিয়ে পড়াশোনা করি। সম্পাদকের অনুরোধে তখন গন্ধর্বে লিখতে থাকি। ওটা যে তখন খুব পলিটিকালাইজড পত্রিকা ছিল তা নয়। তখন সৎনাট্য বা নবনাট্য নিয়েই মূলত নাড়াচাড়া হত এ পত্রিকায়। তার সঙ্গে কিছুটা বামপন্থী ভাবনাও থাকত — অনেক উদারতার চিহ্ন। আমি সেখানে অন্যান্য লেখার সঙ্গে ব্রেখটের 'মাদার কারেজ' ও রোমাঁ রোঁলার '১৪ই জুলাই' অনুবাদ করেছিলাম। ইতিমধ্যে আমি চাকরি নিয়ে মেদিনীপুরে চলে যাই। তারপরও মাঝে মাঝে লিখেছি। কিন্তু ভৌগোলিক কারণেই গন্ধর্বের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে ৬৬র খাদ্য আন্দোলন, ৬৭তে প্রথম যুক্তফ্রন্টের ব্যর্থতা, ৬৯এ বিপুল জয় নিয়েও ব্যর্থতা এল। ধীরে ধীরে কংগ্রেসি অত্যাচার বাড়তে লাগল। কিছুকাল পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামও শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে এখানে ততদিনে ৬৪তে কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে গেছে। ৬৫তে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস ভাগ হল।— এক ধরনের রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটেছিল পশ্চিমবঙ্গে, তার ফলে আমাদের সমাজমুখী নাট্য আন্দোলনও পক্ষে কিংবা বিপক্ষে এই দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল, বরাবরই বাংলা নাটক বিশেষ করে গণনাট্য সংঘ (১৯৪৩) প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকে নাটক চালানোর ভারটা বামপন্থীদের হাতেই ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় প্রগতিশীল আন্দোলনের সাংস্কৃতিক শাখা হিসাবে তার আত্মপ্রকাশ। অবশ্য দেশভাগের পর ৪৭-৪৮'এ শম্ভু মিত্র বেরিয়ে গেলেন গণনাট্য থেকে। এর পর এলেন উৎপল দত্ত— তিনিও অল্পদিনের মধ্যে বেরিয়ে যান। প্রথম দিককার গণনাট্য আন্দোলনে যাঁরা ছিলেন তাঁরা অনেকেই ছেড়ে চলে যান। কিন্তু যে যেখানেই যান না কেন শেষ পর্যন্ত তাঁদের একটা বাম দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যার সঙ্গে নান্দনিকতা মিশিয়ে বহু নাট্যদল তৈরি হয়েছিল। এখানেই গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন শুরু হল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব কায়দায় পেশাদার মঞ্চের সমান্তরাল ভাবে কাজ করেছিলেন, কিন্তু সেটা বেশি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যায়নি। এই গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন সেই কাজটা করল। এটাই আমাদের স্বাধীনতা পরবর্তী অর্জন যার উৎস গণনাট্য সংঘ। এর সহায়ক শক্তি হিসাবে তখন কিছু নাট্য পত্রিকা বেরোয়— গণনাট্য, গন্ধর্ব, বহুরূপী — ৫০ এর দশকে, উৎপল বাবু বার করলেন পাদপ্রদীপ, কিন্তু কেউই বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। ব্যতিক্রম বহুরূপী ও গন্ধর্ব। ৬০ এর দশকে এসে গণনাট্য পত্রিকা নতুন করে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথমে ব্যক্তি উদ্যোগে চিত্তরঞ্জন দাস কাজটা করেছিলেন, পরে সেটা গণনাট্য সংঘের হাতে চলে আসে। ক্রমে গন্ধর্ব উঠে যায়। ওদের মধ্যেও রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটেছিল। সবাই আমার বন্ধু। পরে দেবকুমার ভট্টাচার্য কিছুদিন চালিয়েছেন— বছরে বেরত একটা কি দুটো সংখ্যা। ৭০ এর দশকে গন্ধর্ব বন্ধ হয়ে গেল। অবশ্য বহুরূপী বছরে দুটো বেরত। আরও পত্রিকা-বেরত। ৭০ এর দশক বাংলার উত্তাল দশক। বামপন্থীদের খুন করা হচ্ছে, দল ভেঙে দিচ্ছে। তখন গণনাট্যের দপ্তর ভেঙেছিল। নকশাল ও কংগ্রেসের মিলিত আক্রমণে এগুলো হচ্ছিল। রাজনৈতিক ডামাডোলে বামপন্থীদের বিশেষ করে সি পি আই (এম) যারা করে তাদের পেটাতে বিরোধী দলগুলো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ফলে থিয়েটারের নেতৃত্ব কিছুটা বসে যেতে বাধ্য হয়। বহু নাট্যকর্মী এই ৭০ এর দশকে নিহত হয়েছিলেন। প্রবীর দত্তের কথা সকলের জানা, তবু তাঁর নাম এখন কেউ কেউ করে, কিন্তু আমার যেটুকু জানা—আরও বেশ কিছু নাট্যকর্মী খুন হয়েছিলেন। তাঁদের কথা এখন আর সেভাবে কেউ বলে না—খুবই দুঃখজনক। যেমন বালির সত্যেন চক্রবর্তী।

এই অবস্থায় ৭৭ য়ে যে একটা পরিবর্তন হবে—ভাবা যায়নি। ৭২ এর নির্বাচনে আনন্দবাজার হেডলাইন করেছিল— 'কবর দিবার রাজনীতি কবরস্থ।'— মেশিনগানের ডগায়, বন্দুকের ডগায়, হিংস্রতার ডগায়, সন্ত্রাসের ডগায় সি পি এম-কে হটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আসলে এখন মনে হয় এতটা বাড়াবাড়ি না করলেও ওরা পারত— বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইন্দিরার যে ইমেজ দাঁড়িয়েছিল তার ফলে ওরা এমনিতেই হয়ত জিতত। কিন্তু ঝুঁকি না নিয়ে ওরা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে দিয়ে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস

তৈরি করেছিল— এখনকার প্রজন্ম সে কথা তেমন জানে না, তাদেরকে সেভাবে জানানোও হয় না—আসলে সময়ের ব্যবধানে ব্যাপারটা অনেক ফিকে হয়ে গেছে। ৭৫ এর জুনে জরুরি অবস্থায় কণ্ঠরোধ করা হল। এই যে মানুষের রুদ্ধ রোষ, প্রতিবাদ, এইটা, যখন ইন্দিরা গান্ধী বাধ্য হয়ে ৭৭এ লোকসভা নির্বাচন ডাকলেন একটা বিস্ফোরণ ঘটল। গোয়েন্দারা বলেছিল যে ইন্দিরা জিতবেন— কিন্তু শোচনীয়ভাবে তিনি ব্যর্থ হলেন। এরপর জুন মাসে হল বিধানসভা নির্বাচন— জনতা দল জোট করতে এত বেশি সিট চাইল যে জোট হল না, তখন বামফ্রন্ট সি পি আই এম-এর নেতৃত্বে লড়ল। সি পি আই তখন কংগ্রেসের সঙ্গে ছিল, ফলে সি পি এম মূলত একা লড়ল এবং ফলাফল যা হল তাতে সি পি এম নিজেও বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। অভাবনীয় জয় হল। জনতা দল, বাংলা কংগ্রেস খুব ধাক্কা খেল। কাজেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। একটা নতুন সময় শুরু হল। ৪৭-৭৭ তিরিশ বছর একরকম, আবার ৭৭ থেকে এই পঁচিশ বছর আরেক রকম। দুটো সময় যেন স্পষ্ট ভাগ করতে পারা যায়। তা যদি পারি তা হলে দুটো থিয়েটার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি কেন না সময়ের সঙ্গে থিয়েটারটা পাল্টায়। শিল্পকলার সবকিছুই পাল্টায়, মানুষের চেতনা পাল্টায়, বোধ পাল্টায়— সে ক্ষেত্রে মানুষের রাজনৈতিক চেতনা পাল্টাতে বাধ্য।

কাজেই সেই হিসাবে ৭৭ থেকে মানুষের মধ্যে কি প্রাপ্তি, কি উৎসাহ, কি কর্তব্য, কি দায়িত্ববোধ—সব মিলিয়ে আমরা এক নতুন জায়গায় চলে যেতে চেষ্টা করছি। জ্যোতিবাবুর তখন ৬৪ বছর বয়স, তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী করা হল। — যেটা তাঁর ৬৭ তে কিংবা ৬৯ এ হবার কথা, কিন্তু সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক কিংবা বাংলা কংগ্রেসের ষড়যন্ত্রে হতে পারেননি। ৭৭-এও সি পি আই কংগ্রেসের সঙ্গে। পরে ১৯৮০তে বোধহয় বামফ্রন্টে যোগ দেয়। এ সব অপ্রীতিকর মন্তব্যের মধ্যে আর যাব না। ৭৭ এর পরবর্তী সময়ে বামফ্রন্টে সাংস্কৃতিক অস্ত্রগুলোকে গুছিয়ে নতুন কিছু করার চেষ্টা হল।

নন্দন ৬০ এর দশক থেকে বেরতে শুরু করে। অসুবিধা করেই বেরত। কারণ সি পি এম করা তখন একটা কঠিন ব্যাপার ছিল। প্রচার সংখ্যা খুব কম। তার অনেক সংখ্যা আমার কাছে এখনও আছে। তারপর ৭০ এ বোধহয় বন্ধও হয়ে গিয়েছিল। গণনাট্যও সে সময় অনিয়মিত বেরত। আমার কাছে দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই আছে। বহুরূপী, গন্ধর্ব এ সব পুরনো সংখ্যা যখন নাড়াচাড়া করি তখন ভাবি বাঙালির নাট্যচেতনা কত ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে।

৭৮-এ গন্ধর্বের প্রাক্তন সম্পাদক নৃপেন্দ্র সাহা বাঙ্গুরে আমাদের বাড়িতে একদিন এলেন। বললেন, আমরা একটা পত্রিকা বার করতে যাচ্ছি, আপনাকে সঙ্গে পেতে চাই। আমি বললাম নাটকের পত্রিকা, থিয়েটারের পত্রিকা বেরবে আর আমাকে পাওয়া যাবে না কেন? এ তো খুব ভাল কথা যে আমাদের থিয়েটারের একটা নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম হবে। বলল— পত্রিকার নাম হবে গ্রুপ থিয়েটার এবং পোষকতা করবেন রমন মাহেশ্বরী। রমনের সঙ্গে আমার গন্ধর্বের আমল থেকেই ঘনিষ্ঠতা।

আমার পারিবারিক অসুবিধার জন্য গন্ধর্বের দপ্তরে বেশি যেতে পারতাম না, মাঝে মাঝে যেতাম কিন্তু রমনকে আমার বরাবরই ভাল লাগে। নৃপেনের কথায় প্রথম সংখ্যা থেকেই গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলাম। প্রথম সংখ্যায় গ্রুপ থিয়েটারের সংজ্ঞা অর্থাৎ গ্রুপ থিয়েটার কাকে বলে সে বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখলাম। তারপর ধীরে ধীরে নিয়মিত দপ্তরে যেতে শুরু করি। তখন দপ্তর ছিল রমনের পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে। এর বছরখানেক বা বছর দু'য়েক পরে আমাকে নৃপেন্দ্র এবং রমন বললেন, 'আপনাকে আমরা সম্পাদকমন্ডলীতে চাই'। আমি রাজি হয়ে গেলাম। রমন সম্পাদকমণ্ডলীর একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। নৃপেন সম্পাদক। যুগ্মসম্পাদক আমি আর নিখিল। কিছুদিন চলার পর পত্রিকার পরিচালনায় রাজনৈতিক থিয়েটার নিয়ে একটা সেমিনার হল। প্রমোদ দাসগুপ্ত থেকে শুরু করে বহু রাজনীতির মানুষ, থিয়েটারের মানুষ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এ সেমিনার হয়েছিল ৮০ সালের জুন মাসে কলামন্দিরে। সেমিনারের সমস্তটাই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। নৃপেন্দ্র সাহার অনুরোধে সেমিনারের প্রতিপাদ্য বিষয়টা আমিই লিখে দিয়েছিলাম।— তারপর যে জিনিসটা দেখলাম সেটা আমার রাগের, দুঃখের, ক্ষোভের এবং বিস্ময়ের কারণ— ৮৪ সালে বোধহয়—আমাকে ধীরে ধীরে ব্ল্যাক আউট করা হচ্ছে পত্রিকা সম্পাদক মণ্ডলী থেকে। প্রথমে নামটা নীচের দিকে নামিয়ে দেওয়া হল, তারপর দেখলাম আমার নামটা নিখিলের পরে দেওয়া হল। কারণ যাই হোক আমি তো নিখিলের থেকে সিনিয়র। ওরা আমার থেকে ভাল কর্মী হলেও আমিই সিনিয়র। তখন আমি নৃপেন্দ্র বাবুকে বললাম কী ব্যাপার? উনি বললেন আপনি তো বেশি আসেন না দপ্তরে। আমি বললাম সে তো রবীন ভট্টাচার্যও আসেন না। এগুলো ব্যক্তিগত কথা বলছি এবং ইচ্ছা করেই বলছি। নৃপেনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে যখন কোনও বিতর্কিত কথা হয় তখন তিনি চুপ করে থাকেন। তখন আমি বুঝলাম 'সামথিং রং.... '। আমি বললাম আমার নামটা বাদ দিয়ে দেবেন। নৃপেন্দ্র তাতে রাজি হয়ে গেলেন। তখন আমি বললাম, আমি যে নিজে থেকে বাদ যাচ্ছি এটা কিন্তু বলে দিতে হবে। কিন্তু দেখলাম আমাকে বাদ দিল কিন্তু ওই ঘোষণাটি ছিল না। আমি গ্রুপ থিয়েটারে লেখা

বন্ধ করে দিলাম। তারপর বছর তিনেক পর নানারকম অনুরোধে আবার লিখতে শুরু করলাম। কয়েকটা রিভিউ লিখলাম, প্রবন্ধও লিখলাম। এরও বহুদিন পরে যখন নৃপেন্দ্র সাহা বাধ্য হলেন গ্রুপ থিয়েটার ছেড়ে চলে যেতে, তখন জানতে পারলাম আমি নাকি সি পি আই, তার জন্য আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শুনে আশ্চর্য হলাম, কারণ নৃপেনের সঙ্গে আমার অত ঘনিষ্ঠতা, উনি আমাকে বলতেই পারতেন যে আমি সি পি আই। যাই হোক, এতে দুটো অসুবিধে হল। এক, আমি যে লেখাগুলো গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা বা অন্যত্র লিখতাম, রাজনৈতিক যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি লিখেছি সেই প্রবন্ধগুলো কেউ পড়েনি বা পড়ে না। একাধিক লেখাতে প্রত্যক্ষভাবে সি. পি. আই, বাংলা কংগ্রেসের সমালোচনা করা আছে। আর দু'নম্বর হচ্ছে সি. পি. আই যদি বামফ্রন্টে চলে আসতে পারে ৮০ সালে এবং তর্কের খাতিরে যদি ধরেওনি আমি সি. পি. আই, তা হলেও তো আমি বাদ যেতে পারি না। তা হলে, আমাকে না জানিয়ে আমার বন্ধুবান্ধব, বিশেষ করে নৃপেন্দ্র সাহা কেন এই কাণ্ডটা করলেন। সেটা আজও আমার কাছে রহস্য। এ ঘটনা আমি জানতে পারলাম ৬/৭ বছর পর, যখন নৃপেন্দ্র সাহা বেরিয়ে গেলেন গ্রুপ থিয়েটার থেকে তখন। সেই গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা নিয়ে আমার আর মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করেনি।

বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছে অথচ এ ধরনের সংকীর্ণতা যা কখনওই কাম্য নয় তাই দেখা যেতে লাগল। তা হলে কী লাভ? হয়ত কিছু লোক ব্যঙ্গ করবেন—এটা বুদ্ধিজীবীদের রোগ। এরা অল্পে ক্ষুব্ধ হয়, ওদের অভিমান বেশি। কিন্তু সেগুলো তো বাস্তব এবং যুক্তিসঙ্গত। আজ ২৫ বছর পরে যদি আমি ব্যক্তিগত ক্ষোভের জায়গাগুলো, বিস্ময়ের জায়গাগুলো দুঃখের জায়গাগুলো না বলি তবে থিয়েটার নিয়ে আমার যে বাস্তব ভাবনা চিন্তার ওঠাপড়া, সে ওঠাপড়া তো সত্য হবে না। যেমন, আমি নাট্য আকাদেমির সদস্য হয়েছি ১৯৯০ সাল থেকে। তবে নাট্য আকাদেমির যাঁরা সভ্য তাঁদের অনেকেই বামপন্থী বা সি. পি. এম-এর রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন বলে সভ্য নন। সি. পি. এম মতাদর্শে যাঁরা বিশ্বাস করেন বা অনেক পার্টি মেম্বারও এখানে যেমন সভ্য আছেন, তেমনই, যাঁরা বামপন্থায় বিশ্বাস করেন না বা বিরোধী তাঁরাও আছেন। এটা গত ১০ বছর ধরে মজার সঙ্গে লক্ষ করা যাচ্ছে যাঁরা ঘোষিত বিরোধী ছিলেন তাঁদের ধীরে ধীরে সব সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাথায় যাতে বসিয়ে দেওয়া যায় তার জন্য চেষ্টা চলছে। সি. পি. আই বা সি.পি.এম কেউই নন অনেক উদারপন্থী হয়ত—তাদের যাতে মাথায় বসানো যায় সেটা সি পি এম থেকেই চেষ্টা করা হচ্ছে। আনন্দবাজারে লিখে খ্যাতি পেলে সাংস্কৃতিক জগতে সি পি এম-এ তারা খাতির বেশি পাচ্ছে। এখন ধরে ধরে নাম বলতে গেলে জিনিসটা খুব খারাপ দেখাবে।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, আমরা কি এখন বলব সি পি এম একদিন যে মতাদর্শ, রাজনীতি এবং সংস্কৃতি নিয়ে চলেছিল তার কোনও বদল ঘটেছে? বদল ঘটানোর অনেকগুলো পদ্ধতি থাকতে পারে, কারণ থাকতে পারে। কারণগুলো হল, এক, সি পি এমের মধ্যে আদর্শগত বদল ঘটছে। তাদের সমাজ ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেছে, সমাজ দেখার এই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের জন্যই কিন্তু সি পি এম—সি পি আই ভাগাভাগি হয়েছিল।

সি পি এম কি সি পি আই-এর পথে চলে যাচ্ছে। তাদের ভাগাভাগি তো হয়েছিল মূলত ১৯৫৬ তে সোভিয়েতের বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসের জন্য। ক্রুশ্চেভ যখন ডি-স্ট্যালিনাইজেশন করলেন। ১৯২৭-৫৪য়ে স্টালিনের মতো অত সমর্থ নেতাই তো একটা অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া অর্থনীতিকে দাঁড় করিয়েছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়াকে প্রথম সারির শক্তিতে পরিণত করেছিলেন। একেবারে হাতে কলমে। এত বড় নেতা হয় না, ব্যক্তিগতভাবে আমার স্টালিনকে ভাল লাগে। প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করি তাঁকে। ক্রুশ্চেভ তো তাঁকে খুব গালি দিলেন। এরপর কমিউনিজমের ব্যাখ্যা, সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা, সমাজতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রয়োগপদ্ধতি সব পাল্টে যেতে লাগল। ইনার পার্টি স্ট্রাগেল—একটা চিনের ও একটা সোভিয়েতের লাইন। অবশ্য এ অভিব্যক্তি একটু সরল। এই অবস্থায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও বিভাজন দেখা গেল ৫০-দশকের শেষ দিকে। ১৯৬২তে চিন ভারতের সংঘর্ষ পার্টিকে আলাদা করে দিল। দুটো কমিউনিস্ট পার্টি হল। অর্থাৎ পার্টিটা ভাগ হয়েছিল একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের উপর—সমাজব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে। দুটোর পার্থক্য ছিল। তো আজকে এসে সেই পার্থক্যটা কি মুছে গেছে? পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস কি পাল্টে গেছে? তাই যদি হবে তবে ওই রাজনীতিকে, স্টালিনের রাজনীতিকে, ক্রুশ্চেভ থেকে গর্বাচভ—পর পর—তার মধ্যে অবশ্য অনেক ইতিবাচক কাজ হয়েছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সোভিয়েতটাকে তুলে দিল। এটা তো সংশোধনবাদের ফল। তা হলে আজকে যে মতাদর্শগত বিরোধটা আছে—যেটাকে কিছুতেই থিয়েটার কর্মীরা এড়াতে পারেন না—সেটা অন্তত অবচেতনেও থাকবে—সেই বিরোধ কেন সে প্রশ্নের উত্তর কি খোঁজা হয়? এটাই আমাদের থিয়েটার আন্দোলনের দুর্বলতা বলে আমার মনে হয়। তা বলে কি আমরা শুধু সি পি আই—সি পি এম দ্বন্দ্ব নিয়েই চলব? কিছুতেই না। এটা মূল কথা না, মূল কথা হল এটার মধ্য দিয়ে কি আদর্শটা প্রতিফলিত হচ্ছে। এই আদর্শ কীভাবে থিয়েটারে প্রতিফলিত হল সেটাও তো দেখা দরকার। আমরা কোনটাকে ধরব? কোন মতাদর্শের বীজের দিকে যাব?

অনেকে বলেন আমাদের আদর্শ ব্রেখট। আমরা জানি এতবড় নাট্যকার বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বে আর জন্মায়নি। যদিও চেখভ

আমার প্রিয়। আরও অনেকে আছেন। তাঁদের লেখা পড়েছি, কিন্তু ব্রেখট কখনও কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার ছিলেন না। অথচ তিনি বিশ্বাস করতেন ক্যাপিটাল পড়া ছাড়া, কার্ল মার্কস ছাড়া কোনও উপায় নেই। কারণ এটা না করলে সমাজকে ব্যাখ্যা করা যায় না। শুধু তত্ত্বটা জানলে হবে না, জীবনে প্রয়োগ করার পদ্ধতিটাও জানতে হবে। তত্ত্ব এবং প্রয়োগ এই ব্যাখ্যাগুলো নিয়ে বোধহয় আমাদের কোথাও একটা দুর্বলতা আছে। যার জন্য আজ প্রায় ১২ বছর হল সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত বাংলায় একটা ভাল বই বের হল না। এমনকী রাশিয়া থেকেও কর্তাভজার দল যে বইগুলো বার করছে তাতে শুধুই প্রাক্তন সোভিয়েতকে গালাগালি। আবার উৎপল দত্ত যখন 'প্রতিবিপ্লব' বইটি লেখেন তখন এমন একটা একপেশে সরল সমীকরণ করেন যে আসল জিনিসটা পাই না। তা হলে আমাদের এখানে দরকার যে, সোভিয়েতের বিপর্যয়টা যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করার, যাতে আমরা জানতে পারি, বিচার করতে পারি, আলোচনা করতে পারি। এগুলো না জানলে আমাদের থিয়েটার আন্দোলনের ক্ষতি হচ্ছে। অর্থাৎ আমার অবস্থান পরিষ্কার হচ্ছে না। যার ফলে সমাজকে ব্যাখ্যা করতে পারছি না। সমাজকে ব্যাখ্যা করলেই তো হবে না, ওটাকে ভেতরে নিতে হবে, জীবনের মধ্যে নিতে হবে। সেটা না করে নাটক লিখলে তা ম্যাড়মেড়ে হতে বাধ্য।

আজ যখন দেখি থিয়েটারের নেতৃত্বে চলে আসছেন তাঁরা, যাঁদের সঙ্গে এক সময় এই মতাদর্শের বিরোধ ছিল, বা যাঁরা ৭০ দশকে পথে ঘাটে সি পি এম খুন হওয়াটাকে সমর্থন করতেন। কেউ কেউ হয়ত সক্রিয়ভাবে সি পি এম খতমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা নেতৃত্বে চলে আসছেন। আমি যে সব খবর রাখি তার সবটা ভুল নয়। তাঁরা আজ ভীষণ ভাবে বামপন্থীদের সঙ্গে এসে গেছেন। এবং আমাদের নেতৃত্ব তাঁদের সমর্থন করছে। তাহলে আমাদের নাট্য আন্দোলনের কী হবে? গোড়াতেই কোথাও একটা গলদ বা অসত্য আছে, চেতনার বিপর্যয় আছে, নইলে এরা কী করে নেতৃত্বে চলে আসেন?

সি পি এমের সংস্কৃতি কর্মীরা কাজের দিক থেকে চিন্তার দিক থেকে এতই কি অপটু যে তাঁদের জায়গাটা ধীরে ধীরে বিরোধীরা দখল করে নিচ্ছেন? ওরা কি অনেক বুদ্ধিমান? ইদানীং যেসব নাটক নিয়ে মাতামাতি করা হচ্ছে তাদের আপাতভাবে একটা প্রগতিশীল চেহারা আছে। আড়ালে আড়ালে ওরা আমাদের প্রকৃত রাজনীতির দিকে নিয়ে যেতে চায় না। চেতনাকে গুলিয়ে দিতে চায়। কারোর নাম বলতে পারব না কারণ এখন আমার অসুবিধা হয়েছে যে আমার ছেলে থিয়েটার করে। যাই বলব অন্যেরা ছেলের রেফারেন্স টানবে। আমি তো জগন্নাথের সম্বন্ধেই লিখেছিলাম যে নাটকটা আমাদের চেতনাকে অস্বচ্ছ করে দিচ্ছে।

এটা গেল একটা দিক। এতক্ষণ যা বললাম তা হল গ্রুপ থিয়েটার আমাদের কমিটমেন্টের জায়গা। গণনাট্যের যে ছিল Peoples' Theatre Stars the people অর্থাৎ চেতনাকে জাগিয়ে শিল্পসম্মত ভাবে তার পরিবেশন — সেটাই গ্রুপথিয়েটারের কাজ। তা কেন দূরে সরে যাচ্ছে?

এখন, 'দায়বদ্ধতা' শব্দটা ব্যবহার করতে করতে হয়ত কিছুটা বিবর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু করার কিছু নেই, কারণ 'প্রেম' শব্দটাও তো এতদিন ব্যবহার করতে করতে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে কিন্তু প্রেম বোঝাতে গেলে ওর বিকল্প শব্দও কিছু নেই। এই দায়বদ্ধ থিয়েটারটারের দায়িত্ব কি? — সুস্থ ভবিষ্যৎ। শিল্পী সাহিত্যিকরা কিন্তু চিরকাল এটাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এই সুস্থ ভবিষ্যতে পৌঁছাতে গেলে থিয়েটারকে যে পথে চলতে হয়, সেটা ঠিক করা দরকার অর্থাৎ রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি — তার ইতিহাস পারম্পর্য জানতে হয়। আমাদের প্রদেশের, সারা দেশের, সারা পৃথিবীর পরিস্থিতিকে জানতে হয়। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন এসেছে পৃথিবীতে সেটাও যৌথভাবে জানতে হবে। কারণ, থিয়েটারের ক্ষেত্রে একজনকেই যে জানতে হবে তার কোনও মানে নেই। সকলে মিলে করতে হবে, থিয়েটার তো একটা যৌথ শিল্প। তাই যদি করতে হয়, তা হলে আমরা কি সেভাবে নিজেদের তৈরি করি? গ্রুপ থিয়েটারের কি সে ভাবে চেষ্টা আছে? সেভাবে আমরা হারমোনিটা আনতে পারি না, সংঘবদ্ধ হতে পারি না, সংঘবদ্ধ ভাবে কাজটা করতে পারি না। এটা আমাদের ত্রুটি। কাজেই আমরা যে দায়বদ্ধতার কথা বলি সেটা মুখের কথা বলি, মনের ভিতর থেকে উঠে আসে কি? আমার সন্দেহ আছে। এখনকার থিয়েটারের মধ্যে এটা উঠে আসছে না, এর কারণ কিন্তু এই নয় যে তারা কম সচেতন। আসলে পরিবেশটা বদলে গেছে গত পঁচিশ বছরে। সেটা কীভাবে? আমাদের কতকগুলো সিদ্ধান্ত যেন রাজনৈতিক ভাবে নেওয়া হয়েই গেছে। যে শ্লোগান তৈরি হয়েছে তার পিছনে যে কতটা স্বার্থত্যাগ, কৃচ্ছ্রসাধন ছিল সেগুলোর কথা মনে থাকছে না। তার ফলে শ্লোগানটাই মুখ্য হয়। স্বার্থত্যাগ, কৃচ্ছ্রসাধন বিযুক্ত হয়ে পড়ে।

দু'নম্বর হল যে, আমাকে অনেক দিন আগে একজন বিখ্যাত নাট্যকর্মী বলেছিলেন — এখনকার ছেলেমেয়েদের সিনসিয়ারিটি কম, টি ভির দিকে যায়। আমি বললাম, এটা আমি বিশ্বাস করি না, আমাদের আর ওদের সময়ের অনেক পার্থক্য আছে। প্রথম পার্থক্য হল অর্থনৈতিক। আমাদের সময় অর্থাৎ পাঁচের দশক ছয়ের দশকে যে কোনও একটা কোয়ালিফিকেশন থাকলে একটা চাকরি বাঁধা থাকত। আমি নিজে পাঁচ বা ছয়ের দশকে কতবার চাকরি পাল্টেছি। বি.এ. পাশ করার পরে এক সপ্তাহের মধ্যে

শিক্ষা দপ্তরে চাকরিতে যোগদান করেছিলাম। এখন এটা কল্পনা করা যায়? এরপর আমার বন্ধু গণনাট্যের দিলীপ ঘোষালের ব্যবস্থাপনায় আড়িয়াদহ স্কুলে যোগ দিলাম, রাইটার্স ছেড়ে। আজকের ছেলেরা অনেক সিরিয়াস, কিন্তু ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভিতটা নষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষ করে বাজার অর্থনীতি আসার পর। লক আউট, লে-অফ, ছাঁটাই, রেল বিভাজন এ সবই বাইরের অসুখের চেহারা কিন্তু মূল অসুখ ওই বাজার অর্থনীতি অর্থাৎ আমাদের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে আমেরিকার নিয়োজিত অর্থনীতিকে ঢোকানো হচ্ছে। যার ফলে সমস্ত জায়গায় এমনকী পশ্চিমবঙ্গ সরকারেও এমপ্লয়মেন্টের সুযোগ কমে গেছে। আজ, স্কুল কলেজে মাইনে হচ্ছে না, নিয়োগ বন্ধ হয়ে আছে। আগে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ছিল চল্লিশ-এক এমন সেটা আশি-এক হচ্ছে।—এরপর শোনা যাচ্ছে চুক্তি ভিত্তিতে চাকুরি হবে। এ সবের মধ্য দিয়ে কেউ কি কখনও সিরিয়াস থাকতে পারে? জীবনের কোনও নিরাপত্তা নেই, অর্থনীতির কোনও নিরাপত্তা নেই। ছেলেমেয়েগুলোর বয়স হয়ে যাচ্ছে। বয়স হয়ে গেলে কতকগুলো জৈবিক চাহিদা থাকে, শুধু খাওয়া পরা নয়। এরা সংসার করতে পারছেনা। ক্রমাগত উৎকেন্দ্রিকতা বাড়ছে। আমরা কি চেষ্টা করছি কেউ মূলে পৌঁছাতে? কোনও ব্যবস্থা কি আমরা নিতে পারছি অর্থনৈতিকভাবে? তা হলে তারা কমিটেড থাকবে কী করে? তা হলে কেউ যদি টি ভি র দিকে যায়, এতগুলো চ্যানেল হয়েছে, ফলে তার যদি কিছু রোজগার হয়, তা হলে কি তাকে আমি অন্যায় বলব? তার তো সৎ ভাবে কিছু রোজগার করার প্রয়োজন আছে। তা হলে তাকে আমি কী করে বলব যে তার সিনসিয়ারিটি নেই। কাজেই ওটা ঠিক নয়, বরং এত নাটকের দল বেড়েছে, এই সমস্ত অসুবিধে সত্ত্বেও কত ছেলেমেয়ে, তারা ভাল খেতে পায় না, টিফিন পায় না অথচ সেই নাটকের দলগুলোতে ভিড় করছে। ঘন্টার পর ঘন্টা রিহার্সাল করছে— অনেক ঘরে ভাল ভেন্টিলেশন নেই, সেখানে তারা দিনের পর দিন রিহার্সাল দিচ্ছে, নাটক করছে গাদা গাদা—দর্শক হয় না। কেন করছে? কখন একটা সরকারি স্বীকৃতি পাবে বলে? না, তা নয়। অত ছোট করে দেখলে হবে না। নিশ্চয় কোথাও একটা খিদে আছে, শুধু কিছু করার নেই বলে নাটক করছে, তা নয়। তাদের লঘু করে দেখলে হবে না। টেকনলজির কল্যাণে তো আমরা দেখছি কুচবিহার, বা জলপাইগুড়ি বা মেদিনীপুর কোথায় কী কাজ হচ্ছে তার মোটামুটি একটা খবর আমরা রাখতে পারছি। এদের মধ্যে বেশ কিছু কাজ খুবই ভাল। সেগুলিকে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না। এটাই হচ্ছে কমিটমেন্টের সুফল। অসুবিধাটা কোথায় হচ্ছে তা হলে? আমাদের কমিটমেন্টটা সুস্থ প্রকাশের জায়গা পাচ্ছে না।

মাথায় ইচ্ছাগুলো আছে। ইচ্ছাগুলোকে প্রবাহিত করতে হয়। হিমালয়ের মাথায় বরফ জমে আছে, সেই বরফটা নদী হয়ে বেরিয়ে এলে তারপর তো প্রবাহিত হয়ে দেশকে উর্বরা করবে। আমাদের বরফ শুধু জমেই আছে। প্রবাহিত হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? তার প্রথম কারণ হল দর্শক কমে গেছে। পেশাদার মঞ্চ উঠে গেছে প্রায়। কারণ আমাদের পেশাদার মঞ্চের দর্শক ছিল আধা সামন্ততান্ত্রিক। এবং ওই ধরনের নাটকগুলোই তাদের খুশি করার জন্য লেখা হত। গত পঁচিশ বছরে সেই আধাসামন্ততান্ত্রিক দর্শকের মনস্তত্ত্ব পাল্টে গেছে। বাম রাজনীতি, বিশেষ করে পঞ্চায়েতের কাজের ফল এইটা। সমাজবাদী একটা দৃষ্টিভঙ্গি এসেছে। এবং যৌথ পরিবারের সেই স্যাঁতসেঁতে পারিবারিক ভঙ্গিটা নাটকে আর প্রতিফলিত হলে চলবে না। ওইসব ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটক আর চলে না। দেবনারায়ণ গুপ্ত শরৎচন্দ্রের অনেক কাহিনিকে নাটক করে চালাতে চেষ্টা করেছিলেন। শেষ দুর্দান্ত চেষ্টা করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নানা ধরনের নাটক করে কিন্তু ফেরা বা নামজীবন বা নীলকণ্ঠের মতো নাটক যিনি করেছেন তাকে শেষ পর্যন্ত ঘটকবিদায়-এর মতো নাটক করতে হল। তিনিও অবশেষে পেশাদার মঞ্চ ছেড়ে গেলেন। কেন না ততদিনে দর্শকদের মেজাজ পাল্টে গেছে। পেশাদার মঞ্চের দর্শকের সামাজিক পরিকাঠামোটাও পাল্টে গেছে। সেটা ফেরানো যাবে না। কারণ সমাজটা ওভাবে পাল্টানো যায় না, ফিরিয়ে আনতে পারবে বলে যতই চেষ্টা করুক, স্টার থিয়েটার খুলুক—হবে না। আসলে আমাদের দরকার দর্শক কীভাবে কমছে, কেন কমছে সেটা দেখা। না হলে থিয়েটার বাঁচবে না। থিয়েটারও তো একটা কমোডিটি, আর তাই যদি হয়, তবে একটা বিপণনের ব্যাপার থাকেই। ঠিক হলে তুমি যে নাটক দেবে দর্শক তাই নেবে, এবং সেই দর্শকের মন মেজাজটা যদি গুলিয়ে থাকে, তা হলে সেই দর্শকের মানসিকতায় যে নাটক দেওয়া হবে সে কী করে তা নেবে। এখানেই আমাদের একটা দ্বন্দ্ব চলছে। সেই দ্বন্দ্ব থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এখনও বেরিয়ে আসতে পারিনি আমরা। হয়ত পারব আরও কিছু পরে।

তার ফলে হচ্ছে কি, আজকে এত দল, অথচ কটা দলের নাটকে দর্শক হয়? মাঝখানে সায়ক কয়েকটা নাটক করে পর পর খুব সফল হয়েছে। অসিত মুখোপাধ্যায় কয়েকটা পর পর কাজ করলেন শেষের দিকে—তখন বিকেল, আকরিক, জন্মদিন, অসিতবাবু তো চলেই গেলেন। অরুণ মুখোপাধ্যায় প্রায় কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন, তাঁর ছেলে সুমন অবশ্য ভাল কাজ করছে। তারপর বিভাস, সে তো নিজের দলে আর প্রায় নাটক করেই না। আর করলেও তেমন সাড়া জাগায় না। শেষ ভাল নাটক করেছেন সেই হিসাবে ১৯৮৬ তে মাধব মালঞ্চী কইন্যা। অথচ বিভাসের মতো শক্তিশালী পরিচালক কমই হয়। বহুরূপীর

ক্ষেত্রেও তাই, নিন্দাপঙ্কই বোধহয় শেষ ভাল নাটক। তাও দর্শকরা কাকাতুয়া বা মৃচ্ছকটিকের মতো নাটক নেয়নি। মৃচ্ছকটিক পরিচালনা করেন কুমার রায় ১৯৭৯তে। তার মানে বামফ্রন্ট আসার পরে। বামফ্রন্ট আসার পর থেকে যে ভাল ভাল নাটক হয়েছে, লোকে নিয়েছে, আজকে তার মধ্যে একটা ভাঁটা দেখা যাচ্ছে কেন? কারণ সামাজিক হতাশা বেড়ে গেছে। আমরা আমাদের সময়টাকে ঠিকমত ধরতে পারছি না, ব্যাখ্যা করতে পারছি না। তার ফলে সমস্ত নামী নাট্যকারের নাটক হয়ে যাচ্ছে দেবীমূর্তির মতো। সবগুলো মুখ এক রকম। যেমন ভাদু মূর্তি তৈরি হয় সব একইরকম। তাঁরা অনেক নাটক লেখেন, প্রযোজনা হয় কিন্তু সবগুলো প্রায় একই রকম। তারপর আরেকটা অসুবিধা আছে, সেটা হচ্ছে প্রযোজনা ব্যয়। বড্ড বেড়ে গেছে। কারণ প্রতিযোগিতা বেড়েছে। প্রতিযোগিতা বাড়লে উপস্থাপনার ব্যয় বাড়বেই—বিপণন তো, বিপণন থাকলে খরচ বাড়বেই। আমার কাছে রক্তকরবীর হ্যান্ড বিল আছে, উৎপল দত্তের সুন্দর প্রযোজনা অঙ্গারের আছে। বহুরূপীর ইদিপাসের আছে। তখন তো বহুরূপীর খুব রমরমা যাচ্ছিল। আরও অনেক আছে। এখন অত ম্যাড়মেড়ে হ্যান্ডবিল সাধারণভাবে বিশেষ কেউ করে না। কারণ মার্কেটিং। তখন এখনকার মতো স্পনসরশিপ ছিল না। এত দৌড়াদৌড়ি ছিল না। কেন না প্রযোজনাব্যয় বেড়েছে, হলের ভাড়া বেড়েছে, একটা নাটকের প্রযোজনার প্রাথমিক ব্যয় এখন মোটামুটিভাবে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা। কটা দলের সামর্থ আছে? একটা ছোট দল যদি এই টাকাটা কোনও মতে খরচা করেও, তারপর প্রত্যেকটা শো পিছু খরচা বারো থেকে পনেরো হাজার টাকা। কি করে টানবে? কল শো ছাড়া শুধু হল শো-তে দল বাঁচে না। কিন্তু কটা দল কল শো পায়? অভিনেতা অভিনেত্রীরা তো প্রায়ই কোনও পয়সা পায় না। কিন্তু টেকনিক্যাল হ্যান্ডসদের তো দিতেই হবে। তা হলে বিজ্ঞাপন দিতে, হলকে, অন্যান্যদের সবাইকে টাকা দিতে হবে অথচ নাট্যকার বা অভিনেতা—অভিনেত্রী যাদের ওপর ভিত্তি করে নাটক গড়ে উঠছে, তাদের বেলায় কিছু নেই। এ ভাবে কি খুব বেশি দূর যাওয়া যায়?

আগে এই খরচগুলো কম ছিল এবং এতটা প্রতিযোগিতাও ছিল না। তার মধ্যেও চলেছে। উৎপল দত্ত চাকরি করতেন, সেটা ছেড়ে দিলেন। শুধু থিয়েটার করেছেন। পরে প্রচণ্ড ক্ষমতা ও প্রতিভার বলে ফিল্মেও অভিনয় করেছেন। ছায়ানট বা নীচের মহল ব্যর্থ হয়, অঙ্গার থেকেই তার থিয়েটার সব দিক থেকে একটা স্টেডি থিয়েটারের জায়গায় চলে এল। স্টেডি না হলে কুশীলবদের জীবনযাপনের উপযোগী হতে পারে না। আগে এটা সম্ভব ছিল কারণ সকলেই প্রায় চাকরি বাকরি করতেন। বহুরূপী বা লিটল থিয়েটারের প্রায় সবাই চাকরি করতেন। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় একমাত্র যিনি থিয়েটারে কোনও দল বদল করেননি—তিনি চাকরি করতেন। আজকে কটা ছেলে বলতে পারে যে আমি চাকরি করে নাটক করছি। এখন তরুণ বয়সের ছেলেমেয়ে চাকরি পেয়ে এ সব করছে এটা খুবই কম। কাজেই তারা সমাজের দিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, শিল্পের দিক থেকেও অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। এরা কী করে এত বঞ্চনা নিয়ে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তুলবে?

এখন স্পনসরশিপের জন্য বড় বড় কোম্পানিগুলোর কাছে যেতে হয়। তারা হয় বিজ্ঞাপন দেয় বা অন্য ভাবে টাকা পয়সা দেয়। আবার কটা কোম্পানিই বা সেটা দেয়। এ তো শুধু বিজ্ঞাপন দেওয়া বা টিকিট ছাপিয়ে দেওয়া নয়। যে বড় কোম্পানিগুলো ভাল পরিমাণ টাকা দেয় তাদের মালিক কারা? সেই মালিকরা কখনওই চাইবে না সমাজের পরিবর্তন হোক বা এক্সপ্লয়টেশনটাই বজায় থাক। চাইবে, এটা চাইবে আবার দায়বদ্ধ থিয়েটারকে স্পনসর করবে—একটা বৈপরীত্য আছে না? তবু তারা করে, কারণ তারা আসলে স্পনসরশিপের মধ্য দিয়ে একটা পরিকাঠামো তৈরি করে এই ভাবে যে—তোমরা যারা পাচ্ছ তারা আমাদের মতো বিগ হাউসদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকো। তারা যে কাজকর্ম করবে তার প্রতিবাদ করো না, মঞ্চে এনো না। সেটা ধীরে ধীরে ইনজেক্ট্ করতে করতে আজকে বাংলা থিয়েটারের দশা কী জায়গায় এসেছে। ভাল নাটক মানেই কিন্তু রাজনৈতিক নাটক সেটা কতটা ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই প্রতিফলিত হোক না কেন। ডলস হাউস রাজনৈতিক নাটক। চেরি অর্চার্ড রাজনৈতিক নাটক। কিন্তু সোচ্চার ভাবে রাজনীতি আসেনি। ব্রেখটের মাদার কারেজ বা গালিলিওর মতো অত ভাল রাজনৈতিক নাটক খুব কম হয়েছে। কাজেই ব্যক্তিগত বা সামাজিক বা রাজনৈতিক যে সম্পর্কের ভিতর দিয়ে আসুক না কেন, যদি সেটা ভাল নাটক হয় তবে সেটা রাজনৈতিক নাটক হবেই। এ রাজনীতিটাকে ব্যাখ্যা কয়ার মতো অবশ্য তার যোগ্যতা থাকা দরকার। কাজেই স্পনসররা তো চাইবেই যাতে বিগ হাউসগুলো আক্রান্ত না হয়, সুস্থ থিয়েটার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটাও কি সম্ভব? মারাত্মক আপোস করতে হবে।

এটা কি করে কেউ, আর করলেও কতদূর এগুনো যাবে? ওরা খানিকটা সুতো ছাড়ে। তারপর যখন থিয়েটারের পরিকাঠামোটা ধ্বংস হয়ে যায় তখন নিজেদের গুটিয়ে নেয়। এটা ওরা করে অত্যন্ত পরিকল্পনা মাফিক। এখন যে স্পনসরশিপ কমে আসছে ধীরে ধীরে। তার বিকল্পটা কী? না, নাট্য আকাদেমি। নাট্য আকাদেমি গত ১০ বছরে বহু টাকা খরচ করেছে। এই তো ২০০২ সালে নাট্যমেলাই করেছে প্রায় ১৪ লাখ টাকা খরচ করে। তার আউটপুট কতটা হয়েছে এ নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি।

তবে এটা ঠিক একটা আলোড়ন তোলা গেছে। ২০০২-এ বোধহয় করা যাবে না, যদি না পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। যদি উন্নতি হয় তা হলে হয়ত করা যাবে। তা হলে স্পনসরশিপের বদলে যে বিকল্প বন্দোবস্ত, সেটাকে গড়ে তুলতে হবে। তার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু সরকারি ব্যবস্থার মধ্যেও নানা চোরা স্রোত আছে। ফলে নাটকের দলগুলো হয়ে যাচ্ছে কিছুটা যেন সুবিধাবাদী। একটা অদ্ভুত বিষয়, কিছু বলার নেই।

আমার মনে আছে উত্তরবঙ্গের একটা দল, নাম করছি না, বাংলা রঙ্গমঞ্চের দুশো বছরে নাট্য আকাদেমির পক্ষ থেকে কিছু কিছু পরিচালককে বেশ ভাল পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়েছিল— এ দলটিও টাকা পেয়েছিল। তার পরিচালক এল। মীর মোশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' নাটকটা খুঁজে পাচ্ছে না। আমার কাছে এল। আমার কাছে ছিল, আমি জেরক্স করে দিলাম। তারপর বলল এটা কেন করছি আপনি লিখে দিন। কোনও দিন পড়েনি তো, অথচ করতে হবে একটা প্রগতিশীল নাটক। অনেক নাম শুনেছে। সেটাও দিলাম। তারপর কী কী বই পড়ব বলুন, কারণ ওটা উনিশ শতকের বাংলা দেশের কৃষক সমস্যা নিয়ে। কয়েকটা বইয়ের নাম লিখে দিলাম। এর পরও উত্তরবঙ্গ থেকে মাঝে মাঝে ফোন করে কী করবে না করবে জানতে চেয়ে। তাও বললাম। তারপর এক সুপ্রভাতে জানতে পারলাম ওরা কলকাতায় এসে নাটকটা করে গেছে। আমাকে জানায়নি। অর্থাৎ যতটুকু সময় পর্যন্ত আমাকে দরকার হয়েছে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। এই ধরনের ইনসিনসিয়ারিটি গ্রো করেছে। এমন উদাহরণ আরও আছে। অন্য দিকে সুবিধাবাদের যেন একটা বিশাল টানাপোড়েন চলেছে। এই নৈরাজ্যকে স্বীকরণ করে নিয়েই হয়ত আমাদের থিয়েটার ভবিষ্যতে বাঁক নেবে।

তা ছাড়া যেটা হয় তা হল অ্যাকাডেমিতে নাটক হচ্ছে হয়ত। যারা থিয়েটারের লোক তারা পরিচিত তাই কমপ্লিমেন্টারি নিয়ে নাটক দেখছেন, এটা অনেকেই দেখেন। তাতে আর যাই হোক থিয়েটারের খরচা তো ওঠে না। তবে এই জিনিসটার একটা ইতিবাচক দিক আছে— যদি বেশি লোক দেখে, তবে লোকে বুঝবে এত লোক যখন ভিড় করছে তা হলে নাটকটা ভাল হয়েছে। একটা হুইসপারিং ক্যাম্পেন হয় এতে। ভাল নাটক হলে ভাল আর যদি ড্যামেজ করার ইচ্ছা থাকে তাও করে দেয়। সেটা অনেক সময় খাঁটি ভাবে বলে, কখনও কখনও অসৎ ভাবে বলে। তাতে কিন্তু থিয়েটারের অর্থনীতির উন্নতি হচ্ছে না। এটা না হলে জীবনযাপনের পদ্ধতি সুস্থ হচ্ছে না। আর জীবনযাপনের পদ্ধতি সুস্থ না হলে সুস্থ জীবনবোধ আসবে কী করে।

এই পরিস্থিতিতে আজকে আমরা ২০০২ সালের এই সময়টাতে এসে পৌঁছেছি। জানি না এর পর আমাদের কাঠামো কী হবে। রাজনীতি যে ভাবে পাল্টে গেছে, ২৫ বছর আগেকার রাজনৈতিক চিন্তাধারা, অর্থনৈতিক চিন্তাধারা এগুলো পাল্টে গেছে। পাল্টাতে বাধ্য কারণ পশ্চিমবঙ্গ তো দেশছাড়া নয়। সারা দেশে যে ধরনের সুবিধাবাদ ও মৌলবাদ রয়েছে, জাতপাত নিয়ে যেভাবে রাজনীতি হচ্ছে, ভারতবর্ষ পঞ্চাশটা রাজ্যে বিভক্ত হবে কি না, রেল বিভাজন হবে কি না এ সব নিয়ে কুৎসিৎ রাজনীতি হচ্ছে। গুজরাতের মতো ঘটনা ঘটছে। এটা এনকাউন্টার করার জন্য নাট্যকর্মীদের যা করার দরকার আমরা কি সেটা করছি? রাজনৈতিকভাবেও যেটা করা দরকার সেটাও কি আমাদের করা হচ্ছে? এই যে হচ্ছে না এটা কিন্তু উদ্বেগের ব্যাপার। আমরা কোন দিকে যাচ্ছি? সমাজ যদি না বাঁচে, তার অর্থনীতি যদি না বাঁচে, মানুষগুলো যদি না বাঁচে তাহলে থিয়েটার কি বাঁচবে? অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?

তবু আমার মনে হয় গ্রুপথিয়েটার বা গণনাট্য পত্রিকা সকলের সঙ্গেই আমার বন্ধু সম্পর্ক, তারা এক সঙ্গেই চলছে তবু এদের আমার মনে হয় রুগ্ন। কারণ ওই যে বললাম সুস্থ সংস্কৃতি করতে গেলে যে ধরনের সমাজকে ব্যাখ্যা করা দরকার, সেই ব্যাখ্যা করে জিনিসটাকে শিল্পে রূপান্তরিত করা দরকার সে রকম গঠন মূলক তেমন কিছু হচ্ছে না। নাটক বা প্রবন্ধ হয় খুব ম্যাড়মেড়ে। কিছু দিন আগে দেখলাম গণনাট্য পত্রিকায় একজনের লেখা, তাঁকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি। তাঁর একটা সাক্ষাৎকারে তিনি বলছেন বহুরূপী রাজা অয়দিপাউস করেছিল ওটা ভুল ছিল। ৬৪ তে যখন নাটকটা শুরু হয় তখনও এ প্রশ্ন উঠেছিল। — কিন্তু 'এটাতো ভারতীয় আদর্শের পরিপন্থী—' এ কথা তিনি কেন বললেন? ভারতীয় আদর্শ বলতে কী বোঝায়? যেহেতু না জেনে এক মহিলা তার সন্তানকে বিবাহ করেছিলেন, সন্তান উৎপাদন করেছিলেন সেহেতু ভারতীয় আদর্শের পরিপন্থী। তা হলে ভারতীয় আদর্শ কি এক নারীর পাঁচটা স্বামী থাকা? বা রমণীদের নদীতে নগ্ন করে তাদের পোশাক নিয়ে গাছে উঠে যাওয়া? তার চেয়েও বড় কথা বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা বলে একটা বই আছে দশম শতাব্দীতে লেখা। জাতকের গল্প— এক রমণী তার যৌন তাড়নায় কোনও পুরুষ না পেয়ে পরিচারিকার সাহায্যে নিজের যুবক ছেলের সঙ্গে অন্ধকারে মিলিত হয়। — এটাই কি ভারতীয় আদর্শ? অর্থাৎ আমাদের নাটকের বোধ এখনও তেমন জন্মায়নি, আমরা কতকগুলো ছাঁচে ফেলে নাটক দেখি। অত ছাঁচে ফেলে শিল্প হয় না। তখন ইডিপাস নিয়ে এই মন্তব্য কি ঠিক? যে নাটকটা আড়াই হাজার বছর ধরে টিকে আছে তাকে কি ওভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায়? এটা তো বোধের অভাব। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন মহাকাব্য পড়তে হয় না, না পড়েই মন্তব্য করা যায় কারণ সবার মনে তা ভাসছে। রামায়ণ মহাভারত ভাল কিন্তু কেন ভাল সেটা তো আমরা বিচার করে দেখিনি বিশেষ।

একটা সময় ছিল যখন বঙ্কিমচন্দ্রকে বলা হত প্রগতি বিরোধী, রবীন্দ্রনাথকে কম আক্রমণ করা হয়েছে? যখন আমরা আড়িয়াদহ গণনাট্যে রক্তকরবী, ফাল্গুনী এগুলো করেছি তখন কিন্তু অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় নেতা বলেছিলেন গণনাট্যের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তারা রবীন্দ্রনাথ করছে। আজ রবীন্দ্রনাথ বলতে আমাদের জিভে জল ঝরে যায়। রবীন্দ্রনাথকে উচ্চারণ করার যোগ্যতা তৈরি হয় এমন কিছু কি সত্যিই আমরা ভেবেছি? কাজেই শিল্পের বোধটা আগে জন্মাতে হবে। শিল্পের বোধ এমনি হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'লেজই বল আর কবিত্বই বল ভিতর হইতে বাহির না হইলে টানিয়া বাহির করা যায় না।' কাজেই বোধ কিসের থেকে হতে পারে এ নিয়ে প্রচুর আলোচনার দরকার। এই আলোচনার অভাব আছে আমাদের। পত্রিকাতে কিছু ক্লাসিক নাটক, যা এখনও পৃথিবীতে প্রযোজিত হয়, তাদের অনুবাদ করে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ বোঝানো কেন এটা ভাল নাটক। সে কাজটা গ্রুপ থিয়েটার বা গণনাট্য কটা করেছে? তারপর ঠিকঠাক ক্লাস করা। ওই নাট্য আকাদেমিতে যেভাবে ক্লাস হয়— ওই ওয়ার্কশপ, ওয়ার্কশপ মানে কারখানা। তার মধ্য দিয়ে নাট্যপ্রয়োগ শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। বিজ্ঞান ও শিল্পকে মেলানোর চেষ্টা চলে। এটা নিয়ে আরও পরিকল্পনা নেওয়া দরকার, গ্রুপ থিয়েটার ও গণনাট্যও এক সঙ্গে বা আলাদা ভাবে দুজনেই একাজ করতে পারে। লোকজন ডেকে ভাল ভাবে আলোচনা করে দেখানো যেতে পারে কোথায় দুর্বলতা। প্রসঙ্গত আরও কিছু তথ্যের কথা উল্লেখ করা যায়। ষাটের দশকে নান্দীকার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় পিরানদেল্লোর একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করেছিল। বামপন্থীদের কোনও কোনও মহলে তা নিয়ে কম আলোড়ন হয়নি। পিরানদেল্লো মুসোলিনির সমর্থক, তাই তাঁর নাটক নাকি প্রতিক্রিয়াশীল। বহু পরে যখন গ্রামশ্চির রচনা আমাদের হাতে এল, দেখা গেল তাঁর বহু লেখায় পিরানদেল্লোর নাটকের প্রশংসা। মার্কসীয় তাত্ত্বিক হিসাবে গ্রামশ্চির খ্যাতি জগৎজোড়া। তাই আমরা ঢোক গিলতে বাধ্য হলাম। এ ধরনের বোধকে আমরা কী বলব? কিছু দিন আগে একজন আলোচকের লেখায় দেখা গেল অদ্ভুত এক তত্ত্ব। সত্তরের দশকে কলকাতার মঞ্চে যখন ব্রেখটের কিছু নাটক বাংলা চেহারায় প্রযোজিত হয়েছিল সেটা নাকি ছিল সমকাল থেকে পলায়ন। আবার এখন যাঁরা ব্রেখট করছেন তাঁরা অত্যন্ত প্রগতিশীল। সত্তরের দশক কিন্তু অনেক কঠিন ছিল। তা ছাড়া এ যুক্তি যদি স্বীকার করতে হয় তা হলে বলতে হবে ব্রেখট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে যে সব নাটক জার্মানিতে থাকার সময় লিখেছিলেন সেগুলো আমেরিকায় বাসকালে লিখিত নাটকগুলোর থেকে শক্তিশালী। অথবা সবগুলো নাটকই খারাপ। কেন না ফ্যাসিস্ট জার্মানি অথবা সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার মধ্যে ফারাক কতটুকু? ব্রেখটকে এমন যান্ত্রিকভাবে বিচার কেন করা হবে?

যাই হোক ভাল নাটক অনুবাদ করে এবং পুরনো নাটক ছাপিয়ে এবং তার বিশ্লেষণ করতে হবে কেন এটা ভাল নাটক— এবং সেটাকে বোঝাতে হবে। সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছোট বড় মাঝারি দেশি বা বিদেশি নাটক অনুবাদের অথবা পুনর্মুদ্রণের প্রচুর প্রয়োজন আছে, পৃথিবীটা এখন ওয়েবসাইটের যুগে ছোট্ট হয়ে গেছে, কাজেই আমাদের তো খোঁজ নিতে হবে কোথায় কী হচ্ছে। আজকে তো আফ্রিকা জেগে উঠেছে, লাতিন আমেরিকা জেগে উঠেছে সেখানে বা অন্যান্য দূরবর্তী জায়গায় কত মারাত্মক মারাত্মক নাটক হচ্ছে। আমরা সমগ্র পৃথিবীর নাট্য আন্দোলন থেকে কেন পিছিয়ে যাব? সেই নাটকগুলো ও তার তথ্যগুলো আমাদের দরকার, সেটা তো একজনে পারে না। তার জন্য একটা টিম ওয়ার্ক দরকার। এই তো বার্টল্ট ব্রেখটেরই সব নাটক অনুবাদ হয়নি এখনও। এ ছাড়া কাইজার, পিটার ভাইস, দারিও ফো প্রভৃতির নাটক তো আছে। এ রকম বহু নাটক আছে। আমেরিকান বা লাতিন আমেরিকান নাটক আছে। সোভিয়েত রাশিয়ারও নাটক আছে। একটা টিম তৈরি করে সিলেকশন করতে হবে নাটকগুলো। এর সঙ্গে দরকার কিছু প্রবন্ধও। রোমা রঁল্যার পিপলস থিয়েটার অনূদিত হয়েছে কিন্তু পিইসকাটেরের পলিটিক্যাল থিয়েটার বা ব্রেখটের অনেক প্রবন্ধের এখনও অনুবাদ হয়নি। কেন হয়নি? এটা করা তো দরকার। আমরা রবীন্দ্রনাথকেই বা কতটুকু আবিষ্কার করতে পেরেছি। এই আবিষ্কার তো থিয়েটারের পত্রিকারই করা দরকার। চেতনা বৃদ্ধির জন্য স্পষ্টতার প্রয়োজন এবং স্পষ্টতা আনার জন্য নিরবচ্ছিন্ন আলোচনার প্রয়োজন। এখন হয় কি না জানি না, আগে হত, রমনের বাড়িতে সপ্তাহে একটা দিন বসে খোলাখুলি আলোচনা হত। এগুলো হলে ভাল হয়। এসব কাজ প্রচুর করা যায়। কেউ কেউ অন্ধবিশ্বাস থেকে বলে এটা ওই হয়েছে ওটা নাটক হয়নি ইত্যাদি। বিশ্বাসটা যাই হোক অন্ধতা কিন্তু অন্ধতাই।

স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটগল্পে সমকালীন সমাজভাবনা

নাজিমুল হক

সমাজ ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা সচেতন পাঠকের অবিদিত নয়। সাহিত্যিক সামাজিক জীব হিসাবে যেমন সমাজসচেতন হয়ে থাকেন, তেমনই তাঁর সৃজনশীল সত্তা বিশেষ সমাজকালের পরিপ্রেক্ষিতে লালিত হয়।

স্বাভাবিকভাবে সমাজ চেতনে কিংবা অবচেতনে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে প্রভাব ফেলে। কিন্তু তা বলে ওই বিশেষ সমাজ-কালের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে সাহিত্যের চলে না। সমকালীন সমাজ চেতনাকে বুকে নিয়ে কালান্তরের সহৃদয়ে তার চিরপ্রতিষ্ঠা। আসলে সমাজ সচেতন সাহিত্যিক সমকালীন সমাজজীবন থেকে আহৃত বিষয়গুলিকে প্রতিভাগুণে চিরন্তন অনুভূতির উদ্দীপক করে তোলেন। তাই পরবর্তীকালে ওই সমাজ-রূপের পরিবর্তন ঘটলেও তার সাহিত্যটি কিন্তু পুরাতন হয় না। প্রধানত দুটি কারণে—

১. পরিবর্তিত বিষয়টি তখন সমাজ-ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে পড়ে। আর পুরাতনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে চিরকালের ভাবুক মন।

২. পরিবর্তিত বিষয়টির মধ্যেও শাশ্বতকালের মানবহৃদয়ের অনুভূতি বর্তমান থাকে।

যেমন সতীদাহ কিংবা বাল্যবিবাহ ইত্যাদি বিষয়গুলি আজকের সমাজ থেকে প্রায় অপসৃত। তাই সেগুলি আজ আমাদের সমাজ-ইতিহাসের বিষয়। আর সাহিত্য হল সে ইতিহাসের জীবন্তরূপ। এ ছাড়া থাকে তার নান্দনিক দিক। রীতি কিংবা প্রথা অবশ্যই পুরাতন হয়। কিন্তু তা থেকে সৃষ্ট অনুভূতিগুলি কখনও পুরনো হয় না। তাই সতীদাহ কিংবা বাল্যবিবাহের বিষয় নিয়ে রচিত সেকালের অথবা পরবর্তীকালের কোনও করুণ সাহিত্য আজও আমাদের সমানভাবে ব্যথাতুর করে তোলে। তখন দুঃখের অনুভূতিটিই বড় হয়ে ওঠে, অনুভূতির কারণটি নয়। তবে একইকালের বিভিন্ন শিল্পীর সাহিত্যে প্রতিফলিত সমাজের রূপ একই রকম নাও হতে পারে। এখানেই জড়িত থাকে শিল্পীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি।

সাহিত্যিক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমকালীন সমাজকে দেখেন এবং ওই সমাজ আহৃত বিষয়ের সঙ্গে নিজস্ব কল্পনার সুসমন্বয়ে তাকে সাহিত্যে তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে আমরা ঊনবিংশ-বিংশশতাব্দীর লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটগল্পে তাঁর সমকালীন সমাজকে অনুসন্ধান করতে চাই। অনুধাবন করতে চাই লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপটিও। প্রসঙ্গত আমাদের মনে রাখতে হবে, সাধারণ আয়তনের ক্ষুদ্রতা এবং ব্যঞ্জনাধর্মীতার কারণে ছোটগল্পে সমাজের বিস্তৃত পরিচয় সম্ভব নয়। আভাস-ইঙ্গিতের মাধ্যমেই এখানে সমাজের রূপটি ব্যঞ্জিত হয়।

স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্প রচনার কালসীমা মোটামুটি ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রসারিত। সে সময়ে এ দেশের সমাজে নানা ভাঙন-গড়ন চলছিল। পুরাতনের ভাঙন আর নতুনের গড়ন।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মহাত্মাগণের নেতৃত্বে সমাজ সংস্কারের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তা এ সময়ে আরও বেগবান হয়, ব্যাপক রূপ পায়। বিশেষত ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিরোধ, বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ও নারীস্বাধীনতার স্বীকৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলি সমাজ-জীবনে বিরাট আলোড়ন তোলে। সে সব সামাজিক আলোড়নের অনুরণন সমকালের অনেক শিল্পীর সাহিত্যে বিচিত্রভাবে ধ্বনিত হয়েছে।

স্বর্ণকুমারী দেবীর সামাজিক গল্পগুলিতে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সামন্ততান্ত্রিক সমাজজীবনই প্রতিফলিত হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত রুগ্ন কিংবা স্ফীত পরিবারগুলির হাসি-কান্নার জীবন এখানে গল্প হয়ে ধরা পড়েছে। সমকালীন বাল্যবিবাহ, বালিকাবধূর নানা দুঃখ-যন্ত্রণা, নারীর শিক্ষালাভ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ, নারী-পুরুষের দাম্পত্যজীবনের স্বরূপ, বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সমস্যা ইত্যাদি এ সব গল্পের বিষয়। এমনকী সেকালের স্বদেশি আন্দোলনের তরঙ্গ-বিক্ষোভও কোনও কোনও গল্পে পরিলক্ষিত হয়। আর এ সবের মধ্যে বিধৃত হয়েছে লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়।

বাল্যবিবাহের প্রতিফলন অনেক গল্পেই ঘটেছে। বলাই বাহুল্য, এ বিবাহে পাত্র-পাত্রীর নিজস্ব মতামতের কোনও প্রশ্নই ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে মহিলারা নিজেদের ঘনিষ্ঠ সখিত্বের সূত্রে

অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র-কন্যার বিয়ে নিজেরাই ঠিক করে ফেলেছে। যেমন —

১. 'মালতী' গল্পে রমেশের মা তার মৃতা সখির কন্যা মালতীর সঙ্গে পুত্রের বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

২. 'গহনা' গল্পে 'ভাবিনী ও নলিনের মা তাদের পুত্র-কন্যার বিয়ে স্থির করেছে।

৩. 'বিজয়ার আশীর্বাদ' গল্পে সাগর ও বারুণীর বিয়ে তাদের মায়েরা ঠিক করেছে।

এরূপ সরলভাবেই সেদিনের সমাজ বালিকাকে বধূ হিসাবে বরণ করেছে। তাই স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্পের নারীরা প্রায় সকলেই সরলবালিকা বধূ। যেমন —

১. 'লজ্জাবতী' গল্পের লজ্জাবতী ও তার ননদ ফুলকুমারী।
২. 'যমুনা' গল্পের যমুনা
৩. 'পূজার তত্ত্ব' গল্পের সুশীলা
৪. 'স্বপ্ন না কি?' গল্পের নায়িকা
৫. 'কান্তিবাবুর খোসনাম' গল্পের শান্তি
৬. 'তিনটি দৃশ্য' গল্পের ধনিষ্ঠা ইত্যাদি

এই সরলা বধূদের অনেকেই কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতিতা, লাঞ্ছিতা। লজ্জাবতী শিশুসুলভ সরল লজ্জার আড়ষ্টতায় সদা সঙ্কুচিত। এই স্বভাবের জন্য সে বাবা-মার কাছে আদৃতা হলেও স্বামীর ভর্ৎসনা, এমনকী ঝিয়ের বিরূপতাও তাকে সহ্য করতে হয়। দুঃখই যার নিত্যসঙ্গী সুখ তার কপালে বুঝি সয় না। তাই ননদ ফুলকুমারীর উষ্ণভালবাসা যখন তার ভাগ্যে জুটেছে, তখন মৃত্যুও তার অমোঘবার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে — অকালেই ঝরে যেতে হয়েছে লজ্জাবতীকে। ফুলকুমারী লজ্জাবতীর মতো অত্যাচারিতা বধূ নয়। বরং সে বড়লোকের আদরের বৌমা। কিন্তু বিয়ের পর অবস্থাপন্ন শ্বশুরের আভিজাত্য রক্ষার্থে সে অপেক্ষাকৃত অবস্থাহীন পিত্রালয়ে চোদ্দ বছর আসতে পায়নি। নারীজীবনে এও কম লাঞ্ছনা নয়। যমুনার জীবন দুঃখ-বেদনার কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত। বঞ্চনাই তার ললাটলিখন। পিতৃ-মাতৃহীন অসহায় যমুনাকে জনৈক বিবাহিত পুরুষ ছলনা করে বিয়ে করেছে এবং বিয়ে করেও ছলনা করেছে। স্বামীর কাছে যমুনা স্ত্রীর মর্যাদার বদলে পেয়েছে দাসির পরিচয়। তাই সে প্রতিবাদ করে ফিরে এসেছে। কিন্তু এই প্রতিবাদের শক্তিতেও সে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। অবশেষে জীবন্ত শ্মশানবাসিনী হয়ে তাকে শেয়াল-কুকুরের খাদ্যে পরিণত হতে হয়েছে। বাপের বাড়ির পাঠানো পূজার তত্ত্ব স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের পছন্দ না হওয়ায় সুশীলার লাঞ্ছিতা-অপমানিতা হবার চিত্রটি বর্তমান সমাজেও মোটেই পুরাতন হয়নি। বরং আজকের সমাজ সযত্নেই সে ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। নির্দয় পিতার মুখে শ্বশুরকুলের বদনাম শুনে যেভাবে সুশীলার চোখদুটি অশ্রুসজল হয়েছে, তাতে বাঙালি কন্যার সামাজিক সত্যরূপটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিলাসী-ধনবান স্বামীর উপেক্ষা ও অপমানের জ্বালা ধনিষ্ঠাকেও কম সহ্য করতে হয়নি। তবে শেষপর্যন্ত সে তার 'দেবী-সদৃশ তেজস্বিনী আভা'য় পাষণ্ড স্বামীকে পর্যুদস্ত করেছে। অনুতপ্ত স্বামী তার কাছে ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। কিন্তু সুশীলার এই 'তেজস্বিনী জ্যোতির্ময়ী মূর্তি' তেমন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

বরং নারীব্যক্তিত্বের সাবলীল বিকাশ দেখা যায় 'কান্তিবাবুর খোসনাম' গল্পের শান্তির মধ্যে। পিতার অকাল মৃত্যুতে মায়ের সঙ্গে সে মামার বাড়িতে লালিত। প্রায় সমবয়সী মামাতো দাদা কান্তি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় কোনওক্রমে পাশ করলেও শান্তি প্রথম বিভাগে পাশ করে। এরপর বিয়ে হয়ে যাবার কারণে তার পরবর্তী পড়াশুনায় ছেদ পড়লেও সাহিত্যচর্চায় সে কৃতিত্বের সাক্ষর রাখে। তবে এ ধরনের প্রতিভাময়ী নারীর শিক্ষালাভ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশকে মেনে নিতে সেকালের অনেক পুরুষ যে বড় অপ্রস্তুত ছিল, তা কান্তির আচরণে ধরা পড়েছে। শান্তির প্রথম বিভাগে পাশ করা কিংবা সাহিত্য রচনায় তার কৃতিত্ব ইত্যাদিতে দাদা কান্তি নারীজাতির কাছে নিজের পরাজয়ের অপমানকে অনুভব করেছে। তাই সে সবান্ধব নারীর প্রতি উদারপুরুষের পক্ষপাতের অহেতুক অভিযোগ তুলে শান্তির মেধা ও প্রতিভাকে খাটো করতে চেয়েছে। এমনকী বোনের লেখা গল্প গোপনে চুরি করে নিজের নামে ছাপিয়ে সে খেতাবও অর্জন করেছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনায় 'ভারতী' পত্রিকায় সে সময়ে নারী-পুরুষের সামাজিক গুরুত্ব বিষয়ে উভয়পক্ষের যে তীব্র বাদ-প্রতিবাদ চলেছিল, তার প্রতিফলন শান্তি ও কান্তির কথোপকথনে দেখা যায়। এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, সাহিত্যরচনার অর্জিত অর্থ দিয়ে শান্তি তার বিলেতে অধ্যয়নরত স্বামীর অর্থাভাব দূর করতে প্রয়াসী হয়েছে। নারীর নিজস্ব উপার্জন এবং তা দিয়ে স্বামীর সহযোগী হবার ব্যাপারটি নিছক কল্পকথার গল্পমাত্র নয়। এমন ঘটনা সেকালে খুব সুলভ না হলেও একেবারে দুর্লভও ছিল না। স্বর্ণকুমারী দেবী, ইন্দিরা দেবী, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী প্রমুখ প্রতিভাময়ী নারীদের উপস্থিতি তেমনই সাক্ষ্য দেয়। লক্ষ করার মতো আরও একটি বিষয় হল, আত্মবিকাশ ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শান্তি কোনও পুরুষের সহায়তা পায়নি, সে প্রত্যাশার মনোভাবও তার নেই। আত্মশক্তিতেই সে আত্মপ্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছে।

দাম্পত্যজীবনেও পুরুষকে নারীর ঘনিষ্ঠসঙ্গী হিসাবে তেমন চোখে পড়ে না। বরং সংসার-বন্ধনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের শিথিলতাই পরিলক্ষিত হয়। সেখানে নারীকেই নারীর যথার্থ সহমর্মী সঙ্গীরূপে দেখা যায়। তাই স্বামী থাকা সত্ত্বেও লজ্জাবতী অনেকখানি নিঃসঙ্গ। তার স্বামী মায়ের কথায় নির্দোষ স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করে। পরে যদিও লজ্জাবতী তার অনুতপ্ত স্বামীকে

ক্ষণিকের জন্য ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পেয়েছে কিন্তু তাতে রয়েছে ননদ ফুলকুমারীর আন্তরিক সহায়তা। এখানে ফুলকুমারীই তার যথার্থ সহমর্মীসঙ্গী। 'কেন?' গল্পের বধূটি স্বামীপ্রেম বঞ্চিতা। দুশ্চরিত্র স্বামী অন্য নারীতে আসক্ত। সর্বংসহা সে বধূটিও শেষপর্যন্ত তার পতিকে অনুতপ্তাবস্থায় ফিরে পেয়েছে। কিন্তু তাও সম্ভব হয়েছে স্বামীর গোপন প্রণয়িনী ওই 'অন্যনারী'টির শুভবোধের জাগরণে, তার গোপন সহযোগিতায়। তা ছাড়া এখানে শাশুড়ি পুত্রের পক্ষ না নিয়ে বরং বৌমার পাশেই থেকেছেন, পাশে থেকেছে উর্মি দাসিও। 'যমুনা' গল্পের পুরুষটি ঘরে স্ত্রী-সন্তান থাকা সত্ত্বেও যেভাবে গোপনে যমুনাকে বিয়ে করেছে, তাতে তার সংসারবিচ্ছিন্ন বর্বর মানসিকতাই স্পষ্ট হয়েছে। বঞ্চিতা বধূ যমুনার প্রতি গল্পের বক্তা বধূটি সহানুভূতিশীল থেকেছে আদ্যন্ত। দাম্পত্য ব্যবধানের চিত্র আরও প্রকট দেখা যায় 'পূজার তত্ত্ব' গল্পে সুশীলার বাবা-মা'র মধ্যে। পূজার তত্ত্বকে কেন্দ্র করে আত্মসুখসর্বস্ব গৃহকর্তা যেভাবে স্ত্রী ও কন্যাকে রূঢ় কথা শুনিয়েছে, তাতে তাকে পত্নী কন্যার মানসসঙ্গী কিছুতেই বলা যায় না। সুশীলার জীবনে স্বামী নয়, দুঃখই তার নিত্যসঙ্গী। তাই মাতা-কন্যা পরস্পরের অবলম্বন হয়ে সুস্থ প্রজন্ম পালনের মধ্যে নারীজীবনের সার্থকতা সন্ধান করেছে। 'তিনটি দৃশ্য' গল্পের ধনিষ্ঠার মা বিরাজের দাম্পত্যজীবনে স্বামীর উপস্থিতি তেমন অনুভূত হয় না। বরং গল্পের বক্তা রমণীটিকে স্নেহ-ভালবাসার সখি হিসাবে বিরাজের দুঃখময় জীবনে সদা বিরাজিত দেখি।

তবে দাম্পত্য জীবনের কেবল শৈথিল্যই নয়, দু'একটি গল্পে স্বামী-স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতার কথাও আছে। যেমন — 'স্বপ্ন না কি'? গল্পের জীবন সরকার যথার্থই তার স্ত্রীর জীবনসঙ্গী। এ গল্পের নায়ক বিপন্না নায়িকাকে উদ্ধারও করেছে। কিন্তু সেখানে সামাজিক দায়িত্ব কিংবা পুরুষোচিত উদারতার চেয়ে রোমান্টিক আবেগই বেশি। কেননা বনভোজনে গিয়ে দিদির রান্নার তৎপরতা দেখে তার মনে হয়েছে— 'ভাগ্যিস মেয়েজাতটা এখনও নিছক মেয়েমানুষই আছে, তাই তবু এখনও একটু-আধটু সেবাশুশ্রূষা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু আজকাল মেয়েদের যে রকম পুরুষ গড়ে তোলার প্রস্তাব হচ্ছে, তাহাতে ভবিষ্যৎটা একেবারেই তিমিরাচ্ছন্ন, পুরুষবংশটা তা হ'লে একেবারেই নির্ব্বংশ হবার বিশেষ আশঙ্কা আছে।' বরং কন্যার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিতা মিত্রানীর পাশে নায়কের দিদি যেভাবে স্নেহের সঙ্গে দাঁড়িয়েছেন, তাতে নারীর সহমর্মী হিসাবে নারী-ই বড় হয়ে উঠেছে। 'গহনা' গল্পে সংসারের অভাব-অনটনে, সুখ-দুঃখে বিহারীবাবু ও তাঁর স্ত্রী ঘনিষ্ঠসঙ্গী হিসাবে কাছাকাছি থেকেছেন। পুত্রকে বিলাতে পড়াতে গিয়ে অর্থসংকটের অস্থিরতা, অর্থাভাবের কারণে বিনাচিকিৎসায় কন্যার মৃত্যু, আত্মীয়-পরিজনের অকৃতজ্ঞ আচরণ, পুত্রের গোপনে বিলাতে বিবাহ ইত্যাদির মাধ্যমে বিহারীবাবুর সংসার সমাজজীবনের এক জীবন্তরূপ।

বিধবাবিবাহ এবং বহুবিবাহর মতো সমস্যা দুটি-একটি গল্পে ছায়া ফেলেছে। 'অমরগুচ্ছ' গল্পের নায়িকা বালবিধবা। স্বামীকে তার ভালভাবে মনে পড়ে না। মৃত স্বামীর ছবিকে পূজা করার মধ্যেই সে স্বামীর নৈকট্য অনুভব করে। কিন্তু ঘটনাক্রমে একদিন সে দাদার বন্ধুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেকালে বিধবাবিবাহ আইন সিদ্ধ হলে কি হবে, সমাজের সর্বত্র তা গৃহীত হয়নি। তাই ওই যুবক আচার পালনের মধ্যে নায়িকার বিধবা পরিচয় পেয়ে গম্ভীরভাবে বিদায় নিয়েছে। তা ছাড়া 'অন্তত বিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত খুব কম লেখিকাই প্রবন্ধ রচনাতেও বাল্যবিধবার পুনর্বিবাহ, কিংবা বৈধব্য-আচারের বিরোধিতার কথা সাহস করে লিখেছেন।' তাই এখানে দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত মৃতস্বামীর ছবির মধ্যেই বিধবাকে সান্ত্বনা সন্ধান করতে হয়েছে। নিষিদ্ধ বহুবিবাহে অনেক পুরুষের উৎসাহ দেখা গেছে। যেমন —

১. 'যমুনা' গল্পের পুরুষটি বিবাহিত হয়েও ছলনা করে যমুনাকে বিয়ে করেছে এবং স্ত্রীর কাছে দাসি বলে ও অপরের নিকট " —" বলে যমুনার পরিচয় দিয়েছে। এই ছলনার পেছনে বহু বিবাহের নিষিদ্ধতার কারণটি থাকা স্বাভাবিক। তেমনই "—" পরিচয়ধারী কোনও নারীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকার বিষয়টি নিশ্চয়ই অপরের কাছে আপত্তিকর ছিল না। তা হলে এখানে কেবল ওই পুরুষটিরই নয়, সেকালের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ছলনাসিদ্ধ নগ্নরূপটি উদঘাটিত হয়েছে, যা ভূদেব চৌধুরীর ভাষায় 'পৌরুষের বর্বরতা'। পাশাপাশি তৎকালীন সমাজে অসবর্ণ বিবাহ অপ্রচলিত থাকার ইঙ্গিতও যমুনার কথায় স্পষ্ট হয়েছে।

২. 'চাবিচুরি' গল্পে বৃদ্ধ শ্রীমন্তের স্ত্রী-সন্তান বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বালিকা সত্যবালাকে তার বিয়ে করার ইচ্ছার কথা জানা যায়।

৩. 'স্বপ্ন না কি?' গল্পে প্রৌঢ় ঘনশ্যাম ঘোষ মৃতবন্ধু হরনাথ মিত্রের বালিকা কন্যাকে বিয়ে করার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করেছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তার সম্পত্তির লোভটিও কাজ করেছে। তা ছাড়া সদ্য তার স্ত্রীবিয়োগও হয়েছে।

সেকালের সাহিত্যে অর্থনীতির দিকটি যখন প্রায় উপেক্ষিত থেকেছে, তখন স্বর্ণকুমারী দেবী বিস্ময়করভাবে সেদিকে অল্প-বিস্তর আলোকপাত করেছেন। সমকালীন সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে ক্ষয়িষ্ণু, রুগ্ন কিংবা স্ফীত অনেক পরিবারের কথাই তিনি বলেছেন। আর সে অর্থব্যবস্থাতেও পুরুষের প্রভুত্বের দিকটি বিশ্বস্তরূপে অনাবৃত করেছেন কোনও কোনও গল্পে। যেমন —

১. 'কেন?' গল্পের পরিবারটি আর্থিকভাবে ক্ষয়িষ্ণু, "এককালে ছিল ভাল, এখন ভেঙ্গে পড়েছে—" পরিবারের পুরুষটির

লাম্পট্য ও বিলাসিতাই এই ক্ষয় কিংবা ভেঙে পড়ার অন্যতম কারণ।

২. 'লজ্জাবতী' গল্পে লজ্জাবতীর শ্বশুরবাড়ির চিত্রেও ওই ক্ষয়িষ্ণুতার চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে। অন্যদিকে ফুলকুমারীর শ্বশুর ধনীব্যক্তি। এই ধনগর্বে তিনি বৌমাকে দরিদ্র পিত্রালয়ে পাঠাতে অপমানিতবোধ করেছেন।

৩. 'বিজয়ার আশীবর্বাদ' গল্পে বনমালীর পরিবারের আর্থিক অবস্থান চিত্রণে লেখিকা আরও চমক সৃষ্টি করেছেন। 'গ্রামের মধ্যে সে (বনমালী) ছিল একজন সম্পন্নলোক। জমি জমা, গরু-বাছুর, ধানের মরাই, কৃষাণ, ভৃত্য এ সবই তাহার ছিল, ইহা ছাড়া সে মহাজনী কারবারও চালাইত। ইহার দৌলতে গ্রামভরা চালাঘরের মধ্যে তাহারই ছিল একখানি কোটাবাড়ী।' কিন্তু শিশুপুত্রকে বিসর্জন দেওয়ার অনুতাপে তার স্ত্রী পাগল হয়ে যায় আর সে গাঁজার টানে ভণ্ড সাধু-সন্ন্যাসীদের ডেকে আড্ডা বসায়। শুধু তাই নয়, 'তিনি এখন চেলা নহেন, স্বয়ং গুরু।' ফলে 'চেলাদের রসদ যোগাইতে ক্রমশঃ বনমালী যথাসবর্বস্ব খোয়াইলেন। জমী-জমা, ধান-চাল, গরু-বাছুর, গহনাপত্র সমস্তই দেনার দায়ে বিকাইল, বাড়ীটিও ক্রমে নীলামে চড়িল। চেলার দল বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িল। বনমালী স্ত্রী-কন্যা লইয়া নদীতীরের শ্মশানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গ্রামের লোক চাঁদা করিয়া সেইখানেই একখানি খড়ো-ঘর তাহাদের জন্য বাঁধিয়া দিল। আহার্য্যও তাহারাই যোগান দিতে লাগিল। আমাদের দেশে সাধু-সন্ন্যাসীর অন্নকষ্ট কখনও ঘটেনা।'

৪. 'পূজার তত্ত্ব' গল্পে সুশীলার লাঞ্ছনা এবং তার স্বামী ও বাবার মানসিক ব্যবধানের কারণ মূলত অর্থনৈতিক। সুশীলার প্রতি তার স্বামীর আচরণে কিংবা লক্ষ্মীমণির প্রতি পঞ্চানন দাসের আচরণে সামন্তপ্রভুর দাপটই যেন ফুটে উঠেছে।

৫. 'গহনা' গল্পে বিহারীলাল সেন অবস্থার দায়ে পড়ে ব্যবসায় 'কেরানীগিরি অর্থাৎ খোসামুদি'র কাজ ধরেছেন। কিন্তু পুত্রকে ইংলন্ডে পড়াতে গিয়ে তাঁর জমানো টাকাকড়ি সব নিঃশেষ হয়েছে। পুত্রের প্রয়োজনে আরও একহাজার টাকা জোগাড়ের প্রয়াসের মাধ্যমে বিহারীবাবুর আর্থিক দৈন্যদশা প্রকটরূপে উদঘাটিত হয়েছে। এমনকী অর্থাভাবের জন্য তাঁর অসুস্থ কন্যাকে বিনা চিকিৎসায় মরতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে, আরও পরবর্তীকালের লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'পাশফেল' গল্পের বিমলদের পরিবারের সকরুণ চিত্রটি।

৬. 'তিনটি দৃশ্য' গল্পে ধনিষ্ঠার শ্বশুরবাড়ি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুষ্ট রাজবংশীয় জমিদার পরিবার। তাদের সাজ-সজ্জায়, বিবাহযাত্রায়, মণি-মাণিক্যের বিপুলতায় সে আভিজাত্যই বিচ্ছুরিত হয়েছে।

৭. 'যমুনা' গল্পের বালিকা যমুনা ও তার বিধবা মা সামন্ততান্ত্রিক পুরুষ-প্রধান সমাজের লাঞ্ছনার শিকার। যমুনার বাবা ধনবান ছিলেন। 'কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর একটি বিধবা আর একটি বালিকা— এই দুই মাতা-পুত্রীকে কেবল অসহায় নারী বলেই বঞ্চিত করতে বাধে নি তাদের আত্মীয় পুরুষদের।'

৮. 'স্বপ্ন না কি?' গল্পে জমিদার হরনাথ মিত্র শারীরিক অসুস্থতার কারণে এবং পুত্রের বিলাতে থাকার কারণে বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনার ভার দেন তাঁর প্রিয়বন্ধু ঘনশ্যাম ঘোষকে। কিন্তু মৃত্যুকালে হরনাথ বাবু কন্যাকে যে সম্পত্তি দিয়ে যান, তাতে ঘনশ্যাম ঘোষ লোভাতুর হয়ে ওঠে। তাই বন্ধুকন্যাকে বিয়ে করার জন্য সে নানা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রও করেছে।

সমকালীন স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ কোনও কোনও কাহিনিতে আছড়ে পড়েছে। 'চাবিচুরি' গল্পে দুই সুকুমারের একজন স্বদেশি আন্দোলনকারী। তার আচারে-আচরণে স্বদেশি হুজুগের একটা উগ্র মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। অন্য সুকুমার জড়িত না থেকেও স্বদেশিয়ানার দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছে। ঘটে গেছে তার জীবনের সর্বনাশ। আর এ কারণেই 'কান্তিবাবুর খোসানাম' গল্পে কান্তি স্বদেশিদের দিকে ঝুঁকলে তার বাবা চিন্তিত হয়েছে। স্বদেশিদের আরও উগ্র ও ভ্রান্ত রূপ চিত্রিত হয়েছে 'নব ডাকাতের ডায়েরি' গল্পে। হেয়ার স্কুলের ছাত্র নবকুমার জীবনের স্বাভাবিক পথ ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবী স্বদেশিদের দলে মিশেছে। স্বদেশের মুক্তির জন্য তারা স্বদেশীয়দের বাড়িতে ডাকাতি করেছে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার বিপদ থেকে বাঁচার জন্য দলের সর্দার গুলিবিদ্ধ সঙ্গীর মস্তকছেদন করেছে, আর সে ছিন্নমস্তক বহন করেছে নিরীহ নবকুমার। অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং কেমিক্যাল সাহেবের সাহায্যে মুক্ত হয়ে নবকুমার উপলব্ধি করেছে যে, ইংরেজমাত্রেই খারাপ নয়। তার উদ্দেশে কেমিক্যাল সাহেবের উপদেশ : " ও পথ ছাড় নবকুমার, ওতে দেশেরও মঙ্গল নেই, তোমারও মঙ্গল নেই, প্রকৃত বন্ধুর উপদেশ শোন, ওপথ ছাড়। আবার — পড়াশুনা ধর।" এ জন্য তিনি নবকুমারকে নানারকমভাবে সাহায্যও করেছেন। স্পষ্টতই, সহিংস আন্দোলনের প্রতি লেখিকার সমর্থন নেই। পরোক্ষে এখানে 'বড়-ইংরেজের' মহানুভবতার কথাই তুলে ধরা হয়েছে। তাই কেমিক্যাল সাহেবকে দেখে নবকুমারের মনে পড়েছে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিউম সাহেবের কথা। তা ছাড়া স্বদেশীয় বাঙালি বাড়িতে বিনাপ্রতিবাদে ডাকাতি করার পর নবকুমারের গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি : "বাঙ্গালী জাতি যে কিরূপ শান্তিপ্রিয় নিরীহ প্রকৃতির লোক— ইহা হইতে তাহাই বুঝা যায়। হায় হায়! কত

শৌর্যবীর্য্য মনুষ্যত্বের বিনিময়ে এই শান্তিটুকু আমরা কিনিয়াছি!" বলাই বাহুল্য, সমাজবীক্ষণের এ উপলব্ধি লেখিকারই।

স্বর্ণকুমারী দেবী সমকালীন সমাজকে দেখেছেন সরলদৃষ্টিতে। তাই তাঁর গল্পগুলিতে সমাজের রূপ খুব বেশি জটিল নয়। সে সমাজে সমস্যা অবশ্যই আছে, তবে তার রূপায়ণে কিংবা সমাধানে জটিলতার মনোভাব নেই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর দুর্গতির চিত্রণে নারীর প্রতি তাঁর পক্ষপাত নয়, গভীর সহানুভূতি ও মমতা প্রকাশিত হয়েছে। নারীর প্রতিবাদী উগ্রমূর্তির চেয়ে সহনশীল প্রেমময়ীরূপেই তিনি বেশি আগ্রহী। 'পূজার তত্ত্ব' গল্পে লেখিকার এ মনোভাব স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে সুশীলার মায়ের কণ্ঠে। স্বামীগৃহে লাঞ্ছিতা কন্যাকে তিনি বলেছেন, 'সহ্য করে কর্তব্যপালনেই মনুষ্যত্ব। স্ত্রীলোকেরও জীবনের উদ্দেশ্য আছে। তুমি যখন তোমার ছেলেগুলিকে মানুষ করে — প্রকৃত মানুষ করে তুলবে—তখন তোমার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।' এ বক্তব্যে কেউ লেখিকার 'দীর্ঘদিনের সংস্কারের পিছুটানকে' লক্ষ করতে পারেন। তবে আমাদের মনে হয়, এখানে সমাজ সম্পর্কে স্বর্ণকুমারী দেবীর গভীর ও উদার চিন্তাই প্রকাশিত হয়েছে। কারণ —

১. অত্যাচারী পুরুষেরা সমাজদেহের বিপজ্জনক কীট, সন্দেহ নেই। তাদের সৃষ্ট ক্ষত নিয়েও যে সে সমাজ জীবন্ত রয়েছে, তা অনেকটাই নারীর মহানুভবতায়। কিন্তু তা বলে তো চিরকাল এভাবে চলতে পারে না। প্রয়োজন প্রতিকার। কিন্তু সেজন্য নারীর প্রতিবাদী ব্যক্তিত্বের উগ্র তেজস্বিতায় এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বর্তমানকালের সমাজই তার প্রমাণ। তাতে অত্যাচারী পুরুষের সংখ্যা মোটেও কমেনি। 'পুরুষতন্ত্রের পরিবর্তে যদি কোনোদিন নারীতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে হয়তো এরকম হতে পারে — নারীর পরিবর্তে পুরুষই হতে পারে ভোগ্যবস্তু। কিন্তু সেও কি কোনো কাম্য সভ্যতা? তাই বরং অত্যাচারিতা মায়ের 'ছেলেগুলি' ভবিষ্যতে 'প্রকৃত মানুষ' হয়ে উঠলে সমাজ সুস্থ-সুন্দর-সমৃদ্ধ হতে বাধ্য। নারীর ত্যাগ-তিতিক্ষায়, দায়িত্বে-কর্তব্যে ভবিষ্যতের যথার্থ মনুষ্যসমাজ গড়ে উঠবে — এতে নারীর অগৌরবের বা 'সংস্কারের পিছুটানে'র কি আছে? 'পুরুষতন্ত্রের পরিবর্তে নারীতন্ত্র নয়; প্রতিষ্ঠিত হোক মানবতন্ত্র — এই কি আমাদের একান্ত অভীপ্সা নয়?' কিন্তু শুধু নারীর কর্তব্যপালনে নয়, নারী-পুরুষ—উভয়ের সঠিক বোঝাপড়ায় তা সম্ভব। তার জন্য পুরুষের উদার ও দায়িত্ববান হবার প্রয়োজন আছে বইকি! কিন্তু পুরুষ সাহিত্যিকগণের সাহিত্যে নারীর প্রতি করুণা প্রকাশ ছাড়া পুরুষের দায়িত্ব সচেতনার কথা কতটুকু পাই?

২. কেবল মাতৃত্বের মধ্যেই লেখিকা নারীজীবনের উদ্দেশ্যকে সীমায়িত করেননি। শিক্ষাগ্রহণ ও প্রতিভার স্ফুরণের মাধ্যমে নারীব্যক্তিত্বের বিকাশের কথাও তিনি বলেছেন। 'কান্তিবাবুর খোসনাম' গল্পের লেখিকার এ মনোভাবের প্রতিনিধি। এখানে নারীকে উপার্জনক্ষমও দেখানো হয়েছে। আর এই সচেতন নারীসমাজ গড়ে তোলার জন্য তিনি নারীদের মধ্যে সখিত্বের বন্ধনকে প্রয়োজন মনে করেছেন। পৃথক গোষ্ঠী নয়, সমাজের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান ও সহযোগী হয়ে ওঠাই এ নারীসমাজের উদ্দেশ্য। এ জন্য তিনি সমকালে 'সখিসমিতি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

গল্পগুলির মধ্যে কোথাও পুরুষের প্রতি স্বর্ণকুমারী দেবীর বিদ্বেষ বা বিরূপতা প্রকাশিত হয়নি। ভাল-মন্দে পুরুষ স্বস্থানেই থেকেছে। 'নারীর অনুভব ও চেতনা নিয়ে সমাজ, পরিবার এবং জীবনকে দেখতে পারার ব্যক্তিত্বস্পৃষ্ট' কৃতিত্ব গল্পগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু সমাজবীক্ষায় লেখিকার কিছু সীমাবদ্ধতার কথাও স্বীকার করতে হয়। সমাজজীবন পর্যবেক্ষণে কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব ধরা পড়েছে। তবে এই সীমাবদ্ধতার কতগুলি অনিবার্য কারণও রয়েছে—

১. ঠাকুর পরিবারের রক্ষণশীলতার মধ্যে তিনি প্রতিপালিত হয়েছেন। সেখানে সংস্কৃতিচর্চার বিপুল আয়োজন থাকলেও সাধারণ সমাজজীবনের সঙ্গে মেলামেশার বিশেষ সুযোগ তাঁর হয়নি।

২. অল্প বয়সেই সংসারী হবার ফলে সমাজের সর্বত্র বিচরণের অবকাশ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কম ছিল।

৩. সর্বোপরি সেকালের সমাজ নারী স্বাধীনতাকে ততটা স্বীকৃতি দেয়নি।

এ ছাড়া সমাজের সাধারণ স্তরের জীবন সেকালের সাহিত্যে তেমন ঠাঁইও পায়নি।

পরিশেষে বলতে হয়, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটগল্পগুলিতে সেকালের যে সমাজজীবন প্রতিফলিত হয়েছে, তা সাহিত্যানুরাগী ভাবুক মনের সামগ্রী হতে পেরেছে। আজ সমাজরূপের অনেক পরিবর্তন হলেও গল্পগুলিতে বিধৃত সেকালের সমাজরূপটি কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। তা ছাড়া সে সমাজজীবনকথা সমকালের সীমায় আবদ্ধ না থেকেও কালোত্তীর্ণ হয়েছে। সে জীবনের কান্না-হাসি চিরন্তন অনুভবে গভীর আবেদন রাখে।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. সাহিত্য ও পাঠক — শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
২. স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা সংকলন— দে'জ পাবলিশিং
৩. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার — শ্রী ভূদেব চৌধুরী
৪. মেয়েলি পাঠ — সুতপা ভট্টাচার্য
৫. ভারতের ইতিহাস — ড. অতুলচন্দ্র রায়
৬. স্বর্ণকুমারী ও বাংলাসাহিত্য—ড. পশুপতি শাসমল

গ্রন্থসমালোচনা

বঙ্গবিভাগ এবং সমসাময়িক ঘটনাবলির রূপরেখা

অমিতাভ রায়

'বঙ্গ বিভাগের অর্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। ...... এই প্রজন্মের লোকেদের কাছে অবিভক্ত বঙ্গের কোনও স্বাদ নেই, বিস্বাদও নেই। এই লোকেদের নয়নের কোলে কোনও একটি জলবিন্দুও ঝরে পড়ার জন্য আকুল হয় না। ভিড় করে না কোনও স্মৃতি। কোনও আবেগ, কোনও অনুভূতি তাদের ভারাক্রান্ত করবে না' (পৃষ্ঠা - ৬৮, বঙ্গসংহার এবং - সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত)। তবুও বিগত শতাব্দীতে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের স্বভূমিকে ভৌগোলিক ভাবে দ্বিধাবিভক্ত করার কারণ অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বহু দিন বহাল থাকবে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কারণ অনুসন্ধান, তৎকালীন আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন, তথ্য বিশ্লেষণ, সামাজিক অবস্থার নিরীক্ষা ইত্যাদি নিয়ে নিরন্তর গবেষণা-বিচার-বিবেচনা নিঃসন্দেহে অবশ্যকর্তব্য। আবেগমথিত না হয়ে বিষয়টি নিয়ে নিরপেক্ষ ভঙ্গিতে চর্চা করা কিন্তু আজকের প্রজন্মের পক্ষেই অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত।

বাংলা ভাগের বিষয়টি বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে বাড়তি গুরুত্ব ও মাত্রা পাওয়ার অন্য কারণ,- একই শতাব্দীতে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের বাসভূমিকে দু' দু'বার ভাগের উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথম বার (১৯০৫) বিফল হলেও দ্বিতীয় বার (১৯৪৭) কিন্তু নিশ্চিত ভাবে সফল। এই সুবাদে একটি প্রশ্ন অবধারিত ভাবেই উপস্থিত হয়। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আইন রদ করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ এগিয়ে এলেও ১৯৪৭-এর ভাগাভাগির সময় অনেকেই কেন এড়িয়ে থাকলেন অথবা দেশ ভাগকে কেন করলেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন? বাংলা ভাগের সিদ্ধান্তটি বাস্তবে রূপায়ণের তৎপরতা আরও আশ্চর্য করে। ১৯৪৭-এর ৩-রা জুন ব্রিটিশ সরকার বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগভাগির আনুষ্ঠানিক নির্দেশ দেওয়ার মাত্র সতেরো দিন বাদেই (২০-শে জুন) তৎকালীন বঙ্গীয় বিধানসভা বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। তার চেয়েও অনেক দ্রুততায় ব্রিটেন থেকে সদ্য আগত আইনবিদ সিরিল র‍্যাডক্লিফ অন্য চার জন ভারতীয় আইনজ্ঞের সহায়তায় বঙ্গভূমি দ্বি-খণ্ডিত করার কাজটি সম্পন্ন করলেন। না, কোনও ব্যক্তি বিশেষের 'মৃতদেহ' নয় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুকে সাক্ষী রেখে হয়ে গেল বঙ্গভঙ্গ। লক্ষ লক্ষ লোকের মান-সম্মান-ধন-সম্পদ-পরিবার-পরিজন চিরতরে হারিয়ে গেল। 'স্বাধীন ভারতবর্ষ ও আজাদ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সেদিন, সেই ১৯৪৭-এর আগস্ট মাসে ছয় লক্ষ নরনারীকে দাঙ্গাকারী উন্মত্ত জনতার হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল। এক কোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষ হয়েছিল বাস্তুহারা।' দ্য লাস্ট ডেজ অফ্ দি ব্রিটিশ রাজ পুস্তকে লিওনার্ড মোসলে অন্তত এই রকম লিখেছিলেন।

লিওনার্ড মোসলের বইকে বাধ্য হয়েই উল্লেখ করতে হল। কারণ, এই বইটির কোনও এক অংশের বক্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে দেখা দেওয়া সংশয় নিরসনেই সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয়ের অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার সূচনা। এবং তারই ফলাফল — বঙ্গসংহার এবং।

বাংলা ভাগ নিয়ে গবেষণা-বিশ্লেষণ-অনুসন্ধান দীর্ঘ দিন ধরেই ধারাবাহিকভাবে দেশে-বিদেশে হয়ে চলেছে। সেই ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিকতম সংযোজন - বঙ্গসংহার এবং। প্রবীণ সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয় গত কয়েক বছর ধরে চতুরঙ্গ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে একই শিরোনামে লেখা শুরু করার পর থেকেই পাঠকের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়েছিল। বাংলা ভাগ হওয়ার পঞ্চান্ন বছর পূর্তির প্রাক্কালে 'নয়া উদ্যোগ' সংস্থা দুই মলাটের মোড়কে বঙ্গসংহার এবং-কে সুগ্রথিত করে বাংলা ভাষা তথা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছেন। লেখক এবং প্রকাশক উভয়কেই ধন্যবাদ।

'বঙ্গসংহার এবং' কোনও পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্তে পৌঁছয়নি। প্রায় আড়াই শো পৃষ্ঠার পুস্তকটিতে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার পরিবর্তে স্থান পেয়েছে কালানুক্রমিক ঘটনার বিবরণ। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা রূপরেখা তুলে ধরার জন্যই লেখক পালন করেছেন এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব। রূপরেখাটি সুচারুভাবে প্রণয়নের উদ্দেশ্যে লেখক এমন কিছু দলিল-নথি পাঠকের দরবারে পেশ করেছেন যা সচরাচর নজরে পড়ে না। তবে আরও কিছু দরকার ছিল।

যেমন ৩৫ পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনাটি। আগের অনুচ্ছেদে লেখক লিখছেন, - 'এই সময় ১৯৪২ সালের শেষ থেকে ১৯৪৩ সালের প্রথম দু'মাসের মধ্যে পর পর কয়েকটি

বড় ঘটনা ঘটল। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের এবং তাঁদের সমর্থকদের উপর কর্নেল জন হান্টের (পরবর্তীকালের এভারেস্ট বিজয়ী) নেতৃত্বে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের বর্বর অত্যাচারের অভিযোগ পেয়ে (ফজলুল) হকসাহেব তাঁর অর্থমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে মেদিনীপুর পাঠালেন।' পরবর্তী অনুচ্ছেদেই সুখরঞ্জনবাবু উল্লেখ করছেন, - 'এর কয়েকদিন পর নোয়াখালি জেলার উপকূলবর্তী গ্রাম সানোয়ারে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর একদল আফ্রিকান উপকূলরক্ষী ভোর রাতে হানা দিল। .... খবরের কাগজে এই খবর বের হল না।' ইতিপূর্বে সাধারণভাবে অনুল্লেখিত এমন একটি ঘটনার স্বপক্ষে অন্তত একটি সরকারি দলিল উপস্থাপন করলে বক্তব্যটি জোরালো হত। কারণ নিরপেক্ষ পাঠক প্রশ্ন করতেই পারেন যে নোয়াখালির কুখ্যাত দাঙ্গা কিন্তু ১৯৪২-৪৩-এর অনেক পরেই ঘটেছিল। বয়োজ্যেষ্ঠ সাংবাদিকের কাছে পাঠকের এমন দাবি করা অসমীচীন হবে না।

বাংলা ভাগ নিয়ে রামমনোহর লোহিয়া এবং পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডনের হেরে যাওয়া ভূমিকাকে বহুদিন বাদে আবার এই বইতে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজধানীর একটি সরকারি হাসপাতালের দৌলতে রামমনোহর লোহিয়া তবুও আর. এম. এল বলে মাঝে-মধ্যে উচ্চারিত হন। কিন্তু পুরযোত্তমদাস ট্যান্ডন?

স্বাধীনতার পরবর্তীকালের বাংলার রাজনীতিতে শিল্পোদ্যোগী-ব্যবসায়ীদের ভূমিকার খবর উল্লেখ করে লেখক বর্তমান প্রজন্মকে ঋদ্ধ করেছেন (পৃষ্ঠা-৯৪)। তবে অন্য অনেক খবরের মতো এ ক্ষেত্রেও তাঁর একমাত্র তথ্যসূত্র ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের লেখা 'জীবনস্মৃতি'। সরোজ চক্রবর্তী লিখিত 'মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে' বইটির সাহায্যও তিনি নিয়েছেন। তবে যে লেখকের হাতে এত দুর্লভ তথ্য-ভাণ্ডার আছে (যেমন, - Confidential Official Report about the Condition of Noakhali in in May 1947, ১৯৫৮-য় সৈয়দ বদরুদ্দোজার সঙ্গে কথোপকথন, কবি অমিয় চক্রবর্তীর গান্ধী আশ্রমে উপস্থিতির খবর, মনসুর হবিবুল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ১৯৪৯-এর ২৬-শে ফেব্রুয়ারি ঘটে যাওয়া দমদম-বসিরহাট হামলার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ইত্যাদি আরও অনেক) তিনি কেন মাত্র দুটি বইকে এত বেশি গুরুত্ব দিলেন?

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত একটি বিশেষ সময়ের প্রেক্ষাপটে বাংলার রাজনীতির নৈর্ব্যক্তিক বিবরণ দেওয়ার সময় যথার্থ অর্থে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। দু'-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণভাবে তিনি স্মৃতিচারণা পরিহার করেছেন। ফলে, বইটির মূল বৈশিষ্ট্য, 'রূপরেখা' বা 'চালচিত্র' প্রণয়নের কাজটি যথাযথ মর্যাদা পেয়েছে। বইটির পরবর্তী সংস্করণে পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯ ও ৪২-এর কিঞ্চিৎ সম্পাদনা প্রয়োজন। মনে হয়, দু'-একটি শব্দ অথবা পংক্তি বাদ পড়ে গেছে। গবেষক-অনুসন্ধানকারী ছাড়াও বাংলার ইতিহাসের পাঠকের কাছে বইটি নিশ্চয়ই আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

বঙ্গসংহার এবং-সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত/নয়া উদ্যোগ-কলকাতা-৬/১৫০.০০।

যে দেশে শস্যের চেয়ে টুপি বেশি

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

একজন ঔপন্যাসিক, কুড়ি বছর সময়, সাকুল্যে তিনটি উপন্যাস — 'লালসালু (১৯৪৮), 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪), 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮)। ঔপন্যাসিককের নাম সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২, ১০ সেপ্টেম্বর — ১৯৭১, ১০ অক্টোবর) জন্ম চট্টগ্রামে, শিক্ষা ঢাকা ইন্টারমিডিয়েটে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিবাহ ফরাসি-রমণী অ্যান তিবোর সঙ্গে, কর্মসূত্রে দূতাবাসকর্মী হিসাবে এশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রবাসীজীবন, প্রথম গল্প প্রকাশ 'নয়নচারা' কলকাতার "পূর্বাশা" (১৯৪৫) পত্রিকায়। হাসান আজিজুল হক লিখেছিলেন, "লালসালু' উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের উপন্যাস আধুনিক কথা সাহিত্যে প্রবেশ করে।' উপন্যাসটি ফরাসি ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। ১৯৬১ সালে এই গ্রন্থটির জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কারও পান।

'কিন্তু পরিতাপের বিষয় বাংলা কথা সাহিত্যের সামগ্রিক আলোচনায় এই মননশীল লেখক ক্বচিৎ বিবেচিত হয়েছেন, আর হলেও তা হয়েছেন এতটাই উনতায় যা অন্তত সম্ভ্রমজনক নয়। বিপ্রদুষ্ট এই সাহিত্যবিচারের রেশ কাটিয়ে উঠতে আমাদের সারস্বত সমাজের সময় লেগেছে অর্ধশতক।' — এমন মন্তব্য দিয়েই পৃথ্বীশ সাহা শুরু করেছেন ২০০০ সালে নয়া উদ্যোগ, থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস : পাঠ-পরিক্রমা।' এ আমাদের এক সাংস্কৃতিক দুর্ভাগ্য। উনিশ শতকের রেনেসাঁস থেকেই এর সূচনা। সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে।

দুই বঙ্গের দ্বিভঙ্গ নিয়তি। সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাসে পরস্পরের দেখা ও সম্যদর বিনিময় হতে তাই কেবলই দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সুখের কথা, ইদানীং ওয়ালীউল্লাহকে নিয়ে সমাদৃতিমূলক আলোচনা নজরে পড়ছে। কিছুদিন আগে পার্থপ্রতিম গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : উপন্যাসের অন্তর্স্বর'। তা নিয়ে মননশীল আলোচনা করেছেন তপোধীর ভট্টাচার্য। পৃথ্বীশ সাহার বইটি তার সঙ্গে যুক্ত হল। পাঠক এবং লেখকের মাঝখানে একটি সংযোজক সেতুর দরকার হয়। শত অপছন্দ সত্ত্বেও সমালোচকই সেই সেতু। আমার মতে সমালোচক ত্রিবিধ। তিনি লেখকের কাছের লোক হতে পারেন, তিনি পাঠকের লোক হতে পারেন কিন্তু এমনও হতে পারে তিনি কারও লোক নন। সে ক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি সেতুর মতো না হয়ে দেওয়ালের মতো হতে পারে। সুখের কথা পৃথ্বীশ সাহা লেখক ও পাঠকের মাঝখানে দেওয়াল হয়ে দাঁড়াননি। বইটি পড়ে মনে হয়েছে তিনি বিশেষ অর্থে পাঠকেরই লোক। পাঠকের লোক নন পাঠকই। উপন্যাস তিনটির আলোচনায় উপন্যাসের কথাবস্তু ও ঔপন্যাসিককে তিনি খুঁজে চলেছেন পাঠকের ঔৎসুক্যে। ফলে পৃথ্বীশ সাহার হাত ধরে পাঠক অনায়াসেই ওয়ালীউল্লাহ'র উপন্যাস পরিক্রমা করতে পারবেন। বইটি এতটাই বান্ধবপ্রকৃতির।

'যে দেশে শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি। ভোরবেলায় এত মক্তবে আর্তনাদ ওঠে মনে হয় এটা খোদা তালার বিশেষ দেশ। ন্যাংটো ছেলেও আমসি পাড়া পড়ে.... গোঁফ উঠতে না উঠতেই কোরাণ হাফিজ সারা' — 'লাল সালু' সেই দেশের বিধি ব্যবস্থা, পীড়ন-নিপীড়নের উপন্যাস। 'চাঁদের অমাবস্যা' তিনি লিখেছিলেন ফ্রান্সের আল্পস পর্বত অঞ্চলে পাইন ফার পরিবেষ্টিত ইউরিয়াজ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে। কিন্তু এর কাহিনির বাস্তবে আছে বাঁশঝাড়, মাঠঘাট, গ্রাম, আইল, বকরি কুকুর লাঙল দেয়া মাটি সমেত গ্রামবাংলার দৃশ্যচিত্র। একটি মেয়েলোকের নগ্ন মৃতদেহের দৃশ্য থেকে উৎসারিত অদ্ভুত টানাপোড়েনে হত্যাকারী কাদের আর বিপন্ন আরেফ আলীর গল্প তৈরি হয়। তৃতীয় উপন্যাস 'কাঁদো নদী কাঁদো' চিন্তনপ্রবাহে বিধৃত এক জীবনসংকটের প্রতীকী চিত্রণ। সাকিনা খাতুন এক স্কুলের মাস্টারনি। সে শুনতে পায়— কোথায় একটি নারী কাঁদছে। কে কাঁদে? ক্রমশ সেই ব্যঞ্জনাময় কান্নার আওয়াজ কুকুর ডাঙার অনেকেই শুনতে শুরু করে। অশুভ আশঙ্কা ঘনীভূত হয়। 'মোক্তার মছলেউদ্দীনের মেয়ে ঠিকই বলে কে আর কাঁদবে, নদীই কাঁদে।' অনেক দিন আগে আত্মহত্যা করা খোদেজাই কি নদীর রূপকে কাঁদতে থাকে? 'লালসালু'র মজিদ, 'চাঁদের অমাবস্যা'র আরেফ আলী আর 'কাঁদো নদী কাঁদো'র মুস্তাফা — এদের আশ্রয় করে ঔপন্যাসিক দ্রৌপদীর বস্ত্রের মতো খুলতে খুলতে চলেছেন জীবনের অনির্ণীত রহস্যলোক। পাঠকের হয়ে সমালোচক তাকিয়ে আছেন সেই রহস্যলোকের দিকে। কেউ কেউ বলবেন রচনাই লেখকের ভাষ্য। তার জন্য সমালোচকের প্রয়োজন নেই। একেবারে নেই বলি কী করে? আনন্দবর্ধনের ধ্বনির আলোক দেখানোর জন্য অভিনবগুপ্তকে রচনা করতে হয় লোচন — অভিনব রসভাষ্য। কালিদাস ও পাঠকের মাঝখানে এসে দাঁড়ান মল্লিনাথ। অন্যমনস্ক ও নিরাসক্ত সহস্র পাঠকের মাঝখান থেকে পৃথ্বীশ গেছেন ওয়ালীউল্লাহর কাছে মনস্ক, সংবেদনশীল, অগ্রণী পাঠকের দায় গ্রহণ করে। সে জন্য পাঠকপক্ষ থেকে সহৃদয় ধন্যবাদ তাঁর অবশ্যপ্রাপ্য।

শান্তনু কায়সার 'বাংলা কথা সাহিত্য : ভিন্ন মাত্রা' (ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০১) গ্রন্থে বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। এক সঙ্গে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়েই এতদিন আলোচনা হত (বিভূতিভূষণ, মানিক ও তারাশঙ্কর)। শান্তনু সেখানে ওয়ালীউল্লাহকে টেনে এনে আলোচনায় নতুন মাত্রা এনেছেন মানতেই হবে। বইটিতে আছে চারটি নিবন্ধ। বাংলা সাহিত্য : ভিন্নমাত্রা, দেবযান : স্বর্গ ও পৃথিবীর দ্বন্দ্ব, মাণিকের স্বর্ণবর্ণ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পুনর্বিবেচনা। প্রথম প্রবন্ধটিতে আছে বিভূতিভূষণ, মানিক ও ওয়ালীউল্লাহ'র অবস্থানভূমি, জীবনবীক্ষা ও তাঁদের সাহিত্যিক রূপায়ণের সমত্বসন্ধান। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রবন্ধে বিভূতিভূষণ, মানিক ও ওয়ালীউল্লাহকে নিয়ে আলাদা আলাদা বিশ্লেষণ বা বিচার।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল শান্তনু কিন্তু সমালোচক হিসাবে পৃথ্বীশের মতো পাঠকের লোক নন। তাঁকে সেই অর্থে লেখকের লোক বলাও সমীচীন নয়। আসলে তিনি হচ্ছেন চিন্তা স্বাতন্ত্র্যে, আলোচনা প্রক্রিয়ায় এবং উচ্চারণ বৈগুণ্যে এতটাই অন্য রকম যাঁর সঙ্গে লেখক ও পাঠকের দূরত্ব প্রায় সমান সমান। নয় নয় করে যাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা সাতাশ, 'প্রত্যাশা', 'আলাওল' ও 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ পুরস্কারের' মুকুট যাঁর মাথায় তিনি ছেঁদো পাঠকের লোক হতে যাবেন কেন? লেখক বিশেষের নিজস্ব লোক হওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় কারণ তিনি নিজেই একজন লেখক। বলা বাহুল্য তিনি হচ্ছেন সেই জাতের সমালোচক যিনি নিজের মতো করে আলোচ্য বিষয়ের উপর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের আলো ফেলেন কৌণিক অবস্থান থেকে। যা আছে ফ্লাড লাইটের আলোয় তা দেখা ও দেখানো তাঁর কাজ নয়। কী তিনি দেখতে ও দেখাতে চান তা আগে থেকে ঠিক করে নিয়ে সেই ভাবে ফেলেন তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি, নির্দিষ্ট করেন আলোর প্রক্ষেপণ বিন্দু। ফলে সমগ্রের পরিবর্তে বিশেষ, রূপের বিকল্পে উপরূপ, দৈর্ঘের পরিকল্পে প্রস্থ বা বেধ দৃশ্য হয়ে ওঠে। চেনা লেখক দেখা দেন

অচেনা রূপে। এ আলোচনায় শুধু বিষয় থাকে না বিষয়ীও থাকেন। লেখকের সঙ্গে আর এক লেখক, রচনার সঙ্গে আর এক রচনা মিলে যায়। তখন 'মায়াবী আলোয় ভাসে কলকাতা শহর'। বিস্মিত বা তিরস্কৃত হওয়া ছাড়া পাঠকের এখানে কিছু করার থাকে না। সেই কবে বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলা, মিরান্দা, দেসদিমনার আলোচনা এক সঙ্গে করে তুলনামূলক সাহিত্য আলোচনার চিরঅনতিক্রম্য শোভন সূত্রপাত করে গিয়েছিলেন সেই তৌলন আলোচনা নানা বিসর্পিত পথে তুলনামূলক সাহিত্যিকের আলোচনায় পৌঁছেছে— তার উৎকর্ষ অপকর্ষ নিয়ে প্রশ্ন তোলা সমীচীনও নয় সৌজন্যসম্মতও নয়— সে প্রশ্ন তুলছিও না। শান্তনু কায়সার প্রথম প্রবন্ধটিতে গ্রহণ করেছেন তৌলন আলোচনার একটি সাহসী প্রকল্প। এই আলোচনা প্রকল্পে এসেছেন বিভূতিভূষণ, মানিক ও ওয়ালীউল্লাহ। প্রবন্ধটি আমাদের অনেক তথ্য দেয়, ইতিহাসের একটি ঐকিক সমভূমির সন্ধান দেয়, ত্রয়ী লেখকের উপজীব্য বিষয়ের সমত্ব নিয়ে কিছু উপাদানের সংবাদও দেয় কিন্তু একই মাটি থেকে রস সংগ্রহ করেও গাছ কেন আলাদা আলাদা, একই সূর্য থেকে আলো নিয়েও ফুলের বর্ণ কেন পরস্পর স্বতন্ত্র তার হদিশ জমি ও মাটি আঁচড়ে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ আছে। সমালোচকের সাহসী উদ্যোগ সাধুবাদের যোগ্য কিন্তু কিছু তথ্যগত প্রাপ্তি সত্ত্বেও কোনও মৌলিক অভিন্নতার প্রতীতি বা তার যথার্থ রসরহস্যে তিনি পাঠককে পৌঁছে দিতে পেরেছেন কি না সে বিষয়ে আমি অন্তত সন্দেহমুক্ত নই।

'দেবযান : স্বর্গ ও পৃথিবীর দ্বন্দ্ব' — বিভূতিভূষণ সম্পর্কে একটি বৈশেষিক আলোচনা। 'দেবযান' উপন্যাসটি আশ্রয় করে বিভূতিভূষণের দ্বান্দ্বিক লেখক সত্তাটিকে ভেদ করার চেষ্টা বিভূতি বীক্ষণে অবশ্যই একটি নতুন সংযোজন। এই ভাবেই ধীরে ধীরে একজন লেখকের পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র আঁকা হয়। 'সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ'। সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে এ পথেই লেখকের (পৃথিবীর) ক্রমমুক্তি হবে।

'মানিকের স্বর্ণবর্ণ' সেই অর্থে কোনও বিশেষ রচনা ধরে লেখকের মূলসত্তা আবিষ্কারের প্রবন্ধ নয়। এখানে তল্লাশি চালানো হয়েছে ঘরদোর জুড়ে। ১৯৬২ তে মানিক এক চিঠিতে লিখেছিলেন 'তখন কল্লোলযুগের সমারোহ কিন্তু আমি টের পেয়েছিলাম সাহিত্য যে মোড় ঘুরছে কল্লোলী সাহিত্য তার লক্ষণ মাত্র, আসল পরিবর্তন আসবে অন্যরূপে'— এই অনিবার্যতাই পরিণতিতে মানিকের অনন্যতা হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে স্বর্ণবর্ণ। শান্তনু মানিকের রচনার পর রচনায়, নানা অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়নে উন্মোচিত (বিশেষ করে মার্কসবাদ ও ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব) নানা টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত সেই অনন্য হয়ে ওঠার কাহিনি ধরতে চেয়েছেন। ঔপনিবেশিক বাস্তবতা, শ্রেণীগত সমাজবিন্যাস মানুষকে ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করেছে 'কিন্তু তার বাইরে রয়েছে বৃহৎ মানুষের বিশাল সম্ভাবনা, তার আস্থা ও সৌন্দর্য'— এই প্রতীতিকে কীভাবে লেখক রূপায়ণ করে গেছেন রচনা থেকে রচনান্তরে শান্তনু তারই একটি মনোজ্ঞ মানচিত্র রচনা করেছেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকে 'নেতি ও নিয়তি'র লেখক হিসাবে চিহ্নিত করার কাজ এতাবৎ কাল সমালোচকরা যে ভাবে করে এসেছেন শান্তনু তার পাল্টা একটা বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, পুনর্বিবেচনা' প্রবন্ধটিতে। শিবনারায়ণ রায় ওয়ালীউল্লাহকে 'পারক্য চেতনা'র লেখক, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 'অন্তর্জীবনের জটিলতা ও গ্রন্থিমোচনের' রূপকার, রশীদ করিম 'অর্ধসত্য ও অর্ধবাস্তবে'র ঔপন্যাসিক নামে অভিহিত করেছেন। অনেকেই বলেছেন, দেশের সঙ্গে যোগাযোগহীন 'বিলাতি লেখক'। ওয়ালীউল্লাহ কিন্তু বার বার বলতে চেয়েছেন 'বিদেশে থাকলেও দেশান্তর ঘটেনি, মানে ইমিগ্রেন্টের দলে ঢুকিনি' (পৃ. ১৬৪); 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো এই কঠিন মর্ত্যেই আমার বাস, এই মর্ত্যকেই আমি চিনি।' শুধু দাবি করলেই হয় না তাঁর লেখার মধ্যে তা সত্যি হয়ে উঠেছে কি না সেটাই দেখার বিষয়। শান্তনু বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে 'বাঙালী মুসলমান কর্তৃক আত্মজিজ্ঞাসার অগ্নিপরীক্ষায় আবিষ্কৃত বাংলাদেশ।' তাঁর রচনায় আছে পাকিস্তানোত্তর বিবেকী বাঙালি মধ্যবিত্তের অবস্থান ও ভূমিকা। মনস্তত্ত্ব অনুসরণ করতে গিয়ে প্রুস্ত বা জয়েসের মতো মানবব্যক্তিত্বকে খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেননি। সর্বাধুনিক আঙ্গিক ও বর্ণনাভঙ্গি ব্যবহার করেও তিনি সামাজিক সত্যকেই প্রকাশ করেছেন। 'কাঁদো নদী কাঁদো'তে মানবিক অপচয়ের দুঃখ ও বেদনাই প্রকাশিত। সুতরাং বলা যায় সমালোচক হিসাবে শান্তনু অন্যান্য প্রবন্ধে লেখক ও পাঠকের থেকে সমদূরত্বে অবস্থান করলেও অন্তত শেষ প্রবন্ধটিতে তিনি হয়ে উঠতে পেরেছেন লেখকের লোক। লেখক যা বলতে চেয়েছিলেন সমালোচক হিসাবে শান্তনু তাকেই প্রমাণসিদ্ধ রূপ দান করেছেন। অন্য সমালোচকদের চোখে তিনি বিবাদী হলে লেখক ও পাঠকের কাছে তিনি সহৃদয়হৃদয়সংবাদী।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস : পাঠ পরিক্রমা — পৃথ্বীশ সাহা/নয়া উদ্যোগ কলকাতা — ৬/৩৫.০০

বাংলা কথা সাহিত্য : ভিন্ন মাত্রা — শান্তনু কায়সার/ঐতিহ্য, বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০/১৪০.০০

বাংলা সাহিত্যে একটি উৎকৃষ্ট সংযোজন

অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়

এ বইয়ের মুখবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সঠিক মন্তব্যই করেছেন — লেখিকা শ্রীমতী শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদারের আগ্রহ ও অধ্যয়নের ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত। যে যে বিষয় বা গ্রন্থের আলোচনা এ বইতে স্থান পেয়েছে সেই সব বিষয় বা গ্রন্থ পাঠকমনে আগ্রহ সঞ্চারিত করবে। জ্ঞাত বিষয় বা পঠিত গ্রন্থ হলে আগ্রহী ব্যক্তি দ্বিতীয়বার সেগুলি নিয়ে চিন্তা করবেন এবং বিষয় বা গ্রন্থ নতুন ঠেকলে তা আগ্রহী ব্যক্তির মনে কৌতূহলের উদ্রেক করবে। আলবিরুনির ভারততত্ত্বের সমীক্ষায় লেখিকা আলবিরুনির পাণ্ডিত্য, ঔদার্য, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবিকতার নানা উদাহরণ তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি হিন্দু মানসের মুসলমান রীতিনীতির প্রতি অজ্ঞতা হিন্দুদের মানসিক বৈপরীত্য ও রুচিবিকৃতির ফল—আলবিরুনির এ হেন উপসংহার যে তাঁর চিন্তার দৈন্য প্রকাশ করে এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে লেখিকা Edward Sachau এর মন্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। সব মিলিয়ে একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাহ্‌কিক মা-লিল-হিন্দ খ্যাত আলবিরুনির যথার্থ মূল্যায়ন করার প্রয়াস প্রশংসনীয়।

অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার বাংলার ইতিহাস নির্মাণে কীভাবে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন লেখিকা তার মূল্যায়ন করে পাঠককে এ বিষয়ে কৌতূহলী করেছেন। ইতিহাসের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত ও সাহিত্য বিষয়ে লেখিকার সুচিন্তিত মতামত এ বইতে স্থান পেয়েছে। বাঙালির সঙ্গীত-সংস্কৃতি পরিচ্ছেদে সামবেদী আর্চিক ও গান থেকে শুরু করে পরিক্রমা শেষ হয়েছে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের গানে। এই পরিচ্ছেদটি পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে পরিক্রমা একটু দ্রুত গতিতে সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সেই কারণে কোনও কোনও বিষয়ের আলোচনা হয় একেবারে বাদ পড়েছে নয় লক্ষণীয়ভাবে সংক্ষেপ করা হয়েছে। বাংলার সঙ্গীতের শ্রীক্ষেত্র বিষ্ণুপুর আলোচিত না হলে মনে হয় বাঙালির সঙ্গীত প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। লোকসঙ্গীতের আলোচনা প্রসঙ্গে ভাটিয়ালির নামোল্লেখ করা হলেও বাংলার নিজস্ব অথবা বহিরাগত সঙ্গীত যা বাঙালির সংস্কৃতিতে আদ্যোপান্ত জড়িয়ে রয়েছে যেমন—পূর্ব বাংলার সারিগান ও জারিগান, উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া, চট্‌কা, মালদা জেলার প্রচলিত গম্ভীরা, রাঢ়বাংলার ঝুমুর, ভাদু গান ইত্যাদি আলোচিত না হলে অবশ্যই পাঠকের মন অতৃপ্ত থেকে যায়।

এ গ্রন্থের অন্যতম সুখপাঠ্য পরিচ্ছেদ—বাংলাদেশে চর্যাপদ চর্চা। চর্যাপদের গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গকে পিছনে ফেলে বাংলাদেশ অনেকটাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, অসংখ্য দৃষ্টান্তসহ রচনা থেকে তা সহজেই অনুমেয়। চর্যাপদের ছন্দের চুলচেরা বিশ্লেষণ, ভাষার বিচিত্র প্রয়োগে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের বিশেষ দ্যোতনা, কারক-বিভক্তি, কাল, পুরুষ, লিঙ্গ ইত্যাদি ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য নিরূপণের বহু দৃষ্টান্ত মনোমুগ্ধকর। এই পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় ভাগে লেখিকা উল্লেখ করেছেন— চর্যাপদের কালবিচারে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মত ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৬৫০—১১০০ খ্রিস্টাব্দের ভাষা চর্যাপদে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই মত ও সিদ্ধান্তকে প্রমাণ বলে উল্লেখ করে লেখিকা পাঠককে খানিকটা ধন্দে ফেলেছেন বলে মনে হয়। চর্যাপদ সৃষ্টির কাল প্রমাণিত হবার বিষয়টি বাংলাদেশে চর্যাপদ চর্চার বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না অবশ্যই। সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (আনন্দ পাবলিশার্স — ষষ্ঠ সংস্করণ — প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫) থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া গেল —

> "সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়দের মতে সিদ্ধাচার্যদের কাল মোটামুটি দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে পড়ে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দুই তিন অথবা ততোধিক শতাব্দী পিছাইয়া লইতে চান। নানা কারণে সুনীতিবাবুর মতই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। গোরক্ষনাথের ও মৎস্যেন্দ্রনাথের গাথাকে ইতিহাস মনে করিয়া তিববতী ও নেপালী গল্প ঘাঁটিলে এ মতদ্বৈধের মীমাংসা হইবে না। ঐতিহাসিক প্রমাণে সিদ্ধাচার্যদের আবির্ভাবকালের নিম্নতম সীমা খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী, কেননা ঐ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত মৈথিল পণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণনরত্নাকরে চৌরাশী সিদ্ধের তালিকায় বাঙ্গালী সিদ্ধাচার্যদের অনেকেরই নাম রহিয়াছে। ঊর্ধ্বসীমা একাদশ শতাব্দী।"

উদ্ধৃতিটি এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন হল কারণ, চর্যাপদের কালবিচারে শহীদুল্লাহর মত ও সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলে যদি কোনও পাঠক মনে করেন, তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, অন্য পক্ষের যুক্তিসমূহ আদপেই উড়িয়ে দেবার মতো লঘু নয় বরং অনেক বেশি ইতিহাসনির্ভর।

লেখিকার মৌলিক চিন্তার ফসল — মধ্যযুগের বাংলা কাব্য ও বাঙালির খাদ্যরুচি এবং পরবর্তী বেশ কয়েকটি পরিচ্ছেদ। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন কৌতুক ও ব্যঙ্গ সাহিত্যের প্রতিভাধর শিল্পী আজকের প্রজন্মের কাছে প্রায় অজ্ঞাত। লেখিকা ত্রৈলোক্যনাথ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে একটি মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। গবেষণা ও সমালোচনামূলক গ্রন্থ হিসাবে এই বই বাংলা সাহিত্যে একটি উৎকৃষ্ট সংযোজন।

ইতিহাস ও সংস্কৃতি — শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদার/ নয়া উদ্যোগ, কলকাতা - ৬/১০০.০০

মুক্তমনা এক অগোছালো ব্যক্তিত্ব

বেণু গুহঠাকুরতা

মুজতবা আলী বাংলা সাহিত্যে "এমন একটি মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্য ধারার প্রবর্তন করেন যা সম্পূর্ণভাবে মৌলিকতায় ভাস্বর। ভাষাতত্ত্বে যেমন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন - রচনার ভঙ্গি যেমন বৈদগ্ধ্যে পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র মেজাজে মাতিয়ে রাখে- তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব ও তার তুলনামূলক বিচারে এই উপমহাদেশের স্বল্পসংখ্যক বিশেষজ্ঞের তিনি ছিলেন অন্যতম। ছিলেন রবীন্দ্র সংস্কৃতির নিষ্ঠাবান অনুরাগী "— সম্পাদকের এই মূল্যায়নের সঙ্গে দ্বিমত হবেন মুজতবার পাঠকদের মধ্যে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া বোধ হয় মুশকিল।

তিনটি পর্বে ভাগ করা এই সংকলনটির প্রথম পর্বে মুজতবা আলীর রচনার বৈশিষ্ট্যের নানা দিক আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে স্মৃতিচারণ, তৃতীয় পর্বে তাঁর জীবনী ও গ্রন্থ তালিকা। মোট ৩২ জন জ্ঞানীগুণী বাঙালি ব্যক্তিত্ব মুজতবার জীবনের বহুমুখী প্রতিভার ও তার চরিত্রের নানান বিশেষত্বের দিকগুলি এই সংকলনে আলোচনা করেছেন।

মুজতবার 'দেশে বিদেশে' প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন "লেখকের ব্যক্তিত্ব যা তাঁর বইয়ে ধরা যাচ্ছে তার মধ্যে দুটি জিনিষ লক্ষণীয়। তিনি একদিকে যেমন international বিশ্বের একজন বিশ্বমানবিকতায় ভরপুর উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, তিনি ইউরোপীয়, ভারতীয় আর ইসলামীয় তিনটি সভ্যতার বাহ্য ইতিহাস আর রূপ আর তার ভিতরের কথা সব নখ-দর্পণে রাখেন—তিনি ইতিহাস, দর্শন আর সাহিত্যের অধ্যাপক, ইংরেজি, ফরাসী, জরমান, বাংলা (প্রাচীন আর আধুনিক) সংস্কৃত, ফারসী, আরবী আর তা ছাড়া অন্য কতগুলি সাহিত্যের হাওয়া আর তার মহাকাব্য আর বচন তার মনের ফুল বাগানে সৌরভের মত ভেসে বেড়াচ্ছে— তাঁর কাছে গোঁড়ামির লেশমাত্র নেই — আর অন্যদিকে তিনি হচ্ছেন তেমনি খাঁটি বাঙালী— কেবল খাঁটি বাঙালী নন— খাঁটি মুসলমান বাঙালী। তিনি নিজে মুসলমান সংস্কৃতি ও ধর্মের গৌরবে 'স্বে মহিম্নি'। নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁর আন্তর্জাতিকতা বাঙালী মুসলমান জাতীয়তার ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। সেইজন্যই তাঁর আন্তর্জাতিকতা এত পাকা কারণ এই কথাটি অতি সত্য কথা— He alone is truly international who is most intensely national. মাঝে মাঝে তিনি যখন দুই চারবার তার মনের গভীরতম প্রদেশের বাতয়াণ পথ একটু-আধটু উন্মুক্ত করে দেখিয়েছেন, তখন মুসলমানী রঙে রাঙ্গানো অনুভূতির বা রসোপলব্ধির ঝলক চোখে লেগেছে। আমি বাঙালী হিন্দু ঘরের ছেলে। এতে খুসীই হয়েছি। কারণ আমি একককে তো চাইই, বহু আর বিচিত্র সেই একেরই প্রকাশ বলে পৃথক পৃথক ভাবে এই বহু ও বিচিত্রকেও আমি চাই।' (পৃ. ১৫/১৬)

ধর্মীয় অন্ধতা মুজতবাকে কোনও দিনই স্পর্শ করতে পারেনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কিছুদিন পূর্বপাকিস্তানের বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। সেখানে এক সভায় বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ইকবালের চাইতে অনেক বড় কবি। আর যায় কোথায়, সে দেশের মৌলবাদী ছাত্ররা তাঁকে মারতে যায় আর কি।

মৌলবাদীর অভাব এদেশেও ঘটেনি। "একবার শান্তিনিকেতনে সাতই পৌষের উপাসনায় ছাতিমতলায় তিনি আচার্য হয়েছিলেন। পরে এসেছিলেন শেরওয়ানী চোস্ত ও ফেজ টুপি। এই জন্যে শান্তিনিকেতনের রক্ষণশীল লোকদের কাছে কম কটূক্তি শুনতে হয়নি তাঁকে .... কিন্তু আরও দুঃখের কথা ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় একদল স্বার্থান্বেষী শান্তিনিকেতনবাসী অকারণে তাঁকে 'পাকিস্থানের চর' বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। সেই দুঃখে শান্তিনিকেতন ছেড়ে তিনি সংলগ্ন বোলপুর শহরে বাড়ি ভাড়া করে চলে যান। আর শান্তিনিকেতন যান নি, দুর্ভাগ্য শান্তিনিকেতনের।' (অমিতাভ চৌধুরী-পৃ. ১৯৮)

এ দেশে ধর্মের নামে নানান বজ্জাতি দেখে একবার বিরক্ত হয়ে তিনি বলেছিলেন যে দেশে "শ্রীচৈতন্য প্রেমের উদ্‌গাতা- তাঁরও এই হাল হয়েছে! এই দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতা দূর করার চেষ্টা ছোঃ।"

রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু স্বামী সারদানন্দ গভীরভাবে আরবি ভাষা আয়ত্ত করে মূল কোর-আন্ ও অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করে হজরতের একটি জীবনচরিত রচনা করেন। গজেন্দ্রকুমার মিত্র উৎসাহভরে সে কথা মুজতবাকে বলতে গেলে তিনি বলেছিলেন "তা বেশ করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টার জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু এ বই তিনি যেন ছাপাবার চেষ্টা না করেন।" কারণ হিসাবে তিনি বলেছিলেন "আরে ব্রাদার, শোনই আমার কথাটা। শ্রদ্ধার সঙ্গে লিখেছেন সত্য হতে পারে—কিন্তু সে কতটা শ্রদ্ধা! ফ্যানাটিকদের মতো শ্রদ্ধাপ্রকাশ করা, তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। উদার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ না হলে হিন্দু সন্ন্যাসী এই কাজ করতে যাবেন কেন। আর এইখানেই তো বিপদ! তিনি হয়তো কোথায়ও বুদ্ধের

সঙ্গে তুলনা দিয়ে ভেবেছেন যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখানো হল—আমরা সেটাকে নবীর প্রতি অপমানকর বলে মনে করবো। না, না, এই বই তাকে আলমারিতে তুলে রাখতে বলো" (গজেন্দ্রকুমার মিত্র পৃ. ১৬৯)

এই মজলিসি রসিক মানুষটার অসংখ্য রসিকতা এই গ্রন্থের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্তকে বলেছিলেন 'আমার চিৎকার আর দৌড়ে যাওয়া দেখে ভাবছ, আমি পাগল? কিংবা ওই বোতল দুটিতে চোখ বুলিয়ে ধারণা করেছ আমি মাতাল হয়ে গেছি। আরে না না, মোটেও না। আমি সৈয়দের ব্যাটা, যতই খাইনা কেন মদ আমার গলা অবধি উঠলেও কখনওই মাথা অবধি পৌঁছায় না। প্রমাণ চাও?' বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে রবীন্দ্রনাথের একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা সঠিক যতিচিহ্ন সহ গড়গড় করে বলে থামলেন। বললেন 'বদ্যিদের আমি বিভীষণ ভয় পাই (বিভীষণ আলী সাহেবের ব্যবহার)। কেন, শোনো বলছি। পাঁচটা সাপের বিষে একটি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হয়। দশটা বারেন্দ্র মরলে একটা বদ্যি হয়—তাই অমন ভয়। পরে বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিতে দিতে মনে হল আমিও সৈয়দের ব্যাটা। এতদিন তরল গরল নিয়মিত সেবনেও বিষ এখন গলা পর্যন্ত উঠেও বিসমিল্লার দোয়ায় একবারও মাথায় ওঠেনি, তখন একা এই বদ্যি ব্যাটার বিষে আমার কি হবে' বলেই অট্টহাসি হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন 'কি ব্রাদার কী রকম চম্পু দিলুম।' (পৃ. ২০৯, ২১০)

আলী সাহেবের সদা সহচরের নাম ছিল শেখ দিলজান। তিনি তা পাল্টে করেছিলেন কাটু। কেন? 'প্রথমত সে আমার মুরগী কাটে। দ্বিতীয়ত সে আমার মাছ কাটে, তৃতীয়ত শেষ অবধি ও আমার পকেটও কাটে'। এক মুহূর্ত থেমেই আবার যোগ করলেন 'এ রকম সহচর কোটিতে গোটিক। আমি আদেশ করলে সে লোকের মাথাও কাটতে পারে। তাই কাটুই তার যোগ্য নাম' তেমনই তার ছিল এক আদরের অ্যালসেশিয়ান। আলী সাহেব তিন গেলাসের বেশি খেতে আরম্ভ করলেই প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ শুরু করে শাসন করত। তাই তিনি কুকুরটার নাম দিয়েছিলেন মাস্টার। সৈয়দদা বলতেন, 'গত জন্মে এ ব্যাটা নিশ্চয়ই আমার চাচা ছিল।' (সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত পৃ. ২১১)

মুজতবা ছিলেন রবীন্দ্রস্নেহধন্য। কৈশোরে রবীন্দ্রনাথের 'আকাঙ্ক্ষা' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা শুনে (১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে) তিনি কবির কাছে এক চিঠিতে প্রশ্ন করেছিলেন—'আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করতে হলে কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার?' রবীন্দ্রনাথ উত্তরে জানিয়েছিলেন — 'আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করিতে হইবে—এই কথাটির মোটামুটি অর্থ এই যে—স্বার্থই মানুষের কাম্য না হয়। দেশের মঙ্গলের জন্য ও জনসেবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত যে উদগ্র কামনা তাহাই মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। তোমার পক্ষে কি করা উচিত, তা এতদূর থেকে বলে দেওয়া সম্ভব নহে। তবে তোমার অন্তরের শুভেচ্ছাই তোমাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে।' (বারিদবরণ ঘোষ পৃ. ৫২)

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিই তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল শান্তিনিকেতনে, যেখানে সংগৃহীত হয়েছিল তাঁর ভবিষ্যতের পাথেয়। ১৯৩৯ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথকে শেষ বারের মতো দেখেন। তখন আলী সাহেব বরোদা কলেজে অধ্যাপনা করেন। বরোদার মহারাজ সসম্মানে তাঁকে রেখেছেন শুনে তিনি বললেন—'তোদের যখন রাজা মহারাজারা ডেকে সম্মান দেখায় তখন আমার মনে কি গর্ব হয়। আমার কি আনন্দ হয়। আমার ছেলেরা দেশে বিদেশে কৃতী হয়েছে .... তা যাক্ বলতে পারিস সেই মহাপুরুষ কবে আসবেন কাঁচি হাতে করে?'

আমি অবাক। মহাপুরুষ তো আসেন ভগবানের বাণী নিয়ে, অথবা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম নিয়ে, কাঁচি হাতে করে? 'হাঁ হাঁ কাঁচি নিয়ে। সেই কাঁচি নিয়ে সামনের দাঁড়ি ছেঁটে দেবেন, পেছনের টিকি কেটে দেবেন। সব চুরমার করে একাকার করে দেবেন। হিন্দু-মুসলমান আর কতদিন এরকম আলাদা হয়ে থাকবে।' (বারিদবরণ ঘোষ, পৃ ৫৬)। মুজতবা আলী বা রবীন্দ্রনাথের আশা আজও অপূর্ণই থেকে গিয়েছে। ফলে মুজতবাকে এপার বাংলা আর ওপার বাংলার মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে শেষ পর্যন্ত ঢাকাতে গিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছিল।

মুজতবা আলীর দীর্ঘ সাহিত্যজীবনের নানা দিক এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয় তাই আলী সাহেবকে যাঁরা জানতেন অথবা এই প্রজন্মের মানুষ যারা তাঁকে তেমন ভাবে জানেন না—তাদের সবারই এই সংকলনটি সংগ্রহ করা উচিত।

মজলিসী মুজতবা—সম্পাঃ তাপস ভৌমিক/**কোরক**, কলকাতা-৫৯/৫০.৭০।

সভ্যতার সংকটে এই সমাজ এই সময়

সুস্নাত দাশ

"*মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুতেই আমি কৌতূহলী, আগ্রহী, কোন কিছুতেই আমার অরুচি নেই। জীবনের যাবতীয় দিকই আমাকে ভাবায়। ......*"

কথাগুলি বলেছেন অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ "এই সমাজ এই সময়"-এর মুখবন্ধে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু করে চলতি শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত নানা প্রসঙ্গের আলোচনা ও নানা প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে এই গ্রন্থে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন।

আলোচ্য গ্রন্থটি লেখকের দ্বিতীয় প্রবন্ধ সংকলন। মোটামুটিভাবে বিগত এক দশকে রচিত লেখকের একুশটি সুনির্বাচিত মূল্যবান প্রবন্ধের এই সংকলনটি প্রকাশ করে প্রখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা দে'জ প্রশংসনীয় কাজ করেছেন সন্দেহ নেই। জ্যোতিপ্রকাশবাবুর লেখালেখির সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে মানুষের চিন্তা বুদ্ধি ও যুক্তির জগতকে যা শৃঙ্খলিত করে, দাসত্বের রজ্জু পরায়; যে বিবেকহীন অকল্যাণকর ভাবাদর্শ বিশ্ব ইতিহাস, সভ্যতা ও মানবতাকে প্রতিনিয়ত নিষ্পিষ্ট ও পদদলিত করে — নানারূপে চরিত্রে প্রকট সেই ফ্যাসিবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে লেখকের কলম সর্বদাই সক্রিয়।

ভারতবর্ষে আজকে যে অন্ধকারের সাধনা নানাভাবে ও নানা রূপে চলছে মূলত এই প্রবন্ধ সংকলনের রচনাগুলি সেই অন্ধকারের বুক চিরে জ্বলে ওঠা যেন এক-একটি অনির্বাণ আলোর মশাল। চতুরঙ্গ পত্রিকার (বর্ষ-৬০, সংখ্যা-৩-৪; কার্তিক-চৈত্র, ১৪০৭) একটি সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিকীর্ণ আঁধারের দীক্ষা'-নামক প্রবন্ধটি থেকে শুরু করে 'অন্ধকারের দর্শন' পর্যন্ত নানা নিবন্ধে জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মৌলবাদী শক্তিরূপে সংঘ পরিবার ও হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা সংঘটিত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর নানাবিধ আক্রমণের নগ্ন ও ভয়ঙ্কর চেহারাগুলিকে পাঠকদের সামনে তথ্য ও যুক্তি সহকারে তুলে ধরেছেন।

বর্তমান ভারতে বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতি ও ধর্মের যে মিশ্র কিন্তু সংহত রূপটি কয়েক সহস্র বছরের ভারতীয় ঐতিহ্যের পরম্পরায় গড়ে উঠে 'ভারতীয় মহাজাতি' রূপে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হয়েছে সহিষ্ণুতা ও সেকুলারিজমের যুক্তিসংগত আদর্শকে আশ্রয় করে, আমাদের দেশের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী আজ তাকে ধ্বংস করতে উদ্যত। 'হিন্দুত্বে'র ও 'হিন্দুত্ববাদ'-এর (খাঁটি না মেকি সে বিচার কে করে!) তাত্ত্বিক ধবজা ধরেই স্বাধীনতালাভের পূর্বে অত্যন্ত গোপনে, ভারতীয় ফ্যাসিস্ট শক্তি সংঘ পরিবারের নেতারা এগিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত সীমিত আকারে হলেও কেন্দ্রীয় ক্ষমতার মালিকানা পেয়েছেন। ভারতীর গণতন্ত্রে 'বহুত্ববাদে'র ন্যায়সংগত মূল স্তম্ভটি আজ এই অশুভ ও অকল্যাণকর শক্তির উন্মত্ততায় কম্পমান। ভারতবর্ষের মিশ্র সংস্কৃতির (composit culture) ঐতিহ্যকে এঁরা স্বীকার করে না। R. S. S.- এর হেডগেওয়ার, গোলওয়ালকার থেকে শুরু করে সুদর্শন, সিঙ্ঘল, রাজেন্দ্র (রাজ্জু,) 'আদবানি পর্যন্ত সকল তাত্ত্বিক নেতারাই চেয়েছেন ভারতে 'হিন্দু রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা করতে। তাঁরা চেয়েছেন ভারতীয় তরুণ সমাজও শৈশবকাল থেকেই এই স্বপ্ন দেখুক। ধর্মের ভিত্তিতে 'একশিলাভূত' (Monolithic) এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই তাঁদের গৃহীত ও প্রচারিত ধ্বনি ছিল "হিন্দু-হিন্দী-হিন্দুস্তান"। সংঘ পরিবার তথা বিজেপির গোপন অ্যাজেন্ডা হল-এই নীতিকেই কার্যকর করা। এই উদ্দেশ্যে ধর্মান্ধ জঙ্গি উন্মাদনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তরুণ সমাজের সামনে তারা সরাসরি 'হিন্দু জাতির শত্রু'রূপে হাজির করেছেন ভারতের অপরাপর ধর্মীয় সম্প্রদায় ও সংখ্যালঘুদের, বিশেষত মুসলিমসমাজকে। এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রবক্তাদের বক্তব্যের সঙ্গে তাদের অমিল খুব একটা ছিল না।

হিন্দুত্ববাদীরাও কার্যত ঔপনিবেশিক ভারতে ইংরেজদের অপেক্ষা মুসলমানদেরই মূল শত্রু বিবেচনা করত। যার ফলে রাজনৈতিক সংস্থারূপে আর.এস.এস. বা হিন্দুমহাসভা জাতীয় আন্দোলনে কার্যত নিষ্ক্রিয়তাই অবলম্বন করে। আদর্শগত বিচারে ইতালীয় ফ্যাসিবাদ বা জার্মান নাৎসিবাদের সঙ্গে হিন্দুত্ববাদীদের মৌলিক প্রভেদ প্রায় ছিলই না। ফ্যাসিবাদ বা নাৎসিবাদের মূল বিষয় ছিল অত্যুগ্র জাত্যভিমান। নিজের জাতিকে গৌরবদান বা গৌরবান্বিত করে দেখার মাধ্যমে জন্ম নেয় "আমরাই শ্রেষ্ঠ" মানসিকতা এবং তার থেকে শুরু হয় ১, নিজেদের মহীয়ান করে দেখানোর জন্য কাল্পনিক গাথা বা মিথ সৃষ্টির এবং ২, অপরাপর সংখ্যালঘু জাতি বা ধর্মগোষ্ঠী ও বিরুদ্ধবাদী রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে সহিংস ঘৃণা প্রদর্শন। হিটলার শাসিত জার্মানিতে যেমন ইহুদি বা মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে করা হয়েছিল।

ভারতেও ধর্মের নামে ও ধর্মান্ধকতাকে অবলম্বন করে সেই প্রচেষ্টা ঔপনিবেশিক আমল থেকেই শুরু হয়েছিল। ভারতের

জাতীয় আন্দোলনের প্রধানতম ব্যক্তিত্ব গান্ধীকে হত্যার মাধ্যমে তার অবসান ঘটেনি, বরঞ্চ নবরূপে ও নবশক্তিতে এই ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমশ মাথা চাড়া দেওয়ার সুযোগ পায়। অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় সঠিকভাবেই বলেছেন, *"ধর্মকে কেন্দ্র করে অনায়াসে সৃষ্টি করা যায় এমন আবেগ যেখানে যুক্তি চলে না, বিচার ব্যর্থ হয়ে যায়। অথচ ধর্মের উৎস যেহেতু সুদূর অতীতে, সে আবেগে থাকে এক গভীরতা এবং ব্যাপকতাও। ধর্ম বলেই তার মধ্যে থাকে এক রহস্যময়তাও। থাকে একান্ত বিশ্বাস* (faith) *যা কেউ যুক্তি দিয়ে বদলাতে পারে না, ভাঙতে পারে না। জাতির আবেগের সঙ্গে ধর্মের আবেগ জুড়ে দিলে ...... ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে যুক্তি তর্ক-বুদ্ধি, সব।"* হিন্দুত্ববাদীদের গোপন কর্মসূচি বা অ্যাজেন্ডা একদা পরিকল্পিত হয়েছিল এরই ওপর ভিত্তি করে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ভারতকে একটি "হিন্দুরাষ্ট্রে" (পড়ুন - ধর্মীয় ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে) পরিণত করার জন্য মনস্তাত্ত্বিক ও তাত্ত্বিক পরিমণ্ডল সংগঠিত করা। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর এবং বৌদ্ধিক চিন্তাচেতনার জগতকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা বা গ্রাস করা ভিন্ন এ জাতীয় পরিকল্পনা সফল হতে পারে না। এটা করতে হলে মৌলবাদী মতাদর্শের প্রবক্তারা (মুসোলিনি, হিটলার প্রমুখ) যা করে থাকেন বিজেপি নেতৃত্বও সেই পন্থাই অবলম্বন করেছেন। এগুলি হল- ১) ইতিহাস, ইতিহাসচর্চা ও ইতিহাস পাঠক্রমের বিকৃতি সাধন; ২) রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুদানে পরিচালিত জ্ঞানচর্চার ও গবেষণা কেন্দ্রগুলির (বিশেষত সমাজবিদ্যার) উপর অপ্রতিহত ও নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপন যাতে যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারার পরিবর্তে নিজেদের মতান্ধ ও মৌলবাদী চিন্তা দর্শন প্রচার করা যায় : ৩) শৈশবাস্থা থেকেই যাতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মস্তিস্ক দখল করা যায় তার জন্য প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চবিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত পাঠক্রমে ধর্মান্ধ, মৌলবাদী ও অনাধুনিক (আধুনিকতার সংজ্ঞা অবশ্যই প্রযুক্তির বিকাশে নয়, চিন্তার জগতের যুক্তিবাদী স্বাধীনতার মধ্যে নিহিত) শিক্ষাধারা (স্বাভাবিক কারণেই যা কুশিক্ষার নামান্তর) অনুপ্রবিষ্ট করার ; ৪) ঐতিহ্য ও সংস্কারের মোড়কে উগ্রজাত্যভিমানী বা সাম্প্রদায়িক (পড়ুন তালিবানি) সংস্কৃতির ও পরম্পরাগত মূল্যবোধের নামে অবৈজ্ঞানিক ভাবধারার প্রচার ও প্রসার।

ধর্মীয় মৌলবাদের এই চেহারা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানে বহু পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। সেখানে যেমন "ইতিহাস চর্চা" নামটির স্থলে "পাকিস্তান চর্চা" শব্দটিকে গ্রহণ করা হয়েছে, তেমনই পাক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ইসলাম ধর্মের গৌরবগাথার ভিত্তিতে পাঠ্যক্রম প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়েছে। এই সূত্র অনুসারে নতুন পাঠ্যপুস্তকে উপমহাদেশের প্রাচীন যুগ ইতিহাসের পাতা থেকে বাদ পড়ে যায়। বস্তুত আজ প্রতিবেশী ইসলামি স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রটির সঙ্গে ভারতের জ্ঞানচর্চার পার্থক্যটিকে মুছে দেওয়ার হীন পরিকল্পনাই আমাদের শাসকগোষ্ঠী করে চলেছে। অবশ্য অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় সঠিকভাবে দেখিয়েছেন যে পাকিস্তানের ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভিন্ন এক ধারাও রয়েছে। কে. কে. আজিজ অথবা মুবারক আলির মতন ঐতিহাসিকরা আজও পাকিস্তানে যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক ও বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ভয়ঙ্কর বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ইতিহাসের মৌলবাদী ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে লিখে যাচ্ছেন। অবশ্য সে দেশে এখনও তাঁদেরকে 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দেওয়া হয়নি—যে অভিধা আমাদের দেশের যুক্তিবাদী ঐতিহাসিকরা লাভ করেছেন ভারতের শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে। যোশী আর-এস-এসের যোগ্য মুরলীধরই বটে।

বর্তমান ভারতে হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্ট শক্তি কীভাবে মানুষের মুক্তচিন্তা ও যুক্তির জগৎকে প্রতিনিয়ত আঘাত করে চলেছে তার তথ্যবহুল প্রতিবাদী বিবরণ আলোচ্য গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে নানা প্রবন্ধে। এ ক্ষেত্রে লেখক জার্মান ফ্যাসিবাদ বা নাৎসিবাদের উদ্ভব, বিকাশ ও ভয়ঙ্কর পরিণতির খণ্ড খণ্ড চিত্র যেমন সবিস্তারে আলোচনা করেছেন তেমনই তুলে ধরেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের অন্যত্র ফ্যাসিবাদ এবং পুঁজিবাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতার প্রকৃত রূপ। 'নীটশের ছড়ি' নিবন্ধটি এ ক্ষেত্রে একটি অনন্যসাধারণ রচনা। জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সংকলন গ্রন্থের প্রথম নিবন্ধ 'যাঁরা ইতিহাস বিস্মৃত হয়'-তে মহাভারতের শান্তি পর্বের একটি শ্লোক ("ধর্মং যা বাধতে ধর্মো ন স ধর্মঃ কুর্বত্ম তৎ") তুলে ধরে ব্যাখ্যা করেছেন-"যে ধর্ম অন্য ধর্মকে বাধা ও পীড়া দেয় তা ধর্ম নয়, সে এক অন্যায় পথ।" সুতরাং শুধু হিন্দু মৌলবাদ নয় বা হিন্দুসমাজের মধ্যে বর্ণাশ্রম নামক ব্রাহ্মণ্যবাদী অত্যাচারে পিষ্ট গো-বলয় ও দক্ষিণ ভারতের দলিত জনগণের অবর্ণনীয় দুঃখময় জীবন বৃত্তান্তই নয় ("ওরা তো মানুষ নয়, দলিত সন্তান" এবং "তিন রকমের গেলাস্" প্রভৃতি নিবন্ধ উল্লেখ্য) আফগানিস্তানের তালিবান অত্যাচার বা ইসলামি মৌলবাদী চিন্তাধারার বিরুদ্ধেও লেখক সমান সোচ্চার হয়েছেন। তবে বর্তমান বিশ্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মধ্যপ্রাচ্য নীতি এবং তৈল সম্পদের উপর তার ক্রম আগ্রাসনের ষড়যন্ত্রের প্রতিক্রিয়াতে কীভাবে 'প্যান-ইসলামি' চিন্তাধারার প্রশ্রয় ঘটছে তা যেমন ভেবে দেখা প্রয়োজন, তেমনই বিশ্ব-কম্যুনিজমের পতনের পর কেন মার্কিন ধনবাদী শক্তি 'ইসলামি দুনিয়া'-কেই তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বেছে নিল—তাও তলিয়ে দেখা দরকার। তা ছাড়া বর্তমান বিশ্বে 'মার্কিন মৌলবাদ' (প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন, যাঁরা আমেরিকাকে সাহায্য করবে না তাঁরা সকলেই

সন্ত্রাসবাদী।) না 'মুসলিম মৌলবাদ' বিশ্বমানবতার প্রধান শত্রু কারা, তা স্থির করে নেওয়া বর্তমান সময়ে সহজ কাজ নয়।

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থে সংকলিত 'যদি দেশভাগ না হতো' নিবন্ধটি এই প্রবন্ধ সংকলনের সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত রচনা। লেখক ভারত বিভাগের বিষয়টিকে ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর প্রতিপাদ্য হল যদি বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ দু'টি ভাগ না হত তা হলে বাঙালি মুসলমানসমাজ এবং অমুসলমান পাঞ্জাবি জাতি তাদের পূর্বেকার সামন্ততান্ত্রিক এবং অনাধুনিকতার বোঝা ঝেড়ে ফেলে এই ভাবে বিকশিত ও পল্লবিত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না। কথাটা ঠিক যে প্রাক-স্বাধীনতা কালে অবিভক্ত পাঞ্জাবে হিন্দু-শিখ-মুসলিম নির্বিশেষে পঞ্চনদ অধিবাসীরা শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আধুনিকতাবোধে তেমন উজ্জ্বল ছিল না। কিন্তু পশচাতের প্রকৃত আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কারণ বিশ্লেষণ না করে যদি দেশ বিভাগ সংক্রান্ত বিষয়টিকে সমস্যার প্রতিবিধান স্বরূপ উপস্থিত করা হয় তবে তার ঔচিত্য সম্পর্কে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। জ্যোতিপ্রকাশবাবু যে কারণে পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানের উন্নতি দেখে আনন্দ পেয়েছেন সেই ধরনের উন্নতি কি পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলমানদের মধ্যে ঘটেছে? তা ছাড়া বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছাড়া বাকি ৭০-৭৫ ভাগ অধিবাসী বাঙালি কি এখনও সেই কূপমণ্ডুকতা, দারিদ্র ও ধর্মান্ধতায় জর্জরিত হচ্ছেন না? এই সমালোচকের বক্তব্য এ ক্ষেত্রে আলোচ্য গ্রন্থের লেখকের অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ দেশভাগই স্বাধীনতালাভের পর বাহান্ন বছর ধরে তিনটি দেশেরই জনগণের বহুবিধ সমস্যার মূল কারণ। দেশ বিভাগ না ঘটলে আজ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ভাবে এত পিছিয়ে থাকত না, ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতির বিকাশ চরমসীমা ছুঁতে পারত। সর্বোপরি তিনটি দেশেই ধর্মান্ধ মৌলবাদী শক্তি ও ছদ্মধার্মিক রাজনীতির কারবারিরা গোটা উপমহাদেশ জুড়ে তাদের এমন ফলাও কারবার বোধহয় চালাতে পারত না। বস্তুত দেশভাগের মতন অস্বাভাবিক ঘটনা না ঘটলেই বরঞ্চ পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমান ভারতীয় উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল স্রোতধারায় নিজেদের যুক্ত করতে তাদের উন্নতি আরও ত্বরান্বিত করে পারত। বৈদ্যুতিন ও অন্যবিধ গণমাধ্যমের মনুষ্য-চেতনা ও স্বচ্ছ-বুদ্ধি গ্রাসকারী সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তিনি মানুষকে সচেতন করে তোলেন তেমনই অনলসভাবে ভারতে ফ্যাসিবাদের সম্ভাবনা ও বিপদ সম্পর্কেও তিনি কথা বলে যান। চেষ্টা করে যান সমাজ ও সময়কে সতর্ক করে তুলতে। সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থটিতে তাই তিনি লেখেন : *"ভারতবর্ষেও ইহুদি ঘৃণার মতো মুসলমান ঘৃণার এবং জার্মান গৌরবের মতো হিন্দু গৌরব (সব হিন্দু নয়, বর্ণহিন্দুর গৌরব) সচেতনভাবে রটনার ফলে বিশেষ এক সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে। তাকে ফ্যাসিবাদী বলা যায় কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু সেই সংস্কৃতিরই ফলশ্রুতি আটচল্লিশে গান্ধীহত্যা। পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর-আশির দশক জুড়ে অসংখ্য দাঙ্গা, বিরানব্বই-এ বাবরি ধ্বংস ও শত শত মুসলমান হত্যা (বিরানব্বই-এর বোম্বাই-এর সেই রাত্রিগুলি যেন আটত্রিশের বার্লিনে ইহুদি নিধনের 'ক্রিস্টাল নাইট'!) এবং ছিয়ানব্বইয়ে তেরোদিনের ক্ষমতাতেই সেই বোম্বাইয়ে, গান্ধী হত্যার সহায়ক ও যাবজ্জীবন জেল খাটা গোপাল গডসেকে (নাথুরাম গডসের ভাই) বিশেষ সংবর্ধনা দান.... ভারতের আর-এস-এস হুবহু জার্মান এস-এস না হলেও দুইয়েরই সাংস্কৃতিক ঘরাণাটি এক।"*

'নরকেরও ব্যঙ্গচিত্র, মৃত্যুরও বিকার' নিবন্ধটিতে (পি. সাইনাথের বিখ্যাত বইয়ের আলোচনামূলক রচনা) লেখক তথাকথিত উন্নয়নের নামে কীভাবে দরিদ্র-দলিত-জনজাতি মানুষদের মানবাধিকার প্রতি পলে পদদলিত হচ্ছে তার একটি মর্মস্পর্শী বিবরণ দিলেও মনে হয়েছে 'তথাকথিত বিশ্বায়ন' কীভাবে আজ ভারতের মতন গরিব দেশগুলির নব্যতম ঔপনিবেশিক শোষণের অবাধ মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করেছে এবং মার্কিনি মাতব্বরি কীভাবে এই সকল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাকে পর্যন্ত বিনষ্ট করতে উদ্যত— জ্যোতিপ্রকাশবাবুর কুশলী লেখনী যদি এ বিষয়ে অন্তত একটি রচনা পাঠকদের উপহার দিতেন—তা খুব কাজের হত। বইটির চমৎকার প্রচ্ছদটি করেছেন দেবাশিষ রায়। শুধু যদি গ্রন্থটির মূল্য আরও কিছুটা কম হত তাহলে বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছানোর পক্ষে তা সহায়ক হত। জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় দু'হাতে আরও দীর্ঘদিন ধরে লিখে চলুন এই প্রত্যাশা।

এই সমাজ এই সময় — জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়/ দে'জ, কলকাতা - ৭৩/১০০.০০

গণতন্ত্রের অপব্যবহার ও তার পরিণাম

হাবিব রহমান

আবদুর রউফ, যিনি তাঁর নামের বানান ঈষৎ পরিবর্তন করে বর্তমানে লিখছেন আবদুর রাউফ, সাংবাদিক-লেখক হিসেবে সুপরিচিত। আর দীর্ঘ পাঁচ যুগের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ 'চতুরঙ্গ' পত্রিকা সম্পাদনাসূত্রে পশ্চিম বাংলার প্রাদেশিক সীমা অতিক্রম করে তাঁর নাম বাংলাভাষী অন্য দেশে ও অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্প্রসারণে বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সংহতি পরিষদ এবং সারগর্ভ ও প্রাঞ্জল গদ্যশৈলীর জন্য সমতট সংস্থা কর্তৃক সংবর্ধিত হয়েছেন। বই লিখেছেন 'স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান' ও 'মুক্তমনের সংকট'। আলোচ্য 'গণতন্ত্র ও সংখ্যালঘু সমস্যা' তাঁর তৃতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ।

আবদুর রউফের পরিচিতি ও খ্যাতি মূলত সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় লেখক হিসাবে। 'গণতন্ত্র ও সংখ্যালঘু সমস্যা' বইটি উত্তর-সম্পাদকীয় লেখারই একটি সংকলন। লেখকের ভাষ্য অনুযায়ী ১৯৯৮ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে লেখা এই কলামগুলো বেরিয়েছিল আনন্দবাজার ও সংবাদ প্রতিদিন দৈনিকে। সেগুলোকে ছ'টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে প্রস্তুত করা হয়েছে এই বইটি। অধ্যায়গুলোর নাম যথাক্রমে গণতন্ত্রের অপব্যবহার, সংঘপরিবারের ভূমিকা, খ্রিস্টানদের উৎকণ্ঠা, বাংলাভাষী মুসলমানের দুর্দশা, মাদ্রাসা শিক্ষায় সংকট ও প্রাসঙ্গিক কিছু অন্য বিষয়। লেখকের মূল আলোচ্য হল ভারতে গণতন্ত্রের স্বরূপ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর নানাবিধ সংকট-সমস্যা। এর মধ্যে শেষ অধ্যায়টি প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। হজরত মুহম্মদ, কাজী নজরুল ইসলাম, জাতীয় উৎসব ইত্যাদি বিষয়ে এই লেখাগুলো আপাত-বিচ্ছিন্ন হলেও লেখকের মতে এগুলো সংখ্যালঘুদের মানসিকতা অনুধাবনে সহায়ক হবে আর সব মিলিয়ে বর্তমান আলোচকের বিবেচনায় সম্পূর্ণ বইটি গণতন্ত্র ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা নিয়ে ভাবিত পাঠকের সচেতনতাকে বাড়িয়ে দিতে অনেকখানি সাহায্য করবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত লেখার গুরুত্ব অনেক সময়ই তাৎক্ষণিকতায় সীমাবদ্ধ এবং সে লেখা যদি ধারাবাহিক হয় তা হলে তা সযত্নে সংরক্ষণ করবেন এমন পাঠকের সংখ্যা বিরল। তাই এই লেখাগুলোকে দুই মলাটের মধ্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার খুবই দরকার ছিল।

পৃথিবীর যে অল্পসংখ্যক দেশে গণতন্ত্রচর্চার ঐতিহ্য রয়েছে ভারত তার মধ্যে একটি। কিন্তু ভারতে গণতন্ত্রের যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ তার স্বরূপ প্রকৃতি কেমন? মূলত এই জিজ্ঞাসা থেকেই আবদুর রউফ 'গণতন্ত্রের অপব্যবহার' অধ্যায়টি লিখেছেন বলে ধারণা করি। কেননা তিনি জানেন গণতন্ত্র একটি উন্নত মানবতাবাদী মূল্যবোধের দ্যোতক। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে তাতে সকলের রয়েছে সমান অধিকার। এ কেবল জনগণের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা নয়, মানবতার চর্চা ও প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাও। এ ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত কোনও দেশেই হয়ত দেখা যাবে না, কিন্তু ভারতে এটি হয়ে দাঁড়িয়েছে কেবল ভোটব্যবস্থা। আর ভোটব্যবস্থাই যদি গণতন্ত্রের একমাত্র অথবা মূল রূপ হয় তা হলে সে ক্ষেত্রে রাজনীতিতে, সুতরাং রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও দুর্বৃত্তায়ন ঘটতে বাধ্য। ভারতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এর যা ফল-পরিণাম—বিভেদ-বিভাজনের বৃদ্ধি—ভারতের প্রায় সর্বত্র তা অতীতে যেমন ঘটেছে বর্তমানেও তেমনই ঘটছে। বর্তমানে এর মাত্রা বরং আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তা বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম মৌল কারণ 'হিন্দুত্ববাদী'দের কেন্দ্রীয় ও আরও কিছু রাজ্যের ক্ষমতায় সমাসীন হওয়া। প্রথম চারটি অধ্যায়ে লেখক প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও সেকিউলার মনোভাবের—যা ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম স্তম্ভ—অভাবে দেশে গণতন্ত্রের অপব্যবহার কোথায় কোথায় কীভাবে ঘটছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখিয়েছেন।

পশ্চিম বাংলাসহ ভারতে গণতন্ত্রের যে অপব্যবহার ঘটছে লেখক তা দু'দিক থেকে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। এক দিকে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষভাবে বিষয়টি তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন। বইয়ের প্রথম দুটি অধ্যায়ে গণতন্ত্রের অপব্যবহারকে এ ভাবে দেখা হয়েছে। অন্য দিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকেও বিষয়টি তিনি নিরীক্ষণ করেছেন। কেননা সংঘ পরিবারের হাতে ক্ষমতা আসার পর খ্রিস্টান ও মুসলমান, বিশেষ করে বাংলাভাষী মুসলমান—এই দুটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নতুন রূপে সংকটাপন্ন হয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর খ্রিস্টান সম্প্রদায় যে ভাবে অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়েছে অতীতে কখনও তেমন ঘটেছে কি না জানি না, যদিও মুসলমানরা বহুবার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের শিকার হয়েছে। খ্রিস্টানদের অপরাধ কী? মিশনারিরা ভারতের বহু জায়গায় দলিত ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুদিন থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে সেবামূলক কর্মতৎপরতা চালিয়ে আসছেন। তাতে অবহেলিতদের চোখ ফুটছে ও তাদের কেউ

কেউ খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করছে। ভারতে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বাপ্নিকরা এটি সহ্য করতে পারছে না। ফলে নানা ছুতোয় তাদের উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। সে আক্রমণ কখনও কখনও এমন অমানুষিকতায় পৌঁছেছে যে ওড়িশায় কুষ্ঠরোগীদের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ গ্রাহাম স্টেইনস ও তার দুই নাবালক পুত্রকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। লেখকের সঙ্গত প্রশ্ন 'হিন্দুত্বের' ধ্বজাধারীরা কেন মিশনারিদের মতো চিরকালের অসহায়-বিপন্ন দলিত ও উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকদের সেবায় এগিয়ে আসে না? হিন্দুত্ববাদীদের পক্ষ থেকে এর কোনও উত্তর কিন্তু নেই।

বিজেপি-শিবসেনা জোট সরকারের অপর টার্গেট মুসলমানরা। লেখক বলেছেন বাংলাদেশ, এমনকী পাকিস্তান থেকেও অনেক দরিদ্র মানুষ পেটের দায়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। দিল্লি-মুম্বাইয়ের মতো অর্থনৈতিক দিক থেকে বর্ধিষ্ণু শহরগুলোতে এই অনুপ্রবেশ ঘটেছে বেশি পরিমাণে। এটি অস্বাভাবিক নয়। জীবিকার প্রয়োজনে এক রাষ্ট্র থেকে আর এক রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ দীর্ঘকাল ঘটে আসছে। কিন্তু তাই বলে রাষ্ট্র এই অনুপ্রবেশ সমর্থন করবে তা হতে পারে না। রাষ্ট্রের নাগরিকদের স্বার্থহানিকর হলেই অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের কর্মসূচি রাষ্ট্র নিতেই পারে। লেখক মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও কোনও অযৌক্তিক ভাবাবেগের প্রশ্রয় এখানে দেননি। কিন্তু তাঁর আপত্তি এই বিতাড়ন কর্মসূচির সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যুক্ত হওয়ায়। এই বিদ্বেষ কীভাবে যুক্ত হয়েছে এবং পরিণামে কী ঘটছে তা সবিস্তারে দেখানো হয়েছে 'বাংলাভাষী মুসলমানের দুর্দশা' শীর্ষক অধ্যায়ে। এ সব যে একটি সুচিন্তিত ও পরিকল্পনামাফিক ঘটছে এ বছরের গুজরাটকাণ্ড তার এক বড় প্রমাণ।

পশ্চিম বাংলায় সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামি ধর্মশিক্ষার যে-ব্যবস্থা চালু আছে সেই মাদ্রাসা শিক্ষার কিছু সংকট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে 'মাদ্রাসা শিক্ষায় সংকট' শীর্ষক অধ্যায়ে। মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে-বিপক্ষে বিগত একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে মুসলিম লেখক-বুদ্ধিজীবীরা যে-তর্ক-বিতর্ক করেছেন এবং এখনও করছেন তা যদি দুই মলাটের মধ্যে আনা হয় তা হলে এক বিশাল আয়তন গ্রন্থ হয়ে যাবে। এই বিতর্কের শেষ কবে হবে কিংবা আদৌ হবে কি না জানি না। কেননা এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ধর্মীয় স্পর্শকাতরতা। এই লেখাটিতেও তার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে। লেখক মাদ্রাসা শিক্ষায় যে-সব সংকটের কথা বলেছেন সেগুলো যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে সমাধানের পদক্ষেপ না নেওয়ায় বামফ্রন্টের হিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষামন্ত্রীকে দোষারোপ করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও উল্লেখ করেছেন যে শিক্ষামন্ত্রীর মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব প্রবল হয়েছে কিছু 'তথাকথিত প্রগতিশীল মুসলিম বুদ্ধিজীবীর' অনুরূপ মনোভাবের কারণে। এই মনোভাব কিন্তু আজকের নয় এবং তা দু'একজনেরও নয়। লেখক বলেছেন মুসলমানরা মাদ্রাসাগুলোকে তাদের আইডেন্টিটির প্রতীক হিসাবে গণ্য করে থাকে। তিনি নিজেও হয়ত তা-ই করেন। অথচ আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে মুসলিম সমাজের আর একজন সাংবাদিক-লেখক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪) 'শিক্ষার কথা' নামের একটি প্রবন্ধে (বুলবুল, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৪১) মন্তব্য করেছিলেন যে মাদ্রাসা শিক্ষায় মুসলমানের 'আত্মঘাতী অভিমানের খাদ্য' সঞ্চিত রয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় তিনি এবং আরও অনেকে দেখেছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষায় মুসলমানের প্রকৃত কোনও উন্নতি হচ্ছে না। তাঁর মতে দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য যেটুকু ধর্মজ্ঞান দরকার তা একখানি বাংলা বই থেকেই পাওয়া যেতে পারে। তার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজন নেই। তবে ইসলাম ধর্মে যারা শাস্ত্রবিদ হতে চায় সারা বাংলায় তাদের জন্য গোটা চারেক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেই চলে। এখানে যারা শিক্ষালাভ করতে চাইবে তাদের জন্য সাধারণ শিক্ষার উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক স্তরে বিকল্প বিশেষ পত্র পড়ার ব্যবস্থা থাকবে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় শিক্ষার জন্যও তিনি অনুরূপ পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে বা পশ্চিম বাংলায় সেই পরামর্শ কেউ মানেননি। মানলে মঙ্গলই হত।

আলোচ্য অধ্যায়ে লেখকের সকল বক্তব্য ভাবাবেগমুক্ত নয়। মাদ্রাসা শিক্ষা মানেই যে প্রগতিবিরোধী শিক্ষা নয় তার প্রমাণ দিতে গিয়ে তিনি বাংলাদেশের প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা মুহম্মদ তোয়াহা-র আত্মকথার বরাত দিয়েছেন। তোয়াহা সাহেব লিখেছেন "বস্তুত, শৈশবে আরবি-ফারসি শিক্ষাই আমার পরিণত বয়সে সঠিক পথের সন্ধান লাভে সহায়ক হয়েছে।" সঠিক পথ মানে সমাজতন্ত্রের পথ। তোয়াহা সাহেবের শৈশবের আরবি-ফারসি শিক্ষার ধরন কী ছিল জানি না, কিন্তু তাঁর উপলব্ধি অন্যের জন্যও সত্য হলে মাদ্রাসা শিক্ষিত অনেকেই তো সমাজতন্ত্রী হয়ে যেতেন। কিন্তু বাস্তবে তা তো হতে দেখা যায় না। বরং মুসলিম সমাজে মুক্তবুদ্ধিচর্চার বিরোধিতা যারা করেন তাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এই মাদ্রাসা-পড়া মানুষ। এ সত্য লেখকের অজানা থাকার কথা নয়। মুসলমান সমাজে মুক্ত মনের সংকটের কথা তিনি নিজেই তো লিখেছেন তাঁর 'মুক্ত মনের সংকট' বইয়ে।

তবু বলব কলকাতা মাদ্রাসার মতো সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাতে অনাদরে-অবহেলায় নষ্ট হয়ে না যায় সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের যথাযথ যত্নবান হওয়া বাঞ্ছনীয়। সরকার ও মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা যদি মনে করেন প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা শিক্ষার্থীকে জীবনোন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়ার কোনও সুযোগ না দিয়ে বরং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে তা হলে সেই প্রতিবন্ধকতা দূর করে জীবনের জন্য কল্যাণকর পাঠক্রম ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা তাঁদের কর্তব্য।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৯৮ থেকে ২০০০ সাল এই তিন বছরের মধ্যে এ বইয়ের রচনাগুলো লেখা। তারপর সময় অনেক এগিয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই কিছু পরিস্থিতির পরিবর্তনও ঘটেছে। তবু লেখক যে-দাবি করেছেন, কিছু কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও সামগ্রিক পরিস্থিতিতে বিশেষ কোনও হেরফের ঘটেনি, সে-দাবি অস্বীকার করার উপায় নেই। গুজরাটকাণ্ড লেখকের এই দাবির সত্যতা পাঠককে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে। তাই বলব ভারতে গণতান্ত্রিক রাজনীতির অপব্যবহারের অবসান যতদিন না ঘটবে ততদিন আবদুর রউফের 'গণতন্ত্র ও সংখ্যালঘু সমস্যা' বইটির গুরুত্ব মানবতাবাদী পাঠকসমাজে সমাদর পাবে।

গণতন্ত্র ও সংখ্যালঘু সমস্যা — আবদুর রউফ/ নয়া উদ্যোগ, কলকাতা-৬/ ৬০.০০।

নির্মাণের স্বাতন্ত্র্যে মায়া পৃথিবীর স্বর

গৌরী সেন

শুভ্রত চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'মায়াপৃথিবীর স্বর' মৃণাল বসুচৌধুরীর কবিতা নিয়ে আলোচনার সংকলন। এই বইটিতে বিভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মৃণালের কবিতার বর্ণময় আঙ্গিক, ভাষা, ভাবচেতনার শরীরী ও অশরীরী সমগ্রতা পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। কবি মৃণাল বসুচৌধুরীর কবিতায় বাস্তব পরাবাস্তব শৈল্পিক-ভুবন-নির্মাণের চাবিকাঠির সন্ধান দিতে চেয়েছেন তাঁরা।

ষাটের দশকের কবি মৃণাল বসুচৌধুরী 'শ্রুতি' পত্রিকার কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে ছিলেন এবং কবিতা লেখার জন্য এঁরা কয়েকটি শর্ত সামনে তুলে ধরেছিলেন। এই গ্রন্থের প্রত্যেক প্রাবন্ধিক আলোচনার সূচনাতেই এই সংবাদটি দিয়েছেন। 'শ্রুতি' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় কবি পুস্কর দাশগুপ্ত জানিয়েছিলেন— "জৈব আর্তনাদ, কিংবা সমাজচিন্তার স্থান যেখানেই হোক কবিতায় নয়।"

সুমিতা চক্রবর্তী পঞ্চাশের কবি-মানসের বিশেষ তফাত দেখতে পাননি ষাটের দশকের কবিকুলের সঙ্গে। পঞ্চাশের দশকের কবিরা স্বীয় উপলব্ধি জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্মুক্তভাবে বিস্তৃত হবার অবকাশ দিয়েছেন; আর ষাটের 'শ্রুতি-পত্রিকা' কেন্দ্রিক কবিরা প্রধানত "অন্তর্লীন মগ্নচেতনার মধ্যেই খুঁজেছেন কবিতাকে। প্রকাশরীতির ক্ষেত্রেও পঞ্চাশের কবিরা ছিলেন খোলামেলা। 'শ্রুতি' কবিগোষ্ঠীর কবিরা কবিতা উচ্চারণের সূক্ষ্মতায় পরিশীলিত করে প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। সত্তার শুদ্ধতার যে প্রতিবিম্ব পড়ে চেতনার দর্শনে, তাকেই ভাষায় প্রকাশ করতে ইচ্ছুক ও সচেষ্ট ছিলেন তাঁরা। এই কবিরা অত্যন্ত সচেতন সংহতির পরিসীমায় গাঢ়তর উপলব্ধিকে প্রকাশ করতে চান বলেই পৃষ্ঠার সাদা অংশকে ব্যবহার করতে চান।.... শব্দ সজ্জার সাহায্যে এমন দৃশময় কবিতাও তারা রচনা করতে চান যা তাদের অনুভূতিকে প্রকাশ করবে।" এর চেয়ে ভাল বোধহয় কেউ চিনিয়ে দিতে পারবেন না শ্রুতি কবিতা গোষ্ঠীর কবিতার স্টাইল ও কবিতা ভুবনকে।

১৯৬৫ সালে প্রকাশিত কবিতার বই 'মগ্ন বেলাভূমি' মৃণালের 'শ্রুতি' পত্রিকার কোনও সুনির্দিষ্ট আদর্শ গড়ে ওঠার আগেই লেখা মনে করছেন সুমিতা চক্রবর্তী। পরবর্তী দুটি কবিতার বই 'শহর কলকাতা' (১৯৭০) ও 'যেখানে প্রবাদ' (১৯৭২)। এই বই দুটির কবিতা খুবই যত্ন ও সচেতনার সঙ্গে লিখেছেন কবি; সামনে ছিল 'শ্রুতি' কবিতা পত্রিকার শর্ত ও ছক। তৃতীয় বই 'যেখানে প্রবাদ' (১৯৭২)-এর "কবিতাতে চলে এসেছে উদ্ভট ধরনের চিত্রকল্প.... যেমন 'কাঁটাতারে দীর্ঘায়ু বেড়াল', 'শকুনের ডানায় জ্বলে ক্রোধ', 'নগ্ন যাজিকার দেহে উন্মুক্ত চাবুক'," — এই সব চিত্রকল্পকে অনেকেই পরাবাস্তব মনোতলের স্বয়ংক্রিয় উদ্ভাস বললেও, সুমিতা চক্রবর্তী কিন্তু কবির চারপাশের পৃথিবীর ও মানবসমাজের বিভ্রান্তি ও বিবর্তনের ছায়াছবিই দেখতে পেয়েছেন। 'গুহাচিত্র' (১৯৭৬), 'এই নাও মেঘ', (১৯৮১), 'শুধু প্রেম' (১৯৮২), কবিতা সংকলনগুলিতে কোনও নতুন শিল্পভাবনার সন্ধান পাননি সুমিতা তবুও "কবিতাগুলি সুগঠিত এবং নিপুণভাবেই ব্যক্ত করে কবির উপলব্ধি-জাত বাচ্য বিষয়কে।" দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে ২০০০ সালে পাওয়া গেল 'এবার ফেরো সন্ন্যাসে', আর ২০০১-এ 'শব্দ নির্মাণ'— এই দুটি কবিতার বই-এর কবিতায় বাচনিক সরলতা এল ও কবিতার শরীর গঠনের সচেতনতা সরে গেল বলে মনে হয়েছে প্রবন্ধ লেখিকার। গোড়ার কবিতাগুলির বিপরীত কণ্ঠস্বর শোনা গেল সহজ সরল প্রকাশে, মনের খুশির ঝলকে বাস্তব জীবন ও সময়ের ছবি যেন "ক্যামেরা বন্দী"— এখানেই মৃণালের "স্মরণীয় কবিতার জন্ম" হয় ও জীবনকে চিনে নেবার এক পাঠ খুঁজে পান সুমিতা চক্রবর্তী।

১৯৬৪ সালের এক ঐতিহাসিক ঘটনার আঁচের মধ্যে 'মগ্নবেলাভূমি'র কবিতা রচিত হলেও এই সময়ে 'শেকড় ছেঁড়ার ভয়ংকর টান'। তাই অর্দ্ধেন্দু চক্রবর্তী যখন 'মৃণাল বসু চৌধুরীর কবিতা ও সত্তা' প্রবন্ধে বলেন, "এই গ্রন্থের কিছু কবিতা তাই

সময়ের সাক্ষী, সময় সেখানে নির্ভুল কাজ করেছে .... তবে আড়ালে, অস্থিতে মজ্জার মত" তখন মৃণাল যেন 'শ্রুতি' কবিতা পত্রিকার প্রতিশ্রুতির বাইরে। আরও বেশ কয়েকটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে অর্ধেন্দু চক্রবর্তী পাঠককে বোঝাতে চেয়েছেন যে মৃণাল বসুচৌধুরী সময়ের রাজনীতি একদম খোলামেলা তুলে নিয়েছেন তাঁর কবিতা গ্রন্থের কবিতায়—তবে এই সময়ের কবিতায় "পাঠকের মুখোমুখি যতটা তার চাইতে বেশী তার নিজের হৃদয় ভ্রমণ"; শ্রুতি-কবিতাগোষ্ঠীর কবিদের সঙ্গে তাই পৃথক এই "আশ্চর্যময়তা"। 'যেখানে প্রবাস' (১৯৭২) এর কবিতা সম্বন্ধেও প্রবন্ধ লেখকের একই অভিমত। 'গুহাচিত্র' (১৯৭৬), 'এই নাও মেঘ' (১৯৮১), 'শুধু প্রেম' (১৯৮২), 'ধারাবাহিক অবহেলা' (১৯৮৭) — বইগুলির কবিতায় আলোচক লক্ষ করেছেন, "রহস্যময়তার মোড়কে সংযমী শব্দের প্রয়োগে সংকেতময়তা ও সংযম।"

উত্তম দাশ 'মৃণাল বসুচৌধুরীর কবিতা' নিবন্ধটিতে 'শ্রুতি' পত্রিকার প্রতিশ্রুতিগুলি স্মরণ করে বলেছেন, কবিতার শরীর নির্মাণে শব্দসজ্জার প্রতি মৃণাল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কবিতার আঙ্গিকগত রূপান্তরে ভাবের বস্তুগত দৃশ্যময়তা থেকে অনুভূতির অগম্য স্তরে মৃণালের যাতায়াত; মৃণালের সব কটি কবিতার বই-এ এই অনায়াস ভ্রমণ লক্ষ করেছেন তিনি। প্রবন্ধ লেখক বলেন, "আঙ্গিকগত নানা রূপান্তরে বিশ্বাসী হয়েও মৃণালের কবিতা আবেগ ও বিষয় নির্ভর। প্রেমজাত যন্ত্রণা, সংকট এবং আত্মার প্রদাহ তার নিত্যসঙ্গী।" কিন্তু এই কবির কণ্ঠেই সামাজিক দায়বদ্ধতারও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে কোনও কোনও কবিতায়।—

ব্যাকুল শুভেচ্ছা নিয়ে
উদ্বেগ প্রবণ মানুষের জন্য আজ
লিখে রেখো
শেষতম কবিতা আমার।

মঞ্জুষ দাশগুপ্তর নিবন্ধ "নির্জন বাস্তব থেকে পরাবাস্তবের দিকে" এই শিরোনামই বুঝিয়ে দেয় যে তিনি মৃণাল বসুচৌধুরীর কবিতার বাস্তব থেকে পরাবাস্তবে যাত্রার ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন। "তাঁর শুদ্ধতার অনুভব তাঁকে নির্জন বাস্তব থেকে পরাবাস্তবের দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেছে।" কবিতায় বার বার 'অশরীরী' শব্দটির আসা যাওয়া, কবিতার 'মায়াপুর ভ্রমণ', এই ভাবেই শব্দের ব্যবহারে পরাবাস্তবতার অনিবার্য প্রকাশশৈলী দেখতে পান প্রবন্ধ লেখক।

সুজিত সরকার মৃণাল বসুচৌধুরীর কবিতায় কবির আত্মমগ্নতা ও অন্তর্মুখিতা এবং 'অপরূপ ভাষা চিনে' কবিতার শরীর গঠনশৈলী লক্ষ করেছেন "মৃণাল বসুচৌধুরী যে বিশেষ ধরনের আঙ্গিক নির্মাণ করেছেন; সেই আঙ্গিকের সাহায্যে কবিতায় ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদাভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কবিতা হয়ে ওঠে অনেক বেশি তীক্ষ্ম ও ব্যঞ্জনাময়।"

শুভব্রত চক্রবর্তী 'ভূমি ডানা স্পষ্ট হয় শব্দের দর্পণে' নিবন্ধটিতে আন্তরিকতার সঙ্গে মৃণালের কবিতা ও কবিসত্তার শিল্পীত নির্মাণের স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরেছেন পাঠকের কাছে। প্রথম তিনটি কবিতার বইয়ের কবিতায় একজন সচল গতিময় প্রকৃত কবির সন্ধান পেলেন শুভব্রত চক্রবর্তী। মেধা ও আঙ্গিকের সাহায্যে আবেগকে সঠিক নিয়ন্ত্রণ করে ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করলেন মৃণাল "আর সেই ব্যঞ্জনার খাতিরেই কবিতায় শব্দের প্রাসঙ্গিকতা ক্রমে বিন্যাস কৌশল রপ্ত করলেন মৃণাল।"

'সৃজন পাঠকের চোখে সাহিত্য ও মৃণাল বসুচৌধুরীর কবিতা' প্রবন্ধে দীপঙ্কর বাগচী যখন বলেন, "মৃণাল বসুচৌধুরী প্রথম থেকেই তাঁর কবিতা রচনার পদ্ধতি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছেন", তখন পাঠক বুঝতে পারেন যে প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই মৃণাল কবিতার শরীরী নির্মাণে সচেতন কুশলতা দেখিয়েছেন। "কবিতার ভাষা ও পরাভাষার দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ায় কবিতায় যে ভাববিশ্ব গড়ে ওঠে তা পাঠকের যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করে। একটি চরম বাস্তব আর একটি কাঙ্খিত বাস্তবের মধ্যে, 'উদ্দেশ্যপ্রবণতা ও উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যে' মৃণালের কবিতায় ভ্রমণ।"

পবিত্র মুখোপাধ্যায় মৃণালের সান্নিধ্যের শুরু থেকেই তাঁর কবিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধ 'মায়াপৃথিবীর স্বর' নামটিই মৃণালের কবিতার এমন এক অজানা রহস্যময় পরিবেশ, অন্য এক পৃথিবীর দিকে টানে যাকে প্রাবন্ধিক বলছেন, "আমি এই কবিতার অনির্দেশ সহবাসকে বলেছি মায়াপৃথিবীর স্বর।" বাস্তবকে স্বীকার করেও, পরাবাস্তবের কাছে 'আত্মসমর্পণের ছায়া কেঁপে ওঠে' মৃণালের কবিতার অন্তরের অন্তঃস্থলে। পবিত্র মুখোপাধ্যায় তাঁর নিবন্ধে মৃণালের কবিতা রচনার প্রতিটি ধাপকে অতিক্রম করে আমাদের কাছে পৌঁছে দেন কবির কবিতার দর্শন ও সত্তা। মৃণালের কাব্যগ্রন্থগুলির দীর্ঘ আলোচনায় লেখক বলেছেন কবির আপাত শান্ত কবি-চেতনার মধ্যে সমকালীন সংকট যে ঘূর্ণি তুলেছে, যা কবিকে সুস্থির থাকতে দেয়নি, মাঝে মাঝেই কবিকে অস্থির করে তুলেছে তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রথম দিকের বইগুলির কবিতায়। নিজস্ব প্রেম, প্রকৃতি ও আস্তিক্য-বোধকে টলিয়ে দিয়েছে। সময়ের দাবি, ভুলিয়ে দিয়েছে 'শ্রুতি' পত্রিকার কিছু কিছু প্রতিশ্রুতি। প্রাবন্ধিক মৃণালের প্রায় সব কবিতা-বইয়ের কবিতায়, কবিতার বিষয়, মেজাজ ও দেহ-নির্মাণ একই ধারায় বহমান দেখেছেন। "কবি মৃণাল রোম্যান্টিক স্বভাবের, কবিতার শরীর দীর্ঘায়িত করেন না, চিত্রকল্পের উপর বেশি দৃষ্টি তাঁর, জীবনের প্রতি হ্যাঁ বাচক মূল্যবোধে অবস্থান করেন, প্রকৃতির

প্রতি, ভালোবাসার প্রতি তাঁর আকর্ষণ প্রথম থেকেই," লক্ষ করেছেন আলোচক। কবি বলেন, 'নতমুখে জীবন যাপনে তুমি নেই', 'মঞ্চ থেকে মানুষের মধ্যে নেমে আসা-' ধারাবাহিক অবহেলা' কবিতা বইয়ের কয়েকটি পঙক্তির মধ্যে মৃণালের কবিতায় বাঁক নেবার জায়গা। ৭০-৭১-৭২ এর ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক উত্তাল দিনগুলোর আঁচ পাওয়া যায়—"কবির দায়বোধ তো এভাবেই পালিত হয় পরোক্ষ ভাবে।" 'এবার ফেরো সন্যাসে' বইয়ে সমকালীন জীবন সচেতনা আগের থেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, শেষ ধাপের কবিতার বইয়ের কবিতাকে আলোচক 'মোহমুক্তির কবিতা' বলছেন।

পরিশিষ্টে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, কৃষ্ণা বসু, শংকর চক্রবর্তী, কল্যাণ সেন—মৃণাল বসুচৌধুরীর একটি বা দু'টি কবিতার বই নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় মৃণালের কবিতার কোনও সামগ্রিক পরিচয় নেই।

সম্পাদক শুভব্রত চক্রবর্তী পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের শিরোনাম 'মায়া পৃথিবীর স্বর' বেছে নিয়েছেন। শিলং প্রবাস কালে মৃণাল আমাদের খুবই কাছের মানুষ ছিলেন। তাঁর মৃদু উচ্চারণে কথা, নম্র সপ্রতিভ ব্যবহার যেন তাঁরই কবিতার মতো। বাস্তব পৃথিবীতে বসে মৃণাল বসুচৌধুরী পরাবাস্তবের স্বর শোনেন, মায়াপৃথিবীর স্বর শোনেন।

মায়া পৃথিবীর স্বর,-সঃ শুভব্রত চক্রবর্তী/ইস্ক্রা, কলকাতা-৫৮/৫০.০০।

শুধু বাইরে গড়ার শব্দ নয়

হেদায়েতুল্লাহ

বইটা পড়তে পড়তে তপোবিজয় ঘোষের 'কালচেতনার গল্প'গুলোর কথা মনে পড়ে যায়। শ্রদ্ধেয় তপোবিজয়বাবু শুধু গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু তার ভেতরে ভাঙনের শব্দ শুনতে পাননি। কিন্তু গৌতমবাবু ভাঙনের শব্দ শুনতে পেয়েছেন। এখানে তাঁর কৃতিত্ব অস্বীকার করা যাবে না। বাইরে গড়ার আয়োজন থাকলেও, ভেতরে ভেতরে তাতে ভাঙনের শব্দ শোনা যায়। গৌতমবাবু মার্কসবাদে আর্দশবাদী হলেও, সব কিছুকেই এক রঙে দেখেননি। যুগের পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবনবোধ, মূল্যবোধ, আদর্শবাদিতার ভরকেন্দ্রের পরিবর্তন ঘটেছে। আবার অনেক আচার, কুসংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতি মানুষের মধ্যে অচল পাথরের মতো বসে আছে। মার্কসবাদ, আধুনিকবাদ— কোনও বাদ তাকে খারিজ করতে পারেনি।

আলোচ্য গল্পগ্রন্থটিতে তাঁর পনেরোটি গল্প আছে। বেশির ভাগ গল্প আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে নববুই দশকের শেষ পর্যন্ত।

প্রথম গল্প 'জীবন বৃত্তান্ত' -এ জীবনলাল বাঁচার আগ্রহটুকু হারিয়ে ফেলে। একটা ছোট্ট মেয়ে চাঁপা তার বাঁচার ইচ্ছেটুকু চাগিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে একটা কৌতূহলও। চাঁপা তার হারিয়ে যাওয়া বোনের মেয়ে নয় তো? 'তপোমৃত্যু' গল্পে স্বামী ও স্ত্রীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্বে স্বামীর আত্মহত্যা। আসলে দ্বন্দ্বে একজনকে তো হারতেই হবে। বিরানববুই সালের দাঙ্গা নিয়ে গল্প 'প্রজন্ম।' নিজের কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত পরবর্তী প্রজন্ম ভয়ানক সংকীর্ণ ও সুপ্ত সাম্প্রদায়িক — এ কথাটাই তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। 'নোনে মিত্তিরের আশির দশক' আমাদের চোখ ফুটিয়ে দেয়। কমিউনিস্ট হলেই যে কেউ সব কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের উর্ধ্বে উঠে যাবে তা কিন্তু নয়। বরং প্রতিক্রিয়াশীল হলেও নোনে মিত্তির সংস্কারকে ত্যাগ করতে পেরেছিল। 'ঘরের কোণ ও অমলতাস' গল্পে বর্তমান শিশু ও কিশোরদের কথা বলা হয়েছে। তারা এখন প্রকৃতির খোলামেলা পরিবেশে খেলাধুলো করতে পারছে না। ঘরের কোণে কৃত্রিমভাবে তাদের বিনোদনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 'ইন্টারভিউ' গল্পে তিনি সেই সব লোকদের কথা বলেছেন যাঁরা প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও প্রচারের আলো পাননি। আঁধারেই তাঁরা রয়ে গেছেন। 'কল্পনার কুড়িরা' গল্পে তিনি শিল্পীসত্তা ও রাজনীতিবোধ—এই দুই দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন।

'টার্নিং পয়েন্ট' গল্পে আছে এক তরুণী সাংবাদিকের কথা যে সততার সঙ্গে সাংবাদিকতার জগতে নাম কিনতে চায়। কিন্তু সংবাদপত্রে হলুদ খবরের ছড়াছড়ি। তাই সত্য খবরের সেখানে এক কানাকড়ি মূল্য নেই।

'কবি' গল্পে লেখক খরার প্রসঙ্গ এনেছেন। শহরে বসে আমরা যতই ঢাক পেটাই, এখনও আমরা জলের সমস্যা মেটাতে পারিনি।

'রুদ্র মরে নি', গল্পটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প। কবি রুদ্রের ভেতরে আত্মগর্বী বিধবংসী কবিতা। অশান্ত রুদ্র রাজনীতিতে জড়িয়ে গেল। আবার রাজনীতি ছেড়ে মধুশ্রীকে বিয়ে করে গৃহী হয়ে গেল।

কিন্তু না। রুদ্রের ভেতরে যে কবিতার আগুন তা কিন্তু মরে গেল না। 'চিলে কোঠা' গল্পে লেখকের অবচেতন মনের রাজপ্রাসাদ যেন চিলেকোঠা। সেখান থেকে তিনি অনেক রঙিন কল্পনার জগৎ তৈরি করতে পারবেন। মনিরাম মেথরের পূর্ণাবয়ব মূর্তি বসাতে গিয়ে শিশিরবাবু টের পেলেন সত্যিকারের আবর্জনা দূর করতে গেলে চেয়ারম্যানের পদে বসে থাকলে হবে না।

'ভাঙনের শব্দ' গল্পে লেখক কাঞ্চন ও বকুলের প্রেমের মধ্যে দিয়ে আমাদের ভেঙে যাওয়া মূল্যবোধ, আত্মমর্যাদা প্রভৃতি আঙুল তুলে দেখিয়েছেন। গৌতমবাবু পার্টি দরদী হয়েও আত্মসমালোচনা করতে ছাড়েননি। ঝরঝরে ও সাবলীল ভাষায় তাঁর গল্পগুলো লিখেছেন। বইটার প্রচ্ছদও বেশ সুন্দর হয়েছে।

ভাঙনের শব্দ — গৌতম দে/পত্রলেখা, কলকাতা-৯/৪০.০০।

কলকাতার ছবি

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি একটি অভিনব গ্রন্থ হাতে এসেছে। গ্রন্থটির নাম — 'Index to Pictures on Calcutta.' সঙ্কলন করেছেন National Library Employees' Association. কলকাতা ও তার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যত ছবি জাতীয় গ্রন্থাগারের (কলকাতা) গ্রন্থগুলিতে পাওয়া গেছে তার সূচি প্রকাশ করেছেন কোনও বাণিজ্যিক প্রকাশক বা শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান নয়, জাতীয় গ্রন্থাগারেরই (কলকাতা) কর্মী সমিতি। দীর্ঘ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থটি কলকাতা সম্পর্কে নানা তথ্যের সন্ধানী গবেষকদের অনেক দিনের অভাব পূরণ করবে। কলকাতা নিয়ে নানা বইয়ের তালিকা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে, আরও প্রকাশের কাজ চলছে কিন্তু কলকাতা ও তার বিখ্যাত মনীষীদের ছবি নিয়ে প্রকাশিত এটিই প্রথম তালিকা-সূচি। এর আগে এই ধরনের বিস্তারিত কোনও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা নেই। আংশিকভাবে প্রকাশিত হলেও তা সাধারণের জন্য প্রচারিত হয়নি। সম্প্রতি প্রকাশিত (জুলাই-২০০১) Index to Pictures on Calcutta যেমন বিশদ তেমনই তথ্যমূলক।

১৬৯০ সালে জব চার্নকের প্রাচীন কলকাতা আর বর্তমানের কলকাতার চিত্র এক নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে পারিপার্শ্বিকতারও। এক সময়ের বিভিন্ন সৌধ যা এক কালে দৃষ্টি-নন্দন ইমারত ছিল তারই ধবংসাবশেষের উপর গড়ে উঠেছে নতুন নতুন বহুতল গগনচুম্বী অট্টালিকা। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর অফিস কাছারির প্রাবল্যে এক কালের নানা ধরনের 'বাংলো' বাড়ির পরিবর্তন হয়েছে অনেক দিন আগে থেকেই। সুউচ্চ ছাদ আর নানা কারুকার্যের পরিবর্তে এখন স্থান সঙ্কুলানই প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কারণেই আজকাল কলকাতার গলিতে গলিতে গগনচুম্বী ইমারতের ছড়াছড়ি। স্থাপত্য সৌন্দর্যের চেয়ে এখন স্বল্প পরিসরে অধিক স্থান সঙ্কুলানের সমস্যা সমাধানে স্থাপত্যবিদেরা ব্যস্ত।

প্রাচীন কলকাতার ইতিহাস খুঁজলে জানা যায় যে ১৬৯০ সালের ২৪ শে আগস্ট ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জব চার্নক প্রথমে সুতানুটি গ্রামে বসবাস করতে থাকেন। তারপর ১৬৯৮ সালের ১০ই নভেম্বর বাংলা নবাবের এক 'ফরমান'-এর ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে গোবিন্দপুর, সুতানুটি ও কলকাতা গ্রাম তিনটি ক্রয় করে শহরের পত্তন ঘটায়। ১৬৯৯ তে কোম্পানি গোবিন্দপুর, সুতানুটি ও কলকাতা এই তিনটি গ্রাম নিয়ে গঠন করে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি'— যার মধ্যে কলকাতাই প্রাধান্য পায়। বর্তমানের প্রধান ডাকঘরের কাছে একটি দুর্গ তৈরি করে কোম্পানির লোকজন ও সেনারা থাকতে আরম্ভ করে, তাদের তখনকার ঠিকানা ছিল, Bengal Presidency. Fortwilliam, Calcutta. প্রকৃতপক্ষে ১৬৯৮ সালের ১০ই নভেম্বর লর্ড ওয়েলেস্‌লি ফোর্ট উইলিয়ামে প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

প্রাচীন কলকাতার ইতিহাসের খণ্ডচিত্র পাওয়া গেল কিন্তু কেউ যদি তা ছবিতে দেখতে চান? কোথায় খুঁজবেন? এই কোথায় খোঁজার হদিশই দিয়েছে Index to Pictures on Calcutta. অবশ্য পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আছে এমন কথা বলা যাবে না কারণ বইটিতে কেবল জাতীয় গ্রন্থাগারে যে সমস্ত বই রয়েছে সেগুলিরই কলকাতা সংক্রান্ত ছবির সূচিকরণ করা হয়েছে। আর কলকাতা নিয়ে যত বই প্রকাশিত হয়েছে সবগুলি কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে এমন দাবি করা যাবে না। কারণ অনেক প্রকাশকই তাঁদের প্রকাশিত বই জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা দেন না, যদিও Delivery of Books Act অনুযায়ী ভারতের তিনটি গ্রন্থাগারে প্রত্যেক প্রকাশকের প্রকাশিত একখানি বই দেওয়া বাধ্যতামূলক। বর্তমান সুবৃহৎ গ্রন্থটির ৯১২ পৃষ্ঠার সঙ্গে রয়েছে ১৬টি প্রারম্ভিক পৃষ্ঠা।

বইটির কয়েকটি ভাগ এই রকম : ব্যবহারের পদ্ধতি, সংক্ষিপ্ত শব্দের পূর্ণাঙ্গ রূপ, কলকাতার বিভিন্ন ছবির তালিকা, কলকাতা সম্পর্কিত ছবির তালিকা, কলকাতার বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছবির তালিকা, শিল্পী ও চিত্রসংগ্রাহকের তালিকা, যে সমস্ত বই ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলির ক্রমিক ও বর্ণানুক্রমিক (লেখক-গ্রন্থের শিরোনাম সহ) তালিকা। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্রীসুধীর মৈত্র—প্রচ্ছদে প্রাচীন কলকাতার চিত্র। প্রিন্টিং সেন্টারে ছাপা হয়েছে বইটি। বইটির অন্যতম মূল্যবান দিক হল এর ভূমিকা। লিখেছেন বিখ্যাত কলকাতাবিদ ড. পি. থাঙ্কাপ্পান নায়ার — যিনি পি. টি. নায়ার নামেই অধিক পরিচিত। জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সম্পাদক শ্রীআশিস নিয়োগীর প্রস্তাবনায় শক্ত মলাটে সুন্দর একখানি আকর গ্রন্থ। মূল্য এক হাজার টাকা। বইটি কেবল জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির কাছেই পাওয়া যাবে বলে মনে হয়, কারণ বইটির প্রাপ্তিস্থানের কোনও ঠিকানা উল্লেখ নেই।

গ্রন্থটি সংকলনে সংকলকবৃন্দ কয়েকটি স্থানে নতুনত্বের আস্বাদে একটু স্বাধীনতা নিয়েছেন। বিশেষত বানানের ক্ষেত্রে। অবশ্য এ কথা ঠিক, ইংরেজরা ভারতের ব্যক্তি ও স্থানের নাম নিজস্ব উচ্চারণের ভঙ্গিতে লিখেছেন। আর ইংরেজিতে লেখার সময় এমনকী বাংলা ভাষায় লিখতে গিয়েও আমরা ইংরেজদের লেখা বানানই অনুসরণ করি এবং দীর্ঘকাল প্রচলনের ফলে এই বানানেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। সেই কারণে অন্য ধরনের বানান দেখলে একটু অপরিচিতই লাগে, যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ইংরেজিতে স্বাক্ষর করতেন তখনও লিখেছেন—Rabindranath Tagore, অথচ বইটিতে রয়েছে Rabindranath Thakur (পৃ: ৫৩৫), পণ্ডিত রবিশঙ্করও তাঁর নামের বানান লেখেন Ravishankar, বইটিতে ব্যবহৃত Rabisankar নয়। অনুরূপ বানানের স্বাধীনতা স্থাননামের ক্ষেত্রেও নেওয়া হয়েছে, যেমন, Baliganj, (পৃ: ২৭৭), Taliganj (পৃ: ২৭০), Kasipur (পৃ: ২৭১) এই বানানগুলি আজও যথাক্রমে Ballygunge, Tollygunge এবং Cossipur বানানে লেখা হয়। অথচ মহীশূরের ক্ষেত্রে Mysore-ই (পৃ: ২৭০) রাখা হয়েছে, সেখানে নতুন বানান ব্যবহৃত হয়নি।

অনেকগুলি ছবির উল্লেখ আছে যাতে ঘটনার কোনও তারিখ উল্লেখ নেই, যেমন সংলেখ নং 0079 – Amartya Sen – Reception – Dum Dum Airport, ও 0080 – Amartya Sen – Reception – Indian Chamber of Commerce, কিন্তু কত তারিখে তার উল্লেখ নেই; ঘটনা তো বেশি দিনের নয় তাহলে ছবিতে তারিখ না থাকার কথা নয়। তারিখ নেই অনেকগুলিতেই, যেমন —

0679 : Buddhadeb Bhattacharya – Calcutta Technical School Inauguration Ceremony.

0727 : Calcutta Book Fair

0662 : Brigade Parade Ground – Jyoti Basu – meeting.

0663 : Brigade Parade Ground – NCC Day – Jyoti Basu.

0667 : Brigade Parade Ground – Political gathering

ইত্যাদি অনেকগুলি সংলেখই তারিখবিহীন। তারিখ না দেওয়ার ফলে বিশেষ কোনও তারিখের ছবি দেখার প্রয়োজন পড়লে সংলেখ দেখে বোঝা যাবে না কোন তারিখের ছবির উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, জ্যোতি বসু ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বিভিন্ন সময়েই সভা করেছেন, কোন তারিখের সভার ছবি আছে তা এই সূচিকরণ থেকে বোঝা যাবে না। আবার অন্যত্র ঘটনার তারিখ উল্লেখ থাকলেও স্থানের নাম উল্লেখ নেই, যেমন 0677 সংলেখে Buddha Jayanti Celebration – May, 1956, রয়েছে কিন্তু কোনও স্থানের উল্লেখ নেই। এর ফলেও সংলেখ দেখে বোঝা যায় না বুদ্ধ জয়ন্তী অনুষ্ঠানটি কোথায় হয়েছিল।

বিষয়-বিন্যাসও স্পষ্ট নয়। যেমন 0711 – Buses এর তলায় 0712 – Calcutta Tramways Co Ltd, তার নীচে 0713 – Double Decker Bus. সব চেয়ে অস্পষ্ট 0715 – Trolly Bus এর তলায় Bustee See Slum. বর্ণানুক্রমিক শব্দের বিন্যাস হলেও না হয় কথা ছিল—কিন্তু হঠাৎ Trolly Bus এর নীচে Bustee খুঁজতে যাব কেন?

সাময়িকপত্রের ছবি আলোচ্য গ্রন্থে নেওয়া হয়নি তা গ্রন্থের ভূমিকায় লেখা হয়েছে যদিও ব্যতিক্রমও আছে যেমন গ্রন্থে 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা এবং 'ভ্রমণ' পত্রিকার পূজা সংখ্যার ছবি নেওয়া হয়েছে— কিন্তু কলকাতা সংক্রান্ত ছবির সূচিকরণে কলকাতা পুরসভা প্রকাশিত 'পুরশ্রী' পত্রিকায় প্রকাশিত ছবি সূচিকরণে নেওয়া প্রয়োজন ছিল কারণ তাতে প্রাচীন থেকে বর্তমান বৃহত্তর কলকাতার অসংখ্য ছবি পাওয়া যায়, যেগুলির মূল্য গবেষকদের কাছে অসীম।

পরিশেষে একটা কথা বলতে হয়— কলকাতার চিত্রসমূহের সূচিকরণের গ্রন্থে কিন্তু কোনও চিত্র সন্নিবেশিত হয়নি। চিত্র দিলে গ্রন্থের ব্যয় বাড়ত সন্দেহ নেই, তবে প্রাচীন কলকাতার কয়েকটি ছবি থাকলে ভাল হত।

এতৎ সত্ত্বেও এ কথা বলতেই হবে এমন একটি দুরূহ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ কর্মী সমিতির উদ্যোগে প্রকাশিত হওয়ায় নিঃসন্দেহে কর্মীবৃন্দের সাধুবাদ প্রাপ্য।

Index to Pictures on Calcutta – edit. Ashish Neogy / National Library Employees' Association, Calcutta / 1000.00

প্রসঙ্গ : শ্রীরামকৃষ্ণ — কালের প্রেক্ষিতে শাশ্বত সত্য

অরূপরঞ্জন প্রধান

শ্রীরামকৃষ্ণের ক্রান্তদর্শী জীবনের অসংখ্য সংকলনের মধ্যে বিদগ্ধ ড. এইচ.এন সরকার লিখিত "Sri Ram krishna A New Philosophy" একটি অভিনব ও অনবদ্য সংযোজন। লেখকের জ্ঞানের গভীরতা এবং বিশ্লেষণের মৌলিকত্ব বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য। একদিকে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ হেগেল, মার্কস, ক্রাস্ব, ইয়ুং, রাসেল, টয়েনবি, ম্যাক্সমুলার , রোমা রোঁলা, ইসার উড থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাচ্য মনীষী শঙ্করাচার্য, রামানুজ, রামমোহন, বিবেকানন্দ, গান্ধীজি, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, নেতাজি সুভাষচন্দ্র, রামমোহন, জওহরলাল নেহরু প্রমুখ বিভিন্ন চিন্তাবিদদের উদ্ধৃতি বিশ্লেষণ করে লেখক তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনায় একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করেছেন। সর্বোপরি বেদ বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, ব্রহ্মসূত্রের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক বেত্তাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত যে সব প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে তাতে লেখকের জ্ঞানের ব্যাপ্তি সম্পর্কে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। স্বল্পপরিসরে এমন একটি পুস্তক সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করা নিঃসন্দেহে একটি দুরূহ কাজ।

পুস্তকটির প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা স্বরূপ লেখক পাশ্চাত্য দর্শনের (Metaphysics) ঈশ্বর তত্ত্বের বিভিন্ন বক্তব্যের পাশাপাশি যেভাবে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এবং অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছেন তা সঠিক মানদণ্ডের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছে। বেদান্তকেশরী শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যার পাশাপাশি হিন্দুদর্শনের অন্যান্য শাখা হিসাবে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা, উত্তর মীমাংসা ইত্যাদি আলোচনায় লেখক যে ভাবে রামমোহন দয়ানন্দের পথ ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ অনুধ্যানে পৌঁছেছেন তা গভীরভাবে অনুধাবনযোগ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে অনুষ্ঠিত ছোট্ট ছোট্ট অমিয় ঘটনার ও ভাগবতউক্তির যে ভাবে মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করেছেন তাতে বইটি এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলতে ইচ্ছা করে। সমষ্টি বিপর্যয়ের গলিত শবের পাশে নতুন সৃষ্টির বোধন লগ্ন রচনার ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতাকে তিনি যে ভাবে দক্ষতার সঙ্গে প্রমাণ করেছেন তা এক কথায় বিন্দুতে সিন্ধু পরিবেশন। তবে আলোচ্য পুস্তকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান অধ্যায় হল তৃতীয় অধ্যায় যেখানে ঈশ্বর, জগৎ, অহং, অবতারতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, ধর্মীয় সমন্বয়, নৈতিকতা ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনের মৌলিকতাকে বলিষ্ঠভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে। সবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ — ভাবনার প্রসারে চতুর্থ অধ্যায়ে যে পরিশিষ্ট, গ্রন্থপরিচিত ও নির্ঘন্ট দেওয়া হয়েছে তাও আলোচ্য পুস্তকের অমূল্য সম্পদ এবং ভবিষ্যতের শ্রীরামকৃষ্ণ গবেষকের কাছে একটি মূল্যবান দলিল। কাব্যিক ছন্দে প্রকাশিত দুটি রচনা শ্রীরামকৃষ্ণের রাতুল চরণে আত্মনিবেদনের একটি অন্তরঙ্গ ভাববিচ্ছুরণ এবং ভক্তিপ্রেমের এক দিব্য মণিমঞ্জুষা।

এই প্রসঙ্গে লেখকের দু' একটি সাহসী এবং নির্ভীক মন্তব্যের অবতারণা করা প্রয়োজন। লেখকের মতে শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গি শংকরাচার্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং শুধু শংকর কেন লেখক মনে করেন অতীতের সমস্ত ধর্মাচার্য এবং বেদান্তবেত্তাদের তুলনায় শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান সর্বশীর্ষে। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন শিষ্য গবেষক, বিবেকানন্দ এবং ম্যাক্সমুলরের বক্তব্যকেও অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে খণ্ডন করেছেন। তাঁর মতে— "The Sankar Philosophy is always uppermost in their minds and is deeply ingrained in their brains and therefore they are hardput to it to understand Ramkrishna's Philosophy" (Page 29) এমনকী লেখক তাঁর পুস্তকের ৪১ পৃষ্ঠায় বিবেকানন্দের বিশ্লেষণকেও সমর্থন না করে বলেছেন— 'So I say in all humility that we cannot accept Swami Vivekananda when he says, "it was no new truth that Ramkrishna Param Hansha came to preach, though his advent brought the old truth to light." (Page 41) এ কথা ঠিক যে যুগের প্রয়োজনে সাম্প্রতিকতম অধ্যাত্মবেত্তা হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বাপেক্ষা বেশি বিবর্তিত (evolved) হবেন — এটাই তো স্বাভাবিক — কিন্তু সেই তত্ত্বদর্শন শংকরকে ছাপিয়ে গেছে কি না তা জানিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ থাকতেই পারে। অনেকের মতে শংকর জগৎকে যে অর্থে মায়া বলেছেন তাকে নবযুগের প্রেক্ষিতে ঠিকমতো ব্যাখ্যা করা দরকার। শংকর জগৎকে মিথ্যা বলেননি বরং মায়া তথা পরিমাপিত (Limited বা খণ্ড) বলেছেন। তা ছাড়া অদ্বৈতবাদের প্রচারক হলেও গুরুসান্নিধ্যে তিনি অদ্বৈতবাদের উপর জোর দেননি। সর্বোপরি তিনি অদ্বৈত নির্গুণব্রহ্মের পাশাপাশি মণ্ডন ব্রহ্মশক্তিকেও স্বীকার করেছেন তাঁর নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার নিরিখে। তা ছাড়া আচার্য শংকরের সঙ্গে পুরুষোত্তম শ্রীরামকৃষ্ণের কোনও অবস্থাতেই তুলনা সমীচীন মনে করেননি

বিবেকানন্দ। সে জন্য শংকরের অদ্বৈততত্ত্বের প্রচারক হয়েও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বরিষ্ঠ বলে বন্দনা করেছেন। তা ছাড়া অবতার পরিক্রমায় দেখা যায় যে যুগসমস্যা সমাধানে একেরই অবতরণ হচ্ছে নানা ভাবে—নানা ব্যঞ্জনায়— সেই তাৎপর্য বেদবেদান্তের তুলনায় ছোট কি বড় তার বিচারের চেয়ে তাদের অন্তর্নিহিত একত্বভূমির উপরই জোর দিয়েছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। বর্তমান পুরুষোত্তমে অটুট আনতি নিয়ে এই মহামিলনের সড়ক নির্মাণই ছিল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের স্বপ্ন ও সাধনা। একেরই নানাভাবে উপলব্ধিকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত সেই পরম একেরই যুগোপযোগী বিশ্লেষণ এবং সমন্বয় হয়ে চলেছে। তা ছাড়া যুগবিবর্তনের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণই শেষ অবতরণ নয়। তিনি নিজেই বলেছেন, "পার্ষদদের সব জ্ঞান দিলাম না—আমাকে আবার আসতে হবে।" লেখক নিজেও এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন আলোচ্য পুস্তকের ৪৯ পৃষ্ঠায় — "Those who are in the inner circle of my devotees are not granted ultimate liberation from life, for I shall assume a body again in the North Westen corner." (পৃ: 49)

এটাই তো বিধিসম্মত ধারাবাহিকতা। তা হলে 'সর্বশ্রেষ্ঠ' বলে তাঁকে সীমায়িত করার উপায় কোথায়? — তিনি অনন্ত তাঁর বিবর্তনের ধারাও অনন্ত ও অশেষ। বহুলাংশে প্রশংসিত এবং অভিনন্দিত এমনতর একটি পুস্তকের কাছে উল্লিখিত প্রসঙ্গগুলির অবতারণার প্রত্যাশাই হল আলোচ্য মূল্যায়নের সবিনয় নিবেদন।

Sri Ramkrishna and His New Philosophy – H. N. Sarkar/Sri Ramkrishna Kendra, Jagacha, Howrah – 60.00

মৃণাল সেনের নতুন ভুবন

অধৃষ্য কুমার

আশি ছুঁই ছুঁই মৃণাল সেন নিজের নির্বাসন নিজেই ভেঙে বেরিয়ে পড়েছেন নতুন ভুবনের খোঁজে। 'অন্তরীণ'-এর পর বছর সাতেকের দীর্ঘ নীরবতা। মৃণাল সেন নিজেই ইতিমধ্যে বহুবার জানিয়েছেন কারগিল যুদ্ধের সময় 'স্টার নিউজের' রাজদীপ সারদেশাইয়ের যুদ্ধ সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তরে পাকিস্তানের জনৈক সবজি বিক্রেতার সহজ সরল এক শব্দের উত্তর 'লোকসান' — যুদ্ধ মানে? 'লোকসান'— এক শব্দের এই ভয়ঙ্কর উচ্চারণে কেঁপে উঠেছিল তাঁর বুকের ভেতরটা। শুনতে পেয়েছিলেন সীমানার এপারে আমাদের দেশেও কোটি কোটি সাধারণ মানুষের একটাই উচ্চারণ 'লোকসান।'

প্রতিবাদের দশকের পরিচালক টানা প্রায় দু'-দশক ব্যস্ত ছিলেন 'এনিমি উইথ্ইন' খুঁজতে। ভুবন সোমের সেই অবিস্মরণীয় দোলনায় দোল খেতে খেতে অথবা শেখর চ্যাটার্জির অননুকরণীয় আঃ হুঃ হুঃ ডাক আর সৌরাষ্ট্রের সেই দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের মধ্যে ষাট দশকের শেষ নাগাদ আমাদের চোখের সামনে ঘটল ভারতীয় সিনেমার সাবালকত্ব প্রাপ্তি। 'ভুবন সোম'-এর হাত ধরে প্রচলিত সমস্ত ব্যকরণ ভেঙে চুরমার করে ভারতীয় সিনেমার আধুনিক হওয়ার চোখ ধাঁধানো অবাক কাণ্ডের রেশ কাটতে, না কাটতেই পরপর 'ইন্টারভিউ', 'কলকাতা একাত্তর' আর 'পদাতিক' মৃণাল সেনকে প্রায় সারা পৃথিবীতেই পরিচিত করল প্রতিবাদের দশকের চলচ্চিত্র-নির্মাতা হিসাবে। সত্তর দশকের বোমা-বন্দুক-জেল-বন্দিমুক্তি-শহিদ স্মরণ পেরিয়েই আবার নতুন মৃণাল সেন— সম্ভবত বাইরের শত্রু খুঁজে খুঁজে শ্রান্ত প্রাজ্ঞ মন প্রায় ঘোষণা করেই বলে ফেললেন এবার 'এনিমি উইথইন' খুঁজবে তাঁর শিল্পসৃষ্টি। বাইরের নয় আমাদের ভেতরে, পরিবারের ভেতরে, নিজের ভেতরে শত্রু খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল মৃণাল সেনের অর্ন্তমুখী ক্যামেরা। 'একদিন-প্রতিদিন' দিয়ে শুরু করে একের পর এক তৈরি হল অবিস্মরণীয় সব ছবি—'আকালের সন্ধানে', 'খাণ্ডাহার' 'খারিজ' অথবা 'একদিন অচানক'। দীর্ঘ বছর পনেরো ভেতরের শত্রু খোঁজার চোরাবালিতে পথ হাতড়ে শেষমেশ 'অন্তরীণ'-এ এসে নিজেকেই অন্তরীণ করে রাখলেন দীর্ঘ সময়।

নতুন শতাব্দীতে পাকিস্তানের সবজি বিক্রেতার এক মর্মভেদী উচ্চারণ অবলম্বন করে মৃণাল সেন বেরিয়েছেন এক নতুন ভুবনের খোঁজে। এই খোঁজ, সত্যিকার অর্থেই তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণের চালচিত্রে এনেছে নতুন মাত্রা। সম্ভবত এই প্রথম মুসলিম কৃষক পরিবার এবং তাদের গ্রাম-সমাজ নিয়ে বাংলায় তৈরি হল সম্পূর্ণ একটা ভাল ছবি। মৃণাল সেনের ছবিতে গ্রামের মানুষ এবং গ্রাম বাংলা এর আগেও যে আসেনি তা নয়, তবে কখনওই তা গ্রামের শুধুমাত্র কৃষক পরিবার বা গ্রাম সমাজ কেন্দ্রিক ছবি নয়। 'বাইশে শ্রাবণে'র গ্রাম আমরা দেখেছি যেখানে মূল চরিত্র কৃষিজীবী নয়, ট্রেনে হকারি করেই তার জীবন চলে। গ্রামীণ কৃষকের ভয়ঙ্কর দারিদ্র এবং গ্রাম-সমাজের ক্ষতবিক্ষত ছবি আমরা পেয়েছি 'ওকাউরি' কথা এবং 'মাটির মনিষ' ছবিতেও। বাংলার গ্রাম নয়— অন্ধ্র অথবা ওড়িশার গ্রামীণ বাস্তবতার নিষ্ঠুর ছবি সে দুটি। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজের দৈনন্দিন ছোটখাটো ঘটনার টানাপোড়েন নিয়ে বেশ কয়েকটি দুর্দান্ত ছবি করার পর বছর সাতেকের নীরবতা ভেঙে গ্রাম বাংলায় নতুন সত্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়া শুধু অভিনব নয় রীতিমত দুঃসাহসিক। আশির দোরগোড়ায় এই দুঃসাহস রীতিমত তাজ্জব বানিয়েছে আমাদের। সম্ভবত কিছুটা দুঃসাহসের নেশায় বুঁদ হয়েই মৃণাল সেন বেরিয়ে পড়েছেন গ্রাম বাংলার মানুষের দৈনন্দিন 'বেঁচে থাকার ম্যাজিক' খুঁজতে।

ছবির শুরু সুভাষ নন্দীর এক স্টিল ফোটো দিয়ে। পর্দার মাঝখানে সাদা কালোয় খালি গায়ে ইজের পরা বছর সাত-আটের এক কিশোরীর ছবি কোলে তার বছর দুয়েকের আর একটি বাচ্চা, অনাহার ক্লিষ্ট শরীর, ক্ষুধায় ক্লান্ত মুখ-মণ্ডল, নির্বাক-বিহ্বল চোখ। আবহে পরপর বিস্ফোরণের শব্দ, কাট করে পর্দায় ভেসে ওঠে কালোর ওপর জ্বলজ্বলে সাদা অক্ষর— পৃথিবী ভাঙছে, পুড়ছে, ছিন্নভিন্ন হচ্ছে তবুও মানুষ বেঁচেবর্তে থাকে মমত্বে, ভালবাসায় সহমর্মিতায়।

সাদা-কালোয় কিশোরীর ছবি আর পর্দায় পরিচালকের কয়েক লাইনের ঘোষণায় আমরা জেনে যাই ম্যাজিকের খোঁজে বেরিয়ে পড়া পরিচালকের পা স্থির রয়েছে চারপাশের অস্থির-ভয়ঙ্কর সময়ের মাটিতে। পরের দৃশ্যেই ভয়ানক সময়ের মধ্যেও বহমান জীবনের দিগন্ত বিস্তৃত ছবি। পর্দা জুড়ে গ্রামবাংলার গন্ধ। মাঠ-মাঠ আর মাঠ— আলপথ ধরে এগিয়ে আসছে মোটর

সাইকেলের কর্কশ আওয়াজ। আমাদের চোখের সামনে সাঁ করে বেরিয়ে যায় মোটর-সাইকেল তার আরোহীকে নিয়ে। ক্যামেরা চলে আসে কাছেই মাঠে জল ছাঁচার কাজে ব্যস্ত পিতা-পুত্রের একেবারে সামনে। ছেলের বিস্ময়ের উত্তরে বাবা জানায় মোটর সাইকেল আরোহী তারই খালাতো ভাই নুর, নতুন কিনেছে বাহনটি। অঞ্জন দত্তর নেপথ্য ভাষণে পরিচালক আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন চরিত্রদের সঙ্গে - কাহিনির মধ্যে কখন দর্শক ঢুকে পড়েছেন জানতেও পারি না আমরা। শুরু থেকে শেষ সোজাসুজি গল্প বলার লোক কখনওই নন মৃণাল সেন। কোনও ছবিতেই প্রায় তা করেননি সম্ভবত। একমাত্র খাণ্ডাহার ছাড়া। এই বোধ হয় প্রথম মৃণাল সেনের ছবির শেষে আমাদের মনে গেঁথে যায় এক পরিবারের সম্পর্কের টানা পোড়েনের গল্প। আকাশ ছোঁয়া মাঠের প্রথম দৃশ্যের পর একে একে ছোট ছোট দৃশ্য ও অসাধারণ গার্হস্থ্য অথচ মার্জিত সংলাপে বোনা হতে থাকে দুটি খালাতো ভাইয়ের সংসারের গল্প। মোটর সাইকেল আরোহী নুর ছিল গ্রামের এক দরিদ্র কাঠমিস্ত্রী। বিয়ে হয়েছিল দাদার উদ্যোগে সখিনার সঙ্গে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সেই দাদার প্ররোচনাতেই নুর তালাক দেয় সখিনাকে। নুরেরই খালাতো ভাই মেহের ভালবেসে বিয়ে করে সখিনাকে। নুরকে তার দাদাই আবার বিয়ে দেয় কামেলার সঙ্গে। সখিনা-মেহের এর প্রথম সন্তান জন্মানোর কয়েক বছর পরই নুর চলে যায় আরব দেশে ভাগ্যের সন্ধানে টাকা রোজগারে। বেশ কয়েক বছর বাদে নুর ফিরে এসেছে দেশে। সঙ্গে এনেছে নিজের উপার্জন করা অনেক নগদ টাকা— কিনেছে মোটর সাইকেল। বাড়ি ঘরে ছাপ পড়েছে স্বচ্ছলতার। মেহের দিন মজুরি করে, কখনও ইঁটভাটায় কখনও অন্যের জমিতে। সখিনাকে মেহের বিয়ে করলেও, সখিনার ওপর নুরের সম্ভ্রম মেশানো দুর্বলতা তার অজানা নয়। নুরের বউ সখিনা অনুর্বরা থাকলেও মেহেরের স্ত্রী হয়ে সে ইতিমধ্যেই তিন সন্তানের জননী, বড় মেয়ে সায়রা, ছেলে সাজু, কোলেরটি ছেলে এ সব নিয়ে নুর এবং মেহেরের সম্পর্কে কোনও তিক্ততার গন্ধও আমরা পাই না। সখিনার শেষ সম্বল এক সোনার নথ মাঝেমাঝে সেটা বার করে পড়ার সময় তার চোখ উদাস হয়ে যায়। নথটা নুরের কাছ থেকে পাওয়া। তালাকের সময় স্বামীর দেওয়া সমস্ত গয়না বরকে ফেরত দিতে হয় এটাই নিয়ম। কিন্তু এক অনুচ্চারিত ভালবাসার কারণে নুর পঞ্চায়েতের সম্পত্তি ফেরতের সভায় নথটার কথা উল্লেখ করে না। নুরের স্মৃতি, সোনার নথ রয়ে যায় সখিনারই কাছ থেকে। চারদিকে ধার দেনা আর রহমত চাচার কাছে বাঁধা পড়া জমি উদ্ধার করার জন্য সখিনা একদিন মেহেরকে দেয় সেই সযত্নে রক্ষিত সোনার নথ। বলে, 'বন্ধক রাখবে কিন্তু বেচবে না।' মেহের সম্ভবত না জেনেই সেই নথ নিয়ে হাজির হয় তার নুর ভাইয়ের কাছে। যা আশা করেছিল তার থেকেও বেশি টাকা পায় খালাতো ভাইয়ের কাছ থেকে। নথটা ফেরত দিতে গিয়ে নুর বলে, 'ঠিক আছে এটা থাকুক আপাতত আমার কাছে'। নতুন রঙ করা সাজানো গোছানো বাড়িতে নুর পাড়া প্রতিবেশীদের দাওয়াতে আমন্ত্রণ জানায়। বাড়ি এসে নেমতন্ন করে যায় খালাতো ভাই মেহেরকে - সন্তর্পণে নথটাও ফেরত দিয়ে যায়। সঙ্গে মেহের-সখিনার ছেলে সাজুকে নিজের বাড়ি নিয়ে যায় বলে 'কাল তোরা আসছিস্‌ই—ও আজকেই চলুক আমার সঙ্গে'। ছবি শেষ হয় নুর —এর বাড়ির উঠোনে পড়ন্ত বেলায় আধো আলোয়, সন্তর্পণে নতুন কেনা হাওয়াই চপ্পল ঠিক করতে করতে ঢোকে সখিনা, সঙ্গে ফর্সা পায়জামা পাঞ্জাবি পরা মেহের আর মেয়ে সাজু। হঠাৎ কোলের এক বছরের বাচ্চাটা কেঁদে ওঠে, নিস্তব্ধ উঠোনে। সখিনা সামলাতে পারে না। ওদিকে নুরের বাড়ির ভেতরের উঠোনে তখনও নিমন্ত্রিত অতিথিদের হাসির রেশ ভেসে আসে হঠাৎ হঠাৎ। মা-বাবার খোঁজে অস্থির হয়ে পড়া সাজু হঠাৎ বাবা-মা-বোন কে দেখে হাত বাড়ায়। সাজুর অন্য হাত ছুঁয়ে থাকে কামেলা আর নুরকে। দৃশ্য—ফ্রিজ। আবহে ফিরে আসে "মম চিত্তে .... তা-তা থৈ থৈ"— ধীর লয়ে। আগের কয়েকটি দৃশ্যের ছোট ছোট টুকরো ভেসে আসে গানের মাঝে মাঝে। ছবি শেষ হয়।

একেবারে প্রথমেই বলা যেতে পারে সময়ের নিরিখে এই ছবির মতো প্রাসঙ্গিক বিষয় আর অন্য কিছুই হতে পারে না। ভাবতে সত্যি অবাক লাগে—অন্তরীণ থেকে একেবারে লাফিয়ে গ্রামবাংলার মাঠে-মাঠে, আলে-আলে ক্যামেরা ঘোরানোর দম কোথা থেকে পেলেন মৃণাল সেন। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে গত পনেরো বছরে আমাদের দেশে যারা বড় হয়ে উঠেছে, খবরের কাগজে আর টেলিভিশনের পর্দায় তাদের চোখের সামনে বাবরি মসজিদ ভাঙা আর রামমন্দির গড়া ছাড়া আর কোনও অ্যাজেন্ডাই নেই। দারিদ্র-বেকারত্ব, পানীয় জলের অভাব, অস্বাস্থ্য, কুসংস্কার, সতীদাহ, বউ পোড়ানো সমস্ত কিছু ছাপিয়ে সামনে এসেছে বারেবারে সেই একই বিষয় মন্দির-মসজিদ অথবা মসজিদ-মন্দির। মসজিদ ধবংস আর মন্দির গড়ার রণহুঙ্কারের হাত ধরে এসেছে পোখরান, এসেছে কারগিল—সঙ্গে বিরাট কালো অক্ষরের 'লোকসান'। এই ধর্মোন্মাদ-যুদ্ধ জিগিরে দেশকে সামিল করতে প্রথমেই দরকার দেশের মধ্যেই সুস্পষ্ট ভেদ রেখা। সুকৌশলে এই দীর্ঘ সময় জুড়ে তৈরি করা হয়েছে অলঙ্ঘনীয় পাঁচিল। সমাজের মধ্যে, গ্রামেগঞ্জে, রাস্তাঘাটে, বাজারে হাটে, ট্রেনে বাসে খবরের কাগজে-টেলিভিশনে। পাঁচিলের এপারে 'আমরা' ওপারে 'ওরা'। ওরা কারা? ওরা সন্ত্রাসবাদী, ওরা খুনি, ওরা দেশদ্রোহী, ওরা পাকিস্তানের দালাল ওরা মুসলমান— আমরা হিন্দু। আমরা কবিতা লিখি, ভাল সিনেমা দেখি, গ্রুপ

থিয়েটার করি, মিছিল করি তবুও আমাদের চামড়ায় চিমটি কাটলেই জানা যায় আমরা হিন্দু! ওরা রাজাবাজার খালের ধারে, বেলেঘাটায় আস্তাকুড়ে, অথবা মেটেবুরুজের দর্জিপাড়ায় যেখানেই থাকুক-খুঁটে খুঁটে বেঁচে থাকলেও ওরা-ওরাই। ওদের তাড়াতে হবে, সীমানা পার করে। যুদ্ধ করতে হবে—হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্র কিনতে হবে, বেচার জন্য ওৎ পেতে বসে আছে সাহেব মহাজনরা। এই 'ওরা' আর 'আমরা'র পাঁচিল তৈরির এক কোমর রক্ত-কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে 'আমার ভুবন' যেন এক উজ্জ্বল উদ্ধার। ওদের নাম মেহের, নূর, সখিনা সাজু-সায়রা-কামেলা হলেও ওদের বউ বোরখা পাড়ে না তো! ওরাও আমাদেরই গ্রামের একই পাড়ার অথবা পাশের পাড়ার—সেই তো একই ডুরে ডুরে লাল পাড় শাড়ি, নিকোনো উঠান, সেই একই অস্বচ্ছ হারিকেনের কাঁচে উজ্জ্বল হয়ে উঠে সখিনার চোখ। সখিনার নথ, মেহের সখিনার খুনসুটি, চাঁদের আলোয় সখিনাকে কোলে তুলে নেওয়া—সব মিলিয়ে তৈরি হয় ওদের "বেঁচে থাকার ম্যাজিক" যে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে মেহেরের মাঝে মাঝে অভিমান ক্ষোভ হলেও—খাটতে কুঁড়েমি নেই। কখনও মাঠে, কখনও ইঁটভাঁটায় কখনও রেডিও, টিভির দোকানে মেহেরকে আমরা কখন যে ভালবেসে ফেলেছি বুঝতেও পারি না। মেহেরকে ভালবাসলে যে নূরকে বাঁকা চোখে দেখতেই হবে এই অনিবার্য সিদ্ধান্ত, পরিচালক দর্শকের চেতনায় কোন ম্যাজিকে কখন যে পাল্টে দিলেন—আমরা তা বুঝতেই পারলাম না। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে মোটর সাইকেল চালানোর ভঙ্গিতে সাজুর বোঁ বোঁ আওয়াজ অথবা হাওয়াই চপ্পল কিনে দেওয়ার আবদার জানিয়ে সখিনার অনির্বচনীয় দৃষ্টি নিক্ষেপ। ছোট ছোট অজস্র ঘটনা আর আটপৌরে অথচ প্রগলভ নয় এমন সংলাপে মৃণাল সেন গড়ে তোলেন নতুন ভুবন যেখানে ওরা আর আমাদের মধ্যেকার সযত্নে গড়ে তোলা পাঁচিল কোন যাদু-মন্ত্রে যেন হাওয়া-এ ভুবন সখিনার ভুবন এ ভুবন মৃণাল সেনের নতুন ভুবন। ২০০২ সালের শেষ প্রান্তে এসে নিঃসন্দেহে বলা যায় নরেন্দ্র মোদি-আদবানি-বাজপেয়ীদের ভয়ঙ্কর, নরখাদক সময়ের দিকে পিঠ ফিরিয়ে গ্রাম বাংলার শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন বেঁচে থাকার এই ম্যাজিকের চলচ্চিত্রায়ণ নিশ্চিত ভাবেই এক প্রাসঙ্গিক এবং স্থির নিশ্চিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। ফ্যাসিস্ত-নরখাদক 'ওরা-আমরা' দর্শনের মুখোমুখী বর্ষীয়ান পরিচালকের এক কাব্যিক প্রতিবাদ।

গ্রাম বাংলার শ্রমজীবী মানুষের প্রতি এত পরিমার্জিত সম্ভ্রম এর আগে কোনও ছবিতে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মেহেরের শ্রম বিক্রির বিচিত্র রূপ—কখনও ইঁটভাঁটায় কখনও পরের জমিতে, কখনও মাছের জাল হাতে ধরা পড়ে স্বচ্ছন্দ চিত্রনাট্যের প্রবহমানতায়। গত আড়াই দশকে গ্রাম-বাংলার সমাজ অর্থনীতির পরিবর্তিত ছবি অনায়াসে উঠে আসে ছোট ছোট দৃশ্যে আর গার্হস্থ্য সংলাপে। মাটি কাটতে কাটতে ইঁটভাঁটার শ্রমিকদের কথোপকথনে ধরা পড়ে মেসিনে জল তোলা আর মেসিনে লাঙ্গল দেওয়ার সঙ্গেও প্রয়োজন গতর। গতর—মানুষের, মেহেরের, দু'হাতের কঠোর শ্রম ফলাতে পারে সোনা যদি মেসিন সঙ্গে থাকে। মেহেরের আফশোস, 'বাবা দাদারাও যদি এ সব মেসিন পত্র দেখে যেতে পারত' আমাদের দীর্ঘশ্বাসেও মিশে যায়। সাজু স্কুলে যায়, সায়রাও যেত, আপাতত ছোট ভাইকে সামলায়—মা সখিনা চায় রেডিও, হাওয়াই চপ্পল, একটা ভাল শাড়ি। নিপাট সাদামাঠা গ্রাম বাংলার চালচিত্র যেখানে ওরা-আমরা ভেদের চিহ্ন মাত্র নেই। মৃণাল সেন ভুবন সোম-এ সুহাসিনী মূলে'র সেই অবিস্মরণীয় দোলনা-দৃশ্যর অনেক দিন পর আবার তৈরি করেছেন অতল-গভীর কাব্যময় এক দৃশ্য। নথ্ বন্ধক রাখা টাকা দিয়ে রেডিও কিনে কাঁধে-গামছা নিয়ে মেহের ঢোকে ঘরের উঠোনে—নাচের ভঙ্গিতে এক হাতে ধরা ট্রান্‌জিস্টার রেডিও। রেডিওতে শ্রীকান্ত আচার্যর গলায় "মম-চিত্তে—তা-তা থৈ থৈ" এর তালে তালে মেহেরের ঝোলা থেকে একে একে সায়রার ফ্রক, সাজুর জামা আর সখিনার শাড়ি বেরিয়ে হাওয়ায় উড়ে যায়—মনে হয় যেন আমাদের শহুরে বিচার বোধ 'খেত মজুরের ঘরে রবীন্দ্রসঙ্গীত আবার' ধরনের নাক সিঁটকানোকে উদ্বেল আনন্দে মহাকাশের নীলে মিলিয়ে দিচ্ছে মেহের শাড়ি-জামা-ফ্রকের সঙ্গে সঙ্গে। আমাদের গলা ধরে আসে চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে।

কতকগুলি বিশেষ দৃশ্য এত কাব্যময় অথচ কঠোর কঠিন বাস্তব, ভাবতে অবাক লাগে পরিচালক কীভাবে নির্মাণ করলেন এই অনবদ্য অথচ অনায়াস চলচ্চিত্র ভাষা। যেখানে ভাঙা বাড়িতে সখিনার ইঁটের ঝুড়ি মাথায় তুলে দিতে হাত বাড়িয়ে দেয় নূর সেখানে নূর এবং সখিনার কয়েক মুহূর্তের দৃষ্টি বিনিময়ে কোনও প্রগলভতা নেই অথচ কী আন্তরিক সম্ভ্রম আর ভালবাসা। রেডিও-টিভির দোকানের দৃশ্যে—মেহের-রহমতের লুকোচুরি খেলা সঙ্গে টিভির পর্দায় চ্যাপলিন-পুলিশের বহু আলোচিত লুকোচুরির দৃশ্য। মেহেরের মধ্যে আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করি চ্যাপলিনকে। অথবা অন্য এক দৃশ্যে দিনের বেলা কাজ-কর্ম ছেড়ে হঠাৎ এসে ঘরের দাওয়ায় শুয়ে পড়ে মেহেরের সংলাপ, 'যাব-যাব হ্যাঁ আরব দেশে যাব, টাকা করব, টাকা'—শ্রমজীবী মেহেরের অনোন্যপায় সারল্য আমাদের মথিত করে রাখে। সর্বোপরি সখিনার জ্বলন্ত স্পর্ধা-অথচ ঘৃণাহীন চোখে ঘোষণা, 'আমার মান নেই? তোমার মান নেই? আমাদের মান ইজ্জত নেই?' যখন তার স্বামী মেহের টাকা ফেরত না দিয়েও ফিরিয়ে আনে বন্ধক রাখা নথ, তার আগের স্বামী নূরের কাছ থেকে।

সব ক'জন অভিনেতা অভিনেত্রী বিশেষত তিনটি মূল চরিত্র, মেহের, সখিনা, আর নূর-এর ভূমিকায় কৌশিক সেন, নন্দিতা

দাস এবং শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় প্রায় নিখুঁত। কৌশিক নিশ্চিত ভাবেই 'আমার ভুবন'এর মেহেরের হয়ে আমাদের মনে গেঁথে থাকবেন বহু দিন। নন্দিতার ভুবনভোলানো হাসি আর আত্মসম্মানে দৃঢ় অথচ বেদনার্ত দৃষ্টি আমরা বাংলা ছবিতে কি এর আগে পেয়েছি কখনও? শাশ্বত নিশ্চিত ভাবেই তাঁর টেলিফিল্ম-ইমেজ ভেঙে ফেলে নিজেকে একজন বড় মাপের অভিনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন এ ছবিতে। অভিজ্ঞ বিভাস চক্রবর্তী এবং অরুণ মুখোপাধ্যায় ছাড়াও কামেলার ভূমিকায় শ্রীজাতা সকলকেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক-জীবন্ত রক্তমাংসের চরিত্র মনে হয়।

টাকি হাসনাবাদের ইচ্ছামতীর পারের তালপুকুর গ্রামকে প্রায় জলজ্যান্ত তুলে এনে টালিগঞ্জের স্টুডিওতে বসিয়েছেন গৌতম বসু। গৌতম যদিও শিল্পনির্দেশক হিসাবে এর আগেও মৃণাল সেনের সঙ্গে কাজ করেছেন তবু এ ছবিতে ইনডোর সেট এবং আউটডোরের দৃশ্যের মাঝে কোথাওই প্রায় আমাদের হোঁচট খেতে হয় না তার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে গৌতমের। দেবজ্যোতি মিশ্র'র আবহ সঙ্গীত এবং রবীন্দ্রনাথের গানকে নতুন প্রেক্ষিতে নতুন ঝঙ্কারে গাওয়ার পরিকল্পনাও মৃণাল সেনের নতুন ভুবন নির্মাণের অন্যতম বিশেষ উপকরণ। অভীক মুখোপাধ্যায়ের ক্যামেরার কাজ অসামান্য। অভীক, সম্ভবত এই প্রথম মৃণাল সেনের সঙ্গে কাজ করলেন। মৃন্ময় নন্দী মৃণাল সেনের সঙ্গে বেশ কিছু দিন সম্পাদনার কাজ করছেন। রেডিও-টিভির দোকানের দৃশ্য, অথবা মেহের-সখিনার খুনসুটির দৃশ্য থেকে শুরু করে জলের গ্লাস পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ দৃশ্যে মম-চিত্তে নিতি নৃত্যের তালে তালে একে একে ফিরে আসে মেহের নূর সখিনা সকলেই—পুরো দৃশ্যে মৃন্ময় নন্দীর মুনশিয়ানার ছাপ স্পষ্ট। অভীক মুখোপাধ্যায়-এর ক্যামেরা প্রথম থেকে শেষ অবধি পরিচালকের চাওয়াকে পূরণ করেছেন। বিস্তীর্ণ মাঠের দৃশ্য, ইঁটভাটার দৃশ্য অথবা সখিনার নথ পড়া এবং খুলে ফেলার দৃশ্য থেকে শুরু করে এঁটো বাসন পত্র হাতে সায়রার পেছন পেছন কুকুরের যাওয়া সর্বত্রই অভীকের ক্যামেরা মৃণাল সেনের নতুন ভুবনের অভিসারী। আফসার আহমেদের 'ধানজ্যোৎস্না' যদিও 'আমার ভুবনের' 'কাহিনিসূত্র' মাত্র তবু এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় গ্রামবাংলার মুসলিম কৃষক সমাজকে তাদের রক্তমাংসের অস্তিত্ব নিয়ে আফসারের থেকে ভাল করে আর কোনও বাঙালি কথা সাহিত্যিক জানেন কি-না সন্দেহ। সখিনার চরিত্র এবং সখিনা মেহের ও নূরের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা, তার টানাপোড়েন 'ধানজ্যোৎস্নার' অন্যতম প্রধান সম্পদ। আমার ভুবনেও তাই জ্যোৎস্না মাখানো ধানের মিষ্টি গন্ধ সর্বব্যাপ্ত।

পাকিস্তানের সবজি বিক্রেতার এক শব্দের নিকষকালো উচ্চারণের বিনির্মাণ কীভাবে সখিনা-মেহেরের জীবনের "বেঁচে থাকার উজ্জ্বল ম্যাজিকে" পুনর্নির্মিত হয়, সে গবেষণা আপাতত চলচ্চিত্রের সমাজতত্ত্ব গবেষকদের জন্য তোলা থাকুক। আমাদের মতো মেঠো-দর্শকের কাছে "আমার ভুবন" যেন মৃণাল সেনের হাত ধরে নতুন বিশ্বাসের খোঁজ করার দম যোগায়। চারপাশের এই সর্বগ্রাসী বিশ্বাসহীনতা আর আদর্শবাদের শ্মশানযাত্রার কালে গ্রাম বাংলার আটপৌরে বাস্তবতার দিকে ক্যামেরা ঘুরিয়ে ধরলেই শুধু হয় না, সখিনা-মেহের-নূর-সাজু-সায়রাদের দৈনন্দিন শ্রমঘন জীবনযাপনের মাঝে মানবিকতার মূল সুরটা খুঁজে পেতে হয়। তার জন্য চাই শ্রমজীবী মানুষের প্রতি নিষ্কলঙ্ক ভালবাসা আর সম্মানবোধ। যে ভালবাসা নিম্নবর্গকে শুধুমাত্র ইতিহাসের উপাদান হিসাবে অথবা ক্ষমতায় পৌঁছনোর পাটাতন হিসাবে দেখে না। সম্ভবত এখানেই মৃণাল সেন অনন্য। মুসলমান বাঙালি গরিব কৃষকের সমাজকে ২০০২ সালে তার রক্ত-মাংস, গতিপ্রকৃতি, পঞ্চায়েত-বিডিও, মেশিন-লাঙল-ইটভাটা — এই বিস্তৃত পরিসরে চলচ্চিত্রায়িত করা একেবারেই অসম্ভব ছিল, যদি না মৃণাল সেনের সেই ইতিহাসবোধ থাকত, যা দিয়ে চাক্ষুষ করা যায় "হাসি-কান্না-হীরা পান্না দোলে ভালে" "দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ"। এক পৃথিবী-ঘৃণার দিকে পিঠ ফিরিয়ে মেহের-সখিনা-নূর বেঁচে আছে মমত্বে-ভালবাসায়-সহমর্মিতায়। ওদের বেঁচে থাকার ম্যাজিকে আমরাও যেন জীবনের নতুন মানে খুঁজে পেলাম।

এই নিবন্ধ লেখার শেষে এসে এখনই জানা গেল 'কায়রো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র' উৎসবে 'আমার ভুবন'-এর জন্য মৃণাল সেন শ্রেষ্ঠ পরিচালক এবং নন্দিতা দাস শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। আশা করা যায় 'এনিমি উইথ্‌ইন' এর চক্রবদ্ধ আর্বত থেকে বেরিয়ে তাঁর নতুন ভুবনে অনতি বিলম্বে আমরা পাব আরও একটা তাজা ছবি আরও এক ঝলক বুক ভরা ঠাণ্ডা বাতাস।

একালের "আখেটিক পালা"

তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্ভবত বছর তিরিশ আগে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবাংলার উত্তাল সময়তেই লিখেছিলেন এমন ক'টা লাইন : "ফুরায় না ফুল্লরার বারমাস্যা/ আর শূন্য হাতে কালকেতুর ফিরে আসা/ফুরায় না দু'টি অসহায় মানুষের/ক্ষুধায় জ্বলতে থাকা।/ ... সারারাত তবু তারা স্বপ্ন দেখে/মাঠভর্তি ধানের আর বুকভর্তি ভালবাসার/আর স্বপ্ন দেখতে দেখতে কালকেতু রাজা হয়।/ফুল্লরার মুখে আবির লাগে।" আর তখন থেকেই বোধহয় সমাজকে ইতিহাসের নিচুতলা থেকে দেখার একটা প্রবণতা শুরু হয়েছিল সাহিত্যের শাখাপ্রশাখায়। বাংলা নাট্যচর্চাও সেই আওতার বাইরে থাকেনি। মধ্যযুগ নতুন প্রতীকী আখরে উঠে আসছিল নাটকের মধ্যে। পুরনো লোকনাটকের ভাষা ধরা দিচ্ছিল নাট্যকলার প্রয়োগে। নতুন শতাব্দীর এই দু'তিনবছরে সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ভাবনায় উত্তর-আধুনিকতার বাতাবরণে যখন নিম্নবর্গীয় চেতনার ব্যবহার তর্কে-বিতর্কে, মাজাঘষায় আরও শাণিত তখন "বহুরূপী" নাট্য সংস্থা তাঁদের সাম্প্রতিক প্রযোজনা "ফুল্লকেতুরপালা"তে একটি মধ্যযুগীয় প্রচলিত উপাখ্যানকে ইতিহাসের সেই নিম্নভূমি থেকেই নতুন করে দেখাতে চেয়েছেন।

নাট্যকলার যেহেতু দুটো অংশ প্রধান— এক, নাটক আর দুই, অভিনয়রীতি; তাই প্রথমেই আসা যাক নাটকের আলোচনায়। "ফুল্লকেতুর পালা"-র রচয়িতা রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী এবং নির্দেশক কুমার রায়। নাটকের বিক্রীত লিফলেটে বলা হয়েছে পালার মূল অবলম্বন মধ্যযুগের বাংলা লোকপুরাণের একটি গল্প। তবে খোলসা করে বলতে গেলে, এ নাটকের অনেক সংলাপ পর্যন্ত ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের 'আখেটিক খণ্ড' থেকে প্রায় হুবহু বসানো। তবে অমিলের পাল্লাটাও বেশ ভারি। আসলে এ যুগের নাট্যকার একেবারে শিকড় ধরে টান দিয়েছেন তাই এ পালায় ব্যাধ কালকেতু-ফুল্লরা স্বর্গের নীলাম্বর-ছায়া নয়। এরা 'খাঁটি' মানবসন্তান। পালা অন্তে স্বর্গে ফেরার দায় এদের নেই। এরা ধরাধামে 'সাম্যের স্বর্গ' গড়ার স্বপ্ন দেখায়।

নাটকের নান্দীমুখ হয় শিবপার্বতীর ঝগড়া দিয়ে। তাঁরাই প্রকারান্তরে নাটকের সূত্রধার। গরিবের সংসারে শিবকর্তার নোলাটি সরেস কিন্তু গৃহিণী সখেদে জানান- "প্রথমে যে দিব পাতে তাই ঘরে নাই।" কবি মুকুন্দ অবশ্য এ সময়ে শিবকে ত্রিশূলটি বন্ধক দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের নতুন পালাকার শিবকে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে চাষ করে অন্ন যোগানোর নিদান দেন। দেবতা যখন ভূমিতে নামেন তখন মানুষের অন্যথা কি হয়? তাই গোধাসনা পর্ণশবরী দেবী অভয়া আরণ্যকূলকে রক্ষা করার জন্য আখেটিক (ব্যাধ) কালুবীরকে উড়িষ্যার কোল ঘেঁষে মেদিনীপুরের সীমান্তবর্তী কাঁসাই তীরে বন কেটে বসত 'গুজার' রাজ্যের রাজা করে দিলেন। (মধ্যযুগের কাব্যে অবশ্য এত নিখুঁত ভৌগোলিক অভিনিবেশ ধরা পড়েনি।) আর দেবী বলে দিলেন, হত্যার জীবিকা ছেড়ে কৃষিকাজ করে প্রজাপালন করতে। ব্যাস, দেবীর কাজ শেষ। দেবী গেলেন ঘুমোতে। কিন্তু রাজা-রানি হয়ে কালকেতু আর ফুল্লরা পড়ল দুই ভিন্ন ধরনের আতান্তরে।

কলিঙ্গ থেকে উৎখাত হওয়া চাষি বুলান মন্ডলের সাহায্যে কালকেতু ব্যাধগোষ্ঠীকে কৃষিজীবী করে তুলল। পুরনো সঙ্গী ন্যাড়া, শিবে, আতর আলি এরাই হল নতুন রাজার সেনাপতি, মন্ত্রী, সভাগায়ক। যদিও তারা মাঝেমধ্যেই ভুল করে পুরনো অভ্যাসে রাজাকে 'তুই-তোকারি' করে ফেলে। রাজা কালকেতুও আর নাচের আসরে বান্ধবী সুখদার কণ্ঠলগ্ন হতে পারে না। তার রাজ্যে গোলাভরা ধান আছে কিন্তু অস্ত্রাগার বা কারাগার কোনওটাই নেই। সেনাপতির তরোয়ালটাও আধখানা। স্বভাবতই সামন্তপ্রভু কলিঙ্গরাজ ব্যাধনন্দনের 'রাজা' হওয়াটা ভাল চোখে দেখে না। ইন্ধন জোগায় মধ্যসত্ত্বভোগী ভাঁড়ু দত্ত। আসলে দেবীর বরে কি সত্যিই 'রাজা' হওয়া যায়? রাজা হতে হয় লোকমান্যতায়। পিপীলিকার ডানা ছাঁটার তরে কলিঙ্গরাজ গুজার আক্রমণ করে। নিরস্ত্র রাজা বন্দি হয়। পুরুষেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এগিয়ে আসে নারীবাহিনী—যার নেতা রাজারানির পুরনো সহচরী সুখদা। আবার দেবীর কাছে মানুষ কৃপাপ্রার্থী হয়। কিন্তু ঘুমকাতুরে দেবী কেবলই হাই তোলেন। তখন সুখদা দেবতার থেকে মুখ ফিরিয়ে শুরু করে লোকলক্ষ্মীকে জাগানোর সাধনা। লোক-সাধারণের সেই প্রাকৃত সংগ্রামে ব্যাধ কালকেতুর কপালে আঁকা হয় লোকমান্যতার রাজতিলক।

"ফুল্লকেতুর পালা" কি তবে রাজার রাজত্বে সবাই রাজা হয়ে ওঠার গল্প? আসলে নাট্যকার বোধহয় এ পালায় চুপিচুপি হরেকরকম তত্ত্বকথার মিশেল দেবারই চেষ্টা করেছেন। যেমন, যে দেশে আণবিক নিরীক্ষায় বুদ্ধ হাসেন সেখানে অস্ত্রাগারের থেকে গোলাভরা ধানই বেশি দরকার। দ্বিতীয়ত, সেই গোলা

ভরে ওঠে যাদের শ্রমে, তারাই রাজা নির্বাচনের আসল হকদার। তৃতীয়ত, নতুন সমাজের নিয়ন্তা শিব নন, অন্নপূর্ণা। পুরুষের সঙ্গে শুধু কাঁধ মিলিয়ে নয়, কখনও কখনও তাকে ছাপিয়ে নেতৃত্ব দেয় সুখদারা। তদুপরি রয়েছে 'দাও ফিরে সে অরণ্য'-এর মতো বক্তব্য। তবে কোথাও তত্ত্বকথাই খুব উচ্চকিত হয়নি বলে রক্ষা পেয়েছে নাটকটা। রক্ষা যে পেয়েছে তাতে বোধহয় সন্দেহ নেই। একবার নাট্যকলা সংক্রান্ত আলোচনায় শম্ভু মিত্র বলেছিলেন, 'যাঁরা ছাপমারা বিদ্বান নন, তাঁরা অনেক ভালো নাটক বোঝেন। কেননা নাটকটা বুঝতে হবে নিজের বুদ্ধি দিয়ে। আর যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা, তাঁদের পক্ষে নাটক বোঝা ভয়ানক শক্ত। এইসব লোকেরা হাতড়ায় নাটকটা সম্পর্কে কে কী বলেছে' ('কাকে বলে নাট্যকলা'- বই থেকে)। বর্তমান আলোচকের এ নাটকটি দু'বার দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে। দর্শকরা যে নাটকটার আদ্যন্ত উপভোগ করেছিলেন তা প্রতি পদেই উপলব্ধি করা গিয়েছিল। তত্ত্বের বাড়াবাড়ি থাকলে এটা সম্ভব হত না।

তবে প্রশ্ন উঠতে পারে এ তো ব্যাধ কালকেতুর রাজা হওয়ার নাটক। তবে কেন "ফুল্লকেতুর পালা" নাম? এ নাটকের কোথায় ফুল্লরা? আসলে ফুল্লরাই এ নাটকের বীজ। নাটকের মধ্যে থাকে যে মানুষ — সে বহুস্তরিক। সমাজের সঙ্গে, নিজের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নিয়ে পুরো নাটকটা অনেকগুলো চরিত্রের গল্পের সমন্বয় হয়ে ওঠে। তাই কালকেতুর গল্প শেষ হয় না ফুল্লরা ছাড়া। ব্যাধ আর কৃষক, ব্যাধ আর রাজা, ফুল্লরার প্রেমিক কালুবীর আর রাজা কালকেতু— কালকেতুর এত রকমের দ্বন্দ্বকে উস্কানি দেয় যে ফুল্লরাই। সেই সঙ্গে রয়েছে তার নিজের সংকট। রাজা হওয়ার পর ফুল্লরার সেই সরল কালুবীর, যে অঢেল ধন পেয়ে ফুল্লরাকে গোলাহাট থেকে তাবৎ দ্রব্য মায় বিটাবিটিও কিনে দেবার অঙ্গীকার করেছিল, সে ক্রমশ ফুল্লরার কাছে দূরের মানুষ হয়ে যায়। যে কালু পরম আহ্লাদে ফুল্লরার কাছে নানা ব্যঞ্জন খেতে চাইত, আজ পুরনো অভ্যাসে "কি রেঁধেছিস" জিজ্ঞাসা করলেও রানি ফুল্লরার পক্ষে তার খোঁজ রাখার উপায় নেই। কালুকে সুখদার নাচের সঙ্গী দেখতে ফুল্লরা অভ্যস্ত ছিল। আজ রাজা কালকেতুকে নর্তকীর প্রতি অযাচিত সদয় হতে দেখে হিংসায় সে মত্ত প্রলাপ বকে। যে-সুখদা ছিল ফুল্লরার প্রাণের সখী, সেই সুখদার আনা নারকেল নাড়ু, সুগন্ধী তাম্বুল এ সব রানি ফুল্লরার পক্ষে সবার সামনে খাওয়া হয়ে ওঠে না। কালুবীরের ফুল্লরা 'ঘ্যাচাংফ্যাচাং'-এর অর্থ বোঝে না, বোঝে না খল ভাঁড়ুর শঠতা। ফুল্লরা অনেক কিছুই পারে না, সুখদার সঙ্গী হয়ে লোকলক্ষ্মীকে জাগাতেও পারে না। শেষ কালে সবার অগোচরে সুখদার কাছে নিজের অক্ষমতাকে উন্মোচিত করে। আসলে ফুল্লরার সংকট কেবল সামাজিক নয়, হয়ত অনেক বেশি ব্যক্তিক। তা আধুনিক নিঃসঙ্গ দ্বীপবাসী মানুষের। তাই নাটকের শেষদৃশ্যে রাজা কালকেতুকে নিয়ে যখন সমস্ত গুজার মেতে ওঠে— রাজা স্বয়ং প্রজাকে মাথার ওপর তুলে ধরেন, তখন সেই জনতার সঙ্গী হয়েও মুখে হাসি চোখে জল নিয়ে ফুল্লরা একটু পিছিয়ে পড়া— একটু যেন একা। আসলে আজকের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে তো নিজের বহুমাত্রিক সত্তার নিরন্তর দ্বন্দ্বও যোগ হয়ে গেছে। সেই অভিযোজন প্রক্রিয়ায় আমরা কেউ কেউ এ ভাবেই পিছিয়ে পড়ি— আর রাজার সঙ্গী হবার অপেক্ষাতেও থাকি।

এবার বলা যাক অভিনয়কলা ও অন্যান্য প্রসঙ্গের কথা। আধুনিক মানুষের সমাজসত্তা আর ব্যক্তিসত্তার দ্বন্দ্বকে কালকেতু ফুল্লরার অ্যালিগরিতে গড়তে গিয়ে স্বাভাবিক কারণেই নির্দেশক বেছে নিয়েছেন মধ্যযুগীয় লোকনাট্যের নির্মিতি। শিবপার্বতীর পটের মুখোস পরে নাটকের শুরুতে 'আখড়াইবন্দী' পরিবেশন নতুনত্বের উপভোগ্যতা এনে দেয়। এ নাটকের সংলাপ ছন্দে ও গানে বাঁধা। গানের প্রয়োগ লোকসুরভিত্তিক উনিশ শতকীয় যাত্রার 'জুড়ির গান'-এর মতো। তবে নাচের কোরিওগ্রাফে সকলে সমান স্বচ্ছন্দ নন। সমস্ত মঞ্চকে সাবলীল মুনশিয়ানায় তিনটি স্তরে সাজানো হয়েছে। যার শেষভাগে রয়েছে জুড়ি-গায়নের দল। দ্বিতীয় স্তরটি প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহারোপযোগী কয়েকটা থাম দিয়ে সাজানো। আর মঞ্চের সম্মুখভাগেই রয়েছে পথ থেকে রাজপ্রসাদ।

চরিত্রচিত্রণে বহুরূপীর মান অনুযায়ী সকলেই যথাযথ। তবে অমিয় হালদার ও সুধীন মুখোপাধ্যায়ের সংযত অভিনয় যথাক্রমে ভাঁড়ু দত্ত ও মুরারী শীলকে নিতান্ত ভাঁড় হয়ে যেতে দেয়নি। গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের অস্ত্রহীন সেনাপতির অসহায়তাটুকু ভারি ভাল। দেবীর ভূমিকায় কণিকা দে-র আহ্লাদিভঙ্গি দারুণ অভিনব হয়েছে। সুমিতা বসুর সুখদা দার্ঢে ও লাস্যে নাটকের অনেকখানি জুড়ে আছে।

যদিও এ পালায় কালকেতু ফুল্লরা সমান অংশী কিন্তু অভিনয়ে মঞ্চজুড়ে থেকেছেন একজন— কালকেতু দেবেশ রায়চোধুরী। দেবেশের সমস্ত চেহারা ও আচরণের থেকে যে আদিম অনার্য সরল মানুষটি বেরিয়ে এসেছে— তার সজীবতা প্রতিরোধহীন। কালকেতুর বীরত্ব, তার অবরুদ্ধ আবেগের যন্ত্রণা প্রকট হয়েছে অভিনেতার ছৌনাচের মতো সাবলীল দাপুটে অঙ্গসঞ্চালনায়। কালকেতু-ফুল্লরার যুগল উপস্থাপনায় মাঝে মাঝেই যে কমিক আস্তরণ রয়েছে তা সহজেই মন ছুঁয়ে যায়। দেবেশের অভিনয়ের দাপট ফুল্লরার ভূমিকায় বয়ঃকনিষ্ঠ সুকৃতি লহরীর মধ্যে দেখা না গেলেও তার ঠোঁট ফোলানো অভিমান, অকারণ ঈর্ষায় কুঁকড়ে যাওয়া, নিজের সঙ্গে লড়াইয়ের কষ্ট, আনমনা একাকী ভঙ্গি কালকেতুর জ্বলে ওঠার পাশে একটা নরম ধূপছায়া তৈরি করেছে। যেটার প্রয়োজন ছিল। ধ্রুপদী চর্চার নিত্যনতুন interpretation -এর নামে নিরন্তর চলেছে যে সাংস্কৃতিক দুর্বত্তায়ন, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়ভাবনা ও অভিনয়কলার সোনায় সোহাগায় এ ভাবেই জমে উঠেছে একালের "আখেটিক পালা"।

চারদুয়ার : এক 'অসামাজিক' মা ও মেয়ের নাটক

মেঘ মুখোপাধ্যায়

বাঙালি সমাজে সচরাচর এমনটা দেখা যায় না। মধ্যবিত্ত মহলে তো নয়ই, উচ্চবিত্তদের মধ্যেও সম্ভবত নয়। শুধু বাঙালি সমাজই বা বলি কেন, ভারতীয় সমাজেও কি এমন এক মায়ের তথা নারী চরিত্রের দেখা পাওয়া সহজ? এক প্রৌঢ়া তিন কন্যার জননী, শিক্ষিকা অবিবাহিতা ভদ্রমহিলা আজকের এই 'মা' একদিন এক বিবাহিত সংসারি পুরুষকে ভালবেসেছিলেন। এক বিবাহিত পুরুষ ও এক অবিবাহিত নারী কিংবা তার বিপরীত অথবা উভয় পুরুষ বা নারীই বিবাহিত এবং সংসারধর্মে নিরত হয়েও অপর কোনও বিবাহিত পুরুষ বা বিবাহিত নারীর প্রতি অনুরক্ত—ভাল করে বললে বিবাহিত বা সংসারি কি না এই শর্ত উপেক্ষা করে পরস্পরের প্রতি একরকম মানসিক টান অনুভব করেন আর সংযোগ বা সখ্যতা বজায় রেখে চলেন—নারী পুরুষের এ জাতীয় সম্পর্ক সমাজ-সংসার ভাল চোখে না দেখলেও, অনুমোদন না করলেও—এমনতর প্রেমের সম্পর্কে যে কিছু একটা সৃষ্টিছাড়া নয় বরং সমাজের মধ্যেই বহমান রয়েছে—প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি তার দৃষ্টান্ত কম নয়। রাধা কৃষ্ণের সম্পর্ক এ জাতের 'অসামাজিক' ছন্নছাড়া ভালবাসার পরমতম উদাহরণ।

কিন্তু শুধু ভালবেসেই ক্ষান্ত হননি, দুর্জয় সাহসের অধিকারিণী এক নারী সেই পুরুষটির সন্তান ধারন করেছেন তিন তিনবার। তাঁর প্রেমিকপ্রবর সমাজের কোনও স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ন না করে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে গার্হস্থ্যধর্ম পালন করে চলেছেন। অন্যদিকে এই দুঃসাহসিনী নারী সমাজ বা আইনসম্মতভাবে কারুর স্ত্রী না হয়েও অন্যত্র একাকী তিনটি কন্যাকে পালন পোষণের একক দায়িত্ব নিয়ে বড় করে তুলেছেন। দু'মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। ছোটটি বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠেছে।

এমন এক 'অসামাজিক', 'অবিবাহিতা' মা আর তাঁর তিন কন্যার জীবনের জটিলতা নিয়ে গড়ে উঠেছে গান্ধারের নতুন নাট্য 'চারদুয়ার'। প্রশান্ত দলভির মারাঠি নাটকের রূপান্তর। নির্দেশক মেঘনাদ ভট্টাচার্য। জীবনের জটিলতা তো বটেই — জটিলতা বাদ দিয়ে সমৃদ্ধ জীবন হয় না, জটিলতা এড়িয়ে মানুষের জীবন গভীরতা লাভ করে না—কিন্তু এই চারজনের জীবনকে ছেয়ে আছে অস্বাভাবিকতা। মা আর তাঁর তিন মেয়ের জীবন অস্বাভাবিক ঘটনা দ্বারা আক্রান্ত হয়, বিপর্যস্ত হয়। এ নাটকের চারটি নারীর জীবনস্রোত ক্রমশ সংকটপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। মা তো বহুকাল আগেই স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন অপ্রচলিত জীবনধারা। বিবাহিতা বড় মেয়ের জীবনেও সংকট ঘনিয়ে তুলেছে তার লম্পট স্বামী। অন্য নারীতে স্বামীর আসক্তি আর তা প্রদর্শনের নির্লজ্জতায় অতিষ্ঠ হয়ে বড় মেয়ে বিদ্যা তার শিশুকন্যাকে বাড়িতে ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছে মায়ের কাছে। সে সমাজবিজ্ঞানের কৃতী ছাত্রী এবং অধ্যাপিকা— সে তার সাংবাদিক স্বামীকে বিদ্যাবুদ্ধি অনুভবশক্তিতে হীন বলে মনে করে। তার ওপর যুক্ত হয়েছে অবিশ্বস্ততা, অন্য মেয়েকে নিয়ে ফুর্তি মারার নীচতা—তার জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে যা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। মাও মেয়েকে সমর্থন করেন। আর সমাধানের রাস্তা না বেরন পর্যন্ত তাঁর কাছেই মেয়েকে রেখে দেন। বিদ্যার জীবনের সংকট এ-নাটকের একটা প্রধান অংশ। এবং এতে নাট্যে বেগ সঞ্চার হয় আর তীব্রতা বাড়ে। মা-মেয়ে এই সংকট কীভাবে মোকাবিলা করে দেখার জন্য দর্শকের কৌতূহল বেড়ে যায়। কৌতূহল বাড়ে, কারণ মেয়ে জামাইয়ের চরিত্র নিয়ে কটুমন্তব্য করলে জামাইবাবাজিও শাশুড়ির জীবনের ইতিহাস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বহু বছর বাদে মাকে এই সূত্রে তাঁর অবিবাহিত জীবন এবং বিবাহিত-সংসারি পুরুষের সন্তানধারণের প্রশ্নের মুখে দাঁড়াতে হয়।

তারপর নাটকে প্রবেশ করে মেজ মেয়ে বৈজয়ন্তী। মায়ের কাছে একটি মেয়ের প্রবেশ মানে যেন একটি সমস্যার প্রবেশ। আপাত হাসিখুশির আড়ালে সে যে এক অসুখী জীবনযাপন করে চলেছে ধীরে ধীরে তা উন্মোচিত হয়। মেজ মেয়েও তার স্বামীকে নিয়ে সুখী নয়। তার স্বামীটি অবশ্য বড় মেয়ের স্বামীর মতো তেমন বিপজ্জনক কিছু নয়—তেমন বিপত্তির কোনও কারণ নয় কিন্তু এক প্রাণবন্ত উচ্চাভিলাষী তরুণী স্ত্রীর জীবনে অন্ধকারের ছায়া নামিয়ে আনার পক্ষে যথেষ্ট। আসলে তার স্বামী শ্রীকান্ত একটি মাকাল ফল মাত্র। দেখতে সুন্দর, ফিটফাট থাকায় সদা ব্যস্ত, স্মার্ট দেখাবার আর কথা বলার চেষ্টা করে পেরে ওঠে না, ফেসে যায়, বোকামি করে ফেলে, স্থায়ী চাকরি বজায় রাখতে পারে না, আজকালকার কঠিন দিনে নির্দিষ্ট সম্মানজনক আয়ের

সুবন্দোবস্ত করতে অপারগ, চাকরি জুটিয়ে দিলে সামান্য অজুহাতে ছেড়ে পালিয়ে আসে। যুবকটির এমন কতশত দোষ। এক কথায় আজকের সমাজে অচল, জটিল জীবনধারায় একদম বেমানান। তার ওপর আবার কিছুদিন খুব ঝোলাঝুলি করছে যে সে বাবা হতে চায়। বৈজয়ন্তীকে মা হবার জন্য সাধাসাধি করে। কিন্তু বৈজয়ন্তী সাহস পায় না। স্বামীর অভিলাষ আর রেস্তের জোর নিয়ে তার মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধে। এই সরলমনা, সংসারের অনুপযুক্ত স্বামীকে নিয়ে সে কী করবে— কী করে বাকি জীবন কাটাবে? এই আপশোস থেকে সে এক সময় পরিত্রাণ পায় যখন জানতে পারে তার বড়দির স্বামীর কীর্তি— স্বামীর ভ্রষ্টাচারের জন্য বিদ্যার জীবন ছারখার হতে বসেছে— সে উপলব্ধি করে যে শ্রীকান্ত আর যাই হোক— কোনও তরুণীর স্বপ্নে দেখা আদর্শ স্বামী হতে না পারুক, সে কিন্তু তার স্ত্রীকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে। সবচেয়ে বড় কথা সে তার তরুণী বউয়ের প্রতি অনুগত, অনুরক্ত, সে তার জীবনে বউকে গুরুত্ব দেয়, তাকে খুশি করার চেষ্টা করে নিজের মতো করে, তার বউয়ের কাছে শীঘ্রমধ্যে সন্তান চায়, সন্তান আনার পিছনে আর্থিক পরিকল্পনার কথাকে সে আমল দিতে চায় না কিংবা তার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে এত জটিল পরিকল্পনা সাজানোর কথা ঠাঁই পায় না— সে বাবা হবে, বিজু মা হবে, তারা সন্তান মানুষ করবে এমনটাই তার কাছে বড় কথা।

শ্রীকান্তকে নিয়ে নাটকের মধ্যে এক সময় সংকট ঘনিয়ে উঠেছিল। সে যেন কখনও শুধরোবে না, একজন উপযুক্ত চৌকস স্বামী হয়ে উঠবে না। মায়ের সঙ্গে তার সংঘর্ষ ঘটে যায়। কিন্তু বৈজয়ন্তীর উপলব্ধির পর তাদের দাম্পত্য সম্বন্ধ এবং এই নাটকও নতুন মাত্রা পায়।

ছোট মেয়ে বিনিকে নিয়েও মায়ের এবং দিদিদের সমস্যা কম নয়। তার দুই সহপাঠী বন্ধু প্রকাশ আর বীরেন্দ্রর মধ্যে কাকে ও ভালবাসে, কাকে ও বিয়ে করবে, কার সঙ্গে সংসারজীবন কাটাতে চায় তা ঠিক করতে পারে না কিছুতেই। মা আর দু'দিদি ওকে চেপে ধরে—দু'জনের মধ্যে আর বিলম্ব না করে একজনকে বেছে নিতে বলে—বিয়ের জন্য আর দেরি করা চলে না। এদিকে দু'জনেই উপযুক্ত যুবা, দু'জনেই সুপাত্র, দু'জনেই ওকে গভীরভাবে ভালবাসে; দু'জনেই ওকে বলে তাদের মধ্যে একজনকে নির্বাচন করার জন্য মনস্থির করতে; বিনির সিদ্ধান্তই ওরা মেনে নেবে কিন্তু একজনকে এ বার বেছে নিতেই হবে—তাদেরও এই চূড়ান্তকথা। আসলে, দু'জনের মধ্যে থেকে কিংবা দশজনের মধ্যে থেকে একজনকে জীবনের জন্য বেছে নেওয়া বা বিয়ে করা— এটা হল একজন যুবকযুবতীর কাছে সমাজের দাবি।

শৈশব-কৈশোর থেকে সমাজ তার সদস্যের মনটিকে এ ভাবেই গড়ে তোলে। ছাঁচে ঢালে। সমাজ এবং আইন-নির্দিষ্ট বিবাহের নিয়মটাই এ রকম। ভালবাসার নিয়ম, বিবাহের নিয়ম তথা সমাজের প্রচলিত অনুশাসন এ রকমই দাবি করে— একজন আর একজনকে বেছে নেবে কিংবা অভিভাবকরা বেছে দেবে এবং তারপর তারা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ অর্থাৎ জীবনভর সুখে কালাতিপাত করবে। একজন একই সঙ্গে, একই সময়ে দুজনকে বেছে নিতে পারবে না কিংবা দু'জন একজনকে বেছে নিতে পারবে না। তা হলেই বিপত্তি। বিনিকে একসময় দেখেছি টোমাস মানের কাহিনি অবলম্বনে গিরিশ কারনাডের বিখ্যাত নাটক 'হয়বদন' নিয়ে প্রকাশের সঙ্গে আলোচনা করতে, তর্ক করতে। সেখানে এক নারী চেয়েছিল এমন এক পুরুষকে যার মধ্যে উন্নত মস্তিষ্ক এবং সুঠাম-আকর্ষণীয় শরীরের সমন্বয় ঘটবে। একই সঙ্গে দু'টো প্রত্যাশার মিলন। নাটকের অন্তিমে জানা যায় বিনি কিন্তু একই পুরুষের মধ্যে উন্নত মস্তিষ্ক মেধা বা হৃদয়বৃত্তি এবং শারীরিক সৌন্দর্যের সমন্বয় চায় না। সে কোনও জোড়া দেওয়া 'হয়বদন' চায় না। তার একই জীবনে সে দু'টি ভিন্ন স্বভাবের-প্রকৃতির পুরুষকে চায় একই সঙ্গে একই কালে। দু'টি সম্পূর্ণ পুরুষকে নিয়েই সে জীবনযাপন করবে বলে স্পষ্টভাষায় সবাইকে জানিয়ে দেয়। বিনি একই সঙ্গে প্রকাশ ও বীরেন্দ্রকে বিয়ে করতে চায়। সে জীবনে কারুকেই ছেড়ে থাকতে চায় না, কাউকে বাদ দিয়েই সে সুখী হতে পারবে না। তার এ সিদ্ধান্তের অকৃত্রিম প্রকাশভঙ্গিতে, অন্তর্নিহিত সারল্যে এ-জগৎ হকচকিয়ে যেতে পারে, সমাজ ঝনঝন করে উঠতে পারে, কিংবা অসার কল্পনায় মুচকি হাসতে পারে— কিন্তু বিনির কিছু আসে যায় না। সে বেশ ভেবেচিন্তেই, নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করেই তার অনড় অভিমত প্রকাশ করে দিয়েছে। এবং তার যথার্থ মনোভাব প্রকাশ করে দিয়ে সে ভারমুক্ত।

সমাজহিতৈষী পরিণতবুদ্ধি বয়স্ক মানুষরা বলবেন বিনি তার এই অল্প বয়সে এ সিদ্ধান্তের বাস্তবপরিণাম সম্বন্ধে তো কিছুই জানে না। এ তো অল্পবুদ্ধি খেয়ালি তরুণীর অলীক কল্পনা বই কিছু নয়। সে আর জীবনের কী জানে। কতটুকু দেখেছে। তার উচ্চারণের আন্তরিকতা আর দৃঢ়তা থেকে কিন্তু দর্শকের মনে না হয়ে পারে না যে বিনি এত হালকা করে কথাটা বলেনি। সে অন্যরকম ভাবে জীবনটাকে তথা 'বিবাহ'-ব্যাপারটাকে দেখতে চায়— পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্পর্ককে-সংযোগকে নতুন করে ভাবতে পেরেছে সে। একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর বন্ধনের গণ্ডিটাকে সে আরও প্রসারিত করে দেখতে চায়। বলতে ইচ্ছে করে এমন মায়ের মেয়েই তো এমন করে ভাবতে পারে, বলতে পারে, চাইতে পারে।

সম্ভব কি না? বাঞ্ছনীয় কি না?

বিনি তার উত্তর জানে না। তার প্রথাভাঙা দুঃসাহসিনী মাও জানেন না। নাট্যকারও জানেন না। এমন একটা অদ্ভুত প্রশ্ন বা প্রসঙ্গ তুলে তিনি নাটকের শেষে দুয়ার খুলে দিয়েছেন।

মায়ের জীবনের ইতিহাস এবং ছোটমেয়ের জীবনের চাওয়া ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজের প্রেক্ষিতে কতদূর বাস্তবসম্মত না কি কেবলই নাট্যকারের কল্পনা—তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। কেউ হয়ত বলতে পারেন এমন নাটক অভিনয় করার যৌক্তিকতা বা সার্থকতা কি? এ নাটক সমাজের কোন কাজে লাগবে? কিন্তু 'চারদুয়ার' নাটকে তিনি নারী পুরুষের প্রেম এবং বিবাহসংক্রান্ত কয়েকটি জটিল প্রশ্নের উত্থাপন করেছেন। সমাজের সরাসরি কাজে না লাগলেও প্রশ্নগুলো মানুষের কাজে লাগবে। আর, সমাজের প্রত্যক্ষ কাজে লাগতে হবে, শিল্পরচনার এমন কোনও শর্ত আছে কি? জীবনের কোনও দিক নিয়ে ভাবানোর দায়িত্ব পালনে এ নাট্যপ্রযোজনা সক্ষম হয়েছে বলেই তো মনে হয়। যদিও আরও বহুবিধ জ্বলন্ত সমস্যায় কন্টকিত সম্প্রতিকালের ভারতীয় সমাজের একটি সামান্য অংশই এ ভাবনার অংশীদার হতে সক্ষম। মেঘনাদ ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় এবং বিজয়লক্ষ্মী বর্মন (মা), মানসি সিনহা (বড় মেয়ে), মেঘনা লাহিড়ি (মেজ মেয়ে), মন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় (ছোট মেয়ে), সৌমেন মুখোপাধ্যায় (শ্রীকান্ত), পার্থ মুখোপাধ্যায় (প্রকাশ) এবং অর্পণ শর্মা (বীরেন্দ্র) -এর অভিনয়ে 'চারদুয়ার' একটি মনোযোগ দিয়ে দেখার মতো নাট্যকর্ম হয়ে উঠেছে। বিজয়লক্ষ্মী মায়ের চরিত্রে মনে রাখার মতো অভিনয় করেছেন। স্বাধীন চিন্তা-বুদ্ধির অধিকারিণী এক ব্যক্তিত্বময়ী নারীর ভূমিকা তাঁর হাঁটাচলা, তাকানো, দাঁড়ানো, কথাবলার ভঙ্গিমায় মঞ্চে জীবন্ত হয়েছে। তিনি যে জীবনে অনেক জটিলতা পেরিয়ে এসেছেন, বহু কিছু সহ্য করেও আজ সসম্মানে সমাজে বাস করছেন, তিনি যে 'অবিবাহিত' এ-কথা মনে রেখেও সমাজে নিজের স্থানটিকে হীন মনে করেন না—মায়ের চরিত্রের এ রকম অসাধারণত্ব তাঁর অভিনয়ে ফুটে উঠেছে। 'ফুটে উঠেছে' কথাটি বহুব্যবহৃত হলেও সেটিই প্রয়োগ করলাম।

পর্দা সরতেই মঞ্চ জুড়ে মায়ের বাড়ির বিশাল সেট দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিকল্পনা করেছেন দেবাশিস মজুমদার। বাবা আর জ্যেষ্ঠ জামাতাকে মঞ্চে প্রবেশ করতে দেখা যায় না। বাকিদের সংলাপে তাঁদের সম্বন্ধে জানা যায় কিন্তু দু'বার তাঁদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হওয়ার সময় তীব্র নাট্যমুহূর্তের সৃষ্টি হয় এবং অদৃশ্য পুরুষ দু'টির চরিত্র বেরিয়ে আসে। আমাদের সমাজগঠনে পুরুষতান্ত্রিকতার ধরনটি স্পষ্ট হয় এইভাবে। কিন্তু বোঝা মুশকিল হয়ে ওঠে এ রকম একজন ভিরু পুরুষের সঙ্গে 'মা' কেন বা কী উদ্দেশ্যে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন। ছোট মেয়ের জন্মদিনে কথা দিয়েও যিনি আসতে পারেন না, সবাই যখন তাঁর অপেক্ষায় বসে আছে তখন ফোনে জানিয়ে দেন তাঁর অপারগতা এইরকম একটি ভদ্র গৃহস্থ সামাজিক পুরুষের সঙ্গে এই পরিবারের সম্পর্কের ধরনটি এ নাটকে আরও কিছুটা উঠে এলে মায়ের চরিত্রটি আরও ব্যাপকতা পেত বলে মনে হয়।

অন্নদাশংকর রায় (১৯০৪-২০০২)

ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

গোদাবরীর তীরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের সাধ্য-নির্ধারক প্রশ্নোত্তর বৈষ্ণব সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। "এহো বাহ্য", "এহো বাহ্য" বলে এক এক করে রামানন্দকে শ্রীচৈতন্য সাধনার এক এক স্তর পার করে এগিয়ে দিচ্ছেন, প্রেমভক্তি থেকে দাস্য প্রেমে এসে শ্রীচৈতন্য তবু বললেন, "এহোত্তম আগে কহ আর"। তখন, "রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার।"

আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে যখন অন্নদাশংকর শান্তিনিকেতনে থাকতেন গৌরকিশোর ঘোষের সঙ্গে আমরা কয়েকজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। নানা রকম আলাপের মধ্যে গৌরকিশোর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু কী বলে আপনি মনে করেন?" অন্নদাশংকর এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে বললেন, "প্রেম। তার চেয়ে বড় আর কিছু নেই।"

আজ ওঁদের দুজনের কেউই নেই, কিন্তু আজও যদি অন্নদাশংকরকে গৌরকিশোর একই প্রশ্ন করতেন, অন্নদাশংকর একই উত্তর দিতেন বলে আমার ধারণা। এবং সে-প্রেম কেমন? সে-বিষয়েও তিনি কোনও সন্দেহের অবকাশ রাখেননি। কবেকার সেই "আগুন নিয়ে খেলা" থেকে শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর এই বিশ্বাস কোনওদিন এতটুকু টলেছিল বলে আমার জানা নেই, যে সে-প্রেম একান্তভাবে মানবিক, যদিও বৃহত্তম, মহত্তম অর্থে। " প্রেম ও বন্ধুতা" গ্রন্থে তিনি লিখেছেন "(গান্ধীজির) অহিংসা ও সত্য মেনে নিলেও, ব্রহ্মচর্য মেনে নিতে পারিনে।" মানুষকে প্রকৃতি যেমন ক্ষুধাগ্নি দিয়েছে তেমনি দিয়েছে অপর এক অগ্নি। কামাগ্নি। তাকে দমন করতে গেলে সে নানা ভাবে প্রতিশোধ নেয়। কায়িক ও মানসিক বিকার ও ব্যাধি ডেকে আনে। তার সাবলিমেশন সকলের সাধ্যায়ত্ত নয় .... আমি তাকে প্রেমের সঙ্গে সমন্বিত করার পক্ষপাতী।"

আবার এ বিষয়েও ভুল করবার যো নেই, তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, তাঁর রুচি, তাঁর মার্জিত পরিশীলিত আজন্ম লালিত নাগরিকোচিত স্বভাব, urbaneness তাঁকে অসংযমের হাত থেকে রক্ষা করে গেছে। তা ছাড়া শিল্পবোধ তো ছিলই, শিল্পী মানে রূপশিল্পী এবং এই প্রসঙ্গে বড় সুন্দর বলেছেন নলিনীকান্ত গুপ্ত তাঁর "অশ্লীল ও অসুন্দর" প্রবন্ধে : রস বাঁধন-হারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাহাতে অসুন্দর না হইয়া পড়ে সেই জন্যে পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে রূপ। আপনা-আপনি রস হইতেছে অরাজক, রূপ হইতেছে বিধি, ধর্ম।"

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা অন্নদাশংকরের একটি চিঠির এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। লন্ডন থেকে তিনি লিখছেন ('কল্লোলযুগ' বইয়ে চিঠিখানি আছে) : আপনার "বেদে" পড়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন সে কথা মোটের ওপর আমারও কথা। কিন্তু আমার মনে হয় মিথুনাশক্তি নিয়ে আরেকটু ব্যাপকভাবে ভাববার সময় এসেছে। হঠাৎ একই যুগে এতগুলো ছোট-বড়-মাঝারি লেখক মিথুনাশক্তিকে অত্যধিক প্রাধান্য দিতে গেল কেন? দেখে শুনে মনে হয় বিংশশতাব্দীর লেখকমাত্রই যেন Keats এর মত বলতে চায় "I felt like some watcher of the skies when a new planet swims into his ken." আলিবাবার সামনে যেন পাতালপুরীর দ্বার খুলে গেছে। "শোনো শোনো অমৃতের পুত্রগণ, আমি জেনেছি সেই দুর্বার প্রবৃত্তিকে, যে প্রবৃত্তি সকল কিছুকে জন্ম দেয় ... অসার এই সংসারে কেবল সেই প্রবৃত্তিই সার, অনিত্য এই জগতে কেবল সেই প্রবৃত্তিই নিত্য।"

অন্নদাশংকর আসলে ছিলেন লেখক, গল্প-উপন্যাসকার, শিল্পী। নিজের লেখকসত্তা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, তাঁর ওপরে সর্বাধিক প্রভাব রবীন্দ্রনাথ ও টলস্টয়ের। "রবীন্দ্রনাথের কাছে পাই বিচিত্রের প্রতি আকর্ষণ। সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ। টলস্টয়ের কাছে পাই এপিকের প্রতি আকর্ষণ। সত্যের প্রতি অনুরাগ"। তাঁর লেখক জীবনের কোন পর্বে কোন আকর্ষণ বেশি প্রবল ছিল কতটা প্রবল ছিল খুব নির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন, তবে মনে হয় প্রথম দিকে, যদিও একটু আবছা ভাবে তাঁর লেখার পিছনে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে কিংবা গল্পে চরিত্রনির্মাণ, অর্থাৎ লেখকের নিজের ভিতরের বস্তুকে objectify করা, সে একটা আর্ট। সে আর্ট অন্নদাশংকর পরে অনেকটা আয়ত্ত করেছিলেন, যদিও সব সময় যে নিজের ব্যক্তিত্বকে যথেষ্ট দূরে সরিয়ে রেখে তা করতে পেরেছিলেন কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

হয়ত তাঁর ভাবুকতা, (যদিও তাঁর নিজস্ব গদ্যরীতি জটিল, মিশ্র ভাবনার পক্ষে খুব সহায়ক ছিল না) তাঁর শিল্পকে, বিশেষ করে শেষ দিকে খর্ব করে থাকবে বলে মনে হয়। তবু সেই গদ্যরীতিই তাঁকে বাংলা সাহিত্যে অমর করে রাখবে।

কে জানে, মানুষের চিন্তার ধরন, যেমন তার গদ্যকে বিশেষ এক রূপ দান করে, তেমনই আবার সেই বিশেষ ধরনের গদ্য হয়ত তার চিন্তাকে কিছু একটা চরিত্র দান করে। অন্নদাশংকরের ভাষা অতিশয় স্বচ্ছ, ভাবনাও অতি স্বচ্ছ। অথচ তিনি স্পষ্ট বলেছেন, তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী, গান্ধীভক্ত, সেই সঙ্গে পশ্চিমের অনুরাগী, সেই সঙ্গে ইংরেজের সহযোগী। আরও কত কী।

হয়ত এখানে কোথাও কোথাও অস্বচ্ছতার একটা সম্ভাবনা ছিল, তিনি সে-সম্ভাবনা কাটিয়ে উঠেছেন। তাঁর গদ্যের গুণে? হতেও পারে।

[আগামী সংখ্যায় অন্নদাশংকরকে নিয়ে একাধিক বিশদ নিবন্ধ প্রকাশিত হবে - সম্পাদক]

সংকীর্ণতা নয়, উদার মানবিক ঐতিহ্যকে পাথেয় করেই আমরা এসেছি নতুন সহস্রাব্দে

‘চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির’

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, সত্যেন বসু, মেঘনাদ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, আলাউদ্দিন, উদয়শঙ্কর, নজরুল ইসলাম, লালন ফকির, নিবেদিতা, রোকেয়া, ঠাকুর পঞ্চানন, আব্বাসউদ্দিন, জীবনানন্দ, রামকিংকর, সত্যজিৎ, ঋত্বিক — এঁদের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার আমরাই বহন করে চলেছি। রাজ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিয়েছে। নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, প্রগতিশীল চেতনার উন্মেষসাধন, নিরক্ষরতা দূরীকরণে আন্তরিক প্রয়াস, মাতৃভাষার উপযুক্ত মর্যাদা দান, উৎকর্ষের সন্ধানে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা - এই উদ্যোগগুলি এক নতুন পরিমন্ডল সৃষ্টি করেছে। এই বাংলার জীবনযাত্রার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে চলচ্চিত্র, নাটক, সঙ্গীত ও নৃত্যকলা। রাজ্যের লেখক শিল্পী গায়ক অভিনেতা যাদুকরেরা সারা বিশ্বে আমন্ত্রণ পান তাঁদের শিল্পকলা প্রদর্শনের জন্য। কলকাতার বইমেলা আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত। রবীন্দ্রসদন, নন্দন, মধুসূদন মঞ্চ, গিরিশ মঞ্চ ও জেলায় জেলায় নানা মঞ্চ এবং বাংলা আকাডেমি, নাট্য আকাডেমি, সঙ্গীত আকাডেমি, চারুকলা পর্ষদ সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অপসংস্কৃতি রোধে ও গ্রামবাংলার লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে ও প্রসারে আমাদের প্রয়াস সর্বজনবিদিত। নতুন শতকে শিক্ষাব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের আরও উন্নতিকল্পে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিক্ষা ও সংস্কৃতি-এই বাংলার হৃদ্‌স্পন্দন

স্মারক নং ৪৯২৩/২০০২/তথ্য ও সংস্কৃতি

বিদ্যুৎ চুরি : জনগণের অবগতির জন্য

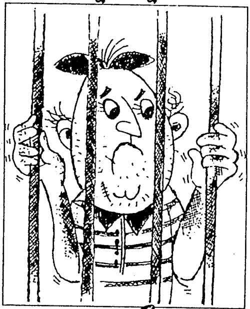

বিদ্যুৎ চোরেরা সাবধান

- বিদ্যুৎ চুরির সাজা এখন আরও কঠোর
- বিদ্যুৎ চোরেদের জন্য গঠিত হয়েছে বিশেষ আদালত এবং ইলেকট্রিসিটি প্রোটেকশন ফোর্স
- বিদ্যুৎ চুরি জামিন-অযোগ্য অপরাধ
- বিদ্যুৎ চুরির শাস্তি ৫ হাজার টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

বাংলা অনুবাদ শিশু ও কিশোর সাহিত্য

অবাবু খাঁর ছাগল (উর্দু) ৪০.০০
জাকির হোসেন
অনুবাদ : *পুষ্পিত মুখোপাধ্যায়*

অন্তরীক্ষে বিস্ফোরণ ৩৫.০০
(মরাঠী কল্পবিজ্ঞান)
জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার
অনুবাদ : *মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়*

বামন ফিরল না ৫৫.০০
(মরাঠী কল্পবিজ্ঞান)
জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার
অনুবাদ : সুব্রত বসু

শিকারায় বেড়াল ৩৫.০০
অনিতা দেশাই
অনুবাদ : *পম্পা পাল*

পায়রা উড়াল ৭০.০০
রাস্‌কিন বন্ড
অনুবাদ : *দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়*

গল্প শোনো (হিন্দি) ৩০.০০
বিষ্ণু প্রভাকর
অনুবাদ : *অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়*

রমন ও রাজা (ইংরেজি) ৩০.০০
কমলা লক্ষ্মণ
অনুবাদ : *অনির্বাণ রায়*

গোট্যার কীর্তি (মরাঠী) ৩৫.০০
এন. ডি. তামহনকর
অনুবাদ : *নীতা সেন-সমর্থ*

সাহিত্য অকাদেমি

জীবনতারা, ২৩এ/৪৪ একস্, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা ৭০০০৫৩, দূরভাষ ৪৭৮১৮০৬
প্রাপ্তিস্থান।। অকাদেমি দপ্তর, দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদার্স, উষা পাবলিশিং, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ইত্যাদি

List of Publications

Jadavpur University, Calcutta — 700 032, India

Phone : 473-4044

ENGLISH

W. B. Yeats : An Indian Approach (1968)
Dr. Naresh Guha Rs. 15.00

Shakespeare : A Book of Homage (1965)
Ed. Prof. S. C. Sengupta Rs. 10.00

The Idea of Revenge in Shakespeare (1969)
Dr. Jagannath Chakraborty Rs. 20.00

Shakespeare's Treatment of his sources in the Comedies (1971) — Dr. D. C. Biswas
Rs. 20.00

Shakespeare Appreciations (1974)
Prof. P.K. Guha Rs. 20.00

BENGALI

Kadambari O Gadyasahitye Silpabichar (1968)
Dr. Hrikshikesh Basu

কাদম্বরী ও গদ্যসাহিত্যে শিল্পবিচার (১৯৬৮)
ড. হৃষীকেশ বসু Rs. 15.00

Kalpanik Sangbadal (1963)
Dr. Madanmohan Goswami

কাল্পনিক সংবদল (১৯৬৩)
ড. মদনমোহন গোস্বামী Rs. 5.00

Manur Barnashramdharma (1970)
Late Hirendra Nath Dutta

মনুর বর্ণাশ্রমধর্ম (১৯৭০)
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত Rs. 15.00

Asutosh Choudhurir Prabandha Sankalan (1973) Ed. Debipada Bhattacharya

আশুতোষ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংকলন (১৯৭৩)
দেবীপদ ভট্টাচার্য Rs. 8.00

Rabindra Kabya Alankar (1971)
Dr. Jatadhari Malakar

রবীন্দ্রকাব্যে অলঙ্কার (১৯৭১)
ড. জটাধারী মালাকার Rs. 20.00

Bilati Jatra Thekey Swadeshi Theatre (1972)
Ed. Subir Roychoudhury

বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার (১৯৭২)
সম্পাঃ সুবীর রায়চৌধুরী (Out of Print) Rs. 4.50

রোমান্টিক ইশ্‌তেহার
ড. নারায়ণ মুখার্জী Rs. 20.00

PHILOSOPHY

Research Bulletin of Philosophy (1984)
Special issue Ed. Dr. S. K. Bhattacharya
Rs. 20.00

LIBRARY & INFORMATION SCIENCE

Librarian
Organ of the Department of Library and Information Science, Jadavpur University,
Vol. II, Juna 1985 Rs. 30.00

WITH BEST COMPLIMENTS :

"TO BUILD A BETTER TOMORROW D.T.M. OFFERS A WIDE RANGE OF CIVIL ENGINEERING AND DREDGING & DISILTING SERVICES UNDER ONE ROOF"

SPECIALISED IN THE CONSTRUCTION AND ERECTION OF :—

- MATERIAL HANDLING PLANTS
- LPG BOTTLING PLANTS
- 400 KV SUBSTATION & SWITCHYARD FOUNDATION
- MULTISTORIED BUILDING
- HOUSING COMPLEXES
- BRIDGE & ROADS
- FACTORY BUILDING & SHEDS
- GAS TURBINE PROJECTS
- MANUFACTURING OF PRE-STRESSED CONCRETE POLES
- DREDGING OF LAKES, CANALS, WATER RESERVOIR & RIVER BEDS
- HEAVY EQUIPMENTS FOUNDATION

D. T. M. CONSTRUCTION (INDIA) LIMITED

'CIVIL/STRUCTURAL ENGINEERS and MASTER DREDGERS'

Registered Office :

59B, CHOWRINGHEE ROAD, (3RD FLOOR)

CALCUTTA-700 020

PHONE : 240-3165, 240-3093

TELE FAX 240-4810

35 Years' Dedicated Service to the Nation

ENJOY

Arambagh's chicken

SERVED **FRESH-N-CHILLED**
WITHIN MINUTES OF YOUR ORDER
FROM ANY OF OUR EXCLUSIVE
COUNTERS AT CALCUTTA

ARAMBAGH HATCHERIES LIMITED

59B, CHOWRINGHEE ROAD, CALCUTTA-700 020
DIAL : 240-2179/2760/1930/0873. FAX : 91-332474137
Sales Offies.351 5037/350 3089

PSL UnIMcCann

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৬২ সংখ্যা ২ ১৪০৯

ভারতের বড় বড় নদীগুলির সংযুক্তিকরণের সর্বনাশা উদ্যোগ, প্রকৃতির মধ্যে জীবনপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখার বিস্ময়কর বিপুল আয়োজন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নামে 'খণ্ডিত বিজ্ঞান' কীভাবে সেই সুষম জীবনপ্রবাহের পথে সৃষ্টি করছে বিঘ্ন — এসব নিয়ে শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের তথ্যসমৃদ্ধ যুগান্তকারী সন্দর্ভ

স্বাভাবিক/অস্বাভাবিক, ঠিক/ বেঠিক, উচিত/অনুচিত, আইনি/ বেআইনি, ইত্যাদি কীভাবে 'নির্মাণ' ও নিয়ন্ত্রণ করে রাজনৈতিক ক্ষমতা — তাই নিয়ে নিবন্ধ 'হিংস্রতা নির্মাণ' — লিখেছেন অধ্যাপক শুভেন্দু দাশগুপ্ত।

বাংলা সংবাদপত্র জগতের অন্দরমহলের খবর, পঞ্চাশের দশকের যে চারজন সম্পাদক গড়ে তুলেছিলেন দৈনিক পত্র সম্পাদনার মান, তাঁদের সম্পর্কে প্রবীণ সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্তের ধারাবাহিক সন্দর্ভের প্রথম কিস্তি।

সেকুলার ভারতবর্ষ বলতে অন্নদাশঙ্কর রায় কী বুঝতেন, কেন তাঁকে বলব 'ক্রান্তদর্শী', তা নিয়ে যথাক্রমে আবদুর রাউফ ও পরিমল চক্রবর্তীর নিবন্ধ।

স্বাধীনতা সংগ্রামী দুই বিপ্লবী সহযোদ্ধা অনিলচন্দ্র ও লীলাবতী রায়ের অসাধারণ দাম্পত্যজীবনের বৃত্তান্ত নিয়ে ড. ঈশানী মুখোপাধ্যায়ের গবেষণামূলক নিবন্ধ।

উত্তরবঙ্গের ভাওইয়া গানের কাব্যসম্পদ, প্রসঙ্গ এবং কেন তার মূল উপজীব্য পরকীয়া — এ সবই আলোচনা করেছেন উত্তরবঙ্গের প্রবীণ কবি বেণু দত্তরায়।

সদ্যপ্রয়াত যাযাবর, বিজিতকুমার দত্ত ও পরিমল চক্রবর্তীর স্মরণে আলোচনা।

WITH BEST COMPLIMENTS :

"TO BUILD A BETTER TOMORROW D.T.M. OFFERS A WIDE RANGE OF CIVIL ENGINEERING AND DREDGING & DISILTING SERVICES UNDER ONE ROOF"

SPECIALISED IN THE CONSTRUCTION AND ERECTION OF :—

- MATERIAL HANDLING PLANTS
- LPG BOTTLING PLANTS
- 400 KV SUBSTATION & SWITCHYARD FOUNDATION
- MULTISTORIED BUILDING
- HOUSING COMPLEXES
- BRIDGE & ROADS
- FACTORY BUILDING & SHEDS
- GAS TURBINE PROJECTS
- MANUFACTURING OF PRE-STRESSED CONCRETE POLES
- DREDGING OF LAKES, CANALS, WATER RESERVOIR & RIVER BEDS
- HEAVY EQUIPMENTS FOUNDATION

D. T. M. CONSTRUCTION (INDIA) LIMITED

CIVIL/STRUCTURAL ENGINEERS and MASTER DREDGERS

Registered Office :

59B, (HOWRINGHEE ROAD, (3RD FLOOR)

CALCUTTA-700 020

PHONE : 240-3165, 240-3093

TELE FAX 240-4810

35 Years' Dedicated Service to the Nation

BENMILK

সমবায় ভিত্তিতে দোহ উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার আর্থ সামাজিক অগ্রগতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রাজ্যস্তরের একটি শীর্ষ সমবায় সংস্থা।

উজ্জ্বল ভূমিকা:-

*রাজ্যে "অপারেশন ফ্লাড" প্রকল্প রূপায়ণ

*রাজ্যে "মহিলা দুগ্ধ সমবায়" প্রকল্প রূপায়ণ

*রাজ্যে "সুসংহত দোহ উন্নয়ন" প্রকল্প রূপায়ণ

*কলকাতা মাদার ডেয়ারী পরিচালনা

*মেট্রো ডেয়ারী লিমিটেডের মুখ্য অংশীদারত্ব

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

*সংগঠিত জেলা দুগ্ধ সংঘের সংখ্যা- ১৪

*সংগঠিত গ্রামীণ দুগ্ধ সমবায় সমিতির সংখ্যা -২৪৩৭

*সমবায় সমূহের সদস্য সংখ্যা- ১,৭৩,৫৭০

*মহিলা সদস্য সংখ্যা ৪০,৬২৪

*দৈনিক গড় দুগ্ধ সংগ্রহের পরিমাণ- ৩,০০,২৮০কে.জি

স্বাদের ঐতিহ্য ও স্বাস্থ্যের আশ্বাসে ভরপূর

*বেন্‌স বাটার*কল্যাণী ঘি ও চকোলেট*মাদারডেয়ারী মিষ্টি দৈ.ইয়োগার্টওঘি

নিয়মিত খান ও খাওয়ান -স্বচ্ছন্দে, সানন্দে

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় দুগ্ধ উৎপাদক মহাসংঘ লিমিটেড

এল.বি-২, সেক্টর-৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯৮

দূরভাষ-২৩৩৫-২৮৫৪/২৮৬০/৪৮৪০ দূরবার্তা-২৩৩৫-২৮৯৬

wbidc

DESTINATION WEST BENGAL

শিল্পোদ্যোগের সব সমস্যার মুশকিল আসান

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের অর্থসাহায্য

- ✓ মাঝারি আকারের শিল্পগুলির জন্য প্রতিযোগিতামূলক হারে প্রকল্পগুলিতে ঋণদানের ব্যবস্থা
- ✓ বর্তমান লাভজনক সংস্থাগুলির জন্য যন্ত্রপাতি কেনার ব্যবস্থা
- ✓ বিল ডিসকাউন্টিং-এর সুবিধা
- ✓ শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলিকে স্বল্পমেয়াদী ঋণের সাহায্য
- ✓ নির্বাচিত প্রকল্পগুলিতে ইক্যুইটি অংশগ্রহণের ব্যবস্থা
- ✓ অ্যাডমিটেড ইক্যুইটি ক্লেমগুলির ক্ষেত্রে ব্রিজ লোনের ব্যবস্থা

শিল্পবন্ধু: লগ্নী বিকাশের কেন্দ্র

- ✓ সেক্রেটারিয়েট ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স এবং ফরেন ইনভেস্টমেন্ট প্রোমোশনাল বোর্ডের অনুমোদন
- ✓ ডিরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজ দ্বারা পঞ্জীকরণ
- ✓ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ছাড়পত্র
- ✓ বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত সব রকমের ছাড়পত্র
- ✓ জমির চিহ্নিতকরণ, বন্টন, মিউটেশন/পরিবর্তনের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত সুবিধা
- ✓ চিহ্নিত প্রকল্পগুলির গঠনে উপদেশদান এবং পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগম কর্তৃক উদ্ভাবিত সুনির্দিষ্ট বেশী প্রকল্পের ক্ষেত্রে সাহায্য প্রদান

আমাদের লক্ষ্য। আপনার সাফল্য।

WBIDC

West Bengal Industrial Development Corporation

Making things happen

Ph: (033) 210 5361-65 Fax: (033) 248 3737 E-mail: wbidc@vsnl.com Website: www.wbidc.com

Progress/WBIDC/2K

বর্ষ ৬২ সংখ্যা ২
মাঘ-চৈত্র ১৪০৯

হিংস্রতা নির্মাণ ❖ শুভেন্দু দাশগুপ্ত ১০৫

ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় ❖ সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত ১০৭

প্রয়াণের আগের দিন ❖ দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৪

কবিতা ❖ ১১৫-১২১

বিজয়া মুখোপাধ্যায় ❖ অজয় নাগ
মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ❖ অসীম রেজ ❖ সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত ❖ মলয় গোস্বামী

অন্নদাশঙ্কর রায়ের সেকুলার ভারতবর্ষ ❖ আবদুর রাউফ ১২২

ক্রান্তদর্শী অন্নদাশঙ্কর ❖ পরিমল চক্রবর্তী ১২৫

নদীসংযোগের সর্বনাশা প্ল্যান; প্রাণীহিতে উদার দাক্ষিণ্যের বিধান; ডারউইন তত্ত্বের একদেশদর্শিতা ও খণ্ডিত বিজ্ঞানের উৎপত্তি
শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ১২৮

গল্প

এ পরবাসে ❖ মীনাক্ষী ঘোষ ১৩৮

চতুর্থ অভিযোগ ❖ সু.সম্মুত্তিরম ১৪১

রক্তবিপ্লবে সপ্তপদী : অনিলচন্দ্র রায় ও লীলাবতী নাগ ❖ ঈশানী মুখোপাধ্যায় ১৪৪

বাংলার ভাওইয়া গান ❖ বেণু দত্তরায় ১৫৫

বিজ্ঞাপন জগৎ ও নারীসমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ❖ গার্গী চক্রবর্তী ১৬৩

গ্রন্থসমালোচনা ❖ ১৬৫-১৭৭

ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ❖ শ্যামলেন্দু রায় ❖ অমিতাভ চন্দ্র
পার্থ ঘোষ ❖ অজিত বাইরী ❖ হাসির মল্লিক ❖ মেঘ মুখোপাধ্যায়

চিত্র-সমালোচনা

নিজের মুখের ছবি ❖ সমীর ঘোষ ১৭৮

চলচ্চিত্র-সমালোচনা

অধৃষ্য কুমার ❖ মেঘ মুখোপাধ্যায় ১৮০

স্মরণে ❖ ১৮৭

যাযাবর ❖ বিজিতকুমার দত্ত ❖ পরিমল চক্রবর্তী

মূল্য: ১৫ টাকা
ডাকে: ১৮ টাকা
শিল্প পরিকল্পনা: রণেন আয়ন দত্ত

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ইম্প্রেশন হাউস, ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা - ৯
থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা — ১৩ থেকে প্রকাশিত
অক্ষর বিন্যাসে — নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা — ৬

দূরভাষ : ২২৩৭-৩৭৭০
সম্পাদক : আবদুর রাউফ

আমরা আর গরীব নই গো

''পঁচিশ বছর আগেকার কথা। শিবুর বাপ মরল। আমি শিবুর হাত ধরে গাছের তলায়। ঠাঁই নেই। চলে গেল একফালি ধানিজমিও, এভাবে চলল ক'বছর। তারপর এলো পঞ্চায়েতের লোকেরা, বলল, সরকার ধানিজমি দিচ্ছে। আমার শিবু তখন তেরো-চোদ্দয় পা দিয়েছে। ধানিজমি ফিরে পেয়ে মা বেটায় খুশিতে ডগমগ। শিবু লোন পেলো। কাজ পেলো। শিবুর বে হল। আমার নাতি এখন ইস্কুলে যায়। এ বি সি ডি পড়ে। আমরা আর গরীব নই গো। সরকারের লোকেরা আমাদের বড্ড উপকার করেছে।.... আহা', শিবুর বাপ যদি আজ বেঁচে থাকতো ...'।

পঞ্চমী দাসী
রাজচন্দ্রপুর, হাওড়া

মানুষের স্বার্থে,
মানুষের সঙ্গে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
স্মারক নং ১০১২/২০০৩/তথ্য ও সংস্কৃতি

With Best Compliments

From

EXIDE INDUSTRIES LIMITED

INDIA'S NO. 1

Storage Battery Company

India Moves on Exide

সাউথ অব পার্ক স্ট্রিটে

একমাত্র বাঙালি রেস্তোরাঁ

পারিজাত

অপেক্ষাকৃত ন্যায্য মূল্যে এখানে পাওয়া যায়
মাছ ও মাংসের বিচিত্র উপাদেয় খাদ্যসম্ভার
বিড়লা তারামণ্ডলের বিপরীতে মাত্র
কয়েক সেকেন্ডের পথ
থিয়েটার রোড ও চৌরঙ্গি রোডের সংযোগস্থল।

With Best Compliments from :

BA

Producer of Quality Tea

With tea estates located in the premium growing areas of Assam, B & A Teas have earned a reputation in India and abroad for its quality. Our teas will continue to be one of the finest and most sought after in India and abroad.

B & A Limited

Regd. Office : Rumini Nagar, G. S. Road, Guwahati – 781 006
Kolkata Office : 113 Park Street, 9th Floor, Kolkata – 700 016
Telephone No 22295098
Jorhat Office : Mahatma Gandhi Road, Jorhat – 785 001

আসুন গড়ি এক পরিচ্ছন্ন, সবুজ এবং সুন্দর কলকাতা

কলকাতা- আশা আর আনন্দের নগর, যেখানে স্বপ্ন প্রাণ পায়

কলকাতা- এক কোটিরও বেশি মানুষের যেখানে বসবাস

কলকাতা- তিনশো বছরেরও বেশি পুরোনো ইতিহাস যেখানে প্রাণ স্পন্দন

কলকাতা- শিল্প সংস্কৃতির পীঠস্থান, যেখানে দেশ, কালের সীমানা নেই

কলকাতা আমাদের আশা

আমাদের ভবিষ্যৎ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

স্মারক নং ১০১২/২০০৩/তথ্য ও সংস্কৃতি

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

২০০৩ কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত গ্রন্থ

শ্রদ্ধালেখমালা : সুকুমার সেন শতবর্ষ স্মারক সংকলন ১৫০ পবিত্র সরকার সম্পাদিত ○ সুকুমার সেন ৩০ অলোক রায় ○ গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ (বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়) ৫০ শঙ্খ ঘোষ ○ বাংলায় ভারতছাড়ো আন্দোলন ১৩০ অমলেন্দু দে ○ পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন ১৮০ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ○ সম্পর্ক : সম্প্রীতি বিষয়ক গল্প সংকলন ১৫০ বিষ্ণু বসু অশোককুমার মিত্র সম্পাদিত ○ বসন্তরঞ্জন রায় ৪০ শান্তি সিংহ ○ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ৩০ অরুণ মুখোপাধ্যায় ○ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হিন্দু পেট্রিয়ট ৯০ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ○ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৫০ বুদ্ধদেব দাস

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র

১০ম খণ্ড প্রকাশিত

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৬০

কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র

তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে

৫ খণ্ডে গ্রাহকমূল্য ৬০০

আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান ১৬০

আকাদেমি বানান অভিধান ৭০ পরিভাষা প্রশাসন (৩য় সং) ২৫

বাংলা বানানবিধি (৩য় সং) ৫ ভাষাতত্ত্বের পরিভাষা ১৮

সুভাষ ভট্টাচার্য সাঁওতালি-বাংলা সমশব্দ অভিধান ১০০ ক্ষুদিরাম দাস

সাহিত্যের শব্দার্থকোশ ৪০ সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০ ০২০
দূরভাষ ২২২৩-৯৭৮ ২৩৫৩-০৪০৭ ই-মেল bakademi@vsnl.com

স্মারক নং ১০৩২/২০০৩/তথ্য ও সংস্কৃতি

ধারাবাহিক সন্দর্ভ

ভাঙা পথের রাঙ্গা ধুলায়

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

দাঙ্গার ক্ষত তখনও কলকাতার বুকে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। দেশ বিভাগের পর উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় দাঙ্গা হয়ে গিয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে (পূর্ব বাংলা) এবং পশ্চিমবাংলার শিয়ালদা স্টেশনে তখন পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের আশ্রয়। ১৯৫০ এর দাঙ্গার মানসিক ও আর্থিক দুর্দৈব মাথায় নিয়ে অশোক দাশগুপ্তের (পরবর্তীকালে সমাজবাদী নেতা হিসাবে বিশেষ পরিচিতি পেয়েছিলেন) হাত ধরে 'লোকসেবক' পত্রিকা অফিসে প্রবেশ করলাম। সময়টা তখন ১৯৫০এর অক্টোবরের শেষ। বাংলার খাদি আন্দোলনের পুরোধা কুমিল্লা 'অভয় আশ্রম' গোষ্ঠীর নেতা জিতেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী তখন 'লোকসেবক' পত্রিকার সম্পাদক। কিন্তু পত্রিকাটি প্রকাশনার দায়িত্ব ছিল আই এন টি ইউ সির নেতা পঞ্চানন ভট্টাচার্যের ওপর। কিন্তু তাঁর প্রধান জীবিকা ছিল শিক্ষকতা। অশোকবাবু আমাকে পঞ্চানন ভট্টাচার্যের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, একবার পরীক্ষা করে দেখুন না কাজ চলবে কি না। পঞ্চাননবাবু চেয়ারের পিছনের আলমারি থেকে একটা মোটা বই বের করে পাতা উল্টিয়ে বইয়ের মাঝখানে চলে গেলেন। দুটো পাতা দেখিয়ে বললেন, এ দুটো পাতার বাংলা করো, এই কাগজ কলম ও ডিকশনারি রইল। বলেই পঞ্চাননবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বইটি ছিল জওহরলাল নেহরুর Glimpses of World History; তাতে Disarmament অর্থাৎ নিরস্ত্রীকরণের উপর নেহরুর বয়ান। এই ইংরেজি বয়ানের বাংলা করো। করতে হবে। চোখ মুখ কান গরম হয়ে উঠল। কেবল ক্রিয়াপদ ছাড়া নেহরুর ব্যবহৃত ইংরাজি শব্দগুলির প্রায় সবটাই আমার কাছে অপরিচিত। প্রায় ঘন্টাখানেক ধস্তাধস্তি করে একটা বাংলা তর্জমা দাঁড় করানো হল। অনেকক্ষণ বসে আছি। অবশেষে পঞ্চানন বাবু ঘরে ঢুকলেন। বললেন, কি, করে ফেলেছ? আমি ভীতভাবে বললাম, করেছি তো, কিন্তু কী দাঁড়িয়েছে জানি না। পঞ্চাননবাবু খুব দ্রুত চোখ বুলিয়ে বেশ কয়েকটি জায়গা 'আন্ডার লাইন' করে বেল বাজালেন। পিওনকে বললেন, শৈলেনবাবুকে ডাকো। শৈলেনবাবু এলেন। ধুতি হাফশার্ট পরা, চোখ দুটো খুব জ্বলজ্বলে। বিড়ি মুখে নিয়েই তিনি এলেন। শৈলেনবাবুর হাতে আমার বাংলা তর্জমা তুলে দিয়ে ওঁকে বললেন, খুব খারাপ হয়নি। মনে হয় চলবে। শৈলেনবাবু আমাকে নিয়ে নিউজ রুমে ঢুকলেন।

জীবনে এই প্রথম টেলিপ্রিন্টারের সঙ্গে শুভদৃষ্টি। শৈলেনবাবু অর্থাৎ শৈলেন রায় জন্মলগ্ন থেকেই 'লোকসেবক' পত্রিকার বার্তা সম্পাদক বা নিউজ এডিটর। দেশ বিভাগের আগে অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লিগের দৈনিক পত্রিকা 'আজাদ' এ দীর্ঘদিন কাজ করেছেন শৈলেনবাবু। অভিজ্ঞতা ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ এমন সাংবাদিক খুব বেশি তখন কলকাতায় ছিলেন না। এই শৈলেন রায়ের কাছে আমার হাতেখড়ি। টেলিপ্রিন্টারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মেসিন চলাকালীন কীভাবে দ্রুত শেষ হওয়া সংবাদ ছিঁড়ে নিতে হয়, কীভাবে সংবাদের শ্রেণীবিন্যাস করতে হয়, এ সব তাঁর কাছে শেখা। শৈলেনবাবু জীবনে কোনও বড় কাগজে চাকুরি পাননি। এটা তাঁর দুর্ভাগ্য। সে সময় তাঁর কাছে নিয়মিত আসতেন 'স্বাধীনতা'-র এক সময়কার বার্তা সম্পাদক সুকুমার মিত্র, 'গণবার্তা' সম্পাদক ননী ভট্টাচার্য (আর এস পির এবং পরবর্তীকালে রাজ্যের মন্ত্রী)। এ ছাড়া আর একজন আসতেন তিনি ছিলেন অদ্বৈত মল্লবর্মন। তিনি 'আনন্দবাজার' পত্রিকার কর্মী ছিলেন। ওই সময়ে তাঁর সাড়া জাগানো উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম' 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশ হচ্ছিল। তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। সম্ভবত ১৯৫১ সালেই। শৈলেনবাবু ও অদ্বৈতবাবু বাল্যবন্ধু। কুমিল্লার একই গ্রামের লোক, সে গ্রামের মধ্য দিয়ে তিতাস বয়ে গিয়েছে। শৈলেন রায়ের প্রসঙ্গে আবার পরে আসব।

'লোকসেবক' পত্রিকা নিয়ে বলা দরকার। পশ্চিমবাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে পদত্যাগ করলেন। ড. ঘোষের মন্ত্রীসভার বেশির ভাগ সদস্যই ছিলেন তখনকার কংগ্রেসের 'অভয় আশ্রম' গোষ্ঠীর। এদের মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য ছিলেন ড. ঘোষের অর্থমন্ত্রী অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরি। ড. ঘোষের মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর 'অভয় আশ্রম' গোষ্ঠীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের হুগলি-বর্ধমান-মেদিনীপুর গোষ্ঠীর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ল। এই সময় থেকে 'অভয় আশ্রম' গোষ্ঠীর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি, অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরিরা একটি পত্রিকা প্রকাশের কথা ভাবছিলেন। অবিভক্ত বাংলায় এই পত্রিকার বাড়িটি (৮৬এ লোয়ার সার্কুলার রোড) ছিল 'আজাদ' পত্রিকার অফিস। শুনেছি বাড়িটির আসল মালিক ছিলেন বগুড়ার নবাবেরা। তাঁদের কাছ থেকে বাড়িটি লিজ

প্রচারে ক্ষমতা নির্মিত স্বাভাবিকতা স্বীকার করিয়ে গ্রাহ্য করিয়ে মান্য করিয়ে নেওয়া হয়।

রাজনীতিক ক্ষমতা যাকে স্বাভাবিক বলে জনমানস তাকে স্বাভাবিক বলে মান্য করে। সামাজিক ক্ষমতা যাকে স্বাভাবিক বলে সাধারণ তাকে স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে, সাংস্কৃতিক ক্ষমতা যাকে স্বাভাবিক বলে সাধারণ তাকে স্বাভাবিক বলে গ্রাহ্য করে।

ক্ষমতা স্বাভাবিকতা নির্মাণ করে, স্বাভাবিকতার ধারণা, চিহ্ন, মাপ, সন্ধান করে, নির্মাণ করে, স্বাভাবিকতাকে প্রকাশ করে, প্রয়োগ করে। স্বাভাবিকতাকে মান্য করায় এবং এই নির্মাণ প্রকাশ প্রয়োগ ও মান্যতার মধ্য দিয়ে ক্ষমতা একটা কেন্দ্র তৈরি করে। ক্ষমতার কেন্দ্র। ক্ষমতাকেন্দ্র। ক্ষমতাকেন্দ্রের একটা চেহারা থাকে। ভৌগোলিক, রাজনীতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক।

স্বাভাবিক কেন্দ্র একটা অস্বাভাবিক প্রত্যন্ত বানায়। স্বাভাবিক কেন্দ্র তার অস্তিত্বের জন্য, অস্তিত্বের স্বীকৃতির জন্য অস্বাভাবিক প্রত্যন্ত নির্মাণ করে। অস্বাভাবিকতার অস্বীকৃতিতে স্বাভাবিকতার স্বীকৃতি। স্বাভাবিকতার আধিপত্য। কেন্দ্রের ক্ষমতা। প্রত্যন্তের নানা চেহারা। শারীরিক চেহারা বেঁটে, তোতলা, কানা, খোঁড়া, কালো। ভৌগোলিক চেহারা জঙ্গলবাসী, পর্বতবাসী, উপকূলবাসী, সীমান্তবাসী। সামাজিকভাবে উপজাতি সাংস্কৃতিক ভাবে অপরধর্মী, সংখ্যালঘু। রাজনীতিকভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী, সন্ত্রাসবাদী, সশস্ত্রসংগ্রামী।

কেন্দ্রের কাছে, ক্ষমতার কাছে, কেন্দ্রের ক্ষমতার স্বাভাবিকতার কাছে এই সব প্রত্যন্ত অস্বাভাবিক অতএব অস্বীকৃত, অগ্রাহ্য।

কেন্দ্র আর প্রত্যন্তের মধ্যে স্বাভাবিকতা আর অস্বাভাবিকতার মধ্যে এক দ্বৈত সম্বন্ধ। কেন্দ্রের প্রচেষ্টা থাকে কেন্দ্রের স্বাভাবিকতার মধ্যে প্রত্যন্তকে নিয়ে আসার তার অস্বাভাবিকতা পরিত্যাগ করে। অথবা প্রত্যন্তের অস্বাভাবিকতাকে দমন করা সন্ত্রাস দিয়ে হিংস্রতা দিয়ে।

এই হিংস্রতা কখনও প্রত্যক্ষ, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, দলীয় হিংস্রতা, শারীরিক হিংস্রতা, আইনি সন্ত্রাস। হিংস্রতা কখনও পরোক্ষ, সামাজিক হিংস্রতা, সাংস্কৃতিক হিংস্রতা, বিদ্বেষ, ঘৃণা।

কেন্দ্রের প্রকল্প কেন্দ্রের তৈরি স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠা। এই স্বাভাবিকতাকে ক্ষমতা করে তোলা। স্বাভাবিকতার আধিপত্য বিস্তার করা। এই স্বাভাবিকতাকেই একমাত্র অস্তিত্ব করা তোলা। একটি অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করা। একমাত্র করে তোলা। অন্য সব অস্তিত্বকে অস্বাভাবিক প্রতিপন্ন করা। অস্বীকার করা। অস্বীকার প্রত্যক্ষ হতে পারে আইন দিয়ে রীতি দিয়ে নীতি দিয়ে। অস্বীকার পরোক্ষ হতে পারে ঘৃণা দিয়ে বিদ্বেষ দিয়ে নিন্দা দিয়ে। এই অস্বীকার চেহারা নেয় হিংস্রতার। প্রত্যক্ষ হিংস্রতা রাষ্ট্রীয় হিংস্রতা, দলীয় হিংস্রতা, সাম্প্রদায়িক হিংস্রতা, গোষ্ঠী হিংস্রতা। পরোক্ষ হিংস্রতা সাংস্কৃতিক হিংস্রতা, সামাজিক হিংস্রতা, মানসিক হিংস্রতা। হিংস্রতার এই প্রকল্পে সহায়তা আসে ইতিহাস থেকে, শরীর বিজ্ঞান থেকে, ভুগোল থেকে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে, সমাজতত্ত্ব থেকে, সাহিত্য থেকে, সংস্কৃতি থেকে। এই সব বিষয় স্বাভাবিক নির্মাণকে, ক্ষমতাকে, কেন্দ্রকে, হিংস্রতাকে রসদ যোগায়।

আবার এই সব বিষয়ই বিরোধিতা করতে পারে কেন্দ্রকে, কেন্দ্রের ক্ষমতাকে, ক্ষমতার কেন্দ্রনির্মিত স্বাভাবিকতাকে, স্বাভাবিকতার হিংস্রতাকে। দাঁড়াতে পারে অস্বাভাবিকতার পাশে, প্রত্যন্তের পাশে। বহুত্বের পাশে, অহিংস্রতার পাশে।

এই প্রকল্প তৃতীয়ভুমির। রাষ্ট্র আর প্রশাসনের প্রথমভুমির নয়। রাজনীতিক দলের দ্বিতীয়ভুমির নয়। প্রথম ভুমি আর দ্বিতীয় ভুমির স্বার্থে স্বাভাবিকতা বানানো, ক্ষমতা বানানো, কেন্দ্র বানানো, এক বানানো। এই স্বার্থের বাইরে তৃতীয় ভুমির প্রকল্প। আমাদের প্রকল্প তৃতীয় ভুমি নির্মাণ।

এই ভাবনার প্রথম আংশিক প্রকাশ : অনুপ ধর, শুভেন্দু দাশগুপ্ত, 'ক্ষমতার স্বাভাবিকতা অধিকারের স্বাভাবিকতা', *মানবাধিকার সনদের ৫০ বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*। মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ, কলকাতা।

প্রথম উচ্চারণ : পশ্চিমবঙ্গ সমাজ বিজ্ঞান কংগ্রেস, হুগলি মহসিন কলেজ, নভেম্বর ২০০২

দ্বিতীয় উচ্চারণ : রিফ্রেশার কোর্স, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ২০০২

প্রবন্ধ

হিংস্রতা নির্মাণ

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

এই ভাবনার চেহারাটা তৈরি হয়েছিল বেশ কয়েকবছর আগে। আমরা কয়েকজন অধিকার আন্দোলনের কর্মী, সঙ্গে ছিলেন জনাকয়েক চিকিৎসাবিজ্ঞানী বন্ধু, মানবসমাজের কয়েকটা অংশের বাসিন্দাদের অধিকার নিয়ে আলোচনা করছিলাম। হিজড়া, যৌনকর্মী, পাগল, ভবঘুরে, প্রতিবন্ধী, সমকামী এমন সব মানুষজনের অধিকার না পাওয়া নিয়ে। এই সব মানুষরা চিহ্নিত অস্বাভাবিক বলে। এদের যদি অস্বাভাবিক বলা হয় তা হলে কোথাও একটা 'স্বাভাবিক', বা অনেকগুলো 'স্বাভাবিক' আছে। আর সেই 'স্বাভাবিক'টা বা 'স্বাভাবিক'গুলো কেউ না কেউ বানিয়েছে, ঠিক করেছে, কোনটা স্বাভাবিক কোনটা অস্বাভাবিক। যেমন মানুষের শরীর হয় নারী অথবা পুরুষ, এ দুটোর কোনও একটা হলে সেটা স্বাভাবিক। এই দুটোর কোনওটাই না হলে অস্বাভাবিক। হিজড়া অস্বাভাবিক। আমাদের, একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অসংখ্যবার নানা কাজে নানা জায়গায় লিখিতভাবে জানাতে হয় আমি নারী না পুরুষ। দুটো মাত্র খোপ থাকে, কলমের দাগে জানিয়ে দিতে হয় আমি কোন খোপে। আমি তো এ দুটোর কোনওটাই না হতে পারি। আমার জন্য তৃতীয় কোনও খোপ নেই। আমি অস্বাভাবিক। আমি হিজড়া। আমি বাতিল। মানুষের এই বর্গে স্বাভাবিকতা অস্বাভাবিকতা নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে।

একজন মানুষ কীভাবে ভাববে, কী ভাববে, কীভাবে চলবে, কথা বলবে, তাকাবে, আচরণ করবে সেটা ঠিক করা আছে, অন্য রকম করলেই বেঠিক, বেচাল, সে অস্বাভাবিক, সে পাগল, তার জায়গা সমাজে নয়, পাগলাগারদে।

সব মানুষেরই কোনও না কোনও কাজ করা উচিত। কেজো মানুষ হওয়া উচিত। কোথাও থিতু হওয়া উচিত। যে বা যারা এমন উচিতের মধ্যে নেই, কাজ করতে চায় না, থিতু হতে চায় না, তারা অস্বাভারিক, ভবঘুরে। তাদের সমাজে থাকতে দেওয়া যায় না। তাদের জন্য ভবঘুরে আইন। সেই আইনে পাকড়াও করে ভবঘুরে নিবাসে পাঠিয়ে দেওয়া।

নারী ও পুরুষ বিপরীত লিঙ্গের মধ্যে যৌনতা স্বাভাবিক, দু'জন নারীর মধ্যে, দু'জন পুরুষের মধ্যে, একই লিঙ্গের মধ্যে যৌনতা অস্বাভাবিক, নিন্দনীয়, অসামাজিক এবং বেআইনি।

এই রকম এই রকম আরও অনেক।

স্বাভাবিকতা নির্মিত হয়। স্বাভাবিকতার বিপরীতে অস্বাভাবিকতা নির্ধারিত হয়। স্বাভাবিকতা নির্মাণ করার জন্য ধারণা, চিহ্ন, মাপ নির্মিত হয়, স্বীকৃত হয়, পালিত হয়।

স্বাভাবিকতা নির্মাণ করে রাষ্ট্র, নির্মাণ করে সমাজ। নির্মাণ করে ক্ষমতা—রাজনীতিক ক্ষমতা, প্রশাসনিক ক্ষমতা, সামাজিক ক্ষমতা, সাংস্কৃতিক ক্ষমতা।

স্বাভাবিকতা নির্মাণে উপাদান এবং সূত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় বিজ্ঞান, শরীর বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, সংখ্যাবিজ্ঞান এবং এইসব উপাদান এবং সূত্র ব্যবহার করা হয় ক্ষমতার সুবিধা অনুযায়ী। সেই সব তথ্য যা ক্ষমতার কাজে লাগে, সেই সব তত্ত্ব যা ক্ষমতার পাশে দাঁড়ায়, প্রয়োজনে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা বদলায়, ইতিহাসের তথ্য পরিবর্তিত হয়, সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণ পুনর্নির্মিত হয়, সংখ্যাবিজ্ঞানের অঙ্ক নতুনভাবে পরিবেশিত হয়।

ক্ষমতা স্বাভাবিকতা নির্মাণ করে, ক্ষমতা স্বাভাবিকতা মানিয়ে নেয়। ক্ষমতা স্বাভাবিকতার মাপ, চিহ্ন, ধারণা নির্মাণ করে। ক্ষমতা স্বাভাবিকতার মাপ, চিহ্ন, ধারণা মানিয়ে নেয়।

স্বাভাবিকতা প্রকাশিত হয় রীতি, নীতি, আইনে, মূল্যবোধে। সরকারি আইন, সামাজিক রীতি, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ। প্রশাসনিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষমতা তৈরি হল। তৈরি করে মানিয়ে নেবার পালা।

ক্ষমতানিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় পাঠ্যসূচিতে, পাঠ্যপুস্তকে, সাংস্কৃতিক মাধ্যমে, সামাজিক প্রকাশে, প্রশাসনিক অনুদানে, রাজনীতিক

নিয়েছিলেন মৌলানা আক্রম খাঁ ('আজাদ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক)। ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে 'আজাদ' পত্রিকা ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে ড. প্রফুল্ল ঘোষের উদ্যোগে বাড়িটি কেনা বা লিজ নেওয়ার ব্যবস্থা হয়। গান্ধীজি নিহত হওয়ার আগে কংগ্রেস সংগঠনের অবলুপ্তি ঘটিয়ে 'লোকসেবক সংঘ' নামে যে সংগঠন গড়ে তুলতে চাইছিলেন, তা থেকেই 'লোকসেবক' নামটি অনুসৃত। এই সময় 'লোকসেবক' ট্রাস্ট গঠন করে পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। 'লোকসেবক' পত্রিকা প্রকাশের শুরু থেকেই সরকারবিরোধী খবরের কাগজ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী অর্থাৎ ড. প্রফুল্ল ঘোষ, ডা. সুরেশ ব্যানার্জি ও অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরিদের মতো শ্রদ্ধেয় জননেতা এবং ত্যাগী ও নিস্বার্থ ব্যক্তিরা এই পত্রিকার কর্ণধার থাকায় অসংখ্য নির্ভুল ও প্রামাণ্য দলিল সহ সংবাদ এই পত্রিকাটির গোচরে আনা হত। 'লোকসেবক' পত্রিকার তিনটি খুব বড় সংবাদ এই রাজ্যকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছিল। এই সংবাদগুলির প্রথমটি হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার 'ফটোস্টাট' সহ সংবাদ। এর ফলে তখনকার উপাচার্য ড. প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। এরপর কলকাতার প্রথম শিল্পমেলার জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহের দুর্নীতির অভিযোগ। এই শিল্পমেলার সংগঠক ছিলেন স্বাধীনতাসংগ্রামী জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী। জ্ঞানাঞ্জনবাবু মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায়ের বাল্যবন্ধু। তিনি বেশির ভাগ সময়ে বিধানবাবুর বাড়িতে থাকতেন। তিনি শিল্পমেলার স্মারক গ্রন্থে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য বিধানবাবুর 'লেটারহেড'-এ একজন শিল্পপতিকে চিঠি লিখেছিলেন। ওই চিঠিটির 'ফটোস্টাট' 'লোকসেবক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই নিয়ে বিধানসভায় সে সময় তোলপাড় হয়েছিল। ঘটনাটি ওই পত্রিকায় প্রকাশের পর বিধানবাবু 'লোকসেবক' পত্রিকার কর্ণধার অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। পরে অন্নদাবাবু তাঁর রিপোর্টারদের বলেছিলেন, ডা. রায় আমাকে বললেন, 'শোনো অন্নদা এটা ঠিক যে জ্ঞানাঞ্জন মোটেই কাজটা ভাল করেনি। কিন্তু আমি ওকে এ নিয়ে গালমন্দ করতে পারব না। এর কারণটা তোমায় বলছি, জ্ঞানাঞ্জন শৈশব থেকে মাতৃহারা। আমার মা ওকে মানুষ করেছেন। মাকে মাঝখানে রেখে আমি ও জ্ঞানাঞ্জন দু'পাশে শুতাম। আমরা দুজনে মারামারি করে মাতৃদুগ্ধ পান করতাম। জ্ঞানাঞ্জন আমার কাছে এলে আমার মাকে খুব মনে পড়ে যায়'। ড. রায়ের এই কথা শুনে অন্নদাবাবু তাঁকে কথা দিয়েছিলেন যে তিনি এই ব্যাপারে রিপোর্টারদের আর কিছু লিখতে বলবেন না।

এর পরের ঘটনাটি হল, বিখ্যাত অধ্যাপক ঐতিহাসিক এবং কাব্যময় বাংলা গদ্যের অন্যতম সুলেখক ড. নীহাররঞ্জন রায়কে নিয়ে। নীহারবাবু ১৯৪৯ সালের কোনও এক সময়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে আমেরিকা গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি তাঁর এক সুরূপা প্রিয় ছাত্রীকে এক দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। পত্রটিতে ছিল আগাগোড়া ভালবাসার কথা। কিন্তু তা ছিল অসাধারণ কাব্যময় প্রেমপত্র। ছাত্রীকে ভালবাসার প্রশ্নে তাঁর বিরুদ্ধে নৈতিকতার প্রশ্ন ওঠে। 'লোকসেবক' নীহাররঞ্জন রায়ের লেখা ওই পুরো চিঠিটি ছেপে দেয়। বিধানসভা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সিন্ডিকেটে তোলপাড়। সেনেটে ড. নীহাররঞ্জন রায়কে ভর্ৎসনা করে প্রস্তাব গৃহীত হল। এই ভর্ৎসনার জন্য অসাধারণ প্রতিভাময় অধ্যাপক মধুর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতে পারলেন না।

নভেম্বর মাসের (১৯৫০) শেষে অথবা ডিসেম্বরের গোড়ায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য মশাই আমাকে বার্তা বিভাগ থেকে ডেকে পাঠালেন। আমি ওঁর ঘরে ঢুকে দাঁড়াতেই উনি বসতে বললেন। আমাকে বললেন, আমার ঘরে ঢোকার দরজার দু'পাশে দুটো বড় বাকসো দেখতে পাচ্ছ তো? আমি বললাম, হ্যাঁ, দেখেছি। উনি বললেন, ওর একটা লেখায়, 'লোকসেবক ট্রাস্ট' আর একটাতে আমি যে ট্রেড ইউনিয়নের সেক্রেটারি তার নাম লেখা। আমি বললাম, তাও দেখেছি। পঞ্চাননবাবু বললেন, ওই দু'টো বাকসোতেই চাঁদা সংগ্রহ করা হয়। লোকসেবক ট্রাস্ট নামাঙ্কিত বাকসে যে টাকা লোকেরা দান করে যায় তা লোকসেবক পত্রিকা পরিচালনার জন্য খরচ করা হয়ে থাকে। আর অন্যটায় আমার ইউনিয়ন চালানোর খরচ। সুতরাং তুমি বুঝতে পারছ আমাদের টাকার জোর খুব একটা নেই। কিন্তু তোমাকে তো কিছু পয়সা দিতে হবে। বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমিও নিরুত্তর। পরে একটু থেমে উনি বললেন, তোমাকে ১৮ টাকা করে দেব এবং প্রতিমাসে ঠিক সময়ে পাবে কি না তাও অনিশ্চিত। তখন আমি খানিকটা হেসে ফেললাম। বললাম, ঠিক আছে। কিন্তু যে ১১ মাস লোকসেবকে কাজ করেছি তাতে আমার প্রায়শই মনে হয়েছে যে পঞ্চাননবাবু কী হিসাবে ১৮ টাকা ঠিক করলেন। ওটা ১৫ হতে পারত বা ২০ টাকা হতে পারত।

সম্ভবত ওই নভেম্বরেই ডা. সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি এবং ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে প্রথম ভাঙন হল। একদিন সন্ধেবেলায় অফিসে ঢোকার মুখে দেখি লোকে লোকারণ্য। এত ভিড় যে অফিসের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকতে লোককে ধাক্কা মারতে হচ্ছে। ওই ভিড় ঠেলতে ঠেলতে দেখতে পেলাম সুরেশ ব্যানার্জি ও প্রফুল্ল ঘোষ দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন। তাঁদের পেছনে দেবেন সেন, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়, মেদিনীপুরের প্রখ্যাত বিপ্লবী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। আমি বার্তা বিভাগে ঢুকে জিজ্ঞেস করলাম—কী ব্যাপার? এত ভিড় কেন? তখন যারা বার্তা বিভাগে ছিলেন বললেন, এঁরা তো কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে

এসে নতুন পার্টি করলেন গো। রাত্রি ৮টার পর পঞ্চাননবাবুর ঘরে বার্তা সম্পাদক শৈলেনবাবু ও চিফ রিপোর্টার অজিত চক্রবর্তীর ডাক পড়ল। ঘন্টাখানেক পরে শৈলেনবাবু অজিত বাবুকে সঙ্গে নিয়ে বার্তা বিভাগে এলেন। তার ঠিক একটু পরেই অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরি মশাই বার্তা বিভাগে প্রবেশ করলেন। তিনি শৈলেনবাবুকে বললেন, ব্যানার হেডলাইন-ই করে দেবেন। একবার যদি আমাকে দেখিয়ে নেন। এই বলে চলে গেলেন। পরের দিন যথারীতি কংগ্রেসের এই ভাঙনের খবর কলকাতার সব কাগজে বের হল। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা এই নতুন পার্টির নাম হল কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি, সংক্ষেপে কে এম পি পি। তখনও প্রদেশ কংগ্রেসের অফিস ছিল ঠিক মৌলালির মোড়ে উত্তর পশ্চিম কোণার বড় বাড়িটিতে। নতুন পার্টির জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকসেবক পত্রিকা নিশ্চিতভাবেই বিরোধী দলের মুখপত্রের মর্যাদা পেল।

বার্তা সম্পাদক শৈলেনবাবু ছাড়া বার্তা বিভাগে সকল কর্মী ছিলেন পার্ট টাইমার। এঁরা কেউই বিকেল ৪টে ৫টার আগে আসতেন না। এই পার্টটাইমারদের বেশির ভাগই স্কুল শিক্ষক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। অল্প কয়েকজন সরকারি কর্মচারিও ছিলেন। এই পত্রিকায় আমার ১১ মাসের শিক্ষানবিশী কালের মধ্যে বার্তা সম্পাদককে বাদ দিয়ে আর যে দু'জন লোক আজও আমার মনের খুব বড় আসনে রয়েছেন তাঁদের একজন সে সময়কার কলকাতার সবচেয়ে নামকরা ক্রীড়া সম্পাদক পরেশ নন্দী এবং আর একজন সত্যানন্দ ভট্টাচার্য। সত্যানন্দবাবু পঞ্চাননবাবুর ছোট ভাই। দাদার মতো তিনিও স্বাধীনতাসংগ্রামী। ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে বেশ কয়েকবছর কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। ভয়ানক কমিউনিস্ট বিরোধী। পরবর্তী কালে অবশ্য তিনি সিপি আই এম দলের ও নকশালপন্থী হিসাবে কলকাতার রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। কিন্তু সত্যানন্দবাবুর সংবাদপত্র থেকে চলে যাওয়া আমার অভিজ্ঞতায় এক অপূরণীয় ক্ষতি। এত চমৎকার হেডিং করতেন এবং ইংরেজি শব্দের নতুন নতুন বাংলা প্রতিশব্দ সৃষ্টির এক অসাধারণ মুন্সিয়ানা ছিল তাঁর। সেই সময়কার সংবাদ জগতে মালয়েশিয়ার জঙ্গলে একটি যুবতী মেয়েকে পাওয়ার ঘটনা সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কোনও এক সময়ে ওই কিশোরী কীভাবে জঙ্গলে বসবাসকারী আদিবাসী উপজাতিদের মধ্যে এসে পড়ল তা ছিল রহস্যাবৃত। কিন্তু ব্রিটিশ গোর্খা বাহিনী মালয়েশিয়ার জঙ্গলে কমিউনিস্ট উৎখাত অভিযানের সময়ে মেয়েটিকে খুঁজে পায়। মেয়েটির বয়স তখন ১৮ থেকে ২০'র মধ্যে। এক ধরনের গাছের ছাল ছিল তার বস্ত্রসম্ভার। ইংরেজি কাগজগুলো তাকে 'জাঙ্গল গার্ল' বলে অভিহিত করল। কলকাতার দু'টি বড় বাংলা সংবাদপত্র জাঙ্গলগার্ল-এর কোনও বাংলা প্রতিশব্দ বের না করে তাকে ওই 'জাঙ্গলগার্ল' বলেই উল্লেখ করছিল। কিন্তু সত্যানন্দদা একদিন আমাকে বললেন, ধুত্তোর, তুই 'বনবালা' লেখ। জাঙ্গলগার্ল লিখবি না। এই প্রতিশব্দটা খুব খাঁটি। কয়েকদিন পরে অন্যান্য বাংলা সংবাদপত্রগুলিও সত্যানন্দদার বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে শুরু করে দিল। সত্যানন্দদার একটি গুণ ছিল, তখনকার দিনে নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রীদের গলার স্বর নকল করা। সত্যানন্দদার পারমানেন্ট নাইট ডিউটি ছিল। রাত দেড়টা নাগাদ পেজ মেকাপ শেষ করে শিশির ভাদুড়ির কণ্ঠে আলমগীরের পার্ট করতেন—ভুল ভুল দিলির.........। কখনও ছবি বিশ্বাস, কখনও অহীন্দ্র চৌধুরি, কখনও নির্মলেন্দু লাহিড়ি, এবং আশ্চর্যজনকভাবে রানিবালার কণ্ঠস্বরও নকল করতেন। আলমগীর নাটকে একটি গান আছে যেটি রানিবালার কণ্ঠে গীত হত — 'নয়নের কোণে একটি বিন্দু এ ঝরে........'। সত্যানন্দদা গানটি নকল করে রানিবালার কণ্ঠে-ই গাইতেন। এরপর পরেশদার কথা বলি। পরেশদা ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্সে কাজ করতেন। ইউনাইটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বিধুভূষণ সেনগুপ্তের শ্যালক। পরেশদা 'দ্য নেশন' পত্রিকার (শরৎ বসু প্রতিষ্ঠিত) ক্রীড়াসম্পাদক ছিলেন। নেশন পত্রিকাটি উঠে যাওয়ার পর তিনি 'লোকসেবক' পত্রিকায় যোগ দেন। খেলার রিপোর্ট ইংরাজি এবং বাংলায় এমন সাবলীল লেখার ক্ষমতা সম্ভবত তখন আর কারুর ছিল না। তিনি লখনউ-এর 'ন্যাশনাল হেরল্ড' এবং হায়দরাবাদের 'ডেকান হেরল্ডে'র কলকাতা সংবাদদাতাও ছিলেন। প্রচণ্ড রসিক ছিলেন। খুব শৌখিন পোশাকে থাকতেন। মাথাভর্তি সাদা চুল। ঘরে ঢোকার আগেই চুরুটের গন্ধেই আমরা বুঝতে পারতাম পরেশদা আসছেন। পরেশদার দু'টি মেয়ে ছিল। তাদের বয়স তখন ১৬ থেকে ১৮'র মধ্যে। তিনি মেয়ে দু'টিকে বার্তা বিভাগে এনে প্রায়শই আমাকে বলতেন, দ্যাখ, কোনটাকে তোর পছন্দ হয়। মেয়েরা বাবার সঙ্গে রাগারাগি করে অফিস থেকে চলে যেত। পরেশদা এন্টালিতে 'লোকসেবক' অফিসের কাছাকাছি থাকতেন। আমার সম্পর্কে ওঁর একটা ধারণা হয়েছিল, আমি যদি খবরের কাগজ থেকে না চলে যাই তা হলে আমার খুব নাম-ডাক হবে। ১৯৫৪ সালে ইনস্যুরেন্সে জাতীয়করণ হওয়ার পর পরেশদা এল আই সি'র একটি উচ্চপদ নিয়ে বোম্বাই চলে যান। ফলে সংবাদপত্রজগৎ থেকে তাঁর বিদায় ঘটল। সত্তর দশকের শেষ দিকে অবসর নেওয়ার আগে কলকাতার এল আই সি'র আর একটি উচ্চপদ নিয়ে তিনি চলে আসেন। তখন আমি আনন্দবাজারে কাজ করি। পরেশদা খুঁজে খুঁজে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। এসেই আমাকে বললেন, তোকে অনেকদিন ধরে খুঁজছি। তুই যুগান্তর থেকে কবে চলে এসেছিস জানি না। আমি আগেই বলেছিলাম না খবরের কাগজে তোর খুব নামডাক হবে। পরেশদার সঙ্গে সেই শেষ দেখা।

ওই সময়টা অর্থাৎ পঞ্চাশের যুগে কলকাতার খবরের কাগজগুলোর পরিকাঠামোতে বার্তা সম্পাদকের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ছিল অনেকখানি। চিফ রিপোর্টারের পদটিও ছিল কিন্তু তার ক্ষমতা এখনকার মতো মোটেই ছিল না। বার্তা সম্পাদক ইচ্ছে করলে চিফ রিপোর্টারকে না জানিয়ে যে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন এবং যে কোনও রিপোর্টারকে যে কোনও জায়গায় রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য পাঠাতে পারতেন। লোকসেবক পত্রিকায়ও এর ব্যতিক্রম ছিল না। কলকাতায় তখনও শীত পড়েনি। তবে অপরাহ্নের রোদে বাঁকাভাব এসে গেছে। এ রকম একটা দিনের শেষে পঞ্চাননবাবু বার্তা বিভাগে এসে বার্তা সম্পাদক শৈলেনবাবুকে একটা চিঠি দিয়ে বললেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বসিরহাটে যাচ্ছেন, একজন রিপোর্টার পাঠাতে অনুরোধ করেছেন, ওরাই নিয়ে যাবে। যে কোনও একজনকে পাঠিয়ে দিন। তবে রিপোর্ট কিন্তু বড় হবে না। পাঁচ-সাত লাইন হবে। বলে চলে গেলেন। শৈলেনবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাবে নাকি?' আমি বললাম, যদি যেতে বলেন যাব। ঠিক ছিল সকাল আটটায় শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে কালিমন্দিরের সামনে শ্যামাপ্রসাদবাবু আসবেন, ওখান থেকে তাঁর লোকেরা রিপোর্টারদের গাড়িতে তুলে নেবেন। নির্দিষ্ট সময়ে ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। গিয়ে দেখা যায় আমার আগেই হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ডের রিপোর্টার সুনীল বোস এবং যুগান্তরের প্রফুল্ল গাঙ্গুলি অপেক্ষা করছেন। ওঁদের মুখচেনা ছিল। পরিচয় দেওয়াতে ওঁরা আমাকে প্রথমেই 'তুমি' বলে সম্বোধন করে আমাকে অনেকটা 'আপন' করে নিলেন। এই সুনীল বোস পরবর্তীকালে আনন্দবাজার পত্রিকায় আমার চিফ রিপোর্টার হয়েছিলেন। প্রফুল্ল গাঙ্গুলিকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল এঁকে আমি আগে কোথায় দেখেছি। আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম — আপনি কি কখনও দেশভাগের আগে খুলনা শহরে গিয়েছিলেন, বক্তৃতা করেছিলেন? প্রফুল্ল সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, যার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে আছি তার সঙ্গে ১৯৪৭ সালে মে-জুন মাসে খুলনায় গিয়েছিলাম। তখন আমি প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভায় অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি। এই বলে প্রফুল্ল থামলেন। আমি তখন বললাম, গান্ধী পার্কে আপনি বক্তৃতা করেছিলেন। প্রফুল্ল আবার হেসে বললেন, আমি এখন অন্যের বক্তৃতা লিখি। নির্দিষ্ট সময়ে শ্যামাপ্রসাদবাবু এলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন, চার ফুট দৈর্ঘের মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক। তাঁর হাতে সুবৃহৎ সাইজের দুটি টিফিন ক্যেরিয়ার। পরে জানলাম এই ভদ্রলোকের নাম মেজর বর্ধন। পেশায় ডাক্তার। শ্যামাপ্রসাদ বাবুর ব্যক্তিগত বন্ধু এবং অনুরাগী। আমরা ছোটখাট একটি স্কুল বাসে উঠলাম। শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে আরও দু'জন গাড়িতে ছিলেন। তাঁদের একজন তখনকার দিনে খুব পরিচিত রিপোর্টার সমর চক্রবর্তী। তিনি ইউনাইটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়াতে কাজ করতেন এবং শ্যামাপ্রসাদবাবুর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। আর একজন ছিলেন তাঁর নাম সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে তিনি জনসংঘ ও বিজেপি'র নেতা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সুপরিচিত হয়েছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে বসিরহাটের পথে রওনা হলাম। দমদম গোরাবাজারে জেসপ কারখানার কাছে যখন গাড়ি পৌঁছল তখন যশোর রোড লোকে লোকারণ্য। বাস চলাচল বন্ধ। শ্যামাপ্রসাদবাবু গাড়ি থেকে নেমে সামান্য বক্তৃতা করলেন। এরপর মধ্যমগ্রাম, বারাসাত এই দুই জায়গায় বসবাসকারী উদ্বাস্তুরা শ্যামাপ্রসাদ বাবুকে অভিনন্দন জানাল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্তের জন্য। বেলা সাড়ে দশটা পৌনে এগারোটা নাগাদ আমরা বসিরহাটে একটি বাড়িতে পৌঁছলাম। বাড়িটির একাংশে তখন সম্প্রসারণের কাজ চলছে। শ্যামাপ্রসাদবাবু গাড়ি থেকে নেমে গৃহকর্তাকে বললেন, লটারির টাকা তা হলে ভালভাবেই খাটাচ্ছেন? তারপর আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, তোমরা এর অতিথি। লটারিতে এবার উনি লাখ দু'য়েক টাকা পেয়েছেন। বলেই হাসতে লাগলেন। ওই বাড়িতেই আমাদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা হল। ওখানে পৌঁছানোর পর আমাদের জলখাবারের আয়োজন হল। শ্যামাপ্রসাদবাবু আমাদের নিয়ে খেতে বসবেন এই সময় একজন লোক এসে খবর দিল বসিরহাটের এস ডিও সাহেব শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। শ্যামাপ্রসাদবাবু পিঁড়ি থেকে উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের বললেন, তোমরা বসো। বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই এস ডি ও শ্যামাপ্রসাদবাবুকে নমস্কার করে বললেন, স্যার, চিফ সেক্রেটারি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে। শ্যামাপ্রসাদবাবু জানতে চাইলেন, কেন? তিনি জবাব দিলেন, চিফ সেক্রেটারি সকালে রেডিওগ্রাম করে আমাকে বলেছেন, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি দেশের অন্যতম বিশিষ্ট নাগরিক, তিনি তোমার শহরে এসেছেন তুমি তাঁর প্রাপ্য সম্মান মর্যাদা দেবে এবং তাঁর যাতে কোনও অসুবিধে না হয় দেখবে। শ্যামাপ্রসাদবাবু হেসে এসডিওকে বসতে বললেন এবং গৃহকর্তাকে বললেন, এস ডিও সাহেবের জন্য জলখাবার নিয়ে আসতে। তারপর তিনি এস ডিও কে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর আদি নিবাস কোথায়। তাঁর আদি নিবাস ঢাকা শহর শুনে এবং এস ডিও সাহেবের পদবি অনুযায়ী একজন লোকের নাম করলেন। এস ডিও সাহেব জানালেন, তিনি তাঁর জ্যেঠামশাই। পরে এস ডিও সাহেব শ্যামাপ্রসাদবাবুকে প্রণাম করে চলে গেলেন। বিকালে ইছামতীর তীরে পাবলিক লাইব্রেরির মাঠে শ্যামাপ্রসাদবাবুর জনসভা। মাঠটি বেশি বড় নয়। শ্রোতার সংখ্যা এত বেশি ছিল যে স্থান সংকুলান হল না। মাঠ উপচে পড়ল। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে লোকেরা নৌকা করে শ্যামাপ্রসাদবাবুর বক্তৃতা শুনতে এসেছিল। তাঁকে কেউ একজন

জানাল, অনেক নৌকা খুলনা জেলায় সাতখিরা অঞ্চল (তখন পূর্ব পাকিস্তান) থেকে এসেছে। এই সভা একটি স্মরণীয় ঘটনা এই কারণে যে এখানেই তিনি ঘোষণা করলেন যে তিনি একটি নতুন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠন করতে চলেছেন। সভা থেকেই অনেকে চিৎকার করে জানতে চাইলেন এই দলের নাম কী হবে? শ্যামাপ্রসাদবাবু বললেন নাম এখনও ঠিক হয়নি। কয়েক সপ্তাহ পরে তাঁর ওই ঘোষণা মতো সেই দলের নাম হল ভারতীয় জনসঙ্ঘ।

রিপোর্টার হিসাবে আমার জীবনে এ এক বড় ঘটনা। তার কারণ ওই মাপের একজন জাতীয় নেতার কাছে আসার প্রথম সুযোগ পেয়েছিলাম। আমার বয়স তখন খুবই কম থাকার ফলে খাবার সময় শ্যামাপ্রসাদবাবু পরিবেশনকারীদের বললেন, ও সব থেকে বয়সে ছোট, ওকে বেশি করে দাও। এই ঘটনার পর মাত্র আড়াই বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। কিন্তু যখনই তাঁর কাছে গেছি এবং প্রণাম করেছি তিনি কখনওই চিনতে ভুল করেননি।

এরপর আর এক ব্যক্তিত্বের কথা বলছি যাকে আমি আমার হৃদয়ের সব ভক্তি ও শ্রদ্ধা দিয়ে ভালবেসেছিলাম — তিনি ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম রিপোর্ট করতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আদৌ সুখকর ছিল না। এটা ১৯৫১ সালের গোড়ার দিকের ঘটনা। তখন পূর্ব কলকাতার ধাপা তালতলা অঞ্চলে কর্পোরেশনের রেলগাড়ি ময়লা ফেলতে যেত। ওই অঞ্চলের দু'পাশে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা রিফিউজিদের আস্তানা গড়ে উঠেছিল। তখন ড. ঘোষসহ অন্যান্য নেতারা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে কৃষক প্রজা মজদুর পার্টি গড়ে তুলেছেন। ওই পার্টির কর্মীরা ড. ঘোষকে একটি সম্মেলন উদ্বোধন করার জন্য নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। সকালবেলায় যেতে হবে। তখনকার দিনেও এখনকার মতোই এই রেওয়াজ ছিল 'ট্রেনি' রিপোর্টারদের দিয়েই সকালবেলায় কাজগুলো করানো হত। আমাকে বলা হল সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে লোকসেবক অফিসে হাজির হতে। ড. ঘোষ আটটার সময় এসে আমাকে তুলে নেবেন। আমাকে বারংবার সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যে আমি যেন কখনও দেরি না করি। কেননা ড. ঘোষের সময়ের জ্ঞান ঘড়ির কাঁটার মতো। আমি সাড়ে সাতটার মধ্যেই অফিসে এসে গেলাম। পাশের দোকান থেকে এক আনা দিয়ে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের পাঁউরুটি কিনে খেলাম। তখনকার কাঁচা পাউরুটি খেলে এখনকার মতো অম্বল হত না। ড. ঘোষ আটটা বাজার এক দেড় মিনিট আগে হাজির হলেন ছোট একটি ফিয়েট গাড়িতে। লোকসেবকের দারোয়ান অফিসের দরজা খুলে দিল। দারোয়ানের ধারণা হয়েছিল ড. ঘোষ ওপরে অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরির কাছে যাবেন। কিন্তু তা না করে ড. ঘোষ গাড়ি থেকে নেমে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন— আমার লগে কে যাইব? আমি এগিয়ে এসে বললাম—আমি যাব। বললেন, ওঠো। আমি ড্রাইভারের পাশে এসে বসলাম। প্রায় সওয়া ঘন্টা পরে কাঁচা-পাকা জঞ্জালের ওপর দিয়ে যথাস্থানে পৌঁছালাম। ১০টার পর সম্মেলন আরম্ভ হল। দু'ঘন্টা আড়াই ঘন্টা সম্মেলন চলার পর বিরতির সময় ঘোষণা করে বলা হল, অংশগ্রহণকারীদের দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উদ্যোক্তারা ড. ঘোষকে দুপুরের খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। ড. ঘোষ নিমরাজি হলেন। কিন্তু খাওয়ার ব্যবস্থা দেখে জানতে চাইলেন, এত পয়সা তোমরা কোথায় পাইলা?

ড. ঘোষের ওই কথা আমার খুব খারাপ লাগল। সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মুখ কালো হয়ে গেল। 'না আমি খাব না' বলে তিনি গাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন। গাড়ির ড্রাইভারবাবু খাওয়ার আশা নিয়ে আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। 'পয়সা কোথায় পাইলা' — ড. ঘোষের ওই উক্তি শুনেই তিনি চট করে গাড়িতে গিয়ে বসে পড়েছিলেন। আমি নীরবে ড. ঘোষের পিছন পিছন গিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসে পড়লাম। বেলা তখন প্রায় আড়াইটা। আমার খুবই খিদে পেয়েছে। ড. ঘোষ সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। গাড়ি চলছে। হঠাৎ আমাকে বললেন, তোমার খিদা পাইছে? তুমি খাইয়া আইলেই পারতা। আমি একটু উষ্মার সঙ্গেই বললাম, আমি আপনার সঙ্গে গিয়েছি, আমি কী তা পারি? সেটা কী শোভন হত? তিনি বিরক্তির সঙ্গে বললেন, দই মিষ্টি এ সবের কী প্রয়োজন? ডাইল ভাত তরকারি হইলেই হইত। এ কথা বলে তিনি গজ গজ করতে লাগলেন। আমি কোনও জবাব দিলাম না। আমাকে 'লোকসেবক' অফিসের উল্টোদিকে নামিয়ে তিনি চলে গেলেন।

কিন্তু ডা. সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জির সঙ্গে যাওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ওই সময় অর্থাৎ ১৯৫১ সালের গোড়ার দিকে বি টি রোডের দু'পাশে এবং দমদম উল্টোডাঙ্গা থেকে রানাঘাট পর্যন্ত রেল লাইনের দু'পাশে পত্তন হওয়া রিফিউজি কলোনিগুলিতে তখন কৃষক প্রজা মজদুর পার্টির বেশ প্রভাব হয়েছিল। ডা. ব্যানার্জির সঙ্গে কয়েকবার ওই সব জায়গায় উদ্বাস্তুদের মিটিং-এ রিপোর্ট করতে গিয়েছি। তাঁকে উদ্যোক্তারা চা খেতে বললে, তিনি বলতেন, আমার সঙ্গে যে রিপোর্টার ছেলেটা আইছে অরে ডাকো, আমার ড্রাইভারকে ডাকো। ডা. ব্যানার্জি কখনও কখনও আমাদের জন্য মিষ্টির প্যাকেট হাতে করে নিয়ে আসতেন। তাঁর ব্লাড সুগার ছিল। তিনি কিছু খেতেন না। তাঁর প্যাকেটটাও আমাদের দিয়ে দিতেন। ডা. সুরেশ ব্যানার্জি ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের চেয়ে সম্ভবত সাত-আট বছরের বড় ছিলেন। তিনিও অকৃতদার ছিলেন। তিনি দেখতে খুবই সুন্দর এবং দীর্ঘকায় ছিলেন। গায়ের রং ছিল খুবই উজ্জ্বল। খুবই স্নেহপ্রবণ মানুষ ছিলেন। ডা. সুরেশ ব্যানার্জির ব্যবহারে কোনও কাঠিন্য ছিল না। ছিল না বাচনভঙ্গিতে কোনও রূঢ়তা। দু'জনেই

'বাঙাল' ছিলেন। তাঁকে কখনও জ্যোতি বসুকে 'জ্যোতি' উচ্চারণ করতে শুনিনি। তিনি সব সময়েই 'জুতি' উচ্চারণ করতেন।

পঞ্চাশের দশকের শুরুতেও অর্থাৎ আমি যখন খবরের কাগজের জগতে প্রবেশ করি, তখনও পর্যন্ত বাংলা খবরের কাগজের মালিকেরা কেউই সম্পাদক ছিলেন না। ওই সময়টা ছিল বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যদিন। এই মধ্যদিনে যাদের কলমে দাবদাহ সৃষ্টি হত, তাঁদের মধ্যে যে চারজন অবশ্যই স্মরণীয়, তাঁরা হলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও চপলাকান্ত ভট্টাচার্য। এদের মধ্যে বাংলা সাংবাদিকতার পিতামহ বলে স্বীকৃত ছিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। ১৯৫০-৫১ সালে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ কোনও খবরের কাগজের সম্পাদক ছিলেন না। বাংলা সাংবাদিকতার সুতিকাগার থেকেই হেমেন্দ্রপ্রসাদ 'বসুমতী' পত্রিকার সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু ওই সময়টাতে 'বসুমতী' পত্রিকার মালিকানার বিরোধ এবং বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে মালিকানার দাবি নিয়ে ঘোরতর বিতর্কের সৃষ্টি হওয়ায় তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন। ১৯৫১ সালের গোড়াতেই কোনও একটা সভায় ওঁর বক্তৃতা রিপোর্ট করতে গিয়ে ওঁর সঙ্গে পরিচিত হই। এই সুবাদে প্রায় তিন বছর ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদের লাইব্রেরির অমূল্য রত্নরাজি ও ক্লিপিংস (Clippings) ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। আমি প্রায় প্রতিদিনই দু'ঘন্টা ওঁর লাইব্রেরির ধুলো পরিষ্কার করতাম, পুরানো ক্লিপিংসের উপরের ময়লা ঝেড়ে ফেলতাম এবং ওঁর নির্দেশ মতো নতুন ক্লিপিংস আঠা দিয়ে আঁটকে দিতাম। ১৯৫১ সালে হেমেন্দ্রপ্রসাদের বয়স ছিল প্রায় ৭৫ বছর। ওঁর যখন দশ বারো বছর বয়স, তখন থেকে উনি দিনলিপি লিখতেন। ওঁর একটি দিনলিপিতে ওঁর এক জন্মদিনে শিবনাথ শাস্ত্রীর আশীর্বাদের চিঠি গ্রথিত ছিল। অরবিন্দ ঘোষ তাঁর 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় কাজ করার জন্য তাঁকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তাও তাঁর ডায়েরিতে গ্রথিত দেখেছি। এই 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় সাংবাদিক জীবনের শুরু। এই কাগজেই তিনি ছিলেন ভারতীয় সাংবাদিকতার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বিপিনচন্দ্র পালের সহকর্মী। বিপিনচন্দ্র পালের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ শ্রদ্ধা, মমত্ববোধ। বিপিনবাবুর দুই পুত্র নিরঞ্জন পাল ও জ্ঞানাঞ্জন পাল দু'জনকেই আমি কয়েকবার তাঁর কাছে আসতে দেখেছি। একটি দিনের কথা আমার আজও মনে আছে। বিপিন পালমশাই তাঁর স্মৃতিকথা লিখে গিয়েছিলেন ইংরাজিতে। জীবিতকালে অর্থাভাবে তিনি তা প্রকাশ করতে পারেননি। ১৯৫১ সালে এই স্মৃতিকথা 'Memories of my life and time' প্রকাশিত হল। তাঁর পুত্রদের মধ্যে সম্ভবত জ্ঞানাঞ্জন পাল ওই বই-এর একটি কপি হেমেন্দ্রপ্রসাদকে দিয়ে যান। বিপিনবাবুর ওই পুত্র বইখানি দিয়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি হস্তগত করি। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতির অমন অন্তরঙ্গ আলেখ্য আমি আর কোথায়ও পাইনি। ওই বইটির প্রথমখন্ডে একটি অসাধারণ ছবি দেখেছি। ছবিটি ছিল রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের। তখন তিনি ICS। শ্রীহট্ট জেলার ফেঁচুগঞ্জের (Fenchuganj) এস.ডি.ও। ব্রিচেস পরা অশ্বারোহী সুরেন্দ্রনাথ কুশিয়ারা নদীর তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এই বইটি আমি আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ক্রমাগত তাগাদার ফলে সেটা আর হয়ে উঠেনি।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ থাকতেন গোয়াবাগান স্ট্রিটে। তাঁর এক ভাইপো ডা. অমরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ থাকতেন তাঁর সঙ্গে। তিনি যৌবনেই বিপত্নীক হয়েছিলেন। তাঁর বসবার ঘরে স্ত্রীর একটি ছবি ছিল। অসামান্য রূপসী, যার নামে আর. জি. কর হাসপাতাল, সেই রাধা গোবিন্দ করের কন্যা ছিলেন তিনি। তাঁর এক মেয়ের বিয়ে হয়েছিল চোরাবাগানের মিত্র পরিবারে। তিনিও যৌবনে বিধবা হয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিদিন দুপুরে তিনি পিতার খাওয়ার সময় চোরাবাগান থেকে গোয়াবাগানে আসতেন। ওঁর বাড়ির দোতলার বারান্দাটা খুব বড়। বারান্দার এক পাশে টবে সাজানো ফুলের বাগান ছিল। আর একটা খাঁচাতে দুটো পাখি ছিল। বারান্দার উত্তর দিকে দুটো শ্বেতপাথরের টেবিল। একটা টেবিলে বসে আমি বই কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ করতাম। আর একটা টেবিলে আমার মুখোমুখি বসে উনি খেতেন। ওঁর খাওয়া ছিল দেখবার মতো। দু'বাটি ভাত থালায় নিপুণভাবে উপুড় করা থাকত। বেশ বড় এক বাটি পাঁঠার মাংস, একটা মাছের মুড়ো, বড় দু'টুকরো মাছ, এক বাটি তরকারি ও ডাল। এরপর ছোট এক বাটি ক্ষীর ও একটা কলা। আমি প্রায় তিন বছর ওঁর এই খাওয়ার কোনও ব্যতিক্রম দেখিনি।

হেমেন্দ্রপ্রসাদের কাছে যাঁরা প্রায়শই আসতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন তুষারকান্তি ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকা) সুধাংশুকুমার বসু (হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড) কানাইলাল সরকার (আনন্দবাজার পত্রিকা) এবং বিখ্যাত প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্সের অংশীদার ছেলেরা। ওই সময়েই বাংলার ওই গৌরবময় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের পারিবারিক বিরোধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। হেমেন্দ্রবাবু বিরোধ মেটানোর চেষ্টা করেছিলেন। আমার সময় মতো আমি একদিন ওঁর ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, আজ সকাল থেকে ভাবছি, তুমি যদি একটু আগে এসে যাও। আমি বিস্ময়ে ওঁর দিকে চাইতেই বললেন, একজন আসবেন, কে তা তোমাকে এখনই বলছি না, এই কথা বলে তিনি আমাকে দোতলার পিছনের দিকে অনেকগুলো আলমারির কাছে নিয়ে গেলেন। একটি আলমারি দেখিয়ে বললেন, এই আলমারিটায় কয়েকটা বাঁধানো খাতায় লর্ড লিটনের আমল থেকে ১৯৩৯-৪০ সাল পর্যন্ত ইংরেজরা যে সব Press Act. করেছে, তার clippings আছে

এবং ওগুলোর বিরুদ্ধে কিছু প্রতিবাদী বিবৃতি আছে। যেটা দরকার তা হল মতিলাল নেহরুর একটি বিবৃতি বা কেন্দ্রীয় আইনসভায় মতিলালের একটি বক্তৃতা। ওঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। ফলে ঘন্টাখানেকের পরিশ্রমের মধ্যেই মতিলালের বক্তৃতার ক্লিপিংস এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেস দলের নেতা হিসাবে মতিলালের একটি স্মারকলিপির ছিন্নপত্র খুঁজে পেলাম। সংশ্লিষ্ট ফাইলটা ধুলোময়লা ঝেড়ে ওঁর হাতে দিয়ে নিজের হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। হাত-মুখ মোছা শেষ হয়নি, হঠাৎ শুনি হেমেন্দ্র প্রসাদ উচ্চকণ্ঠে কাকে বলছেন, এসো। তাকিয়ে দেখি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সময়টা ছিল ১৯৫১ সালের মার্চ থেকে মের মধ্যে।

যে-বাঁধানো খাতাটিতে বিভিন্ন ক্লিপিং এবং বিবৃতির অংশ বিশেষ আঁঠা দিয়ে আটকে রাখা ছিল সেই খাতাটি হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ শ্যামাপ্রসাদের হাতে তুলে দিলেন। শ্যামাপ্রসাদের বসতে বেশ বড় জায়গা লাগে। তিনি বড় সোফাটার প্রায় সবটাই জুড়ে বসে ওই খাতাটির ক্লিপিংগুলি দেখছিলেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস তাঁর হাতে এগিয়ে দিলেন। ওই খাতাটিতে মতিলাল নেহরুর বিবৃতি জায়গায় জায়গায় আবছা হয়ে গিয়েছিল। সেটা পাঠোদ্ধারের সময় হেমেন্দ্রবাবু শ্যামাপ্রসাদকে সাহায্য করছিলেন। আমি তাকিয়ে আছি। প্রায় আধঘন্টা ধরে শ্যামাপ্রসাদ সংবাদপত্রসংক্রান্ত আইনের কয়েকটি ধারা নিয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে মত বিনিময় করলেন। যাবার জন্য শ্যামাপ্রসাদ উঠে দাঁড়ালেন। খাতাটি হাতে করে আমার দিকে চেয়ে বললেন, তোমাকে দিয়ে খুব ধুলোময়লা ঘাটিয়ে নিলাম। পরক্ষণেই হেমেন্দ্রপ্রসাদকে বললেন, ওকে একটা বড় কাগজে জায়গা করে দিন না। হেমেন্দ্রপ্রসাদ হেসে বললেন, আমার কথা এখন কেই বা শোনে! বরং তোমার কথা শুনবে। তুমি তুষারকান্তি ও সুরেশ মজুমদারের যা উপকার করেছ...। শ্যামাপ্রসাদ এক প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়লেন। কিন্তু আমি তার তাৎপর্য তখনও কিছু বুঝিনি। ১৯৫১ সালের যে সময়টার কথা বলছি তখন রাজাগোপালাচারী কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি সংবাদপত্র সম্পর্কিত একটি বিল সে সময় পার্লামেন্টে পেশ করেছিলেন। বিলটি পেশ হওয়ার পর সংবাদপত্র জগতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সংবাদপত্রের মালিক ও সাংবাদিকরা ওই বিলকে সাংবাদিকদের স্বাধীনতা সংকুচিত করার উদ্যোগ বলে শঙ্কা প্রকাশ করলেন। পার্লামেন্টে ওই বিলের আলোচনার সময় শ্যামাপ্রসাদ তাঁর তরবারিকে শাণিত করার জন্যই হেমেন্দ্রপ্রসাদের কাছে এসেছিলেন। ওই বিলের বিতর্কের সময় শ্যামাপ্রসাদ একটি পুরনো দলিল পাঠ করে এক নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন। সেটা এক বিস্মৃত অতীত। তার যতটুকু আমার স্মৃতিতে রয়েছে, তা হল এই, মতিলাল নেহরু যখন কেন্দ্রীয় আইন সভায় কংগ্রেস দলের নেতা ছিলেন, সে সময় তিনি তৎকালীন ইংরাজ সরকারের একটি প্রেস বিলের তীব্র সমালোচনা করে বক্তৃতা করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি ওই আইনের বিরুদ্ধে একটি পৃথক স্মারকলিপি দিয়েছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ ১৯৫১ সালের 'প্রেস' বিলের বিতর্কের সময় মতিলাল নেহরুর বিবৃতির ছিন্নপত্র গুলির অংশবিশেষ ব্যবহার করার সময় 'মতিলাল' নামটি অনুচ্চারিত রেখে 'মি. নেহরু' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদের ওই উদ্ধৃতি শোনামাত্রই জওহরলাল নেহরু পার্লামেন্টে তাঁর আসন থেকে বারবার লাফিয়ে উঠছিলেন। শ্যামাপ্রসাদকে বাধা দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, আমি কখনওই ওসব কথা বলিনি....। শ্যামাপ্রসাদ তাঁর বক্তৃতা থামিয়ে স্পিকারের দিকে তাকালেন একবার। তারপর জওহরলালের দিকে স্মিতহাস্যে তাকিয়ে বললেন I have said Mr. Nehru that is not you, but your father.... জওহরলাল একেবারেই অপ্রস্তুত হয়ে বসে পড়লেন। তারপর বহু কংগ্রেস সদস্য শ্যামাপ্রসাদের কাছে এসে মতিলাল নেহরুর বিবৃতি সম্পর্কিত দলিলটি (হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের দেওয়া) দেখে হতবাক হয়ে যান। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস সদস্যরাই বিভিন্ন সংশোধনী এনে ওই 'প্রেস বিলের' ধার কমিয়ে দেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ইংরেজ আমলের সংবাদপত্র আইন সংক্রান্ত যে খাতাটি শ্যামাপ্রসাদকে দিয়েছিলেন, তাতে বাংলা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র একটি অমূল্য ক্লিপিং দেখতে পেয়েছিলেন। ১৮৭৬ সালে লর্ড লিটনের দেশীয় সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের (Vernacular Press Act) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে একটি ছড়া লেখা হয়েছিল 'অমৃতবাজার পত্রিকায়'। ছড়াটি ছিল এই :

শুনহ লিটন ভারতের লাট
আর নাহি করিও
তাণ্ডব নাট।

সম্ভবত ওই বছরেই 'অমৃতবাজার' পত্রিকা বাংলা থেকে ইংরাজিতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের কাছে ১৯০১-০২ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক সামাজিক ও সংবাদপত্র জীবনের অনেক ঘটনা শুনতে পেতাম। ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ারে সারা দেশ ভাসছে। এসপ্লানেড ইস্টে এখন যেখানে ডিরেকটর জেনারেল অফ অর্ডিন্যান্স ফ্যাকটরিজ-এর অফিস, সেই বাড়িটি ছিল তখনকার ভারত সরকারের বিদেশ দপ্তর বা Foreign Office। লর্ড কার্জন ওই বাড়িতে বসে বিদেশ দপ্তরের কাজ দেখতেন। কার্জন শহরের অফিসে থাকাকালীন সময়েই বেশির ভাগ দিন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিক্ষোভ মিছিল, শ্লোগান চলত। লর্ড কার্জন মাঝে মাঝে বিদেশ দপ্তরের দোতলার বড় বড় থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওই আন্দোলন দেখতেন। ওই সময় একটা ঘটনা ঘটে যার অন্যতম অংশীদার ছিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। ক্রমশ

প্রয়াণের আগের দিন

দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

স্থান : বিড়লা নিবাসের আউট হাউস-অধুনা তিশ জানুয়ারি মার্গ। কাল : ২৯ শে জানুয়ারি ১৯৪৮ সন : বেলা আড়াইটা। পাত্র : মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

তখনকার গোয়ালিয়র রাজ্যের দেওয়ান শ্রী শ্রীনিবাসন মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎপ্রার্থী বেলা আড়াইটার সময়। গান্ধীজি সময়ের ব্যাপারে সব সময়ই খুব সতর্ক। নিজে নির্ধারিত সময়ের কখনও ব্যতিক্রম করতেন না। তাঁর প্রার্থনা সভায় যাওয়া দেখে লোকে ঘড়ি মেলাতে পারত। সেদিন আড়াইটে বেজে গেল কিন্তু শ্রীশ্রীনিবাসনের ডাক পড়ছে না। উনি একটু চিন্তিত হলেন মহাত্মাজি কোনও কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কি না। প্রায় তিনটে নাগাদ উনি দেখেন যে ৫/৬ জন লম্বা চওড়া পাঠানি পোশাক পরা লোক বেরিয়ে গেলেন বিমর্ষ মুখে। ওঁরা চলে যাবার পরই শ্রী শ্রীনিবাসনের ডাক পড়ল।

উনি ভেতরে যেতেই গান্ধীজি তাঁর স্বভাবসুলভ হাসি মুখে জানতে চাইলেন শ্রীনিবাসনজির হিন্দি কেমন চলছে। তিনি উত্তর দিলেন, "৪০ শতক বলতে পারি আর ৬০ শতক বুঝতে পারি।" গান্ধীজি হেসে বললেন, 'তা হয় না। যতখানি বলতে পারেন ততখানিই বুঝতে পারবেন। কাজেই এখনও অনেক শেখা বাকি।'

তারপর গান্ধীজি বললেন যে আপনাকে ডাকতে দেরি হল কেন জানেন? আমার কাছে বান্নু থেকে আসা ৫/৬ জন শরণার্থী এসেছিলেন। খাঁ সাহেব ওঁদের পাঠিয়েছেন। ওঁরা খাঁ সাহেবের হিন্দু খোদাই খিদমতগার। তাঁরা দেশ বিভাগের পর খাঁ সাহেবের সঙ্গে পাকিস্তানেই থাকবেন ঠিক করেছিলেন। মুসলমান খোদাই খিদমতগাররা ওঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। কিন্তু ক্রমশ অবস্থা এমন হয়ে উঠল যে খাঁ সাহেব ওঁদের বললেন এখানে ওঁদের পক্ষে মান সম্মান নিয়ে থাকা মুশকিল হবে। তাই ওঁদের ভারতে চলে যাওয়াই শ্রেয়। ওঁরা খুব আপত্তি করেছিলেন। হিন্দু হলে কি হবে বান্নুই তাঁদের বাপ দাদার ভিটে সেখানেই তাঁরা মরবেন—যা কপালে থাকে তাই হোক। কিন্তু খাঁ সাহেবের আর্জি তাঁরা উপেক্ষা করতে পারলেন না। তাই শরণার্থী হয়ে ভারতে এলেন। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। ওঁরা যা বলতে এসেছিলেন তা একটু চমকপ্রদ ও আশ্চর্য।

ওঁদের নেতা একজন বয়স্ক ব্যক্তি। তিনি আমাকে বললেন, 'মহাত্মাজি এবার আপনার মরা উচিত।' ওঁরা হিন্দু হলেও পাঠান। সোজা কথা সোজা ভাবে বলাই ওঁদের স্বভাব। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?' তার উত্তরে উনি যা বললেন তাতে আমি একটুখানির জন্য হতবাক হয়েছিলাম। তিনি বললেন, 'মহাত্মাজি আপনি বলেছিলেন যে দেশ বিভাগ হবে আপনার মৃতদেহের ওপর দিয়ে। দেশবিভাগ তো হয়ে গেল আজ ৫/৬ মাস হল। কিন্তু আপনি তো বেঁচে আছেন। মহাত্মার কথার তো খেলাপ হওয়া উচিত নয়। আপনার কথা তো আপনাকে রাখতেই হবে। তাই আপনার মৃত্যু হওয়া দরকার।'

মহাত্মাজি উত্তর দেন, 'আপনারা যা বলেছেন তার যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। কিন্তু স্বইচ্ছায় মৃত্যু তো আত্মহত্যা। আত্মহত্যা তো মহাপাপ। সে পাপ আমি করি কী করে। এটা সত্যি যে যা হচ্ছে তা আমার একেবারেই মনঃপূত নয়। ঈশ্বর যদি আমাকে নিয়ে নিতেন তা হলে এই মনঃকষ্ট ও নৈতিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতাম। কিন্তু তিনি যখন আমাকে নিয়ে যাননি তা হলে তখন যতই দুঃখ কষ্ট পাই তাঁর আদেশ অমান্য করে আত্মহত্যা করে মহাপাপ করি কী করে? তা ছাড়া আমার অন্তঃস্বরও (innervoice) তো আমাকে বলছে না যে মোহনদাস তুমি চলে যাও।'

কিন্তু পাঠানরা সে কথা শুনল না। তারা বললে যে তাদের অন্তঃস্বর বলছে সময় হয়ে গেছে, এবার মহাত্মার যাওয়া উচিত। নইলে কথার খেলাপের দোষে মহাত্মা দোষী হবেন।

হাসতে হাসতে মহাত্মা শ্রীনিবাসনজিকে বললেন যে আমার এখন মরা উচিত কি উচিত না এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়ায় ডাকতে দেরি হল। তা বলে আপনি দেরি করবেন না। আপনার সময় হয়ে এল। আমার প্রার্থনা সভায় যাবার জন্য তৈরি হতে হবে। আপনার মঙ্গল হোক। এখানেই শ্রী শ্রীনিবাসনের সঙ্গে মহাত্মাজির কথাবার্তা শেষ।

দেশভাগ, পশ্চিম ও পূর্ব পাঞ্জাবের গণহত্যা, দু'দিকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের যাতায়াত, সব মিলিয়ে গান্ধীজির শেষ দিনগুলো ওঁর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। মৃত্যু উনি চাইছিলেন কিন্তু আত্মহত্যা উনি করতেন না।

নাথুরাম গডসে এক ধর্মান্ধ হত্যাকারী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাও কি ঈশ্বরের ইচ্ছা যে গডসের হাত দিয়ে মহাত্মাকে হত্যা করিয়ে তাঁকে অসহ্য মর্মপীড়া থেকে নিষ্কৃতি দিলেন। এর উত্তর কে দেবে?

[এই কাহিনিটি আমি শ্রী লক্ষ্মীচাঁদ জৈন মহাশয়ের কাছ থেকে শুনি ১৮ই আগস্ট ২০০১ তিরুবনন্তপুরমে হোটেল সমুদ্রতে প্রাতঃরাশ খেতে খেতে। শ্রী শ্রীনিবাসন শ্রীজৈনের শ্বশুরমশায়। শ্রুতিতে যেটুকু ভ্রান্তি আসতে পারে তা ছাড়া এটা সবই সত্য।]

ভুলে ও নির্ভুলে

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

চুপ করে বোসো চন্দ্রাতপে।
স্থিরতা না জানলে কোনও প্রতিচ্ছবি হয়?
সেই কবে এসেছিলে পা টিপে পা টিপে
মাঝখানে ঝোড়ো যুগান্তর
দীর্ঘ যুগ নিয়ে গেছে স্মৃতি, লোককথা।

তুমিও বলবে একে দীর্ঘকাল?
বলবে কি অনন্ত? ব্যাপক আলোকবর্ষ
তোমাকে ছুঁয়েছে ভেবে, ভয় করে আজ
প্রিয়নামে ইন্দুমতী, অনাদরে ইতি
তোমাকে খোঁজার ছলে খুঁজেছে নিজেকে।

স্মৃতি বড় গভীরবাসিনী, ঘোর সন্দিহান। জানি
বৈঠকি মহলে তাকে রক্ষা করা দায়।
তবু বলি, দু'একটি প্রতীকী ছবি থেকে যাক ভুলে
ভুল হয়ে সামনে বোসো, নির্ভুলে তাকাও।

অন্য গানের খাতা - ২৬

অজয় নাগ

কেউ নেই আজকাল—আমার গানের
বন্ধু-স্বজন
আমি একা ঝরনার ধারে—জানে না কেউ
শুধু হাওয়া জানে
অন্ধকারে নিশ্বাস পাই গোপন মনের
খসে-পড়া একটি তারার

সুগন্ধি রঙিন রুমাল প্রতিদিন কারা
ফেলে যায় ভিজে ঘাসে
তাদের আমি কি কোনওদিন দেখেছিলাম
আমার গানের খাতায়?
নির্জন বৃষ্টির সন্ধ্যা মেঘের আয়নায়
তাদের কি কাঁদতে দেখেছিল?

বিশল্যকরণীর খোঁজে
মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সন্ধ্যার আকাশ থেকে ছিঁড়ে দিলে এক মুঠো তারা
জ্যোৎস্না যুবতী তুমি বুঝবে না বুকের যন্ত্রণা
এ হৃদয়ে বহু ক্ষত তুমি তার কিছুই জানলে না।

বিশল্যকরণী এনে নিরাময় করে তুলতে কেন ভয় পাও?

আমার তো শূন্য থালা ভাত নেই শুধু স্বপ্ন আছে
স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন ডানা মেলে
পান্না হীরে নিঃশব্দে ঝিলিক মারে খিদে তো মেটে না
খিদের আগুনে পুড়ি ক্রমাগত খড়ের মানুষ
তুমি শুধু মজা দেখো স্থির হয়ে রাত্রির উদ্যানে।

রাতের আকাশ থেকে এক মুঠো তারা ছিঁড়ে এনে
কেবল ভোলাতে চাও, বেড়ে যায় চোখের কৌতুক।
বিশল্যকরণী তুমি আনতে পারলে না
যে পারে মুছে দিতে জীবনের হলুদ অসুখ।

ভালবাসার অন্যভাষা

অসীম রেজ

মেঘেদের কোনও দেশ নেই,
বাতাসের কোনও ভাষা,
রাশি রাশি টবে ঝরেছে ফুল,
নেই পুনর্জন্মের আশা।
গাছেদের ভাষা মানুষের জানা নেই
গাছ কি জেনেছে কখনও মানুষের ব্যথা?
তবু রোজ ভোরে-
একে একে তুলে আনি ফুল,
শিউলি বকুল মাধবীলতা,
এরই মাঝে ফুলদানিতে শোভা পায়
দু'একটি বাহারি পাতা,
যেন দিনে দিনে শিকড়ের গজিয়েছে পাখা।
আমি খুঁজি মেঘেদের সঙ্গে পাখিদের,
পাখিদের সঙ্গে ফুল ও বাতাসের সম্পর্ক,
ছয় ঋতু ছত্রিশ বছর পার হয়ে
ভালবাসার অন্য এক ভাষা।

চলন্ত জানলা থেকে

সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

এই নিয়ে কতবার মেঘের আড়ালে চলে গেল রোদ
আমি তবু সোনার রোদের দিকে চেয়ে থাকি।
সারাদিন এইভাবে চেয়ে থাকা যেত যদি!
কোনও দিন হত যদি এই একটিই কাজ— খোঁজাখুজি!
এই পৃথিবীতে তবে অসম্ভব দিন হত তা।

বাতাসে ভেসে আসে টুংটাং পেয়ালার গান
আশেপাশে বাড়িগুলো মেতে আছে জীবনস্বভাবে
তবু তাদেরও মাথার চুলে
সিন্ধুর ওপার থেকে আসা ধোঁয়া—
যেন অনেকদিন ধরে চলেছে দ্রুতগামী আগুনের খেলা
ভেতরে-ভেতরে—

তবু রোদ খুঁজতে যাই, আর বুঝি
বছরগুলো এক একটা পাখির মতো উড়ে যাচ্ছে
আমাদের ঝুলি থেকে।
মাঘ-রাত্রির গায়ে মিশে আছি যেন উদাসীন বরফের কণা।
সিন্ধুর ওপার থেকে ধোঁয়া তবু আসছেই—
বাতাস ওড়াচ্ছে তার ধবংসবীজ এই ব্যস্ত শহরে।

মেঘের আড়ালে চলে গেলে রোদ
আমি তবু সোনার রোদের জন্য চেয়ে থাকি শূন্যের বাগানে
ভাল হত—
আরও সুস্থির হয়ে যদি খোঁজা যেত তাকে

বাগান

পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত

লেবু-বাগানের ফুল
কামলিপ্ত
গাঢ় হয়ে বসেছে বাগানে।
কৃন্তক, কোথায় কৃন্তক, যাদুদর্শী অদেয়-দৃশ্যমান।
চতুর্দিকে বেঁহুশ,
চতুর্দিকে গাছের বাকল দিয়ে ঘেরা পরমায়ু,
গাঢ় হয়ে আসছে গর্ভাশয়, ধর্মবীজ....
রাজা নেই
শাসন নেই
অরাজক বাগানের ফুল
খায়দায় আর ঘুরে বেড়ায় পাটুনি বউটির
বারমুখো স্বভাবের সাথে।
বাগান চিরান্ধ অথবা চক্ষুঃশ্রবা,
সে কারও মুখাপেক্ষী নয়।

না-ই বা পেলাম

মলয় গোস্বামী

চারিদিকে একটা ফাটলের শব্দ!

রাত্রে কারা যেন গাছেদের সমস্ত বৃন্তে
প্লাস্টিকের পাতা সেঁটে দিয়ে গেছে!
একটা মন মরে পচে গলে গিয়েছে। তার ধারার ওপর
কে যে ভাসায় কাগজের নৌকো আজ!... পোকারা মাঝি!

তবু কোথাও যেন এক বাচ্চা ছেলে হাসছে।
তার মুখে একটাই মাত্র দুধে-দাঁত একেবারে কবিতার মতোই। তাই
প্রেমের ওপর দলাদলা রক্ত দেখেও বুঝতে পারছি
ফাটলের শব্দের ফালি দিয়ে একটু একটু করে মাথা তুলছে
সবুজ পাতা; তলায়
গিটারের তারের মতো শেকড়গুচ্ছ...

ওই শেকড়গুলো একবার বাজাতে
আজও এইসব কবিতা লিখি আমরা।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের সেকুলার ভারতবর্ষ

আবদুর রাউফ

সেকুলারিজমের সংজ্ঞানির্ধারণ একটা তর্কসাপেক্ষ ব্যাপার। তাই সেদিকে না গিয়ে ইতিহাসের সাহায্যে এর অর্থ অনুধাবন অনেক বেশি সহজসাধ্য বলেই মনে হয়। ইউরোপেই যে প্রথম সেকুলারিজমের ধারণা এবং সেকুলার স্টেটের উদ্ভব ঘটে এ বিষয়ে সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই। এই কারণেই আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসের অভিজ্ঞতাকে যাচাই করে দেখা অত্যন্ত জরুরি। অন্নদাশঙ্কর রায় 'আমাদের ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন, 'আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে ইউরোপের ইতিহাস যারা মন দিয়ে পড়েছে তারাই কেবল সেক্যুলার স্টেট বস্তুটিকে ধারণ ও বহন করতে পারে।' (পৃ. ২৩৩, প্রবন্ধ)

পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক জীবনে চার্চের স্বেচ্ছাচারী আধিপত্য থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা থেকেই ইউরোপে সর্বপ্রথম সেকুলার ধ্যান-ধারণা বিকাশ লাভ করে। সম্ভবত সেই কারণেই সেকুলার কথাটার বাংলা করা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ। কেউ কেউ অবশ্য এই ধর্মনিরপেক্ষ বলতে বোঝেন ধর্মবিরোধী। এদের কথা মনে রেখেই শ্রীরায় বলেছেন, 'সেক্যুলার কথাটা ধর্মের বিপরীত নয়। ধর্ম থাকুন, কিন্তু তা যেন আফিং না হয়। ধর্মের নেশায় যেন তারা স্বাধীনতা বিকিয়ে না দেয়।' (আমাদের ভবিষ্যৎ, পৃ. ২৩৫, প্রবন্ধ) তিনি আরও বলেছেন, 'মানুষ মানুষকে ধর্মের দ্বারা চিহ্নিত করতে সব সময় রাজি নয়, এই হলো সেক্যুলার মনোভাবের আদত কথা। নইলে ধর্ম ছাড়তে বা ধর্মে অবিশ্বাস করতে কেউ বলছে না। সেক্যুলার স্টেট ধর্মবিরোধী নয়। ভেদবুদ্ধিবিরোধী।' (স্বাধীনতা দিবসের ভাবনা, পৃ. ২৭১, প্রবন্ধ) ধর্ম এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে শ্রীরায়ের সাফ কথা হল, 'ধর্ম চিরকাল থাকবেই, ধর্ম না হলে মানুষের চলে না। রাষ্ট্রও চিরকাল থাকবে, যদি না মানুষের জীবন বিকেন্দ্রীকৃত হয়। ধর্মের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া নেই, আমরা বরং ধর্মের ঝগড়া চুকিয়ে দিতে চাই। সে অধ্যায় শেষ হলে আমরা বাঁচি। আমরা বলি ধর্মও থাকুক রাষ্ট্রও থাকুক। কিন্তু জোড়া লেগে ধর্মরাষ্ট্র না হোক।' (চেতাবাণী, পৃ. ২৩০ প্রবন্ধ) হিন্দি 'পন্থনিরপেক্ষ' কথাটা বোধ হয় 'সেকুলার'-এর অনেকখানি কাছাকাছি। কারণ ধর্ম নয় এমন যেসব পন্থ বা ডগমাসর্বস্ব জীবনদর্শন আছে যার মধ্যে নাস্তিক্যও পড়ে, যথার্থ সেকুলারিস্ট সেগুলি সম্পর্কেও রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষতা অবলম্বনের পক্ষপাতী। রাষ্ট্র যেহেতু সমস্ত নাগরিকের কাছেই আনুগত্য দাবি করে তাই কোনও নাগরিক নাস্তিক কিংবা অজ্ঞেয়বাদী হলেও তার অধিকার কিছুমাত্র কম হতে পারে না।

বস্তুবাদীদের কেউ কেউ সেকুলার কথাটার বাংলা করেছেন পার্থিব। তাঁরা বলেন, 'All secular concepts start with the non-recognition of any supernatural entity অর্থাৎ যে কোনও অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্বীকৃতির পথেই সমস্ত পার্থিব চিন্তার জন্ম।' এঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এগোলে সেকুলার রাষ্ট্রের শেষ পর্যন্ত ধর্মবিরোধী না হয়ে উপায় নেই। আমাদের দেশের রাজনীতিক এবং রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের বেশির ভাগই কিন্তু এই ব্যাখ্যার ধার ধারেন না। তাঁদের কাছে সেকুলার স্টেটের বর্তমানে মানে দাঁড়িয়েছে 'equal encouragement of all religions বা সমস্ত ধর্মে সমান উৎসাহদান।' অন্নদাশঙ্কর রায় সেকুলারিজমের স্পিরিট যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা এই দুই মতের চেয়ে অনেকখানি ভিন্ন প্রকৃতির।

একথা অবশ্য ঠিক, সেকুলারিজমের সমস্ত ধ্যান-ধারণার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে মানুষ। শ্রীরায় যেমন বলছেন, 'এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ, এ কথা সকলে জানে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, মানবিকতার যুগ। যাকে বলে হিউম্যানিজম তার লক্ষণ হলো সমাজের চেয়ে মানুষ বড়ো, সম্প্রদায়ের চেয়ে মানুষ বড়ো, সংঘের চেয়ে মানুষ বড়ো।' (যুগজিজ্ঞাসা, পৃ. ২৪৫, প্রবন্ধ) মানুষকে এই গুরুত্বপ্রদানই হল সেকুলারিজমের আদত লক্ষণ। আগে এই গুরুত্বের জায়গায় ছিলেন ঈশ্বর। কিন্তু মানুষকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে সেকুলারিস্টদের সমস্ত চিন্তাভাবনা বিবর্তিত হলেও তাঁরা তাঁদের মতো করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কোনও চেতন সত্তার উপলব্ধিতে পৌঁছবেন না কিংবা বস্তুবহির্ভূত কোনও অতিপ্রাকৃত সত্তাকেই মানবেন না এমন ধারণা ঠিক নয়। কিন্তু কোনও ভাবেই সেই অতিপ্রাকৃত সত্তা তাঁদের কাছে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিধিনিষেধের ধ্বজাধারী ঈশ্বর নন। কারণ সেকুলারিস্টগণ বিশ্বাস করেন মানুষের ভাল-মন্দ, নীতি-দুর্নীতির বিচার হবে সর্বজনীন মানুষের সর্বোত্তম কল্যাণের নিরিখে, কোনও ঈশ্বর দ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট বিধি-বিধানের নিরিখে আদপেই নয়।

ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্রের এইরকম একটা সেকুলার অবস্থান সম্পর্কে ধারণা করা ভারতবর্ষের মানুষের পক্ষে তেমন কিছু কঠিন নয়। মনে রাখতে হবে এখানে ঈশ্বরচেতনা, যা কিছু ভাল তার মধ্যে ভগবানের প্রকাশ আর যা কিছু খারাপ তা শয়তানের

[প্রবন্ধটি অন্নদাশঙ্কর রায়ের নবতিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ভারতীয় ভাষা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত দুদিন ব্যাপী অন্নদাশঙ্কর সম্বর্ধনা সভায় ১৩ই মার্চ '৯৪-এ দুপুরের অধিবেশনে পঠিত হয়েছিল। শতবর্ষ পূর্ণ করার মাত্র কয়েক মাস বাকি থাকতেই অন্নদাশংকর রায় ২৮ অক্টোবর ২০০২ তারিখে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রয়াণ স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে পুরাতন চতুরঙ্গ থেকে রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হল।]

কারসাজি, এই রকম কোনও সরলীকৃত ব্যাপার নয়। এখানে বিচিত্র বিধি-নিষেধের ধ্বজাধারী বহু দেব-দেবীর মধ্যে ব্যক্তিকৃত ঈশ্বর যেমন আছেন তেমনই এমন ঈশ্বরও আছেন যিনি বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত করে একটি চেতনসত্তার অনুভব মাত্র। যে অনুভবের ভিত্তিতেই বলা হয় জগৎসংসারের সবকিছুই ব্রহ্মময়। সবকিছুই যদি ব্রহ্মময় হয় তা হলে তো আর দেবতা-দানব, ভগবান-শয়তান বলে কিছু থাকে না। সে ক্ষেত্রে ভাল-মন্দ, নীতি-দুর্নীতির বিচার হয়ে পড়ে নিরর্থক। অর্থাৎ ঈশ্বরের নিরিখে বিচার আর এগোতে চায় না। তাই মানুষকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে তার সর্বোত্তম কল্যাণ কামনায় ভাল-মন্দ, নীতি-দুর্নীতির বিচার করা ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। তাই আধুনিক জীবনের তাগিদে সেকুলার মানবতাবাদের চিন্তা যখন ইউরোপ থেকে এসে আমাদের ভাবজগতে আলোড়ন তুলল তখন আমাদের মনীষীগণ সেটাকে গ্রহণ করলেন নিজেদের মতো করে। মানুষের স্বাভাবিক যুক্তিবিচার, ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতেই তাঁরা মানবতাবাদী চিন্তার বিকাশসাধন ঘটালেন ঠিকই কিন্তু এঁদের মধ্যে সেই সব মনীষীর চিন্তাই গণমানসের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হল যাঁরা এই সেকুলার মানবতাবাদকে সম্পূর্ণ ভারতীয় ধাঁচে ঢেলে সাজাতে সক্ষম হয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য যে সারা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে এঁদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য।

একথা অবশ্য একশো ভাগ ঠিক যে ইউরোপের সেকুলার ধ্যান-ধারণার অভিঘাতেই আমরা প্রথম সচেতনভাবে ধর্মীয় ঈশ্বর এবং দেব-দেবী নিরপেক্ষভাবে সর্বজনীন মানুষের সর্বোত্তম কল্যাণের কথা ভাবতে শুরু করি। কিন্তু এর ফলে ঈশ্বরচিন্তার আর একটি রূপ যে আমাদের মধ্যে ছিল সেটা অন্য তাৎপর্য পেতে শুরু করে। রামমোহন যে ঈশ্বরের কথা আমাদের শোনালেন তার সঙ্গে হিন্দুসমাজে প্রচলিত দেব-দেবীমূলক ঈশ্বরচিন্তার মিল ছিল না। ফলে সমাজে আলোড়ন শুরু হয়। রামমোহন কোনও ঋষি বা প্রেরিত পুরুষ ছিলেন না। তিনি সেরকম কোনও দাবিও করেননি। যে রকম নতুন ধরনের ঈশ্বরচিন্তার সূচনা তিনি করলেন তা ছিল রেনেসাঁস চেতনাপুষ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষের ঈশ্বরভাবনা। যদিও এই ঈশ্বর ভারতীয় ধ্যান-ধারণার ঐতিহ্য বহির্ভূত কোনও সত্তা নয়। কিন্তু পরিপ্রেক্ষিত পাল্টে যাওয়ায় এটাকে গণ্য করা যেতে পারে পন্থনিরপেক্ষ ভারতীয়ের ঈশ্বরভাবনা হিসাবে। যদিও পরবর্তীকালে রামমোহনের অনুগামীরা এই ঈশ্বরভাবনাকে কেন্দ্র করে আর একটি নতুন পন্থের জন্ম দিয়েছিলেন।

আমার নিজের ধারণা, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ঈশ্বরচিন্তাও এই রকমই একটা ব্যাপার। তাঁরাও হিন্দু দেব-দেবীদের নিয়ে প্রচলিত সংস্কারগুলিকে বিশেষ আমল দেননি। ধর্মীয় বিধি-নিষেধের বেড়াগুলি ভাঙতে ভাঙতে শেষ পর্যন্ত জগৎকল্যাণকেই দিয়েছেন সর্বোচ্চ স্থান। বলেছেন, 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'। এইভাবে জগৎকল্যাণ তথা মানবকল্যাণকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে ঈশ্বরচিন্তার বিবর্তন এর আগে দেখা যায়নি। মনে রাখতে হবে এঁদের এই জগৎকল্যাণ ভাবনার মধ্যে কোনওরকম স্বর্গলাভ বা মোক্ষপ্রাপ্তির বাসনা ছিল না। বিবেকানন্দ বেদান্তদর্শন ব্যাখ্যা করে দেশের যুবকদের বলেছেন, 'তোমাদের সবার মধ্যেই রয়েছে ব্রহ্ম। তোমরা ব্রহ্মের তেজে জেগে ওঠ'। এই ব্রহ্ম তেজে জাগ্রত যুবকদের তিনি দেশব্রতী হতে বলেছেন। মানবকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে ওঠার আহ্বান দিয়েছেন। বলেছেন, দেশের একটা মানুষও যতক্ষণ অভুক্ত থাকবে তাকে খাওয়ানোই যথার্থ ধর্মাচরণ। বলেছেন, নিজেদের জাতীয় পরিচয়ে গৌরবান্বিত হয়ে উঠতে (এই কথাটার এখন অবশ্য শোনা যায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপব্যাখ্যা)। উপদেশ দিয়েছেন, গীতাপাঠ স্থগিত রেখে ফুটবল খেলে স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে। এইসব কোনওমতেই সেই সময় দেশে প্রচলিত ধর্মীয় চিন্তার প্রতিধ্বনি ছিল না। এ একেবারে অন্য ধরনের ভাবনা। পুরো ব্যাপারটাই পার্থিব, ইহলৌকিক; পারলৌকিক ভাবনার কোনও স্থানই এখানে নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা হল এই ভাবনা পন্থনিরপেক্ষ। বিবেকানন্দ শুধু হিন্দুকে আহ্বান করেননি, তিনি ডাক দিয়েছেন সারা ভারতের সমগ্র জনসাধারণকে। এই কারণে একেই আমি বলতে চাই, এ হল সেকুলারিস্ট বা পন্থনিরপেক্ষ ভাবনার ভারতীয় রূপ। যদিও এই ভাবনা তখনও বৃহত্তর হিন্দুধর্মীয় ঐতিহ্যের বৃহত্তর গন্ডি অতিক্রম করেনি। বিবেকানন্দের ধর্মীয় আত্মপরিচয়ে হিন্দু আইডেনটিটিই ছিল মূল কথা। কিন্তু এই হিন্দুত্ব পুরোপুরি তাঁর নিজের ব্যাখ্যাকৃত, যা সমকালীন কোনও পন্থেরই অনুসারী ছিল না। বেদান্তদর্শনভিত্তিক হিন্দুত্বের এই অভিনব ব্যাখ্যা (যার মস্তিষ্ক বেদান্ত এবং দেহ ইসলাম) হিন্দু আইডেনটিটির গন্ডি অতিক্রম করে যায় রবীন্দ্রনাথে এসে।

একজন যথার্থ সেকুলারিস্ট মানবতাবাদী মানুষের ঈশ্বরচেতনার এবং জগৎকল্যাণচিন্তার কীভাবে মেলবন্ধন ঘটতে পারে তার সর্বোত্তম নিদর্শন আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ যখন দেশের মানুষের সমস্যার কথা বলেন, সেগুলি সমাধানের পথ খোঁজেন, প্রচলিত ধর্ম সে ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ালে তার বিরুদ্ধেও কলম ধরতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। কখনও কখনও এমন মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয় যে প্রচলিত কোনও ধর্মেই তাঁর আস্থা নেই। প্রাচীন ভারতের আশ্রমবাসী ঋষিদের সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধান্বিত মনোভাব ছিল ঠিকই কিন্তু ঋষিবাক্য মাত্রেই অভ্রান্ত এমন বিশ্বাস তাঁর কোনও দিনই ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে কোনও বিশেষ ধর্মের আওতাভুক্ত মানুষ হিসাবে কল্পনাই করা যায় না। ধর্ম ছাড়া অন্য কোনও বিশেষ মতাদর্শের

প্রতিও তাঁর কোনও রকম অন্ধ আনুগত্য ছিল না। সব কিছুকেই তিনি যুক্তি বুদ্ধি, নিজের এবং ইতিহাসের অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। সেই হিসাবে তিনি একজন পুরোপুরি পন্থনিরপেক্ষ মানুষ। কিন্তু এই পন্থনিরপেক্ষতা তাঁকে শিব ও সুন্দরের সাধনা থেকে বিরত করতে পারেনি কখনওই। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মূর্ত ভারতীয় সেকুলার হিউম্যানিজমের আদর্শ তাই অনন্য।

এই অনন্য রাবীন্দ্রিক ভারতীয় সেকুলারিজমের স্পিরিট যথার্থভাবে অনুধাবন করেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়। শ্রীরায়ের সেকুলারিজম তাই বস্তুবহির্ভূত সত্তার পরিপূর্ণ অস্বীকৃতির নামান্তর নয়, কিংবা সর্বধর্মে সমান উৎসাহপ্রদান নামক অপব্যাখ্যারও অনুসারী নয়। প্রচলিত কোনও বিশেষ ধর্ম কিংবা দেব-দেবী ধারণা যে তাঁর স্বীকৃতি পায়নি একথা তো বলাই বাহুল্য। বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এবং সাধারণ যুক্তিবিচারের ভিত্তিতে সর্বজনীন মানুষের সর্বোচ্চ কল্যাণই অন্নদাশঙ্করের সেকুলারিজমের মূল লক্ষ্য। সেকুলার স্টেটের পক্ষপাতী তিনি এই কারণেই। তিনি মনে করেন, 'হিন্দুত্ব বা ইসলাম বা খ্রীস্টধর্ম নিয়ে যদি মানুষ সন্তুষ্ট থাকত তা হলে মানব বিবর্তন এইখানে শেষ হয়ে যেত। সেই শেষ নয়। তাই মানবিকবাদের উদয় হয়। মানবিকবাদ মানব থেকে আরম্ভ করে, ঈশ্বর থেকে আরম্ভ করে না' (বিষাদসিন্ধু, পৃ. ৬২, খোলা মন ও খোলা দরজা) তাঁর দাবি, এই রকম ভাবনার ভিত্তির উপর গড়ে উঠুক সেকুলার স্টেটের ইমারত। কিন্তু যেহেতু অন্নদাশঙ্করের সেকুলারিজম ভারতীয় পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনও ব্যাপার নয় এবং তা শতকরা একশো ভাগ রাবীন্দ্রিক তাই কল্যাণময় ঈশ্বরচেতনার সঙ্গেও রয়েছে এর গভীর সংযোগ।

অন্নদাশঙ্কর অবশ্য একে ঈশ্বর বলতে নারাজ। তাঁর মতে এটা চিরন্তন কোনও চিৎ সত্তা। 'নীতিজিজ্ঞাসা' প্রসঙ্গে নিজের মনের সংশয় প্রকাশ করে সেই ১৯২৯ সালে তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা আকাশ বাতাস জয় করেছি, মানুষের মনের অলিগলির খবর রাখি, কিন্তু সব মিলিয়ে যা এক— যাকে বিশ্বাস করাটাই যাকে জানা— যাকে বোধ করাটাই যাকে বোঝা— সেই অখণ্ড ও অনির্বাণ স্বতঃসিদ্ধের বেলায় আমরা সংশয়বাদী। কেন আমাদের জন্ম, কেন আমাদের মৃত্যু, কেন আমাদের সুখ দুঃখ — কেন-র উত্তর খুঁজে পাচ্ছিনে। বেদ-বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব ও কথামালার গল্প দুই সমান আজগুবি ঠেকছে।

'সব অস্থিরতা সত্ত্বেও কী স্থির সেইটে না জানলে বিশ্বাস রাখব কার উপরে, নিষ্ঠা রাখব কার প্রতি? সব পরিবর্তন সত্ত্বেও কী অপরিবর্তনীয় সেইটে না জানলে পরিবর্তনে আনন্দ পাব কেমন করে? যা কিছু সৃষ্টি করব সবই কি লোপ পাবে? যা কিছু হব তার কিছুরই কি চিহ্ন থাকবে না? এ জীবনের কি এই জীবনেই আদি এবং এই জীবনেই শেষ? যত খুশি অন্যায় করে গেলে কি মৃত্যুর পরে তার শাস্তি নেই? আজীবন যাতনা পেলে কি মৃত্যুর পরে তার পুরস্কার নেই? আত্মা কি অমর নয়? আমরা কি এত অসহায় যে পৃথিবী ধ্বংস হলে আমাদেরও ধ্বংস হবে? কাল কি এত নিষ্ঠুর যে ভালো মন্দ উভয়কেই মুছে দেবে? মঙ্গলময় কি নেই? নবনীতির ভিত্তিপাতের জন্যে চিরন্তনকে আবিষ্কার করা আবশ্যক।' (নীতিজিজ্ঞাসা, পৃ. ৫৭, প্রবন্ধ) অন্নদাশঙ্করের এই নবতি বর্ষ পূর্তির সময়েও অতি সম্প্রতি তাঁকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি* এই চিরন্তনের প্রতি আস্থা তিনি কোনও দিনই হারাননি। কারণ, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস সব রকম মানবকল্যাণ চিন্তার গভীরে এই চিরন্তনের অবস্থান না থাকলে মানুষের সত্যাসত্যের ধারণা এবং নীতি-মূল্যবোধের কোনও ভিত্তি থাকে না। কিন্তু এই চিরন্তন চিৎসত্তার সঙ্গে প্রচলিত ঈশ্বর ধারণাকে মিলিয়ে ফেললেই বেধে যায় যত গোলমাল। তখন চলে আসে ধর্ম এবং কান টানলেই যেমন মাথা আসে সেই ভাবে চলে আসে জাত-পাত, হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি জটিল সব সমস্যা।

তাই অন্নদাশঙ্করের বিশ্বাস, আমাদের দেশে সেকুলারিজমের ধ্যানধারণার বিকাশ ঘটাতে হবে প্রচলিত ধর্ম, ঈশ্বর এবং দেব-দেবী সংক্রান্ত সংস্কারগুলি এড়িয়ে গিয়ে। অন্তত রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কোনও রকম প্রশ্রয় প্রদান চলবে না। শ্রীরায়ের দৃঢ় অভিমত, আমাদের মতো এই বহু ধর্ম, বহু দেব-দেবী, বহু জাতি-বর্ণ এবং বহু ভাষাভাষী অধ্যুষিত দেশে সেকুলারিজমকে জাতীয় আদর্শ করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। পাকিস্তান ধর্মকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ করে কিংবা বাংলাদেশ ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ঐক্যবিধানের প্রতীক করে পার পেয়ে গেলেও আমাদের পক্ষে এর কোনটাই সম্ভব নয়। আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হতে পারে একমাত্র সেকুলারিজম। কিন্তু এও মনে রাখতে হবে পুরোপুরি ইউরোপীয় মডেলের সেকুলারিজম এখানে চলবে না। এই সেকুলারিজম নিঃসন্দেহে হবে রাবীন্দ্রিক। যেখানে মানবকল্যাণচিন্তার সঙ্গে অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে শিব এবং সুন্দরের সাধনার।

আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক এবং বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ যদি এই রাবীন্দ্রিক ভারতীয় সেকুলারিজমের স্পিরিট যথার্থভাবে অনুধাবন করতে পারেন তা হলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই পন্থনিরপেক্ষ মানবতাবাদের আবেদন দেশের তৃণমূলে পৌঁছে দিতে কোনও অসুবিধাই হবে না। আর এই রাবীন্দ্রিক ভারতীয় সেকুলারিজমের স্পিরিটকে ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে বিষয়টিকে যথার্থভাবে অনুধাবন করেছেন যে চিন্তাবিদ সেই অন্নদাশঙ্কর রায়ের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমাদের অন্য কোনও উপায় নেই।

* ১৫ই মার্চ ১৯৯৪-এ প্রচারিত আকাশবাণীর তরফে লেখক কর্তৃক নেওয়া সাক্ষাৎকার।

'ক্রান্তদর্শী' অন্নদাশঙ্কর

পরিমল চক্রবর্তী

১.

পৃথিবীর সকল দেশে এবং সকল কালেই আমরা মাঝে-মাঝে এমন কিছু সাহিত্যশিল্পীর সন্ধান লাভ করি, যাঁরা শারীরিক অর্থে তাঁদের সমকালের অন্তর্গত হয়েও মানসিক বিবেচনায় ভাবীকালের অধিবাসী। এঁদের ব্যক্তিত্বের সংগঠনে (organisation of personality) আপাত নিরপেক্ষ-অথচ-স্বরূপত-সাপেক্ষ দুটি সত্তা যুগপৎ সক্রিয়। এঁরা একদিকে যেমন ব্যক্তিগত জীবনযাপনে সন্নিহিত প্রতিবেশী পরিজন পরিবৃত প্রাত্যহিক সুখে দুঃখে আপ্লুত উদ্বেলিত, অন্যদিকে তেমনই সর্বগত জীবনসন্ধানে ভৌগোলিক সর্ব সীমাতিক্রান্ত মানবীয় চিন্তাভাবনায়ও আবিষ্ট উদ্দীপিত। ব্যক্তিত্ব স্বরূপের এই আপাত বৈপরীত্য, স্বভাবের এই বাহ্য বিরোধাভাস, এঁদের পক্ষে সঙ্গত। এবং শুধু সঙ্গতই নয়, এই দোটানার আর্তি, এই দ্বন্দ্বের রক্তিমতা, এঁদের ক্ষেত্রে বোধ হয় সহজাতও; কেননা এঁদের চরিত্রের গভীরে রয়েছে সেই অবিভাজ্যতা, ব্যক্তিত্বের গঠনে রয়েছে সেই অখণ্ডতা, যা এঁদের নিষেধ করে জীবনচর্চা এবং জীবনচর্যা—উভয়তই সমকালে সীমিতদৃষ্টি হতে। একেই জীবনধেয়ানী শিল্পীরা তাঁদের আত্মসমীক্ষায় 'বিবেকের তাড়না' অভিধায় অভিহিত করেছেন। এই বিবেকী তাড়না—যা দীপ্যমান শিখার মতো এঁদের শিল্পীসত্তার গহন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, আলোকিত করে—যথার্থ মানবতাবাদী শিল্পী সাহিত্যিক মাত্রেরই একটি প্রধান পুঁজি, মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ সাহিত্যরচনার অন্যতম মুখ্য অনুপ্রেরণা।

বিবেকের এই তাড়না কী করে সৃষ্ট হয়? সৃষ্ট হয় কল্পনার সেই সমৃদ্ধির দ্বারা, দৃষ্টির সেই দূরযানীতার দ্বারা—অর্থাৎ সেই ontological vision -এর দ্বারা, যার সামর্থ্যে এবং আশীর্বাদে একজন সাহিত্যশিল্পী ক্রমেই হয়ে ওঠেন প্রাজ্ঞ (prudent) এবং সংবেদী (sensitive)। এবং কালক্রমে সেই সত্যে তিনি দীক্ষিত হন, যে-সত্য মানুষের স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ মৌল মহত্ত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করে, সচেতন করে তোলে। এই সত্যের আলোকেই সামাজিক মনুষ্যসৃষ্ট পারস্পরিক বিরোধ ও বৈষম্যের অন্তরালবর্তী সর্বদেশীয় ও সর্বকালীন মানবীয় অন্বয় ও ঐক্য সম্পর্কিত স্থির বোধে তিনি সমুত্তীর্ণ হন। জগৎ ও জীবনকেন্দ্রী সর্ববিধ ধ্যান-ধারনায় এই বোধের দ্বারা সঞ্জিবিত মানববিদ্যার যে কোনও বিভাগের শিল্পীকেই আমাদের দেশের শিল্পশাস্ত্রীরা 'ক্রান্তদর্শী' বিশেষণে বিশেষিত করেছেন এবং এমন শিল্পীর কৃতি সম্পর্কেই প্রযুক্ত হয়েছে 'কালাতিশায়ী' শব্দটি।

উপরের স্তবক দুটিতে 'ক্রান্তদর্শী' শিল্পীর যে সামান্যধর্ম সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে মাত্র আভাসটুকু দেওয়া হল, সে সামান্যধর্ম নিজেদের রচনায় এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনেও, সর্বাংশে না হোক (কেননা তা বোধ হয় সম্ভবই নয়), অন্তত কিয়দংশেও প্রকট হ'য়ে উঠেছে, এমন দৃষ্টান্ত হিসাবে মানবেতিহাসের অপেক্ষাকৃত পূর্ববর্তী অধ্যায়ের রুশি টলস্টয় ফরাসি রোঁলা এবং ভারতীয় রবীন্দ্রনাথ যেমন অবশ্যই উল্লেখযোগ্য, তেমনই তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক পর্বের সার্ত্রে, কামু কিংবা হকস্থথ অথবা আমাদের অন্নদাশঙ্করের নামও সমানভাবেই স্মরণীয়। টলস্টয়, রোঁলা, সার্ত্রে, কামু কিংবা হকস্থথ — এঁরা কেউই যেহেতু বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু নন, অতএব এঁদের জীবন এবং সাহিত্য-সম্পর্কিত কোনওরূপ পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত না হ'লেও এ ক্ষেত্রে বোধ হয় অন্যায় কিছু হবে না। রবীন্দ্রনাথও বর্তমান আলোচনার প্রত্যক্ষ লক্ষ্য নন: আমাদের আলোচ্য হচ্ছেন অন্নদাশঙ্কর রায়। কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও এই আলোচনায় অন্নদাশঙ্করকে প্রত্যক্ষে রেখে পরোক্ষে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি অনিবার্য। কেননা, আমার বিশ্বাস, একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনার আলোকেই সারস্বতশিল্পী অন্নদাশঙ্করের সামগ্রিক ভাবমূর্তিটি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তোলা যত সহজ, অন্য কারও সঙ্গে কোনওরূপ তুলনাতেই বোধ হয় তা তত সহজ নয়।

২.

অন্নদাশঙ্করের শিল্পীসত্তার অন্তঃস্থলে যে-মানুষটি নিবাতনিষ্কম্প শিখার মতো অনির্বাণ, সে-মানুষটির নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই একজন মানুষ, যাঁকে অন্নদাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যজীবনের একেবারে প্রথম থেকেই তাঁর অন্তরে আসন পেতে দিয়েছেন। অবশ্য আরও একজন আছেন, যাঁর সপ্রতিভ উপস্থিতিও তাঁর চিন্তনে-মননে অনস্বীকার্যরূপে স্পষ্ট। তিনি প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল, যিনি বিখ্যাত 'সবুজপত্রে'র মাধ্যমে আমাদের সাহিত্যে একদা 'সবুজ বিপ্লবে'র সূচনা করেছিলেন। কিন্তু আমরা যাকে

বলি 'রবীন্দ্রজীবনসাধনা', তা যেমন অন্নদাশঙ্করকে আকৃষ্ট করেছে সামগ্রিকভাবে, কোনও 'প্রমথজীবনসাধনা'ও যে তেমনই তাঁকে সামগ্রিক, এমনকী আংশিকভাবেও আকৃষ্ট করেছে, তেমন কোনও কথা, অন্তত তাঁর রচনা থেকে, আমাদের জানা নেই—যদিও তাঁর রচনারীতিতে প্রাথমিক প্রভাব একেবারেই অলক্ষ নয়। অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরী তাঁর মাত্র লেখকসত্তাকেই প্রভাবিত করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র জীবনসত্তাকেই আলোড়িত করেছেন। এখানেই তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবের মাত্রাগত পার্থক্য। তাঁর নিজেরই কয়েকটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করতে সহায়তা করবে। নিজের রচনারীতিতে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী—এই উভয়ের প্রভাব প্রসঙ্গে 'প্রমথ চৌধুরী, সবুজপত্র ও আমি' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টতই স্বীকার করেছেন, 'আমার নিজের স্টাইল রচিত হয়েছে এঁদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।' কিন্তু তাঁর উপর প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব অন্য দিক দিয়ে কিংবা আরও গভীরভাবে পড়েছে কি না, সে-বিষয়ে তিনি নিজেও যে একেবারে নিঃসংশয় নন, তার স্বীকৃতি রয়েছে বিশিষ্ট মননজীবী শ্রীশিবনারায়ণ রায়কে ৩১.৩.১৯৫২ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে লেখা তাঁর একটি চিঠির এই পংক্তিটিতে—'আমি বীরবলের (প্রমথ চৌধুরীর) উত্তরসাধক কিনা সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে সমগ্রতই তাঁর শিরোধার্য, এ-সম্পর্কে তাঁর কোনও সংশয়ী উক্তি তো নয়ই, বরং বিপরীতক্রমে নিঃসন্দিগ্ধ স্বীকৃতিই আমাদের নজরে পড়েছে। তাঁর 'জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের প্রারম্ভেই তিনি লিখেছেন—"প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর জীবন। তাঁর অন্যান্য কীর্তি বিলুপ্ত হ'য়ে যাবার পরও তাঁর এই কীর্তিটি জীবিত মানুষের আন্তরিকতম যে-জিজ্ঞাসা—'কেমন ক'রে বাঁচবো?' সেই জিজ্ঞাসার একটি সত্য ও নিঃশব্দ উত্তর হয়ে চিরস্মরণীয় হবে।"

উক্তিটি অন্নদাশঙ্করের জীবনে রবীন্দ্রনাথের আত্মিক উপস্থিতির স্বরূপ সম্পর্কে কিংবা তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথের নেপথ্য ভূমিকার গুরুত্ব বিষয়ে বিশেষ মূল্যবান। কেননা এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথের কবিরূপ, প্রবন্ধকার রূপ, সাংগীতিক রূপ, চিত্রশিল্পী রূপ এবং তাঁর যদি আরও কোনও অজ্ঞাত রূপ থেকে থাকে, তাকেও অতিক্রম ক'রে তাঁর 'জীবনশিল্পী' রূপটিই অন্নদাশঙ্করের মুগ্ধ দৃষ্টিতে কত মহিমান্বিত! কিন্তু কেন? রবীন্দ্রনাথের বহুবিচিত্রপ্রতিভা বিকশিত অন্য সব ক'টি দিককে অতিক্রম ক'রে এই বিশেষ দিকটি তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হ'য়ে প্রতিভাত হল কেন? প্রশ্নটির উত্তর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হ'লে আমরা দেখব, সেই উত্তরের শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে অন্নদাশঙ্করের অস্তিত্ববাদী জীবনপ্রত্যয়ের অনেক গভীরে, প্রসারিত হ'য়ে আছে তাঁর শিল্পীজীবনের কোমল মৃত্তিকার বহু নীচে। বস্তুত, "কেমনভাবে বাঁচবো?" প্রকৃত মানবতাবাদী ব্যক্তিমাত্রেরই সত্তামথিত এই আকুল জিজ্ঞাসা মানবতার পূজারি অন্নদাশঙ্করেরও অস্তিত্বের অতল থেকে উত্থিত ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। এবং তাঁর সাহিত্যশিল্পীসত্তার মর্মমূলে বিদ্ধ শায়কতীক্ষ্ণ এই প্রশ্নটির বিস্তারিত উত্তর রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য জীবনে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথের 'জীবনশিল্পী' রূপ তাঁকে এমন বিমোহিত করেছে। তা ছাড়া, অন্য সর্ববিধ বিশেষণ পরিহার ক'রে কেন যে তিনি 'জীবনশিল্পী' বিশেষণটি বেছে নিয়েছেন, তার হেতুরও একটা আভাস এর থেকে আমরা পেতে পারি। 'জীবনশিল্পী' রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটি তাঁর চোখে কেমন? তাঁর চোখে সেই মূর্তিটি তেমনই একজন নরোত্তমের, যিনি সমুন্নত মানবীয় সাধনায় বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির আদর্শ সমন্বয় ঘটিয়ে নিজের জীবনটিকে এক অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত করতে পেরেছেন। মানবীয় চিত্তবৃত্তি নিচয়ের এই যে আদর্শ সমন্বয়সাধন, আত্মজীবনকে সুষমায় মণ্ডন, অন্নদাশঙ্কর একেই বলেছেন জীবনের শিল্প, জীবনশিল্প; কেননা এরই ফলে সম্ভব হয় জীবনের পক্ষে শিল্পে উন্নীত হওয়া, শিল্পীত হ'য়ে ওঠা।

অন্য একটি দিক থেকেও বিষয়টির পর্যালোচনা করা যেতে পারে; তা হচ্ছে তাঁর রচনারীতিতে, বিশেষত ভাষাভঙ্গিমায়, রবীন্দ্রনাথের অদৃশ্য উপস্থিতি। সাহিত্যিক জীবনের সূচনা থেকেই তাঁর রচনাপ্রকরণে যে রবীন্দ্রমুখিতা স্পষ্টত লক্ষ করা যায়, তা শেষাবধি তাঁর রচনায়, নিজস্বতা সত্ত্বেও, অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত। অথচ রবীন্দ্রানুসৃতির এই স্থির পথ থেকে সস্তা জনপ্রিয়তার ঢালু রাস্তার আবিল আবর্তে বিচ্যুতির কোনও সম্ভাবনাই যে তাঁর দশকের কোনও কোনও সাহিত্যিকের মতো তাঁর সামনেও উন্মুক্ত ছিল না, তা নয়; কিন্তু সে-আবর্তে কদাচ তিনি নিজেকে সমর্পণ করেননি। তা না হ'লে, তাঁর ছাত্রজীবনের সমাপ্তিতে, ইংল্যান্ড থেকে সদ্য-প্রত্যাবর্তনকালে, আমাদের সাহিত্যের ঐতিহাসিক তিরিশের দশকের বুদ্ধদেব বসু বা বিষ্ণু দে-র মতো (এখানে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ এবং অমিয় চক্রবর্তীর নাম অনেক ভেবেচিন্তেই আমি অনুল্লিখিত রাখছি; যেহেতু এই তিন কবির কেউই কঠোর বিচারে 'রবীন্দ্রনাথবিরোধী' ছিলেন না, ছিলেন 'রবীন্দ্রস্বতন্ত্র') 'দুর্দান্ত' কবিরা প্রচণ্ড রবীন্দ্রবিরোধিতার যে-পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন, সেই পরিমণ্ডলের অধিবাসী হ'য়েও রবীন্দ্রবিরোধীদের পতাকাতলে সমবেত হ'লেন না কেন তিনিও সেদিন? এই প্রশ্নটিরও উত্তর এই যে, শুধু রচনারীতিতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ভর করেননি, তাঁর মানসভূমিতেও তিনি গ'ড়ে তুলেছিলেন প্রকাণ্ড এক ইমারত এবং এই বাস্তব সত্য সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন বলেই নিজের মনোজগৎটিকে শুধু তিরিশের দশকেরই নয়, ইদানীংকাল পর্যন্ত প্রসারিত সর্বপ্রকার রবীন্দ্রবিরোধী ক্রিয়াকলাপের বহির্ভূত রেখেছেন অতি সতর্কতার সঙ্গে।

৩.

অবশ্য এ-কথা ঠিক, 'কেমনভাবে বাঁচব?'— তাঁর স্রষ্টাজীবনের বিভিন্ন পর্বে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত এই মূল প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে তিনি কেবল রবীন্দ্রনাথকেই শরণ করেননি, উচ্চ-নীচ কিংবা মুখ্য-গৌণ নির্বিশেষে বহু জনের বহু মনের দুয়ারে দুয়ারেই করাঘাত করেছেন তিনি। এ-বিষয়েও তাঁর নিজের স্বীকৃতির সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। জীবনের পথের সংকেত কোন কোন ধরনের মানুষদের কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন, সে-সম্পর্কে পূর্বোল্লিখিত 'প্রমথ চৌধুরী, সবুজপত্র ও আমি' প্রবন্ধে তাঁর উক্তি — 'জীবনের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন নারী ও পুরুষের কাছে আমি বিভিন্ন সংকেত পেয়েছি। তাঁদের অনেকের নাম সাধারণের অজানা। জানিয়ে কাজ নেই। যাঁদের সকলে চেনে তেমন কয়েকজনের নাম বাঙালীর মধ্যে চণ্ডীদাস, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী। ভারতীয়দের মধ্যে গান্ধীজী। মানবজাতিদের মধ্যে টলস্টয়, রঁলা এলেন কেই, গ্যেটে, চেখভ।'

কিন্তু কেবল নিজের আন্তর প্রশ্নের উত্তর সন্ধানেই এঁদের দ্বারস্থ হননি তিনি, একই সঙ্গে এইসব বরেণ্যের জীবনসাধনার স্রোতে নিজের জীবনকে মিলিত করার গভীর আকাঙ্ক্ষায় এঁদের অসমাপ্ত 'মহৎ' কর্মকাণ্ডকে সমাপ্তির পথে পরিচালিত করার গুরুদায়িত্বকে সহিষ্ণুর মতো স্বস্কন্ধে তুলে নিতেও উৎসুক হয়েছেন। নয়ত ওই প্রবন্ধেরই অন্যত্র তিনি কেন লিখতে যাবেন, 'আমি স্বীকার করি যে টলস্টয় যে কাজ অসমাপ্ত রেখে গেছেন বা যে-কাজে ফাঁক রেখে গেছেন, সে-কাজ আমার উপরেও বর্তেছে। তেমনি রবীন্দ্রনাথ যে-কাজ সারা করে যেতে পারলেন না, যে-কাজে হাত দিতে সময় পেলেন না, সে-কাজ আমার উপরেও পড়েছে। তেমনি প্রমথ চৌধুরী যে-কাজে বাধা পেলেন, যে-কাজে ভঙ্গ দিলেন, সে-কাজ আমার উপরে চেপেছে।' এবং তাঁর ততোধিক মানবীয় স্বীকারোক্তি, 'কর্তব্য থেকে পালিয়ে কেউ কখনো সুখী হয় নি।'

এই হচ্ছেন অন্নদাশঙ্কর, আমাদের অন্নদাশঙ্কর—এ-পার বাংলা ও ও-পার বাংলায় সম্মিলিত জীবনসাধনার দীপ্ত দীপশিখা অন্নদাশঙ্কর রায়, যিনি নিখিল মানবতাবাদীদের অসমাপ্ত জীবনকৃতিকে সমাপ্ত করাকে একান্ত পবিত্র কর্তব্য বলে স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সুব্যাপ্ত জীবনবোধ, সর্বমাঙ্গলিক অন্তরাভিলাষ, 'কেমনভাবে বাঁচবো?' প্রশ্নকে বীজমন্ত্রের মতো জীবনে ধারণ করে তন্ন-তন্ন আত্মসন্ধান—অর্থাৎ, যাকে বলা যেতে পারে যথার্থ মানবতন্ত্রীর মৌল জীবন জিজ্ঞাসা, যা রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর থেকে বাঙালি সাহিত্যিকদের মধ্যে ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসছে, তাঁর মধ্যে পাই ব'লেই তিনি স্বতন্ত্র, এই সামগ্রিক জীবন জিজ্ঞাসাতেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। আর, সাহিত্যচর্চা এবং জীবনচর্চা—এই উভয়েই তাঁর অন্তরের বিবেক-প্রদীপটি অনির্বাণ ছিল বলেই তাঁকে আমরা জেনেছি 'দীপিত বিবেক' অন্নদাশঙ্কর রূপে।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের স্মরণে প্রয়াত পরিমল চক্রবর্তীর
শেষ লেখা ছিল এটি। লেখাটি চতুরঙ্গ দপ্তরে দিতে
আসার সময় তিনি পথদুর্ঘটনায় মারা যান।

নদীসংযোগের সর্বনাশা প্ল্যান; প্রাণীহিতে প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্যের বিধান; ডারউইন তত্ত্বের একদেশদর্শিতা ও 'খণ্ডিত বিজ্ঞানে'র উৎপত্তি

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

নদীসংযোগের সর্বনাশা প্ল্যান

ভারত সরকার সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে দেশের বড় বড় নদীগুলিকে সংযুক্ত করা হবে। তাতে নাকি ভারতের কোথাও জলাভাব থাকবে না। সরকারের এ সিদ্ধান্তে বিরোধী দলগুলিও খুব খুশি; বিপুলভাবে তাঁরা এই সিদ্ধান্তের সমর্থন জানিয়েছেন। দুঃখ হয় রাজনৈতিক দলগুলির চিন্তার দৈন্য দেখে। অটলবিহারী বাজপেয়ী বোধ হয় ভেবেছেন এই নদীসংযোগকাণ্ড চালু করার ফলে ভারতের ইতিহাসে তাঁর নাম অমর হয়ে থাকবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যদি কাজ হয়, তবে ভারতভূমিকে অনুর্বর বন্ধ্যাভূমিতে ও নুনপাহাড়ের দেশে পরিণত করার জন্য পৃথিবীর লোক তাঁকে অবশ্যই স্মরণ করবে। দেশকে সব দিক দিয়ে দেউলিয়া করার এই বাহাদুরির ভাগীদার অবশ্যই হবেন এ কর্মে সরকারের সহযোগী বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ। চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুরলঙ্গ ভারতভূমিকে দীর্ঘমেয়াদি পতিতভূমি বানাতে পারেনি। বাজপেয়ী-আদবানি-সোনিয়া গান্ধী পারবেন। পরিবেশ ও নদীবিজ্ঞান বিষয়ে অনভিজ্ঞ কতিপয় শীর্ষ আদালতের বিচারকও সেই বাহাদুরির অংশভাগী হবেন।

মাটি, নদী, পর্বত, বন আমাদের জীবন ও জীবিকার ভিত্তি। তাদের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও পাঠ না নিয়েই আমাদের দেশে নেতা গজিয়ে ওঠে। তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই ধরনের সিদ্ধান্ত। আমাদের দেশের কর্ণধারেরা ভেবেছেন, সারাদেশের রাস্তাঘাটের network যদি বানানো যায়, তা হলে নদীসমূহের network বানানো যাবে না কেন?

স্যার আর্থার কটন শতাব্দী-অধিক কাল পূর্বে ভারতের নদীগুলি সংযুক্ত করার কথা বলেছিলেন। তাঁর ভাবনা ছিল কীভাবে দেশের ভিতরে নাব্যতা যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা যায়। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে, ১৯৭০ দশকে ড. কে. এল. রাও প্রস্তাবটি আবার ওঠান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, দেশে সেচের যথাসম্ভব বৃদ্ধি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন। প্রস্তাবটি কার্যকরী করার পথে যে দুস্তর technological বাধা ছিল, যে অভাবনীয় অর্থ ও বিদ্যুৎ ব্যয়ের ঝুঁকি ছিল তা বিবেচনা করে প্রস্তাবটি বর্জন করা হয়েছিল; কিন্তু মৌলিক প্রশ্নগুলি তখনও অবহেলিত ছিল। স্যার কটন ও ড. রাও উভয়েই বিশ্ববিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন কিন্তু ইঞ্জিনিয়াররা সাধারণত তাঁদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বাইরে অন্য কিছু ভাবনা-চিন্তার বিষয় যে থাকতে পারে, সে সম্বন্ধে নিস্পৃহ থাকেন। বিশেষজ্ঞতার সাধনায় তাঁরা "Tunnel View"এর বন্দি হয়ে পড়েন।

নদীর কার্যকারিতা (functions) কী, সে প্রশ্ন সর্বপ্রথমেই বিবেচনা করার দরকার ছিল। সে প্রশ্ন কর্তারা তোলেননি। আমিও প্রথমে তুলব না এঁদের চিন্তাজগতের সীমানার মধ্যেই যে প্রশ্ন

সহজেই ওঠার কথা, সে বিষয়গুলির ব্যাপারেও এঁরা বিশেষ কিছু ভাবনা-চিন্তা করেছেন কি না, তা উদঘাটিত করার জন্য।

নদীসংযোগ প্রকল্পের ঘোষিত উদ্দেশ্য উদ্বৃত্ত অঞ্চলের জল ঘাটতি এলাকায় পাঠানো। তা হলে প্রথমেই জানা দরকার, কোন কোন এলাকা জলের দিক দিয়ে উদ্বৃত্ত হওয়ার সৌভাগ্যভাগী? উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা (basin) ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোনও উদ্বৃত্ত-জলের এলাকা আছে কি? গঙ্গার জল যে সমস্ত প্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তারা প্রায় সকলেই প্লাবিত হয় এক মরসুমে, আবার অন্য ঋতুতে জলাভাবে পীড়িত হয়। এই যে এক ঋতুতে বন্যা, অন্য ঋতুতে জলসঙ্কট, এই দ্বৈত অবস্থা কিসের জন্য ঘটে?

আরও কতকগুলি প্রশ্ন ওঠা উচিত ছিল দেশে এত সেচবিস্তারের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করার জন্য। শুধু ধান ও আখ ছাড়া কি কোনও শস্য আছে, যাতে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়? চাষিরা বলেন, অন্য সব শস্যের চাহিদা ঈষৎ সিক্ততায় মিটে যায়। তা হলে সর্বত্র flow irrigation-এর জন্য এত অতি তোড়জোড় কেন? সেচব্যবস্থা নিশ্চয়ই জরুরি, কিন্তু মিতপরিমাণের অতিরিক্ত সেচ মাটিকে লোনা করে ছাড়ে। সে ক্ষেত্রে যাঁরা ধানের পর ধান একই মাটিতে একই বৎসরে চাষ করেন, তাঁরা দীর্ঘস্থায়ী অনুর্বরতা ডেকে আনেন, আপাতলাভের লোভে। পশ্চিম এশিয়ার মেসোপটেমিয়া একদা ছিল সভ্যতার পীঠস্থান। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সেচের ফলে গত তিন হাজার বৎসর ধরে সেই ভূমি আবাদের অযোগ্য হয়ে আছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পশ্চিম পাঞ্জাবে — বর্তমানে পাকিস্তানে — লয়ালপুর, মন্টগোমারি ও সারগোদা সমৃদ্ধির নিদর্শন ছিল। বে-হিসেবি সেচের কারণে এলাকাগুলি এখন উর্বরতায় নিম্নশ্রেণীভুক্ত। FAO বহু বৎসর পূর্বে জানিয়েছিল, সেচসিক্ত ভূমিগুলির শতকরা ৩০ ভাগেরও বেশি অনুর্বর হয়ে গেছে। বিশ্ববিখ্যাত ভূমিবিদ স্বর্গত Prof Kovda জানিয়েছিলেন যে flow irrigation ভুক্ত জমিগুলির শতকরা ৮০ ভাগই লবণাক্ত অবস্থার শিকার হতে চলেছে। এ সব দৃষ্টান্ত থেকে আমরা শিক্ষা নেব না? ভারতীয় এলাকায় পাঞ্জাবে ও সারদা সহায়ক ক্যানালের command area-তে যে waterlogging ও খেতি ভূমিতে লবণসঞ্চয় সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা দেখেও flow irrigation--এর মোহে আবিষ্ট থাকব? রাজস্থানে ইন্দিরা গান্ধী ক্যানাল থেকে যে সব এলাকায় flow irrigation ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, সে সব এলাকার জমিতে নুন যে জমছে, তা সমীক্ষা করার কথা ভেবে দেখছি কি? স্বল্পবৃষ্টির এলাকায় flow irrigation জমির উপর তাড়াতাড়ি নুন জমিয়ে তোলে, কারণ সেখানে তাপের দহনে জল উবে যায়, নুন পড়ে থাকে। আর প্রচুর বৃষ্টির এলাকায় সেচ প্রণালীর সঙ্গে নিষ্কাশন (drainage) প্রণালী না থাকলে বিপদ ঘটে।

অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু— এই দুই রাজ্যেই প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। তবুও এই দুই রাজ্যেই বেশি দাবি ওঠে অন্য অববাহিকা থেকে জল টেনে আনার জন্য। এর কারণ কি এই নয় যে এখানকার ধনী চাষিরা একের পর এক ধান কিংবা আখের চাষ করতে চাইছেন জমির ক্ষতি করেও—অথবা রাজ্য সরকার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্বপ্ন দেখছেন?

কোনও নদীকে তার মোহানা থেকে বিচ্ছিন্ন করে যদি অন্য নদীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়, তাতে যে কী ক্ষতি হয়, সে কথায় পরে আসব। তার আগে একটি অতি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতেই হয়। ব্রহ্মপুত্রের জল গঙ্গায় কীভাবে আনা হবে, সে সম্বন্ধে সঠিক নির্ণয় সম্ভব হয়েছে কি? ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বকালে এই সংযুক্তি প্রস্তাব বাতিল হয়েছিল technological challenge-এর অভূতপূর্ব জটিলতা ও খরচের বিপুলতার বহর জেনে। তা ছাড়া বিন্ধ্যপর্বতের উপর জল pump করে তুলে তাকে দক্ষিণদেশে নিতে গেলে ৯০,০০০ মেগাওয়াট খরচ হবে, এ কথা শুনে সকলে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। তার বিকল্প হিসাবে আজ NAWDA যে প্রস্তাব রেখেছেন, তা কতটা কার্যকরী হবে, সে বিষয়টি প্রস্তাবক ইঞ্জিনিয়ারদের গণ্ডির বাইরে অন্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে কি? সেই বিকল্প প্ল্যান সরকারিভাবে প্রকাশ করে জনমত আমন্ত্রণ করা হল না কেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে?

ধরে নিলাম, সংযোগের সব technological challenges অতিক্রম করে ব্রহ্মপুত্রের জল গঙ্গায় আনা হয়েছে এবং বিন্ধ্যাচলের বাধা এড়িয়ে জলসম্ভারকে দক্ষিণমুখী করা সম্ভব হচ্ছে। সেখানে কি নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে না? এমনিতেই পূর্ব বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ অভিযোগ করে আসছে যে উত্তর প্রদেশে বহু সংখ্যক বড় বড় সেচপ্রণালী জল টেনে নেওয়ার ফলে তারা যথেষ্ট জল পাচ্ছে না। এখন তাদের সে অভিযোগ তীব্রতর হবে। "যত বেশি সেচ, ততই ভাল", এই যদি নীতি হয়, তা হলে উড়িষ্যার লোক প্রাচুর্যের অজুহাতে অনেক বেশি সেচপ্রণালী তৈরি করে মহানদীর জল গোদাবরী পর্যন্ত পৌঁছানোর পথে বাধা তৈরি করবে না? তাতে কি রাজ্যে-রাজ্যে বিবাদ আরও ছড়িয়ে পড়বে না এবং নিজ নিজ জমির সর্বনাশ ডেকে আনবে না? তা ছাড়া, বাংলাদেশের সঙ্গে গঙ্গার জলবন্টনের যে চুক্তি ১৯৯৬ সাল থেকে চলে আসছে, তাতে ফরাক্কায় জলের পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ভারত চুক্তিবদ্ধ। তার ব্যত্যয় হলে বাংলাদেশ কি একটা আন্তর্জাতিক বিবাদ হিসাবে বিশ্বের দরবারে তোলপাড় করে ছাড়বে না?

সুপ্রিম কোর্টের সামনে পেশ করা estimate অনুযায়ী এই প্রকল্পে ৫৫৬০০০ কোটি টাকা খরচ হবে। পৃথিবীতে কোনও প্রকল্পে এত খরচের কথা কখনও শোনা যায়নি। খরচ যদি এই

অঙ্কের দশ ভাগের এক ভাগও হত, তা হলেও এ প্রকল্প সমর্থনযোগ্য ছিল না, কারণ তার চেয়েও কম খরচে দেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের বিকেন্দ্রিক water harvesting technique মারফত প্রতিটি গ্রামকে জলে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যায়। রাজস্থানের মতো স্বল্পবৃষ্টির রাজ্যে এই সত্য প্রতিষ্ঠা করার পর সরকারি মহলও এ কথা মোটামুটি মেনে নিয়েছিলেন, যদিও বড় বড় সংগঠনের ইঞ্জিনিয়াররা তাতে অস্বস্তিবোধ করছিল। ভারত সরকারও বোধ হয় সন্দিগ্ধ ছিলেন। তাই পৃথিবীর কোথাও যার তুলনা মিলবে না, এমন বিশাল ও জটিল প্রকল্প গ্রহণ করে জানিয়ে দিলেন যে বারিপাত ধারণ ও সংরক্ষণে বিকেন্দ্রিক rainwater harvesting -এর কার্যকারিতায় তাঁদের সত্যকার বিশ্বাস ছিল না। বিপুল অর্থব্যয়, কন্ট্রাক্টর নিয়োগ ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ দৃঢ়করণ ব্যতীত তাঁরা ভরসা বা শান্তি পান না।

এই প্রজেক্টের প্রস্তাবকরা যুক্তি দেখাবেন, বিকেন্দ্রিক জলধারণ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থায় স্বাভাবিক বৎসরে প্রয়োজন মিটতে পারে, কিন্তু ৪/৫ বৎসর অনাবৃষ্টি হলে কীভাবে সামাল দেবে? হিমালয়ের হিমবাহ-গলানো জল ছাড়া তখন উপায় থাকবে না। এ ধরনের বানানো যুক্তির উত্তরে এইটুকু বলা যায় যে পরপর ২/৩ বৎসর অল্পবৃষ্টি হলেও বিকেন্দ্রিক ব্যবস্থা সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে পারে। Percolation tank -এর যে পরম্পরা ছিল, তাতে বাষ্পীভবন এড়িয়ে, ভূগর্ভে জল সংরক্ষণ করে এ ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করা যায়। সরকার এতদিন conjunctive storage of water — অর্থাৎ খালবিল-পুকুরে surface storage— এর সঙ্গে ভূগর্ভে জলসংরক্ষণ— ব্যাপারে যে অমৃতবাণী পরিবেশন করছিলেন, তাতে সরকারের নিজেরই বিশ্বাস এত ঠুনকো ছিল?

যদি ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসর অল্পবৃষ্টির বদলে সম্পূর্ণ শুষ্কতার মতো অভাবিত ঘটনা ঘটে, তা হলে নিউক্লিয়ার লবণমুক্তি (nuclear desalination) মারফত সমুদ্রজলকে ব্যবহারযোগ্য করার যে সুমহান উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়, সেই technique কে ব্যাপকভাবে প্রয়োগযোগ্য করার দিকে মনঃসংযোগ করা যায় না? হিমবাহের জল পাওয়ার ভরসায় বিপুল ব্যয়ে এই যে নদী-সংযোগ করা হচ্ছে, সে গুড়েও তো বালি পড়ছে— climate পরিবর্তনের কারণে হিমালয়ের snowline যে পিছু হটছে। সুতরাং অভূতপূর্ব অতি ভয়ঙ্কর জলসংকটের কল্পনা করে অতি-বড় দৈত্য-প্রকল্পে শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় না করে, বর্তমানের চেয়ে কিছু কঠোর জলাভাবের মোকাবিলা করার জন্য সর্বপ্রকার বিকেন্দ্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত নয় কি? তা যদি করি, সেইটিই হবে প্রতি গ্রামে "জলের স্বরাজ"।

বিকেন্দ্রিক ব্যবস্থা বলতে বোঝায় চেক ড্যাম, rooftop water harvesting, খাল, ঝিল, ঈরি, বাউড়ি, পাহাড়ের পাদদেশে circular পরিখা, farm pond, সিমেন্ট-করা catchment ও জালি (sieve) সমন্বিত dug well, percolation tanks, ভূগর্ভস্থ structure এবং aquifer এ জলসংরক্ষণ ব্যবস্থা। (খেতি জমিতে soil organic matter বাড়ালে তার spongy চরিত্রের জন্য প্রচুর জল সংরক্ষণ হয়, তাতে কৃষিরও সুবিধা হয়।) এই প্রকার বিবিধ ব্যবস্থা নিলে সকল প্রকার ন্যায্য চাহিদা — পানীয় জল, মানুষ ও পশুর স্নানের জল, মিতব্যয়ী সেচের জল, run of the way technique -এ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জলের চাহিদা মিটবে।

এখন আসা যাক মৌলিক প্রশ্নে, যে-আলোচনা সর্বপ্রথমে না করে শেষ দিকে করছি। নদীর কাজ কী? তা শুধু শহরে-নগরে জল সরবরাহ করা ও গ্রামে সেচের জলের সিংহভাগ সরবরাহ করা নয়। নদীর প্রধান কাজ : (১) অববাহিকার salts and toxins সমুদ্রে নিয়ে ফেলা; (২) নদীর মোহানায় (estuaries) -এ মিষ্টি জল বয়ে নিয়ে যাওয়া, যাতে সমুদ্রের লোণাজল ও এই মিষ্টি জলের মিলনজনিত উথলপাথলের ফলে মাছ, seafowl, কাঁকড়া, ঝিনুক প্রভৃতি জলজ প্রাণী প্রজননের মহোৎসবে মেতে ওঠে (যাতে স্থলজ ও জলজ প্রাণীর খাদ্যভাণ্ডার ভরে ওঠে); (৩) hydrological cycle রক্ষা করা; (৪) সমুদ্রে detritus (বালি নুড়ি জাতীয় পদার্থ) বয়ে নিয়ে যাওয়া, সেখানে phytoplanktons -এর খাদ্য হিসাবে। নদীর হালকা মিষ্টি জল যদি সমুদ্রে না যায়, তা হলে সমুদ্রে বাষ্পীভবনের প্রক্রিয়া কমে যাবে, ফলে স্থলাঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণও কমবে। সমুদ্রের phytoplanktons যদি তাদের খাদ্য না পায়, তা হলে তারা oxygen ছাড়তে পারবে না। মনে রাখা দরকার, পৃথিবীতে যত oxygen, তার বৃহত্তর অংশ এই phytoplankton দেরই দান।

যদি নদীর জল সমুদ্রে পড়তে না পেরে এই network -এর মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকে, তা হলে যে সব salts ও toxins সমুদ্রে যেতে পারত, তা না গিয়ে সেচের জমিতে জমে থাকবে। ফলে ক্ষুদ্র মেসোপটেমিয়ার ভাগ্যে যা ঘটেছিল, সমগ্র ভারতের ভাগ্যে সেই দশা ঘটবে। আমরাই বৃষ্টিপাত কমিয়ে দেওয়ার কারণ ঘটিয়ে নিজেদের ভাগ্যকে seal করে দেব। রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ অধ্যায়ে "রোগশয্যা"য় লিখেছিলেন :

"যমরাজ দিল যবে ধ্বংসের বিধান
আপন হত্যার ভার আপনিই নিল মানুষেরা।"

এই প্রকল্প তার-ই এক দৃষ্টান্ত।

জনগণের এ কথা মনে রাখা দরকার যে প্রতিটি নদীর আপন বিশিষ্ট বৈভব (properties) আছে, যা অন্য সব নদীর থেকে পৃথক। এই বৈভবের প্রকৃতি নির্ভর করে তার উৎপত্তিস্থল এবং তার অববাহিকার চরিত্রের উপর। শুধু জলের hardness বা

softness-এর তফাত নয়, তফাত আছে তার mineral contents, তার স্বচ্ছতার এবং ফলত aeration (হাওয়া খেলার) এবং oxygenation -এর পরিমাপে, তার electro-chemical বৈভবে। এই সব বৈভব-পার্থক্যের ফলে বিভিন্ন নদী বিভিন্ন প্রকার জলজ প্রাণীর লীলাক্ষেত্র। গঙ্গায় যে ইলিশ মাছ জন্মে, অন্য নদীতে তা জন্মে না। Dolphins পাওয়া যায় মাত্র কয়েকটি নদীতে, তা-ও আছে তাদের মধ্যে প্রকারভেদ। জলজ কোনও প্রাণী ও জলস্তরোপরি বিচরণশীল কোনও পক্ষী বা পতঙ্গ সমগ্র জীবনপ্রবাহে—এমনকী মানবহিতে—কী ভূমিকা পালন করে বা করবে, তা আমরা কেউ জানি না। সুতরাং কোনও প্রাণীরই জন্ম বা বিচরণক্ষেত্র নষ্ট করে দিলে নিজেদেরই ক্ষতি। উল্লেখ্য যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বহু মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে Tellico dam তৈরি যখন শেষ হতে চলেছে, এমন সময় কোর্ট আদেশ দিল এ বাঁধ রাখা চলবে না কারণ dart fish নামক এক অতি ক্ষুদ্র মাছ শুধু ওই নদীতেই পাওয়া যায়। আমাদের দেশে যদি আমরা নদীগুলির বৈশিষ্ট্য লোপাট করে দিই, তা হলে বহু প্রকার মাছ, শামুক, পাখি, পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। কী অমূল্য সম্পদ হারাব, তা অজানা থাকবে।

পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি নিয়েও বলি, অন্যায্য চাহিদা ওঠে যখন পাঞ্জাবের মতো অনতিপ্রচুর বর্ষণের এলাকায় ধান চাষ করা হয়, তামিলনাড়ে একই বৎসরে ধানের পর ধানের চাষ করা হয়, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটকে আখের চাষ ব্যাপক হয়। এই ধরনের অস্বাভাবিক কৃষিতে শুধু যে ভূমি অনুর্বর হয় তা নয়; সমাজের balanced food উৎপাদনও বিঘ্নিত হয়। এর বিকল্প আছে, যা সব দিক দিয়ে শ্রেয়, এমনকী চাষির অর্থাগমের দিক দিয়েও।

খ্যাতনামা কৃষিবিশেষজ্ঞ ড. আই সি মহাপাত্র বলেছেন, "কর্ণাটকে সেচবিহীন বারিনির্ভর এলাকাতে রাগি, জোয়ার, বজরা, কুলথ কলাই, অড়হর, চিনাবাদাম, রেড়ি ও নারিকেল চাষ করা যায়। সেচসিক্ত জমিতে চাষিরা আখ, মকাই (ভুট্টা), বেগুন, লঙ্কামরিচ, তুঁত, টোম্যাটো, আলু, হলুদ, আদা, আঙ্গুর, কলা ও পান (betel) এর মধ্যে বেছে নিতে পারেন। তামিলনাড়ে নদীর অববাহিকায় (basin) শতকরা ৬২ ভাগ ক্ষেত্রে তিনবার ধান চাষ হয়—কুরুবাই, থালাদি এবং শম্বা; অথচ এমনভাবে চাষ করা যায় যে এক শম্বা ধানই থালাদি ও কুরুবি শস্যের চেয়ে অনেক বেশি ফসল দিতে পারে। ধান ছাড়াও এ রাজ্যে রাগি, চিনাবাদাম, তিল, রেড়ি, মাশকলাই, মুগডাল ও তুলা চাষ করা যায়। তুলা এই সকল শস্যের মধ্যে একটি শস্যের স্থান পেতে পারে।" ড. মহাপাত্র আক্ষেপ করে বলেছেন যে কর্ণাটকে ১১ হাজার waterharvesting structures বুজে যাচ্ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা জানি, তামিলনাড়ে যে "ঈরি" system-এর কার্যকারিতা এক সময় বিস্ময় উদ্রেক করত, সেগুলিও মজে যাচ্ছে। তামিলনাড় নদীর বুকে sandquarry (বালিখনন) করতে দিয়ে নদী নষ্ট করেছে। অপরিশুদ্ধ ময়লা জল (untreated effluents) নদীতে হরদম ঢালতে দিয়েছে। চেন্নাই শহরের বুক দিয়ে যে "কুম" নদী বয়ে চলেছে, তাকে নদী না বলে পূতিগন্ধময় খোলা নর্দমা বলা যায়। এ ভাবে নদী ও জলাধার নষ্ট করে ও অসঙ্গত শস্যের খেতি করে জলাভাবের জন্য বিলাপ অশোভন।

উত্তর ভারতের নদীসমস্যা গত সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। তাদের siltation rate পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশি। নদীর অগভীরতার কারণে বর্ষাকালে বাঁধ উপচিয়ে প্লাবন আসে আবার অন্য ঋতুতে জলাভাব ঘটে। সুতরাং সেখানে প্রাথমিক কর্তব্য dradging ও নদীর উভয় তীরে উৎস হতে বদ্বীপ পর্যন্ত সুপরিসর বনসৃষ্টি। এ সমস্ত জরুরি কাজ অবহেলিত হবে নদী-সংযোগের আড়ম্বরে।

এক কথায়, এই প্রকল্প অভূতপূর্ব অর্থব্যয়ে জাতিকে দেউলিয়া করার প্ল্যান, বহু সহস্র বৎসরের জন্য ভারতের উর্বর ভূমিকে ঊষর করার প্ল্যান, বহুবিধ প্রাণীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত করার প্ল্যান — ভারত ধবংসের প্ল্যান, অভিপ্রায়ে না হলেও বাস্তবত।

প্রাণীহিতে প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্য

এই রচনার প্রথম পর্বেই বলেছিলাম, "প্রাকৃতিক ব্যবস্থার মধ্যেই জীবনপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যথাযোগ্য সম্পদের আয়োজন আছে। প্রকৃতির নিয়ম পালন করে চললে সমাজে অনটনের কোনও সম্ভাবনা নেই। অবশ্য তাতে অতিপ্রাচুর্যের ব্যবস্থা নেই; তা থাকলে দায়িত্বজ্ঞানহীন ও বেহিসাবি খরচের অবকাশ থাকত।" এ কথার মধ্যে পৃথিবী বা তদন্তর্ভুক্ত কোনও ecosystem-এর carrying capacity-র সীমাবদ্ধতার অস্বীকৃতি নেই। জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি ঘটলে—প্রাণী (animal) জগতের পিরামিডের শীর্ষদেশ অতি ভারাক্রান্ত হলে সব কিছু ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও স্থৈর্য নষ্ট হয়ে যাবে, এ সত্যেরও অস্বীকৃতি নেই। মানুষ apex animal, তার জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি ঘটলে প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম "inter-species balance" বিঘ্নিত হবে। সে জন্যই তা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তবে দারিদ্র ও অপুষ্টি দূরীভূত হলে ও gender equality প্রতিষ্ঠিত হলে মনুষ্যজনসংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই সীমিত হয়ে যাবে।

প্রকৃতির মধ্যে জীবনপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে কী বিস্ময়কর আয়োজন ও সুষম বিধান আছে, তার সামান্য কয়েকটি

দৃষ্টান্ত এখানে দেব। এই পরিচিতি থাকলে প্রকৃতিজয়ী বিজ্ঞানের কথা মনে কখনও স্থান পেত না।

পৃথিবী (The Earth) নামে আমাদের এই গ্রহ সৃষ্টির প্রথমকালে বায়ুমণ্ডলে carbon dioxide ছিল অত্যধিক, oxygen ছিল না বিশেষ। ধীরে ধীরে CO_2 শুষে নেওয়ার ও বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ছেড়ে দেওয়ার জন্য উদ্ভিদের জন্ম হল। অক্সিজেনের আবির্ভাবে অক্সিজেন-নির্ভর প্রাণীদের জন্ম সম্ভব হল। উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ ও আত্মিক যোগাযোগের ভিত্তি পরিবর্ধিত হল carbon-oxygen-hydrogen cycle-এ। সূর্যালোকের সাহায্যে উদ্ভিদের পাতাগুলি বায়ুমণ্ডল থেকে CO_2 টেনে নিয়ে আপন মূল থেকে তুলে আনা জলের oxygen ও hydrogen উপাদানগুলি সংযুক্ত করে তৈরি করে carbohydrate molecules, কয়েকটি প্রক্রিয়ায়। সেই carbohydrates প্রথমে উদ্ভিদ দেহে অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে ভোজ্য হিসাবে সব প্রাণীকে (animal) carbon সরবরাহের উৎস হয়।

কার্বন ছাড়া কোনও জীবকোষ তৈরি হতে পারে না, এই কথা মনে রাখলে এই photosynthesis প্রক্রিয়ার গুরুত্ব বোঝা যাবে। স্থলে যেমন মাটিভিত্তিক উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে CO_2 টেনে নিয়ে carbohydrates তৈরি করে, সমুদ্রের phytoplanktons সেইভাবে সমুদ্রজলে মিশে থাকা (dissolved) CO_2 টেনে নিয়ে চারপাশের জল থেকে পাওয়া oxygen, hydrogen-এর সঙ্গে বিভিন্ন reaction প্রক্রিয়া মারফত carbohydrates তৈরি করে। সেখানে উৎপন্ন carbohydrates মাছ ও জলজ প্রাণীর দেহপুষ্টি করে; আর সমুদ্রোপরস্থিত বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেওয়া oxygen জলভাসি প্রাণীর শ্বাসের কাজে লাগে। এই photosynthesis process আজও এক বিস্ময়; আর তৎসৃষ্ট chemical energy of carbon bonds আরও এক বিস্ময়। এই carbon এর অভিযান molecule থেকে molecules-য়ে; জীবকোষ থেকে জীবকোষে; প্রাণী থেকে প্রাণীতে; প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ক্রমারোহী ধারায়। অবশেষে উদ্ভিদ ও প্রাণীর এবং তৎসহ decomposer জাতীয় প্রাণীর *শ্বাসপ্রশ্বাস* মারফত বায়ুমণ্ডলে carbon-এর প্রত্যাবর্তন carbondioxide রূপে।

উল্লেখ্য যে উপরি-উক্ত carbohydrates আবার sugar, starch, cellulose, lignin হিসাবে বিভক্ত হয়। তাদেরও ভিন্ন ভিন্ন কাজ আছে। সেই broken-down পদার্থসমূহের কাজের আলোচনা ছেড়ে দিয়ে এখানে শুধু এইটুকু বলা দরকার যে অন্য এক cycle থেকে নাইট্রোজেন এলে তবেই এই suger-এ প্রাণসঞ্চার হয়। আর তখনই নাইট্রোজেন-উদ্বুদ্ধ শর্করা nucleic acid ও protein -এর সংশ্লেষণে (synthesis) প্রবৃত্ত হতে পারে। Carbon-oxgen-hydrogen চক্র এইভাবে জীবনসৃষ্টি ও জীবনরক্ষা করে। তবে সেখানেও অন্য চক্র থেকে সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

এখন আসতে হয় Nitrogen চক্রে। এই Cycle-এর ক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ও বিস্ময়কর। মনে হয় প্রকৃতি যেন এখানে মূর্ত হয়ে উঠে প্রতিটি পদ নিজেই design করছে, নিজেই পরিচালনা করছে। নাইট্রোজেন গ্যাস বায়ুমণ্ডলের ৭৮ ভাগ জুড়ে আছে। এই গ্যাস বড় অলস ও অ-মিশুক। অন্যের সঙ্গে সহজে react করতে চায় না। অথচ বায়ুস্তর থেকে একে নীচে না নামালে nucleic acids ও proteins -এর সংশ্লেষণ হবে না। ফলে কোনও living tissues তৈরি হবে না। তাকে ভূমিস্তরে আনার জন্য প্রকৃতির কত রকম ব্যবস্থা! বজ্রনির্ঘোষে, বিদ্যুৎস্পর্শে photochemical reaction ঘটিয়ে তাকে নামিয়ে দিতে হয় ভূমিস্তরের দিকে। Biosphere-এ nitrogen পৌঁছালে leguminous জাতীয় ছোট ছোট গাছ ও তৃণগুল্মের মূলস্থিত nodule-এ যে bacteria থাকে, তারাই তাকে টেনে নিয়ে মাটিতে প্রোথিত (fix) করে। ক্ষুদ্র bacteria-র এ এক অভাবিত শক্তি!

তবুও শুধুমাত্র nodulated bacteria-র উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর না করে প্রকৃতি কয়েক প্রকার fern, algae (শ্যাওলার জাত) ও কিছু free-living (অর্থাৎ nodule বহির্ভূত) bacteria কেও — যথা azotobacter, clostridium প্রভৃতিকেও এই একই শক্তি দিয়ে রেখেছে। আবার বিভিন্ন গাছপালা, তৃণগুল্ম ও প্রাণীদের মৃতদেহ পচনের সময় decomposer জাতীয় বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী (micro-organisms) ওই সব দেহের অন্য উপাদান থেকে nitrogen-কে পৃথক করে mineral nitrogen -এ পরিণত করে। তার পরের অধ্যায়ে শুরু হয় nitrogen কে মাটির সঙ্গে আবদ্ধ (bound) অবস্থা থেকে মুক্ত করে তাকে গাছপালার ব্যবহারযোগ্য করে তোলা।

মাটিতে fixed অবস্থা থেকে nitrogen কে এক ধাপে মুক্ত হওয়ার উপায় প্রকৃতি দেয়নি। কিছু nitrogen মুক্তি পায় ammonia হিসাবে; nitrogen-এর অপর অংশকে মুক্তি পেতে হয় ধাপে ধাপে, প্রথমে nitrite রূপে। পরে nitrate রূপে। সব রকমের মুক্তি ঘটে soil microbes-এর মাধ্যমে। বলে রাখা ভাল যে, যে-নাইট্রোজেন মাটি থেকে ammonia হিসাবে মুক্তি পায়, তা-ও পরে nitrate এ পরিণত হয়ে protein তৈরি করে। সেখানে ammonia to nitrate to protein to ammonia র এক ছোট চক্র বৃহত্তর nitrogen cycle এর মধ্যে কাজ করে।

প্রকৃতির কাজের ধারা বোঝার উপর বারে বারে গুরুত্ব দিয়েছি। বুঝতে হবে প্রকৃতি কেন বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন গ্যাসকে নিষ্ক্রিয় থাকার ব্যবস্থা করেছে। নাইট্রোজেন যদি সক্রিয় অর্থাৎ

সহজে reaction -উন্মুখী হত, তা হলে কি ঘটত? বন্দি নাইট্রোজেনকে মাটি থেকে ধাপে ধাপে মুক্তি না দিয়ে যদি এক সঙ্গে মুক্তি দেওয়া হত, তা হলে কী ঘটত? বিভিন্ন রূপেই বা বন্দি nitrogen কে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হল কেন?

প্রথমত, প্রকৃতি যদি বায়ুমণ্ডলের nitrogen gas -কে নিষ্ক্রিয় থাকার ব্যবস্থা না করত, যদি তা সহজেই অন্যের সঙ্গে মিলিত হতে পারত, আর তাকে সহজেই biosphere-এ capture করা যেত, তা হলে সারা পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে যেত আর সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে nitrous oxides তৈরি হত, যে oxide-গুলি ozone স্তরকে সৃষ্টির প্রথম যুগেই ছিন্নভিন্ন করে ফেলত। বায়ুমণ্ডলে প্রচুর যে nitrogen, তা সক্রিয় হলে বহু প্রকারের proteins তৈরি করত, যা সমস্ত জীবজন্তু ও উদ্ভিদের পক্ষে toxic হয়ে উঠত। পৃথিবীতে জীবনকে স্থায়িত্ব দিয়েছে সজীব ও নির্জীব matter-এর যে মিথস্ক্রিয়া (interaction), সেই interaction-এর ভিত্তিই ধ্বংস হয়ে যেত।

দ্বিতীয়ত, নাইট্রোজেন যদি মাটি থেকে এক ধাপেই nitrate হিসাবে মুক্তি পেত, তা হলেও বিষে ভরে যেত। বিভিন্ন শক্তি মাটির রসে (soil sap) যে পরিমাণে sugars, enzymes release করছে, তার তুলনায়—অর্থাৎ আনুপতিকভাবে— বেশি পরিমাণে nitrates released হয়ে আসত। সেই nitrate- কে plants absorb করতে পারত না। তাতে plant পুষ্টির কাজ তো হতই না, বরং উল্টা ফল ফলত। মাটি থেকে সেই nitrate leached out হয়ে যেত। ভূগর্ভস্থ জলস্তরে চলে গিয়ে groundwater বিষাক্ত করত, নতুবা খালে-বিলে চলে গিয়ে nitrate poisoning ঘটাত।

প্রকৃতির বিধানে নাইট্রোজেন শেষ পর্যায়ে nitrate ion হিসাবে মুক্তি পায় যাতে plant root hairs তাকে টেনে নিয়ে আত্মস্থ করতে পারে। Root hairs টেনে নিতে পারে শুধু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অদৃশ্য particles-কে, যারা electrically charged. এইভাবে charged না হলে root cells-এ প্রবেশ করার মতো energetics (শক্তি) যে তাদের থাকবে না। মাটিতে nitrogen fixation-এর পরে এই দ্বি-ধাপ মুক্তিকে বলে nitrification. এই কাজের জন্য নিযুক্ত bacteria -দের বলা হয় nitrifying bacteria.

তারপরে আরও কথা আছে। এত কড়াকড়ি ব্যবস্থা সত্ত্বেও যদি কোনও কারণে মাটিস্তরে nitrate-এর পরিমাণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকত, তা হলে বিষ ছড়িয়ে পড়ত, মাটিও acidic হয়ে যেত। তাই সেই plant -এর অব্যবহার্য nitrate -কে molecular nitrogen-এ রূপান্তরিত করে বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। প্রকৃতি সেই কাজটি দিয়েছে denitrifying bacteria-র উপর।

যেখানে নাইট্রোজেন সম্বন্ধে এত কারণে প্রকৃতির এত বেশি কড়াকড়ি, সেখানে যখন কোনও বিজ্ঞানীকে বলতে শোনা যায়, "যদি নাইট্রোজেন তৈরি করে ভরিয়ে দিতে পারতাম, তা হলে কতই না ভাল হত", তখন বুঝতে বাকি থাকে না বিজ্ঞান কীভাবে অ-বিজ্ঞান হয়ে যায়। তবে এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায়, আমরা যদি প্রকৃতির বিধান বুঝে দেশে আরও বেশি compost সার তৈরি করতাম, blue green algae ও azolla pinnata fern -এর চাষ করতে পারতাম, leguminous plants চাষে উৎসাহ দিতাম, বহু প্রকারে লভ্য organic সার ব্যবহার করতাম, তা হলে দেশ জুড়ে সুষমভাবে nitrogen fixation-এর ব্যবস্থা হতে পারত। (প্রকৃতির বিধান না মেনে ফ্যাক্টরিতে তৈরি fertiliser — যার ব্যবহারে এত safeguard কখনও থাকতে পারে না তা যে কী সর্বনাশ করেছে, সে আলোচনা ভবিষ্যতে করা যাবে।)

ফসফরাস সম্বন্ধে প্রকৃতির ব্যবস্থা অন্য রকম। ফসফরাস বড় মিশুক, বড় reactive. তাই বায়ুমণ্ডলে তার প্রবেশের অনুমতি নেই — শুধু dust রূপে ছাড়া। Rock phosphate deposits স্থানে স্থানে আছে। মাটিতে যা organic phosphorous আছে, তাকে অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য phosphate salts এর স্থায়ী রূপ দিয়ে মাটির সঙ্গে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা আছে। সে দায়িত্ব পালন করে phosphatising bacteria. তারপর বৃষ্টি শুরু হলে সেই phosphate -কে দ্রবীভূত করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ion -এ পরিণত করা হয়। এ কাজ করে phosphatobacter এবং অনুরূপ soil micro-organisms। তারা enzyme নিঃসৃত করে এই কাজ সম্পন্ন করে। ঝাড়ুদার যেমন জঞ্জাল একত্র করে, তেমনই এই সব soil micro-organisms উদ্ভিদের চারিধারের phosphates একত্র করে।

প্রকৃতির আর এক আশ্চর্য দান mycorrhizal fungi। যখনই মাটিতে nitrogen, phosphate বা অন্য কোনও nutrients -এর অভাব ঘটে, যার ফলে নির্দিষ্ট মাটিতে বেড়ে ওঠার হকদার গাছ পুষ্টিলাভ করতে পারছে না, তখনই মাটির নীচে mat -এর মতো বিছানো এই mycorrhizal fungi এক অদ্ভুত কর্মকাণ্ডে মেতে ওঠে। তারা অতি সূক্ষ্ম সুতার মতো। এরা গিয়ে plant cells আক্রমণ করে আত্মবিলুপ্তির জন্য। সেখানে root cell গুলি তাদের টেনে নিয়ে আত্মস্থ করে নেয়। Nutrients -এর অভাব ঘুচে যায়। তারা এই কাজ করে কারণ উদ্ভিদের সঙ্গে এদের ভাগ্য জড়িত। উদ্ভিদ থেকে এরা carbohydrate গ্রহণ করে কিন্তু বিশেষ কোনও কোনও nutrient-এর অভাবে যদি উদ্ভিদ গড়ে উঠতে না পারে, তা হলে তারাও carbohydrate থেকে বঞ্চিত হয়। মজার কথা, protein synthesis-এর জন্য

প্রয়োজনীয় পদার্থ— nitrogen, phosphates প্রভৃতি পদার্থ যদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, সেখানে কিন্তু mycorrhizal fungi বাড়তে পারে না। এইভাবে শুধু nutrient অভাবগ্রস্ত জায়গাতেই প্রকৃতি এদের বিকাশের ব্যবস্থা করে রেখেছে।

প্রকৃতির ব্যবস্থায় যেমন গাছের পাতার মাধ্যমে একটা গড়ে তোলার (building up) process আছে — যার ফলে Carbohydrates, proteins, fats ইত্যাদি এবং গাছের কাঠামো গড়ে ওঠে— তেমনি উল্টা এক process-ও আছে। তাকে বলে breaking down process। এর ফলে জৈব পদার্থকে ভেঙে অ-জৈবিক অবস্থায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম mineral salts -এ পরিণত করা হয়। Phosphorous, potassium, calcium, manganese, sodium, iron, magnesium, zinc, copper, boron প্রভৃতি রূপে তারা সঞ্চিত থাকে, যাতে পরে তাদের ionised অবস্থায় রূপান্তর ঘটিয়ে plant root hairs টেনে নিয়ে আত্মস্থ করতে পারে। এই বিভিন্ন salt -এর বেশ কিছু অংশ ভবিষ্যতে কাজে লাগার জন্য মাটির তলায় সঞ্চিত থাকে। অতি হীন (poorest of the poor) topsoil -এর নীচেও এই reserves থাকে, যাকে ব্যবহার করতে হয় গভীরে শিকড় পাঠাতে দক্ষ গাছপালার সাহায্যে। তা ছাড়া earthworms এর মতো প্রাণী আছে, যারা মাটিকে উর্বর করে। Vermicast অতি সমৃদ্ধ জৈব সার। কৃষিকে chemicalisation -এর পথে নিয়ে যাওয়ার পর সাধারণ মানুষ যখন দেখতে পেল যে বহু দিক দিয়ে সর্বনাশ ঘটছে, তখন জৈব কৃষিতে ফিরে এসে vermicasting-এর সাহায্যে (কেঁচোর তৈরি মাটির ছাঁচ) অনেক বেশি ফসল পেতে শুধু করছে।

এই প্রাকৃতিক পথে গেলে "Green counter-revolutions" এর পথে যেতে হত না। আজও genetic engineering এর পথে যাওয়ার কোনও প্রয়োজনই নেই।

প্রকৃতির কর্মকান্ড চলে বৈচিত্রের মাধ্যমে। জড় ও জীবজগৎ—অর্থাৎ জড় পরিবেশ এবং উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানুষ নিয়েই এই বৈচিত্র। তাদের মধ্যে এবং সেইসঙ্গে সৌরশক্তির সঙ্গেও এদের প্রতি অংশের নিত্য আদানপ্রদান। আর প্রকৃতির কর্মনীতি Recycling, Symbiosis ও antibiosis—এই তিন নীতির আশ্রয়ী। তাই যাঁরা নিজেদের জড়পরিবেশ ও আঞ্চলিক উদ্ভিদ ও প্রাণীজগাতের সম্পদকে রক্ষা করেন এবং প্রকৃতির উক্ত ত্রয়ী নীতির সার্থক প্রয়োগে সক্ষম হন, তাঁরাই দীর্ঘমেয়াদি সমৃদ্ধির শিখরে যেতে পারেন। এর মধ্যে শুধু একটি দিক নিয়ে ১৯৯৬ সালে গোয়ার The other India Book Store 'The Organic Farming Source Book' নামে একটি বই প্রকাশ করেছিল। তারপরে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত বিবরণ আরও চমকপ্রদ। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইল।

ডারউইনের একদেশদর্শিতা ও খণ্ডিত বিজ্ঞানের উৎপত্তি

এই ধারাবাহিক সন্দর্ভ পাঠকদের কাছ থেকে যে সমাদর পাচ্ছে, তা আমাকে গভীর প্রেরণা দিয়েছে। তবে আমার সুপরিচিত একজন "মার্ক্সবাদী" activist আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সমালোচনা পাঠিয়ে এক মৌলিক দিক আলোচনা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। প্রারম্ভে (৬১ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যায়) "পরিবেশ বিজ্ঞান উন্নত সভ্যতা স্থাপনের দিগ্‌দর্শন" শিরোনামায় মার্কস, লেনিন ও মাও-সে-তুং-এর দৃষ্টির সীমাবদ্ধতার আলোচনা করে লিখেছিলাম "সহজাত প্রকৃতিসম্পদের মধ্যে যে সব গুণ আছে .... তাতে বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বহু সংখ্যায় বিকেন্দ্রিক/ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা যায় যার দূষণ সামান্য, পরিবেশবিজ্ঞান থেকে আসে। মহামনীষী কার্ল মার্কস প্রকৃতির এই গুণের সন্ধান পাননি। তাই বিশাল শিল্পগঠনে তাঁর সম্মতি ছিল আর কেবল জাতীয়করণের মধ্যে সমস্যার সমাধান ও শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি খুঁজেছিলেন। ...... জাতীয়করণের নামে রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা সমর্পণের ফরমুলা হয়েছিল তাঁর একমাত্র সম্বল, যার বিষময় পরিণতি পরে প্রত্যক্ষ হয়েছিল।" সমালোচক বন্ধু লিখেছেন, "আপনার কথা মানতে গেলে তো ডারউইনকে অস্বীকার করতে হয়।" প্রথমে কথাটা আমার বুঝতে কষ্ট হয়েছিল। ডারউইনকে অস্বীকৃতির কথা আবার কোথা থেকে এল? পরে উপলব্ধি করলাম, ডারউইন-পাঠে প্রকৃতিকে রুক্ষ, কঠোর ও জীবজগাতের প্রতিকূল মনে হতে পারে। ১৯৪০ সালে যখন আমি প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির recruit হতে চলেছিলাম, তখন আমাকে বলা হয়েছিল : what man has made of man .. শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রাম যখন শেষ হয়ে যাবে, তারপর থেকে চলতে থাকবে শুধু প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম। প্রকৃতি নির্মম, নিষ্ঠুর এই ছবি আঁকা হয়েছিল। আমার প্রবন্ধে বিপরীত কথা—প্রকৃতির মধ্যে আছে life-support system, আছে মিতাচারী জীবনযাত্রার সব উপাদান বৈষম্যহীন বন্টনের মাধ্যমে।

ডারউইন তত্ত্বে জীব বনাম প্রকৃতির অবধারিত প্রতিকূল সম্পর্কের কথা ছিল না। প্রাণীজগাতের সমস্ত species এর মধ্যে প্রতিযোগিতার কথা ছিল। পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য species-দের মধ্যে সে প্রতিযোগিতা।

ইতিহাসে ডারউইনের স্থান থাকবে এক বিশেষ কারণে। "ঈশ্বর প্রতিটি species কে পৃথক মনোযোগ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন", প্রচলিত এই ধারণাকে তিনি উল্টে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

নব animal-এর একটিমাত্র ancestor (পূর্বসুরি) ছিল। তা থেকে বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারে—ও মানুষে—বিবর্তন ঘটেছে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। তিনি আরও বলেছিলেন, এই বিবর্তন ঘটেছে ধীরে ধীরে ক্রমিক পদক্ষেপে অবিরাম। কোনও আকস্মিক jump এর সম্ভাবনা যে থাকতে পারে, তা-ও তিনি মেনে নেননি।

তাঁর মূল বক্তব্য, জীবজগতের মধ্যে অবিরাম প্রতিযোগিতা চলছে। species-এর সঙ্গে species-এর প্রতিযোগিতা। আবার species এর অভ্যন্তরে ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে সে-ই, প্রকৃতি যাকে বেছে নিয়েছে, অনুগ্রহ করেছে শ্রেষ্ঠ endowment (জীবনবৈভব) দিয়ে। সর্বব্যাপী প্রতিযোগিতার জগতে বাঁচার জন্য চাই competitive দক্ষতা। সে জন্য চাই স্বার্থবুদ্ধি। যে পুস্তকে তিনি এই তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন, তার নাম ছিল "The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for life."

প্রকৃতি যে বিশেষ কোনও race বা ব্যক্তিকে বেছে নেয়, অনুগ্রহ করে—তা কিসের ভিত্তিতে? বিভিন্ন species-এর মধ্যে এবং একই species-এর অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্যষ্টির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার বৈভবের সৃষ্টি ও পুষ্টি কীভাবে হয়, এ প্রশ্নে তাঁর উত্তর, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যের প্রকারভেদে। এই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি কোথায় এবং তার মধ্যে প্রকারভেদ আবার কীভাবে ঘটে, ডারউইনের থিওরিতে তার ব্যাখ্যা মেলে না। ডারউইন থিওরির কয়েক বৎসর পরে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়ান কৃষিবিশারদ (horticulturist) Gregor Mendel তাঁর Theory of Genetics প্রকাশ করেন এবং ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তা পুনরাবিষ্কৃত হয়ে বিপুল সমাদর লাভ করে। তাতে উত্তরাধিকার বৈশিষ্ট্যের প্রকারভেদের কারণ হিসাবে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হল, তা সম্ভাব্য বিবেচিত হওয়ায় ডারউইনপন্থীরা সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করলেন। ডারউইনের অন্যান্য বক্তব্য পূর্ববৎ রয়ে গেল।

মেন্ডেল বললেন, bisexual প্রজননের ফলে সৃষ্ট gamete-এ বিস্তর প্রকারভেদ ঘটে; এই gamete -এর chromosome-এ কোনও ক্ষেত্রে পুরুষ parent-এর প্রভাব শতকরা একশো ভাগ থাকলে থাকতে পারে, আবার কোনও ক্ষেত্রে স্ত্রী-জাতীয় parent -এর একশত ভাগ প্রভাবও থাকতে পারে। এই ব্যাপারে কোনও ঠিকঠিকানা নেই। পুরুষ-স্ত্রীর মিলনজাত সন্তানের chromosomes কী ধরনের হবে, সে ব্যাপারটা একেবারেই random। ডারউইনপন্থীরা এই ব্যাখ্যা মেনে নেওয়ার পর থেকে ডারউইনের বিবর্তন থিওরি আর মেন্ডেলের Genetics তত্ত্বের সঙ্গম ঘটল। তাই একের মতবাদের আলোচনায় অন্যের তত্ত্ব এসে পড়ে।

ডারউইন যে সর্বত্র প্রতিযোগিতা দেখতে পেয়েছিলেন, তার উত্তরে Peter Kropotkin (যিনি রাশিয়ান অভিজাতবংশজাত হয়েও চাষিদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, সে জন্য দেশে বিদেশে জেল খেটেছেন এবং নিজের Prince উপাধি ত্যাগ করেছিলেন) বহু উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে বিবর্তনে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা উভয়ের ভূমিকা ছিল কিন্তু সহযোগিতার ভূমিকাই ছিল সমধিক। আজ পর্যন্ত কেউ Kropotkin কে ভুল প্রতিপন্ন করতে পারেননি। সে জন্য সর্বব্যাপী ও সর্বনিয়ামক প্রতিযোগিতার দর্শনকে সঠিক বলে মেনে নেওয়া যায় না।

স্বার্থসাধনাই আত্মরক্ষার মূলমন্ত্র, এ বক্তব্য ডারউইন তত্ত্বের একটি স্তম্ভ। ডারউইন নিজেই ১৮৫৯ সালে বলেছিলেন, "আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও যদি কোনও species স্রেফ পরার্থপরতার প্রেরণায় চালিত হচ্ছে, এমন একটি species -ও যদি পাওয়া যায়, তা হলে আমার থিওরি বাতিল বলে পরিগণিত হবে।"

(Natural Selection cannot possibly produce any modification in a species exclusively for the good of another species, though throughout Nature one species necessarily takes advantage of, and profits by, the structure of others ..... If it could be proved that the structure of any one species had been formed for the exclusive good of another species, it would annihilate my theory, for such could not have been produced by natural selection.') আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় তাঁর এই উক্তির ফলে বহু বিজ্ঞানীই আজ তাঁর natural selection theory বাতিল করে দিচ্ছেন কারণ জীববিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করেছেন "পরোপকারে আপন সার্থকতা" নীতির অনুশীলন করেই বেঁচে আছে, এমন কতিপয় প্রাণী। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে Scripps Institute of Oceanography র বিজ্ঞানী Conrad Limbaugh এরূপ কয়েকটি species এর বিবরণ দিয়েছেন। Lower California র golden kelp perch, Pendersen's shrimp. একজাতীয় মাকড়সা এবং La Senorita নামক এক প্রাণীর মধ্যে তিনি এই প্রকার ঝুঁকি নিয়েও পরোপকারী ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেছেন। লক্ষ লক্ষ species -এর মধ্যে মাত্র এই কয়েকটি ব্যতিক্রম নয়। এ শুধু এক জায়গায় এক বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত কয়েকটি species -এর তালিকা।

পূর্বেই বলা হয়েছে বিবর্তনতত্ত্বের মূল কথা ছিল, প্রকৃতির অনুগ্রহ সেই সব race পায়, যারা স্বতন্ত্র গুণের অধিকারী আর সেই স্বতন্ত্র গুণগুলি তারা পায় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যে। ডারউইনপন্থীরা Mendelian genetics ভালভাবে মেনে

নেওয়ার ফলে hereditary বৈশিষ্ট্যের উৎস দাঁড়াল genome অর্থাৎ totality of genes, তা হলে ডারউইন তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যাপারটা দাঁড়াল প্রাণী (species বা race) প্রকৃতির অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয় শুধু genome-এর গুণে। এতে পরিবেশের প্রভাব নেই, cultural upbringing-এর কোনও দান নেই। Gene-ই সর্বনিয়ামক।

উল্লেখ্য যে, ডারউইনের পূর্বে Jean Baptiste Lamarck নামক এক ফরাসি প্রাণীবিজ্ঞানী (zoologist) ঠিক উল্টো কথা বলেছিলেন। ডারউইনের বক্তব্য ছিল, information অর্থাৎ নির্দেশ সব সময় প্রবাহিত হয় ভিতর থেকে বাহির অভিমুখে। মেন্ডেলীয় পরিভাষায় ডারউইনের বক্তব্য দাঁড়াল, nucleic acid থেকে নির্দেশ যায় proteins-এ, তারপর সমগ্র দেহযন্ত্রে এবং আরও বাহিরে। লামার্ক বলেছিলেন, নির্দিষ্ট পরিবেশে বাস করতে গিয়ে প্রাণী কিছু অভাব বোধ করে এবং সেই অভাব পূরণের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকে। পরিবেশপ্রেক্ষিত একটানা ক্রিয়াকর্ম সুদীর্ঘকাল ও বহু প্রজন্ম ধরে চলতে থাকলে প্রাণীর মধ্যে এক প্রবণতা জন্মে এবং তার অবয়বেও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটতে থাকে—প্রথমটা অবশ্য অলক্ষে, পরে দৃশ্যত। ফলে তার সন্তানসন্ততির মধ্যে অবয়বী ও ব্যবহারিক পরিবর্তন সঞ্চারিত হয়। লামার্কের এই তত্ত্ব inheritance of acquired characteristics নামে পরিচিত। লামার্কের মতে variation এর নির্দেশ আসে বাহির থেকে ভিতরে—পরিবেশ থেকে, cultural upbringing জনিত প্রেরণাশক্তি থেকে—প্রাণীর অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তিতে। লামার্ক কখনও প্রাণীকে—তার মধ্যে মানুষকেও—gene নিয়ন্ত্রিত বস্তু বানিয়ে ছাড়েননি, যা ডারউইন-ভক্তরা করছেন। লামার্ক প্রাণীর কর্মকাণ্ডকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে বর্তমান লেখকের ধারণা, variation -এর নির্দেশ একটি two-way process; feedback এর ধারা বহে ভিতর থেকে বাহিরে, আবার বাহির হতে ভিতরে। লামার্ক অবহেলিত হয়েছেন বলে ডারউইন আলোচনায় লামার্কের উল্লেখ করতে হল।

ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের আরও দিক আছে। যা পরবর্তীকালে ধোপে টেকেনি। আকস্মিক jump এর সম্ভাবনা তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেও আজ তা স্বীকৃত। তবে সে আলোচনায় এ প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত না করাই ভাল।

ডারউইনের একদেশদর্শী সত্যানুসন্ধান, সর্বত্রই রক্তচক্ষু প্রতিযোগিতা দর্শন, সহযোগিতার দৃষ্টান্তসমূহের প্রতি অন্ধত্ব ও স্বকীয় স্বার্থচেতনার positive quality র গুণগান সমাজের পক্ষে বিষময় হয়েছে। শোষকশক্তি এই বৈজ্ঞানিক অর্ধসত্যকে তাদের কাজের সাফাই হিসাবে ব্যবহার করতে পারছে। পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ দাবি করতে পারছে, তারা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, উচ্চ কর্মদক্ষতা ও সৃজনীশক্তির জোরে স্বদেশে ও বিদেশে ক্ষমতায় সমাসীন; সুবিধাবাদের নীতিভ্রষ্টতা তাদের স্পর্শ করতে পারেনি কারণ তারা যা করেছে তা শুধু আত্মরক্ষার কর্তব্যপালনে। সফল stockbroker এর পুঞ্জীভূত ধনরাশি তাদের বুদ্ধিবৃত্তির সমুচ্চতার ফল, survival of the fittest -এর নিদর্শন। আর দরিদ্র জনতা অসীম দুঃখভোগ করে কারণ তাদের gene নিম্নস্তরের, তাদের বুদ্ধি কম, কর্মদক্ষতা কম, জন্ম থেকেই তারা high achievement এ অপারগ। সমাজব্যবস্থার — উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার— কোনও দোষ নেই! প্রকৃতি-বিজয়-অভিলাষী, অতি-পুঁজি-অনুরাগী, জনমারণমুখী, পরিবেশবিধ্বংসী প্রযুক্তিবিদ্যার আজ বিপুল সমাদর যে দর্শনের কল্যাণে, তারও কোনও দোষ নেই! বর্তমানের একমাত্র কাজ "ভজ gene -কৃষ্ণ, জপ gene-কৃষ্ণ" কারণ gene-ই ভিতর থেকে বাহিরের সব কিছুকে— দেহযন্ত্র ও কৃষি থেকে বিশ্বব্যবহারকে—নিয়ন্ত্রণ করে না কি? ডারউইন ও মেন্ডেলের শিক্ষা যে ছিল "From in to the out".

এই "একপেশে" শিক্ষা যারা ধ্রুব হিসাবে মনে করে Gene এর মধ্যে সব সমস্যার উৎপত্তি এবং gene বদলের মধ্য দিয়ে সব সমস্যার নিষ্পত্তি খোঁজেন—যাঁরা মনে করেন gene therapy তে রোগ সারাবেন, শস্যবৃদ্ধি করবেন—তাঁদের কে বোঝাবে যে (i) organisms -এর structural blueprint এ কোনও gene এর অপরিবর্তনীয় স্থান (constancy) নেই; (ii) পরিবেশের সহিত জীব (organism) সমূহের সব সময় আদান-প্রদান ও অদল-বদলের পালা চলছে এবং সেই পালার অঙ্গে জীবকে adjust করতে হয় এবং সেই adjustment-এর কারণে জীবের মধ্যে genes ও genome এর base sequence (অনুক্রম)-এর পরিবর্তন ঘটে; (iii) কোনও gene-ই বিশেষ কোনও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য control করে না, কারণ genome-এর structural পুনর্বিন্যাসে — অর্থাৎ পরিবর্তিত sequence -এ — একই gene ভিন্ন ধরনের ব্যবহার করে; (iv) কোনও gene বদল করলে পরিবর্তিত genomic এবং cellular কাঠামোয় নতুন নতুন রোগজীবাণু (pathogen) সৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠবে। শুধু gene নিয়ে কোনও organism হয় না। কীভাবে organism বিকাশলাভ করে, সে প্রশ্ন এড়িয়ে গেলে চলবে কেন?

ব্রিটেনে Open University'র অধ্যাপিকা এক খ্যাতনামা জীববিজ্ঞানী Dr Mae-Wan-Ho -র অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক বিশ্লেষণের উল্লেখ এখানে করতেই হয়। পাশ্চাত্যের ভাবধারার প্রবণতা আছে বহুমুখী বাস্তবতার একটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা এবং সেদিকে সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করা। ফলে অন্য দিকগুলি বাদ পড়ে যায়। এই ধরনের প্রবণতার ফলে সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে এসেছে তিনটি বিশেষ doctrine,

যাদের কেন্দ্রবিন্দুতে বসানো হয়েছে এবং যাদের একদেশদর্শী বাণী "খণ্ডিত বিজ্ঞানের" (reductionist science তথা fragmented science -এর) জন্ম দিয়েছে। এই তিনটি হল Newtonian mechanics; ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব (যা Origin of species by natural selection এ বিধৃত); এবং Mendel এর Genetics.

(ক) Newtonian mechanics এর কেন্দ্র হচ্ছে force–force of gravity এবং তৎসঙ্গে law of motion। সুতরাং চাপ, তাপ, বেগ (pressure, temperature, velocity) জাতীয় কয়েকটি parameter এবং quantitative estimation (পরিমাণগত পরিমাপ) হচ্ছে বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র, যা non-living systems (যথা planetary bodies ও machines) অনুসন্ধানের পক্ষে উপযোগী। প্রাণীজগতের (plant ও animal জগতের) অনুসন্ধানক্ষেত্রে এই মন্ত্র হয়ে দাঁড়ায় প্রতিবন্ধক, কারণ সেখানে থাকে অগণিত variables, অঙ্কে যার পরিমাপ সম্ভব নয়। তা ছাড়া নিউটনীয় বিজ্ঞান রূপ, রস, গন্ধ অর্থাৎ quality সম্পর্কিত সব কিছুকেই বিজ্ঞানের আওতা থেকে নির্বাসন দিয়েছে।

(খ) ডারউইনের বিবর্তন থিওরি—প্রতিযোগিতায় দক্ষতা যেখানে জীবনরক্ষার উপায়, স্বকীয় স্বর্গে মগ্নতা যেখানে প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম—বলা যায় ঐশ্বরিক বিধান। (রবীন্দ্রনাথ "স্বার্থমগ্ন যে জন, বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখন-ও শেখেনি বাঁচিতে" বললে কী হবে?)

(গ) মেন্ডেলের Genetics, যাতে মনে হয় জীব যেন শুধু genes-এর সমষ্টি। জীবনের বহুবিধ জটিলতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে gene-কে দেখার শিক্ষা দেয় এই তত্ত্ব। Gene-সমূহের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার (interaction) কথা ভুলিয়ে দিতে চায় এই শিক্ষা। জীবকোষ ও জাগতিক পরিমণ্ডলও যে gene এর প্রকাশভঙ্গি নির্ধারণ করে, সে কথা অস্বীকার করে এই তত্ত্ব। Physiological, physiochemical, psychocultural দিকগুলি ঢাকা পড়ে যায়। (অবশ্য Mendel নিজেই স্বীকার করেছিলেন, তাঁর দৃষ্টি ছিল সীমিত ক্ষেত্রে।)

এই ত্রয়ীর সংযোগ Reductionist বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে। এই বিজ্ঞানের মূল কথা (guiding principle) হচ্ছে যে জটিল system-কেও ভালভাবে বোঝা যায় তার simplest units অধ্যয়ন করে (by reducing the system to its simplest parts)। ছেঁটে দেওয়া অংশগুলি সাধারণ মানুষের (common people) জীবনধারণ ও মর্যাদাপ্রতিষ্ঠাভিমুখী পথের উপর আলোকসম্পাতের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। "খণ্ডিত বিজ্ঞানের" paradigm -এর ছত্রতলে ভৌতিক বিজ্ঞান ও শক্তি প্রয়োগ-সম্পর্কিত প্রযুক্তিবিদ্যাসমূহের (physical sciences and force-application-oriented technologics) প্রভূত উন্নতি ঘটলেও জীববিজ্ঞানের (life sciences) বিকাশ ব্যাহত হয়। ফলে মানবমুক্তির পথেও বাধা এসে যায়।

গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা এখনও যাঁরা দেননি, যথাশীঘ্র সম্ভব তাঁদের তা মিটিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে এ বিষয়ে চিঠি দেওয়া সম্ভব নয়, তাই গ্রাহকদের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার আবেদন।

বার্ষিক গ্রাহকচাঁদা ৭২ টাকা। বিদেশবাসী গ্রাহকদের চাঁদা US। $ 12 "CHATURANGA" নামে স্থানীয় গ্রাহকরা চেক/ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠাতে পারেন। বৎসরের যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ছোটগল্প

এ পরবাসে

মীনাক্ষী ঘোষ

মৌচাকের মতো হাউসিংটার ৩২৫ নম্বর খোপ থেকে উঁকি মেরে চেতনা বলল, "এই এত সব কাদের বাড়ি?" গ্রাম থেকে আসা নতুন বউয়ের মূর্খামিতে সস্নেহে বলল শৈলেন, "কেন? যারা থাকে তাদের।" — "নিজের বাড়ি?" — "তা কী করে বলব? অদ্ভুত প্রশ্ন!"

অদ্ভুত প্রশ্নটার টনিকেই চেতনার মন বেড়েছে — নিজের বাড়ি মানে আসলে কী? জ্ঞান হয়ে অবধি শুনেছে যেখানে তার বাস সেটি নাকি নিজের বাড়ি নয়। মা, ঠাকুমা সর্বক্ষণ বলতেন, "মেয়ে হল গে পরের বাড়ির ধন।" কুড়ি বছর দু'মাস সেখানে কাটাবার পর এই তার নিজের বাড়িতে সদ্য পা রেখেছে সে অথচ ভীষণ বুক টিপ টিপ।

শ্বশুর শাশুড়ি সমাদর দেখাতে লাগলেন প্রথমটা—"আহা পরের বাড়ির মেয়ে।" অমনি বুক টিপ টিপ। কী উপায়ে ঘোচানো যায় পরের বাড়ির দাসত্ব, কোন যাদুতে নিজের বাড়িতে বাস করতে পারবে সে — শত মাথা ঘামিয়ে এবং অজস্র পরিশ্রমের বিনিময়েও চেতনা খুঁজে পেল না বছরের পর বছর। অতি পরিশ্রম দেখলে শ্বশুর বলেন শাশুড়িকে, "পরের বাড়ির মেয়ে। বেশি খাটিও না। অসুখ করলে তোমারই বদনাম।" শাশুড়ি গরম তেলে আড় মাছ-এর মতো ফটাস করে ওঠেন, "হুঁঃ সুখ তো যত পরের বাড়ির মেয়ের জন্যই। আমি যে অসুখে মরছি কে দেখে। যাও গো পরের বাড়ির মেয়ে শুয়ে থাকো গে, আমিই করে নেব।"

পরের বাড়ির পরাধীনতার দুঃখ যখন চেতনার বুকটাকে একেবারে খান খান করে ফেলে তখন সে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়— যে যাই বলুক শৈলেশ তো তাকে পরের বাড়ির মেয়ে মনে করে না।

এক সন্ধ্যেয় অফিসের বিস্তর ঝামেলা সামলে বাড়ি ফেরা মাত্রই শৈলেশকে শুনতে হল, "হাড় মাস ভাজা ভাজা ....।" মায়ের এই উত্তপ্ত সম্বর্ধনা সেদিন আর সহ্য হল না শৈলেশের। অবিলম্বেই শুরু হল মা-ছেলের তুমুল বাক্ যুদ্ধ। শান্তির আশায় চেতনা অগত্যা নিজের স্বামীকেই বলতে লাগল, "আহা, তুমি থামো না। চুপ করো না।" বেসামাল শৈলেশ প্রথমটায় পাত্তাই দিল না, শেষে জোরে ধমকে উঠল, "তুমি চুপ করো। আমরা মা-ছেলে কথা বলছি। এর মধ্যে তুমি পরের বাড়ির মেয়ে....।"

অনেক রাতে মশারি গুঁজতে গুঁজতে চেতনা শৈলেশকে বলে, "নিজের বাড়ি মানে আসলে কী বলত?" যদিও বাড়িতে তখন গুমোট নৈঃশব্দ তবু সজোরে শৈলেশ জবাব দিল, "তোমার মুন্ডু।" রাত ক্রমশ আরও বাসি হতে লাগল। এ-ঘরে, ও-ঘরে ঝগড়া-ক্লান্ত মা-ছেলের ঘুমের গভীরতা সরবে ঘোষিত। কেবল চেতনার দুই চোখ মশারি ভেদ করে, অন্ধকার ছিঁড়ে জানালার ওপারে অসংখ্য বাড়ির দিকে। বুক জুড়ে তার উপড়ানো গাছের যন্ত্রণা।

পরাধীনতার দুঃসহ কষ্টের মধ্যেই চেতনার এক সময় ছেলে হল এবং সে ছেলের বউও ঘরে এল। নাতবউ আসার কিছু আগেই পিঠোপিঠি শ্বশুর শাশুড়ি মরেছেন। শৈলেশের চুলে পাক ধরেছে কিন্তু চেতনার যন্ত্রণা বিষয়ে সে আজও একই রকম অজ্ঞ। চেতনা প্রথম থেকেই তার সমস্ত যত্ন ঢেলে দিল নতুন বউকে আপন করার সাধনায়। শৈলেশকে বলল, "সারাটা জীবন আমি যে-কষ্ট করেছি লালিকে তার এতটুকুও পেতে দেব না।"— "তোমার আবার কষ্টটা কিসের শুনি?"—"সে তুমি বুঝবে না। অফিস থেকে ফেরার সময় পেস্ট্রি আনতে ভুলো না কিন্তু। লালি ভালবাসে। আর হ্যাঁ একটু তাড়াতাড়ি ফিরবে আজ? স্যাকরার দোকানে যাবার ছিল। লালির জন্য একটা" — "এই সবে বিয়ে হল। এত গয়না, এখন আবার ...." — "ওর মাইসোর সিল্কটার সঙ্গে ম্যাচিং কোনও গয়নাই নেই। আহা তোমাকে খরচা করতে হবে না, আমারতো গয়না পরাই হয় না, ভাবছি বালাটা ভেঙে...।" একান্নবর্তী পরিবার থেকে আসা লালিও সর্বক্ষণ ঘুরতে থাকে চেতনার ছায়া হয়ে। এক মিনিটও একলা থাকার অভ্যেস নেই তার। সঙ্গীতের মতো একটি সংসারের কর্ত্রী হতে পেরে চেতনা নিজের পরগাছা-অস্তিত্বের অসহায়তাকে সবে ভুলতে শুরু করেছে সে সময়ই এল অপ্রত্যাশিত সুখবরটা। চেতনার দাদু একখানা বাড়ি দিয়ে গেছেন চেতনার নামে। শৈলেশ বলল, "তোমার নিজের বাড়ি থাকতে খামকা কম্পানির বাড়িতে ভাড়া গোনা কেন।" আঃ নিজের বাড়ি। শব্দটা এত আকাঙ্ক্ষার যে বিশ্বাস করতেও ভয় করে।

সদ্য পাওয়া পুরনো আমলের বাড়িটাকে সামান্য অদল-বদল আর রঙ করানোর কাজে কোমর বেঁধে মিস্তিরি খাটাতে লাগল চেতনা। সারাদিন পরে ফিরেই বলতে থাকে, "মিস্তিরিগুলো এমনি

ফাঁকিবাজ....।" লালি তাড়া লাগায়, "মা মুখ-হাত ধুয়ে আগে একটু খাও।" বিভোর চেতনা রঙ-কার্ড বার করে বলে "দেখ তো বাইরের ঘরের রঙটা যদি".... । কিংবা "নিজের বাড়িতে বাপু প্রথমেই একটি আউট-হাউস বানাব। সারাজীবন ঠিকে ঝি নিয়ে যা কষ্টে কাটালাম। এবার আউট-হাউসে লোক রেখে বুড়ো বয়েসটা আরামে কাটাব।" শৈলেশ সব কথাতেই বলে, "সে তোমার বাড়ি, যেমন ইচ্ছে করে নাও।" প্রত্যেক বারই চেতনা পরগাছা থেকে মহীরুহ হয়ে নিজের বাড়ির মাটির আরও গভীরে শিকড় চালিয়ে বাঁচার রসদ খুঁজে পায় যেন।

অবশেষে নিজের বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করে প্রথম রাতটাকে মনে হল ফুলশয্যা-রাতের চেয়েও বিশিষ্ট। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে শৈলেশ আশ্চর্য — "কী হল শোবে না?" — "কি জানি ঘুম আসছে না।" শৈলেশকে বলতে লজ্জা করল এত সাধের নিজের বাড়িতে এসেও চেতনার কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। পুরনো বুক টিপ-টিপ টের পাচ্ছে। কেবলই মনে হচ্ছে সুখকে সে সত্যিই হাতের মুঠোয় ধরতে পেরেছে তো!

নতুন বাড়ির সাজসজ্জা নিয়ে চেতনা দিনের পর দিন এত মগ্ন ছিল যে খেয়ালই করেনি শৈলেশ ইদানীং বড়ই অন্যমনস্ক। নতুন টেবিল কভারে এম্বোডরি করছিল চেতনা, শৈলেশ বলল, "একটা কথা তোমায় ক'দিন ধরে বলব ভাবছি কিন্তু তুমি বাড়ি নিয়ে এতই ব্যস্ত।"—" ওমা ব্যস্ত কোথায়। এখন তো ঘর দেওয়া ঝি, তার ওপর লালি রয়েছে। জানো, ভাবছি আবার গানটা শুরু করলে হয়।" শৈলেশ চেয়ার বদল করল। চেতনা লক্ষ না করে সূচে চোখ রেখে বলল, "কি যেন বলবে বলেছিলে।" শৈলেশ আরও একবার চেয়ার বদল করল, আঙুল মটকাল, তারপর — "আমি চাকরি বদলাব ঠিক করেছি। তুমি তো জানো সারা জীবন গ্লোবাল কম্পানিতে কাজ করবার জন্য কত চেষ্টা করেছি কিন্তু সুযোগ আসেনি। এতদিনে একটা যোগাযোগ ঘটেছে যখন, তখন আর কুয়োর ব্যাঙ হয়ে পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না।" — "এ্যাঁ!" যে চেতনা এতকাল স্বামীর তুচ্ছাতিতুচ্ছ সাফল্য, গৌরব, প্রতিষ্ঠাকে পর্যন্ত মাথার মুকুট করে রেখেছিল আজ কিন্তু স্বামীর এত বড় সুখবরে তার কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ওই একটি শব্দ ছাড়া আর কিছুই বার হতে পারল না।

শ্বশুরের বদলির খবরে লালি এত কাঁদল যা সে শ্বশুর বাড়ি আসবার দিনেও কাঁদেনি। স্বামীকে বলতে লাগল ক্রমাগত, "এক বাবা মা ছেড়ে এসেছি আবার ..." .."তুমি নাইট ডিউটি গেলে এত বড় বাড়িতে আমি কী করে একলা..." ছেলে সুকান্ত এ পর্যন্ত স্নেহময়ী মা, আদুরে বউ নিয়ে সম্পন্ন বাবার ছাতায় অতি নিরাপদে, পরম নিশ্চিন্তে বসবাস করে এসেছে। এই নিটোল গেরস্থালির ভূমিতে অপ্রত্যাশিত ভূমিকম্পে প্রথমে সে তার মায়ের মতোই হতভম্ব হয়ে পড়ল। তারপর শৈলেশকে নিরস্ত করবার জন্য খুঁজে খুঁজে কত রকম যুক্তি বার করতে লাগল। "বাবা, দু'জায়গায় সংসার পাতলে খরচা যে দ্বিগুণ" ..."মা-র স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে এখন একল, একলা ঘর সংসারের খাটুনি" ..." এখানেও তো তোমার কিছু কম রোজগার নয়" ইত্যাদি। কিন্তু শৈলেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কাছে কোনও যুক্তি, মন খারাপ বা শরীর খারাপ টিকতে পারল না।

প্রৌঢ় বয়েসে চেতনা তার পরিচিত শহর, বন্ধু, আত্মীয়, অতি প্রিয় ছেলে-বউ এবং বড় সাধের নিজের বাড়িটিকে ছেড়ে, ছিঁড়ে নতুন শহরে, কম্পানির ফ্ল্যাটে বাসা পাতবার চেষ্টায় হিমসিম খেতে লাগল। স্বামীর প্রতি বিদ্রোহে, সন্তানের জন্য শোকে, নিজের বাড়ির জন্য হাহাকারে নতুন সংসারে একটি মুহূর্তের জন্যও সুখী হতে পারল না চেতনা।

ঠিকে ঝি হরদমই কামাই করে। তখন চেতনা সিঙ্কে বাসন মাজতে গিয়ে জানলার ওপারে প্রতিবেশিনীকে বলে, — "নিজের বাড়িতে আমার ঘর দেওয়া ঝি। একবেলাও বাসন মাজতে হয় না। নিজের শরীর খারাপ হলে মেয়েকে পাঠায়।"

লালি সুকান্ত প্রায়ই ফোন করে — "বাবা আর চাকরি করে কাজ নেই, এবার চলে এসো।" চেতনা নতুন বান্ধবীদের কাছে গর্ব করে — "বুঝলেন না, খুঁজে পেতে একান্নবর্তী পরিবারের মেয়ে এনেছি। একাশুঁড়ি হতেই শেখেনি। সব সময় ডাকছে। ওঁর খেয়ালেই তো আমাদের এমন সুখের সংসার কেটে দু'খানা করা।"

ফেলে আসা বাড়ির সুখস্বপ্নে এবং কম্পানির বাড়ির দুঃসহ বাস্তবে একে একে অনেকগুলো বছর কেটে গেলে শৈলেশ ঘোষণা করল, "দেখতে দেখতে রিটায়ারমেন্ট এসে গেল। চলো এবার একেবারে নিজের বাড়িতে গিয়ে..."

আনন্দের ধাক্কায় হঠাৎ-উদার চেতনা দু'চক্ষের বিষ ঠিকে ঝিকে অকাতরে জিনিসপত্তর বিলিয়ে দিতে লাগল। — "এসব আর বয়ে নিয়ে গিয়ে কী হবে। ওখানে তো সব কিছু একেবারে সুবিধা মতো সাজিয়ে রেখে এসেছি।"

(২)

দুপুরে লালির হাতের পাঁচ পদ রান্না খেয়ে টান টান পেতে রাখা বিছানায় দেহ মেলে বহুদিন পরে আবার চেতনা বলল, "আঃ।" ঠিক তখুনি ফোন বাজল। করিৎকর্মা শৈলেশ রিটায়ার করে ঘরে ফিরেছে শুনে কলিগরা খোঁজ খবর নিচ্ছে। ফোন রেখে শৈলেশ ঘরে ঢুকতে চেতনা জিজ্ঞাসাও করল না কার ফোন। দীর্ঘ দিনের ক্লান্তিতে তাকে ঘুম ঘিরে ধরছে তখন। শৈলেশ কিন্তু শুল না। একটু উসখুস করে বলল, "ঘুমালে নাকি?" একটা অল্প দিনের কন্ট্র্যাক্ট জবের খবর আছে। ভাবছিলাম শরীরস্বাস্থ্য তো

ভাল আছে...।" ঘুম ছুঁড়ে ফেলে খাড়া উঠে বসল চেতনা— "কিছুতেই নয়। যেতে হয় একলা যাও। নিজের খাওয়া শোওয়ার ব্যবস্থা নিজে করবে।" একান্ত গৃহপালিত শৈলেশ অগত্যা পুরনো কলিগদের সঙ্গে অফিসের খোশগল্পে দিন কাটানোর পথই বেছে নিল।

পরের দিন ঘুম ভেঙে চেতনা আবার বলল, "আঃ। কিন্তু স্নানের সময় কাপড় খুঁজে হয়রান। আলনাময় লালি-সুকান্তর কাপড় যে। চা-করা ছেড়ে দৌড়ে এল লালি—"পাচ্ছো না? কেন? আমি তো কাচা কাপড় তোমার স্যুটকেশে গুছিয়ে রেখেছি।" বুকটা টিপ টিপ করে উঠল চেতনার। চিন্তিত মুখে অতিথির মতো স্যুটকেশ খুলল সে।

নিজের বাড়িতে শেকড় গেঁথে ফেলবার চেষ্টায় রান্নাঘরে ঢুকল চেতনা। কিন্তু লালি আদর দেখিয়ে বলল, "তোমার আর কষ্ট করার দরকার কি মা?" খেয়ে উঠে শৈলেশ প্রায় রোজই বলছে, "কত রকম রাঁধতে শিখেছে বউমা।" চেতনা গম্ভীর ভাবে বলে, "রোজ রোজ আমাদের জন্য এত রকম রাঁধতে লালির বড্ড পরিশ্রম হচ্ছে। যত বলি এত করবার দরকার নেই, শোনেই না।"— "শুনবে কেন? ও তো জানে আমাদের সংক্ষেপে খাবার হ্যাবিট নেই। শাশুড়ির যোগ্য বউ হয়েছে।" পরম সন্তোষে মৌরি চিবিয়ে দিবানিদ্রা দেয় শৈলেশ আর চেতনার মনে হয়, একবার হার্টের ডাক্তার দেখানো দরকার, বুকটা যেন বড়....।

মাস খানেক পরে শৈলেশ একদিন বলে, "তুমি কি ফিলোসফার হয়ে উঠলে নাকি? সারাদিন জানলার ধারে গালে হাত দিয়ে বসে কী ভাব বল তো? — "কী করব লালি তো কিছুই করতে দেয় না।" — তবে? বৌমা একলা হাতে সব দিক কেমন সামলাতে শিখে গেছে দেখ।" — "হুঁ, একলা থাকতে থাকতে একলা থাকাটা বেশ রপ্ত করে ফেলেছে। তোমার মনে আছে আগে যখন আমরা একসঙ্গে ছিলাম ও বেড়াতে যাবার সময় নিজের কাপড়টা পর্যন্ত পছন্দ করে উঠতে পারত না। প্রতি পদে কেবল মা আর মা। এখন তো সবই...।"— "ভালই তো। এত কাল কষ্ট করেছ। এবার আরাম করো।"—"অন্যে আরামে থাকলে তবে তো নিজে আরামে থাকা যায়। অন্যের অসুবিধা হচ্ছে দেখলে...।" —"মানে?"— "আসলে কী জানো, একলা থাকার অনেক রকম আরাম আর স্বাধীনতা আছে। একান্নবর্তী পরিবার থেকে এসেছিল, হাত-পা ঝাড়া থাকতে পারার সুখগুলোকে চিনতই না। আজ আর দোষ দিয়ে কী হবে, আমরাই তো..." অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে শৈলেশ জবাব দেয় — "কোনও খানে কিছুতেই আর তোমার সুখ হল না।" তারপর একটি কথাও বাড়তে না দিয়ে সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল। চেতনা ভাবতে লাগল, কেন এমন হচ্ছে। কেন সে অসুখী তার নিজস্ব বাড়িতে। এই অসুখ থেকে বার হবার জন্য ইদানীং তার প্রাণ একেবারে হাঁস ফাঁস করছে অথচ পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

আরও একমাস পরে ছেলের ঘরের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল চেতনা। লালি বিরক্ত সুরে বলছে — "ঝি কাজ বেশি বলে রাগ করছে।" সুকান্ত— "কেন?' রাখার সময় মা তো ওকে চারজনের কাজ করার কথা বলেই রেখেছিল।"— "সে তো ছ'বছর আগে। এতদিন দু'জনের কাজ করে করে অভ্যেস হয়ে গেছে, বেশি কাজ পেরেই ওঠে না। এত ভাল ঝি, চলে গেলে আর পাব না।"— "বাঃ কাজ বেশি বলে চলে যাবে কেন? এই জানুয়ারিতে তোমার ভাইরা এসে কতদিন ..." — "আহা, তারা তো অতিথি।"

শ্বাস নেবার জন্য চেতনা ছুটে নিজের ঘরের জানলায়। অতিথি শব্দটার ধাক্কা তাকে টানা দু'দিন অসুস্থ করে রাখল। তারপর শরীর ঠিক হল বটে কিন্তু অতিথি শব্দটা তার মাথা ছেড়ে নড়ল না। সুকান্ত একদিন বলল, "আজকাল তুমি কারো সঙ্গে কথাটথাও বল না। কী এত ভাবো?"— "এই কত কিছু ভাবি, আগে যে-সব কথা ভাববার সময়ই পাইনি। এক একটা খুব চেনা শব্দ হঠাৎ নতুন নতুন চিন্তার পথ খুলে দেয়।" কথা না বাড়িয়ে অফিসে রওনা হল সুকান্ত। আর চেতনা ভাবতে লাগল, ভাবতেই লাগল, সে এত কষ্ট পাচ্ছে কেন? এই কষ্ট থেকে সে কি কিছুতেই বেরিয়ে আসার পথ পাবে না? আর ঠিক তখনই অতিথি শব্দটা যেন তার ভিতরের বহু দিনের একটা বন্ধ দরজা দড়াম করে খুলে দিল।

পরের দিন চেতনা শৈলেশকে বলল, "একটা কথা ভাবছিলাম, তোমার তো শুয়ে বসে দিন কাটছে না। ওই যে ভাইজাগে একটা জব কন্ট্রাক্টে ডেকেছিল, সেটা কি এখনও....."। শৈলেশ প্রথমে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। তারপর সোজা টেলিফোনে।

মাস দু'য়েক পরে শিফটিং। চেতনা কোমর বেঁধে গোছগাছে লেগে পড়ল। কোনটা নেওয়া হবে, কোনটা নয় তা নিয়ে শৈলেশের সঙ্গে সোৎসাহে পরামর্শ করতে লাগল। ছেলে-বউকে বলল, "তোদের বেড়াতে যাবার একটা ভাল জায়গা হল। ছুটি কাটাতে আসবি।"

বিদায় দিনে সুকান্ত বিষণ্ণ ভাবে বলল, "মা, তোমার আর নিজের বাড়িতে থাকা হল না।" আগের বারের মতো এবার আর কান্নায় ভেঙে চুরমার হল না চেতনা। বিষণ্ণ কিন্তু প্রশান্ত, নির্মল হাসল — "তাতে কী? শোন খোকা পৃথিবীতে কোথাও নিজের বাড়ি নেই। মানুষ এখানে দু'দিনের অতিথি মাত্র। এই কথাটা ঠিকমতো বুঝতে পারলেই মানুষ সুখে থাকতে পারে। কথাটা শিখতে আমার প্রায় গোটা জীবনটাই দুঃখে কেটেছে।"

ডান হাতখানা পরম স্নেহে ছেলের মাথায় রেখে চেতনা বাঁহাতে ট্যাক্সির দরজার হ্যান্ডেল ঘোরাল।

অনুবাদ গল্প

চতুর্থ অভিযোগ

সু. সমুত্তিরম

পারভিন মাণিক্কমকে কিছু কড়া কথা বলতে চাইল, তাঁকে স্মরণ করাতে চাইল যে সে তাঁকে তার অফিসে আসতে বারণ করেছে। কিন্তু মাণিক্কমের করুণ চেহারা দেখে তাঁকে ধমকাতে আর মন সরল না।

সে তার বাড়িতে আল্লার নাম করে তাঁকে যে সান্ত্বনা দিয়েছিল হাতের ফাইল দেখিয়ে আজ আবার সে কথাই বলল, "চিন্তা করবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে, আজকেই মিটে যাবে ব্যাপারটা।"

মাণিক্কমের দৃষ্টি এখন পারভিনের ডান হাতের ফাইলটার উপর পড়ল। লাল রঙের মলাট। মোটা অক্ষরে 'গোপনীয়' লেখা একটা সাদা কাগজের টুকরো মলাটের সঙ্গে পিন দিয়ে গাঁথা। পারভিনের বাঁ হাতে কিছু বই — 'সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধি', 'সাময়িক কর্মচ্যুতি', 'বিচার, শাস্তি, পুনর্নিযুক্তি' ...। বইগুলির পৃষ্ঠা থেকে লম্বা লম্বা কাগজের টুকরো বেরিয়ে এসেছে লেজের মতো।

মাণিক্কম ভরা গলায় বললেন, "মা, তুমি.... আপনি আমার মেয়ের চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু আপনি আমার মা — গর্ভে ধারণ না করেই মা।" ওঁর চোখ ছলছল করল। তিনি তাঁর মুখটা পেছন দিকে একটু ফিরিয়ে নিলেন যাতে চোখের জলটা গাল দিয়ে গড়িয়ে না যায়। তাঁর ঈষৎ বাঁকানো দেহটা যেন তাঁর বাঁকানো জীবনকে প্রতিফলিত করছে। কিন্তু এই বাঁকানোটা খোসামদির ভঙ্গি নয়, বরং জীবনের সঙ্গে কঠোর সংঘর্ষের পরিণতি।

পারভিন দরদভরা চোখে তাঁর দিকে তাকাল।

পারভিন এখন তামিলনাড়ু রাজ্যের একজন আই.এ.এস অফিসার। শিক্ষানবিশির পর্বে তাকে বিভিন্ন সরকারি অফিসে গিয়ে কাজ শিখতে হয়েছিল মাঝারি স্তরের অফিসারদের কাছে। সাধারণত এই অফিসাররা এসব শিক্ষানবিশদের খুব সমীহ করে চলত। কারণ কয়েক মাসের পরেই এই শিক্ষানবিশরা এই অফিসারদের উপরওয়ালা হয়ে যেত।

কিন্তু মাঝারি স্তরের অফিসার হলেও মাণিক্কম খোশামুদে ছিলেন না। পারভিন যখন তাঁর কাছে কাজ শিখতে এল, তিনি সহজভাবেই তার সঙ্গে ব্যবহার করলেন এবং তাকে আমলাতান্ত্রিক কর্মপ্রণালীর সব খুঁটিনাটি ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বেশি কথা বলতেন না। তাঁর কথাবার্তায় যেমন ছিল গাম্ভর্য তেমনই ছিল বিনয়। অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে মায়ের স্নেহ এবং বাবার অনুশাসন একসঙ্গে ফুটে উঠত। তিনি তাদের উচিত সম্মান দিতেন। তারাও তাঁর সঙ্গে বিনা দ্বিধায় কথা বলতে পারত। ভাল ভাবে কাজ করলে তিনি তাদের অকুণ্ঠভাবে প্রশংসা করতেন এবং তাদের কাজের তারিফ করে উপরওয়ালাদের রিপোর্ট পাঠাতেন।

মাণিক্কমের সপ্রতিভ অথচ স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিল পারভিন।

কালের ফের এমনই যে সেই মানুষ এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন উপযাচক হয়ে। এ রকম একজন সদাশয় লোকের দুর্গতিটা দেখাও এক রকম শাস্তিই বলতে হয়। এই শাস্তি ভোগ করতে করতে পারভিন মাণিক্কমকে সান্ত্বনা দিল- "আপনি কিছু ভাববেন না .... এন্‌কোয়ারি অফিসার স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে আপনার বিরুদ্ধে সব অভিযোগই ভিত্তিহীন। সুতরাং আপনার সাসপেনশন বাতিল করে আপনাকে পুনর্বহাল করার সুপারিশও আমি ফাইলে দিয়েছি। আমি ফাইলটা নিয়ে সেক্রেটারির কাছে যাচ্ছি তাঁর সইয়ের জন্য। তাঁর সই পেতে কোনও অসুবিধে হবে না। তিনি সই করলেই ব্যাপারটা মিটে যাবে, আপনি আবার চাকরিতে বহাল হয়ে যাবেন। .... আপনি ভিজিটার্স রুমে অপেক্ষা করুন। আধঘন্টার মধ্যে আপনার অর্ডার বের করে দিচ্ছি।"

মাণিক্কম যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। হাত জোড় করে ভক্তিভরে পারভিনকে নমস্কার করলেন তিনি। এভাবে তিনি কোনওদিন মন্দিরের দেবতাকেও প্রণাম করেননি। সেই বিরাট সেক্রেটেরিয়েটের লম্বা বারান্দা তাঁর চোখে যেন মন্দিরের অলিন্দ, আর পারভিন যেন সাক্ষাৎ দুর্গা।

গত ছয় মাস ধরে একটা অপ্রত্যাশিত ঝঞ্ঝার আঘাতে টালমাটাল খাচ্ছে মাণিক্কমের সংসার। সাসপেনশন, দরখাস্ত, আপিল, এন্‌কোয়ারি এসব নিয়ে তিনি খুবই হয়রান। এই দুর্ঘটনার জন্য তাঁর মেয়ের বিয়ে আটকে গেছে। আর ছয় মাসের মাথায় তিনি অবসর নেবেন। এই দুর্যোগটা কেটে গেলে তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন এবং শান্তিপূর্ণ অবসরজীবন কাটাতে পারবেন।

সেক্রেটারির ঘরের দেওয়ালে বোর্ডে সোনালি অক্ষরে লেখা ছিল — "সুকুমার আই.এ.এস., সেক্রেটারি।" পারভিন ঘরটার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকবার মুখে একটু পিছিয়ে এসে মাণিক্কমকে বলল, "একটা কথা....কেউ যেন না জানে যে আপনি আমার পরিচিত। এটা কেউ জানতে পারলে তখনি উড়ো চিঠি আমার বিরুদ্ধে চলে যাবে আবার উপরওয়ালাদের কাছে। এখানে ক্লাস ফোর কর্মচারি থেকে আই. এ. এস অফিসার পর্যন্ত সকলেই উড়ো চিঠি লেখার ব্যাপারে ওস্তাদ। ....আমি যেন আপনার জন্য ফ্যাসাদে না পড়ি।"

"আপনার কোনও ক্ষতি হলে সেটা হবে আমার আর একটা শাস্তি। আমি সত্যি বলছি মা, আপনাকে সামনে রেখেই আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব।"

পারভিন সেক্রেটারির ঘরে ঢুকল।

ঘরের একধারে একটা উঁচু চেয়ারে সেক্রেটারি বসে। তাঁর সামনে চকচকে অর্ধগোলাকার টেবিল এবং আরও কিছু চেয়ার; ঘরের একধারে সোফা। পারভিন মাথা নুইয়ে সেক্রেটারিকে অভিবাদন করে একটা চেয়ারে বসল।

টেলিফোনের আওয়াজ, ইন্টারকমে কথা, কম্পিউটারের জাদুর খেলা, ফ্যাক্স থেকে আস্তে আস্তে বেরুতে থাকা কাগজের শিরশির শব্দ, টি.ভিতে ক্রিকেট খেলা এ সব এক সঙ্গে সামলাচ্ছিলেন সেক্রেটারি মহাশয়। তাঁর ভ্রুতে কুঞ্চন দেখা গেল কিন্তু পারভিনের মুচকি হাসিতে তা পরক্ষণেই মিলিয়ে গেল। এখন সেক্রেটারি টি.ভির আওয়াজ বন্ধ করে তার দিকে তাকালেন।

"স্যার, মিঃ মাণিক্কমের কেসে এন্‌কোয়ারি রিপোর্টের ফাইলে আমাকে আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলেছিলেন, তাই এসেছি..."

"তা সেটা কাল দেখলে হয় না? .... দেখুন, টেণ্ডুলকার কী মার মারছে! ....."

পারভিন হাসতে হাসতে বলল, "স্যার, আপনিই তো বলতেন, "কাজ ভাল করে কর, আর তা আজই কর' ..... আর এই কেসে বেশি সময় লাগবে না স্যার। পাঁচ মিনিটে মিটে যাবে।"

"ঠিক আছে .... আপনি তো নাছোড়বান্দা ....."

পারভিনের জায়গায় একজন 'প্রমোটি' অফিসার আসলে সেক্রেটারি সায়েবের ব্যবহার একেবারে অন্য রকম হত। তিনি সেই অফিসারের উপর ফেটে পড়তেন এবং ওঁকে অপদস্থ করে দিতেন। কিন্তু পারভিনও খোদ আই.এ.এস-এর লোক, অর্থাৎ তাঁর স্বজাতি।

পারভিন ফাইলটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিল। কিন্তু সেক্রেটারি বললেন, "আপনিই পড়ে শোনান না।" তাঁর চোখ একবার টিভির দিকে আর একবার পারভিনের দিকে যাচ্ছিল।

পারভিন ফাইলের লেখাটা হুবহু না পড়ে তার সারাংশটা শুধু বলতে লাগল।

"স্যার, প্রথম অভিযোগ হল, মাণিক্কম নিয়মবিরুদ্ধভাবে নিজস্ব কাজের জন্য সরকারি গাড়ি ব্যবহার করে প্রায় একশো কিলোমিটার যাত্রা করেছেন। তিনি গাড়িটা নিজের কাজে ব্যবহার করেছেন, এ কথা সত্যি। কিন্তু ব্যাপারটা হল, তিনি যখন সরকারি কাজে একটি গণ্ডগ্রামে ক্যাম্প করেছিলেন, তখন মাঝরাতে তাঁর বাবার মৃত্যুর খবর পেলেন। তখন তাঁর বাড়ি ফিরবার জন্য কোনও বাস ছিল না, তাই তিনি সরকারি গাড়িতেই বাড়ি ফিরেছিলেন। এমত জরুরি অবস্থায় সরকারি গাড়ির ব্যবহার নিয়ম-বিরুদ্ধ নয়। শুধু এই যাত্রার খরচটা সরকারকে দিয়ে দিতে হয়। মাণিক্কম পরের দিনই সমস্ত ঘটনাটা ব্যাখ্যা করে তাঁর উপরওয়ালা অফিসারকে চিঠি দিয়েছেন এবং তাঁর দেয় টাকাটা সরকারি তহবিলে জমা দিয়েছেন। তাঁর বাড়ি যাওয়ার পরের দিন রবিবার ছিল, তাই তাঁর এই যাত্রার জন্য সরকারি কাজে কোনও ক্ষতি হয়নি। সুতরাং এনকোয়ারি অফিসার মাণিক্কমকে এই অভিযোগ থেকে মুক্ত করেছেন।"

"ঠিক আছে, দ্বিতীয় অভিযোগটি কী?" বললেন সেক্রেটারি। এয়ারকন্ডিশন করা সরকারি গাড়িতে তাঁর মেয়েরা কলেজে যায়, এ কথা স্মরণ করে মনে মনে অস্বস্তি বোধ করলেন তিনি।

"দ্বিতীয় অভিযোগ হল, মাণিক্কম একজন দলিত কর্মচারিকে তার জাত তুলে খিস্তি করেছেন। আসল ব্যাপারটা হল, সে কর্মচারি রোজ দেরি করে অফিসে আসত। মাণিক্কম ওকে অনেক বার সাবধান করেছেন, ধমকেছেন কিন্তু ওকে শোধরাতে পারেননি। তিনি একদিন হাসতে হাসতে ওকে বলেছিলেন, 'তোমার স্বভাব তো বদলাবে না'। এই কথাটাকে সে কর্মচারি অন্য ভাবে নিয়ে অভিযোগ করেছে যে মাণিক্কম তার জাতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মাণিক্কম বলেছেন, তিনি জাতপাত মানেন না, কোনওদিন দলিত জাতের অপমান করেননি। মাণিক্কমের অফিসে অনেক দলিত কর্মচারি আছেন। এঁরা কেউ এতদিন ওঁর ব্যবহার সম্পর্কে কোনও নালিশ করেননি। তা ছাড়া অফিসের দলিত কর্মচারি সঙ্ঘ মাণিক্কমের কথা সমর্থন করেছে।"

"হতে পারে যে মাণিক্কম সঙ্ঘের কর্তাব্যক্তিদের ভয় দেখিয়ে এ রকম সাক্ষ্য আদায় করেছেন ....."

"তা হতে পারে না স্যার। কারণ যদি মাণিক্কম সত্যিই খারাপ লোক হন, এটা তো সুবর্ণ সুযোগ তাঁকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিতে। ... এন্‌কোয়ারি রিপোর্ট এই অভিযোগকে নাকচ করেছে।"

"আচ্ছা, তারপর ...."

"তৃতীয় অভিযোগটা হল, মাণিক্কম একজন গায়িকার সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করেছেন ... এটা আট বছর আগেকার ঘটনা। তখন মাণিক্কম ছিলেন জেলার সহায়ক শাসক। সে সময় পরিবার কল্যাণ দফতর একটি গানের দলকে ওঁর কাছে পাঠিয়েছিল। মাণিক্কম এই দলকে একটি গাঁয়ে পাঠিয়েছিলেন একটি অনুষ্ঠান

করতে এবং অনুষ্ঠান তদারকির জন্য নিজে সেই গাঁয়ে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখলেন দলটি অনুষ্ঠানের আগের দিনই গাঁয়ের এক বিয়েবাড়িতে গান গেয়ে তাদের কাছে টাকা নিয়ে কেটে পড়েছে এবং নির্ধারিত দিনের অনুষ্ঠান আদৌ হয়নি। মাণিক্কম দলের ম্যানেজারের কৈফিয়ত চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। ম্যানেজার ভয় পেয়ে জেলা শাসকের কাছে গেলেন। শাসক মহাশয় কোনও কারণে মাণিক্কমের উপর খাপ্পা ছিলেন। তিনি এই সুযোগে মাণিক্কমকে শায়েস্তা করতে চাইলেন। সুতরাং মাণিক্কমের বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা অভিযোগ করতে ম্যানেজারকে উস্কে দিলেন। এর ফলে গানের দলের একজন গায়িকাকে দিয়ে তার প্রতি অশালীন ব্যবহারের অভিযোগ মাণিক্কমের বিরুদ্ধে দায়ের করা হল। এই অভিযোগের উপর আগেই এনকোয়ারি করা হয়েছিল এবং অভিযোগটা ভিত্তিহীন সাব্যস্ত হয়েছিল। আটবছর আগেকার এই ব্যাপারটাকে আবার গর্ত খুঁড়ে বের করে আনা হয়েছে শুধু একজন নিরীহ অফিসারকে হয়রান করবার জন্য।"

"এটা কি আপনার মন্তব্য, না এনকোয়ারি রিপোর্টের বক্তব্য?"

"এটা এনকোয়ারি রিপোর্টেরই বক্তব্য, স্যার।"

"আচ্ছা, এইটেও মেনে নেওয়া যায়। পরের অভিযোগটা কি?"

"সেটা কোনও অভিযোগই নয়, স্যার।"

"সেটা আপনিই বলবেন কেন? ফাইলটা পড়ুন।"

"চতুর্থ অভিযোগটা হল এই যে মাণিক্কম উপরোক্ত তিনটে অপরাধ করে সরকারি কর্মচারি আচরণ বিধি উল্লঙ্ঘন করেছেন।"

"এই অভিযোগ সম্পর্কে এনকোয়ারি রিপোর্ট কী বলছে?"

"এটা তো একটা স্বতন্ত্র অভিযোগ নয়। তাই এটা নিয়ে এনকোয়ারি রিপোর্টে কোনও মন্তব্য নেই।"

"মিস্ পারভিন, আপনি কী বলছেন? আপনি না আই.এ.এস অফিসার? .... আসলে এই অভিযোগটাই অন্যান্য অভিযোগের চেয়ে মারাত্মক। কারণ, বাকি সব অভিযোগের শাস্তি হল শুধু বেতনবৃদ্ধি বন্ধ অথবা পদে অবনমন; এই অভিযোগটার শাস্তি তো পদচ্যুতি...."

"কিন্তু স্যার, এটা কোনও স্বতন্ত্র অভিযোগ নয়, শুধু অন্যান্য অভিযোগের উল্লেখমাত্র। সেই সব অভিযোগ বাতিল হয়ে যাওয়ায় এই অভিযোগটার অস্তিত্বই থাকছে না।"

"এটা কি আপনার নিজের কথা, না এনকোয়ারি অফিসারের মন্তব্য।"

"স্যার, আমি তো বলেছি, এনকোয়ারি অফিসারের এ বিষয়ে কোনও মন্তব্যই নেই। .... আমি আপনাকে বোঝাতে পারছি না হয়ত। যদি কোনও দুর্ঘটনা না হয়ে থাকে তো দুর্ঘটনাজনিত কোনও ক্ষতির কথা উঠবে কী করে? তেমনি যখন প্রথম তিনটে অভিযোগ ভিত্তিহীন সাব্যস্ত হল, সেগুলির পুনরুল্লেখের গুরুত্বটাই বা কোথায়?"

"তা হলে চতুর্থ অভিযোগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে কেন? যখন তার উল্লেখ আছে তাকেও হিসেবের মধ্যে নিতেই হবে।"

"এ রকম কথা তো যুক্তিযুক্ত মনে হয় না, স্যার।"

সেক্রেটারির মুখ রাগে লাল হয়ে গেল। চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিয়ে বসে থাকা মানুষটি পিঠ সোজা করে বসে মুখ তুলে পারভিনের দিকে তাকালেন, আর তাকে মনে মনে আই. এ. এস জাত থেকে বের করে দিয়ে তার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলতে লাগলেন যে ভাবে তিনি নন-আই.এ.এস অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারিদের সঙ্গে কথা বলতে অভ্যস্ত। "মিস পারভিন, আপনি আপনার সীমা ছাড়িয়ে কথা বলছেন। মনে হয়, আপনি ভুলে গেছেন যে আপনার সুপিরিয়র অফিসারের সঙ্গে কথা বলছেন। গলা উঁচু করে বলা, হাত বাড়িয়ে কথা বলা, সিনিয়রের কথায় খুঁত ধরা এ সব হল বেআদবি। এটা প্রথমবার বলে আমি আপনাকে ক্ষমা করছি ....."

"সরি স্যার, ... কিন্তু এই চতুর্থ অভিযোগ নিয়ে .....

"না, আর কথা বলবেন না।"

"আচ্ছা স্যার, তা হলে আমি কি এ ব্যাপারে আইন দফতরের সঙ্গে পরামর্শ করে ...."

"না, সেটা দরকার হবে না। চতুর্থ অভিযোগ একটা এখনও রয়েছে। ফাইলটা রেখে যান। আমি ওতে যা অর্ডার দেব তাই ইমপ্লিমেন্ট করুন। আপনি যেতে পারেন, আমার আর সময় নষ্ট করবেন না।"

সেক্রেটারি নিজে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। পারভিনকেও উঠতে হল।

পারভিন মনে মনে কী বিড় বিড় করতে করতে বেরিয়ে এল, আর ভাবতে লাগল, আধা দিনের ছুটি নিয়ে ভিজিটার্স রুমে অপেক্ষারত মাণিক্কমকে কীভাবে এড়িয়ে বাড়ি চলে যাওয়া যায়। ...

অনুবাদ : **সুব্রমণিয়ন কৃষ্ণমূর্তি**

লেখক পরিচয় : আজকের প্রগতিশীল তামিল কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন সু. সমুত্তিরম। ত্রিশ বছর ধরে সাহিত্যসৃষ্টিতে মগ্ন তিনি। অনেক উপন্যাস, ছোট গল্প লিখেছেন। সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত এই লেখক সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ। বহু সমসাময়িক সমস্যা তাঁর লেখায় উঠে এসেছে। হিজড়াদের নিয়ে তাঁর উপন্যাস 'নিষল মুহঙ্গল' এবং এইড্স সমস্যা নিয়ে তাঁর রচনা 'পালাইঙ্গুরা' পাঠক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

রক্তবিপ্লবে সপ্তপদী : অনিলচন্দ্র রায় ও লীলাবতী নাগ (১৯২২-১৯৫২)

ঈশানী মুখোপাধ্যায়

দেশে দেশে কালে কালে সভ্যতার ইতিহাসে সমাজ বিবর্তনের দুই মুখ—সৃষ্টিধর্মী গার্হস্থ্য ও বিনাশধর্মী বিপ্লব। প্রাচীনতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিবাহ প্রথা প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিল সার্বিক শৃঙ্খলা বিধানের উদ্দেশ্যে, নরনারীর সম্পর্ক সুসংহত, সুবিন্যস্ত করার জন্য। সন্তানধারণ ও প্রতিপালনের অতি আবশ্যকীয় কারণে। শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য, ইন্দ্রিয় সুখ, ধর্মাচরণ গৃহস্থ জীবনের মূল উপাদান। সর্বত্র রাগে রসে গন্ধে, আনন্দউৎসবে মন্ত্রোচারণে অনুষ্ঠিত দাম্পত্য রীতির জয়যাত্রা। সমাজের অগ্রগতির অপর মেরুতে সশস্ত্র রক্ত বিপ্লব-সর্ববিধ অন্যায় অত্যাচার ও শোষণকে ধ্বংস করে নূতন সমাজগঠনের মধ্য দিয়ে সত্য সুন্দর শিবকে প্রতিষ্ঠার আরাধনা। কৃচ্ছ্রসাধন, তিতিক্ষা ও চরম আত্মত্যাগে সুরঙ্গের অভিযাত্রী সক্রিয় বিপ্লবের সন্তানদের শিরায় উপশিরায় মরণের আহ্বান-ক্ষুরধার পথে নিঃসঙ্গ যাত্রা। দেশের মুক্তিকামনায় আত্মবলি প্রদত্তের কাছে ব্যক্তিগত সর্বপ্রকার স্বার্থ, সন্তুষ্টি, লাভক্ষতি তুচ্ছ। 'ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে' মাথার উপর খড়্গ সদা দোদুল্যমান-পলাতকের বৃত্তে নিকেতন পরিবার ও স্থিতিশীলতার স্বপ্ন নেই।

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বঙ্গব্যবচ্ছেদের অঙ্গ হিসাবে বাংলাদেশে ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে তিনদশক ব্যাপী বিপ্লব আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। সংসার ও সন্ত্রাসের সফল সম্মিলন অসম্ভব বিবেচনা করে সশস্ত্র সংগ্রামের অগ্নিহোত্রীরা মন্ত্র শিষ্যদের উপর সুকঠিন বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন। পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা বর্জনীয় ছিল, স্ত্রীসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বিবাহবন্ধনের প্রতিষেধক হিসাবে ব্রহ্মচর্য্য পালনের কঠোর অনুশাসন ছিল অবশ্য পালনীয়। একাগ্র চিত্তে বিপ্লবসাধনায় নিমগ্ন থেকে আত্মাহুতি দেওয়া মূল্যবোধের ভিত্তিপ্রস্তর। বিবাহিত গৃহস্থদের অপেক্ষা রক্তবিপ্লবে চিরকৌমার্যধারী নবীনদের প্রাধান্য ছিল। এই মনস্তত্ত্ব তৎকালীন রক্ষণশীল সামাজিক পরিমণ্ডলে নরনারী বিযুক্তির প্রতিবিম্ব। স্ত্রী পুরুষের পূর্ব নির্ধারিত পারিপার্শ্বিকে প্রতিপালিত বিপ্লবীদের মানসিকতা বিবাহ ও দাম্পত্য সুখের অনুকূল ছিল না। দেশমুক্তির শোণিতাক্ত পথে দ্বৈত জীবনযাত্রা অকল্পনীয় ছিল। ১৯২০-এর দশকে বিপ্লবের নব অংশীদার কুমারী ছাত্রীরাও উদ্বাহের 'স্বর্গ খেলনা' পরিহার করেছিলেন। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ স্বল্পসংখ্যক বিপ্লবসাধকের পরিবারে সুখ শান্তি অথবা নিরাপত্তার লেশমাত্র ছিল না।

স্থায়িত্বের প্রতীক দাম্পত্য ও বিনাশের প্রতিমূর্তি বিপ্লবের বৈপরীত্য অতিক্রম করে ১৯৩৯ সনে বাংলা তথা ভারতের সহিংস সংগ্রামের দুই সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব শ্রীসংঘের অনিলচন্দ্র রায় ও লীলাবতী নাগ পরিণয়সূত্রে মিলিত হয়েছিলেন। প্রায় দ্বিদশকের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তাঁদের বিবাহপূর্ব পরিচয়ের চালচিত্র। সতীর্থ, সহকর্মী, সমদর্শী, সখ্যতার বন্ধনহীন গ্রন্থি কাটিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্কটময় অগ্নিগর্ভ পরিবেশে হৃদ্যতার সামাজিক স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। দেহোত্তর প্রেমকে প্রাধান্য দিয়ে রচনা করেছিলেন অভিনব দাম্পত্যদর্শন। তাঁদের সংক্ষিপ্ত বৈবাহিক সম্বন্ধের অর্ধেকের বেশি কেটেছিল কারান্তরালে। বিপ্লববাদকে পূর্ণ মর্যাদা দান করে 'নানা সমস্যা, সংঘর্ষ ও নিরানন্দকে ... অন্তরের মাধুর্য্য সম্পদে'[১] সার্থক করার ব্রত এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। বহির্জগতের রক্তিম কর্মমুখর প্রেক্ষাপটের অন্তরালে তাঁদের মনোজগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির বিচিত্র গতিপ্রকৃতির অনুসন্ধান এষণা। গবেষণামূলক নথিপত্রের সঙ্গে লীলা-অনিলের চিঠিপত্র, দিনলিপি, দিনপঞ্জি, কবিতাগুচ্ছ ও সংক্ষিপ্ত আত্মকাহিনি এ প্রয়াসের প্রধান উপাদান।

সূর্যোদয়

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে, শতাব্দীর উদয়লগ্নে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নারী ও দেশমুক্তি আন্দোলনের অবিসংবাদী নেত্রী বিপ্লবিনী লীলাবতী নাগ, ২রা অক্টোবর, ১৯০০ সাল এবং কবি, দার্শনিক, সমাজবাদী, বিদগ্ধ বিপ্লবী অনিলচন্দ্র রায়, ২৬ মে, ১৯০১। বংশমর্যাদায়, সম্পদে, শিক্ষায় দুই পরিবার সমতুল্য ছিল। উচ্চ মধ্যবিত্ত, আলোকপ্রাপ্ত, উদারমতাবলম্বী, আদর্শনিষ্ঠ পরিবেষ্টনের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছিলেন তাঁরা। 'একটি অসম্পূর্ণ খসড়া'য় লীলাবতী লিখেছেন,

> গৃহে অর্থসংগ্রহ অথবা সাংসারিক সুখভোগের আবহাওয়া অপেক্ষা জীবনের মহত্তর দিকের ওপরই ঝোঁক দেওয়া হয়েছে।... স্বাদেশিকতার কথা অতি শৈশব থেকে শুনে এসেছি।... শিশুমনে নিজে কষ্ট স্বীকার করে অন্যের জন্যে কিছু করার শিক্ষা গভীর রেখাপাত করেছিল।[২]

কল্পজগতের অনেকাংশ অধিকার করেছিল রামায়ণ. গ্রভারতের কাহিনি, দেশবিদেশের বীরত্বগাথা, ক্ষুদিরামের ফাঁসি। :সন্দেহে অনুরূপ পরিমণ্ডলে বর্ধিত হয়েছিলেন কিশোর অনিল। কার বক্সিবাজার অঞ্চলে লীলাবতীর পিতা গিরীশচন্দ্র নাগ এবং নিলচন্দ্রের জনক অরুণচন্দ্র রায়ের নিবাস ছিল। পুরুষদের মধ্যে রিচয় থাকলেও পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা হয়নি। অনিলের শিক্ষা কায়, লীলার মূলত কলকাতায়, সুতরাং তাঁদের কোনও যোগসূত্র ল না।

শিক্ষাক্ষেত্রে অনিলচন্দ্র লীলাবতী সমগোত্রীয় ছিলেন। ঢাকায় ডেন বালিকা বিদ্যালয় থেকে ১৯১৭ সনে বৃত্তিসহ াট্রিক্যুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন লীলাবতী। কলকাতার বেথুন লেজে ইংরাজি অর্নাসে বি এ উত্তীর্ণ হয়ে পদ্মাবতী স্বর্ণপদক পয়েছিলেন। ১৯২১এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী াহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। অনিলচন্দ্রের ছাত্রজীবনও তিত্বের স্বাক্ষরে উজ্জ্বল ছিল। ১৯১৯ সনে তিনি ঢাকা কলেজের দ্যার্থীরূপে আই এ পরীক্ষা দেন। সংস্কৃতে তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তি রীক্ষকদের চমৎকৃত করেছিল। ১৯২১ সনে তিনি সসম্মানে ংস্কৃত সাহিত্যে বি এ পাশ করেন। এম এ পরীক্ষার অনতিপূর্বে ংস্কৃতের পরিবর্তে ইংরেজিতে পরীক্ষা দেওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ রেন এবং প্রতিবেশী সহপাঠী লীলাবতীর সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের ন্য তাঁর যোগাযোগ হয়। প্রথম পরিচয়ের সেতু ছিলেন দুই ালক বন্ধু — অনিলচন্দ্রের অনুজ অমলচন্দ্র রায় এবং লীলাবতীর াহোদর প্রভাতচন্দ্র নাগ। অমল চন্দ্রের স্মৃতিতে:

> মেসোমশাই একদিন আমার বাবা মাকে চায়ের আমন্ত্রণ করলেন। চায়ের আসরে ছিলেন দিদি, মা বাবা ও তিন ভাই .... আর এদিকে আমি দাদা ও আমার বাবা গিয়েছিলাম। চা খাওয়ার পর মেসোমশাই দাদাকে বললেন অনিল, তুমি লীলার ঘরে যাও। তোমাদের পড়াশোনার আলোচনা করার সুবিধে হবে। দাদা এই প্রথম দিদির ঘরে গেলেন এবং নানা বিষয়ে আলোচনা হল।[৩]

বিপ্লবী সুনীল দাসের মতে, "বাংলার তথা ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে এই যোগাযোগ তাৎপর্য্যময় দিক্‌চিহ্নরূপে হায়িত্ব পেয়েছে।"[৪]

লীলাবতী নাগ শিক্ষাজগতে একটি সুপরিচিত নাম হলেও অনিল রায় শুধুমাত্র তাঁর সান্নিধ্যকামনায় সংস্কৃতের বদলে ইংরাজি গ্রহণ করেননি। এই বিষয় পরিবর্তনে রাগ অনুরাগের রং ছিল না। তিনি সংস্কৃত পরীক্ষায় সকলের আশানুরূপ 'দুর্দান্ত ফল' করতে ইচ্ছুক ছিলেন না কেননা তাতে কৃতিছাত্রের বিপ্লবী সাধনা ব্যাহত হবার আশঙ্কা ছিল। লীলাবতী অথবা অধ্যাপকেরাও তাঁর 'উড়ে এসে জুড়ে বসা'য় সন্তুষ্ট হননি।[৫] তৎসত্ত্বেও অতি সহজভাবে শুরু হয়েছিল 'ইতিহাসের দুই আশ্চর্য্য সৃষ্টির[৬]' সুদীর্ঘ পথযাত্রা। এই অন্তরঙ্গ সখ্যতার ভিত্তি ছিল বৌদ্ধিক সম্পর্ক। পর্যায়ক্রমে সামাজিক, রাজনৈতিক বৈপ্লবিক স্তরে উন্মোচন করেছিল নতুন দিগন্ত।

বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভায় সমতা থাকলেও বৈপ্লবিক আদর্শবাদে লীলা-অনিলের মিল ছিল না। আশৈশব দেশের সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন লীলাবতী স্কুলে কলেজে ছাত্রী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা করেছেন, নারীমুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন।[৭] অপর দিকে বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র অনিল রায় হেমচন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠিত একটি বিপ্লব সংস্থা 'মুক্তিসঙ্ঘে' যোগ দিয়েছিলেন। ১৯১৫ থেকে ১৯১৯-এর মধ্যে ঢাকার যুবশক্তিকে সুসংবদ্ধ করে বিপ্লব মন্ত্রে উদ্দীপিত করার ব্রত নিয়েছিলেন।[৮] চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের দুর্লভ সমাবেশ তাঁকে অনতিকালে মর্যাদা দিয়েছিল বাংলার বিপ্লব আবেষ্টনে। কৈশোর থেকে লীলাবতীর প্রবল ইংরাজ বিদ্বেষ থাকলেও প্রাথমিক স্তরে গুপ্ত সশস্ত্র রক্তবিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের পন্থায় আস্থা ছিল না।

কর্মব্যাপ্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লীলাবতী ও অনিলচন্দ্রের পরিচয় পরে কর্মক্ষেত্রে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। সমাজ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অনিলচন্দ্র 'সোস্যাল ওয়েলফেয়ার লিগ' স্থাপন করেছিলেন। এর মূল ভিত্তি ছিল সামাজিক দায়বদ্ধতা ও জনসেবা। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে, 'অগণিত দুঃখীর বেদনায় উচ্ছ্বসিত' হয়ে তিনি সাংগঠনিক কাজে নিমজ্জিত হলেন। শরীরচর্চা, লোকহিত, পল্লির অসামাজিক ও অশুভ শক্তিকে দমন করে নতুন প্রজন্মকে 'মানুষ' করার সংকল্প নিয়েছিলেন।[৯] সমাজকল্যাণের অন্তরালে বৈপ্লবিক প্রস্তুতি অব্যাহত ছিল। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ নথিপত্রে এই দুর্ধর্ষ গুপ্ত সংগঠন "শ্রীসঙ্ঘ" নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৯২২ সনে লীলাবতী উত্তরবঙ্গে বন্যাত্রাণে অর্থসংগ্রহ করতে গিয়ে বাংলার বৃহত্তর নারীসমাজের পরিচয় পেয়েছিলেন। ১৯২৩ এ তিনি দুঃস্থ বালকবালিকাদের জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বারো জন সতীর্থের সহযোগিতায় দীপালি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূল লক্ষ্য ছিল মেয়েদের সংগঠিত করে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে মানব সেবায় নিযুক্ত করা। ১৯২৩-১৯৩১ এর মধ্যে ঢাকায় নারীসমাজে তা অভূতপূর্ব সাড়া ফেলেছিল। দীপালি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। ভারতের নারীমুক্তি আন্দোলনের পুরোভাগে স্থান পেয়েছিলেন লীলাবতী।[১০]

প্রাথমিক পরিচয়ের পরে সমাজসেবার মঞ্চে অনিলচন্দ্র ও লীলাবতী পুনরায় মিলিত হলেন। এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ অনিল সর্বদাই বান্ধবীকে সাহায্য করতে আগ্রহী ছিলেন। দীপালির অনুষ্ঠানসূচি

রূপায়ণে পুরুষের বাহুবলের প্রয়োজন হলে শ্রীসঙ্ঘের সদস্যারা সহায়তা করতেন। লীলাবতীর অনুরোধে দীপালির বর্ষামঙ্গলে অনিলচন্দ্র কথায় ও সুরে সংঘের মূল চরিত্র-কে নিয়ে একটি গীত রচনা করেছিলেন। বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন লীলাবতী। গায়ক ও শ্রোতাদের মধ্যে গানটি অপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়েছিল।[১১]

দীপালি। দীপালি মঙ্গল দীপ জ্বালি
মন্দিরে আগমনী শঙ্খ বাজায়
সুপ্ত নয়নে আনে মুক্তির জাগরণী
নিদ্রিত নিপীড়িত আঁখি মেলি চায়।[১২]

মানবদরদী সংবেদনশীল অনিলচন্দ্রের কাছে স্ত্রীপুরুষের ভেদাভেদ ছিল না। চিন্তাজগতের এই সামীপ্য তাঁদের এক সূত্রে বেঁধে পারস্পরিক প্রতিভা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপন করেছিল।

বাংলার নারীস্বাধিকারের পথপ্রদর্শিকা লীলাবতী নাগের সশস্ত্র সংগ্রামে যোগদান স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন সংযোজন। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ না দিলেও তৎকালীন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন তিনি। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ব্যক্তিগত সম্ভ্রম থাকলেও তাঁর অহিংস নীতি ও আপোসপন্থী মনোভাবে সমর্থন ছিল না। লীলাবতী ব্রিটিশ শাসনের লৌহকাঠামোর উপর সর্বস্ব পণ করা কঠিন আঘাতের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। নানা সংশয়ের ঘাত প্রতিঘাতে রক্ত বিপ্লবের পথ নির্বাচন সহজসাধ্য ছিল না। নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। গুপ্ত বিপ্লব সংস্থার কঠোর নিয়মাবলি আত্মবিকাশের অন্তরায় হয়ে তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে খর্ব করতে পারত। সকল দ্বিধাদ্বন্দ্বের নিরসন করে দিলেন তাঁর সহকর্মী বিপ্লবী বন্ধু অনিল রায়। সমাজ সেবার গতি ফিরিয়ে বিপ্লব প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করার বিকল্প পথ দেখালেন — আর্থ সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের পূর্বে রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্থান। বিদেশি রাহুর গ্রাস মুক্ত না হলে শোষিত দেশবাসীর কোনও উন্নতির সম্ভাবনা নেই। লীলাবতী বেছে নিলেন আপোসহীন সশস্ত্র বিপ্লবের পথ। শ্রীসঙ্ঘের সদস্য হিসাবে দলভুক্ত হলেন।[১৩] দুই সহযাত্রীর সম্পর্ক হয়ে উঠল ঘনিষ্ঠতর। দেশমুক্তি-সাধনে সম্মিলিতভাবে প্রবাহিত হল তাঁদের জীবন, চিন্তন ও কর্মধারা।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষচালিত শ্রীসঙ্ঘে লীলাবতীর প্রবেশ কুসুমাস্তীর্ণ হয়নি। নারীসংস্পর্শবিবর্জিত ব্রহ্মচর্যভিত্তিক বিপ্লবীসংস্থায় অনিল-লীলার হৃদ্যতা রক্ষণশীল সদস্যারা সুনজরে দেখেননি। অনিলচন্দ্রের প্রবল ব্যক্তিত্ব ও তাঁর অনুগামীদের অকুণ্ঠ সমর্থনেই লীলাবতীর দলভুক্তি সম্ভব হয়েছিল। প্রথমে ভিতরের অসন্তোষ প্রকাশ্য বিরোধিতার পর্যায়ে আসেনি। অমলচন্দ্রের স্মৃতি কথায় জানা যায়, শ্রীসঙ্ঘের প্রধান প্রতিপক্ষ হেমচন্দ্র ঘোষ বক্সিবাজারে 'দিদি'র বাসায় প্রতি সন্ধ্যায় আসতেন নিকুঞ্জ সেন
নিয়ে। 'উচ্চমহলের এই politics' অমলের বোধগম্য না হলে
তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে একটা দলাদলি চলছে। সকল সম
বিপ্লবের জটিলতা নিয়ে আলোচনা হত না।[১৪] সম্ভবত রমণী রূ
লীলার সঙ্গ কাম্য হলেও বিপ্লবে তাঁর নারীত্ব অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল

অবধারিতভাবেই শ্রীসঙ্ঘ দ্বিখণ্ডিত হল ১৯২৯ সনে
লিঙ্গগত প্রশ্নই তার অন্যতম মুখ্য কারণ। লীলাবতীর প্রশ্নাতী
যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা, কর্মদক্ষতা যে কোনও পুরুষের সমকক্ষ অথ
শ্রেষ্ঠতর ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংঘ পরিচালনায় লীলাবতী
নেতৃত্বকে মেনে নিতে আপত্তি ছিল অধিকাংশ পুরুষ সদস্যের
তবু সবকিছুকে উপেক্ষা করে নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল অনিলচ
পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন লীলাকে। তাঁর উপর তুলে
দিয়েছিলেন শ্রীসঙ্ঘের কর্মভার। প্রবল সংঘাতের মধ্যে
বিরোধীপক্ষ বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বি ভি) নামে নতুন বিপ্লবী গোষ্ঠী
প্রবর্তন করলেন।[১৫] প্রকৃতপক্ষে তাঁদের ক্ষমতালিপ্সাই এ
বিভাজনের অন্তর্নিহিত হেতু। সহবিপ্লবীদের নির্দয় ব্যবহারে
মর্মাহত অনিল রায় কিছুকাল হিমালয়ের কোলে আশ্র
নিয়েছিলেন। তাঁর অবর্তমানে কুৎসা কলঙ্ক উপেক্ষা ক
লীলাবতী কর্মস্থলে নিজের অভীষ্ট কার্য সম্পাদনে নিযু
রইলেন। সব সমালোচনার উর্ধ্বে আপন নীতিতে অবিচলি
থাকার দৃঢ়তা তাঁর জীবনের শেষ দিন অবধি ছিল। স্বভাবসি
উদারতা ও বিপ্লবের স্বার্থে অকৃতজ্ঞ হীনমন্য বিপ্লবীদের ক্ষ
করেছিলেন তিনি, কিন্তু ভুলতে পারেননি 'জীবনের সর্বপ্রথ
tragedy নারী হওয়া'। বিকৃত সামাজিক আবহাওয়ায় সামঞ্জস
খুঁজে পাননি কোথাও।[১৬]

লীলাবতী নারীমুক্তির ভাবনা ও বিপ্লবসাধনার সমন্বয় ঘটি
শ্রীসঙ্ঘের সঙ্গে দীপালিকে সংযুক্ত করলেন। সমাজসেবা
অন্তরালে দীপালির কন্যারা শ্রীসঙ্ঘের বৈপ্লবিক কর্মে নিয়োজি
হতেন। স্ত্রী পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দীপালি-শ্রীসঙ্ঘ প্রভূ
শক্তি সঞ্চয় করেছিল। রাজনৈতিক বিপ্লবে যুক্ত হয়েছিল অন্তর্মু
সমাজবিপ্লব। আদর্শ, লক্ষ্য ও কর্মে পরস্পরের পরিপূরক লীলাব
নাগ ও অনিলচন্দ্র রায়ের নিঃস্বার্থ সহমর্মিতার উপর প্রতিষ্ঠি
সফল যৌথ নেতৃত্ব ভারতের সমস্ত বিপ্লব সংস্থার সম্মান অর্জ
করেছিল।[১৭] ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ সনে চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহে
অনতিকাল পরে অনিলচন্দ্রের গ্রেপ্তারের প্রেক্ষিতে শ্রীসঙ্ঘে
একক নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন লীলাবতী নাগ। এ কঠিন গুরুভা
বহন দুঃসাধ্য ছিল। ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১এ বক্সা জেলে অনি
রায়কে লিখিত পত্রে তাঁর সংশয় ও ক্লান্তি পরিস্ফুট :

> পথ চলতে হয়-পায়ের তলায় পথই একমাত্র পথ কি না সন্দে
> জাগে—কিন্তু তবুও চিন্তা করার অবসর কই .... পথটাকে
> আঁকড়ে ধরি-চলাটাকেই ধ্রুব বলে মানি।[১৮]

লীলাবতী নাগ স্বাধীনতাসংগ্রামে বিপ্লব সংস্থায় একক নারীনেতৃত্বের অভিনব নজির সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর পরিচালনায় শ্রীসঙ্ঘ ভারতের অন্যতম দুর্ধর্ষ গুপ্ত সংগঠনে পরিণত হয়। তাঁর 'বিপজ্জনক' খ্যাতি এত দূর প্রসারিত ছিল যে তৎকালীন সমস্ত রক্তাক্ত বৈপ্লবিক অভিযানের জন্য দায়ী করা হত তাঁর অদৃশ্য শক্তিকে।[১৯] এরই সঙ্গে অক্ষুণ্ণ ছিল দীপালির সমাজসেবা ও স্বজাতিকা জয়শ্রী পত্রিকার সম্পাদনা। অনিলচন্দ্রের অসীম আস্থার পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছিলেন লীলা। সার্থকতার নতুন মাত্রা সংযোজনে ঘনীভূত হয়েছিল তাঁদের সম্পর্ক। ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৩১ এ লীলাবতী বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে প্রথম মহিলা রাজবন্দি হিসাবে কারারুদ্ধ হন।[২০] নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতিতেও শ্রীসঙ্ঘের বলিষ্ঠ সাংগঠনিক পরিকাঠামো সুসংবদ্ধভাবে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছিল।

পূর্বরাগ

১৯৩০ থেকে ১৯৩৮ অবধি অনিলচন্দ্র ও লীলাবতীর সুদীর্ঘ কারাবাস তাঁদের মধ্যে রচনা করেছিল দুস্তর ব্যবধান। লৌহকপাটের অন্দরে থেকে বাহিরে সংযোগের একমাত্র বাহন ছিল লেখনী। কবি অনিলের মর্মোৎসারিত কবিতাগুচ্ছ, চিঠিপত্রের আদানপ্রদান, দিনপঞ্জি ও দিনলিপি তারই প্রমাণ। অনিলচন্দ্রের লেখার সংখ্যাই বেশি, লীলাবতী পরবর্তীকালে, অজ্ঞাত কারণে তাঁর অনেক চিঠিপত্র বিনষ্ট করেছিলেন। এগুলির মাধ্যমে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। সরস্বতীর প্রাঙ্গণে জাত বন্ধুত্ব উর্বর কর্মক্ষেত্রে বৃদ্ধিলাভ করে, জীবনমৃত্যুর পারে এসে শ্রদ্ধা, নির্ভরতার সিঞ্চনে মহীরুহে পরিণত হয়েছিল।

কট্টর বিপ্লবী অনিলচন্দ্রের মানসভূমি অধিকার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, গ্যেটে, বায়রন, হোমার, রোলাঁর মতো কবি দার্শনিকেরা। সঙ্গীত, বাদ্য, চিত্রকলায়ও ছিল অসম্ভব টান।[২১] তাঁর কবিতার প্রতি ছত্রে নারীমূর্তির আবাহনের অন্তরালে অনামিকা লীলাবতীর ছায়া সুপরিস্ফুট। ১৯৩১ এ বক্সা জেলে লিখিত কবিতায় বিরহী যক্ষের আকুলতা। প্রিয়ার সঙ্গে আকস্মিক দেখায় "ছন্দ সুর আনন্দের ধারা, কলকল বয়ে গেছে বাধাবন্ধ হারা।"[২২] বিপ্লবের বহ্নিশিখা, রাজনীতির দাহন, সমাজসেবার কর্মব্যস্ততা, এমনকী সাহিত্যের ডাকও অনুপস্থিত। দুর্যোগের ঝড়ে অমৃত সাগর থেকে ভেসে আসা তরঙ্গের মতো প্রেয়সীর পরম আশ্বাস।

> ভয় নাই সহযাত্রি, ভয় নাই বন্ধু, প্রিয় জীবনের মণি।
> আমরা চলিব শুধু শুনি সত্য দেবতার বাঁশরীর ধ্বনি।[২৩]

লীলা-অনিলের লেখাগুলির মধ্যে তাঁদের প্রকৃতিগত ঐক্য ও অসংগতি প্রকাশিত। মননসম্পদে অনন্য দুই মানবমানবীর সাহিত্যে, ইতিহাসে, দর্শনে, সঙ্গীতে, শিল্পানুরাগে সমরুচি। প্রথম পরিচয়ের উপকরণ পুস্তক তাঁদের নিত্যসঙ্গী। বহুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অনিল রায় 'ইওরোপীয় রেনেশাঁসের একটি চরিত্র'।[২৪] তিনি কল্পনাবিলাসী, ভাবুক, রোম্যান্টিক। লীলাবতী বিদুষী, কর্মতৎপর, বাস্তববাদী ও সাংসারিক জ্ঞানসম্পন্ন। স্বভাবজ অনৈক্য সত্ত্বেও অনিলচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সহমর্মিতার কোনও অভাব নেই। বিপ্লবের আত্মঘাতী প্রান্তরে বন্ধুর সদাবর্তমান সংশয়, তীব্র অস্থিরতা, অসম্ভব ব্যাকুলতা[২৫] প্রশমন করেছেন ধৈর্য, সংযম ও আশাবাদের দৃঢ়তায়:

> সুখ দুঃখ সবই আজ অভিজ্ঞতার নিকষ পাথরে অনেকটা মূল্যহীন। ... তোমার সব চিঠিতে এত নিরাশার সুর কেন? যারা দুর্বল তাদের দুঃখ করা সাজে কিন্তু যারা সর্বজয়ী হতে চায়-তাদের তো নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। ... জীবনে আনন্দকেই guiding factor করতে হবে। নিরাশাকে নয়।[২৬]

কারান্তরালের বদ্ধ পরিবেশে লীলা অনিলের বৌদ্ধিক সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়েছিল জ্ঞানপিপাসার আলোকে। দুই সতীর্থের অগাধ পড়াশোনার প্রমাণ তাঁদের পত্রদূতগুলি। নানা বিষয় ও শাস্ত্রে তাঁদের গভীর আগ্রহ, ব্যুৎপত্তি ও বিশ্লেষণ বিস্ময় উৎপাদন করে। তাঁদের চিন্তাধারা ও বুদ্ধিমত্তা যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯৩১ এর ১২ই জুনের পত্রে লীলাবতী অরবিন্দের যোগের পন্থা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর কাছে কর্মসাধনা আত্মশুদ্ধির অপেক্ষা অনেক বেশি মূল্যবান ছিল।[২৭] অনিলচন্দ্র ১৯৩৮ এ ২রা জুনের দিনলিপিতে ন্যায়শাস্ত্রের অবশ্যম্ভাবিতা স্বীকার করেও মায়াবাদের শক্তিশালী প্রভাবকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

> মানুষ ছায়াকে চায়, মানুষ মায়াকে চায়, ... সে সহজ নয়, জটিল। সে একরঙা নয়-বিচিত্র। ... চাই সুদূরকে, চাই অজানাকে, চাই দুর্বোধ্য অন্ধকারকে। অর্থাৎ চাই ম্যাজিককে।[২৮]

পূর্বরাগের শেষ অঙ্কেও অনিল ও লীলার ভাব বিনিময়ের মধ্যে প্রণয়ের উচ্ছলতা অনুপস্থিত। বোধি ও মননের জগতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে তাঁরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য উপভোগ করেছিলেন।

বিপ্লবী সাধনা অনিল-লীলাকে বেঁধেছিল অচ্ছেদ্য সূত্রে। বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁদের চিন্তাভাবনা চিঠিপত্রে অলিখিত। কারাগারে ব্রিটিশ রক্তচক্ষুর সম্মুখে এ বিষয়ে আলোচনা সম্ভব ছিল না। অস্পষ্টভাবে দুজনে তাঁদের জীবনের ধারা, পথের লক্ষ্য সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন।[২৯] সশস্ত্র সংগ্রামের দুর্বলতা-শঠতা, প্রতারণা, হীনমন্যতা, ক্ষমতালিপ্সা-অনিলচন্দ্রকে জর্জরিত করেছিল। লীলাবতী আপন শক্তিতে এ বিপর্যয় অতিক্রম করার চেষ্টা করেছিলেন। সঠিক দিশার যাথার্থে সন্দেহ জাগলেও পরিত্যাগ করার উপায় নেই, কারণ বিচ্যুতির অর্থ তাৎক্ষণিক পতন। অনিল তাঁর প্রিয়সাথীর দুর্দম মনোবলে আশ্রয় খুঁজেছেন।

জীবন মরণ সব সমান হয়েছে, একাকার, কুয়াশার পর কুয়াশা ঘিরে আসছে রহস্যের মতন। .... একটা ধূসর সমুদ্রের মাঝে তুমি জ্বলছ দিগন্তে শুকতারার মতন। কত দূরে কোন অনন্তের পারে।[৩০]

বিপ্লবের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনিলচন্দ্র দিনপঞ্জিতে সংক্ষিপ্ত আকারে নীরস প্রাত্যাহিক ঘটনাবলির বর্ণনা দিয়েছেন। দিনলিপিতে লীলাবতীর প্রতি ভাবাবেগের প্রবল প্লাবন। অথচ রোজনামচায় যেন সঙ্কুচিত তার নামোল্লেখ। [৩১] অনিলের তুলনায় লীলার মতামত অনাবৃত। তিনি সুস্পষ্টভাবে নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রতি ছত্রে তাঁর বাস্তববোধ ও অপরিমেয় কর্মানুরক্তির স্বাক্ষর। সভা সমাবেশ, দলীয় সংহতি, সদস্য নির্বাচন, প্রচার ব্যবস্থা কোনও কিছুই তাঁর দৃষ্টির অগোচর নয়।[৩২] কেবলমাত্র প্রণয়পাত্রের উপর সামান্য দাক্ষিণ্যের অভাব।

ব্যক্তিগত ও সংসারজীবন সম্বন্ধে লীলাবতী ও অনিলচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য তাঁদের পত্রগুলিতে ধরা পড়ে। অনিলের একমুখী অন্তর শুধু তাঁর ও লীলার জন্য সৃষ্ট একটি নির্দিষ্ট মনোবৃত্তে বিচরণ করত। কদাচ তিনি পরিবার ও সহযোগীদের কথা উল্লেখ করেছেন। বৃহত্তর জগতের সংঘাতময় পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে লীলাই তাঁর একমাত্র সম্বল ছিলেন। প্রিয়তমার অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার জন্য শারীরিক অসুস্থতার সম্ভাবনা তাঁর অশেষ আশঙ্কার কারণ ছিল। সকল সময় 'দুঃসংবাদ ও অকল্যাণের প্রতীক্ষা' তাঁকে ব্যাকুল করত।[৩৩] দৈনন্দিন জীবন বিষয়ে অনিলচন্দ্রকে লেখা লীলাবতীর পত্রগুলি ঘটনাবহুল। ১৯৩১এর ১২ই জুনের চিঠিতে তিনি গৃহ থেকে ৩০০০৲ টাকার গহনা অপহরণের কথা লিখেছেন। মাতা কুঞ্জলতার অসুস্থতার বিবরণ দিয়ে তাঁকে বায়ুপরিবর্তনের জন্য উত্তর ভারতে নিয়ে যাওয়ার অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন। লীলাকে অর্থাভাব বিশেষ উদ্বিগ্ন করত, তদুপরি বক্সা জেলে অনিলচন্দ্রের পীড়ার সংবাদ। পত্রান্তে তাঁর অপরিসীম শ্রান্তি প্রতীয়মান।

সব দিক থেকে collapse করবার আশঙ্কায় রয়েছি। .... নিজেদের অবস্থার দৈন্যে বেদনা দেয় অসীম। সক্ষম হয়েও এ যে অক্ষমের মত নির্ভরশীল হওয়া — সমাজের জন্য এ যে কী ছোট করে দেয় অন্তরকে।[৩৪]

অনিলচন্দ্র ও লীলাবতীর প্রাক বিবাহ সম্পর্কের মধ্যে স্বাভাবিক প্রেমানুভূতির আবেশ ছিল না। বিপ্লব ও প্রণয়ের মধ্যে সর্বদাই একটি টানপোড়েন দ্বিখণ্ডিত করেছিল তাঁদের মনোজগৎ। বিপ্লবসত্তা ও প্রেমসত্তার অদৃশ্য দ্বন্দ্বে কর্মসাধনা জয়যুক্ত হয়েছিল। লীলাবতী এই দুই ধারার তীব্রতা প্রশমিত করে সমন্বয় আনার চেষ্টা করেছিলেন। অনিলচন্দ্রের সর্বব্যাপী প্রবল ভাবাবেগ অন্তর্মুখী ছিল। প্রিয়ার কাছে নিবেদিত হয়নি। লীলাবতীর পরিমণ্ডলে বহু মানুষের মধ্যে অনিলচন্দ্র প্রধান। অনিলচন্দ্রের অস্তিত্বের অণু পরমাণুতে লীলাবতী প্রেমের ভাষা ও হৃদয়স্পন্দন কোন আর্থসামাজিক রাজনৈতিক লৌহনিগড়ে বন্দি থাকে ন লীলাবতীর কাছে অনিলচন্দ্রের অব্যক্ত আর্তির প্রতিধ্বনি কোনও নারী পুরুষের প্রীতিবন্ধনের শেষকথা।

সূর্য্য হয়ে দিনের আকাশে জ্বলো আর রাতে হও অনাদিকালে তারা .... সবগুলো মুহূর্তের ওপর বিকীরণ করছ আলো; আমা চিত্ততলের গহন কোণগুলি পর্য্যন্ত তুমি চিরকাল ছুঁয়ে আছ তোমা চিরজাগরূক অক্ষয় স্পর্শে।[৩৫]

পরিণয়

১৯৩৭-১৯৩৮ সনে লীলাবতী নাগ ও অনিলচন্দ্র রায়ে কারামুক্তির সময় ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূ পরিবর্তন ঘটেছিল। বিপ্লবীরা বিচ্ছিন্ন আঞ্চলিক সশস্ত্র সংগ্রামে অসারতা অনুধাবন করে উপমহাদেশীয় স্তরে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে আয়োজনে নিযুক্ত হলেন। বিপ্লব গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন আকার ধার করে পুনর্গঠিত হল। লীলাবতী ও অনিলচন্দ্র সুভাষচন্দ্র বসু বাম রাজনীতি সমর্থন করে তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দিলেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে শ্রীসঙ্ঘের সংযুক্তি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র লীলা-অনিলকে তাঁর দলের অন্যতম সঞ্চালক রূপে সসম্মানে গ্রহণ করেছিলেন। মুক্ত রাজনীতি মঞ্চে, সর্বভারতীয় পরিবেশে, সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে সুভাষের কর্মযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁরা।[৩৬] তাঁর অন্তর্ধানের পরও ফরোয়ার্ড ব্লকের দুরূহ দায়িত্বভার নিয়েছিলে একাগ্রচিত্তে।

১৯৩৯ এ অনিলচন্দ্র ও লীলাবতীর অতুলনীয় সখ্যতা সকল বাধা অতিক্রম করে বিবাহের মাধ্যমে বিধিবদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তাঁদের মনোবল বিবাহ বহির্ভূত অন্তরঙ্গতা সম্বন্ধে সামাজিক ভ্রূকুটি উপেক্ষা করতে সক্ষম ছিল। যৌবনের প্রারম্ভে মিলিত হলেও চল্লিশের উপান্তে এসে তাঁদের বয়স পরিণয়ের কাল উত্তীর্ণ হয়েছিল। দেশের মুক্তিসাধনার চূড়ান্ত পর্যায়ে দুই বিপ্লবসাধক স্বাধীনতার বেদিমূলে উৎসর্গিত ছিলেন। বিপ্লব ও বিবাহের ভাবনা স্ববিরোধী এবং লীলা-অনিল সাধারণ দাম্পত্য সুখের জন্য সৃষ্ট হননি। এক অনাড়ম্বর সামাজিক অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁদের সম্বন্ধ বৈধতা লাভ করেছিল।

বিবাহ বিষয়ে লীলাবতীর ধারণা ক্রমপর্যায়ে পরিবর্তিত হয়েছিল। কৈশোরে তিনি বিবাহ না করার 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' গ্রহণে বিরত থাকলেও এ ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না। পিতৃ নির্বাচিত পাত্রের সঙ্গে নিরাপত্তা ও আর্থিক সচ্ছলতার জন্য 'নির্ধারিত' বিবাহ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বিবাহ প্রশ্ন পরিহার করে তিনি শান্তিতে স্বদায়ভার বহন করতে চেয়েছিলেন। সপ্তদশী লীলা তাঁর পিতাকে লিখেছিলেন :

আমাকে প্রলোভিত করতে কেউ পারবে না .... আমাকে এখন বিয়ে টিয়ের কথা লিখো না। কেন তোমার অত কষ্ট হয় বুঝিনা। তুমি কি ভাবো বিয়ে করলেই আমার কোন দুঃখ হোত না! ... একদিন একটুকু ভুলের জন্য সারা জীবন কষ্ট পেতে পারবো না আমি।[৩৭]

পরবর্তীকালে অনিল রায়ের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা তাঁর চিন্তাধারাকে পরিমার্জিত করেছিল। নারীর জীবনে বিবাহের অনস্বীকার্য প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। বিবাহ সামাজিক পরিকাঠামোর অত্যাবশ্যকীয় চিরস্থায়ী বন্ধন। প্রত্যেক নারীর যুক্তি, বিশ্লেষণ ও ইচ্ছানুসারে সঠিক বয়সে উপযুক্ত পুরুষ নির্বাচনের পূর্ণ অধিকার আছে।[৩৮]

অনিলচন্দ্র ও লীলাবতীর বিবাহের পিছনে পারিবারিক কারণ ছিল। লীলাবতীর পিতা গিরীশচন্দ্র নাগ তাঁর কন্যার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে সুপাত্রস্থ করতে সাতিশয় উৎসুক ছিলেন।[৩৯] বিবাহে লীলার সম্মতি তাঁকে আনন্দে আত্মহারা করেছিল। পিতার অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে মাতা কুঞ্জলতার আকস্মিক মৃত্যুও অবশ্য তাঁর মত পরিবর্তনের অন্যতম নির্বন্ধ ছিল। কুঞ্জলতা ও অনিলের মধ্যে সুমধুর সম্বন্ধ থাকলেও তাঁরা বলপূর্বক লীলার উপর কোনও প্রকার চাপ সৃষ্টি করতে চাননি। বিবাহের শুভলগ্নে লীলাবতীর মনে স্নেহশীলা জননীর প্রতিমূর্তি বারম্বার ভেসে উঠেছিল। প্রভাতচন্দ্র নাগের উদ্ধৃতিতে :

> দিদিকে সারা সকাল থেকে বিবাহলগ্নের পূর্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত কেমন যেন উদাস গম্ভীর দেখেছিলাম। ঠিক উপর তলায় দক্ষিণ বারান্দায় মার আরাম কেদারায় বসে সারাদিন কাটিয়েছেন। দিদির চোখে জল; কিন্তু সাহস হয়নি দিদিকে জিগ্যেস করি। বিবাহের পরের দিন দিদি আমাকে ডেকে বললেন- 'জানিস খোকা, কাল আনন্দের মাঝেও আমার মন মার কথা ভেবে খারাপ ছিল বেশ।'[৪০]

লীলাবতী-অনিলচন্দ্রের পরিণয়ে কোনও সামাজিক বাধ্যবাধকতা ছিল না। তাঁদের অনাবিল বন্ধুত্ব রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থা সুনজরে দেখেনি। অনুগত সহচরদের মধ্যে অনেকে কুমারীত্ব ও শুদ্ধাচারের প্রতীক বিপ্লব নেত্রীর বিবাহের যুক্তি মানতে পারেননি। সব কিছু অগ্রাহ্য করে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁরা স্বেচ্ছায় বিবাহের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। লীলার সনাতন ঐতিহ্যে ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বৈবাহিক মূল্যবোধের সমর্থক হিসাবে তিনি সহবাসের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। জীবনের পথে উদ্বাহকে একটী স্বাভাবিক ঘটনারূপে গণ্য করে সহজ দাম্পত্যকে কর্মমুখর করতে চেয়েছিলেন।[৪১] রাজনৈতিক অপপ্রচার তাঁদের মীমাংসা ত্বরান্বিত করেছিল। সুভাষচন্দ্র ও লীলাবতীকে কেন্দ্র করে পঙ্কিল অঙ্গুলি নির্দেশ শালীনতার সীমা অতিক্রম করলে লীলা তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার বন্ধ করে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনার জন্য সহায়ক নিযুক্ত করলেন।[৪২] এই কুৎসিত ক্লান্তিকর অসত্যের মুখ রুদ্ধ করতে বিবাহ অপরিহার্য ছিল।

প্রাক বিবাহ পর্বে লীলাবতী সম্পর্কে অনিলচন্দ্রের মনোভাব অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ ও মায়াময়। তাঁর অপ্রকাশিত দিনলিপিতে তিনি বারম্বার নামহীন লীলাবতীর প্রতিমূর্তিতে গভীর ঐশ্বরিক প্রেম নিবেদন করেছেন। বিবাহে অনিলের বিশেষ আগ্রহ থাকলেও লীলা তাঁকে কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি। তাঁর অবদমিত মনস্কামনা 'প্রস্তাবনার' স্তরে উন্নীত হতে পারেনি। নিঃসন্দেহে, লীলাবতী স্বয়ং প্রতিবন্ধকতা দূর করে বিবাহের পথ উন্মুক্ত করেন। এ বিষয়ে তাঁর কোনও উত্তেজনা, চাঞ্চল্য বা প্রেমোচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয় না। সংসার ও রাজনীতির সর্বগ্রাসী প্রাত্যহিক চাহিদা মিটিয়ে তিনি অনিলচন্দ্রকে লিখেছেন :

> জীবনের ব্যথা বেদনা, frustration এ তো আসবেই-এরই মধ্যে আমরা সৃষ্টি করবো অক্ষয় আনন্দ-সমস্ত হলাহল আকণ্ঠ পান করে পরিবেশন করবো অমৃত .... যে সাধনা ও আদর্শ জীবনকে কিনে নিয়েছে এ জীবন তার জন্য উৎসর্গ হোক-তার সব দুঃখ, সব কুশ্রীতা, সব নিস্ফলতা সত্ত্বেও .... তার সঙ্গে সংগ্রাম করে আমাদের আনন্দ জয়ী হবেই।[৪৪]

১৩ ই মে, ১৯৩৯-এ লীলাবতী নাগ ও অনিলচন্দ্র রায়ের বিবাহ হয়। বধূর বয়স ৩৯, বরের ৩৮। প্রভাতচন্দ্র নাগ এ বিশেষ দিনটির বর্ণনা দিয়েছেন :

> দিদির চিঠি পেয়ে আমি সিলেট থেকে ঢাকায় এসেছি-এসেই আমি লেগে গেলাম সাজানোর কাজে... আমি একটি ছেলে নিয়ে দিদির বিবাহের স্থানটুকু সাজাতে শুরু করলাম সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। প্রথমতঃ সাদা সিল্কের কাপড় দিয়ে pillar গুলো মুড়ে দিলাম-তারপর fern নানা সবুজ পাতা, বেলফুল দিয়ে সাজিয়ে দিলাম। কি সুন্দর হয়েছিল।[৪৫]

অনিলচন্দ্র বাঙালির চিরাচরিত বর বেশে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি পরে বরযাত্রী নিয়ে পদব্রজে গিরীশচন্দ্রের গৃহে এসেছিলেন। লীলাবতীর সাদা বেনারসি শাড়িতে লাল জরির পাড় ছিল। তিনি অলঙ্কার, পুষ্প ও সুগন্ধি ব্যবহার করেছিলেন। বিবাহ ব্রাহ্মমতে অনুষ্ঠিত হয়—উপাসনা, গীত, আচার্যের মন্ত্রোচ্চারণ ও মালাবদল সহ প্রদোষে। লীলার সিঁথিতে সিঁদুর, মস্তকে অবগুণ্ঠন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে পারিবারিক পরিজন ও রাজনৈতিক সহযোগীরা ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে নবদম্পতি অনিলচন্দ্রের গৃহে তাঁর পিতামাতাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন। সকলের কাছে এই শুভদিনটি সমাদৃত ও চিরস্মরণীয় হয়েছিল।[৪৬]

লীলাবতী ও অনিলচন্দ্রের বিবাহ অসবর্ণ হলেও তাঁদের পরিবারে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়নি। উভয় পক্ষই এই মেলবন্ধন সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। গিরীশচন্দ্র অসীম উৎসাহে সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছিলেন। অরুণচন্দ্র ও তাঁর পত্নী

পুত্রবধূকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। বিবাহের চিহ্নগুলি- শাঁখা সিঁদুর লোহা, আলতা, ঘোমটা-লীলাবতী নিয়মিতভাবে ব্যবহার করতে পারেননি[৪৭] বলে তাঁদের কোনও আক্ষেপ ছিল না। তাঁর পক্ষে স্থানাভাবে শ্বশুরালয়ে থাকা সম্ভব হয়নি কিন্তু সম্পর্ক অটুট ছিল। প্রতিটি বিশেষ দিনে তিনি শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতাকে প্রণাম করে যেতেন। তাঁর দেবর অমলচন্দ্র তাঁর একান্ত গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। সংসারের সুখদুঃখে, আপদে বিপদে লীলাবতীর সহায়তার হস্ত সর্বসময়ে প্রসারিত ছিল।

অনিলচন্দ্র ও লীলাবতীর কর্মবহুল জীবনে মধুচন্দ্রিমার উত্তাল আনন্দোচ্ছ্বল স্বপ্ন রঙিন ভাবাবেগের অবকাশ ছিল না। সর্বদাই বৃহত্তর কার্যক্রমের স্থান ছিল বৈবাহিক ঘনিষ্ঠতার উর্ধ্বে। ১৯৪০ এর প্রারম্ভে বিবাহের মাত্র সাত মাস পরে স্টিমারে কর্মব্যস্ত লীলাবতীর অনিল রায়কে লিখিত একটি পত্র বিস্ময় উদ্রেক করে। নববিবাহিত স্বামীকে তিনি ক্রমানুসারে বিবিধ রাজনৈতিক, সাংগঠনিক, আর্থিক ও বৌদ্ধিক বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশাবলি পাঠিয়েছেন।[৪৮] প্রেমোচ্ছ্বাসের কোনও অভিব্যক্তি নেই। জীবনসঙ্গীর মনোভাব অবিবেচ্য। হয়ত বা স্বামীর ভালবাসার উপর গভীর আস্থা ছিল, অথবা আত্মনিবেদিত বিপ্লবীর কোনও পিছুটান নেই। অনেক দিন পর, দিনাজপুর জেল থেকে অনিলকে প্রেরিত লীলার পত্রগুচ্ছ তাঁদের বিবাহোত্তর মধুর সম্পর্কের উপর নতুন আলোকপাত করে :

> আজ লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন না লিখে পারলাম না। গত বছর কলকাতায় রাত্রে Esplanade এ গিয়ে আমরা বহুদূর হেঁটে হেঁটে বেড়ালাম নির্জন রাস্তায়। গত বছরের আগের বছর-আগ্রায় জ্যোৎস্না রাত্রে তাজ দেখা ও সারা U P ঘুরে বেড়ানো-ট্রেনে, পায়ে হেঁটে, এক কথায় সে কি বিচিত্র আনন্দানুভূতি।[৪৯]

স্বামীর কাছে প্রাণোচ্ছ্বাসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে এ যেন এক অন্য লীলাবতী। সুকঠিন বাহ্যিক ভাবমূর্তির অন্তরালে কোমলতায়, লালিত্যে, ভালবাসার একাত্মবোধে ছোট ছোট সুখস্মৃতির রমণীয় প্রতিচ্ছবি। বোধ করি এই তাঁর সত্য রূপ, স্বসৃষ্ট যন্ত্রচালিত রাজনৈতিক জীব অপেক্ষা বহুগুণে আকর্ষণীয়। নারী লীলা প্রচ্ছন্ন নেত্রী লীলার মোড়কে।

দাম্পত্য

অনিল ও লীলা রায়ের বৈবাহিক জীবন অত্যন্ত জটিল ও বৈচিত্র্যময় ছিল। কর্মক্ষেত্রের আধিপত্য দাম্পত্যসুখ ব্যাহত করেছিল। বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগতের মধ্যে সমতা এনে তাঁরা স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। পরিপূর্ণ আনন্দের মাঝে ধূসর উপচ্ছায়া-যন্ত্রণা, আশঙ্কা, একাকীত্ব, অনিশ্চয়তা ও নিরানন্দ সৃষ্টি করেছিল। সার্থকতা ও ব্যর্থতার মিশ্রণে লীলা ও অনিল রায়ের মাত্র বারো বছরের বিবাহিত জীবনে ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রেখে রাজনীতিতে আত্মোৎসর্গ করার অদম্য প্রয়াস মানবিক সহনশীলতার এক অসাধারণ কাহিনি। আশানিরাশার আলো আঁধারে, পাওয়া না পাওয়ার হিসাবনিকাশের উর্ধ্বে তাঁদের পথচলা সুন্দর হয়েছিল মনের ঔদার্যে।

বিবাহের প্রথম পর্বে অনিলচন্দ্র নতুন জীবন ও পরিবেশকে সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। পরিণয়ের সাত মাস পরে নববর্ষের দিনে লিখেছেন :

> আমাদের যাত্রা হল সুরু, এখন ওগো কর্ণধার, তোমায় করি নমস্কার। এখন বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক ফিরবো না তো আর ... যে বিমল আনন্দ আজ মনে জাগ্রত হইল তার তুলনা নাই। লীলাদেবীও সঙ্গে সঙ্গে গান করিলেন।[৫০]

স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে কাজ করার আগ্রহ ও গৌরব তাঁকে আপ্লুত করেছিল। এই উত্তেজনা স্তিমিত হতে বিলম্ব হয়নি। অগণিত সামাজিক রাজনৈতিক কার্যক্রম অধিকাংশক্ষেত্রেই পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করেনি। অসহিষ্ণু লীলা কর্মোন্মাদ ছিলেন এবং অনিলচন্দ্র ঘোড়দৌড়ে তাঁর সঙ্গে পেরে ওঠেননি। লীলার সাহচর্যের অভাবে বিপুল কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যেও তাঁর মনে জেগেছিল অসীম নিঃসঙ্গতাবোধ। সুগভীর অভিমানে তিনি লিখেছেন, 'কেবলই অশান্তি ও অস্বস্তি বোধ করছি। মনে হচ্ছে এই কলকাতা সহরে আমাকে কেউ চায় না।'[৫১]

অনিলচন্দ্রের অসংখ্য কাজের তালিকাভুক্ত দিনপঞ্জিতে কদাচিত পত্নীর সঙ্গে মনোবিনিময়ের আভাস পাওয়া যায়। লীলার প্রবেশ ও প্রস্থান লুকোচুরির মতো তাৎক্ষণিক। অতি সংক্ষিপ্ত, নিরুত্তাপ তার বর্ণনা। 'Evening -went alone to press and met L Roy there .... went to cafe with L Roy and came back to office at 9 pm.' [৫২] এরই মধ্যে কদাচ অবসর মুহূর্তে ঢাকায় লীলার অবস্থানে উদ্বেগ প্রকাশ। কর্মযজ্ঞে লীলাবতীর পূর্ণ আত্মাহুতির ব্যর্থতার সম্ভাবনা তাঁকে বিশেষ বিচলিত করত। আদর্শের স্বপ্নসৌধ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে চূর্ণ হতে বাধ্য:

> ওঁর জন্যে কি যে বেদনা আমার। ওঁর কাজের জন্য কি আগ্রহ! নিজেকে ভেঙে চুরচুর করে নিঃশেষে একেবারে মুছে ফেলবার কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা ওর। কাজের এই একাগ্র উন্মাদনা আমার নেই। আমি ভাবিত হয়ে উঠি ওঁর জন্যে।[৫৩]

দুই বিপ্লবসাধকের স্থায়ী অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা ছিল না। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ব্যাপক আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল। অর্থাভাবে জয়শ্রীর নিয়মিত প্রকাশনা কষ্টসাধ্য ছিল। স্বকীয় বাসস্থানের ভাড়া দেওয়ার সঙ্গতিও সীমিত ছিল। দীর্ঘকালের রাজনৈতিক উৎপীড়নে স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী ছিল। চরৈবেতি মন্ত্র হলেও বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন ছিল।

এই সার্বিক চাপ লীলা অনিলের অন্তরঙ্গ জীবনের উপর গভীর ছায়াপাত করেছিল। সর্বদাই 'বিস্ফোরণে'র সম্ভাবনা ছিল। লীলার অপেক্ষা অনিলচন্দ্র অধিকতর স্থির ও সহিষ্ণু ছিলেন। স্ত্রীর অল্পেই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটত। বহু সময়ে সহানুভূতির অভাবে অসহায় অনিল নদীতটে আশ্রয় নিতেন। দিনপঞ্জিতে তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন :

রাত্রে লীলাদেবীর সঙ্গে হঠাৎ ঝগড়া হল। ওঁর সঙ্গে একত্র খাবো বলাতে ওঁর রাগ হল। দুজনেরই খাওয়া হল না। ঝগড়াটা কল্যাণকর নয়-এতে মানুষের সত্য মানসিক সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করে।[৫৪]

যে কোনও পতিপত্নীর সম্পর্কে সাময়িক মনোমালিন্য স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। লীলা-অনিলের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ব্যবহারিক জীবনের বৈক্লব্য লীলা-অনিলের পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভালবাসাকে ম্লান করেনি। রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত সংঘর্ষের আবর্তে প্রেম হয়ে উঠেছে সমুজ্জ্বল। এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে প্রবল বাদবিসম্বাদের পর অনিল রায় লিখছেন, 'Relief – cloud dispersed by and by. Feeling very happy this night'।[৫৫] অন্য একদিন নদীবক্ষে স্টিমারে ঢাকায় লীলার সঙ্গে মিলিত হওয়ার আশায় তাঁর উদভ্রান্ত উক্তি :

মন ভারাক্রান্ত নানা জটিলতায়। তবু সব মেঘভাবকে ছিন্ন করে মন আসন্ন আনন্দের আশায় উধাও হয়েছে। ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্ছে জীবনে এ কি আনন্দ। কেন এমন হয়?[৫৬]

এ ক্ষণিকের পুলক তাঁর অমূল্য সম্পদ। সহধর্মিণীর দুর্দম কর্মৈষণা ও অপরিসীম আন্তরিকতা তাঁকে অভিভূত করত। পত্নীর শ্রেষ্ঠত্বকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়ে তিনি সর্বদাই অন্তরালে থেকেছেন। ইস্পাত-কঠিন বাহ্যিক রূপের আবরণে স্বামীর প্রতি লীলারও গভীর ভালবাসা ছিল। তাঁর অধিকাংশ পত্রগুলি অত্যন্ত নৈর্ব্যক্তিক এবং দৈনন্দিন কর্মতালিকার ভারে ন্যুব্জ। এরই মধ্যে শেষ পংক্তিতে অনুরাগের ছোঁয়া, 'কেমন আছ? সমস্ত সময় তোমার কথা মনে হচ্ছে।'[৫৭] অবিমিশ্র বিশ্বাস, নির্ভরতা ও সখ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত লীলা-অনিলের নিবিড় সম্পর্ক ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত।

জেলজীবনে লীলাবতী ও অনিলচন্দ্রের ভাব বিনিময়ের সেতুবন্ধ সৃষ্টি করেছিল মত ও রুচির সমদর্শিতা। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঐকান্তিক ছিল পুস্তকপ্রীতি। গ্রন্থ ছিল নিত্যসঙ্গী, দু'জনাই আগ্রাসী পাঠক। লীলার পঠনক্ষমতার পরিমাপ বোঝা যায় দিনাজপুর জেলে লিখিত অনিলকে একটি পত্র থেকে :

পড়ছি কিছু কিছু .... fairly swift reader মন দিয়ে পড়লে মনে রাখতে বা grasp করতে দেরী হয় না। Novel তো আমার ঘন্টায় ১০০ পাতা পড়া চিরদিনের অভ্যাস ছিল। অন্য বই ৩০ থেকে ৪০, ৫০ পাতা পড়তে পারি।[৫৮]

লীলাকে প্রেরিত অনিলচন্দ্রের নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জির সংখ্যা ও উৎকর্ষ বিস্মিত করে। অবশ্যপাঠ্য পুস্তকগুলির মধ্যে ছিল Osborn এর Freud and Marx, Erust Toller এর I was a German, Louis Fischer এর Men and Politics, Souverine – এর Stalin, Joad এর Philosophy of Our Times, Toynbee – র Study of History, Sorokin – এর Social and Cultural Dynamics, John Dewey-র Hegel's Philosophy of History এবং Ginsburg এর Studies in Sociology। লীলা-অনিলের পাণ্ডিত্য, জ্ঞানান্বেষণ ও চিন্তনের ব্যাপ্তি, বৈচিত্র ও গভীরতা বৌদ্ধিক শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।[৫৯]

অনিলচন্দ্রের পুস্তকপ্রীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত ছিল তাঁর জীবনদর্শন। তিনি পত্রযোগে বারম্বার লীলার সঙ্গে দর্শনচর্চা করেছেন। দার্শনিক তত্ত্বকে নীরস ভাবজগৎ থেকে নামিয়ে প্রাত্যাহিক জীবনে ব্যবহার করে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন। বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানানুসন্ধিৎসার উপরে অনুভূতি এবং বোধশক্তির স্থান দিয়েছেন। সভ্য জগতে বিজ্ঞান ও প্রগতির যুগে স্বজ্ঞার মূল্য অপরিসীম। পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি, শিল্পী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকের সৃষ্টির উৎস মননশীলতা ও ভাবাবেগ।[৬০] তিনি একাধিকবার লীলাকে সাবধান করেছেন যে ত্যাগের মাধ্যমে বিনষ্টি মূল্যহীন, নিজেকে নিঃশেষ করে কর্মের চক্রে নিষ্পেষিত হওয়ার সার্থকতা নেই। কর্মযোগের উপর সানুভূতির প্রাধান্য বুঝিয়ে ব্যখ্যা করেছেন :

... তোমার সঙ্গে স্থূল জগতের যোগাযোগ যদি কোন দিন ছিন্ন হয়ে যায়, তবু আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের বশে নিরেট দিনরাতগুলো রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরে থাকবে। এ অতি নিশ্চিত সত্য।[৬১]

অনিল-লীলা উভয়েই প্রকৃতিপ্রেমিক ছিলেন। পুষ্পবিজ্ঞানে অনিলচন্দ্রের প্রীতি থাকলেও লীলাবতীর স্বহস্তে বৃক্ষচর্যা ও মালঞ্চ রচনায় বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। ১৯৪২ এ ৬ই মে তিনি অনিলকে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে লিখেছেন যে বেলফুল, বই ও স্বচিন্তা-তাঁর সদা মিত্র। বাংলার বহু কারাগার তাঁর স্পর্শে মরুভূমি থেকে মরূদ্যানে পরিণত হয়েছিল। ইংরাজনাশে দুর্দমতা লীলাকে প্রণোদিত করেছিল প্রতিকূল পরিবেশে ফুল ফোটাতে।

বাগানের কাজে বেশ exercise হয়। সকালে চা খেয়ে একেবারে ৮/৯ টা পর্য্যন্ত বাগানে কাজ করি .... বহু গাছ হয়েছে কাজেই বেশ দেখাশোনা করতে হয় .... চেষ্টা এবং আগ্রহ আমার will not take a refusal.।[৬২]

অনিলচন্দ্র স্ত্রীর পুষ্পপ্রেমে সোৎসাহে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর কবিমানসে কুসুম ও তরুরাজি সংসারে যত অমৃত, যত আনন্দের উৎস।[৬৩]

দুই বিপ্লবী সহযাত্রী সঙ্গীতসাধক ছিলেন। গীতবাদ্যের মাধ্যমে তাঁদের প্রথম পরিচয়। অনিলচন্দ্রের সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি একাধারে গীতিকার, সুরকার, সুগায়ক ও সুবাদক। লীলাবতী সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। অনিল এস্রাজ বাজাতেন, লীলা তানপুরা। উভয়ে ঢাকায় ওস্তাদ ভগবান সেতারির কাছে শিখেছিলেন। লীলাবতী অর্গ্যান সহযোগে গান গাইতেন। অনিল তবলার সঙ্গতে সুনিপুণ ছিলেন। সঙ্গীতচর্চায় নিঃসন্দেহে অনিলচন্দ্রের জ্ঞান ও দক্ষতা অসাধারণ ছিল।[৬৪] লীলা কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তাঁর গানের অনুরাগী ছিলেন। দিনাজপুর জেল থেকে স্বামীকে লিখেছেন :

> তোমায় চিঠি লিখছিজানলার ধারে বসে- জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে বাইরেটা - ভারী ইচ্ছে করছেএ সময় গান শুনতে-তোমার গান। তুমি বিশ্বাস করবে না জানি-কারণ বাইরে আমাদের এই high speed এর জীবনযাত্রায় গানের অবসর হয় তো কমই... এখন প্রায় তোমার গান শুনতে ইচ্ছে করে।[৬৫]

এই অনন্য দম্পতির সত্যই গান শোনার অবকাশ ছিল না।

একটি সুখী গৃহকোণ গড়ে তুলবার সমস্ত উপাদান অনিলচন্দ্র লীলাবতীর মধ্যে ছিল। অনিল রায়ের পত্রগুচ্ছের মধ্যে সংসার সৃষ্টির আকাঙ্খা, স্ত্রীর সান্নিধ্যের অভাববোধ, একাকিত্বের জ্বালা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। লৌহমানবী লীলার অন্তরেও যথেষ্ট সৌন্দর্যলিপ্সা, সুক্ষ্মানুভূতি, স্নেহমমতা, সুগৃহিণীর সব গুণাবলির সমাবেশ ছিল। দেশের এবং দশের জন্য তাঁরা নিজেদের সর্ববিধ আত্মসুখ থেকে বঞ্চিত রেখেছিলেন। বিপ্লবী হেলেনা দত্তের স্মৃতিচারণে :

> দাম্পত্য জীবন বলে কিছুই ছিল না। সংসার করতে পারলেন না। স্থায়ী বাসস্থান ছিল না। আর্থিক সঙ্কট বৃদ্ধি পেয়েছিল। বেশীর ভাগ সময় কেটেছে জেলে। দীর্ঘ দিন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দেখা হত না। কোন দিন দেখা হবে কি না এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল।[৬৬]

১৯৪৬-১৯৪৭ এ জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর লীলা অনিল কলকাতায় রাসবিহারি রোডে-র আবাসনে ছিলেন। একতলায় ফরোয়ার্ড ব্লকের অফিস, দ্বিতলে জয়শ্রী কার্যালয় এবং ত্রিতল তাঁদের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ফরোয়ার্ড ব্লক, জয়শ্রী ও শ্রীসঙ্ঘের সম্মেলনে এই গৃহটি একটি বিশাল একান্নবর্তী পরিবারের আকার ধারণ করেছিল। যদিও এর রক্ষণাবেক্ষণ কষ্টসাধ্য ছিল।[৬৭] লীলাবতীর সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পানুরক্তি সর্বজন বিদিত ছিল। তিনি অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণ সাজসজ্জায় বিশ্বাসী ছিলেন।[৬৮] গৃহালঙ্করণে বিশেষ পারদর্শিতার ছাপ রেখেছিলেন। স্বামী স্ত্রী স্বাস্থ্যসম্মত পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বাস করতে ভালবাসতেন। লীলা রন্ধনপটিয়সী ছিলেন। তাঁর দেশীয়, মোগলাই ও বিদেশি খাদ্যপ্রস্তুতিতে সমান অধিকার ছিল। শত ব্যস্ততার মধ্যে তিনি সেবাকর্মে অতুলনীয় দক্ষতা দেখিয়েছেন। সেবাব্রত দেশসেবার অঙ্গ ছিল।[৬৯] অবসর বিনোদনের জন্য রাজনীতিচর্চা, পুস্তকসমালোচনা এবং মাঝে মাঝে ইংরাজি সিনেমা দেখা অভ্যাস ছিল। তাঁদের ভ্রমণপ্রিয়তা সময়াভাবে কার্যকরী হত না ঠিকই, তবে ভ্রমণ তাঁদের রাজনৈতিক কর্মসূচির অনুষঙ্গ ছিল। অনুগতদের সমক্ষে লীলা-অনিল পরস্পরকে 'তোমাদের দাদা' ও 'তোমাদের দিদি' নামে অভিহিত করতেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারায়, সনাতন ও নতুন ঐতিহ্যের মিশ্রণে তাঁদের দাম্পত্যজীবন হয়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ।

বৈদিক সূত্রে হৃদয় বিনিময়ের উপর গুরুত্ব দিলেও সমাজ ব্যবস্থায় বিবাহবন্ধনে দৈহিক সম্পর্কের প্রয়োজন ও বংশবৃদ্ধি একান্তভাবে জড়িত। অনিলচন্দ্র ও লীলাবতীর দাম্পত্য সম্পর্ক একটি অত্যাশ্চর্য ব্যতিক্রম। বিবাহের পূর্বে অনিল লীলার মতানুসারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁদের মধ্যে দৈহিক সান্নিধ্য অথবা সন্তানাদির সম্ভাবনা বর্জনীয়। পুরুষ হিসাবে স্বামীর প্রবলতর আকর্ষণ প্রত্যাহত করে লীলাবতী উচ্চ আত্মিক স্তরে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন তাঁদের বিমল প্রেমাসক্তিকে। বিবাহোত্তর ব্রহ্মচর্য পালন অতি কঠিন ব্রত। তাঁরা চূড়ান্ত আত্মত্যাগের মাধ্যমে দলের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা দেবীর মতো আদর্শ দম্পতির ভাবমূর্তি গড়েছিলেন।[৭০] সন্ন্যাস গ্রহণ না করে স্বাভাবিক সংসার জীবনের মধ্যে, সুগভীর প্রেমে আবদ্ধ দুটি সুস্থ সবল তরুণ প্রাণের দেহবোধকে জয় করার সফল পরীক্ষা এক অশ্রুতপূর্ব ঘটনা।

অস্তাচল

১৯৫১ সনে অনিলচন্দ্র-লীলাবতীর জীবনে বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো ছন্দপতন ঘটল। বহুকালব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম, সুদীর্ঘ কারাবাস, শারীরিক ও মানসিক উদ্বেগ ও অনিয়মে অনিলচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। অবিরাম পেটে যন্ত্রণা হত। ডাক্তারি পরীক্ষায় ধরা পড়ল ক্যানসার। শোকস্তব্ধ লীলা তাঁর কার্যক্রমের পুনর্বিন্যাস করে অনিলচন্দ্রের শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করলেন। মৃত্যুপথযাত্রী জীবনসঙ্গীর রোগোপশমে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় অভিভূত অনিল মুগ্ধস্বরে বলেছিলেন, 'তুমি সত্যিই অতুলনীয়'। অশ্রুসজল হাসিতে মনের ব্যথা গোপন করে লীলার প্রত্যুত্তর, 'আমাকে অকর্মণ্য ভাবো না কি?' পাকস্থলীর ক্যানসার সর্বদেহে ছড়িয়ে পড়ল। সুনীল দাস একটি মর্মস্পর্শী প্রবন্ধে অনিলচন্দ্র রায়ের জীবনের অন্তিম মুহূর্তগুলি ধরে রেখেছেন :

> সহকর্মীদের মনে বেদনাহত হাহাকার ধ্বনিত হতে লাগলো .... 'The light is fading out'। আর সেই জনসমুদ্রের মাঝে হাসপাতালের কেবিনে সুতীব্র বেদনায় মুহ্যমান হয়ে বসে আছেন লীলা রায়।... মৃত্যুর যবনিকা নেমে এলো ১৯৫২র ৬ জানুয়ারী, শেষরাত্রে। হাসপাতাল থেকে লীলা রায় এক বন্ধুর গাড়ীতে রাসবিহারী এভেনিউ এর মোড় পর্যন্ত শোকযাত্রার সহযাত্রী হন।

সেখান থেকে ৪৭এ রাসবিহারী এভেনিউ এর নিঃসঙ্গ বাড়ীতে ফিরে এলেন। তখন ৭ জানুয়ারীর বিকেল ৪টা।[৩১]

লীলাবতী কর্মসাগরে নিমজ্জিত থেকে এই মহাশোক ও শূন্যতা জয় করতে চেয়েছিলেন। অনিলচন্দ্র একাধারে তাঁর প্রিয়সখা, সচিব ও শিক্ষাগুরু ছিলেন। চিরসহচর, নির্ভরস্থল। রাজনৈতিক কার্যাবলি অব্যাহত থাকলেও তাঁর জীবন থেকে আলো আনন্দ নির্বাপিত হয়েছিল। স্বামী সম্পর্কীয় আলোচনায় তাঁর অনীহা ছিল। তাঁর লিখিত দিনপঞ্জিগুলি সম্মুখে রেখে নির্জনে বহু সময় অতিবাহিত করতেন। কথাও বেশি বলতেন না। অনিলচন্দ্রের প্রতি লীলার সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাতর্পণ এসেছিল তাঁর মৃত্যুর অনেক বছর পরে, জয়শ্রীর পৃষ্ঠায় :

আমার শৈশব ও যৌবনের দীর্ঘদিন কেটেছে rational upbringing ও ভাবধারার মধ্যে। দিবালোকের স্পষ্টতার মধ্যে তার ছাপ তীব্র হয়ে আছে জীবনে। তারপর যোগাযোগ হলো যথার্থ হিন্দু সভ্যতা মনন ও জীবনধারা ও mysticism এর একটি শ্রেষ্ঠ product এর সঙ্গে। কতবার ধাক্কা খেয়েছি, মন গ্রহণ করতে পারেনি, বুদ্ধিবিচার বিচলিত হয়েছে। কিন্তু এমন কিছু পেলাম তাঁর নিকট যা আমার পূর্বপুরুষের হাজার হাজার বৎসর ধরে রক্তে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। আমার জীবনে অলক্ষ্যে যাঁর স্পর্শ নিজের মধ্যে উদ্‌বুদ্ধ করার জন্যই যেন আমার সেই অপূর্ব জীবনসাথীটিকে পেলাম। পেলাম এমন কিছু আস্বাদ যার রূপ নেই স্বাদ আছে, যার প্রকৃতি ধরা ছোঁয়া যায় না, কিন্তু অনুভূতিতে যাকে পাওয়া যায়। এই কি আমার পূর্বপুরুষের হাজার বছরের সঞ্চিত দান?[৩২]

লীলা রায়ের দেহাবসান হয়েছিল মস্তিষ্কের প্রবল রক্তক্ষরণে, অচৈতন্য অবস্থায়, ১২ জুন ১৯৭০ সালে। আত্মজয়ী নিঃসঙ্গ পথিক সুদীর্ঘ পরিক্রমা শেষে অজানালোকে মিলিত হলেন তাঁর প্রিয়তমের সঙ্গে। রেখে গেলেন চিরপরিচয়ের অমর ইতিকথা।

তথ্যসূত্র

এই প্রবন্ধটি লীলাবতী নাগ ও অনিলচন্দ্র রায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে উৎসর্গীকৃত। তাঁদের মূল নথিপত্র বিজয়কুমার নাগ কর্তৃক জয়শ্রী গবেষণাগারে সুরক্ষিত।

১। লীলা রায়কে অনিল রায়, দমদম জেল, ২ অক্টোবর, ১৯৪৫।

২। লীলা রায়, 'একটি অসম্পূর্ণ খসড়া', **জয়শ্রী**, আশ্বিন ১৪০৬, পৃ: ১৮৭।

৩। অমলচন্দ্র রায়, 'স্মৃতির পাতা থেকে', **জয়শ্রী**, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬, পৃ: ৪৮।

৪। সুনীল দাস, 'অনিল রায়', **জয়শ্রী**, বৈশাখ ১৪০৭, পৃ: ৪।

৫। বিজয়কুমার নাগ (লীলা রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র), সাক্ষাৎকার, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০০১, কলকাতা।

৬। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'ইতিহাসের দুই আশ্চর্য্য সৃষ্টি : লীলা রায়-অনিল রায়' **জয়শ্রী**, কার্তিক, ১৪০৬, পৃ. ২৩৫।

৭। সুনীল দাস, 'লীলাবতী নাগ-লীলা রায়' **জয়শ্রী** সুবর্ণজয়ন্তী গ্রন্থ, ১৯৮৩, পৃ: ৬২০-৬২১।

৮। সুনীল দাস, 'অনিল রায়', তদেব, পৃ: ৬৪৯-৬৫০।

৯। ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, 'বিপ্লবী ও দার্শনিক অনিল রায়', **জয়শ্রী** বিপ্লবী অনিল রায় ৯৯ তম জন্মদিবস সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৬, পৃ: ৪৪-৪৫।

১০। লীলা নাগ, 'ঢাকা দীপালি সঙ্ঘ', বঙ্গলক্ষ্মী, পৌষ, ১৩৩২

১১। অনিল রায়কে লীলা রায়, দিনাজপুর জেল, ১৯/২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪।

১২। অনিলচন্দ্র রায়, 'নবগীতিকা', ঢাকা, ১৩৫৪, পৃ. ৫১।

১৩। ঈশানী মুখোপাধ্যায়, 'স্ত্রী স্বাধিকার ও সশস্ত্র সংগ্রামে নারীনেতৃত্ব: লীলাবতী নাগ, একটি সমীক্ষা', **জয়শ্রী** হীরকজয়ন্তী গ্রন্থ, পৌষ, ১৩৯৮, পৃ. ৫৩-৫৪।

১৪। অমলচন্দ্র রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬।

১৫। বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, ডি এম লসে, 'দি শ্রীসঙ্ঘ অ্যান্ড দি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স', জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, ভল্যুম ১, পার্ট ১, ১৯৭২।

১৬। অনিলচন্দ্র রায়কে লীলাবতী নাগ ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১।

১৭। সুনীল দাস, লিখিত বিবরণী, মে ৬, ১৯৮৬, পৃ. ১১-১২।

১৮। অনিলচন্দ্র রায়কে লীলাবতী নাগ, বক্সা ডিটেন্‌সান ক্যাম্প, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৩১

১৯। উল্লেখ্য নথি সংখ্যা ৫৪৯৮/৩০, হোম পল কন, জি ও বি, আই বি।

২০। দি হিন্দু, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৩১।

২১। ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, 'স্মৃতিতর্পণ', **জয়শ্রী**, জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৬, পৃ. ৫১।

২২। অনিলচন্দ্র রায়, অপ্রকাশিত কবিতা, বক্সা ফোর্ট, ১৯৩১।

২৩। তদেব। অনিলচন্দ্র লিখেছেন, 'আমি কিছু নাহি দিতে তুমি দিয়েছিলে সব আপনার মানি।'

২৪। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৮।

২৫। অনিলচন্দ্র রায়, অপ্রকাশিত দিনলিপি, ১৭ জুন, ১৯৩৮।

২৬। অনিলচন্দ্র রায়কে লীলাবতী নাগ, বক্সা ডিটেন্‌সান ক্যাম্প, ২৫ এপ্রিল ১৯৩১।

২৭। অনিলচন্দ্র রায়কে লীলাবতী নাগ, ১২ জুন, ১৯৩১।

২৮। অনিলচন্দ্র রায় অপ্রকাশিত দিনলিপি, ২ জুন, ১৯৩৮।

২৯। অনিলচন্দ্র রায়কে লীলাবতী নাগ, ১২ জুন, ১৯৩১।

৩০। অনিলচন্দ্র রায়, অপ্রকাশিত দিনলিপি, ১৫ জুন ১৯৩৮।

৩১। অনিলচন্দ্র রায়, অপ্রকাশিত দিনপঞ্জি, ২২ জুলাই ১৯৩৮।

৩২। অনিলচন্দ্র রায়কে লীলাবতী নাগ, ঢাকা, ২৩ এপ্রিল ১৯৩৯।

৩৩। অনিলচন্দ্র রায়, অপ্রকাশিত দিনলিপি, ২১ জুন ১৯৩৮।

৩৪। অনিলচন্দ্র রায়কে লীলাবতী নাগ, ঢাকা, ২৩ এপ্রিল ১৯৩৯।

৩৫। অনিলচন্দ্র রায়, অপ্রকাশিত দিনলিপি, ২০ জুন ১৯৩৮।

৩৬। লীলা রায়, সম্পাদকীয়, **জয়শ্রী**, আষাঢ় ১৩৪৬।

৩৭। গিরীশচন্দ্র নাগকে লীলাবতী নাগ, জন্মদিনে, ঢাকা, ২ অক্টোবর, ১৯১৭।

৩৮। লীলা রায়, 'এই কি নারী প্রগতির লক্ষণ?' জনমত, ২৩ জানুয়ারি, ১৯৫৫।

৩৯। প্রভা দত্ত, সাক্ষাৎকার, ২৮ জুলাই, ১৯৯২, কলকাতা।

৪০। প্রভাতচন্দ্র নাগ, 'দিদিকে যেমনটি দেখেছি।' **জয়শ্রী**, আষাঢ়, ১৩৭৭।

৪১। সুলতা গুহচৌধুরী, সাক্ষাৎকার, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০০১, কলকাতা। লীলাবতী বিবাহকে 'accident' বলেছেন যার অর্থ দুর্ঘটনা নয়, ঘটনামাত্র।

৪২। বিজয়কুমার নাগ, সাক্ষাৎকার, পূর্বোক্ত।

৪৩। দ্রষ্টব্য অনিলচন্দ্র রায়, অপ্রকাশিত দিনলিপি, ২২ ডিসেম্বর ১৯৩৮, ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৮।

৪৪। অনিলচন্দ্র রায়কে লীলাবতী নাগ, ঢাকা, ২৮ এপ্রিল, ১৯৩৯।

৪৫। প্রভাতচন্দ্র নাগ, 'দিদিকে যেমনটি দেখেছি', পূর্বোক্ত।

৪৬। হেলেনা দত্ত, সাক্ষাৎকার, ১৯ জানুয়ারি ২০০১, কলকাতা। সুলতা গুহচৌধুরী, সাক্ষাৎকার, পূর্বোক্ত। এঁরা শ্রীসঙ্ঘের সদস্যা এবং প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

৪৭। বিজয়কুমার নাগ, সাক্ষাৎকার, পূর্বোক্ত।

৪৮। অনিল রায়কে লীলা রায়, ২৫ জানুয়ারি, ১৯৪০।

৪৯। অনিল রায়কে লীলা রায়, দিনাজপুর জেল, ২৩ অক্টোবর, ১৯৪২।

৫০। অনিল রায়, অপ্রকাশিত দিনপঞ্জি, ১ জানুয়ারি, ১৯৪০।

৫১। তদেব, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০।

৫২। তদেব ২২ জানুয়ারি, ১৯৪০।

৫৩। তদেব, ২৭ এপ্রিল, ১৯৪০।

৫৪। তদেব, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০।

৫৫। তদেব, ৬ জানুয়ারি, ১৯৪০।

৫৬। তদেব, ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০।

৫৭। অনিল রায়কে লীলা রায়, ২৭ জানুয়ারি, ১৯৪০।

৫৮। অনিল রায়কে লীলা রায়, দিনাজপুর জেল, ৩০ মার্চ, ১৯৪৫।

৫৯। লীলা রায়কে অনিল রায়, দমদম জেল, ৫ ডিসেম্বর ১৯৪৩। দমদম জেল থেকে অনিল কর্তৃক লীলাকে প্রেরিত ৪০টি পুস্তকের তালিকা বিস্ময় উৎপাদন করে। লীলা রায়কে অনিল রায়, দমদম জেল, ২৮ জুন ১৯৪৪।

৬০। লীলা রায়কে অনিল রায়, দমদম জেল ৪ এপ্রিল, ১৯৪৫।

৬১। লীলা রায়কে অনিল রায়, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, ১৮ মার্চ, ১৯৪২।

৬২। অনিল রায়কে লীলা রায়, প্রেসিডেন্সি জেল, ৬ মে, ১৯৪২।

৬৩। লীলা রায়কে অনিল রায়, দমদম জেল, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫।

৬৪। অমলচন্দ্র রায়, 'স্মৃতির পাতা থেকে', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯।

৬৫। অনিল রায়কে লীলা রায়, দিনাজপুর জেল, ৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৬।

৬৬। হেলেনা দত্ত, সাক্ষাৎকার, পূর্বোক্ত।

৬৭। বিজয়কুমার নাগ, সাক্ষাৎকার, পূর্বোক্ত।

৬৮। "দিদি অসম্ভব পরিপাটি করে সাজতে ভালবাসতেন। শাড়ির সঙ্গে match করে ফুলহাতা ব্লাউস, matching চটি, তার সঙ্গে হাল্কা সোনার গহনা-কানের দুলে মুক্তোর setting, গলায় লম্বা chain। এই নিয়েও তাঁকে সমালোচনার শিকার হতে হয়েছিল। পরে সব ছেড়ে খদ্দর পরতেন।" হেলেনা দত্ত, সাক্ষাৎকার, পূর্বোক্ত।

৬৯। প্রতিভা রায়চৌধুরী, সাক্ষাৎকার, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৮৯। হেলেনা দত্ত, তদেব। প্রমীলা গুপ্ত, সাক্ষাৎকার, ৭ মার্চ, ১৯৮৯। সাগরিকা ঘোষ, সাক্ষাৎকার, ২৭ জুলাই ১৯৯৯।

৭০। বিজয়কুমার নাগ এই অসম্ভব স্পর্শকাতর বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন গভীর সংবেদনশীলতার সঙ্গে। অনুমোদন করেছেন বিপ্লবিনী হেলেনা দত্ত, সুলতা গুহচৌধুরী ও সাগরিকা ঘোষ।

৭১। সুনীল দাস, অনিল রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬৮।

৭২। লীলা রায়, উদ্ধৃতি, **জয়শ্রী**, ২৯ মে-২জুন, ১৯৬৩

পরবর্তী সংখ্যায় খ্যাতনামা অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'যাযাবরের সাহিত্যকৃতি' প্রকাশিত হবে।

বাংলার ভাওয়াইয়া গান

বেণু দত্তরায়

লিখিত সাহিত্যের পাশাপাশি একটি জীবিতজাতির মৌখিক সাহিত্যও (Oral literature) বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকে। লিখিত সাহিত্য শিক্ষিত মানুষের সৃষ্টি। তার মধ্যে জাতির মার্জিত মানসিকতা, বুদ্ধির দীপ্তি, পরিশীলিত বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ দেখা দেয়। মৌখিক সাহিত্য কিন্তু অধিকতর অর্থে কোনও জাতির মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য, তার হৃদয়রহস্য—এক কথায় তার সমগ্র লোকায়ত জীবনের মন্থনরসজাত সৃষ্টি। তা অবশ্যই পরিশীলিত ও সুমার্জিত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ নয়, তা কিছু পরিমাণে স্থূল, কেননা তার সৃষ্টিমূলে থাকে সাধারণের মানসমর্জির সুর। তাই লোকসাহিত্য বলে যা কথিত, তা অধিকতর অর্থে কোনও জাতির প্রাণের সৃষ্টি। এ জন্যই কোনও জাতির সাহিত্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার কালে লিখিত সাহিত্যের পাশাপাশি থাকে তার লোকসাহিত্যেরও বিবরণ এবং বিশ্লেষণ।

বাঙালির সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে গিয়ে দেখা যায়, তার সূচনাই ঘটেছে গানে। হয়ত ভক্তিরসের ঐকান্তিকতা থেকেই তার সৃষ্টি, দেব মাহাত্ম্য ঘোষণাই ছিল মুখ্যবিষয়। ধর্মচেতনাকে বাদ দিয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য রচিত হয়নি। কিন্তু একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ করবার যে, এ-সাহিত্য মূলত গীতধর্মী। বাঙালি মূলত গানের জাতি। তার আবেগপ্রবণতা থেকেই এই সব গানগুলির সৃষ্টি হয়েছে। সাহিত্যের ইতিহাসে লিখিত গানগুলির পাশে পাশে মৌখিক সাহিত্যধারায় লোকায়ত সঙ্গীতগুলিও বিশেষ মূল্যবান। লোকসাহিত্য গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই গানগুলির সাহিত্যমূল্য নিয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছেন। এই গানগুলির মধ্যে যে-সরলতা, সরসতা, সজীবতা, প্রকাশভঙ্গির কৌশল, ভাষাভঙ্গির আন্তরিকতা আছে, সেগুলির দিকে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দেশবিভাগ পূর্ব বাংলাদেশের নদীপথে ভ্রমণকালে তিনি যেমন এগুলি শুনেছেন, তেমনই বাংলার নানা অঞ্চলে গীত গানগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উপরেও গুরুত্ব দিয়েছেন। পূর্ববাংলায় যেমন এ জাতীয় অজস্র লোকসঙ্গীতের নিদর্শন আছে, তেমনই বাংলার অন্যান্য প্রান্তেও নানাশ্রেণীর গানের সন্ধান পাওয়া যায়। উত্তরবাংলার লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীতগুলিও তেমনই বাঙালির প্রাণের ঐশ্বর্য বিস্তারের পরিচয় দেয়।

এই শ্রেণীর গানের মধ্যে উত্তরবাংলার জলপাইগুড়ি-কোচবিহার বা সন্নিহিত গোয়ালপাড়ার ভাওয়াইয়া গানগুলি বাঙালি চিত্তের এক আশ্চর্য প্রাণস্পন্দনের পরিচয় দেয়। এগুলি এক আশ্চর্য শিল্প। করুণ মধুর দুঃখের পদাবলিগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে বসে কবি জীবনানন্দের সেই আশ্চর্য শুদ্ধ কলি মনে পড়ে, "কে হায় হৃদয়খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?" আমার তো মনে হয়, ভাওয়াইয়ার গানই সেই বেদনার সুর যে ভিতর থেকে হৃদয় খুঁড়ে দিতে ভালবাসে। আসলে সব ভালবাসাই তো বেদনার গান। সব গানই তো অন্তর বেদনা থেকে বাইরে এসে দাঁড়ায়। পৃথিবীর সব গানই বাঁধা হয়েছে বেদনার করুণতম শিল্পে। মনে মনে আমি প্রশ্ন করে উঠি, উত্তরবাংলার এই গানগুলি কি কেউ মুখেমুখে বেঁধেছিলেন? অথবা হৃদয়ের আঁকুপাকু করা আবেগ-উত্তাপে প্রাকৃতিক নির্যাসের মতোই নিঃসৃত হয়েছিল তাদের কণ্ঠ থেকে? নদীর চরে, খোলা মাঠে, মুক্ত দিগন্তের অঙ্গনে মোষ চরাতে এসে, অথবা খোলা আকাশের তলায় সাদা কাশিয়ার বনে, নলখাগড়া ঝোপের ধারে-ধারে এইসব গান একদিন জীবনের উত্তাপের মতো বিকীর্ণ হয়েছিল। এই গানগুলি কত সরল ও সুন্দর, কত সহজ ও অনায়াস, কত নিষ্পাপ ও শুদ্ধ, একমাত্র গান শুনলেই তা অনুভব করা যায়।

লোকায়ত জীবনের শিল্পগুলি আধুনিকতার স্পর্শে ইতিমধ্যেই অনেকটা ম্লান। আমরা সেই পটভূমি থেকে সরে এসেছি বলে আজ লোকসঙ্গীতের সৃষ্টিও হচ্ছে বৈদ্যুতিক আলোর ঝলমলানো মঞ্চে। নগরীর মার্জিত মানুষদের অনুষ্ঠানে আজ যখন ভাওয়াইয়া গান শুনি তখন গদাধরের তীরের সেই শিল্পিতকণ্ঠের অপূর্ব মাদকতা আর হৃদয়কে মুগ্ধ করে না। কৃত্রিমতা আজ আমাদের জীবনের অঙ্গ বলে শিল্পের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কৃত্রিমতা প্রাধান্য লাভ করেছে।

ভাওয়াইয়াকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করাই আমার লক্ষ্য। ভাওয়াইয়ার গবেষক আমি নই। এ-সম্পর্কে নতুন কোনও মত বা তত্ত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়েও আমার কলম ধরা নয়। সে-কাজ বহুকাল ধরে পূর্ববর্তী আচার্য বা পণ্ডিতেরা করে গিয়েছেন। ভাওয়াইয়া শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থে অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে কিছুকাল আগে সে-কাজ শ্রদ্ধেয় ড. সুখবিলাস বর্মা সম্পন্ন

করেছেন। রসাস্বাদনের আনন্দই আমাকে ভাওয়াইয়া গানগুলির উপরে পুনরপি লেখার প্রেরণা দিয়েছে। এই গানগুলির বৈচিত্র ও বৈভবেরই আমি পূজারি। এই সব অগণিত অসংখ্য গান বাস্তবিক পক্ষেই বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। ময়মনসিংহ গীতিকা বা পূর্ববঙ্গগীতিকাগুলি যেমন আজ সাহিত্য হিসাবে প্রাণদ প্রবর্তনার পরিচয়বাহী; আমি মনে করি, ভাওয়াইয়া সঙ্গীতগুলিও তেমনই বাঙালি প্রাণের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়-রূপে সংকলনবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। নানাজনের বিচ্ছিন্ন প্রয়াসে কিছু কিছু সংগৃহীত হয়ে নানা গ্রন্থে ছড়িয়ে থাকলেও এগুলি সংগৃহীত হয়ে গ্রন্থবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। নিঃসংশয়ে এগুলি আঞ্চলিক, এবং আঞ্চলিক বৈচিত্রই তো লোকসঙ্গীতের প্রাণ। তবুও এই আঞ্চলিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি ভাওয়াইয়া। মানবসমাজের চিরন্তন প্রাণের রস-রহস্যেই তা পরিপূর্ণ। এগুলির মধ্যে আছে চিরকালের মানুষের হৃদয়সম্পদ। আমি কোনও গায়কি, আঞ্চলিক স্বরভেদ, ছন্দ বা বাগভঙ্গির কথা বলছি না, আঞ্চলিক সাহিত্যের সে-সব বিশিষ্ট লক্ষণ অবশ্যই থাকে, কিন্তু একটি জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস-স্পন্দন-প্রত্যয় তথা জীবনের আবেগে যে সরলতা থাকে, তার সাহায্যে তা যে কোনও ভৌগোলিক সীমাকে পেরিয়ে নিত্যকালের সম্পদরূপে গণ্য হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে সুখবিলাস বর্মা-কৃত "ভাওয়াইয়া" গ্রন্থটি থেকে ভাওয়াইয়া গানের জনপ্রিয় শিল্পী ও বাঙালির প্রাণের মানুষ আববাসউদ্দীন সাহেব ও অন্য এক লোকায়ত জীবনের সুপ্রসিদ্ধ গবেষক ড. সুধীরকুমার করণের বক্তব্যদুটি উদ্ধার করে আমি আমার বক্তব্যকে সমর্থন করতে চাই।

আববাসউদ্দীন বলেছেন, "এই গানের সুরে সত্যিকারের উদাস করা ভাব সারাবাংলার অন্তরবাণীর তারে এক অভূতপূর্ব স্পন্দন তুলেছে। কারণ এ শুধু কল্পনাবিলাস নয় এ হচ্ছে মানবহৃদয়ের চিরন্তন সত্যের প্রতিচ্ছবি।"

ড. করণ বলেছেন, "যে গানে লোকসমাজের বৃহদংশ একাত্ম, যে-গান সবাই গাইতে পারে অনায়াস ভঙ্গিমায়, যে গান অনায়াসে যে কোন লোকের দ্বারা রচিত হতে পারে .... তা স্বমহিমায় উজ্জ্বল। .... উত্তরবঙ্গের রাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চলের ভাওয়াইয়া-চট্কা গান অবশ্যই বাংলার লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক অনন্য ও অসাধারণ সঙ্গীত।"

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন, বাঙালি চরিত্রের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে মধুর রস। এই মধুর রসের মধুরিমা মাখিয়ে বাঙালির বৈষ্ণব পদাবলিতে এসেছে নরনারীর প্রেম ভালবাসা, মান-অভিমান ইত্যাদি। আবার তার পাশাপাশিই শাক্তপদাবলির বাৎসল্য রসের ধারা বয়ে গিয়েছে। এই বাৎসল্য রস বাঙালি মায়ের ঐকান্তিকতা দিয়ে মাখানো। বৈষ্ণবপদাবলিতেও আছেন মাতা যশোদা। প্রিয় সন্তানের জন্য উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তাঁর সীমাহীন।

ধর্মীয় গানের কথা বাদই দিচ্ছি, চিরন্তন বাৎসল্যরসের পরিবেষণে ভাওয়াইয়া গানও সাধারণ লোকজীবনের মাতা ও কন্যার সম্পর্ককে কত সফলভাবেই না প্রকাশ করেছে। নীচের পদটির দিকে লক্ষ করুন, এক দুঃখিনী কন্যা কাককে উদ্দেশ করে জানিয়েছে যে শ্বশুরবাড়িতে তার দুঃখময় জীবনযাপনের কথা যেন সে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দেয় —

ও মোর কাগারে কাগা,

যখন মাও মোর রান্দে বাড়ে পত্র না দেন কাগা মায়ের হস্তে
মইরবে মাও মোর আগুনতং পড়িয়া রে।।

ও মোর কাগারে কাগা—

যখন মাও মোর আঞ্জা কোটে, পত্র না দেন মায়ের হস্তে
মইর্‌বে মাও মোর গালাত্ কাটারি দিয়া রে।।

মাতা ও কন্যাকে আশ্রয় করে অজ্ঞাতপরিচয় রাজবংশী বাঙালি কবি যে মাধুর্যপ্রকাশ করেছেন, তা একান্তভাবেই সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ। লোকসাহিত্যের ভাষার সারল্য প্রাণ থেকে প্রাণের মধ্যে ধারাটি ছড়িয়ে দেয়। এর আছে নিজস্ব ভাষা, যা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা থেকে আলাদা। তা শুধু সংবাদ দেয় না, সঙ্গীত ছড়ায়।

কন্যার চোখের জলে ভিজে নীচের গানটি তার অভিমানভরা হৃদয়কে এক আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় ভরে দিয়েছে—

তিস্তার পারের কন্যা তুমি হে,
কন্যা ছাড়লেন তিস্তার মায়া।
বাপ মাও দূরদেশে তোমাকে খাইছে বেছাইয়া।

এই করুণরসের আবেদন চারপাশের প্রকৃতির সাযুজ্যে এক অপরূপতা লাভ করে উঠেছে—

কুরা কান্দে কুরী কান্দে কান্দে বালিহাঁস,
কান্দে ঐ না তিস্তার পারে
প্রভাতে চকোয়া কান্দে ঐ না বালির চরে।

এই অপরূপত্বের বাহন হয়েছে রাজবংশীভাষা। লোককবির গানের আস্বাদনের জন্য উপমা-অলঙ্করণের জটিলতা সরাবার প্রয়োজন হয় না। একান্ত ভাবেই এগুলি মানসিক সম্পদে পরিপূর্ণ। রাজবংশী সম্প্রদায় বাঙালি সমাজেরই শাখা বলে তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবমণ্ডল আমাদের অপরিচিত নয়।

একটি বিবাহিত মেয়ের প্রাণ বাপ-মায়ের জন্য কেঁদে উঠেছে। ছইওয়ালা গাড়িয়ালকে ডেকে সে তার প্রাণের কথা নিবেদন করে। সে বলে, আমার বাবা-মা বিয়ের পর আর কোনও খবর করেনি। হে গাড়িয়াল ভাই, তোমার পায়ে পড়ি, আমার বাবা-মা কেমন আছে—

ও গাড়িয়ালভাই পাও ধরং
একখানা কাথা জিগাসা করং
কেমন আছে মোর দয়াল বাপ-মাও।
বাগো-মা মোর কঠোর হিয়া
মন বান্দিছে পাষাণ দিয়া
বেছায়াখায়া মোর খবর না করে।

অধ্যাপিকা ভাস্বতী রায়চৌধুরী এক প্রবন্ধে বলেছেন, "যে-প্রেম ও বিরহের কথা আছে ভাওয়াইয়া গানে— সেই প্রেম মেয়েদেরই হৃদয়ের ভাষা, মেয়েদেরই মুখের ভাষা।" এর সপক্ষে বলতে গিয়ে তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রভাবেই হয়ত এই অঞ্চলে মেয়েরা ছিল অনেকটাই স্বাধীন। তাই তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে পেরেছে তাদের প্রেমের কথা, বিরহের কথা। আবার অধ্যাপক ড. হরিপদ চক্রবর্তীও বলেছেন 'ভাওয়াইয়া প্রেমের গান। আরও তীক্ষ্মভাবে দেখলে বলা যায়, প্রোষিতভর্তৃকার গান বা বিপ্রলব্ধ শৃঙ্গার রসের গান। নারীর বিরহব্যাকুলতাই এই গানের মর্মবাণী, নায়ক কোথাও সাধু, নাবিক, মইষাল বন্ধু, মাহুত বন্ধু, কোথাও বা রাখাল, কোথাও বা বৈদ্য। যৌবনবেদনার প্রকাশ ঋজু।"

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যও বলেছেন, "ভাটিয়ালী সুরে দেহতত্ত্ব, বাউল, বৈরাগ্যমূলক গান গাওয়া হয়। কিন্তু ভাওয়াইয়া গানে কেবলমাত্র নারীহৃদয়ের বেদনার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়।" ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক কিন্তু এই মূল ভাবনাকে স্বীকৃতি জানিয়েই আরও অনেক কাল আগে লিখেছিলেন, "নারীর বিরহবেদনা প্রকাশের অধিকার নেই। সে ব্যথাবেদনা প্রকাশের পরোক্ষ পথ হয়েছে পুরুষের কণ্ঠ।" মধ্যযুগীয় শিষ্ট সাহিত্যের প্রভাবও তিনি এর মধ্যে দেখেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, এর মধ্যে এক দিকে এসেছে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের প্রভাব, অন্য দিকে নারীর বেদনাকে প্রকাশের পরোক্ষ রীতি; নারী নিজে নয়, পুরুষ তার প্রকাশক।

সাধারণভাবে রাধাকৃষ্ণ ভাবনাতেই বেশির ভাগ সমালোচক আপ্লুত হয়েছেন। এর কারণও এই যে, সাধারণ ভাবে তাঁরা অনেকেই লোকসঙ্গীতের Performence এর সঙ্গে সংযুক্ত নন। ড. বর্মা স্পষ্টই বলেছেন, "প্রেম অপার্থিব অলৌকিক স্বর্গীয় বিস্ময় নয় ভাওয়াইয়া গবেষকের কাছে। বরং কঠিন কর্মমুখর জীবনের কেন্দ্রভূমিতে এর অবস্থান। প্রকৃতির নিবিড় দাক্ষিণ্যে, অখণ্ড নির্জনতার মধ্যে নায়িকার সঙ্গে নায়কের সাক্ষাৎ হয় অল্পক্ষণের জন্য। পরস্পর পরস্পরের বোঝাবুঝির মধ্য দিয়ে শ্রমসাধ্য কর্মক্লান্তির মধ্যেও পরশমণির মতো প্রেমের ছোঁয়া লাগে। দৈনন্দিন জীবনাবরণের সমস্ত ক্লেশ মুহূর্তে দূর হয়ে যায়। নারী অনুভব করে যে, এই সহমর্মী পুরুষটি সঙ্গে থাকলে সে যে-কোনো কষ্টসাধ্য পথে চলতে পারবে।"

পূর্ববঙ্গের লোকসঙ্গীতগুলির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে এখানে জীবনঘনিষ্টতা অনেক বেশি। নদী-জল আকাশ-বাতাস, গরুর বাথান, নদীর চর, চিলামারীর বন্দর সব গভীর ও অন্তরঙ্গ বাস্তবমুখী হয়ে ধরা দিয়েছে। আমার বক্তব্য ভাওয়াইয়া গানের প্রধান পরিচয় এর কবিত্বে, এবং এগুলির একনিষ্ঠ সরলতায়। চর্যাপদগুলি ধর্মীয় বিষয় হওয়া সত্ত্বেও যদি সাহিত্যের মর্যাদা পেয়ে থাকে, গীতিকারূপে পরিচিত ময়মনসিংহ গীতিকাকে যদি আমরা সাহিত্যের অঙ্গীভূত করে থাকতে পারি, তবে উত্তরবাংলার এই লোকসঙ্গীতগুলিও সাহিত্য হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

সব দেশের লোকসঙ্গীতেই প্রকৃতির এক পটভূমি থাকে। সেই দেশের নদী-খাল-সাগর-হাওয়া, বনজঙ্গল, পাহাড়-উপত্যকা, নানা রঙের পাখিপাখালি সেই পরিবেশ রচনা করে। উত্তরবাংলার এইসব গানগুলিতেও প্রকৃতি এক নিবিড় অনুষঙ্গ রচনা করেছে। এগুলি সৃষ্টি করেছে রূপের মায়া। ভরা তিস্তা ছুটে চলেছে গাভুর নারীর মতো; ছিটকে পড়ছে ফেনার ফুল, যেন সাদা নাকছাবি তার নাকে। ঘোলা জলের নদীর তীরের আলুয়া-কাশিয়ার বন। চরের ধারে ধারে নতুন সবুজ ঘাস। তোর্সা নদীরও সেই একই চেহারা, বনের আবাদ তার পাশে। হলং নদীর জল নীচের শৈবালাচ্ছন্ন পাথরের জন্য সবুজ হয়ে থাকে। এইসব নদীগুলি— গদাধর, সুটুঙ্গা, মান্‌সাই, ধরলা নদীর তীরে তীরে মোষ চরাতে আসে রাখালরা, উত্তরবাংলার রাজবংশী ভাষায় যারা মৈষাল নামে পরিচিত। মোষ চরানোই তাদের কাজ। মোষের গলায় পেতলের ঘন্টি বাজে— ঢং ঢং ঢং।

বাথান শব্দ এসেছে বিশিষ্ট অর্থে গরুর বাসস্থান হিসাবে। ডাঙা-অঞ্চলে বা নদীর চরে মোষ বা গরু রাখা হয় যেখানে। এইসব স্থান থেকেই বাথানের মালিকেরা দুধ-দই-ঘি-মাখন যোগাত। রুজি-রোজগারের জন্য এদের মোষ চরাত মৈষালেরা। মোষের পিঠে বসে থাকত ওরা। মোষ চরিয়ে জীবিকা অর্জনের স্বার্থে গ্রামে-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াত। ঘর ছিল না তাদের, কিন্তু তাদের জীবনে ছিল এক রকম ভালবাসার রেশ। কোথাও কোনওখানে কোনও নারীর সঙ্গে জমে উঠত অবৈধ প্রেম-প্রণয়। সুতরাং সে-প্রেমের স্থায়িত্ব নেই। এই মৈষাল-প্রেমিকদের দূরে যেতে হয় বলে তাদের ছেড়ে দিতে আকুলপ্রাণ নারীরা। কোথা থেকে কবে এসেছিল, তারা চলে যাবে। পরপুরুষদের জন্য নারীর প্রেম এইসব গানে জীবন্ত। আর সেইসব হৃদয়ভাঙা অবৈধপ্রেমের গানে সাড়া দিতে উড়ে আসে গদাধর নদীর তীরের বগা, কোরা ইত্যাদি পাখি। কোথাও বা চিলামারীর বন্দরের তোতা-ময়না-বগিলা-দৈয়ল ও টিটি পাখির দল।

এইসব প্রকৃতিকে আশ্রয় করে চিরকালের অবৈধ বা নিষিদ্ধ প্রেম রূপ ধরে। সব দেশে সব কালে অগম্যাগমন বা নিষেধ-বিধিভাঙা প্রেমের জয়গান। এগুলিতেও তাই। বিচিকলা যেমন

কলা নয়, তেমনই পরপুরুষের সঙ্গে প্রেমও অর্থহীন। এ-প্রেম ঘর বাঁধে না, ঘর ভাঙায়। পরপুরুষের জন্য এই প্রেমে লজ্জার বাঁধন মানে না নায়িকানারী। ভাওয়াইয়া গানে প্রেমের সেই অনির্বাণ রূপমাধুরী ধরা পড়েছে। এইসব গানগুলি যেমন Pastoral Song বা শ্রমজীবী যাযাবর মানুষদের গান, তেমনই তাদের প্রেমও pastoral. নারীর কণ্ঠে ঝরে পড়ে স্বর্গীয় আকুলতা। এখানে নাগরিক নারীর ছলনা-কৃত্রিমতা নেই। প্রেমের এমন আরক্ত প্রকাশ অন্য কোনও গানে তেমন পাওয়া যায়না। তাই এগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ লোকায়ত প্রেমের গান-

যদি পিরীত মৈষাল করিতে চাও
ঘরোয়া পাছত্ মৈষাল বাতান দেও
চরণ ধর মৈষাল তমারে...

এই প্রেমিকার প্রেমে উথাল-পাথাল হৃদয়ের ভূমিকা। সে বলে, মৈষাল যেন তার বাড়ির পেছনেই বাথান করে। কিন্তু সে আর কতদিনের জন্য। মৈষাল তো চিরকালের জন্য থাকবে না এখানে। মোষ চরাতে চলে যাবে অন্য কোনওখানে। তার হৃদয় ভেঙে যায়। এগুলি সবই প্রেমের গান। প্রেমের গান অর্থে চিরন্তনকালের বিরহের গান—

ধিক্ ধিক্ ধিক্ মৈষাল রে—
মৈষাল ধিক তমার হিয়া
এ-হেন সুন্দরী নারী কারে যাইবেন দিয়া
মইষালরে।

এ-নারীর সান্ত্বনা নেই। পরপুরুষের সঙ্গে ঘরবাঁধারও স্বপ্ন নেই। শুধু জীবন্ত লতার ডগার মতো পরপুরুষের কাছে স্বেচ্ছাধীন আত্মসমর্পণ। যে ভেঙে-পড়া কণ্ঠে তার খেদ ঝরে পড়ে—

ধিকধিক ধিক মইষাল রে
(ও) মইষাল ধিক গাবুরালি
এ-হেন সুন্দরীক ছাড়ি
না যাং চাকিরি (মইষাল রে)

সে তাকে বোঝায় —

চাকিরি চাকিরি করেন মইষাল রে
ও মইষাল চাকিরি নোয় ভাল্
নলখাগেরার উড্ডার গুতায়
পিঠির যাবি ছাল।
আজি না দিস মইষাল গাও ত হাত (রে)
মইষাল ভাঙিবে মোর ছাপর খাটরে
মইষাল আউলাইবে মোর ঢালুয়া খোঁপা রে।
আজি বকনা মইষের দুধ ধরি
যান্ মইষাল আমার বাড়ি (রে)
মইষাল খাইয়া আইসেন মোর
নবীন বাটার পান রে।।

কী অসাধারণ আবেগ প্রকাশ পেয়েছে গানে। অলজ্জ প্রেমের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে এখানে। এ-পৃথিবীর প্রেমে স্বর্গের ইন্দ্রজাল নেই। বরং শরীরী প্রেমের ইঙ্গিত ফুটেছে আভাসে-ব্যঞ্জনায়। নারী বিষণ্ণ আক্ষেপে মইষালকে তার গায়ে হাত দিতে নিষেধ করে। তার সঙ্গে জোরাজুরিতে ছাপরখাট ভেঙে যেতে পারে মৈষালকে সাবধান করে দেয়। যে পরপুরুষ প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে চলে যাবে, সেই প্রেমাষ্পদের সঙ্গে মিলন-সম্পর্কে তার রুচি নেই। রাগের সঙ্গে জানিয়ে দিতে ভোলে না যে, এতে তার ঢিলে-করে-বাঁধা খোঁপা আলোল হয়ে যাবে। মৈষালবন্ধুকে আহ্বান জানিয়ে যৌবনবতী সেই নারী তাকে তার বাড়িতে গিয়ে "নবীন বাটার পান" খেয়ে আসবার অনুরোধ রাখে। এখানে নবীন বাটার পান অর্থে নবযৌবনের মধুকে বোঝানো হয়েছে।

কোথাকার কোন দেশ থেকে এসেছিল মৈষাল। সেই পরপুরুষে মন সমর্পণ করে সে তার ভালবাসার অর্ঘ্য প্রদান করে। আকুল প্রেমের তাগিদে সে তার নিজেকে বন্ধুর হাতে তুলে দেবার জন্য ব্যগ্র। তাই সে মৈষালকে তার বাড়ির পেছনেই বাথান তৈরি করতে বলে —

যদি পিরিত মৈষাল করিতে চাও
ঘরোয়া পাছত্ মৈষাল বাথান দেও।

আবার কম্পিতহিয়া নারী আকুলভাবে বলে ওঠে—

দ্যাশের মইষাল দ্যাশে যাবে
ও মোর মনটাই অবে বান্দা
আঁটিয়া কেলায় কেলায় না কং
বিচি ঘস্‌ঘস্ করে
পরপুরুষ বা পুরুষ না কঁও
হিয়া জরজর করে।

গানে সেই চিরযৌবনার বেদনার আর্তি ঝরে পড়ে। প্রেমের বেদনায় দগ্ধ হয় সে। একান্ত আকুল কণ্ঠে বিরহখিন্না নারী বলে—

আজি ছাড়িয়া না যাং চ্যাংরা মইষাল রে।
মইষের পিটিৎ চড়িয়া মৈষাল
ছিঁড়েন কাশিয়ার ফুল
আষাঢ়ো শ্রাবণমাসে নদী
হুলাস্থূল রে।

ভরা নদীর জল ছলছল করে উঠছে। নারীরও ভরা যৌবন। প্রেমে পরিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে সে মইষালের কাছে আবেদন জানায়—

আজি ছাড়িয়া না যান চ্যাংরা মইষাল রে।
দুধ খোয়াইলেন সেরে-সেরে
দই খাওয়াইলেন ভারে
তমরা মইষাল ছাড়িয়া গেইলে
গাভুর বয়সে আড়ি রে।

কোনও গানে পাই নারীর আশংকা-উদ্বেল হৃদয়ের চিত্র। মইষালের জন্য ঘরের কাজে মন বসে না তার। মোষের পিঠে চড়ে মইষাল গেছে নদীর চরে। নারীর মন বিধুর হয় চিন্তায়। সে কানপাতে বাতাসে। পরপুরুষের জন্য উন্মুখ চিত্ত সে মোষের গলার ঘন্টির শব্দও শুনতে পায় না।

মইষ চরান্ মোর মৈষাল বন্ধু
গামছা মাথায় দিয়া
ওরে, মোর নারীটার মনটায় কয়
মুই পরু ধরং যায়্যারে।

'পরু' অর্থে মোষের বাচ্চা ধরার বাসনা আসলে মৈষালের কাছে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কিছু নয়। বাথানকে শত্রু মনে করে নারীর হৃদয় ক্ষিপ্ত হয়—

আকারি চাউলের ভাত, মৈষাল রে
মৈষাল, বক্না মৈষের দুধ
তুই মৈষাল বাথানত্ থাকিস
আমার জ্বলে বুক, মৈষাল রে।

বিরহে জ্বলে বুক। শরীরও জ্বলে প্রেমিকের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায়। দেহ-মিলনের উদগ্র বাসনায় অস্থির হয়ে ওঠে হৃদয়। এখানে অলজ্জ প্রেমের রক্তিম ছটা—

ও কি ও মৈষাল রে
ফুলো ফুটিল মানববৃক্ষে
ভমর বিনা ফুলের মধুরে মৈষাল
ফুলেতে শুকাবে।
ও রে মানবকুলের ভমর তুই
ভমর বিনা ফুলের মধুরে মৈষাল
কায় বসি খাবে।

অজানা লোককবির গানে দেখি, শরীরবৃক্ষে ফুল ফুটেছে। ভ্রমরহীন ফুলের গতি কী? কে খাবে মধু?

এইসব গানের সঙ্গে মাহুতবন্ধুর গানও পাওয়া যায়। সর্বদাই যে পরপুরুষের জন্য আকুলা নারীর দেহকামনা বা হৃদয়বেদনা এগুলিতে সুর হয়ে প্রকাশ পায়, তা নয়। নিজের যৌবনবেদনায় উত্তাল নারীর জলপাইগুড়ি-কোচবিহারে মৈষালবন্ধুর গানে মৈষাল রূপ নায়ককে পাই, মাহুতবন্ধুর গানেও তেমনই পাই বিবাহিত স্বামীরূপে। জীবিকার তাগিদে সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে রেখে হাতির পিঠে চড়ে মাহুতস্বামী যায় শিকারসন্ধানে। অরণ্যময় হিংস্র পরিবেশে এইসব মাহুতদের কাটাতে হয় হাতির খেদার দলে। বিরুয়া গানে বা মাহুত বন্ধুর গানে তাই নারীর বেদনা ঝংকৃত হয়। বিরহখিন্না নারীদের স্বামীর পরবাসযন্ত্রণা সহ্য হয় না, সে-বেদনাও ফুটে উঠেছে ভাওয়াইয়ার গানে। আবার যে-সব নারীর স্বামী নিজেই মৈষাল হয়ে জীবিকার সন্ধানে অনিশ্চিত জীবনের পথে ছুটেছে, যে-সব নারীর স্বামী হাতি-ধরার কাজে জঙ্গলে ছুটে গিয়েছে, যে-সব নারীর স্বামী মনিবের গরুর গাড়ির গাড়োয়ান (গাড়িয়াল) হয়ে পথে-পথে জীবন কাটায়, তাদের যুবতী স্ত্রীদের বেদনা সহজেই ঝংকৃত হতে দেখা যায় ভাওয়াইয়ার গানে।

যেদিন মাহুত শিকারে যায়
নারীর মন মোর ঝুরিয়া রয় রে।
বালু টি-টি পাখিরে কান্দে বালুতে পড়িয়া
আর গৌরীপুরিয়া মাহুত কান্দে ও
সখি, ঘরবাড়ি ছাড়িয়া, সখিও
মোর, দাম্তাল হাতির মাহুত রে
দ্যাশেতে মাহুত ছাড়িয়া যায়
নারীর মন মোর কান্দিয়া রয় রে।

কোনও গানে শুনি মাহুতকে দেখে পরকীয়া নারীর আকাঙ্ক্ষা—

হাতির পিটিৎ থাকিয়া রে মাহুত
থোরো কলা ভাঙো মাহুত রে
নারীর মনের কাথা তমরা কি বা জানোরে।

তার বেদনা সোজাসুজিভাবে প্রকাশিত হয় কোনও গানে—

যে-নারীর পুরুষ নাই ও
ও তার রূপে কি কাম করে, সখিও
মোর, সারীন হাতির মাহুতরে
দ্যাশের মাহুত ছাড়িয়া যায়
নারীর মন মোর কান্দিয়া রয় রে।

মাহুতের প্রেমের বেদনা দেখি একটি গানে—

আই ছাড়িলং, ভাই ছাড়িলং ছাড়িলং সোনার পুরী
বিয়াও করেয়া ছাড়িয়া আসিলং ও
সখি, অল্প বয়সের নারী ......

লক্ষ করবার বিষয় ভাওয়াইয়ার গানগুলিতে বিবাহিতা নারী পুরুষের প্রেমে বিরহব্যঞ্জনা যেমন আছে, তেমনই পরপুরুষের সঙ্গে প্রেমের ব্যঞ্জনাও আছে। মাহুতের প্রেমে বিদেশিনি প্রেমিকার আকুতির উদ্ধৃতি রেখেছেন এ-গানের শ্রেষ্ঠ গবেষক ড. সুখবিলাস বর্মা—

গঙ্গাধরের পারে পারে রে, ও মোর মাউতে চরায় হাতি
কি মায়া নাগাইলেন মাহুতরে।

গাড়িয়ালের গানেও এই প্রেম, এই বিরহের বেদনা। তার সঙ্গেও মিশে রয়েছে শরীরী বাসনা। দেহই প্রেমের যজ্ঞবেদি। এই যজ্ঞবেদি ছাড়া স্ত্রীপুরুষের মিলন অসম্পূর্ণ থাকে। ভাওয়াইয়া গানের শিল্পীরা বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তা জেনেছেন। এইসব গানে নারীর করুণ কণ্ঠে নদীর স্রোতও উজানে বয়ে যায়, পথের ধুলোয় জাগে রোমাঞ্চ—

যেদিন গাড়িয়াল উজান যায়
নারীর মন মোর ঝুরিয়া রয় রে

কোনও গানে শুনি—

তোরে ছাড়িয়া রইতে পারি না রে
ওরে গাড়িয়াল বন্ধুরে
গাড়ির চাকায় পড়িয়া গাইল....

বিশাল প্রাকৃতিক পটভূমিকে সাক্ষী রেখে এইসব গানগুলি গড়ে উঠেছে। শরীরকে বাদ দিয়ে প্রেম-প্রণয়ের আরতিবন্দনা কৃত্রিম শিল্পকলামাত্র। তিস্তা-তোর্সার চর, চিলামারির বন্দর, গদাধরের তীরবর্তী আলুয়া-কাশিয়ার বন, গোয়ালপাড়ার জঙ্গল বা অরণ্যের যে-বিশাল পটভূমি, তাতে এই প্রেম-প্রণয় উচ্চারিত হয়েছে গভীর আবেগের সুরে। অনেকে এগুলির মধ্যে বৈষ্ণবপদাবলির রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের প্রভাব দেখেছেন। উত্তরবাংলার এ সব অঞ্চলে বাংলার বৈষ্ণবপদাবলির প্রভাব বেশি থাকার কথা নয়। আসলে লোকায়ত জীবনের প্রাণবন্যাই অসংকোচ প্রকাশের সাহসে এগুলিকে কাব্যহিসাবে অনুপম করে তুলেছে। উদ্ভিন্নযৌবনা নারী এই সব গানে নিজ হৃদয়ের অপূর্ণবেদনা প্রকাশে যেমন সরল, তেমনই আন্তরিক। এক বিয়ের উপযুক্তা কন্যা বাবা তার বিবাহ দিচ্ছে না বলে তার দিদিমার কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করছে। তার সমবয়সীদের সকলেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তারা সবাই বাড়ির উঠোন দিয়ে যাতায়াত করে। এ-দৃশ্য নারীর যৌবনবেদনাকে বহ্নিমান করে তুলেছে। এখন আর তার কিছু ভাল লাগছে না। বাপের বাড়ির খাদ্যের স্বাদ ভাল লাগছে না।

আবো দেখত মোর বাপের কাথা মোর বুলে না দেয় বিয়া,
মুই বুলে গাবুর হংকে নাই।

আবোগে গাবোর কাল উচ যাইয়া মুখ না ফাটে, ফাটে হিয়া।

কোনও গানে শুনি উদ্ভিন্নযৌবনা কন্যা প্রণয়াসক্ত হয়ে কোনও প্রণয়ী সম্পর্কে বলছে। তার বাড়ির পাশে বাঁশবনের আড়ালে সেই প্রেমিক মোষ নিয়ে হালচাষ করছে—

ও মোর কালারে ও মোর কালারে
বাড়ির পছিম দিয়ে বাঁশের আওডাল।
সে দি কালা জুড়িছে মইষের হাল।

বিধবার প্রেমের আকাঙ্ক্ষাও ভাওয়াইয়ার গানে সুর ধরেছে। এখানে কোনও ছলনা বা বিধিনিষেধের কৃত্রিমতা প্রাধান্যলাভ করেনি। একে অসামাজিক কলঙ্কযুক্ত প্রেম বলা যাবে না। দেহকে অভুক্ত রেখে এ-জীবন ব্যর্থ হতে দিতে চায় না নারী। তার শরীরে ভরা যৌবন। বোষ্টমবাদিয়াকে কামনাজর্জর গানে আহ্বান ধ্বনিত হয়—

অল্প বয়সে মোর স্বামীটা গেইছে মরিয়া
তুই মোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর বৈষ্টম বাদিয়ারে।

বৈধব্যযন্ত্রণা সইতে পারছে না নারী। উপযুক্ত বয়সে পুরুষ বিহনে দগ্ধ হচ্ছে দেহ-মন। এইসব চিটুল বিদুয়ার দুঃখ উথলে উঠেছে গানে। কুরা-পাখিকে সম্বোধনে গান—

নদীর পারের কুরুয়ারে মোর জামের গাছের শুয়া
আজি কেনে কান্দেন অমন করি চৌখের জল ফ্যালেয়ারে
কোরারে মুইও কান্দোং চিটুল বিদুয়া হয়া
ওরে ঢাল কাউয়ার কান্দন শুনি মনের আগুন জ্বলে

কোনও গানে শুনি—

ওকি পতিধন প্রাণ বাঁচেনা যৈবন জ্বালায় মরি
খোঁপোতে নাইরে কবুতর কি করে তার খোঁপে।

এইসব গানগুলির মধ্যে যে-অকৃত্রিমতা আছে, যে-জীবননিষ্ঠা আছে, যে-আন্তরিকতা আছে, লোকসাহিত্যের মধ্যে তা প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়ে যাই। হৃদয়প্রান্ত ছাপিয়ে যে-প্রেম আসে, তা কোনও জাতিকুল মানে না। সর্বোপরি, উপবাসী দেহ-মন থরে-থরে নিজেকে সাজিয়ে তোলে, সর্বসমর্পণের মধ্যে জীবসত্তার আস্বাদন ঘটাতে চায়। সে সমাজ-সংসার মানে না। ভাইয়ের দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে চায়—ছাড়নু ভায়ের দ্যাশরে।

পতিপত্নীর প্রেমও অনেক ভাওয়াইয়া গানের বিষয় হয়েছে। গাড়িয়াল স্বামীর জীবনের দুঃখকষ্ট সে জানে। জীবিকার জন্য তার কঠোর পরিশ্রম। নারীর গানে বেজে ওঠে বিনিদ্র দিনরাত্রি যাপনের গান—

কতয় রব আমি পন্থের দিকে চায়া রে
যেদিন গাড়িয়াল উজান যায়
নারীর মন মোর ঝুরিয়া রয়রে ....

আবার, বিপদসঙ্কুল জঙ্গলে দাঁতাল হাতির সামনে মাহুত স্বামীর জন্য আশংকাও তাকে বিচলিত করে। যতদিন স্বামী ঘরে না ফিরে আসে, ততদিন সে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় অস্থির—

আকাশেতে নাইরে চন্দ্র কি করে তোর তারা
যেবা নারীর পুরুষ নাইরে ও তার দিন অন্ধিয়ারা।

বৈষ্ণবপদাবলিতে পরপুরুষের প্রেমে বিচলিত রাধার অভিসার পেয়েছি "ঘনঘন ঝনঝন বজর নিপাত" - ভরা রাতে, ভাওয়াইয়ার নারীও ঘরে থাকতে না চেয়ে বেরিয়ে পড়তে উন্মুখ তার পুরুষ-সন্ধানে—

হাঙ্গর কুমীর বন্ধু হামাক কিসের ভয়
সান্তারিয়া দরিয়া হব পার।

কৃষ্ণের জন্য সর্বস্ব সমর্পণের পরেও যখন সে-প্রেমিক তারই আঙিনা দিয়া অন্য নারীর সঙ্গে মিলতে যায়, তখন রাধার বেদনার মতো ভাওয়াইয়ার নারীকেও আক্ষেপে বিদ্ধ হতে শুনি—

কিসের মোর রান্ধন কিসের মোর বাড়ন
কিসের মোর হলদিবাটা
মোর প্রাণনাথ অন্যের বাড়ি যায়
মোরে আঙিনা দিয়া ঘাটা।

ভাওয়াইয়ার এক বিরাট অংশই জুড়ে আছে পরকীয়া প্রেম। পরপুরুষের প্রেমে এই নারী জর্জর। এই স্বাধীনা রমণী প্রেমকেই তার সর্বস্ব বলে মনে করে। দেহের আরতিবন্দনায় শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য-উপচার সাজিয়ে সেই প্রেমিককে পাবার জন্য সর্ব ভয়-বন্ধন অস্বীকার করে সে। প্রেমের দুর্জয় শক্তি সেই নারীসত্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভাওয়াইয়ার এই গানটি লক্ষ করা যাক। ভাওয়াইয়ার এক বিশেষ শ্রেণীর গানকে বলা হয় চট্‌কা। এই গানে চটুল ও চপল সুরের দোলা লাগে। গানের ভাষাও হয় তেমনই।

আই মোর পায়ে বা ঘুংরা বাজেরে
আই মুই কেমনে বাইরা যাং
ঘরে মোর শ্বশুর আগদুয়ারে ভাসুর
ও মোর শিয়রে ননদী জাগে
আই মুই পিরীতির আগে পিরীতিরও বাদে
ও ঘুংগুরার বায়না দিনু
আরে না জানিয়া রসিয়া বানিয়া
কালাই বা ওরেয়া দিছে রে।
ও মুই ঠাসিয়া ধরং চিপিয়া ধরং
ও আস্তে ফেলাওং পাওরে।

পরকীয়া প্রেমে ঘর ভাঙতে চায় নারী। এখানে যেন বৈষ্ণব পদাবলির রাধাকৃষ্ণলীলার ভাবানুষঙ্গ আছে

মন মোর কারিয়া নিল বন্ধুয়া রে
মন কারিয়া নিলুরে মোর তোর ভাওয়াইয়া গান
তোর না গানের সুরে পাগল করল মনরে
মন কারিয়া নিলুরে মোর বন্ধু সোনার চান
তোর না পিরিতে বন্ধ ঘরত না রয় মনরে।

চিতান ভাওয়াইয়ার দৃষ্টান্তটি দেখা যাক। বিচ্ছেদের ব্যথায় কাতর ক্রন্দনের গান। অস্থায়ীতে আরম্ভ হয়ে এই গান উচ্চগ্রাম থেকে ক্রমেই নিম্নগ্রামে যায়। "বৈদ"-অর্থে কিশোর চ্যাংরাকে সম্বোধন করে পরকীয়া নারী বলে—

(আজি) নদী না যাইওরে বৈদ
নদী না যাইওরে (বৈদ) নদীর ঘোলাপানি।
আজি নদীর বদলেরে (বৈদ) বাড়িতে ধোন্ গাওরে (বৈদ)
মুই নারী তুলিয়া দিব পানি।

গানে দেখি, এক লোটা দুই লোটা জল তুলে দিতে না-দিতেই যুবতীর—"খসিয়া পড়িল মোর গালার চন্দ্রমালা
বাপনাই মোর ভাবিবেরে (বৈদ) মাও নাই মোর কান্দিবেরে (বৈদ)
ভাইও নাই যে তুলিয়ারে দিবে মালা।
তোর্সা নদীর পারে রে (বৈদ) রাজহংসা পঙ্খী পড়েরে (বৈদ)
পঙ্খীর গালায় গজমোতি মালা।
রাজহংসার কান্দনেরে (বৈদ) বাড়িঘর মোর না-জাগে মনেরে (বৈদ)
মনটা মোর উড়াও-বাইরাও করে।

প্রবন্ধ ক্রমশ দীর্ঘ হয়ে আসছে। কিন্তু এর কাব্যসৌন্দর্যের আবেদন এমন যে, গানের পংক্তির পর পংক্তি তুলে ধরতে ইচ্ছে করে। নীচের গানটি দেখুন, অবৈধ প্রেমের কী সুন্দর বৈচিত্র্যই না ফুটেছে।

নায়ক। তমার বাড়ি আসিলাম কন্যা
তমরা নাই ঘরে
তমার বাড়ি খেকি ভুটি খেই-খেই করে।

নায়িকা। কুকুরজাতি নেলজ জাতি
ডাঙ্গেয়া ভাঙ্গিখ ঠ্যাং
দুঃখে আসুক সুখে আসুক
কিসের ঝাং ঝাং।

কুকুর। চোর চোর বলিয়া করিলাং ঝাং ঝাং
কায় জানে তায় গিথ্যানীর বেটির নাং।

নির্জনবাড়িতে প্রেমিকার কাছে এসেছে অবৈধ প্রেমিক। কুকুর ঘেউ-ঘেউ করেছে বলে নায়কটির অভিযোগের উত্তরে নারী স্বীকার করেছে কুকুরজাতি এখন নির্লজ্জই বটে। সে প্রেমিককে ভরসা দেয় যে পিটিয়ে কুকুরের ঠ্যাং ভেঙে দেবে। তার এত ঝাং ঝাং করার কী প্রয়োজন? উত্তরে কুকুর বলে, চোর ভেবে সে ঝাং ঝাং করেছে। সে কী করে জানবে যে, তার প্রভুপত্নীর কন্যার উপপতি এসেছে বাড়িতে?

গানে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে নতুন ধরনের পরকীয়া আবেগ। স্বামীর চাইতে তার পছন্দ দেবরকে। এ পরকীয়া প্রেমের আর এক নিদর্শন। দেবরকে কেন্দ্র করে বৌদির মনে নিষিদ্ধ প্রেমের জোয়ার। ছলাকলাই প্রেমের আদিমতম উপাদান। দেবরের দিকে সে চোরা দৃষ্টিতে তাকায়। তার দৃষ্টিতে জাগে ইশারা।—

ভাসুর শ্বশুরের মাছ রান্ধোং মুই ঝোলেয়া করিয়া
ভাবের দেওরার মাছ রান্ধোং মুই তৈলোতে ভাজিয়া।

সে ভাবের দেওরকে নিষিদ্ধ সম্পর্কে বেঁধেই খুশি হয় না। তার নিজের স্বামীকে সে বলে ঘাটের মড়া। প্রেমের মর্ম কিছুই জানে না স্বামী।

ভাবের দেওরাকে খাবার ডাকোং চৌকের ইশারা দিয়া
পানিয়া মরাক খাবার ডাকোং নাটির গুটা দিয়া রে।

চোখের ইশারায় নবযুবতী ভাবী ডাকবে দেওরকে। আর "পানিয়া মরা" অর্থে ঘাটের মড়াকে খেতে ডাকবে "নাটির গুটা" অর্থে লাঠির গুঁতো দিয়ে।

দেশবিভাগপূর্ব বাংলার রংপুর জেলা, দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ, আসামের গোয়ালপাড়া ও ধুবড়ি জেলা ছাড়াও বর্তমান উত্তরবাংলার কোচবিহার-জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং জেলার সমভূমি অঞ্চল জুড়েই এই অঞ্চলের কথোপকথনের ভাষা রাজবংশী বা কামরূপীতে গীত সঙ্গীত ধারাই ভাওয়াইয়া নামে পরিচিত। নানা অনুষ্ঠানে, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে, বিবাহে এই গানগুলি যেমন গীত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন, তেমনই প্রেমগীত-বাৎসল্য বা বিরহ-মিলনেরও এই গান। ছয়ের দশকের আগে পর্যন্ত বিশ শতকের সবটা জুড়ে এই ভাওয়াইয়া চটকার গানগুলি লোকের মুখে মুখে চলে এসেছে বলে ড. বর্মা মনে করেছেন, সংগ্রহ তার অনেক পরের। পরবর্তীকালে অল্পসংখ্যক কেউ-কেউ এই গান লিখেছেন বটে, কিন্তু অজানিত কাল ধরে মুখে মুখে রচিত এই গানগুলি অসাধারণ কাব্যসম্পদে সমৃদ্ধ।

প্রবন্ধের উপসংহারে নীচের গানটির দিকে পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। মঙ্গলকাব্যে আমরা বারোমাস্যার গান পেয়েছি। এই শ্রেণীর গান রাজবংশী বাঙালিদের রচিত ভাওয়াইয়া গানেও আমরা পাই। এক সময় ব্যাপক প্রচলিত ছিল রাজবংশী বারোমাসি গীত। শান্তি বারোমাসি পিয়া বারোমাসি, নাগা বারোমাসি নামে পরিচিত ছিল এই গান। প্রোষিতভর্তৃকার বিরহবেদনার এই গান মঙ্গলকাব্যের নারীদের বারোমাস্যা স্মরণ করিয়ে দেয়—

কত পাষাণ বাইন্ধাছ পতি মনেতে
সুখের সময় পতি রইলেন বৈদ্যাশে
জ্যৈষ্ঠমাসে মিষ্টিফল
আষাঢ়মাসে নতুন জল
শ্রাবণমাসে গেল কন্যার কান্দিতে-কাটিতে
ভাদ্রমাসে আউলা কেশ
আশ্বিন মাসে বর্ষা শেষ
কার্তিক মাস গেল কন্যার ভাবিতে-চিন্তিতে
আঘন মাসে পাকে ধান
পৌষমাসে শীতের বান
মাঘমাস গেল কন্যার ভিজাইতে শুকাইতে
ফাগুন মাসের তিগুণ জ্বালা
চৈত্রে নারীর বরণ কালা
বৈশাখ মাস গেল কন্যার উঠিতে আর বসিতে।

চতুরঙ্গ পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিবরণী

১। প্রকাশস্থান — ৫৪, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা — ৭০০ ০১৩
২। প্রকাশের ব্যবধানকাল — ত্রৈমাসিক
৩। মুদ্রক — নীরা রহমান, জাতীয়তা — ভারতীয়। ঠিকানা — ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১৩
৪। প্রকাশক — নীরা রহমান, জাতীয়তা — ভারতীয়। ঠিকানা — ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১৩
৫। সম্পাদক — আবদুর রাউফ, জাতীয়তা — ভারতীয়
৬। স্বত্বাধিকারীদের নাম ও ঠিকানা — নীরা রহমান। ঠিকানা — ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১৩

আমি নীরা রহমান, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উল্লিখিত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

নীরা রহমান
স্বাক্ষর

দেখাসাক্ষাতের সময়

চতুরঙ্গের সম্পাদকীয় দপ্তরে প্রতি সোম, বুধ এবং শুক্রবার বিকাল চারটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত

বিজ্ঞাপন জগৎ ও নারী সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা

গার্গী চক্রবর্তী

বাজার অর্থনীতিতে বিজ্ঞাপনের রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। পণ্যসামগ্রীকে জনপ্রিয় করে তোলবার জন্য বিজ্ঞাপনের রূপ ও রেখা, তার পরিকাঠামো পরিবর্তিত হয়েছে। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতিটি সংস্থা তাদের পণ্যবস্তুকে আকর্ষণীয় করে ক্রেতাদের কাছে উপস্থাপিত করতে চায় এবং তাই বিজ্ঞাপনে নতুনত্ব আনবার এক বিশেষ প্রচেষ্টা রয়েছে। আর সেই দৌড়ে যাঁরা বিজ্ঞাপন তৈরি করেন, তাঁরা অনেক সময় ভুলে যান যে তাদের একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে।

বিজ্ঞাপনের দুনিয়ার সঙ্গে আজ শুধু প্রিন্ট মিডিয়ার যোগসূত্র রয়েছে, তা নয়। ইলেকট্রনিক মিডিয়া অর্থাৎ টেলিভিশনের নানা চ্যানেলে প্রোগ্রাম স্পনসর করবার রীতিতে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। বিশেষ বিশেষ সংস্থার ওপর টেলিভিশনের নির্ভরতা বেড়েই চলেছে। সিনেমা হোক, ধারাবাহিক টেলিভিশন সিরিয়াল হোক, খেলার জগৎ অর্থাৎ ক্রিকেট ম্যাচ হোক, আলোচনা সভা হোক, সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যেই ঘন ঘন বাণিজ্যিক বিরতি থাকবেই। আর, বাণিজ্যিক বিরতির অর্থ হল নানা সংস্থার উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর বিজ্ঞাপন। বলা যেতে পারে ভোগবাদী সংস্কৃতির পরিণাম। খালি বেচা কেনা-ভোগ্যবস্তুর হাতছানি। তাতে আপত্তি করবার কিছু নেই। যদি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা থাকে, আর তারা বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ওই সমস্ত বিজ্ঞাপিত বস্তু কেনে ও ব্যবহার করতে ব্যস্ত হন, তাতে বলবার কিছু নেই, সে হল তাদের ব্যক্তিগত অভিরুচি।

কিন্তু আপত্তি তখনই হয়, যখন দেখা যায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে চিন্তাধারা প্রচারিত হচ্ছে, তা যুগোপযোগী আদৌ নয়, বরং সমাজকে পিছিয়ে নিয়ে যাবার আশংকা রয়েছে। বহু বিজ্ঞাপন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নারীবিরোধী পিতৃতান্ত্রিক সামন্তবাদী সমাজের চিন্তাধারাকে মজবুত করে চলেছে ওই সব বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু।

নারী ও পুরুষের সমান অধিকার মূলত সাংবিধানিক মানব অধিকার। নারীদের যে চিন্তাধারা ছোট করে দেখে (Demean করে) তাদের সামাজিক মর্যাদায় আঘাত হানে, সেই ভাবনা নারীপ্রগতির পরিপন্থী। সে সব বিজ্ঞাপনে নারীদের একটা পণ্যসামগ্রী হিসাবে শুধু যে দেখানো হয়, তাই নয়, তাদের হেয় করে উপস্থাপিত করা হয়। আলোচ্য বিষয় সেই সব বিজ্ঞাপন নিয়ে। কারণ ওই সব বিজ্ঞাপন পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোকে শক্তিশালী করে এবং মধ্যবিত্ত জনমানসের গভীরে প্রভাব বিস্তার করে। তার প্রমাণস্বরূপ দেখা যায় পুত্রসন্তানের প্রতি চাহিদা বাড়ছে। এমিনিওসেন্টেসিসের ফলে কন্যাভ্রূণহত্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক জনগণনায় মহিলাদের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় কম, বিশেষ করে কয়েকটি বর্ধিষ্ণু রাজে, এ তথ্য খুবই চিন্তার বিষয়।

এইবার বিজ্ঞাপনের পালায় আসা যাক। প্রথমেই শুরু করি একটি জনপ্রিয় cream এর বিজ্ঞাপন দিয়ে। এটি হল Fair and Lovely, মুখে মাখার cream, যা নিয়মিত ক'দিন মাখলেই মেয়ের গায়ের রঙ ফরসা হয়ে যাবে। (মজার ব্যাপার ছেলের গায়ের রঙের কোনও উল্লেখ নেই, অর্থাৎ ছেলেদের গায়ের রঙ কালো হলেও কোনও ব্যাপার নয়! এই ফরসা রঙের প্রতি ঝোঁক কি, কলোনিয়াল লিগ্যাসিরই তারই পরিণাম!) বিজ্ঞাপনে দেখাচ্ছে বাবা এক কাপ কফি চাইছেন। মা রাগ করে বলছেন মেয়ের পয়সা এইভাবে নষ্ট কর আর কি? তখন বাবা দুঃখ করে বলছেন, 'যদি আমার একটা ছেলে থাকত।' অর্থাৎ এটাই ইঙ্গিত করছে যে ছেলের রোজগার বেশি হত এবং ছেলের রোজগারের ওপর বাবার অধিকার থাকত। মেয়ের রোজগারের ওপর যেন সে অধিকার থাকে না। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে তা থাকে না ঠিকই। তাই বলে সে নিয়ম মানতে কেন হবে, যেখানে কন্যা ও পুত্রকে সমান দৃষ্টিতে দেখবার কথা বলা হয়ে থাকে। বিজ্ঞাপনে মেয়েটি বাবার ওই উক্তিতে কেঁদে ফেলে। হঠাৎ তার চোখে পড়ে এয়ারহোস্টেসের চাকরির বিজ্ঞাপন। তারপর সে Fair and Lovely cream ব্যবহার করে তথাকথিত সুন্দরী মহিলায় পালটে যায়। সে মিনিস্কার্ট পরে সেই এয়ারহোস্টেসের চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে সবাইকে তার চেহারায় মুগ্ধ করে দেয় এবং চাকরিটি পেয়ে যায়। অর্থাৎ মেয়েটির যৌন আবেদন কার্যকরী হয়, যার জন্য সহায়ক হয় Fair and Lovely cream। বৌদ্ধিক যোগ্যতার কোনও স্থান নেই। মেয়ের বাবা-মা খুবই খুশি। হাসিমুখে বাবা বলেন, 'এক কাপ কফি পেতে পারি।' .. এই বিজ্ঞাপনটি বাণিজ্যিক বিরতির সময়ে প্রায়ই দেখানো হয়। বিজ্ঞাপনটি আপত্তিজনক — প্রথমত, ছেলেরাই কি উপার্জন

করার ক্ষমতা রাখে, তাদেরই কি শুধু মা-বাবাকে দেখবার দায়িত্ব রয়েছে? 'যদি আমার ছেলে থাকত' বাবার এই উক্তি আজকের সমাজে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত, মেয়েদের চাকরি পেতে হলে শুধু তার বাইরের চেহারা বা ফর্সা ত্বক বাঞ্ছনীয়। এ তো আজ পরিহাসের বিষয়। এই ধরনের পশ্চাদগামী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হওয়া প্রয়োজন।

Fair and Lovely cream এর আরেকটি বিজ্ঞাপনের বিশ্লেষণও করা দরকার। শ্যামবর্ণ পাত্রী ওই ক্রিম ব্যবহারে হঠাৎ গৌরবর্ণ হয়ে উঠল। ফলে পাত্রের পাত্রীকে চোখে পড়ে আর অন্যরা বলে ওঠেন—ঠিকুজি মিলে গেছে। যারা এই ধরনের বিচারধারা পোষণ করেন, তাদের বলতে ইচ্ছা করে সৌন্দর্যের পরিভাষা পালটে গেছে। দেহগত রূপের বাইরে একটা আকর্ষণীয় বস্তু রয়েছে, তা হল বৌদ্ধিক দীপ্তি। তা ছাড়া পাত্রীকে পাত্রের পছন্দ হওয়া জরুরি, অথচ মজার ব্যাপার বিজ্ঞাপনে পাত্রীর পাত্রকে পছন্দ হওয়ার প্রসঙ্গ কখনও থাকে না। এত এক তরফা বিজ্ঞাপন যারা অনুমোদন করেন, তারা যুগের থেকে অনেক পিছিয়ে।

LIC থেকে একটা বিজ্ঞাপন প্রায়ই দেখানো হয় — কন্যার বিয়ে এবং পুত্রের শিক্ষার (বেটি কি শাদি আর বেটে কি পড়াই) জন্য জীবনবিমার প্রয়োজন। অর্থাৎ পুত্রের জন্য শিক্ষা খাতে খরচ প্রয়োজন কিন্তু কন্যার ক্ষেত্রে শিক্ষার পরিবর্তে বিবাহের খরচের উল্লেখ থাকে। মেয়েদের জন্য ছেলেদের মতোই শিক্ষার অধিকারের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। তাকে উপেক্ষা করলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকেই দৃঢ় করা হয়, এ বিষয়ে বিজ্ঞাপনদাতাদের কোনও সচেতনতা নেই। একদিকে বলা হয় পণ ও যৌতুকপ্রথা (dowry) বন্ধ করা হোক, তার জন্য আইনও তৈরি হয়েছে, কিন্তু বহু বিজ্ঞাপনে ওই প্রথাকে কিংবা সেই ব্যবস্থাকে প্রোৎসাহিত করে। এ প্রথা যে নিন্দনীয় ও দণ্ডণীয়, মেয়েদের হীনদৃষ্টিতে দেখার অপপ্রয়াস, এই চেতনাই অনুপস্থিত, এটাই দুঃখের। যেমন, CITI Bank-এর বিজ্ঞাপন — 'Best father of the world' যাতে একটি ফোটোতে কন্যার পিতা ও বিবাহ পোশাকে সজ্জিতা ও অলংকৃতা কন্যাকে দেখানো হচ্ছে। ফোটো ও সেই সঙ্গে ওই caption এই বার্তাই বহন করছে, যে বাবা CITI Bank থেকে ঋণ নিয়ে কন্যার বিবাহের খরচ মেটান তিনিই শ্রেষ্ঠ পিতা (Best Father)। মেয়ের উচ্চশিক্ষার জন্যও তো ঋণ নিতে পারেন, কিন্তু সে চিন্তাধারা নেই। Durien imported furniture-এর বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে— তোমার প্রিয় কন্যার বিবাহে Durien Furniture দাও। যদি নবাগত বর ও কনের আসবাবের প্রয়োজন হয়, সেটা শুধু কন্যাপক্ষ দেবে কেন, বরপক্ষও দিতে পারে, কিংবা উভয়পক্ষ মিলিত ভাবে দিতে পারে। শুধুমাত্র কন্যাপক্ষের ওপর এই প্রত্যাশা করা আজকের যুগের পরিপন্থী। এই ধরনের চিন্তা বা প্রশ্ন যদি না উদ্রিক্ত হয়, তা হলে আধুনিক শিক্ষায় কী পরিবর্তন হল? বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিবাহের পণ ও যৌতুকপ্রথাকে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহিত করা হয়। সাধারণ মানুষের মনে এই ভাবে বিজ্ঞাপনের প্রভাব পড়ে এবং নিজেদের অজান্তে বিজ্ঞাপনে দেখা ইমেজগুলো মনের মধ্যে স্থান করে নেয়। ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছে বিবাহ অনুষ্ঠান একটা বাণিজ্যিক লেনদেনে পরিণত হয়ে উঠছে। বিজ্ঞাপনের দুনিয়ায় বস্তুসামগ্রীগুলো পণের অঙ্গ হয়ে উঠছে। বিজ্ঞাপন মারফত 'Kanyadan Package' এই শিরোনামায়— একটা সনাতনপন্থী চিন্তাধারা প্রসারিত হচ্ছে। কন্যাসন্তান ও পুত্রসন্তানের সমান শিক্ষার সুযোগ, সম্পত্তিতে সমান অধিকার ইত্যাদি চিন্তাধারার পরিবর্তে মেয়েদের সামাজিক স্থিতি পুরুষের নীচে করবার কোনও প্রয়াসকে প্রতিরোধ করা উচিত। বাস্তবিক সত্য যাই হোক না কেন, সমাজকে পালটাবার দায়িত্ব সমাজসচেতন মানুষের। বিজ্ঞাপনের সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। এটা একটা বিরাট মাধ্যম সুস্থ চিন্তাধারার প্রয়োগকে সম্ভব করে তোলার জন্য।

এবার আর একটা বিজ্ঞাপনে আসা যাক। ICICI -এর বিজ্ঞাপনে দেখানো হচ্ছে একজন স্বামী তার স্ত্রীর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিচ্ছে। এবং ছবিটির ক্যাপসান এ লেখা হচ্ছে— "সারাজীবনের সুরক্ষা" (জীবনভর কি সুরক্ষা)। অর্থাৎ বলা হচ্ছে, স্বামীর ওপরই স্ত্রীর নির্ভরতা এবং বিবাহই তার জীবনের নিরাপত্তার চিহ্ন। ইঙ্গিত বহন করছে, একটি মেয়ের জীবনের সুরক্ষা নির্ভর করে বিবাহের ওপর। আজকের দিনে অনেক মেয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন, কেউ কেউ বিয়ে করেন না। একদিকে যখন মেয়েদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক empowerment এর কথা বলা হয়, তখন মাথায় সিঁদুর অর্থাৎ বিবাহই মেয়েদের নিরাপত্তা এই সাবেকি ভাবনা নারীস্বাধীনতার গতিকে পিছিয়ে দেয়। নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ভাবনা নিয়ে কোনও বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে না।

তা ছাড়া সিঁদুর দেবার প্রচলন শুধু হিন্দুসমাজে প্রচলিত। সে ক্ষেত্রে ICICI-এর বিজ্ঞাপন দেবার সময় অন্যান্য ধর্মের মানুষের কথা কি ভাবা উচিত নয়? অবশ্য মূল কথা তা নয়, আসল কথা হল, মেয়েদের সুরক্ষা বিবাহ নয়, বরং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তার সুরক্ষা। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পরিতৃপ্তি। বিবাহ হলেই বা কেন স্বামীর ওপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভর করবে? ছেলেদের কাছে কেউ প্রত্যাশা করে না, স্ত্রীর ওপর অর্থনৈতিকভাবে স্বামী নির্ভর করবে। তা হলে মেয়েরাই বা কেন করবে? আজকের দিনে অনেক প্রশ্নই জাগতে পারে। সামন্তবাদী সমাজের সঙ্গে যুক্ত পিতৃতান্ত্রিক চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া দরকার। আর সেই পরিবর্তনে বিজ্ঞাপনের একটা প্রগতিশীল এবং ইতিবাচক ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞাপনজগতের একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে।

গ্রন্থসমালোচনা

বাংলার রেনেসাঁসের সন্ধানে

ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথকে শেলি অফ বেঙ্গল বললে তাতে শেলি কিংবা রবীন্দ্রনাথ কিংবা বেঙ্গল কাউকেই ঠিক মতো বুঝবার সুবিধা হয় না। রেনেসাঁস অব বেঙ্গল সম্পর্কেও কি একই ধরনের কথা বলা চলে না? চতুর্দশ এবং ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ইতালিতে আরম্ভ হয়ে ক্ল্যাসিকাল আদর্শের প্রভাবে সাহিত্য ও শিল্পের যে পুনরুজ্জীবনকে পাশ্চাত্যের ইতিহাসে রেনেসাঁস আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তার প্রভাব পাশ্চাত্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, আমরা সবাই জানি। এই যে অত্যন্ত চিন্তা-সমৃদ্ধ ও চিন্তা-উদ্রেককারী বইখানি, শিক্ষিত বাঙালি মাত্রেরই (আর কিছু না হোক, বাংলা ভাষাতেও আধুনিকতম প্রাগ্রসর চিন্তার চর্চা কত দূর সম্ভব তার পরিচয় লাভের জন্যও) ব্যক্তিগত সংগ্রহে যেটি থাকা উচিত, তার একটি প্রবন্ধে অন্নদাশংকর রায় স্মরণ করেছেন, "সুদূর ইউরোপ থেকে জাহাজ আসে। গঙ্গার ঘাটে নামিয়ে দেয় ইংরেজি ভাষায় লেখা বইপত্র। নাটক উপন্যাস কাব্য প্রবন্ধ। রাজনীতি অর্থনীতি দর্শন বিজ্ঞান-সন্দর্ভ।" তা হলে আর বাকি থাকল কী? মুশকিল হল, রেনেসাঁস জাহাজে করে আমদানি করার পণ্য নয়। তার পিছনে একটা দীর্ঘ ইতিহাস থাকে, বিস্তীর্ণ পটভূমি থাকে, এমনকী যাকে একদা ইউরোপের ইতিহাসের অন্ধকার মধ্য যুগ বলা হত, সে রকমও কিছু একটার হয়ত প্রয়োজন থ'কে। রবীন্দ্রনাথ অন্য কোনও প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন, "বৃহৎ নিয়মে ক্ষুদ্র কাজ অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেই নিয়ম যদি বৃহৎ না হইত তবে তাহার দ্বারা ক্ষুদ্র কাজটুকুও অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না। একটি পাকা আপেল ফল যে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িবে, তাহার জন্য চরাচরব্যাপী মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবশ্যক, একটি ক্ষুদ্র পালের নৌকা চলিতে, কিন্তু পৃথিবী-বেষ্টনকারী বাতাস চাই।" মধ্যযুগ চাই, কেননা হাওয়ার সঙ্গে লড়াই চলে না, আবার অজানার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য প্রবল যৌবন-ধর্ম চাই, অজেয় প্রাণপ্রাচুর্য চাই। সে প্রাণপ্রাচুর্য নানাভাবে, নানা দিকে নিজেকে ছড়িয়ে দেয় চারিদিকের জগৎটাকে হাত দিয়ে ছুঁতে চায়, নাক দিয়ে শুঁকতে চায়, চোখ দিয়ে দেখতে চায়, যে একটি ছুঁচের ডগায় কটি এঞ্জেল নৃত্য করতে পারে তা নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নয়, সব অনুসন্ধিৎসা, সব গবেষণা, শাস্ত্র মানে না, এগোতে গিয়ে পিছিয়ে আসে না শাস্ত্রের ভ্রুকুটি দেখে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক ধর্মতত্ত্ববিদ লিখেছেন, "এক অর্ধশতাব্দীতে আমরা বিজ্ঞানে যে অগ্রগতি দেখেছি, আমাদের পূর্ব পুরুষেরা গত চোদ্দ শতাব্দীতেও সে-রকম দেখেননি।" যে বই থেকে এই উক্তিটি উদ্ধৃত করলাম (ইংরেজি থেকে অনুবাদ করে) সেই Larousse এর *Encyclopedia of Modern History* থেকেই সে অগ্রগতির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণও উদ্ধৃত করার লোভ সামলানো কঠিন :

"Gerner, the Pliny of Germany, wrote a *History of Animals* the science of ichthyology was developed at Montpellier by Roudelet; mineralogy was studied in Bohemia by Bauer, and arsenei zinc and bismuth were added to the seven metals known to antiquity. Vesalius of Brussels produced the first exact description of the human body...." ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমাদের বঙ্গভূমিতেও যে একেবারে কিছুই এ দিক থেকে হয়নি, তা নয়। শিবনারায়ণ রায় লিখেছেন, "ভূগোল, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদবিজ্ঞান, শারীরস্থান প্রভৃতির চর্চায় কিছু বাঙালির মন নিযুক্ত হল।" তার আগে তিনি উইলিয়াম জোনস-এর এশিয়াটিক সোসাইটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ঘোষণার উল্লেখ করেছেন : "মানুষ এবং প্রকৃতির সব দিকই তাঁদের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু।" কিন্তু সে অনুসন্ধান যে সব দিকে খুব বিস্তার লাভ করেছিল, খুব বেশি দূর অগ্রসর হয়েছিল এমন দাবি তিনিও (অর্থাৎ শিবনারায়ণও) করতে পারেননি।

বঙ্গভূমির উনিশ শতকী নবজাগরণের সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপীয় Renassance এর তুলনা সম্পর্কে ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায়ের মত খুব স্পষ্ট, "গোড়াতেই বলা প্রয়োজন, এই তুলনা, এই অনুষঙ্গ অসার্থক, অনৈতিহাসিক, পশ্চিম ইউরোপীয় Renassance এর সঙ্গে আমাদের উনিশ শতকী পুনরুজ্জীবনের কোনও মিল নেই, শুধু নবজন্মের সামান্যার্থ ছাড়া।" যথা, তিনি বলেছেন, "ইউরোপীয় রেনেসাঁস মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের কার্যকারণশৃঙ্খলাগত পরিণতি : সে বিবর্তন ও কার্যকারণশৃঙ্খলা ইউরোপীয় সমাজের ভেতর থেকেই উদ্ভুত। উনিশ শতকে বঙ্গ ভূমে ও ভারতবর্ষে যা ঘটেছিল তাকে বাঙালী ও ভারতীয় সমাজ বিবর্তনের কার্যকারণশৃঙ্খলাগত পরিণতি বলা যায় না, সমাজের

ভেতর থেকে তা উদ্ভূত হয়নি। তার প্রেরণা এসেছিল দেশীয় সমাজের বাইরে থেকে।" এ রকম আরও কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য নীহাররঞ্জন দেখিয়েছেন ইউরোপের রেনেসাঁস ও আমাদের নবজাগরণের মধ্যে। তিনি একে বলেছেন "পুনরুজ্জীবন" এবং একই সঙ্গে স্বীকার করেছেন এই আখ্যার পিছনেও একটু "ইতিহাস বিলাস" আছে, অর্থাৎ যোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে যে গভীর "জীবনান্দোলন" দেখা গিয়েছিল তাকে "উজ্জীবন" বললে, একে পুনরুজ্জীবন বলা যায়। মনে হয় না এই দুই ঘটনাকে এক শ্রেণীতে ফেলা সঙ্গত।

তবে শিবনারায়ণ রায় প্রশ্ন করেছেন, "বাঙালী ভাবুকেরা ইংরেজির সূত্রে পশ্চিমী চিন্তার জগৎ থেকে বহু উপাদান গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের অনেকের মধ্যে যে অসামান্য ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি চোখে পড়ে এবং সেই সব ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াকলাপ ও প্রকাশের ভিতর দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যে বিস্ময়কর সমৃদ্ধি অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে, নিজমূল্যে এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্যে তা কি পনের শতকের ইতালীয় রেনেসাঁসকেই স্মরণ করায় না?" স্মরণ অবশ্যই করায়, তবে মনে হয়, এই দুই ঘটনার সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য কোথায় কোথায় তা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ কিংবা আমাদের রেনেসাঁসে ওদের রেনেসাঁস-এর তুলনায় কত ঘাটতি কী পরিমাণ অসার্থকতা, তা নিয়ে মনস্তাপ যথেষ্ট হয়েছে, এখন বরং রবীন্দ্রনাথ যে শেলি নন সে-কথা স্বীকার করে নিয়ে রবীন্দ্রনাথেই আমাদের মনোনিবেশ করা, তাকেই বুঝবার চেষ্টা করা বেশি দরকার। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে যে ঘটনা ঘটেছিল এবং আমাদের সমাজে, সাহিত্যে, শিল্পে, চিন্তায় তার যে অভিঘাত, এবং যে সম্ভাবনা তার ফলে দেখা দিয়েছিল তা কতটা বাস্তবায়িত হল, কতটা হল না, সেই হওয়া এবং সেই না হওয়ার কারণ কী, এ-সব বিশ্লেষণ করা, অনুত্তেজিত চিত্তে, কারও ওপর, কোনও ব্যক্তি অথবা শ্রেণী অথবা জনগোষ্ঠীর ওপর অযথা দোষারোপ না করে, কিংবা কারও দোষ থাকলেও তা নিয়ে মাথা গরম না করে, বুঝবার চেষ্টা করার এখন সময় এসেছে। সে-কাজে এই বইটি বিশেষ সহায়তা করবে। যে ঘটনা, যে phenomenon আমার অত্যন্ত অপছন্দের তাকেও নৈর্ব্যক্তিকভাবে মানসিক ভারসাম্য না হারিয়ে তলিয়ে দেখতে হবে, বুঝতে হবে, এই বিশ্বাস হারান মানে আবার সেই অন্ধকার যুগের দিকে পা বাড়ান যেখান থেকে রেনেসাঁস আমাদেরকে বার করে এনেছে।

এই বইয়ের প্রথম পাঁচটি প্রবন্ধে সে বিশ্লেষণ ও বিচার লেখকেরা বিভিন্ন দিক থেকে করেছেন। মানবেন্দ্রনাথ রায় "ভারতীয় রেনেসাঁস" প্রবন্ধে দেখিয়েছেন আমরা আমাদের উত্তরাধিকারের একটি অতি মূল্যবান অংশ (নিছক অনবধানতা বশত নিশ্চয় নয়) হারিয়ে ফেলেছি, আমাদের যুক্তিবাদী, নিসর্গবাদী, সজ্ঞাবাদী, এমনকী নাস্তিক্যবাদী ও নিসর্গবাদী চিন্তার অংশটি। কেন হারালাম, কার দোষে হারালাম সে-সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথ যা বলেছেন, তার পরেও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা নিয়ে আলোচনা, বিচারবিশ্লেষণ দরকার। মনে হয়, তা হলে আমরা আমাদের এখনকার যে বৌদ্ধিক অনগ্রসরতা, তার কারণ আরও ভালভাবে বুঝতে পারব। নীহাররঞ্জন রায় আমাদের নবজাগরণ, কিংবা পুনরুজ্জীবন, যাই বলুন (আলোচনার সুবিধার জন্য নাম একটা দিতেই হবে) দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতার দীর্ঘ বিশ্লেষণ করে, কোথায় তার শিকড় নিহিত, তার আলোচনা করেছেন। একটা বড় কথা তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে। সেই আন্দোলনের দুর্বলতার প্রধান কারণ তার সংকীর্ণ ক্ষেত্র। তার জন্য দায়ী তাঁর মতে অনেকাংশে ইংরেজি। "আজ ক্রমশ পরিষ্কার হচ্ছে, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীমহলে ইংরেজি ভাষার এই আধিপত্য ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থার এই নির্বাক সর্বভারতীয় বিস্তার (যার সূচনা বঙ্গভূমের পুনরুজ্জীবনে) বঙ্গভূমি ও ভারতবর্ষের পক্ষে শুভকর হয়নি, কল্যাণকর হয়নি, এর ফলে দেশের মানুষ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে।" আমরা যারা ইংরেজির একান্ত গুণগ্রাহী ও পক্ষপাতী, তাদেরও সাধ্য নেই এই অপ্রিয় সত্যটি অস্বীকার করার। তবে নীহাররঞ্জন সেই পুনরুজ্জীবনের নানা সার্থকতারও উল্লেখ করেছেন। তার একটি হল, "অখণ্ড ভারতবর্ষের চেতনা" সৃষ্টি করা। এ কথাও তিনি বলেছেন, সেই নবজাগরণের নায়কেরা কেউই বিপ্লবী ছিলেন না, এবং "যা তাঁরা ছিলেন না, যা তাঁরা চেষ্টা করেন নি, তাঁদের কাছ থেকে তা প্রত্যাশা করাটা কি খুব যুক্তিযুক্ত?"

শিবনারায়ণ রায় "বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা" সম্পূর্ণ অস্বীকার করেননি, কিন্তু জোর দিয়েছেন তার কৃতিত্বের ওপর। শিবনারায়ণের চিন্তার বৈশিষ্ট্যই এই, তিনি চিরকাল খুজেছেন "প্রাতিস্বিকতা, অনন্যতা, স্বনির্ভরতা, আত্মপ্রকাশের সামর্থ্য, ঐতিহ্য ও লোকাচারকে নিজের বিচারবুদ্ধির দ্বারা যাচাই করে নেবার সাহস ও শক্তি" এবং যেখানেই তার সন্ধান পেয়েছেন অভিবাদন করেছেন তাকে। আমাদের নবজাগরণের নেতাদের মধ্যে তিনি সে-সব গুণের পরিচয় পেয়েছেন, তারপর আর কী পাননি তা নিয়ে হাহুতাশ করবার মানুষ তিনি নন। "ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে এবং বিশশতকের প্রথমাংশেও এই ধরনের বহু সংখ্যক ব্যক্তিত্বের সমাবেশ বাংলার রেনেসাঁসকে অর্থবহ করে।" এবং তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস, ইংরেজের সূত্রে ইউরোপের সঙ্গে যোগসাধন না ঘটলে এই ধরনের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ এ দেশে ঘটত, "এমন প্রকল্প দেশাভিমানের পরিচায়ক হতে পারে। কিন্তু তার সমর্থনে নির্ভরযোগ্য যুক্তি অথবা তথ্য মেলে না।" যাই হোক, কী হলে কী হত তা নিয়ে গবেষণার চেয়ে জরুরি, সেই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ কোথায় গেল, সেই চরিত্র কোথায় পালাল, এই চিন্তা।

তারও কিছু কিছু ইঙ্গিত এই বইয়ে আছে। অম্লান দত্ত বলেছেন, "উনিশশতকী নবজাগরণ যদিও শ্রদ্ধেয় তবু নিজেকে রক্ষা করবার শক্তি তার নিজের ভিতর ছিল না। তাকে রক্ষা করবার জন্যই তার অপূর্ণতা স্বীকার করে নিতে হয়। নবজাগরণের ধারাকে ব্যাপ্ত করতে না পারলে তাকে রক্ষা করা যাবে না।" তিনি আরও বলেছেন, "আনন্দিনী বুদ্ধি ও ব্যবহারিকী বুদ্ধির মধ্যে একটা নতুন সমন্বয়ের সময় এসেছে।"

তা ছাড়া কিছু একটা বড় জিনিসের অভাবও আছে বোধ হয় আমাদের ঐতিহ্যে, আমাদের স্বভাবে, যা ব্যতিরেকে নবজাগরণের যুগের প্রাপ্তি আমরা রক্ষা করতে পারিনি, যা নইলে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের যা সবচেয়ে বড় দান, তা মুঠো করে ধরবার সামর্থ্য আমাদের কোনও দিনই হবে না। তার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "য়ুরোপ এশিয়ার মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে য়ুরোপে মনুষ্যের একটা গৌরব আছে, এশিয়াতে তাহা নাই। এই হেতু এশিয়ায় বড়ো লোককে মহৎ মনুষ্য বলে না, একেবারে দেবতা বলিয়া থাকে।"

যে-অক্ষয়কুমার দত্তকে বলা যায় সেই নবজাগরণের যুগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাঁকে নিয়ে সুন্দর একটি নিবন্ধ লিখেছেন সাধনা মজুমদার। তা ছাড়া, 'ইসলাম ও বাঙালী মুসলিম সমাজ' অসীম রায়ের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা, মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতার ওপর যাতে মূল্যবান আলোচনা আছে। একই বিষয় নিয়ে, "আধুনিকতা বিমুখ বাঙালী মুসলমান ও বাংলাদেশের বিকাশ সমস্যা" প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন সালাউদ্দীন আহমদ। কে. জি. সুব্রহ্মণ্যনের 'রেনেসাঁসের শর্ত"-তে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এ দেশের শিল্পে নতুন যুগের প্রবর্তনের ইতিহাস। এবং "বঙ্গদেশের নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কৃষ্ণভাবিনী দাসী"-তে গোলাম মুরশিদ এমন একজন নারীকে নিয়ে আলোচনা করেছেন যার কথা আজকের দিনে নিরতিশয় প্রাসঙ্গিক।

বস্তুত এই বইখানি ভাবনা-চিন্তায় আলাপ-আলোচনার, বিতর্কের অজস্র উপকরণে সমৃদ্ধ।

বাংলার রেনেসাঁস — সম্পাদক : শিবনারায়ণ রায়/ রেনেশাঁস পাবলিশার্স, কলকাতা ৭৩/১০০.০০

ইতিহাসের ট্র্যাজিক নায়ক ইকবাল

শ্যামলেন্দু রায়

'দেশের ঐক্য আর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলন রচনার সুরে ইকবালের বাণীর আজ সর্বোচ্চ গুরুত্ব।" বলেছেন সৈয়দ মুজফ্ফর হুসেন বারনি তাঁর ইংরেজিতে লেখা 'ইকবাল-ভারতের কবি দেশপ্রেমী' শীর্ষক গ্রন্থটির উপসংহারে। গ্রন্থটি নতুন দিল্লির বিকাশ প্রকাশনা ভবন থেকে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। বঙ্গানুবাদ করেছেন শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশিষ্ট ইসলামি শিক্ষাবিদ, একদা ভারত সরকারের শিক্ষাসচিব, পরে রাজ্যপাল, সৈয়দ মুজফ্ফর হুসেন বারনি ১৯৮৪ সালে ভুপাল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইকবাল ও জাতীয় সংহতি' বিষয়ে আমন্ত্রণী ভাষণে ইকবালের কবি-দেশপ্রেমী ভূমিকার বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন এবং সেই প্রসঙ্গে ইকবালের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের প্রয়াস করেন।

ইকবালের রচনায় গভীর মানবতাবোধ, সর্বধর্মমতসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, মাতৃভূমির ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার, সর্বোপরি প্রাচ্যের দর্শন, ধ্যানধারণা এবং অনন্য দৃষ্টিভঙ্গির প্রচুর নিদর্শন পাই। ঔপনিবেশিকতা ও দাসত্ব বন্ধনের বিরুদ্ধে তিনি অবিরাম লেখনী ধারণ করেছিলেন, তাঁর সেই সব অবদান যথোপযুক্ত বিবেচনায় না এনে, পরবতীকালের কোনও কোনও ভাষণ কিংবা বক্তব্যের বিকৃত অর্থ গ্রহণ করে তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবক্তারূপে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। স্বাধীনতালাভ ও দেশবিভাগের অব্যবহিত পরে কিছু সংখ্যক মানুষ, যাঁদের মধ্যে কিছু উর্দুভাষাপ্রেমিকও আছেন, ইকবালকে পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত করে দিয়েছেন। সৈয়দ মুজফ্ফর হুসেন বারনি এই অন্যায় অভিযোগ অপনোদনের মানসে তাঁর ভাষণে নানা তত্ত্ব এবং তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে ছিলেন এবং ইকবাল প্রকৃতই তথাকথিত বিচ্ছিন্নবাদের অধিবক্তা, না, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির একনিষ্ঠ প্রচারক,-এই প্রশ্নের সঠিক পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়ণ দাবি করেছিলেন। ভাষণটি প্রথমে ইংরেজিতে, পরে যথাক্রমে হিন্দি ও উর্দুতে প্রকাশিত হবার পরে তাঁর বিষয়-বিচার সঠিক ও নিরপেক্ষ বলে পণ্ডিত ও সমালোচকদের কাছে সমাদর লাভ করে। ফলত উৎসাহিত সৈয়দ বারনি তাঁর ভাষণটি পরিমার্জিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

১৯৮৪ সালে তাঁর প্রদত্ত ভাষণটি যে অত্যন্ত সঙ্গত হয়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যখন ১৯৯৩ সালে নতুন দিল্লি থেকে পেঙ্গুইন সিরিজে প্রকাশিত ড. রফিক জ্যাকেরিয়ার 'ইকবাল দ্য পোয়েট অ্যান্ড পলিটিশিয়ান' শীর্ষক গ্রন্থে গ্রন্থকার

লিখিত মুখবন্ধে আমরা দেখি, ১৯.১১.১৯৯০ সালে তৎকালীন বোম্বাইয়ের নেহরু সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ওপরে এক আলোচনাসভায় ভারতীয় জনতা দলের সাংসদ শ্রীযুক্ত প্রমোদ মহাজন বলেন, মহান ভারতীয় মুসলিমদের একজন, যাকে 'সারে জহাঁসে অচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হমারা'র মতন সঙ্গীত প্রণয়নের জন্য আমরা ভক্তি করতাম, পরবর্তীকালে তিনি-ই আমাদের মাতৃভূমির ব্যবচ্ছেদের এক অস্ত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন! এমন মানুষদের অতঃপর কেমন করে বিশ্বাস করা যায়?

১৯৫৫ সালেও তৎকালীন তথ্য ও প্রচার মন্ত্রী মাননীয় বি.ভি. কেশকার কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত সভায় বিশিষ্ট ইকবাল-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জগন্নাথ আজাদ-কে ইকবাল-সম্পর্কিত বক্তৃতা দিতে সরকারিভাবে বাধা দিয়েছিলেন, ভারতীয় বেতার থেকে ইকবাল-বিষয়ে সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে 'তরানা-এ হিন্দ' নামে ইকবালের 'বাঙ্-এ-দারা' (তীর্থযাত্রীর আহ্বান ঘন্টা) কাব্যগ্রন্থের সেই বিখ্যাত উর্দু শায়েরি, যার প্রথম পংক্তিই বিশ্বখ্যাত এবং বহুশ্রুত, জনগণ-বন্দিত, 'সারে জহাঁ সে আচ্ছা', সেটি ছাড়া ইকবালের অন্য কোনও রচনা ভারতীয় প্রচার মাধ্যমে খুব একটা পরিবেশিত হয়নি।

এ সব ঘটনায় প্রতীয়মান হয়, ইকবাল ভারতবর্ষে সেই সময়ে কী নির্মম মরণোত্তর বিরূপ সমালোচনা, অবহেলা ও অনাদরের সম্মুখীন হয়েছিলেন। অথচ সমসাময়িক ঘটনাবলির ঘাত প্রতিঘাত লক্ষ করলে বোঝা যায়, ভারত-বিভাগ অনিবার্য ছিল এবং ঘটনাচক্রে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের মহান জননেতৃবৃন্দের অধিকাংশই তা মেনে নিয়েছিলেন। অন্যায়ভাবে কেবল ইকবালকেই দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তা বলে মনে করলেও পরবর্তীকালে এ দেশে এ তত্ত্বের সমর্থক কেন বহুজাতিতত্ত্বের প্রবক্তাদের দেখাও অবশ্য পাওয়া গিয়েছিল। অথচ ইকবাল তাঁর রচনায় মহান ভারতীয় জাতির উল্লেখ করেছিলেন বারে বারে এবং ধর্মকে জাতি-ভাবনা থেকে পৃথক রেখেছিলেন। ইকবালের দুর্ভাগ্য, নিয়তির অদৃশ্য এবং অলঙ্ঘনীয় অঙ্গুলিহেলনে তিনি যেন মহাকাব্যের এক ট্র্যাজিক নায়কে পরিণত হয়েছিলেন।

এ কথা অনস্বীকার্য, ইকবালের দেশপ্রেমের কবিতার অকৃত্রিম নিদর্শন 'সারে জহাঁসে অচ্ছা ....' মাতৃভূমির প্রতি তাঁর সুগভীর ভালবাসা ও প্রগাঢ় জাতীয়তাবোধের পরিচয় বহন করে। সৈয়দ বারনি সাহেবের বিশ্বাস এবং বহু ভারতীয় মানুষেরও সম্ভবত তাই, দেশভাগ না হলে এই কবিতাটি নিঃসন্দেহে নির্বাচিত হত জাতীয় সঙ্গীতরূপে। ইকবাল পাকিস্তান প্রস্তাবের একজন উদ্ভাবক, এই সাধারণ ধারণা অবশ্য ভারতের স্বর্গীয় প্রধানমন্ত্রী নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছেন তাঁর 'Discovery of India' গ্রন্থে। পরবর্তীকালে আরেকজন প্রধানমন্ত্রী স্বর্গতা ইন্দিরা গান্ধী সেতারে আকাশবাণীর পরিচয়জ্ঞাপক সুরসঙ্কেত রচনার জন্য পণ্ডিত রবিশঙ্করের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।

১৯২০ সালে কেম্ব্রিজের অধ্যাপক ড. আর.এ. নিকলসন ইকবালের অসরার-এ-খুদি (আত্মার রহস্য — ১৯১৪) অনুবাদ করে ইকবালকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কবিত্বশক্তির জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হয়ে পড়েন ইকবাল। ১৯২৩ সালে এ জন্য ইংলন্ডেশ্বরীর দরবারে 'নাইটহুড' (স্যার) উপাধিতে অভিষিক্ত হন।

ইকবালের আবির্ভাব কাশ্মীরের নিকটবর্তী শহর শিয়ালকোটে এক সুফি পরিবারে। ১৮৭২ সালের ২২, মতান্তরে ২৪ ফেব্রুয়ারি। পিতা ধর্মপ্রাণ নূর মহম্মদ। শিয়ালকোট জুনিয়ার স্কুলে ছাত্রাবস্থায় তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষ করা গেছে। 'ইকবাল' নামকরণ তাঁর জীবনে যে আশ্চর্য সার্থকতার ব্যঞ্জনা আনবে, এ যেন সেই সময়েই দৈব-নির্দিষ্ট ছিল। উর্দু 'ইকবাল' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Glory', বাংলায় 'গৌরব' অথবা 'যশ'।

লাহোরে কলেজ-জীবনে দর্শনশাস্ত্রে স্বর্ণপদক পেয়ে এম.এ. উত্তীর্ণ হন এবং কলেজে ইংরেজি ভাষার সহকারী অধ্যাপক হন। ১৯০৫ সালে দর্শনশাস্ত্রে উচ্চতর গবেষণার জন্য ইয়োরোপে যান। ১৮১৬ সালে শিয়ালকোটে বাসকালীন আরবি এবং ফারসি সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত আল্লাখা মীর হাসানের কাছে ইকবাল কাব্যরচনার প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করেন এবং নানা কবিতারচনা করে দিল্লি নিবাসী নবাব মিরজা খান দাঘের কাছে সমালোচনার জন্য এবং ক্রমে দাঘের ঘনিষ্ট কবি-সঙ্গী হয়ে ওঠেন। স্যার আবদুল কাদের সম্পাদিত 'মাখজান' পত্রিকায় 'হিমালা' শীর্ষক কবিতায় তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ (১৯০১)।

তাঁর কাব্যভাবনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন-চিন্তা, ইসলামি, হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান অধ্যাত্ম-অনুভবের ও মতাদর্শের সমন্বয় ছিল। ইসলাম ধর্মাচরণে একনিষ্ঠ থেকেও অন্য ধর্মভাবনার অমর্যাদা তিনি করেননি। যেমন তিনি রুমির অনুগামী, তেমনই হেগেল, নিটশে, ব্রাডলি, রুডলফ অয়কেন অথবা গীতার শ্রীকৃষ্ণ, অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য কিংবা রামানুজমের তত্ত্ব-ছায়া তাঁর কাব্যে গ্রহণ করেছেন। এমনকী গৌতম বুদ্ধকেও অন্যতম পয়গম্বর বলে উল্লেখ করেছেন ইকবাল, যার ভেতরে সকল ধর্মের প্রচারক-প্রতিষ্ঠাতার ওপরে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা অনুভূত হয়। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিমের পক্ষে যা অকল্পনীয় মনে হতে পারে। শ্রীরামচন্দ্র, নানক, স্বামী রামতীর্থ, বিশ্বামিত্র, ভর্তৃহরি প্রভৃতি হিন্দু, শিখ অবতার এবং সন্ন্যাসী সন্তদের নিয়ে কবিতা রচনা, মহাত্মা গান্ধীর প্রতি কবিতায় শ্রদ্ধা নিবেদন, বাঙ্-এ-দারার (তীর্থযাত্রীর আবাহনঘন্টা) প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় গীতার স্বীকৃতি কিংবা 'অসরার-এ-

খুদি' (আত্মার রহস্য) কাব্যে ভগবদগীতার কর্মযোগের উল্লেখ বারে বারে তাঁর ধর্ম-সম্প্রদায়-রাজনীতি নিরপেক্ষ মানসভূমির পরিচয় উদঘাটন করে।

ইকবালের জীবনে যথাক্রমে তিন পর্যায়ের ক্রমবিকাশ বা ক্রমবিবর্তন তাঁর কাব্যরচনায় বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।

প্রথম পর্যায় ১৮৯৯-১৯০৫ সালের শিয়ালকোট ও লাহোর পর্ব, যখন তাঁর উর্দু কবিতায় দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের স্ফুরণ, দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯০৫-১৯০৮, ইয়োরোপ পর্ব, পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদে বিরাগ, ক্রমশ ইসলামি ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে অনুরাগ, ১৯০৮-১৯২৪ আন্তর্জাতিক ইসলামি ভ্রাতৃত্বের পুনর্জাগরণ সংকল্প, ফারসি ও উর্দু কাব্য প্রকাশ। এই পর্যায়ে ১৯১১ সাল থেকে তাঁকে ক্রমশ রাজনৈতিক কর্মধারায় জড়িত হয়ে পড়তে দেখি। ১৯২৬ সালে পঞ্জাব প্রাদেশিক আইনসভায় মুসলিম লিগের প্রতিনিধি, ১৯২৮এ লাহোরে মুসলিম লিগের সভাপতিত্ব, ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে সারা ভারত মুসলিম লিগের অধিবেশনে একটি মুসলিম প্রদেশ সৃজনের প্রস্তাব, যা পরবর্তীকালে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রস্তাব বলে অপ-প্রচারিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং কায়েদে আজম জিন্নাহ্ বলেছিলেন, ইকবাল পাকিস্তান প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি। পাকিস্তান প্রস্তাব বলে প্রসিদ্ধ ১৯৪০ সালের মুসলিম লিগের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি জিন্নাহ্ সাহেবের লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তান পরিভাষা কিংবা সে ব্যাপারে ইকবালের উল্লেখ মাত্র নেই।

লন্ডনের 'অবজার্ভার' কাগজের সমালোচক এডওয়ার্ড টমসনকে ইকবাল তাঁর 'ইসলামে ধর্মভাবনার পুনর্গঠন' শীর্ষক গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষে লিখেছিলেন, '.... পাকিস্তান আমার পরিকল্পনা নয়। আমার বক্তৃতায় (২৯ শে ডিসেম্বর, ১৯৩০এ এলাহাবাদে সারা ভারত মুসলিম লিগের বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে) আমি যা ইঙ্গিত করেছিলাম তা হল একটি মুসলিম প্রদেশ সৃষ্টি করা, ... আমার পরিকল্পনানুসারে এই (নতুন) প্রদেশ প্রস্তাবিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেরই একটি অঙ্গ হবে।'

বস্তুত পরবর্তীকালে প্রাপ্ত ইকবালের কিছু চিঠিপত্রে জানা গিয়েছিল, তিনি কেবল ভারতীয় যুক্তরাজ্যের মধ্যে পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে নিয়ে একটি স্বায়ত্ব-শাসিত রাজ্যের পক্ষ নিয়েছিলেন।

টমসনের কাছে লেখা চিঠিতে ইকবাল জানিয়েছিলেন, পাকিস্তান পরিকল্পনা মুসলিম প্রদেশ সমূহ নিয়ে গঠিত এক স্বতন্ত্র যুক্তরাজ্যের প্রস্তাব করছে, স্বতন্ত্র অধিরাজ্য হিসাবে যার সম্বন্ধ হবে ইংলন্ডের সঙ্গে। সেই পরিকল্পনার উদ্ভব কেমব্রিজে জনৈক ভারতীয় ছাত্র চৌধুরী রহমত আলির মস্তিষ্কে, যার বিশ্বাস তথাকথিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের যূপকাষ্ঠে মুসলিম জাতি বলিপ্রদত্ত হচ্ছে।

অধ্যাপক অলে আহমেদ সুরবের মতে ইকবাল মৃত্যুর আগে ১৯৩৭ সালে পাকিস্তান সম্বন্ধে তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন। ২৮ শে মে, ১৯৩৭ সালে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্-কে লেখা এক চিঠিতে ইকবাল বলেছিলেন, মুসলিম ভারতের স্বার্থে দেশের পুনর্বিন্যাস করা এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে এক বা একাধিক মুসলিম রাজ্যের পত্তন করে নেওয়া প্রয়োজন। সারা ভারত মুসলিম লিগ পৃথক পাকিস্তান সৃষ্টির বিধিসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করেন ১৯৪০ সালে, ইকবালের মৃত্যুর দু'বছর পরে। এই সব তথ্য পেশ করে সৈয়দ বারনি সাহেব প্রতিপন্ন করেছেন যে, ইকবাল পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে ছিলেন না।

কাব্যচর্চা, শিক্ষা-আন্দোলন,ধর্মভাবনা, রাজনৈতিক আন্দোলন, ভিন্নমুখী নানা কর্মকাণ্ডে প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে ধীরে ধীরে ইকবাল অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন এবং অবশেষে ২১ এপ্রিল, ১৯৩৮ সালে তাঁর প্রতিভা-দীপ্ত জীবনের অবসান ঘটে।

পরাধীনতা থেকে স্বদেশের বন্ধনমুক্তি, মুসলিম জনগণের স্বাধিকার চিন্তা, এমনকী অমুসলমান দরিদ্র কৃষকের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য ইকবাল আজীবন কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন। তবু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে শুধু ভারতের সাধারণ জনগণ কেন, স্বদেশীয় নেতৃবৃন্দের কাছে তিনি প্রায় উপেক্ষিত নাম।

সৈয়দ মুজফ্ফর হুসেন বারনি তাঁর সেই দুঃখ অপনোদনের প্রভূত প্রচেষ্টা করেছেন তাঁর ১৩২ পৃষ্ঠা-ব্যাপী ডিমাই আকারের 'Iqbal : Poet – Patriot of India' গ্রন্থে ৪ পৃষ্ঠার গ্রন্থপঞ্জি সহ। পরপর ছয়টি পরিচ্ছেদে লেখক সবিস্তারে আলোচনা করেছেন মহাকবি ইকবালের জীবন ও কাব্যে 'দেশপ্রেম, ভারতীয় দর্শন ও চিন্তার প্রভাব। পরিশেষে ইকবাল যে ভারতের কবি-দেশপ্রেমী, নিশ্চিতভাবে এই অভ্রান্ত ঘোষণায় সফল হয়েছেন।

সৈয়দ হুসেন বারনির ইংরেজি বইটির বাংলা অনুবাদ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করেছেন শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। আগাগোড়া মূলানুগ অনুবাদ করতে গিয়ে অবশ্য মাঝে মাঝেই ইংরেজি পংক্তিগুলির রচনাভঙ্গি, শব্দপ্রয়োগ এবং বাক্যবিন্যাস হুবহু অনুসরণ করে গিয়েছেন, যার ফলে মূল গ্রন্থকারের রচনাশৈলী পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হলেও বাংলা অনুবাদে স্বচ্ছতা এবং গতির অভাব অনুভূত হয়েছে। অনেক অনুচ্ছেদে বক্তব্য প্রকাশে জটিলতা এবং প্রয়োজনীয় বিরাম-চিহ্নের অনুপস্থিতি অনূদিত অংশবিশেষের অধ্যয়ন বিলম্বিত এবং অন্তর্নিহিত রসগ্রহণ ও মর্ম অনুধাবন অযথা বিলম্বিত করে। তুলনায় অনুবাদে বাক্যগঠন ও শব্দবন্ধ প্রয়োগে অনুবাদকের আপন ভাষায় প্রকাশের দুর্বলতা প্রকট হয়ে

পড়েছে। এবং অনুবাদ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট স্কটিশ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়ালটার স্কটের কথায় "In most translations, the noble translation is from gold into lead" পরিহাসটি মনে করিয়ে দেয়।

তবে মূল গ্রন্থটির নির্দেশিকা, টীকা, গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদি অনূদিত অংশে সঠিকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে অনুবাদক যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করে বাড়তি টীকা সংযোজন করেছেন পাদটীকা রূপে। প্রারম্ভে অনুবাদকের নিজস্ব ভূমিকাটিও অত্যন্ত মূল্যবান, কিন্তু সেখানেও প্রায়শ ভাষায় জটিলতা সৃষ্টি করে পাঠককে উদ্বিগ্ন করেছেন অনায়াস সহজবোধ্যতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কোনও কোনও সময়ে মনে হতে পারে ভূমিকাটি ইংরেজি থেকে ভাষান্তরিত এবং ইংরেজি রচনাপদ্ধতি ও বাক্যবিন্যাস অনুসরণ করেছে। কখনও মনে হয় অন্য ভাষার অগোছালো অনুবাদ পড়ছি। কিছু কিছু অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ ব্যবহারেও অনুবাদকের ঝোঁক লক্ষ করা যায়, যা কখনও কখনও অন্য আধুনিক শব্দসংযোগের পাশে শ্রবণ-কটু হয়ে পড়েছে। যেমন যবিষ্ঠ, বিশ্রব্ধ, অন্যান্য ইত্যাদি। কিছু অভিধান বা শব্দকোষ বহির্ভূত নতুন শব্দ যেমন প্রাবরণ, প্রমিল, প্রমূল্য, প্রণোদনা, উদ্‌বেজনা, হলক, দেশনা ইত্যাদি সৃষ্টি এবং প্রয়োগে অনুবাদকের ঝোঁক লক্ষণীয়। অনাবশ্যক দুর্বোধ্য এবং দুরূহ শব্দব্যবহার করে জটিলতা সৃষ্টির কী আবশ্যকতা আছে আমার জানা নেই। এই অনুবাদগ্রন্থে এমন অনেক অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের ব্যবহার ঘটেছে যা সাধারণ পাঠকের পক্ষে কর্ণ ও চক্ষুপীড়ার কারণ বলে মনে হতে পারে। অনুবাদকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখেও এ কথা উল্লেখ করা যায়। অনুবাদে বেশ কিছু ক্ষেত্রে তথ্যভ্রান্তি, তথ্য পরিবেশনে ত্রুটি এবং মুদ্রণপ্রমাদ গ্রন্থটিকে ভারাক্রান্ত করেছে।

অনুবাদ গ্রন্থটির প্রকাশ তথ্যের পৃষ্ঠাতে লেখা আছে, ডক্টর সৈয়দা সয়িদায়িন হমিদ-এর ইংরেজি অবলম্বনে। এই বাক্যবন্ধ পাঠে মনে হয়, সৈয়দ মুজফ্‌ফর হুসেন বারনির বইটি তাঁর মূল ভাষণের ডক্টর হমিদ-কৃত ইংরেজি ভাষান্তর মাত্র, যেটি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয়বার বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। কিন্তু বারনি সাহেবের ভাষণটির পুরোপুরি ইংরেজি অনুবাদ ড. হমিদের, এ বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ ঘটে যখন দেখি, মূল ইংরেজি বইটিতে অনুবাদকের কোনও আলাদা ভূমিকা পরিবেশিত হয়নি। শুধুমাত্র বইটির 'টাইটেল পেজে' মূল গ্রন্থকারের নামের নীচে মুদ্রিত — Translated in English by Dr. Sayeda Saidjidain Hameed. কিন্তু সৈয়দ বারনি সাহেবের ভূমিকায় প্রকাশ, ড. হমিদ ইকবালের উর্দু ও ফার্সি কয়েকটি পদ ও কবিতার চমৎকার ইংরেজি ভাষান্তর করে দিয়েছেন এই মাত্র।

লক্ষনীয়, ডক্টর হমিদের বাংলা নামে বিভিন্ন বানান-বিভ্রাট। প্রথমে লেখা, 'সৈয়দা সয়িদায়িন', পৃ. ২৩ এ হয়ে যাচ্ছে 'সৈয়েদা সয়িদায়িন' এবং পরে পৃ. ২৬এ 'সায়েদা সয়িদাঈন'। মনে হয়, অনুবাদক নিশ্চিত নন, কোনটি সঠিক। উর্দু উচ্চারণ অনুসারে 'সৈয়েদা' সঠিক বিবেচিত হলেও, সৈয়দা কথাটিও চলতে পারে। সায়েদা অথবা সয়িদাঈন নিশ্চিত নয়।

পৃ.১এ 'বলাৎকারীর ঝটক' পৃ. ৩২এ 'বলাৎকারীর ঝটকা' তে রূপান্তরিত হয়ে পাঠকের মনে দোলাচল সৃষ্টি করতে পারে। পৃ. কোনটি শব্দ 'পৈগাম' না 'পয়াম'? পৃ. ১১এ 'জিব্রিল পৃ. ২১এ 'জিবরিল', পৃ ১১৮ তে জিব্রায়েল, কোনটি সঠিক? পৃ. ১৯এ, 'দিভিনা কোমেদিয়া' পৃ. ৫৯এ 'ডিভাইন কমেডি'। যে কোনও একটি উচ্চারণ বাঞ্ছনীয় একই বইতে, হয় ইতালীয়, নতুবা ইংরেজি। পৃ. ৩এ 'পারস্যের অধ্যাত্মবিদ্যার ক্রমবিকাশ', পৃ. ৭৮এ 'পারস্য দেশে দর্শন শাস্ত্রের বিকাশ' গবেষণা পত্রে কোনটি সঠিক? সম্ভবত দ্বিতীয়টি। উপযুক্ত সংশোধনের অপেক্ষা রাখে উৎসুক পাঠক ও গবেষণাকারীর প্রয়োজনে অথবা আগ্রহে।

পৃ. ২এ- 'সত্য বটে, এক দেশ হয়ে দুর্যোগের, শত্রুর মুখোমুখি হবার আগে ততদিনে বোঝাপড়া শুরু হয়ে গেছে নিজেদের দুইয়ে দুইয়ে'- একটু বিভ্রান্তির উদ্রেক করে, কাদের মধ্যে বোঝাপড়া? 'রবীন্দ্রনাথ-ইকবাল', 'হিন্দু-মুসলিম', 'গান্ধী-জিন্নাহ' অথবা 'রোমান্টিক জাতীয়তা বনাম পশ্চিমের আগ্রাসী 'ন্যাশনালিজম'? পৃ. ১এ-'বাঙ-ই-দিবা, পৃ৩এ বাঙ-এ-দিবা, পৃ. ৬এ 'বাঙ্‌-এ-দিবা, পৃ. ২৯এ 'বাঙ-এ-দিবা', পৃ ১৫০এ 'বাঙ্‌-এ-দিবা' কোনটি সঠিক? আমার মনে হয়, 'বাঙ-এ-দারা' পৃ. ২২এ 'সাদা কালো কামলা' কী 'সাদা কালো কমলা'? আবার পৃ. ২২এ 'প্রাচ্যের নিষ্কলা আত্মা' কী 'নিস্ফল আত্মা'। অথবা অখণ্ড আত্মা বা ব্রহ্ম পুরুষ প্রকৃতি ভেদে 'নিস্ফলা' হয়েছে? পৃ. ৩৫এ কখনও 'হিন্দি', কখনও 'হিন্দী'। পৃ. ৩৮এ 'নয়া শবালা' নিশ্চয় 'নয়া শিবালা' হবে? পৃ. ৫২তে 'ঐকাত্ম্য', পৃ. ৮০তে 'একাত্ম', পৃ. ১৫১ 'একাত্ম্য'। একাত্মবোধ হতে পারে 'একাত্মা' অথবা 'ঐকাত্ম্য'তে। বানানবিভ্রাটের এমনই অসংখ্য নজির আছে।

যেহেতু 'সাহিত্য অকাদেমি' থেকে প্রকাশিত এই অনুবাদ-গ্রন্থ, অনুবাদক অথবা সাহিত্য অকাদেমির পক্ষ থেকে কেউ যদি সম্পাদনা করে থাকেন কিংবা ভুল সংশোধন করে থাকেন, 'ইকবাল-ভারতের কবি-দেশপ্রেমী' গ্রন্থটি প্রকাশের আগে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করাতে ত্রুটি ঘটেছে। অবশ্য 'মুদ্রাকরের শয়তান' তো অলক্ষ্যেই কাজ করে।

অনুবাদক মূল উর্দু থেকে ভাষান্তর করেছেন বলে দাবি করেছেন, অবশ্য এ কথাও জানিয়েছেন,-সে ক্ষেত্রে ড. হমিদের তরজমা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ছিল। অন্যান্য অনুবাদকের কাছে স্বভাবত উনি ঋণী নন। উপযুক্ত অভিভাবকতার অভাবে পাঠোদ্ধারে কিছু ভুল থাকতে পারে বলে তিনি জানিয়েছেন। সম্ভবত সে জন্যে কিছু মূল উর্দু অথবা ফারসি শব্দ থেকেই গেছে।

এ কথা অনস্বীকার্য, শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ইকবাল অনুবাদে গভীর অধ্যবসায়, আন্তরিক অনুরাগ এবং কঠিন পরিশ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর ভূমিকাতে মহাকবি ইকবালের দশটি কাব্য এবং একটি গ্রন্থের উল্লেখ করে থাকলেও, গ্রন্থগুলির একটি সুসংবদ্ধ তালিকা এবং কোনটি কোন ভাষাতে লেখা, তা কালানুক্রমে সংযোজিত করলে ধন্যবাদার্হ হতেন।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় মোটামুটি অনুবাদকের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ইকবালে আগ্রহী এবং অনুসন্ধিৎসু মানুষের কাছে 'ইকবাল — ভারতের কবি-দেশপ্রেমী' এক সানন্দ প্রাপ্তি। এক চিরন্তন গৌরবের উজ্জ্বল উদ্ধার মহাকবি শেখ মুহম্মদ ইকবাল।

বইটির ছাপা, বাঁধাই, কাগজ ও প্রচ্ছদ মনোরম।

ইকবাল : ভারতের কবি-দেশপ্রেমী — সৈয়দ মুজফ্‌ফর হুসেন বারনি/অনুবাদ, শ্রী দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়/সাহিত্য অকাদেমি/৮০.০০

বাংলাদেশের অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর কথা

অমিতাভ চন্দ্র

বর্ণভিত্তিক ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক হিন্দুসমাজে যুগ যুগ ধরেই সর্বাপেক্ষা নিম্নবর্ণ শূদ্র জনগোষ্ঠী চরমতম নিপীড়ন ও শোষণের শিকার। বঞ্চনা-অবহেলা এই অন্ত্যজ শূদ্রদের নিত্যসঙ্গী, উচ্চবর্ণের চোখে তারা প্রায় মনুষ্যেতর প্রাণীরই পর্যায়ভুক্ত। নিপীড়িত-শোষিত এই অন্ত্যজ শূদ্র জনগোষ্ঠী সব রকমের অধিকার থেকেই বঞ্চিত— তারা মন্ত্রহীন। বর্ণভিত্তিক ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক হিন্দু সামাজিক অচলায়তনে তাদের প্রায় মানুষ হিসাবে গণ্য হবার নূন্যতম স্বীকৃতিটুকুও জোটে না। 'আমি শূদ্র, আমি মন্ত্রহীন : বাংলার সংখ্যালঘু নিম্নবর্ণের কথা' নামক বইতে কঙ্কর সিংহ এই মন্ত্রহীন অন্ত্যজ শূদ্র জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বহুমুখী আলোচনা করেছেন।

লেখক কঙ্কর সিংহ আলোচনার গোড়াতেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর 'আমি শূদ্র, আমি মন্ত্রহীন' কোনও গবেষণামূলক গ্রন্থ বা তাত্ত্বিক আলোচনাগ্রন্থ নয়। এই গ্রন্থে বর্তমান বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীভুক্ত নিম্নবর্ণীয় ব্রাত্যজনদের, অন্ত্যজ শূদ্র হিসাবেই যাঁদের পরিচিতি, কথা আলোচনা করলেও, ধারাবাহিক কোনও ইতিহাস রচনা করার প্রয়াস এখানে গ্রহণ করা হয়নি। কোনও তত্ত্বকথাও লেখক এখানে বলতে চাননি। এই শোষিত জনসমষ্টি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক ভারতের ধর্ম, সাহিত্য, পুরাণ, ইতিহাস, সমকালীন সমাজ, রাজনীতি সবকিছু নিয়েই ভেবেছেন। সেই ভাবনাচিন্তার স্বাক্ষর স্বীয় অঙ্গে ধারণ করে আছে আমাদের আলোচ্য এই বইটি।

গ্রন্থের একেবারে প্রথম অধ্যায়ে লেখক মন্ত্রহীন শূদ্র বলতে কাদের বোঝাচ্ছেন, সেই প্রসঙ্গটির আলোচনা করেই চলে গেছেন প্রথম বিদ্রোহী গৌতম বুদ্ধের মহান ভূমিকার আলোচনায়। বেদ ও ব্রাহ্মণকে প্রথম অস্বীকার করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ। তিনি তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন বহু মানুষের হিতের জন্য, বহু মানুষের সুখের জন্য, মানুষের প্রতি করুণাবশত, বৃহৎ জনসমাজের স্বার্থে। গৌতম বুদ্ধই ছিলেন পৃথিবীর প্রথম ধর্মবিপ্লবী। তাঁর কাছে আশ্রয় মিলেছিল সকল দলিত-পতিত-লাঞ্ছিত-নিপীড়িতের। ভারতে যে বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন, মুক্তি দিয়েছিলেন শূদ্রদের, তাঁর মহাপ্রয়াণের কয়েক শত বছরের মধ্যেই হিন্দু ধর্মের নব্য দর্শন প্রচারীরা সেই সবই বাতিল করে দিয়েছিলেন। শূদ্রদের পুনর্বার চরম সামাজিক লাঞ্ছনা-শোষণ-নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছিল। ভারত থেকে বিতাড়িত হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্ম। আর অপরদিকে বুদ্ধের ধর্মবিপ্লবী ভূমিকাকে মুছে দিয়ে তাঁকে হিন্দুদের অবতার তত্ত্বে আত্তীকরণ করে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন বর্ণভিত্তিক ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক হিন্দু সামাজিক অচলায়তনের রক্ষকেরা।

পরবর্তী অধ্যায়ে সমন্বয়বাদী, ভক্তিবাদী, বাংলার পতিত, দলিত শূদ্রদের উদ্ধারকারী শ্রীচৈতন্যের মহান ভূমিকার যথাযোগ্য স্বীকৃতি জানিয়েও লেখক দেখিয়েছেন, এমনকী শ্রীচৈতন্যও ভাঙতে পারেননি ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র। লেখকের মতে প্রস্তরীভূত হয়ে ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছেন হিন্দু সমাজের জাতপাতের নিগড় ভঙ্গকারী, প্রেম ও করুণার প্রতিমূর্তি শ্রীচৈতন্য।

পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে লেখক শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন রাজা রামমোহন রায়ের এবং বিদ্যাসাগরের ভূমিকাকে, দেখিয়েছেন বাংলার ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা, তাঁর লেখায় আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকৃত হয়েছে মানব ইতিহাসে 'মহত্তম মহিমায় চিহ্নিত' স্থানের অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা ও অবদান। এই গ্রন্থের প্রতিটি পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেই যে উদ্ধৃতি আছে, তা রবীন্দ্রনাথের। লেখকের মতে রবীন্দ্ররচনার মহাসাগর থেকে কিছু তুলে নেওয়া মানে আসলে নিজেকেই ধন্য করা।

লেখক দেখিয়েছেন 'যত মত তত পথ'-এর বৈপ্লবিক উচ্চারণকারী শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দু সমাজের জাতব্যবস্থাকে অপছন্দ করেননি, বরং কঠোরভাবেই তিনি তা মেনে চলেছেন। লেখকের

মতে শূদ্রদের ঘরে কখনও যাননি তিনি, যেতে পারেননি, আর এই না পারাটা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল, আর তাই লেখকের মন্তব্য, অন্ত্যজ ব্রাত্যজনেরা সেই কারণেই কোনও আকর্ষণ অনুভব করেননি তাঁর কাছে ছুটে যেতে। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসংস্কার আন্দোলনকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁরই প্রিয়তম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দই প্রাচ্যের রামকৃষ্ণকে নিয়ে গিয়েছিলেন পাশ্চাত্যে। সুস্পষ্টভাবেই বিবেকানন্দ শূদ্রদের জাগরণের কথা বলেছেন। শূদ্রদের কথা ভেবেই স্বামী বিবেকানন্দ নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে দাবি করেছেন, স্বীকার করেছেন শূদ্রদের কল্যাণ সমাজতন্ত্রেই নিহিত। শূদ্রদের কল্যাণের জন্য ধর্মকেও খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেননি তিনি। স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছেন ভবিষ্যৎ ভারতে শূদ্রশাসন। কিন্তু লেখকের মতে বিবেকানন্দ বর্ণব্যবস্থা বিলুপ্ত করতে চাননি। লেখক মন্তব্য করেছেন যে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বর্ণবাদের বেড়া বিবেকানন্দ ভাঙ্গতে চাননি। লেখকের অভিমত অনুযায়ী স্বামী বিবেকানন্দ বারংবার হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের বর্ণব্যবস্থার ভাল দিকগুলি খুঁজে বেড়িয়েছেন। তাঁর মতে বিবেকানন্দ শূদ্রকে শূদ্র হিসাবেই অবস্থান নিয়ে অপেক্ষা করতে বলেছেন ভবিষ্যতের জন্য। লেখকের মন্তব্য, আগামী ভারতে শূদ্র শাসনের বলিষ্ঠ উচ্চারণ করেও বিবেকানন্দ ব্রাহ্মণ্যবাদের বাইরে পা রাখতে পারলেন না, ফিরে গেলেন বর্ণবাদের সংরক্ষকের ভূমিকা পালনে।

লেখকের মতে ভারতে হরিজন আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীও কোনও কালজয়ী অবদান রাখতে পারেননি। লেখকের অভিমত — অসাধারণ এক জীবনযাপন করা সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধীর জীবন ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মের বর্ণবাদের বন্ধনে আবদ্ধ, তাঁর মতো এক মহাপ্রাণও সেই বন্ধন থেকে বাইরে চলে আসতে পারেননি।

লেখক আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করেছেন অন্ত্যজ শূদ্রদের অধিকার অর্জনের জন্য মহারাষ্ট্রের গৌরব জোতীবা গোবিন্দরাও ফুলের এবং তাঁর প্রয়াস দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের অসামান্য ভূমিকার কথা। অস্পৃশ্যদের সম্প্রদায়ভুক্ত অসাধারণ এই দুই সংগ্রামী তাঁদের জীবন নিয়োজিত করেছিলেন শোষিত-নিপীড়িত মানুষদের মুক্তির জন্য। উভয়েই ব্রাহ্মণ্য সমাজবিধানের প্রতি সারা জীবন পোষণ করেছেন তীব্র বিদ্বেষ এবং ঘৃণা। উভয়েই ভারতে বিদেশি ব্রিটিশ শোষকদের চেয়ে অধিকতর নির্মম শোষক রূপে দেখেছিলেন এ দেশেরই ব্রাহ্মণদের। আর সেই কারণেই তাঁদের কাছে মনে হয়েছিল বিদেশি ব্রিটিশ শাসনই ব্রাহ্মণদের বর্বর ও অমানবিক সামাজিক শাসন-শোষণ থেকে দলিত শূদ্রদের উদ্ধার করতে পারে। আর তাই তাঁদের আনুগত্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের প্রতি, কারণ তাঁরা মনে করতেন ইংরেজরাই ভারতে নিম্নবর্ণীয় অন্ত্যজ মানুষদের বন্ধু। অস্পৃশ্য দলিত জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারে ফুলের ও আম্বেদকরের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা সম্ভবত অনিবার্যই ছিল। এর জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণাধীন ভারতের বৃহত্তর পরাধীন জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা-আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার অভিযোগে তাঁদের অভিযুক্ত করা সম্ভবত ইতিহাসের সঠিক পাঠ বা বিচার নয়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অন্ত্যজ শূদ্ররা সম্পৃক্ত থাকেননি। এর জন্য তাঁদের দোষারোপ করা নিতান্তই অন্যায়। এই আন্দোলনে অন্ত্যজ শূদ্রদের অংশগ্রহণ না করার কারণ ছিল। সমগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনই অস্পৃশ্য দলিতদের চোখে ছিল সম্পূর্ণভাবেই উচ্চবর্ণীয় এক আন্দোলন, যার উদ্দেশ্যই ছিল উচ্চবর্ণের জন্যই যাবতীয় সুযোগসুবিধা আদায়। উচ্চবর্ণের দাবিদাওয়া-আশা-আকাঙ্ক্ষা আর নিম্নবর্ণের চাহিদা-আশা-আকাঙ্ক্ষা কখনওই এক সূত্রে গ্রথিত হয়নি। আর সেই কারণেই নিম্নবর্ণীয় অন্ত্যজ শূদ্রেরা কোনও দিনই এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে তাঁদের নিজেদের আন্দোলন বলে গ্রহণ করতে পারেননি। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে তাঁদের মনে নিরন্তর সক্রিয় ছিল সন্দেহ ও অবিশ্বাস, কারণ এই আন্দোলন উচ্চবর্ণীয় হিন্দু ভদ্রলোকেদের সঙ্গেই একাত্ম হয়ে উঠেছিল। এটাই ছিল আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা, কারণ তা নিম্নবর্ণীয় দলিতদের বিশ্বাস অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল। এই সীমাবদ্ধতার দায়িত্ব উচ্চবর্ণেরই, কারণ তাঁদেরই উচিত ছিল নিম্নবর্ণীয় দলিতদের চাহিদা-আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত করে তাঁদের এই আন্দোলনে টেনে নেওয়া।

গভীর আক্ষেপের সঙ্গেই লেখক উল্লেখ করেছেন, মার্কসবাদে দীক্ষিত এবং মজুর-শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থে সংগ্রামরত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বেও স্বল্প কয়েকটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া কখনওই অন্ত্যজ দলিত শূদ্রদের দেখা যায়নি। লেখক মন্তব্য করেছেন যে সকল মার্কসবাদী দলের নেতৃত্বই থেকে গেছে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের হাতে। লেখকের কাছে এ এক গভীর পরিতাপের বিষয়। লেখকের মতে, এর কারণ কী, সেই 'প্রশ্নের উত্তরও সহজ নয়।'

এই গ্রন্থে লেখকের বর্ণনায় আমরা ইতিহাসের এক ট্র্যাজিক নায়ক হিসাবে পাই বাংলার তপশিলি ফেডারেশনের অবিসংবাদী নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে। নিম্নবর্ণভুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তাঁর তপশিলি ফেডারেশনের সদস্যদের নিয়ে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লিগ মন্ত্রীসভায় ক্যাবিনেট মন্ত্রীরূপে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালে ভারতের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল যোগ দিয়েছিলেন মন্ত্রী হিসাবে। মুসলিম লিগের সদস্য না হয়েও, বাংলার মুসলমানদের

প্রতিনিধি হিসাবেই যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল যোগ দিয়েছিলেন সেই অন্তর্বর্তী সরকারে। এটাই ছিল তাঁর প্রতি মহম্মদ আলি জিন্নাহ্-এর দান, আর সেই দান তিনি গ্রহণ করেছিলেন চরম আনুগত্যের সঙ্গেই। পাকিস্তানের প্রতি যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। তাঁর সার্বিক অবস্থানই ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বিরুদ্ধে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর সেই দেশের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় তিনি আইনমন্ত্রী হয়েছিলেন। পাকিস্তান গণ পরিষদে এক দিনের অস্থায়ী সভাপতিও তিনি হয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁকে পদ দেওয়া হয়েছিল, মর্যাদা দেওয়া হয়নি, আর ক্ষমতা তো দেওয়াই হয়নি। দেশবিভাগপরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর চরম আক্রমণ ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ১৯৫০ সালের ৯ অক্টোবর লিয়াকত আলি খানের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। শুধু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগই নয়, তাঁকে দেশত্যাগ করে আশ্রয় নিতে হয়েছিল পশ্চিমবাংলায়। পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণ ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, যা চরমে পৌঁছেছিল ১৯৫০ সালে, তার মর্মস্পর্শী বিবরণ রেখে গেছেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানে শুধু মাত্র উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নয়, নিম্নবর্ণভুক্ত অন্ত্যজ হিন্দুদের জন্যও যে কোনও সম-মর্যাদার আসন নেই, তা দেরিতেই বুঝেছিলেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ইতিহাসের এক ট্র্যাজিক নায়ক হিসাবে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের ছবিটিই লেখকের কলমে ফুটে উঠেছে এই গ্রন্থে।

দেশবিভাগপরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানে অন্ত্যজ শূদ্ররা, যাঁদের সরকারি নাম ছিল তপশিলি সম্প্রদায়, হারিয়েছিলেন সব রকমের অধিকার। পূর্ব পাকিস্তানে নিম্নবর্ণীয় শূদ্ররা দ্বৈত বঞ্চনা ও শোষণের শিকার হয়েছিলেন। এক দিকে বর্ণভিত্তিক ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সমাজের নিজস্ব সামাজিক অবহেলা-বঞ্চনা-শোষণ তো ছিলই। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হিসাবে ইসলামি রাষ্ট্রীয় বঞ্চনা ও শোষণ এবং মুসলিম মৌলবাদীদের নিপীড়ন-নির্যাতন। বাংলাদেশ সৃষ্টির পরেও এই দ্বৈত বঞ্চনা ও শোষণের অবসান ঘটেনি, কারণ বাংলাদেশেও নিম্নবর্ণীয় শূদ্ররা ফিরে পাননি তাঁদের হারিয়ে যাওয়া অধিকার। বর্তমান বাংলাদেশেও অন্ত্যজ শূদ্রদের ওপর একদিকে বর্ণবাদী-ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সামাজিক শোষণ তো আছেই, আর একই ভাবে অব্যাহত আছে পূর্বের পাকিস্তান আমলের মতোই মুসলিম মৌলবাদী অত্যাচার ও নিপীড়ন। এর পরিণতিতে বর্তমানে বাংলাদেশে নিম্নবর্ণীয় এই শূদ্রদের পিঠ একেবারেই ঠেকে গেছে দেওয়ালে, কারণ তাঁদের কোনও সহায় নেই, বঞ্চিত-নির্যাতিত হওয়া ছাড়া তাঁদের সামনে আর কোনও পথই খোলা নেই। লেখক কঙ্কর সিংহ তাঁর বই শেষ করেছেন এই অমোঘ প্রশ্নটি তুলে : 'এরপর তাঁরা (শূদ্ররা) কি করবেন?' লেখক নিজেই জানিয়েছেন: 'এই প্রশ্নের উত্তর বড় কঠিন।'

লেখক তাঁর এই বইতে বহু বিষয়ের অবতারণা করে তাঁর আলোচনাকে বহুমুখী করে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করায় বেশ কিছু ক্ষেত্রেই আলোচনায় গভীরতার অভাব দেখা গেছে। বিষয়ের গভীরে ঢোকেননি লেখক, ফলে আলোচনা থেকে গেছে ওপর ওপর, ভাসা ভাসা। বেশ কিছু ক্ষেত্রেই বিশ্লেষণের পরিবর্তে প্রাধান্য পেয়েছে নিজস্ব মন্তব্য। লেখক অবশ্য এই গভীরতার অভাবের কথা 'পূর্ব কথা'য় স্বীকারও করেছেন। বইটিতে মুদ্রণ প্রমাদেরও আধিক্য আছে। এই বিষয়ে অবশ্যই আরও বেশি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন ছিল। সব মিলিয়ে এই রকম একটি প্রয়োজনীয় তথ্যবহুল বই পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আলোচক হিসাবে লেখক কঙ্কর সিংহকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমি শূদ্র, আমি মন্ত্রহীন : বাংলার সংখ্যালঘু নিম্নবর্ণের কথা— কঙ্কর সিংহ/ র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা-৯/৮০.০০

উপেক্ষিত প্রতিভা ওয়ালীউল্লাহ

পার্থ ঘোষ

তিনটি উপন্যাস, অর্ধশতাধিক গল্প, তিনটি নাটক, ছড়ানো-ছিটোনো আরও কিছু অগ্রন্থিত রচনা — একটি জীবন! এমন এক সময়ে সে জীবন যদি নিভে যায় যখন তার সব থেকে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠবার কথা ছিল, তা হলে তো পরিতাপের সীমা থাকে না! সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তেমনই একটি নাম বললেই বোধহয় সব বলা হয় না। তিনি বাংলা সাহিত্যের উপেক্ষিত অথচ প্রতিভাবান কথাশিল্পীদের অগ্রগণ্য, এ কথাও এই সংগেই স্বীকার করে নিতে হয়।

'লালসালু' থেকে 'চাঁদের অমাবস্যা' হয়ে ওয়ালীউল্লাহ-র শেষ উপন্যাস 'কাঁদো নদী কাঁদো'। জীবনের একটা বড় অংশই যাঁর কেটে গেছে প্রবাসে, তাঁর পক্ষে বহুপ্রজ হওয়া হয়ত সে কারণেই সম্ভব ছিল না। বাংলা সাহিত্যের বর্তমান লেখকদের

বিপুল রচনা সম্ভারের সঙ্গে তুলনা করলে এ কথা মনে হতেই পারে, কিন্তু মাত্র ৪৯ বছরের জীবনে ওয়ালীউল্লাহ (বন্ধুরা আদর করে ডাকতেন ওলি) যা অর্জন করেছিলেন তা-ও বড় কম নয়। ১৯৩৯ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র থাকাকালে ওই কলেজের বার্ষিকীতে ওয়ালীউল্লাহ্-র প্রথম ছোটগল্পটি প্রকাশিত হয়। যার নাম 'সীমাহীন এক নিমেষে'। পরবর্তী দীর্ঘ ৩২ বছরের সাহিত্যজীবনে এই অসামান্য লেখক অবশ্যই সীমাহীন, বলগাহীন গতিতে কলম ছোটাননি। যা লিখেছেন তা-ও কিন্তু এক হিসাবে বড় কম নয়। জীবিতাবস্থায় খ্যাতি যতটা না পেয়েছেন, ওঁর প্রয়াণের পরে পরিচিতিটা ছড়িয়েছে আরও অনেক বেশি। তবে তার প্রধান কারণ সম্ভবত স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র মৃত্যুর মাস দুই-এর মধ্যেই তাঁর মাতৃভূমির মুক্তিলাভ ঘটে। যা তাঁর দেখে যাওয়া হয়নি আর এইটাই বোধ করি স্বভাবত স্বতন্ত্র এই লেখকের জীবনের সব থেকে বড় ট্র্যাজেডি।

সৈয়দ আবুল মকসুদ-এর লেখা "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন সাহিত্য' পড়ে এমনই প্রতীতি হয়। এই ব্যতিক্রমী সাহিত্যসাধকের জীবনী রচনার জন্য এ বই লেখা হয়নি। তাঁর সাহিত্য নিয়ে আলোচনাও এই গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য নয়। একজন লেখক ও তাঁর সাহিত্যকে কখনওই তাঁর ব্যক্তিজীবন থেকে আলাদা করে দেখা চলে না। সৈয়দ আবুল মকসুদ সে কথা জানেন আর সে জন্যই তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র ৪৯ বছরের জীবন ও তাঁর সাহিত্যকীর্তির পাতায় পাতায় ঘুরে ফেরে নতুন এবং অজানা আরও কোনও তথ্যের সন্ধানে। মকসুদ অত্যন্ত নির্মোহ দৃষ্টিতে ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্যের প্রতি আলোকপাত করতে চেয়েছেন। প্রকৃত গবেষকের সন্ধিৎসা তাঁকে সেই দিকেই চালিত করেছে।

এই কাজে তাঁর সাফল্যের পরিচয় মেলে ওয়ালীউল্লাহর সঠিক জন্মতারিখ নিরূপণে। যে অসাধারণ নিষ্ঠা আর আন্তরিকতায় মকসুদ ওয়ালীউল্লাহকে তুলে ধরেছেন। বাংলায় জীবনীগ্রন্থ বলতে এক স্কুলপাঠ্য বই ছাড়া তেমন কিছু পাওয়া যায় না। ইদানীং অবশ্য দু'একটি ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ চোখে পড়ে। সেই ব্যতিক্রমের তালিকায় মকসুদের এই সুবৃহৎ রচনাটি অবশ্যই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাবে। ১৯৮১-এ বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ড এবং ১৯৮৩ তে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবার পর ২০০০ সালের অকটোবরে এই যে গ্রন্থটি প্রকাশ লাভ করে সেটি কেবল অখণ্ড সংস্করণই নয়, সম্পূর্ণ পুনর্লিখিতও বটে।

১৯৪৯-এ তাঁর প্রথম এবং সব থেকে জনপ্রিয় উপন্যাস 'লাল সালু' প্রকাশিত হবার বছরেই ওয়ালীউল্লাহ মাতৃভূমি ছেড়ে পেশাগত কারণে অন্যত্র যাত্রা করেন। পাঁচ বছর বাদে একবার ঢাকায় ফিরে বছর দেড়েক সেখানে কাটাবার পর আবার কর্মসূত্রে বিদেশে পাড়ি দেন এবং আমৃত্যু বাইরেই কাটান। এমন একজনের জীবন ও সাহিত্যকর্ম নিয়ে লেখার জন্য যে যে উপকরণ প্রয়োজন হয়, তা সংগ্রহ করা অত্যন্ত সময়সাধ্য এবং দুরূহ। মকসুদ যে নিপুণতায় ওয়ালীউল্লাহের জীবনের অপ্রচারিত সময়গুলোকে ধরেছেন, তাঁর ব্যক্তিজীবনের নানা মুহূর্ত যেভাবে ওঁর রচনায় উদ্ভাসিত হয়েছে, সে জন্য শুধু সাধুবাদই যথেষ্ট নয়। তিনি শওকত ওসমানের দিনপঞ্জি দেখার বিরল সুযোগ পেয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু এ ছাড়াও সানাউল হক, আলী আহসান কিংবা নাজমুল হুদা অথবা গোলাম কুদ্দুস-এর মতো আরও বহুজনের কাছ থেকে তিনি অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

তবে জীবনের ছবিটি সার্থকভাবে আঁকার পাশাপাশি সাহিত্য-অংশে লেখকের মুন্সিয়ানার কিছুটা অভাব চোখে পড়ে। উদ্ধৃতির বহুলতা এবং বহু ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘ উদ্ধৃতি পাঠের গতিকে ব্যাহত করে। এরই পাশাপাশি কিছু কিছু স্বতঃপ্রণোদিত মন্তব্যও অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টির আশংকা জাগায়। 'ক'-এর সাহিত্যকে রসোত্তীর্ণ বলতে গিয়ে যদি 'খ'-এর সৃষ্টিকে খাটো করতে হয়, সেটি সার্থক নয় বলে রায় দিতে হয়—তা হলেই 'ক'-এর কৃতিত্বটা বেশি হয়ে যায় কি? সাহিত্যের আঙিনায় সকলেরই প্রবেশ অবাধ, স্রষ্টা সেখানে অহরহ পাঠকের মুখোমুখি। যে রচনা সত্যিই সার্থক, তাকে নিয়ে কোনও সার্টিফিকেটেরই প্রয়োজন হয় না।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য - সৈয়দ আবুল মকসুদ/তাম্রলিপি, ঢাকা-১২০৫/পরিবেশন - নয়াউদ্যোগ কলি-৬/৩০০.০০

দর্পণে দুই মুখ

অজিত বাইরী

একজন কবির নিজস্ব ভূমি স্পর্শ করার মধ্যে গভীর আনন্দ আছে। একটি কাব্যগ্রন্থের পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে মনে হয়, আমি একটি জীবনকেই অন্বেষণ করে চলেছি প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠায়। আমি একটু একটু করে স্পর্শ করতে চাইছি, তাঁর মগ্নতা, তাঁর নির্জনতা। এবং আমি একাত্ম হতে চাইছি তাঁর সেই বিরল মুহূর্তের অর্জিত অনুভূতির সঙ্গে। এই যে একজন কবির চয়িত পঙক্তিমালার মধ্য দিয়ে আত্মীয়তার উপলব্ধি, তা যেন অন্য ভাবে নিজেরই আত্মার পুষ্টিসাধন।

যে কোনও কাব্যগ্রন্থ হাতে নিয়ে আমি যখন মুদ্রিত অক্ষরমালায় চোখ রাখি, তখন অনুরূপ অনুভূতিই আমার ভেতরে সংক্রামিত হয়। এবং আমি সচেষ্ট ভাবেই একটির পর একটি কবিতা পড়তে পড়তে কবির জীবন-চর্চার গতিপ্রকৃতি, মনোভূমির অবস্থানটি বুঝে নিতে চাই। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে কবি-জীবনের আঁচটুকু উপলব্ধি করতে প্রলুব্ধ হই।

দু'খানি কাব্যগ্রন্থ একটি কবি মণিভূষণ ভট্টাচার্যর 'পাঠ্যগ্রন্থের ভূমিকা', অন্যটি কবি ঈশ্বর ত্রিপাঠীর 'জন্মদিনের কবিতা'। দুই কবিই কবিতার সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন। 'গান্ধী নগরে রাত্রি'র কবি মণিভূষণ ভট্টাচার্যর নতুন করে পরিচিত দেবার প্রয়োজন দেখি না। তাঁর কবিতায় প্রতিবাদের ভাষা যেমন ঋজু তেমনই ব্যঞ্জনাধর্মী। রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের অসঙ্গতি তাঁর কলমে সংহত রূপ পেয়েছে কাব্যের তির্যক ভাষায়। সে সব কবিতা খুবই সমাদৃত পাঠকদের কাছে। হয়ত কিছুটা সোচ্চার এবং জনমুখী। কিন্তু সে-সব কবিতায় পাঠকরা সময়ের উত্তাপ অনুভব করেছেন। প্রতিবাদী স্বর তাঁদের সংক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ উসকে দিয়েছে। মণিভূষণ ভট্টাচার্যর কবিতার সে একটি ভিন্নতর অধ্যায়। সেখানে তারুণ্যের বিদ্রোহ সোচ্চার।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে তাঁর প্রতিবাদী ভূমিকা প্রত্যক্ষ নয়। প্রচ্ছন্ন। মেঘের আড়ালে বিদ্যুতের শিকড়ের মতো জায়মান। প্রাজ্ঞতা তাঁর কলমকে দিয়েছে ধ্যানের গাম্ভীর্য। শব্দ, ভাবে অর্থে অনেক বেশি ব্যঞ্জনাধর্মী এবং ক্ষেত্র বিশেষে পঙক্তিগুলি মন্ত্রের মতো গূঢ় এবং প্রার্থনার মতো সংহত। কাব্যগ্রন্থটির একের পর এক যতই পৃষ্ঠা উল্টেছি ততই মণিভূষণকে নতুন করে আবিষ্কার করেছি। বারে বারেই মনে হয়েছে, কবি আমাদের অতি-পরিচিত অবস্থান থেকে নিজেকে আমূল বদলে নিয়েছেন। নিজেরই ভাবমূর্তিকে ভেঙেচুরে গড়ে নিয়েছেন আর একটি মূর্তি; যেখানে সমকালীনতার দাবির কাছেই দায়বদ্ধ থাকেননি, কবিতার আবেদনকে পৌঁছে দিয়েছেন ভাবীকালেও। কবিতার মুগ্ধ পাঠক সে কারণে তাগিদ অনুভব করবেন বারবার কবিতাগুলির কাছে ফেরার। 'আমাকে আমার শব্দ তুলে নিতে দাও' এই বিনীত অন্তরাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে কাব্যগ্রন্থের প্রথম পর্বের কবিতায়। শেষ পর্বে গিয়ে তিনি লিখছেন, 'জবাকুসুমসংকাশ বালার্কদেব, তোমায় প্রণাম করি। তমসার অতলস্পর্শী গহ্বর থেকে তোমার অভ্যুত্থান, তোমাকে নতি জানাই। বিশ্বচরাচরের পিতা, বৃক্ষ ও প্রাণীকুলের পুষ্টিসাধক মার্তণ্ডদেব, তোমাতে প্রণত হই।' বাকি কবিতাগুলির যাবতীয় উচ্চারণ যেন এই দুই পঙক্তির মধ্যবর্তী পরিসরে বিধৃত। 'বিশ্ববেদনার স্রোতে ভেসে আছি, ভেঙে গেছে ছাত;/আমার ভিতর ছিঁড়ে প্রজাপতি হতে থাকে অজ্ঞাত প্রপাত' এমনই সব উজ্জ্বল পঙক্তিমালার সন্ধান মিলবে সংকলনভুক্ত চুয়ান্নটি কবিতায়।

কলকাতার প্রাণকেন্দ্র থেকে দূরে বাঁকুড়া শহরে কবি ঈশ্বর ত্রিপাঠী আজীবন কাব্যচর্চায় নিমগ্ন রয়েছেন। এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, কলকাতার সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগহীন কবিরা পরিচিতির দিক থেকে কিছুটা পেছনে পড়ে যান। তাঁদের কাজের যোগ্য মূল্যায়ন অনেক সময়েই হয় না। কেউ কেউ ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন; কিন্তু, আমি নির্দ্বিধ যে এটাই বাস্তব। আমরা অনেক অক্ষম ব্যর্থ কবিদের কি নানাভাবে প্রচারিত হতে দেখি না কলকাতার সাহিত্যপত্র ও সাংস্কৃতিক মঞ্চে? ঈশ্বর ত্রিপাঠী কবি হিসাবে বাংলা কবিতায় একটি মর্যাদার আসন অলংকৃত করে থাকলেও তাঁকে বহুল প্রচারিত কবি বলা যাবে না। তিনি অন্তর্মুখী স্বভাবের কবি। তাঁর অভিযাত্রা কবিতার দিকেই, প্রচারের দিকে নয়।

এ অবধি প্রকাশিত কবি ঈশ্বর ত্রিপাঠীর অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থের সঙ্গেই আমি সম্যক পরিচিত। তাঁর 'ঈশ্বর বেদ' 'অনন্ত মহিমা', 'ঋক্ এবং শায়েরী' কাব্যগ্রন্থত্রয় যথেষ্ট গভীর ও মননশীল কবিতায় সমৃদ্ধ। 'জন্মদিনের কবিতা' তাঁর সাম্প্রতিকতম কাব্যসংকলন। এ সংকলনে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের জীবনকেই পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছেন কবি। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলিতে তাঁর কাব্যবোধের যে গাম্ভীর্য ও গভীরতার পরিচয় পেয়েছি, এ কাব্যগ্রন্থে তা বিষম কৌতুকে রূপান্তরিত হয়েছে। এবং সেই একই সুর কাব্যগ্রন্থের আদি-অন্ত বজায় রেখেছেন। জীবনের গতি যেমন বিচিত্রধর্মী সংকলিত কবিতাগুলিও তেমনই বিবিধ অভিব্যক্তিতে বৈচিত্রসন্ধানী। 'ইয়ার্কি' কবিতায় তিনি শুরু করেছেন এইভাবে : 'আর বেশি দিন বাঁচতে ইচ্ছে নেই/ হে আমার বিশুদ্ধ ইয়ার্কি/ এবার তোমার বর্গা থেকে আমার নিজস্ব ক্ষেতে যাই।' 'নিজস্ব ক্ষেত' বলতে ভিনি বলতে চেয়েছেন, গাম্ভীর্যের দিকে হেঁটে যাবার কথা। যা তাঁর স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এবং তিনি আদতে জীবনের সত্যকেই আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন কবিতায়। তাই অন্য একটি কবিতায় দেখি : 'ভাবমূর্তি ভেঙে যাক/আমি চাই সত্য জয়ী হোক।' একজন কবির সারা জীবনের অন্বিষ্ট কবিতায় জীবনের সত্যকে উন্মোচিত করা। ব্যঙ্গ ও কৌতুকে ধার আছে; তবু গাম্ভীর্যের দিকে যাত্রাই তাঁর কবিতার মৌলিক প্রবণতা। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি নিয়ে জীবন। সহস্রধারার মতো তারও বহু প্রকাশমুখ। তাঁর জীবন-ভাবনায় একদিকে মিশেছে কৌতুক; অন্যদিকে আক্ষেপের সুর। অতৃপ্তিই জীবনকে তাড়িত করছে অহরহ। বয়েসের দিক থেকে কবি যখন সায়াহ্ন অভিমুখে, তখন তিনিও সেই চিরন্তন উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন, 'অনেক সাধে পেয়েছিলাম এই যে একক মানব জন্ম/ হেলাফেলায় ফুরালো তা বোঝা গেল না আসল মর্ম।' বিভিন্ন কবিতায় জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতালব্ধ নানা অনুভূতির প্রকাশ তাঁর একক জীবনকেই সমৃদ্ধ করেনি শুধু, সেই সঙ্গে পাঠকদেরও সমভাবাপন্ন করে তুলেছে। সংকলনটি

পাঠের এটাই বড় প্রাপ্তি। তাঁর এই সব কবিতায় আছে প্রেম, গার্হস্থ্যজীবন, ব্যক্তিজীবনের ইচ্ছে-অনিচ্ছে, এমনকী শিল্প ও মৃত্যু-ভাবনার নানা অনুষঙ্গ। এ কাব্যগ্রন্থটিও পাঠকমহলে সমাদৃত হবে, আলোচকের এটুকুই প্রত্যয়ী আকাঙ্ক্ষা।

পাঠ্যগ্রন্থের ভূমিকা : মণিভূষণ ভট্টাচার্য/জনপদ প্রয়াস, চুচুড়া/৪০.০০

জন্মদিনের কবিতা : ঈশ্বর ত্রিপাঠী/অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর/৩০.০০

কবিতার নির্বিরোধী রাত

হাসির মল্লিক

কবি কার মুখের দিকে তাকিয়ে কবিতা লিখবে, কার জন্য তাঁর রক্তক্ষরণ, অগ্নিবমন — সে কি শুধু প্রেমিকার প্রতি প্রেমিক-কবি-হৃদয়ের প্রেম-বিরহ-লিপি! নাকি প্রেমিকা ছাড়াও আরও কারও কারও মুখের জন্য, হৃদয়-তন্ত্রীতে দোলা দেওয়ার আকাঙ্ক্ষায় একজন কবি কবিতা লেখেন? কাগজ, কলম, কালি, হরফ, বর্ণ, শব্দ, চিত্রকল্পের জগতের ভেতর থেকে যা বের হয়ে আসে তা কাকে বিদ্ধ করবে? সে কি কোনও কেলাসন নাকি ফেনামেনন! তবে কবি, প্রায় সব কবিই কি নিজের অনুভূতির উপস্থিতিতে, উপলব্ধিতে, ব্যক্ত করানোর রীতিতে কবি-মনস্ক-পাঠকহৃদয়েই পৌঁছতে চান না? একজন কবিকে যে হৃদয় সুরে সুরে টঙ্কারে বিদ্ধ করবে। মজাবে, মগ্ন করবে, আক্রান্ত করবে। তর্ক এবং আবেগে বরণ করবে একজন কবির কবিতা লেখার জ্বালাকে। সেই অন্তর্দাহ যা কবিকে সবসময় দগ্ধ করে, একজন কবিহৃদয়-পাঠক ছাড়া এই অন্তর্দাহের 'লু'-এর আঁচ পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে তেমন কবি যদি হন—যিনি সব সময় আনন্দ, বিষাদ, হতাশা, অপমান, উদ্দীপনা সব সব কিছুতেই একমাত্র, মাত্র একটি কাজই করে যেতে চান—কবিতা লেখা। তিনি শুধু কবিতাই লিখতে চান, তা কবিতা হল কি হল না তাতে যাঁর কিছু যায় আসে না। শেষাবধি তাঁর কাজ শুধু কবিতা লেখা। তিনি কবিতার অন্তর্লীন সমুদ্রে মৎস্যসন্ধানী জেলের মতো প্রকৃত মৎস্যসন্ধানে রত। সে মাছ হেমিংওয়ের উপন্যাসের নায়ক 'সান্তিয়াগো'র মতো প্রত্যাশা মাফিক না হলেও কাব্যসমুদ্রে কবির সন্ধান শেষ পর্যন্ত চলবেই। (কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় কবি নিজেকে 'সান্তিয়াগো'র সঙ্গে তুলনা করেছেন।)

এমনই এক কবি পিনাকী ঘোষের 'সহৃদয় অনুপস্থিতি'-র আলোচনা করতে গিয়ে বারবার এ কথা মনে হয়েছে। যদিও এ কবির কোনও লেখাই আগে পড়িনি।

"হরফের কালো কালো ঘুমের ভেতরে বাবু হয়ে/একজন কবি বসে আছে।/কবি বলতে কী বোঝায় সে ব্যাপারে মনস্থির করে উঠতে না পেরে অযথা/ বোরডমে বিরক্ত হয়ে বিবিক্ত শব্দের মধ্যে বেকসুর আস্তানা গেড়েছে।" — এই কাব্যভাষ ও বিরোধাভাসে পিনাকী ঘোষের কাব্যগ্রন্থটি বেশ কয়েকবার পড়তে পড়তে কবিতার অন্তর্মুখী স্বর, নানান পরীক্ষানিরীক্ষা, বাস্তবের প্রতিক্রিয়ায় কবির নানাবিধ মর্মজ্বালা, নিঃসঙ্গতা, হতাশা এবং নানা নাগরিক কর্মকাণ্ডের পর আবার কবিতার কাছেই সমর্পণ এবং কবিতাই লিখতে বসা, কবিতা লেখাটাই হয়ে ওঠে সব কিছুর জবাব—এই কবির কাব্যগ্রন্থ থেকে এ বোধই বারবার আবিষ্কৃত হয়। কবি কবিতা লেখা, কাব্যগ্রন্থে কবিতা সাজানোর ক্ষেত্রে, পর্ববিভাগ ও ডিটিপি বর্ণমালার নানা বিন্যাসে যেভাবে তাঁর সৃজনপ্রতিমাকে সুচারুময় করার শ্রম করেছেন—তাতেই বোঝা যায় কবিতার প্রতি তাঁর কী মায়া। কবিতাকেই নানা ভাবে দেখতে চান। যেন কবিতাই জীবনলিপি হয়ে উঠছে। তাই লেখেন, "সারাদিন এর ওর তার সঙ্গে অনর্থক হাসির ঠোঁটবদল করে যেতে যেতে হারিয়ে ফেলি নিজেরটা।" তাই যেন কবিতার জন্য "আয়নার দিকে চেয়ে চেয়ে"লেখেন—"কবিতাকে খুঁজতে খুঁজতে এত নীচে নেমে গেছি যে ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পারছি না/ প্রেমেন্দ্র মিত্রের মৃত কুমোরের কামারের চাষীদের জেলেদের তাঁতীদের মজুরের/ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ানোর/সমাজ বিজ্ঞানী-কাম-কবির মনীষা নিয়ে নয়।"

তাঁর যেন ভাবনা বা জীবন-জিজ্ঞাসা—"বরঞ্চ আত্মনৈঃশব্দ্যে খাঁ খাঁ চারিপাশ।" কিন্তু তা দগ্ধ করে কবি-হৃদয়কে, "একটু পরেই কবিতাকে শুচিবায়ু ও বাড়তি উপদ্রব বলে মনে হয়/ কেন না বুলডোজার এই ভয়ংকর দেখতে শব্দটাও টালি নালার পাশে ফ্রক পরা মেয়েটির/ ভোকাবিউলারিতে ঢুকে গেছে..." এই বাস্তবতায় একজন কবির মর্মযন্ত্রণায়, মেধা ও মননে যে তোলপাড়, বাস্তব কাঠিন্যকে মোকাবিলার যে-অক্ষমতা সে ক্ষেত্রে কবিতায় শুধু রক্তক্ষরণ আর হাহাকার, যা একান্তই সৎ ও অনুভবী ক্যাথারসিস," "এত অন্ধকার আমি কি করে ঢাকব আলো দিয়ে/এত আলো কোথা থেকে পাবো"— এ বেদনা কি আমাদেরও নয়? কেননা "যথেষ্ট কবি হয়ে ওঠা হল না/যথেষ্ট বিপ্লবীও নই"। কবির সম্বল তো শুধু হৃদয় আর বর্ণমালা নির্ভর

চিত্রকল্প। এ দিয়ে করা যায় একান্ত কথোপকথন, "শব্দের সাথে শব্দের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের নির্জনে।"

এ কবি কেমন ভাবে লিখব—এ ভাবনা অনেক কাল আগেই অতিক্রম করেছেন। কাব্যিক ভাঞ্জুরে তার পোক্ত চিত্র রয়েছে। কবি "কী লিখব" ভাবনায় আক্রান্ত। "মাথার ভেতরে নীল আকাশের ক্লান্ত বিবরণ" প্রবেশ করে যায়; তখন এমতো বোধে শেষ পর্যন্ত কী অনুভব হয়, সে বোধ শুধু মাত্র কবিরাই জানেন!

কাব্যানুভব, রুক্ষবাস্তব, নাগরিক ক্লেদ, নিসঙ্গতা, মেধা ও আধুনিক কাব্য নিরীক্ষা এবং বিরোধাভাসে পিনাকী ঘোষের কাব্যগ্রন্থে এক ধরনের আবহাওয়া তৈরি হয়েছে, যা সব সময় পেলব না হলেও মনের মধ্যে কবিতার যে অনুরণন ওঠে তাকে অস্বীকার করা শক্ত।

কবি লেখেন, "সান্ধ্য আইনের কাব্যকাঁথা আমি শুকিয়েছি ঘিলুর রোদ্দুরে আপামর।" কিংবা "প্রায়ই আসবাবমনস্ক হয়ে পড়ি/আমার বেঁচে থাকা আসলে চেয়ারের পায়াবাস্তব হেঁয়ালি।" বা "হে হলুদ নির্জনতার বাষ্পবিন্দু/ তোমার পচনশীলতা থেকে জন্ম নিক/অন্ধকারের লবণ, কমলালেবু হাহাকার ও চাদরের নিরাপত্তা।" যদিও কবি কখনওই জ্বালা-যন্ত্রণাহীন নিরাপদ হৃদয় পাননি। "শব্দ-ক্ষুধায় বিপর্যস্ত আমি গোগ্রাসে গিলে ফেলেছি/অভিধান অথবা ভাষার টোটেম/যা আমাকে বন্দী করেছে কবিতা লেখার অজুহাতে।" কিন্তু তা হয় কি? কেন এ কবিই আবার লেখেন, "প্রতিটি পংক্তি থেকে ঝুলে থাক অশ্ব ডিম্ব।" কেন? কোন যন্ত্রণায়? কবির যন্ত্রণার শরিক তো আমরাও। তাই শেষ আশা কবির বাক্যবন্ধে, যাতে আমার রইল সহৃদয় অনুভবের সমর্থন—

"আমাদের কবিতা লেখার/পরমায়ু দীর্ঘ হোক" ....

"পেলবতা ধুয়ে দিক সব ক্রোধ হিংসা দ্বেষ রক্তের গভীর উচ্ছ্বাস/ জেগে থাক এই শূন্যে কিছু হাওয়া, মরীচিকা, নির্বিরোধী কবিতার রাত।"

সহৃদয় অনুপস্থিতি — পিনাকী ঘোষ/ লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা ৩৪/৩০.০০

স্বপ্নের মতো বাস্তব

মেঘ মুখোপাধ্যায়

হাওড়া থেকে লোকালটা ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম আমার পড়তে থাকা বইটির পাতার ওপরে আর একজনের চোখ আটকে গেছে। পাশে বসা সহযাত্রীটি বইটি পড়ার আগ্রহে আমার গা ঘেঁষে এসেছেন। ঠেলার চোটে একজন আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ায় বইটা আমাদের দু'জনের চোখের সামনে মেলে ধরা কঠিন হয়ে পড়ল। তখন নিরুপায় যুবকটি কাচুমাচু হয়ে আমাকে শুধোলেন, আপনি কদ্দুর? আমার গন্তব্য আর মিনিট দশেক শুনে ওঁর মুখ বিমর্ষ। বললাম, নিন না, ততক্ষণ আপনিই বইটা পড়ুন। ভাল লাগছে? হতাশার মধ্যে আশ্বস্ত হয়ে বললেন, চমৎকার লিখেছেন। দিন, প্রকাশকের ঠিকানাটাও লিখে নিই। সুযোগ হলে কিনে নেব। বইটা পড়তে হবে।

বইটা হল স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বপ্ন না মায়া না ভ্রম'। বছর কয়েক আগে 'সংবাদ প্রতিদিন'-য়ে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল। কলেজ স্ট্রিটের নয়, শ্রীরামপুরের এক অনামা প্রকাশক বই আকারে বের করেছেন। মাত্র পঞ্চান্ন পৃষ্ঠার মধ্যে আমাদের সমকালের বোধ হয় প্রসিদ্ধতম কবি-লেখকের পত্নী তাঁর বিখ্যাত স্বামীর এবং তাঁকে কেন্দ্র করে আরও কিছু খ্যাত-অখ্যাত মানুষের গল্প শুনিয়েছেন আমাদের। তাঁর ভাষা ঝকঝকে আর বলার ভঙ্গি আকর্ষক। সুনীল বা কৃত্তিবাসগোষ্ঠীর কীর্তিকলাপ আমাদের অনেকেরই জানা ছিল। এ নিয়ে সুনীল এবং তাঁর বন্ধু আর অনুরাগীরা নানা সময়ে লিখেছেন। স্বাতীও লিখলেন নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। সুনীলের দুরন্ত যৌবনকাল আর সে-সময়ের দামাল জীবনযাপন সদ্যবিবাহিতা এক তরুণী কীভাবে গ্রহণ করেছিল, পরিবার বা সংসারধর্ম পালনে ব্যগ্রতার চেয়ে যাঁর বাহির পৃথিবীর টান ছিল বেশি এমন এক কবির সঙ্গে সংসার করার ধরনটি কেমন- সেই কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ তিনি লিখেছেন। দমদমে নতুন শ্বশুরবাড়ির দিনগুলির কথা পড়তে ভাল লাগে- তাঁর শাশুড়ি-দেওর-ননদের কথা। হঠাৎ একদিন অশোকতরুর আগমন আর গান শোনানো। পড়তে পড়তে মনে হয় এইরকম আরও অনেক পারিবারিক গল্প তাঁর বলার ছিল কিন্তু সংক্ষেপে সেরে দিয়েছেন। এক একবার তিনি ভেবেছেন, হয়ত ধন্দে পড়েছেন যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী ছাড়া তাঁর কি নিজস্ব কোনও পরিচয় আছে। হয়ত উপরোধে অনুরোধে তিনি সুনীল-সংশ্লিষ্ট কিছু কথা লেখার জন্য কলম ধরেছিলেন কিন্তু ক্রমশ এক ব্যক্তিত্বময়ী নারীকে চেনা যায়। এক বিখ্যাত ব্যক্তির পত্নীর পরিচয় ছাড়িয়ে তাঁর বর্ণনায় এক সংবেদনশীল নারীর অনুভব-অভিজ্ঞতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

যদিও ইতিমধ্যে সুনীল 'অর্ধেক জীবন' লিখেছেন, তবুও স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়ের উচিত তাঁর এই লেখাটি আরও মনোযোগ দিয়ে বিশদ করে আর একবার লিখতে বসা। জীবনের আরও গভীর কিছু কথা, আনন্দের-বেদনার-বিস্ময়ের, লিখে যাওয়া।

স্বপ্ন না মায়া না ভ্রম—স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়/সপ্তর্ষি প্রকাশন, শ্রীরামপুর/৪৫.০০

নিজের মুখের ছবি

সমীর ঘোষ

দেশবিদেশের বহু বিশিষ্ট শিল্পীই এঁকেছেন নিজের মুখের ছবি। রেনেসাঁস পর্বে যার বিকাশ, সময়ান্তরে নানা রীতি-আঙ্গিকের ক্রমবিস্তারে এসেছে বৈচিত্রের ভিন্নতর স্বাদ। নিজের মুখের ছবিতে শিল্পী শুধু বাহ্যিক রূপেরই বিশ্বস্ত প্রকাশ ঘটাননি, এনেছেন অন্তর্গূঢ় সত্তার পরিচয়। জীবনযাপনে, দৈনন্দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, সুখ-দুঃখের স্মৃতিও ধরা পড়েছে শিল্পীর আত্ম-প্রতিকৃতির আত্মদর্শনে।

এমনই এক বিষয়-বৈচিত্রের আয়োজন দেখা গেল বিড়লা আকাদেমিতে, আর.পি.জি-র উদ্যোগে প্রদর্শিত আত্ম-প্রতিকৃতির ব্যাপ্ত সম্ভারে। ২৯ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর ২০০২, — ভারতের নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদের আঁকা নানা আঙ্গিকে নিজের মুখের ছবির এই প্রদর্শনী উপস্থাপন-ভাবনায় অবশ্যই স্মরণীয়। তবে আত্ম-প্রতিকৃতি রচনার ঐতিহ্য এবং বিস্তার সম্পর্কে চেতনার অভাবেই হোক কিংবা ভাবনার অক্ষমতাই হোক—অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পীরা আত্ম-প্রতিকৃতি অঙ্কনে অন্তর্গূঢ় সত্তার যথাযোগ্য প্রকাশে নিজেদের সীমাবদ্ধতাকেই প্রকট করে তুলেছেন। নিজের মুখের ছবিতে কেউ কেউ বাহ্যিক গড়নের গণ্ডিতে বাঁধা পড়েছেন কিংবা প্রথাবিরোধী রূপকল্প নির্মাণের তাগিদে নিজের মুখের পরিবর্তে খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার অহংকেই চিত্রায়িত করেছেন প্রত্যয়ী প্রতীকী বিন্যাসে। ফলে আত্ম-প্রতিকৃতি রচনার তাৎপর্য অনেক ক্ষেত্রেই দিশাহীনতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

১৮৮৭-তে শিল্পী ভ্যান গঘ, তাঁর বোন উইলিয়ামকে চিঠিতে লিখেছিলেন, —'আমি কোনও মডেল জোগাড় করতে পারছি না। আমাকে অন্য কিছুর জন্য ভাবতে হচ্ছে—অবশ্যই ভিন্ন ধরনের কিছু আঁকার।'

এরপরই ১৮৮৮-তে ভাই থিও-কে চিঠিতে জানাচ্ছেন, — 'আমি অনেক ভেবেচিন্তে একটা সুন্দর আয়না নিয়ে এসেছি। সে জন্য মডেলের অভাবে আমার নিজের মুখ আয়নায় দেখে কাজ চালিয়ে যেতে কোনও অসুবিধা হবে না।'

নিজের মুখের ছবি আঁকতে গিয়ে স্বদেশের বা বিদেশের বিশিষ্ট শিল্পীদের অনেকেই তাঁদের স্বাভাবিক গড়নের পরিবর্তে এঁকেছেন কল্পিত, আদর্শায়িত রূপকল্প। রূপকের আড়ালে এ-যেন নিজেকে ভিন্নসত্তায় রূপান্তরের খেলা। এমন খেলার ভঙ্গিতেই শিল্পী ড্যুরা, নিজেকে এঁকেছিলেন খ্রিস্ট রূপকল্পনায়। রেমব্রান্ট হয়েছিলেন এপসটল পল, কিংবা বিচিত্র পোশাকে-প্রসাধনে আরও নানা চরিত্রে বিশিষ্ট। কিন্তু এই আরোপিত ভূমিকার আড়ালে নিজের মুখচ্ছবি, ব্যক্তিস্বরূপ কখনওই অদৃশ্য বা অপরিচিত থাকে না। লোত্রেক বা নন্দলাল বসুর মতো শিল্পীও যখন নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক রূপকল্প নির্মাণের খেলায় মেতে ওঠেন, সেই বিশেষ ক্ষণেও ব্যক্তিত্বের চিহ্ন পুরোমাত্রায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার অনেক শিল্পীরই পরিচিত চেনা মুখের আদলের মধ্যেই ছুঁয়ে যায় অচেনা রূপের আভাস। সমকালীন শিল্পনির্মাণে আধুনিক রীতি শৈলীর প্রভাবে এবং শিল্পীর সহজাত দক্ষতায় এই সাধারণ মুখচ্ছবিই হয়ে ওঠে বাস্তবতার সীমা ছুঁয়ে সৃষ্টিশীলতার উজ্জ্বল দ্যুতিতে বিশিষ্ট, সম্পন্ন।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে অসংখ্য কাজের ভিড়ে কয়েকটি প্রতিকৃতি অবশ্যই স্বকীয়তায় বিশিষ্ট। আত্মপ্রতিকৃতির এই সম্ভারে যাঁদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন প্রবীণ শিল্পী পরিতোষ সেন, বিকাশ ভট্টাচার্য, অঞ্জলি এলা মেনন, মানু পারেখ, সুহাস রায়, যোগেন চৌধুরী, শুভাপ্রসন্ন, বাংলাদেশের শিল্পী শাহাবুদ্দিন এবং নবীনদের মধ্যে সমীর মণ্ডল, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রমুখ।

শতাধিক শিল্পীর আত্মপ্রতিকৃতির বিপুল সম্ভারে প্রথমেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি পরিতোষ সেন। দীর্ঘদিন ধরে সৃজনের ধারাবাহিকতায় পরিতোষ সেন ছবির বিষয় অনুষঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নিয়েছেন স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিকতায়। প্রদর্শিত চিত্রপটেও তিনি নিজের শিল্পী-পরিচয়কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। স্টুডিওতে প্রেক্ষাপটে ক্যানভাসে অঙ্কিত নগ্নিকা আর সামনে অঙ্কনরত শিল্পী। কর্মীষ্ঠ শিল্পীর শিল্পময় অভিব্যক্তিই যেন ফুটে উঠেছে এই আত্ম-প্রতিকৃতিতে। বহিরঙ্গের সাদৃশ্যই শুধু নয়, শ্লেষধর্মী আঙ্গিক শৈলীতে অন্তর্ভেদী নিরীক্ষায় নিজেকে প্রকাশ করেছেন শিল্পী পরিতোষ সেন, তাঁর নিজের মুখের ছবিতে।

এই ছবির পাশে বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবি, আত্মপ্রতিকৃতি, সম্পূর্ণতই ভিন্ন চরিত্রে উপস্থিত। প্রথাসিদ্ধ বাস্তবতার মধ্যেও পূর্ণাবয়ব এই আত্মদর্শনে শিল্পী প্রকাশ করেছেন এক নাটকীয় অভিব্যক্তি। সীমাহীন দূর নীল দিগন্তের প্রেক্ষাপটে ক্যানভাস জুড়ে শিল্পী-ব্যক্তিত্বের রাজসিক উপস্থিতি। কিন্তু এই উপস্থিতির মধ্যেই

রয়েছে এক গূঢ় ব্যঞ্জনা। ব্যাপ্তনীল আকাশপটে সাদা মেঘের প্রতিভাস। পশ্চাৎপটের উজ্জ্বল দ্যুতির মাঝে হলুদাভ লাল আলখাল্লায় দীর্ঘদেহী শিল্পীর অবস্থান। দেহ থেকে মাথা ছিন্ন, চোখে কালো চশমা। ১৯৭০-এ আঁকা এই আত্মপ্রতিকৃতিতে সত্তর দশকের সমাজ-সংকটের, রক্তক্ষরণের স্মৃতি কীভাবে শিল্পীকে তাড়িত করেছিল তা অনুমানের বিষয়। তবে এই সময়ের বেশ কিছু ছবিতে, বিষয়কল্পে শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য, তৎকালীন সমাজ-রাজনীতির নানা অনুষঙ্গ জুড়ে দিয়েছিলেন সচেতন প্রজ্ঞায়। স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, বিপন্নতার তীব্র আর্তি এবং রক্তাক্ত স্মৃতিকে অক্ষয় করে রেখেছিলেন শিল্পী বিকাশ, তাঁর সমসময়ের চিত্রমালায়। হয়ত সেই স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের মায়াময় স্মৃতির নিবিড় আকর্ষণেই একালের বিশিষ্ট সৃজনশীল গল্পলেখক মধুময় পাল এই আত্মপ্রতিকৃতির মধ্যে খুঁজেছেন সত্তর দশকের রক্তাক্ত আলেখ্য। তিনি লিখেছেন, —'পায়ের নিচে ধাতব সড়ক—দূরগামিতার সুস্পষ্ট সঙ্কেত, শূন্যে সাদা মেঘ-ভাসা নীলাকাশ, বহুদূর পেরিয়ে এসেছেন তিনি, দূরতর সম্মুখে পেরতে হবে তাঁকে' স্বপ্নে ও সন্ত্রাসে আলোড়িত, রক্তাক্ত সেই সময় আর তারই সঙ্গে মিশে আছে অস্তিত্বের সংকট, বিপন্নতার ছায়া এই ছবির নাটকীয় উপস্থাপনায়। চেনা রূপের সীমা ভেঙে আত্মজিজ্ঞাসায় উন্মুখ শিল্পী ব্যক্তিত্বের এমন উপস্থাপন শুধু শিল্পিত দক্ষতাই নয়, চেতনা-ঋদ্ধ আত্মপ্রতিকৃতি হিসাবেও সার্থক।

বিশিষ্ট শিল্পী মানু পারেখের আত্মপ্রতিকৃতিও সময়ের জটিল আবর্তে, সংকট দীর্ণতার চিহ্নবহ। আপাত সাদৃশ্যহীনতার মধ্যেও লাল-হলুদের ভাঙাচোরা রেখায়, তুলির স্বতঃস্ফূর্ত টানে, আবেগময় আঁকিবুকিতে গড়ে উঠেছে ব্যঞ্জনাময় রূপকল্প।

শিল্পী শুভাপ্রসন্ন, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রীতিপ্রকরণে যে আত্ম প্রতিকৃতি উপস্থিত করেছেন তাতে বাস্তবতার লক্ষণ কোনও ভাবেই ক্ষুণ্ণ হয়নি। কিন্তু সাদৃশ্য চিহ্নিত মুখাবয়বের সঙ্গে জুড়ে আছে তাঁর বিষয়কল্পের চির-পরিচিত প্রতীক-প্রতিমা—কাক। আত্মপ্রতিকৃতি আর তার সঙ্গে একান্ত সংলগ্ন কাকের সহাবস্থানের সূত্রেই তৈরি হয়েছে ভিন্নতর মাত্রা। চিরাচরিত প্রতিকৃতি রচনার ঐতিহ্য ভেঙে এ-যেন সৃজনধর্মী চিত্রময়তায় রূপান্তরের শিল্পিত প্রয়াস।

নবীন শিল্পী সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর নিজের মুখের ছবিতে বাস্তবতার সীমা ভেঙে দিতে খণ্ডিত মুখাবয়বের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন পটভূমির অংশ। রঙে ও নির্মিতিতে ভেঙে দিতে চেয়েছেন বাস্তবতার সমূহ সীমাবদ্ধতা। ঠিক একই ভাবে আত্ম-প্রতিকৃতি এঁকেছেন শিল্পী অঞ্জলি এলা মেনন। সামান্য রেখায় মুখের একাংশ আর বাকি অংশজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন স্বাক্ষর, পটে ভারসাম্য তৈরি করার খেলায়। তবু এমন চরিত্রের মুখচ্ছবি যেন যথার্থ আত্মজৈবনিক পরিচিতির বাইরে নিছক বাহ্যিক রূপের বিশ্বস্ত অনুকৃতিতেই সীমাবদ্ধ থাকে। ভিন্নতর দ্যোতনা প্রকাশ করে না।

শিল্পী যোগেন চৌধুরী, জাহাঙ্গির সাবাওয়ালা, আকবর পদমসি, ওয়াসিম কাপুর প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীর আত্মপ্রতিকৃতিতে স্বকীয় দক্ষতার চিহ্ন থাকলেও প্রথাসিদ্ধ বাস্তবতার সীমা ভেঙে ভিন্নতর অভিব্যক্তির প্রকাশ অনুপস্থিত। প্রসঙ্গত বলা যায়, যোগেন চৌধুরীর বেশ কিছু আত্মপ্রতিকৃতি রয়েছে যা নিছক অনুকৃতি নয়, ব্যক্তিস্বরূপের বিস্ময়কর উন্মোচন ধরা পড়ে সে-সব রচনায়। তেমন সৃষ্টিশীল ভাবনা যেন বর্তমান ছবিতে অধরাই রইল। আত্মানুসন্ধানী রূপকল্প এ-সব প্রতিকৃতিতে সে-ভাবে পাওয়া গেল না।

নানা রঙের জ্যামিতিক সীমা বিভাজনে, গ্রাফিক্স ধর্মী নির্মাণ আঙ্গিকে শিল্পী সি.জগদীশের আত্মপ্রতিকৃতিটি ভিন্ন স্বাদের। এমন আর এক ভিন্ন ধর্মী আত্মপ্রতিকৃতি রচনা করেছেন শিল্পী মাধবী পারেখ। লোকশিল্পের আদলে গড়া এই মুখচ্ছবি আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে নজরে পড়ে।

বাংলাদেশের খ্যাতনামা শিল্পী শাহাবুদ্দিনের আত্মপ্রতিকৃতির চরিত্র তাঁর নিজস্ব ধারায় আঁকা। প্রথাগত বাস্তবতাকে তীব্র গতিময় তুলির টানে ভিন্ন মাত্রায় রূপান্তরিত করেছেন। প্রয়োগদক্ষতার সঙ্গে তীব্র আবেগ তাঁর মুখচ্ছবিতে ব্যক্তিস্বরূপকে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করে।

আর. পি. জি আয়োজিত এই প্রদর্শনীর অনেক ছবিই বিশেষ শিল্পী-শিবিরে অনুরোধের কাজ বলেই মনে হয়। স্বভাবতই অনেক শিল্পীই আত্মপ্রতিকৃতি রচনায় তেমনভাবে ভেতরের সাড়া পাননি। অনুরোধের দায় পালনে কিংবা অত্যুৎসাহে যুক্ত হয়েছেন নিজের মুখের ছবি আঁকায়। ফলে আত্মপ্রতিকৃতির নামে সীমাহীন স্বাধীনতা নিয়েছেন নবীন-প্রবীণ নির্বিশেষে অনেক শিল্পীই। যেমন শিল্পী পরমজিৎ সিং এঁকেছেন স্বকীয় ঘরানার নিসর্গচিত্র। অর্পিতা সিং চিত্রপটে ডানহাতের ছাপ চিহ্নে বুঝিয়েছেন নিজের প্রতীকী পরিচয়। একইভাবে সনাতন দিন্দা ক্যানভাসের উল্টোদিকে ফ্রেমের গায়ে এক কোণে জুড়ে দিয়েছেন ডান হাতের প্লাস্টার-ভাস্কর্য আর পটের শরীরে রঙে-রেখায় স্বাক্ষরিত আত্মপরিচয়। এমন আরও বেশ কিছু ছবি ছিল যা আত্ম-প্রতিকৃতির নামে আধুনিক প্রকাশভঙ্গির যথেচ্ছাচার। এই বিতর্কিত রূপকল্পে আত্ম-প্রতিকৃতির যথাযোগ্য পরিচয় না পাওয়া গেলেও ভাবনার অভিনবত্বে এই প্রদর্শনী অবশ্যই সার্থক।

চলচ্চিত্রসমালোচনা

জঙ্গি হিন্দুত্বের রূপ ঃ দুই ছবির আয়নায়

অধৃষ্য কুমার

১৯৪৬-৪৭ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিষয়ে যত লেখালেখি হয়েছিল অথবা এখনও হচ্ছে, গত প্রায় পঞ্চান্ন বছর ধরে, সে রকমটা স্বাধীন ভারতের কোনও সামাজিক অথবা সাম্প্রদায়িক হিংসাকাণ্ড বিষয় নিয়ে হয়েছে বলে মনে হয় না। ৪৬-৪৭এর দাঙ্গা বিষয়ে সেই সময়ের থেকে সম্ভবত পরবর্তী কালেই গবেষণার কাজ অনেক বেশি হয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা খুনোখুনি চলাকালীন সময়ে ওই বিষয়ে যত কম বলা হয় বা প্রচার করা হয় ততই মঙ্গল, হিংসা বিদ্বেষ কম ছড়াবে। এ রকম একটা প্রচলিত ধারণা আমাদের সেকুলার-মানসিকতায় নিশ্চয়ই আছে। ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গার সময়ে হিংসার বিস্তৃত বিবরণ হিংসা ছড়াতেই বেশি সাহায্য করে এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু এটাও আবার ঠিক, দাঙ্গার খবর হিংসার খবর সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত থাকলে সেটা কীভাবে দাঙ্গার বিরুদ্ধে সেকুলার মানসিক প্রতিরোধ গড়ে তুলবে তা নিয়েও সংশয় যথেষ্ট গভীর। ৪৬-৪৭ এর দাঙ্গার সময়ে সংবাদ মাধ্যমে (তখন তা শুধুই প্রায় সংবাদপত্র) অনেক সময়েই এমন খবরাখবর ছাপা হয়েছে যা দাঙ্গার আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। আমাদের শহরের অভিজ্ঞতায় '৬৪ সালের দাঙ্গার সময়েও কিছু কিছু প্রকাশিত সংবাদ দাঙ্গার উত্তেজনা ছড়াতে সহায়ক হয়েছিল। সম্ভবত ৬৪-৬৫ এর পর থেকেই আমাদের সেকুলার মনোজগতে এক অলিখিত চুক্তি হয়েছিল যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হিংস্রতার বিস্তৃত বিবরণ সংবাদমাধ্যমে অন্তত সেই সময়ে তুলে ধরা হবে না। আসলে এক সম্প্রদায়ের মানুষের খুন হওয়ার খবর দাঙ্গাবাজদের আরও উৎসাহিত করে অন্য সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণে। সবসময়েই দেখা গেছে দাঙ্গার গুজবের গরু গাছে উঠে বসে আছে। গুজব আর দাঙ্গার দাবানল ছড়ায় প্রায় হাত ধরাধরি করে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে গুজবের আগুন নির্বাপণে যদি খবরকেও কিছুটা চেপে যেতে হয়-তাই সই, এরকম একটা ধারণা আমরা সকলেই মনে মনে মেনে নিয়েছিলাম ষাটের দশকের পর থেকেই। ভাগলপুর, জামশেদপুর, হায়দরাবাদ, আমেদাবাদসহ আরও বেশ কিছু অঞ্চলে ১৯৬০-'৭০ সময়ে বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সেকুলার সংবাদ মাধ্যমের এটাই ছিল প্রচলিত রীতি যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে যতটা পারা যায় দাঙ্গার পরস্পর আক্রমণ প্রতিআক্রমণ এবং খুনোখুনির খবর না প্রকাশ করা। তবে মূলত বামপন্থী পত্রপত্রিকার একটা রেওয়াজ গত অর্ধশতাব্দী ধরেই রয়েছে যে দাঙ্গা চলাকালীন দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাহানি খুনোখুনির খবর না ছেপে বরং ওই নারকীয় উন্মাদনার মধ্যেও এক সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের ব্যক্তিগত অথবা সংঘবদ্ধ সাহায্য-সহযোগিতা-সহানুভূতির কথা জোর দিয়ে তুলে ধরা।

পুরো অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করল টেলিভিশনের ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। ভাগলপুর দাঙ্গার পর থেকেই বেশ কিছু ছোট ছোট গণতান্ত্রিক-নাগরিক সংগঠন দাঙ্গার আগুন পুরোপুরি নিভে যাওয়ার আগেই সেই সমস্ত এলাকায় গিয়ে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ এবং তার ওপর বড় বড় প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকেন। হিংসার বিবরণ তখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে ছাপার অক্ষরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

কিন্তু ১৯৮০ এর দশকের মাঝামাঝি থেকে পরবর্তী বছর পনেরোর ভেতর যখন টেলিভিশনের ক্যামেরা স্টুডিও ছেড়ে কাঁধে চেপে বেরিয়ে পড়ল সংবাদের খোঁজে তখনই অবস্থা গেল পাল্টে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সহ সবরকমের সামাজিক রাজনৈতিক হিংসাকাণ্ডের জলজ্যান্ত ছবি চলে এল আমাদের ঘরের মধ্যে সংবাদ সংগ্রাহকদের ক্যামেরায় ভর করে। সংবাদ সংগ্রহ এবং তার বিক্রির বাজারের আয়তন গত দশ-পনেরো বছরে যে হারে যে জেট্ গতিতে বেড়ে চলেছে তা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। বাজারে বিক্রি হচ্ছে, চাহিদা আছে সুতরাং তার উৎপাদনও হচ্ছে যথেচ্ছ পরিমাণে। সে ইরাক যুদ্ধের হুবহু চলচ্চিত্র অথবা বসনিয়ার সাম্প্রদায়িক হানাহানি — যাই হোক না কেন।

তবু আমাদের দেশে ১৯৮৯ থেকে শুরু করে ৯২-এর বাবরি মসজিদ ধ্বংসপরবর্তী বছরগুলিতে হাতে গোনা কয়েকটি দায়িত্বশীল তথ্যচিত্র তৈরি হয়েছে। এ ব্যাপারে অবশ্যই পথিকৃত আনন্দ পট্টবর্ধন। আনন্দের 'রাম কে নাম পর' সংবাদ বাজারে বিক্রিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের লোভনীয় হাতছানিকে অনেকটাই এড়িয়ে গিয়ে দায়িত্বশীল সামাজিক তথ্যচিত্র হিসাবে পরিচিত। আনন্দ পট্টবর্ধন নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম তার পরবর্তী তিনটি ছবি নিয়েও যার শেষতম বোধহয় "জঙ্ আউর আমন" (ওয়ার অ্যান্ড পিস)।

২০০২ সালের নরেন্দ্র মোদির গুজরাট আগের সমস্ত হিসাব নিকাশ পাল্টে দিয়েছে। আগের হিসাব-নিকাশ মানে সব বিষয়ের হিসাব নিকাশ। আমাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, আমাদের সেকুলারিজম, আমাদের গণতান্ত্রিকতা, আমাদের আধুনিকতা সবকিছুই প্রায় তালগোল পাকিয়ে যেতে বসেছে নরেন্দ্র মোদির নিউটনীয় বলবিদ্যার ব্যাখ্যার এক ধাক্কায়। ২০০২ এর গুজরাতের ভয়াবহ গণহত্যার সঙ্গে আমাদের দেশের এর আগের আর কোনও সাম্প্রদায়িক হানাহানির তুলনা চলে না। গুজরাটের ঘটনার সময়ে সরকারের ভূমিকা, রাষ্ট্রের ভূমিকার সঙ্গে আমাদের দেশের এর আগের কোনও সময়েরই কোনও সরকারের ভূমিকার তুলনা চলে না; এমনকী প্রাক স্বাধীনতা পর্বে ব্রিটিশ প্রশাসনের ভূমিকাও কোনও তুলনা চলে না। ২০০২ এর গুজরাতে হিংসা, হিংসার বিস্তার, হিংসা-ধ্বংসকাণ্ডের পরিকল্পনা, সাধারণমানুষের অংশগ্রহণ, রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশগ্রহণ সবই অভূতপূর্ব। পৃথিবীর ইতিহাসেও এর তুলনা একটাই নাজিপার্টির হাতের জার্মানির।

তাই সাম্প্রতিক গুজরাট-গণহত্যাকাণ্ডের মুখোমুখি আমাদের দেশ-সমাজ-ব্যক্তি-গণমাধ্যম সকলের প্রতিক্রিয়াও অভূতপূর্ব। এটা ঘটনা যে ২৭ শে ফেব্রুয়ারির সবরমতী এক্সপ্রেস ট্রেনে হত্যাকাণ্ডের পর যখন গুজরাট সরকার এবং তার মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়কে হত্যার হাইটেক পরিকল্পনা কার্যকর করা শুরু হল, তখন আমরা অনেকেই প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। লজ্জার কথা হলেও স্বীকার না করে উপায় নেই যে আমাদের গর্বের সেকুলার শহর কলকাতারও আড়িমুড়ি ভেঙে রাস্তায় নামতে লেগে গেছে কয়েকটা সপ্তাহ। এর মধ্যে সারাভারতে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাছে এবং আমাদের কাছেও পদত্যাগী আই.এ.এস. হর্ষ মন্দারের মর্মভেদী আবেদন এসে পৌঁছেছে। আমরা ই-মেল থেকে সংবাদ পত্র হয়ে ছোট প্রচারপুস্তিকায় হর্ষ মন্দারের আকুল আবেদন ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি মার্চের শেষাশেষি নাগাদ।

এরই কাছাকাছি সময়ে আমাদের শহরেরই কয়েকজন সাহসী তরুণ বেরিয়ে পড়েছিলেন গুজরাতের উদ্দেশে। কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে সৌমিত্র দস্তিদার, কিংশুক রায় আর দেবাশীষ দে তিনবন্ধু ৯ই এপ্রিল কলকাতা ছেড়ে আমেদাবাদে পৌঁছায় ১১ এপ্রিল ২০০২-এ।

সৌমিত্রর কথাতেই — "আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম কিন্তু কীভাবে কী করব, কোথায় থাকব কিছুই ঠিক ছিল না।" এর আগে সৌমিত্র দস্তিদার দু'-একটা ছোটখাটো তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন। তার মধ্যে জলযুদ্ধগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড নিয়ে তৈরি ছবির বিষয়ে কিছুটা আলোচনাও হয়েছে এখানে সেখানে। প্রায় সপ্তাহ দুয়েক ওঁরা মূলত আমেদাবাদ শহরের বিভিন্ন ত্রাণশিবিরে (যেগুলির অবস্থা তখন আক্ষরিক অর্থেই নারকীয়) ঘুরে বেড়িয়েছেন ক্যামেরা কাঁধে। ৯ই থেকে ১৪ই এপ্রিল ২০০২ কারফিউ কবলিত আমেদাবাদের বিভিন্ন ত্রাণশিবির ঘুরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রায় রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতির মধ্যে ঘন্টাদশেকের চলমান ছবি (পরিভাষায় 'ফুটেজ') ক্যামেরা বন্দি করে ফিরে আসেন তিন বন্ধু। ইতিমধ্যে কলকাতা রাস্তায় নেমেছে। দেরিতে হলেও রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক কর্মী, শ্রমিক সংগঠন সকলেই গুজরাটের চলমান গণহত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার। যদিও এটাও মানতে হবে এই আলোড়নের মধ্যে সাধারণমানুষের অংশগ্রহণ তেমন চোখে পড়ার মতো ছিল না।

এর মাঝেই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির দোতলার সভাগৃহে আমরা প্রথম দেখলাম 'নাথিং অফিসিয়াল'— ২০০২ সালের গুজরাটের গণহত্যাকাণ্ড-ধ্বংসলীলার জীবন্ত দলিল। সেদিনের অনুষ্ঠানের প্রথমেই পরিচালক সৌমিত্র দস্তিদার আমাদের জানিয়েছিলেন কী অবস্থার মধ্যে ন্যূনতম পরিকাঠামো এবং পারিপার্শ্বিক সাহায্য ছাড়াই ওঁরা ছবিটা তুলেছেন। ওঁর সেদিনের কথায়—আমরা যা পেরেছি ওই সাত দিন ধরে তুলে গেছি। 'নাথিং অফিসিয়াল' নিয়ে দু'চার কথা বলতে গেলে ওদের সেদিনের অনুষ্ঠানের আরও একটা উক্তি উল্লেখ করা প্রয়োজন। সৌমিত্র দস্তিদার বলেছিলেন যে, "পরবর্তী মিনিট কুড়ি আপনারা যা দেখবেন সেই ছবির মধ্যে শিল্পসৌকর্য খুঁজতে যাওয়া বৃথা আর কারিগরি বা কলাকুশলতাগত ভুলত্রুটিও বেশ কিছু আছে। কারণ আমাদের তাড়া ছিল একটাই, সময় নষ্ট না করে গুজরাটের ভয়ঙ্কর বিপদের চলমান কিছু ছবি আপনাদের সামনে হাজির করা যাতে আমরা আত্মতুষ্টিতে না ভুগে আমাদের এই প্রিয় শহরে নরেন্দ্র মোদি-তোগড়িয়ার-নরখাদক সময়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়তে পারি।"

একটা তথ্যচিত্র কতটাই বা করতে পারে। তবু ২০০২ এর ওই সময়ে 'নাথিং অফিসিয়াল' নিশ্চয়ই তার পরিচালকের অভিপ্রায় অনুযায়ী আমাদের কলকাতার সেকুলার মননে কিছুটা অন্তত নাড়া দিয়েছিল। মিনিট কুড়ির ছবির শুরু থেকেই ক্যামেরার সঙ্গে আমরা ঘুরে বেড়িয়েছি আমেদাবাদ শহরের শরণার্থী শিবির নামের নরককুণ্ডগুলোতে। কখনও কখনও আশেপাশের লোকালয়ে, শহরতলির বিভিন্ন রাস্তায়। শাহ আলম, চবুতলা কবরস্থান, গোমতিপুর, কালুপুরা, নারোদাপাটিয়া, হোসেনপুর সবকটি শরণার্থী শিবিরেই মৃত্যুর মুখোমুখি, অসহায় আকুল মা-বোন-দাদা-ভাই বাবা-দাদু। ক্যামেরার সামনে ভয়ার্ত বৃদ্ধের দৃষ্টি। কখনও ছেলের জন্য মায়ের আর্তনাদ, কখনও বা নারোদাপাটিয়া ক্যাম্পের বৃদ্ধ পিতার মুখে সেই নরপশু বীরপুঙ্গবদের বীভৎসতম তাণ্ডব-কাহিনি, সন্তানসম্ভবার পেট চিরে পূর্ণাবয়ব শিশুর ভ্রূণ

তরোয়ালের ডগায় নিয়ে তাণ্ডবনৃত্য। গোটা বাড়ি, বস্তি ভেঙে চুরে তছনছ, বাড়ির জিনিসপত্র সমস্ত লুঠ করে ছড়িয়েছিটিয়ে আগুন লাগানো হয়েছে। চোখেপড়ার মতো দু'-তিন মিনিটের দৃশ্য, একই শহরের দুই অঞ্চলের একই দিনে প্রায় একই সময়ের দুটি রাস্তা। একটি কলকোলাহল-মুখরিত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রাস্তা। অন্যটি যেন যুদ্ধপরবর্তী ধবংসক্রান্ত মরুভূমি। মোদি লাইনের বিভেদের পাঁচিল তোলা সম্পূর্ণ। হর্ষ মন্দার ইতিমধ্যেই আমাদের সকলের কাছে পরিচিত নাম। তবে সৌমিত্রির ছবিতেই বোধ হয় আমরা প্রথম শুনলাম সমাজকর্মী হানিফ লাকড়েওয়ালা, হর্ষ মন্দার এবং একাশি বছরের প্রবীণ গান্ধীবাদী ডি. এন পাঠকের খোলাখুলি এবং সোজাসুজি অভিযোগ— যে গুজরাতে যা হয়েছে, যা হচ্ছে তা "একমুখি এবং কেবলমাত্র একমুখি গণহত্যাকাণ্ড"। "পরিকল্পনা মাফিক মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষকে নিশ্চিহ্ন করার চক্রান্ত।" ডি. এন. পাঠকের বহু ঝড়ঝাপটায় পোড় খাওয়া ক্রোধ—"এই গণহত্যাকাণ্ড রাষ্ট্রের সহযোগিতায় রাষ্ট্রের দ্বারা সংগঠিত"। শাহ আলম ক্যাম্পের পুরুষ মহিলারাও একবাক্যে বলেন যে "পুলিশই হত্যাকারী"— রক্ষা করার পরিবর্তে পুলিশই হত্যাকারীদের রাস্তা চিনিয়ে এগিয়ে নিয়ে এসে অসহায় মুসলমান বস্তিবাসীদের দু-দিক থেকে আক্রমণ করে হত্যা আর লুঠপাঠ চালিয়েছে। ডি.এন. পাঠক পরিষ্কার করেই বলেন, "দি স্টেট ওয়াজ টেকন্ ওভার বাই সংঘ পরিবার।" শেষ এবং প্রয়োজনীয় কথাটাও উনিই বলেন — "সেকুলার বাহিনী প্রয়োজন আজ ভারতবর্ষের, যারা বাঁচাবে দেশকে।"

সৌমিত্রর ছবি শেষ হয় 'কমব্যাট ফ্যাসিজ্‌ম' ডাক দিয়ে। সেকুলার বাহিনী গড়া অথবা ফ্যাসিবাদকে রোখবার পথে গত আট দশ মাসে আমরা কতটা এগিয়েছি জানি না। তবে কলকাতার তিনজন তরুণ কিছুটা কাজ অন্তত করেছেন নিঃসন্দেহে বলা যায়। শোনা যাচ্ছে এঁরা গুজরাতের পরবর্তী অবস্থা নিয়ে আর একটা ছবি তৈরির পথে। আশা করা যায় পরের ছবিটা আরও একটু গোছানো হবে—অপ্রয়োজনীয় অথবা একটু বেশি কর্কশ আবহসঙ্গীত নিশ্চয়ই থাকবে না সেখানে। 'নাথিং অফিসিয়াল' তথ্যচিত্র হিসাবে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিশ্চয়ই। তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশ আমাদের। ধর্মভীরু, কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোটি কোটি দেশবাসী। নিরক্ষরতা, দারিদ্র আর স্বপ্নহীন হতাশাই ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরির উর্বর ক্ষেত্র। এই কাজে বিশ্বায়নের যুগে ভারতবর্ষের ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের প্রধান অস্ত্র সঙ্ঘ পরিবারের সুপরিকল্পিত সাংস্কৃতিক আধিপত্য। এর বিরুদ্ধে সেকুলার সাংস্কৃতিক কর্মীদের শিল্পকর্মই হতে পারে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। আমাদের সংস্কৃতিচর্চা নিয়ে অনেক কটাক্ষ। অনেক কর্কশ মন্তব্য সত্ত্বেও আমাদের রাজ্য তথা কলকাতা এখনও আছে সামনের সারিতে।

মৃণাল সেনের 'আমার ভুবন' গুজরাট-হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে নিঃশব্দ তন্নিষ্ঠ প্রতিবাদ। এ ছবি নিয়ে চতুরঙ্গের পাতায় আলোচনা হয়েছে এর আগেই। আমাদের শহরের সেকুলার সংস্কৃতিচর্চার সামনের সারির অন্যতম একজন অপর্ণা সেন। তাঁর নতুন ছবির নাম 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার'। ছবির কাহিনি- চিত্রনাট্য সবই পরিচালকের নিজের। ছবি তৈরির কাজ যখন শুরু করেছেন অপর্ণা তখনও বজরঙ দলের গুজরাট কাণ্ডের ভয়ঙ্কর চেহারা ফেটে পড়েনি,তবে গুজরাটে যে নরেন্দ্র মোদির নিউটনীয় বলবিদ্যার পরীক্ষা শুরুর প্রস্তুতি চলছে গত প্রায় পাঁচ সাত বছর ধরে তা আমরা জেনেছি ইতিমধ্যে। 'কমব্যাট কমিউনালিজ্‌ম' পত্রিকার সম্পাদক তিস্তা শীতলাবাদ বহু আগে থেকেই আমাদের সতর্ক করেছেন সংঘপরিবারের গুজরাট পরীক্ষা নিয়ে। কলকাতার অগ্রণী সাংস্কৃতিক কর্মী হিসাবে অপর্ণাও এ বিষয়ে তাঁর উদ্বেগ জানিয়েছেন, প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন। ২০০২ এর শেষে আমরা পেলাম অপর্ণার নতুন ছবি-নতুন ভাষা-নতুন আঙ্গিকে। সংবাদপত্রে ইতিমধ্যেই একাধিক নিবন্ধে ছবিটি নিয়ে আলোচনা করেছেন বিদগ্ধজনেরা। প্রথমেই বলা যায় কাহিনি এবং চিত্রনাট্যে নিশ্চয়ই চমক এনেছেন অপর্ণা সেন। তাঁর আগের সবকটি ছবিই মূলত মানবিক সম্পর্কের জটিলতা আর টানাপোড়েন নিয়ে আধুনিক মননের চিত্রায়ণ। তাঁর প্রথম দিকের কয়েকটি ছবিতে মানবিক-ব্যক্তিগত সম্পর্কই মূলত প্রাধান্য পেয়েছে। আবার পরের দিকে যেমন 'যুগান্ত'তে পারিপার্শ্বিক সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা এসেছে অনেকটা খোলাখুলিভাবেই কিন্তু ব্যক্তিসম্পর্কের জটিলতার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে। সম্ভবত 'মি. অ্যান্ড মিসেস আইয়ার' এ অপর্ণা সেন তাঁর নিজের আগের ছবিগুলোর কাহিনি বিন্যাস থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

একদিকে একটি সম্পর্ক শুরু থেকে গড়ে ওঠার অসাধারণ অথচ আটপৌরে চিত্রায়ণ অন্যদিকে এই সম্পর্কের জটিলতার ভাঁজে ভাঁজে সামাজিক সম্পর্কের সমস্যা নিয়েও গভীর মন্তব্য ছবিটিকে করে তুলেছে অনবদ্য। দুটি একেবারে অপরিচিত নারী-পুরুষের প্রথম পরিচয় হয় ভারতবর্ষের এক পাহাড়ি এলাকা থেকে তাদের বাস যাত্রার শুরুতেই। কলকাতার উদ্দেশে ট্রেন ধরতে যাচ্ছেন দু'জনেই, একজন পেশাদার ফটোগ্রাফার, অন্য জন তুলনামূলক কম বয়সেই বিয়ে হওয়া এবং মা হয়েছেন সম্ভবত বছর খানেক হয়নি এখনও। মা-সন্তানকে নিয়ে যাচ্ছেন কলকাতায় স্বামীর কাছে। তরুণ ফটোগ্রাফার মানুষটি অপর্ণা সেনের প্রিয় চরিত্রদের ধাঁচের, একটু বাউণ্ডুলে কিন্তু নিজের কাজের ব্যাপারে ষোলো আনা নিয়মানুগ। পথিমধ্যে বাস আটকে পড়ে। জানা যায় সংলগ্ন এলাকায় দু'সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে হিংস্র সংঘর্ষের জেরে জারি হয়েছে কারফিউ। অগত্যা সারি সারি সব যানবাহনের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায় তাদের বাসটিও। এই পর্যন্ত অপর্ণা সেন

ছিলেন আগের অপর্ণা সেনেই। এর পরই প্রায় নিজের তৈরি প্রথা বা গণ্ডির বাইরে বেরোলেন অপর্ণা। বাসের মধ্যে মুসলমান যাত্রীদের খোঁজে এল হিন্দু গেরুয়া-গুণ্ডার দল। লাঠি হাতে হিন্দুবাহিনী বাস থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল বৃদ্ধ মুসলিম-দম্পতিকে। তরুণ ফটোগ্রাফার, যার সঙ্গে ইতিমধ্যেই তরুণী মীনাক্ষী আইয়ার আর তার ছোট্ট বাচ্চার এক না বলা দরদী সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করেছে, তিনি যে একজন মুসলমান এটাও মীনাক্ষী জেনেছে হিন্দু-গুণ্ডার লাঠি হাতে বাসে ওঠার একটু আগেই। তাৎক্ষণিক স্বতঃস্ফূর্ত মানবিক তৎপরতায় গুণ্ডাদের সামনে রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের গৃহবধূ মীনাক্ষী নিজেদেরকে পরিচয় দেন 'মিঃ অ্যান্ড মিসেস আইয়ার' বলে। হতবিহ্বল-কৃতজ্ঞ ফটোগ্রাফার জাহাঙ্গির চৌধুরী প্রাণে বেঁচে যান। এরপরও চিত্রনাট্য বহু বিস্তৃত। নদীর ধারে বৃদ্ধ মুসলিম দম্পতির হত্যাচিহ্ন, দাঁতের পাটির খালি বাক্স থেকে ভাঙা চশমা। দায়িত্বশীল তৎপর পুলিশ অফিসারের বদান্যতায় 'মি. অ্যান্ড মিসেস আইয়ার' ঠাঁই পান জঙ্গলের ভেতর প্রায় পরিত্যক্ত এক বাংলোয়। নিঝুম রাতে শিশিরের টুপ টুপ শব্দ আর দূরে গৌতম ঘোষের ক্যামেরায় নিপুণভাবে ধরা পড়া হরিণের দল—সমস্ত পৃথিবী স্তব্ধ, এদিকে আমরা হলের ভেতরের দর্শকরা সমস্ত হৃদয় নিঙড়ে নিয়ে উপভোগ করছি নৈসর্গিক সৌন্দর্য আর মানবিক সম্পর্কের সম্মিলিত অপরূপ এক দৃশ্যকাব্য। হঠাৎ শিশিরের স্তব্ধতা হারিয়ে যায় আক্রান্ত মানুষের প্রাণভিক্ষার আকুল চিৎকারে। এ রকম অনেক দিন মনে রাখার মতো বেশ কয়েকটি দৃশ্য নির্মাণ করেছেন অপর্ণা। তাঁর নিজেকে ভেঙে গড়ার এই নতুন সৃষ্টিতে।

এই নিবন্ধের প্রারম্ভিক জিজ্ঞাসায় ফিরে যেতে হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হুবহু বিবরণ বা হিংসার বর্ণনা দাঙ্গা চলাকালীন সময়ে প্রচারিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এই সাধারণ সেকুলার সিদ্ধান্তকে গুজরাট কাণ্ডের ধাক্কায় আমরা অনেকটাই পরিবর্তনে সম্মত হয়েছি। উল্টো দিক থেকে বলতে গেলে এই প্রথম গুজরাট-কাণ্ডের তিনমাস ২০০২-এর মার্চ-এপ্রিল-মে জুড়ে বিভিন্ন টিভি ক্যামেরার বিশেষত স্টার নিউজের জলজ্যান্ত-তীক্ষ্ণ আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয়েছে নরেন্দ্র মোদি, আদবানির ত্রিশূলধারী হিন্দুবাহিনীকে। গুজরাটে একপাক্ষিক গণহত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সারা ভারত জুড়ে মানসিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এই প্রচারযুদ্ধের ভূমিকা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। এই প্রেক্ষিতে অপর্ণা সেনের ছবিতে হিন্দু সাম্প্রদায়িক গুণ্ডাবাহিনীর নৃশংসতাকে নগ্ন করে দেখানোতে বর্তমান নিবন্ধকারের অন্তত ষোলআনা সমর্থন আছে। বৃদ্ধ-মুসলিম দম্পতিকে বাস থেকে নামানোর দৃশ্য এবং তারপর নদীর ধারে তাঁদের চশমা ইত্যাদি দেখানোর মধ্যে হত্যাকে চাক্ষুষ না দেখিয়েও দর্শকের ঘৃণা এবং ক্রোধের উদ্রেক নিঃসন্দেহে ছবিটিতে অন্য মাত্রা যোগ করেছে।

তবে সবিনয়ে অন্য একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে পারা যায় না। সাধারণভাবে ভারতবর্ষের একটি পাহাড়ি অঞ্চল যেখান থেকে কলকাতার ট্রেন ধরতে যেতে হবে শুধু এইটুকু বললে সম্ভবত কিছুটা দায়সারা গোছের হয়ে যায়। কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের দর্শকের কাছে তো বটেই দেশের বাইরে বিশেষত ইউরোপ আমেরিকার দর্শকদের কাছে আকারে ইঙ্গিতে ছবির পুরো ঘটনাস্থল পশ্চিমবঙ্গ মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। এখানে দুটো প্রশ্ন অপর্ণা সেনের কাছে রাখা যায়ই। এক, সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গের কোনও শহর বা গ্রামাঞ্চল এবং গুজরাটের গণহত্যাকাণ্ড — দুটি যে সম্পূর্ণ ভিন্ন জায়গায় এ কথা বলার দায় কি পরিচালকের থাকে না? নিশ্চয়ই এই দায় রাজনৈতিক দায়—শিল্পীর দায়। কেউ কেউ 'মি. অ্যান্ড মিসেস আইয়ার' কে ব্যক্তিমানুষের আইডেনটিটি খোঁজার চিরন্তন সমস্যার চিত্ররূপ হিসাবে দেখতে চেয়েছেন—তাঁরা বিদগ্ধজন। কিন্তু আমাদের মতো ভাল সিনেমার মেঠো দর্শকদের কাছে ছবিটি নিঃসন্দেহে একটি শিল্পসম্মত রাজনৈতিক ছবি। এবং এই সময়ে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক বলিষ্ঠ রাজনৈতিক ছবি। তাই রাজনৈতিক দায়টাও অস্বীকার করা যায় না। সারা দেশে সেকুলার বাহিনী গড়ার যে আহ্বান সৌমিত্র'র ছবিতে প্রবীণ গান্ধীবাদী নেতা জানিয়েছেন সেই বাহিনীর সামনে যে মৃণাল সেন, মহাশ্বেতা দেবী, অপর্ণা সেন, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শহর কলকাতা থাকবে এ বিষয়ে কি কোনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকা উচিত? আর এটাও তো সাদামাটা বাস্তব হিসাবেও সত্য যে গত বছর পঁচিশ পশ্চিমবঙ্গের কোথাও এই ধরনের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পরিস্থিতি হয়নি যেখানে বাস থেকে টেনে টেনে মুসলমানদের খুন করতে পারছে হিন্দু গেরুয়া বাহিনী বিনা বাধায়। ইতিহাসবোধ বাদ দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির মধ্যেও আমরা কি পারব আমাদের এই শহরের এই প্রদেশের সেকুলারিজমের শক্ত মাটি ধরে রাখতে? দুটি কথা বলে নিবন্ধ শেষ করা উচিত এবং এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের কিছু দিন আগের জওহরলাল নেহরু স্মারক বক্তৃতা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। বিস্তৃত বক্তৃতায় অধ্যাপক সেন বলেছেন একদিকে যেমন শ্রেণী সম্পর্ক-শ্রেণী বৈষম্য-শ্রেণীদ্বন্দ্ব সামগ্রিক সমাজ পরিবর্তনের কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত জরুরি বিচার্য ঠিক তেমনই বর্ণগত, সম্প্রদায়গত, ভাষাগত, লিঙ্গগত সম্পর্ক, বৈষম্য এবং দ্বন্দ্বও সমধিক গুরুত্ব সহকারে বিচার্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে শ্রেণীবৈষম্য নিরপেক্ষভাবে সম্প্রদায়গত, ভাষাগত, লিঙ্গগত বৈষম্য নিয়ে আন্দোলন আমাদের কোনও ইতিবাচক ভবিষ্যতে পৌঁছে দিতে পারবে বলে মনে হয় না। তাই ধান ভানতে শিবের গীত হলেও এ কথা বলতেই হবে যে সংগঠিত বাম রাজনীতির শক্তপোক্ত শ্রেণী বৈষম্য বিরোধী সংগঠিত আন্দোলনই এ রাজ্যের

সেকুলার জমির প্রধান ভিত্তি। অপর দিকে সংগঠিত বাম আন্দোলনের সাংস্কৃতিক চিন্তার জগতেও এই পরিবর্তন আনা জরুরি যে সম্প্রদায়গত-লিঙ্গগত-বর্ণগত ভাষাগত-জাতিগত বৈষম্য বিষয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড কখনও শ্রেণী বৈষম্য বিষয়ক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরোধী তো নয়ই বরং পরস্পর হাতধরা ধরি করে চললে তবেই মোদি-সুদর্শন-তোগাড়িয়াদের উন্মাদ আস্ফালনের মুখোমুখি হতে পারব আমরা।

প্রতিবেদন

৮ম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব : অ্যাঞ্জেলোপৌলোস, মাস্ত্রোইয়ানি, মার্কো বেচিস ......

মেঘ মুখোপাধ্যায়

গত বছরের প্রথম দিকে উঁকি দিতে দিতে ক্রমশ প্রকাশ হয়ে পড়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অভূতপূর্ব আর্থিক সংকটের খবর। সরকারই স্বীকার করে নেন। তারপর থেকে তীব্র আর্থিক সংকটের কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নানা ক্ষেত্রে খরচ কমানোর সিদ্ধান্ত নিতে থাকেন। এমন অবস্থায় সরকারি অর্থব্যয়ে নানা রকমের সাংস্কৃতিক উৎসব পালন কত দুর সঙ্গত, সে নিয়ে প্রশ্ন ওঠা ছিল স্বাভাবিক। সরকারি আয় থেকে যখন শিক্ষকশ্রেণীকে নির্দিষ্ট সময়ে মাইনে দেওয়া দুরূহ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা যাচ্ছে না, প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র আর হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক, চিকিৎসাসহায়ককর্মী আর ওষুধপত্রের যোগান দেওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে, জনসাধারণের টাকায় যখন জনসাধারণের উপযোগী জরুরি পরিষেবা বহাল রাখা ও বিস্তার করা দিনদিন কঠিনতর হয়ে পড়েছে এবং এতাবৎকালের নানা করমুক্ত পরিষেবায় নতুন করে কর আরোপিত হচ্ছে—এমন দুঃসময়ে বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসবে উদ্যোগী হওয়া কোনও সরকারের পক্ষে কতটা বাঞ্ছনীয় হবে—এমত নানা কৌতূহলের নিরসন ঘটিয়ে যথারীতি ৮ম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন হয়ে ছিল ১০ নভেম্বর ২০০২। উৎসব বন্ধ হল না বটে তবে খরচের বরাদ্দ অনেকটাই কমানো হল—যার ফলে কমল জাঁকজমক আর ছবির সংখ্যা। যাঁরা দেশ-বিদেশের ভাল ছবির ঐতিহ্য আর সাম্প্রতিক বা আধুনিক ধারার সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ গড়ে তুলতে উৎসুক হয়ে থাকেন, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন তাঁরা—কারণ গত সাত বছরে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব তাঁদের কাছে এক অমোঘ আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। কোনও কোনও মহল থেকে সরকারি বদান্যতায় উদযাপিত এই বার্ষিক চলচ্চিত্র উৎসবের ওপর কটূক্তি বর্ষিত হলেও—সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণালের এই ছবির বাংলায় এই ছবির পার্বণ সগর্বে স্থান করে নিয়েছে। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবকে বাদ দিয়ে এখন আর নভেম্বর মাসকে ভাবা যায় না।

সমগ্র রাজ্যের আর্থিক অবস্থার বিচারে চলচ্চিত্র উৎসবের খরচ কমানোর সিদ্ধান্ত ছিল যথার্থ। তাতে উৎসবের বৈচিত্র কমেছে ঠিকই কিন্তু বিরাট যে হানি হয়েছে তা নয়। উদ্যোক্তারা সংকুচিত সামর্থের মধ্যেই উৎসবের মান বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। কিছু মাঝারি মানের ছবি যেমন ছিল তেমনই স্মরণীয় ছবিও কিছু দেখানো হয়েছে এতে সন্দেহ নেই। উৎসবের আয়তন খানিক ছোট হয়ে আসার ফলে এমনও তো মনে হল যে গত কয়েক বছরে এই উৎসব ক্রমশ যে বিশাল আকার ধারণ করছিল—তাতে প্রকৃত সমঝদারদের কাছে অসুবিধার একটা দিক ধরা দিচ্ছিল—অসংখ্য ছবির ভিড়ে ভাল ছবিগুলো, দেখার যোগ্য গুণমানের ছবিগুলো ঠিকমতো দেখা হয়ে উঠছিল না; একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে বিখ্যাত ছবিগুলির প্রদর্শনী চলায়—অনেকের পক্ষেই অনেক ছবি দেখার সুযোগ পাওয়া মুশকিল হচ্ছিল। তবে এটাই নাকি চলচ্চিত্র উৎসবের নিয়ম। পরিশ্রমী উদ্যোক্তারা সারা বিশ্ব ছেঁকে বেশি সংখ্যক উঁচুমানের ছবি সংগ্রহ করে আনতে সক্ষম হলেও সমস্ত উৎসাহী দর্শককে তা মনের সাধ মিটিয়ে দেখাতে সফল হন না—উৎসবের নির্দিষ্ট সময়সূচির এবং সীমিত প্রেক্ষাগৃহের মধ্যেই তাদের ধরাতে হয়—এরকম বাধ্যবাধকতা থাকেই—যত সদিচ্ছাই থাক না কেন সবাইকে সন্তুষ্ট করা যায় না। কিছু ভাল ছবি দেখতে গিয়ে কিছু ভাল ছবি বাদ চলে যাওয়ার আফশোস একজন দর্শকের বুক ভার করে রাখবেই। বাছাই করার ভারটা গত কয়েক বছরে জোরালো হচ্ছিল। কোন বিভাগের কোন ছবি না দেখলেই চলে না, কোন ছবি না

দেখলে আফশোস করতে হয় না— এমনতর বাছবিচারের মধ্যে এক ধরনের ভার আছে। তা মনকে সহজ হতে দেয় না।

সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে ছবির সংখ্যা কম হওয়ায় এবং সম্ভবত বিভাগের পরিমাণ কমে যাওয়ায়— এ বার ছবি দেখার সুবিধা হয়েছিল বেশি। মনের ওপর অযথা চাপ ছিল না। বেশি বাছবিচার করতে হয়নি। মানতেই হবে যে এ এক প্রকার স্বস্তি। কী দেখতে গিয়ে কী হারাচ্ছি, কী দেখা হল না— এই পীড়াদায়ক বোধ মনকে খুঁচিয়ে মারে না। মনে করে নিতে পারি, আমি এই প্রেক্ষাগৃহে এ সময়ে বসে যে ছবিটি দেখছি ঠিক এ-সময়ে উৎসবের অন্য কোথাও অন্য কোনও এর চেয়ে ভাল ছবি দেখানো হচ্ছে না। আমি তো এই ছবিটিই দেখতে চেয়েছিলাম।

তবে নন্দন-২-এর সামনের লাউঞ্জে প্রতি উৎসবে সে-বছরের মুখ্য পরিচালকদের প্রদর্শিত ছবির স্টিল-সহযোগে যে প্রদর্শনী করা হয়— যা ঘুরে দেখে সবাই আনন্দ পান— এবার তা বাদ দেওয়া একদম ঠিক হয়নি। এই প্রদর্শনীর আয়োজন না করে সরকারি কোষাগারের এমন কী খরচ বাঁচানো গেল বুঝলাম না। অথচ একটি চলচ্চিত্র উৎসবের পক্ষে এ-প্রদর্শনী অপরিহার্য বলেই মনে হয়।

লাতিন আমেরিকার যে-পরিচালকের ছবি 'পুত্র-কন্যারা' দিয়ে অষ্টম ক. চ. উৎসবের উদ্বোধন হয়েছিল সেই মার্কো বেচিসের কয়েকটি ছবি দেখতে পাওয়া অবশ্যই এবারের উৎসবের এক বড় প্রাপ্তি, এতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু গ্রিক পরিচালক থিও অ্যাঞ্জেলোপৌলোসের এক গুচ্ছ ছবি দেখা এক জীবনের পক্ষে স্থায়ী আর স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। তেমনই জোরালো অভিঘাত হয়েছে শ্রদ্ধার্ঘ্য বিভাগে মার্চেল্লো মাস্ত্রোইয়ানি অভিনীত বিভিন্ন প্রসিদ্ধ পরিচালকের ছবিগুলির (যাঁদের মধ্যে অ্যাঞ্জেলোপৌলোসও রয়েছেন)। আর ভোলা যাবে না গত বছর বিদেশি ভাষা-বিভাগে অস্কারজয়ী 'নো ম্যানস ল্যান্ড' দেখার সুযোগ। বিচ্ছিন্নতাবাদ-গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত আধুনিক পৃথিবীর, শিরদাঁড়ায় কাঁপন ধরানো ভয়াবহ রূপটি চলচ্চিত্রায়িত হয়ে রয়েছে 'নো ম্যান্‌স ল্যান্ড'-য়ে। তেমনই বলতে হয় অপর্ণা সেনের সাম্প্রতিক ছবি 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার'-এর কথা। অপর্ণা সেনের স্বরচিত ঘরানার বাইরে বেরনোর এক সাহসী প্রয়াস এই ছবিটি তাঁকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা দেবে বলে মনে হয়। হিন্দু মৌলবাদের হিংস্র রূপটিকে তিনি এ ছবিতে নির্দয়ভাবে উন্মোচন করে দেখিয়েছেন। যদিও এ-জন্য একটা মন-কেমন করা মিষ্টি প্রেমের গল্পের আশ্রয় নিতে হয়েছে তাঁকে — কিন্তু সেটা তাঁর উদ্দিষ্ট নয়। তিনি তাঁর মতো করে এক প্রচ্ছন্ন প্রেমের গল্পকে অবলম্বন করেছেন আজকের ভারতবর্ষ জোড়া এক বীভৎস অমানবিকতাকে আক্রমণ করার জন্য। সাধারণ দর্শককে ছবিটা দেখানোর এটা এক কৌশল হতে পারে। কিন্তু সাধারণ ভারতবাসী, সাধারণ ছবি দেখিয়ে দর্শক ইংরেজি ভাষায় কতদূর ছবিটার কাছাকাছি যেতে পারবে তা নিয়ে সংশয় রয়ে গেল। তিনি ছবিটা হিন্দিতে করলে এর প্রভাব হত আরও ব্যাপক।

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগের জটিল ও নৈরাশ্যজনক জগৎ তথা আমাদের এই সভ্যতাকে বোঝবার জন্য মার্কো বেচিস, অ্যাঞ্জেলোপৌলোসের ছবি কিংবা নো ম্যানস ল্যান্ডের মতো ছবিগুলি অত্যন্ত জরুরি। আমার ভুবন কিংবা মি. অ্যান্ড মিসেস আইয়ারও তেমন মনোযোগ দাবি করে আমাদের দেশকালকে বুঝতে। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ভেনেজুয়েলার ছবির ওপর এবার প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া ছিল অ্যাঞ্জেলোপৌলোস, মাস্ত্রোইয়ানি, অপর্ণা সেন এবং মণিরত্নমের ছবির রেট্রোসপেকটিভ। 'কাহিয়ে-দু-সিনেমা'-এর পঞ্চাশবর্ষপূর্তি স্মরণীয় করে রাখতে ওই গোষ্ঠীর পরিচালকদের কয়েকটি ছবি দেখানো হল। মাস্ত্রোইয়ানি অভিনীত চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ হিসাবে বিবেচিত কয়েকটি ছবি দেখতে দর্শকদের মধ্যে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। যেমন ভিসকন্তির 'সফেদ রাত' (৫৭), আন্তনিওনির 'লা নত্তে' (৬১), ফেলিনির 'লা দোলচে ভিটা' (৬১)। অধিকাংশ তরুণ এমনকী অনেক প্রবীণ চলচ্চিত্রপ্রেমিকও এই ছবিগুলির নাম শুনেছিলেন এবং এগুলির আলোচনা পড়েছিলেন কিন্তু দেখার সুযোগ পাননি। এবার তাঁদের প্রতীক্ষা পূর্ণ হল। এই মহান অভিনেতার সাক্ষাৎকারভিত্তিক তাঁর আত্মজীবনীমূলক একটি ছবি দেখা ছিল এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা: 'আই রিমেমবার, ইয়েস, আই রিমেমবার' (৯৭)। সত্তর বছর বয়সী শিল্পী তাঁর শৈশব-কৈশোর-পরিবার-সিনেমায় আসা এবং বিভিন্ন বড় মাপের পরিচালকের সঙ্গে তাঁর কাজ করার অভিজ্ঞতার কথা বলে যাচ্ছেন। তাঁর আনন্দ-বেদনা-ক্লেশ-প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি-ব্যর্থতার কথা। একটা বড় মাপের অবিস্মরণীয় ডকুমেন্টারি ফিল্ম। এক মহান শিল্পীর জীবনের কত দিক ছবিটিতে উদঘাটিত হয়েছে। তাঁর আত্মকথনভঙ্গিমা—উচ্চারণের উত্তেজনা, উৎসাহ, আত্মপ্রকাশের অভিব্যক্তি মুগ্ধ হয়ে দেখবার শোনবার। নেপলসের মনোরম সমুদ্র সৈকতে বসে, কখনও আবার বোটে বা স্টিমারে চড়ে মাস্ত্রোইয়ানি তাঁর শিল্পীর জীবন আর সাধারণ মানুষের জীবনকে মেলে ধরছিলেন। সাধারণগোছের একটা ছেলে কী করে দুর্দম প্রাণের তেজে, অভিনয় ভালবেসে এত বড় এক শিল্পী হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল তাঁর কথা যেন না ফুরোয়—আমরা আরও ঢের শুনতে চাই।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে অসাধারণ এক নৃত্যশিল্পীর জীবন নিয়ে পল কক্সের ছবি Diaries of Nijinisky দেখার মুগ্ধতা।

শিল্পীর ডায়েরি অবলম্বন করে পল কক্স তাঁর জীবনী তথা জীবনদর্শন আর শিল্পদর্শন রচনা করেছেন ক্যামেরা দিয়ে। ডায়েরির পৃষ্ঠা থেকে পর্দায় মূর্ত হচ্ছে জীবন-শিল্পীর উদ্ভাবিত বিশেষ নৃত্যশৈলী মেলে ধরছে জীবনের তরঙ্গভঙ্গকে। শিল্পীর অনুভব, মানসিক গঠন, চিন্তাধারার উপযোগী চিত্রভাষা নির্মাণে পরিচালকের সার্থকতা দর্শকমণ্ডলীর প্রশংসালাভ করেছে।

স্বৈরাচারী উৎপীড়ক শাসকের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রাম আর সেই উদ্দেশে জীবনপণ করা মুক্তিসেনানীদের ওপর স্বৈরাচারী শাসনের ভয়াবহ নিপীড়নের ঘটনা চিত্রায়িত করেছেন মার্কো বেচিস। লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে মিলিটারি ডিক্টেটরশিপ মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর যে দৈহিক-মানসিক নির্যাতন চালায় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র বিশ্বের সামনে উপস্থাপিত করেছেন তিনি। এ যেন অকল্পনীয়—চোখে দেখে সহ্য করা যায় না। নাৎসিরা ইহুদি নির্যাতনের ও নিধনের যতরকম পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল—বিভিন্ন ছবিতে আমরা যা দেখেছি—লাতিন আমেরিকার স্বৈরশক্তি তাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। দর্শকের সহ্যশক্তিকে ভেঙে চুরমার করে দেয় মার্কো বেচিসের ক্যামেরা। আমাদের মনে পড়ে যায় ৭ম উৎসবে দেখা পাসোলিনির শেষ ছবি Salo or the 120 days of Sodom (৭৫) এর বর্বর ভয়াবহতা। তিনি নাৎসি-নির্যাতনের নৃশংসতার চূড়ান্ত তল ছুঁতে চেয়েছিলেন ওই ছবিতে—সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ যার পরে আর কিছু কল্পনা করতে পারে না।

অ্যাঞ্জেলোপৌলোস. একেবারে ভিন্ন জাতের এক পরিচালক। উৎসবে দেখানো হয়েছে তাঁর এই ছবিগুলি — Megalexandros, Voyage to Cythera, The Beekeeper, The Suspended step of the Stork, Ullysses' Gaze এবং Eternity and a Day ।তাঁর চলচ্চিত্রের ভাষাই আলাদা। নিজের জন্য তিনি এক ন্যারেটিভ স্টাইল সৃজন করে নিয়েছেন। এ ভাষা গোদারের মতো দুরূহ নয় মোটেই। বরং কাব্যিক, না, বরং মহাকাব্যিক। কোনও বস্তু, চরিত্র বা ঘটনাদৃশ্যকে ক্যামেরা দিয়ে ধরার ভঙ্গিটিই তাঁর স্বতন্ত্র। ভূমি বা সমুদ্রের বিশাল পরিসরকে তিনি পর্দায় তুলে আনতে চান। প্রকৃতির বিশাল প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে থাকে তাঁর চরিত্রগুলি। প্রেক্ষাপটের ওপর তাঁর ক্যামেরা স্থির হয়ে থাকে, যেন নড়তে ভুলে যায়। মনে হয় আমরা যেন মঞ্চের সামনে বসে আছি। আবার চুপিচুপি ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ বদল আর গতিভঙ্গির তরঙ্গে পর্দার চার কোণের পরিসরে তিনি যে কী নিপুণ দৃশ্য-সুর রচনা করতে পারেন - তাও বিস্মিত হয়ে দেখার। তাঁর অধিকাংশ ছবির বিষয়বস্তুও মহাকাব্যিক। দেশ ও কালের বৃহৎ প্রেক্ষাপটে তিনি কাহিনি বোনেন। ব্যক্তিমানুষের চরিত্রের মধ্য দিয়ে ক্রমশ এক জাতির এবং জাতীয়জীবনের কাহিনি গড়ে তোলার দিকে তাঁর ঝোঁক। চলচ্চিত্রের পর্দার সামনে বসিয়ে তিনি আমাদের দেশের গণ্ডি—সীমান্ত— দেশ বা রাষ্ট্রের নিরিখে মানুষের আত্মপরিচয় আসলে কী—এ রকম জটিল ও জ্বলন্ত প্রশ্নের মুখোমুখি করে দেন। মহৎ কাব্যের রচয়িতাদের মতো তিনি একই সঙ্গে শিল্পী-কবি এবং দার্শনিক। তাই তিনি এক প্রৌঢ় কবি-দার্শনিককে বেছে নিয়েছেন তাঁর এ যাবৎ মহত্তম ছবি Eternity and a day -এর প্রধান চরিত্ররূপে। এই কবির সঙ্গে আবার কল্পদর্শন ঘটে অতীতের এক কবির। তিনি স্বদেশভূমি গ্রিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বহুদিন ছিলেন ইতালিতে। দেশে ফিরে এসে তিনি আবার নতুন করে শিখে নিচ্ছেন তাঁর মাতৃভাষার মধুর শব্দগুলি। পথেঘাটেপ্রান্তরে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের মুখ থেকে ঝরে পড়া ভাষার মাধুর্য তিনি খুঁটে খুঁটে তুলে নিচ্ছেন তাঁর মগজে। মাতৃভাষাকে হারিয়ে ফিরে পাওয়া, মাতৃভূমিকে হারিয়ে ফিরে পাওয়ার চেতনা অ্যাঞ্জেলোপৌলোসের অনেক চরিত্রকে আন্দোলিত করেছে ভিন্ন ভিন্ন ছবিতে। বড় ক্যানভাসে মানুষের সংকটের কথা বলতে গিয়ে কিন্তু পরিচালক কখনও একটি পরিবারের মধ্যেকার সম্পর্কগুলিকে অবহেলা করেননি। নারীতে পুরুষে, পিতা-মাতা-পুত্র-কন্যা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কের সংবেদনাকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। এইসব সম্পর্কের খুঁটিনাটির আকর্ষণ কোনও মহৎ শিল্পীই এড়াতে পারেন না।

মাতৃভূমি থেকে উৎখাত হওয়া এবং স্বদেশ-স্বজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি এবং জনগোষ্ঠীর বেদনা-হতাশা-দ্বন্দ্ব তাঁর অনেকগুলি ছবির মূল বিষয়। এই নিয়ে সত্তা নাড়িয়ে দেওয়া অসাধারণ দৃশ্য রচনা করেছেন তিনি। যেমন The Suspended Step of the Stork — ছবিতে সীমান্ত নির্দেশ করা স্রোতোস্বিনী নদীর দু'তীরে বিবাহের অনুষ্ঠান। এক তীরে দাঁড়িয়ে আছে বর আর বরপক্ষ, অন্য তীরে দাঁড়িয়ে নববধূর সাজে কন্যা আর কনেপক্ষ। দু' দেশের সীমান্তরক্ষীদের ফাঁকি দিয়ে এক হৃদয়বিদারক প্রতীকী বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। আধুনিক বিশ্বের দেশে দেশে মানুষের ক্রমবর্ধমান জাতিসত্তার সংকট নিয়ে যাঁরা ভাবনাচিন্তা করেন, কোনও জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্রতা রক্ষার সংগ্রামের যাঁরা অংশীদার কিংবা অ্যাঞ্জেলোপৌলোসের চলচ্চিত্রসমগ্র তাঁদের কাছে সম্পদ।

স্মরণে

বিনয় মুখোপাধ্যায় (যাযাবর)

জীবিতকালে বিনয় মুখোপাধ্যায় মহাশয় দু'বার মৃত বলে বিজ্ঞাপিত হলেন। যাযাবর ছদ্মনামে প্রথম বই দৃষ্টিপাতের ভূমিকায় প্রকাশকের বকলমে তিনি নিজেকে, লেখককে, মৃত বলে জানালেন। অনেক পরে জানা যায় যাযাবর হলেন দিল্লি প্রবাসী এক আমলার ছদ্মনাম এবং তিনি জীবিত। আরেকবার, যখন তিনি লেখার জগৎ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে আত্মমগ্ন হয়ে আছেন, তখন এই বেপাত্তা মানুষটির খোঁজ না পেয়ে এক বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা তাঁকে মৃত বলে জানায়। পরে যখন জানা যায় মানুষটি তখনও জীবিত, তখন, হয়ত বা লজ্জায়, সেই পত্রিকায় তাঁর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। তখন জানা যায়, তিনি শুধু জীবিত নন জীবনে, তিনি জীবিত চিন্তাজগতে, মননশীল ভাবজগতে। এই সময়ে তাঁকে সমতট থেকে প্রশ্ন করা হয়, বাইবেলে ল্যাজারাস মৃত্যু থেকে পুনর্জীবিত একবার হয়েছিলেন, আপনি দুবার। ইউজিন ওনিলের ল্যাজারাস লাফ নাটকে ফিরে আসা ল্যাজারাস বেঁচে থাকার বেঁচে ওঠার আনন্দের কথা বলেছেন। আপনি তো জানেন মৃত্যু কী। তবু কেন তা জানালেন না। তা ছাড়া নিজের হাতে মরা আর পরের হাতে মরা—এ দুটির অভিজ্ঞতাই আছে আপনার। এখানে তফাত কিছু কি আছে? প্রশ্ন শুনে স্বভাবসিদ্ধ অন্তর ভঙ্গিতে স্মিত হেসে বলেছিলেন, 'মৃত হয়ে দুবারই আমার একই ধরনের উপকার হয়েছিল। মৃত লোকের লেখা বলে দৃষ্টিপাত বাঙালি পাঠকের করুণা পেয়েছিল। আহা, বেচারা নিজের বইটা পর্যন্ত ছাপা হতে দেখল না। এই সমবেদনায় বইটা বিক্রি হল। আমারও অর্থোপার্জন হয়। আর দ্বিতীয় বারে অন্যের হাতে মারা যাবার পর যে ইন্টারভ্যুটা নেওয়া হল, সেখানেও অর্থপ্রাপ্তি ঘটে। বুঝলেন, পড়ে পাওয়া চোদ্দ পোয়া, মরে পাওয়া চোদ্দ রুপিয়া।'—শুনে জানা গেল, যে মানুষটির লেখা শব্দচয়নে ও শব্দ ব্যবহারে দীপ্ত, তিনি কথোপকথনেও দীপ্যমান। যাযাবর সর্ব অর্থে বিনয় মুখোপাধ্যায়ের alter ego আত্মস্বরূপ। আরও জানা গেল, যে কথা তিনি আলোচনায় তুলতে চান না, তা তিনি অতি সহজে এড়িয়ে যেতে পারেন। মৃত্যু নিয়ে নিজের বক্তব্য তিনি প্রকাশ করতে চাননি।

স্ত্রী দুর্গাদেবী তাঁর চেয়ে পনেরো-ষোলো বছরের ছোট, আর অনুজ ভাই নির্মাল্য প্রায় উনিশ-কুড়ি বছরের ছোট। এ দু'জনা ছিল তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ। অন্যদিকে স্বল্পবাক নিঃসন্তান দম্পতিটির স্নেহভাজন ছিল অনেকে। এখানে তিনি অকৃপণ। তাঁর সেই স্নেহ নির্বাক উদাসীন নিরপেক্ষতার মোড়কে বাঁধা। তাঁর স্নেহের স্পর্শ যারা পেয়েছিলেন, তাঁরা, কখন না জানি, তাঁকে ভালবেসেছিলেন। আপাত উদাসীন মানুষটি তাঁর ব্যবহারে ভালবাসা পেয়ে গেলেন। এখানে তিনি quietly effective — নীরব গঠনমূলক ভূমিকায়।

বাড়িতে বসার জায়গায় যামিনী রায়ের আঁকা দুটি বৃহদাকার ছবি ছিল, শুনলাম, তার একটি মৌলিক, স্বয়ং যামিনী রায়ের উপহার। অন্যটি অনুকৃতি। বৌদি দুর্গাদেবী যামিনী রায়ের শৈলীতে ছবি আঁকতেন। ওঁদের প্রশ্ন করেছিলাম, ছবিটি কি বৌদির আঁকা? এখানেও মানুষটি হেসে বলেন, 'কৌতূহল ভাল। তবু সব প্রশ্নের উত্তর জুটে গেলে জীবন বড় আলুনি হয়। কিছু কিছু অজানা থাকা ভাল।' প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রসিক মানুষটি মজা করে গেলেন। পরে জেনেছি, ছবি দুটিই বৌদির অনুকৃতি। আসল নকলে প্রভেদ প্রায় নেই বলে শোনা গল্পটা চালু ছিল। বয়সের কারণে তিনি সমতট সভাপতির পদ ছাড়তে চাইলেন। কোনও কাজ না করে পদ আঁকড়ে থাকতে তিনি চান না। তাঁর দেওয়া যুক্তির মোকাবেলা না করতে পেরে, আমরা বলি, নৈবেদ্য সাজিয়ে দিতে গেলে সবার উপরে একটি অখদ্দে আর অখাদ্য স্বর্ণবর্ণ কাঁঠালি কলা দিতে হয়। নইলে নৈবেদ্য সম্পূর্ণ হয় না। আপনি আমাদের পত্রিকার আপনার মতে অকেজো, কিন্তু আমাদের মতে শোভাময় কর্মী, কাঁঠালিকলাটি। ওটিকে বাদ দেওয়া যায় না। কলার উপমা শুনে তিনি মজা পেয়ে বলেছিলেন, 'কলা হয়ে থাকলাম। তবে জেনে রাখুন আমি আসলে কাঁচকলা, একেবারে অষ্টরম্ভা।' স্ত্রীর মৃত্যুর পর একদিন তিনি বললেন, 'আপনাদের কাঁঠালি কলাটির পচন ধরেছে; নৈবেদ্য দেওয়ার অযোগ্য। এবার রেহাই দিন।' তিনি এবার সরে গেলেন, যেমন সরে গিয়েছিলেন লেখার জগৎ থেকে।

নিজের লেখা সম্পর্কে, খ্যাত অখ্যাত বিষয়ে, তিনি এক নীরব নির্লিপ্ততাকে টেনে নিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যাসাগর পুরস্কারপ্রাপ্তির কথা অশীতিবর্ষাধিক মানুষটি জানতে পেরে বলেছিলেন, 'বেশি বয়সের একটা সুবিধা আছে। ফেলে দিয়েও ফেলা যায় না।' এই সুযোগে প্রশ্ন করা হল, একটি অসাধারণ ছোট গল্প লেখার পর আর কেন কিছু লিখলেন না। তিনি তাঁর সেই স্বাভাবিক অন্তর ভঙ্গিতে জানিয়েছিলেন, 'নিজেকে নিয়ে যে ভয় ছিল'। একটি ছোট বাক্যে তিনি তাঁর সঙ্কল্পের দৃঢ়তাকে

যাযাবরের জন্ম: ৮ জানুয়ারি ১৯০৮ মৃত্যু: ২২ অক্টোবর ২০০২

চেনালেন। শেষদিকে আমাদের পত্রিকায় তাঁর দু'তিনটি লেখা প্রকাশ হয়েছিল; হয়ত তা পুস্তক সমালোচনা, নয়ত স্মৃতিকথা। তবে তা যেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের ভুতপত্রির দেশে কাটামকুটুম খেলার মতো। নইলে, জীবিতকালে, তিনি নিজে দ্বিতীয়বার নিঃশব্দে যাযাবরের স্বেচ্ছামৃত্যু ঘটিয়ে গেলেন।

পোশাকের ব্যবহারে বড় ফিটফাট ছিলেন তিনি। তিনি বা বৌদি কে যে বেশি সুশৃঙ্খল, তা নিয়ে গবেষণা চলতে পারত। বাইরে বেরুতে হলে ধুতি পাঞ্জাবি ছাড়া পরতেন সাদা ট্রাউজার্স আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলে পাওয়া বুশ শার্ট। সব সাদা। বৌদিও সাদা ভালবাসতেন। দু'জনের আরও একটি প্রিয় বিষয় ছিল ফুল। বৌদি লিখেছিলেন বাংলা ভাষায় ফুল সাজানো নিয়ে প্রথম বই—পুষ্পপট। আর যাযাবর জানতেন গোলাপ সম্পর্কে ঊনকোটি তথ্য। তা ছাড়া দু'জনে জানতেন, শুনতেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-ধ্রুপদী সঙ্গীত এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা তাঁর মুখস্ত ছিল। মনে আছে, বৌদির মৃত্যুর পরের বছর, যখন তিনি বিরানব্বই বছর বয়সী, তখন হঠাৎ আবৃত্তি করলেন রবীন্দ্রনাথের 'যাবার সময় হলো বিহঙ্গের'— কবিতাটি। তাঁর দু'দিন পরে তিনি বাক্যহারা নিশ্চল হয়ে পড়েন। মনে হয়, যিনি দৃষ্টিপাত লিখেছিলেন, তাঁর স্মরণে মননে রবীন্দ্রনাথ নিরন্তর দৃষ্টিপাত করে আছেন। অথচ তাঁর এই রবীন্দ্রচর্চার কথা গোপন রেখে গেলেন।

তিনি সুরসাগর হিমাংশু দত্তের বন্ধু ছিলেন—গান লিখেছিলেন। যার একটি 'নতুন ফাগুন যবে'। যে গানের সুর হিমাংশু দত্তের, কণ্ঠ শচীন কর্তার। এখানেও তিনি নিজেকে সরিয়ে নিলেন। সুরসাগরের মৃত্যুর পর।

তাঁর পাঠের পরিধি ছিল বিশাল, কৌতূহলের পরিধি বিশালতর। সাহিত্য-দর্শন-ললিতকলা-সঙ্গীত এবং ক্রীড়াজগতে তিনি স্বচ্ছন্দে আলোচনায় নামতে পারতেন। টেনিস ও ক্রিকেট সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যে কোনও ক্রীড়া সাংবাদিকের অসূয়ার কারণ হতে পারত। তাঁকে দেখে বারবার মনে হত, যাকে বলা হয় রেনাসাঁস ম্যান, তিনি যেন তার প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। অথচ এখানেও তিনি প্রকাশে বিমুখ। অন্যদিকে নতুন বিষয়ে জানার আকাঙ্ক্ষায় তিনি নিজেকে সর্ব অর্থে নিযুক্ত করে গেছেন। বই পাঠে তাঁর কোনও ক্লান্তি ছিল না। তিনি সম্ভবত নাস্তিক ছিলেন না। তাঁকে মনে হত অজ্ঞেয়বাদী। স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্থৈর্য হারিয়ে বিচলিত হয়েও ঈশ্বরের কথা বলেননি। আবৃত্তি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটি। সেই প্রথম অসাধারণ ধৈর্যশীল মানুষটিকে বিচলিত দেখেছিলাম। তিনি স্বাভাবিক হতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, গানের কথায়। দেশি বিদেশি সাহিত্য-দর্শন অভিজ্ঞ মানুষটি রবীন্দ্রনাথকে একমাত্র সঙ্গী বলে বেছে নিলেন সেদিন। একের পর এক কবিতা-গান স্মৃতি থেকে তিনি আবৃত্তি করে শান্ত হয়ে বলেছিলেন, 'আমি ঠিক একা নই। রবীন্দ্রনাথ রইলেন।'

এই মানুষটি নৈবেদ্যের কাঁঠালিকলা ছিলেন না। তিনি ছিলেন আমাদের, সমতটের, গ্রীষ্মের বাতাস, বর্ষার ছাতা, শীতের উড়ানি আর সবার উপরে বসন্তের আনন্দ। চিরজীবন বিনয়ী যাযাবর মানুষটি চলে গেলেন, রেখে গেলেন স্মৃতি।

এক বছরের উপর তিনি কোমায় আচ্ছন্ন ছিলেন। রায় মহাশয়, রীনা ও মীনাকে নিয়ে গড়ে তোলা তাঁর নির্বাক নিস্তরঙ্গ সংসারটি তাঁকে ঘিরেই সচল ছিল। সেই সংসারটি থেমে গেল। জীবনে যিনি বারবার মৃত সেজে গেলেন, শেষ মৃত্যুর অপেক্ষায় তাঁর প্রতীক্ষা যেন অনন্ত হয়ে দাঁড়ায়। তবু সেই মৃত্যু যখন আসে তখন মানুষটির শান্ত মুখ দেখে মনে হয় যেন তিনি স্মিত হেসে তাঁর স্বাভাবিক অন্তরভঙ্গিতে বলে উঠবেন, 'বুঝলেন, শেষ মৃত্যুটা একেবারেই আলাদা। সে যে কত আহ্লাদের এতদিনের প্রতীক্ষার তা জানলাম।'— অথবা তিনি কিছুই হয়ত বলতেন না; যেমন প্রথমবারে মৃত্যুর কথা এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

স্বাভাবিক মৃত্যুই মানুষের কাম্য। তবু মৃত্যু আসে তার নিজের সময়ে নিজের পথে। অপ্রতিরোধ্য তার গতি। মানুষ চায় সেই মৃত্যু। যা প্রকৃতি তাকে আদরে উপহার দেয়। যা হল প্রকৃতিতে ফিরে যাওয়া; শাস্ত্র যাকে বলে পঞ্চভূতে মিশে যাওয়া। খেলাশেষে ক্লান্ত শিশু যেমন ফেরে মায়ের কোলে—এই আকাঙ্ক্ষা মানুষের। এটি সহজে প্রাপ্য নয় বলে এত চাওয়ার, এত কামনার, আকাঙ্ক্ষার। মানুষ তবু চায়। হয়ত ভুল করে। শুধু জানে, শেষ যাত্রা হল প্রকৃতিতে বিলীন হওয়া। যেখানে অপেক্ষামানা মা তাকে ধুলো ঘাম মুছে কাছে টেনে নেন।

এই কথাটি যাযাবর তাঁর জীবন দিয়ে আমাদের জানিয়ে গেলেন। তবু একটি কৌতূহল। জীবিতকালে যিনি মৃত বলে ঘোষিত হলেন, তাঁর শেষমৃত্যু এত দেরি এত ধীর-লয়ে কেন? তখনও যাযাবরের কণ্ঠে যেন শুনি, কৌতূহল ভাল। তবে সব কৌতূহলের নিরসন হয় না।

সাধন দাশগুপ্ত

সম্পাদকের সংযোজন :

'সমতট' সম্পাদক অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সরবরাহ করেছেন।

সুরসাগর হিমাংশু দত্তের সুরারোপিত যাযাবরের (বিনয় মুখোপাধ্যায়ের) লেখা গানের রেকর্ডের তালিকা (প্রথম পাঁচটি গানের সূত্র : চামেলি)। গায়কের নাম পাশে দেওয়া আছে।

১। 'বেদনাতে বিজড়িত গান'—সাবত্রী ঘোষ

(এইচ.এম.ভি. রেকর্ড নং N. 8702, কাল 1936 নভেম্বর)

২। 'উযার উদয় ক্ষণে' — হিমাংশু দত্ত
(হিন্দুস্থান রেকর্ড নং P 11809, কাল 1936 অক্টোবর)
৩। 'নতুন ফাগুন যবে' — শচীনদেব বর্মন
(হিন্দুস্থান রেকর্ড নং H 412, কাল 1936 অক্টোবর)
৪। 'নিশিরাতে কে ডাকে'— শচীনদেব বর্মন
(হিন্দুস্থান রেকর্ড নং ?)
৫। 'ঝরানো পাতার পথে' — উমা বসু
(এইচ. এম. ভি. রেকর্ড নং N. 9837, কাল 1937 ফেব্রুয়ারি)
এবং
একই গান অমলা দত্তের গাওয়া (হিন্দুস্থান রেকর্ড নং H.453, কাল 1937)
৬। 'আঁখিতে ভরিয়া জল'—সতী দেবী
(হিন্দুস্থান রেকর্ড নং P. 11802, কাল 1936)

সুরসাগরের মৃত্যুর পর বিস্ময়করভাবে তিনি নিজেকে সঙ্গীত রচনা থেকে সরিয়ে নিলেন। ফলে অনেকের কাছেই অজানা রয়ে গেছে সঙ্গীতজগতে তাঁর অবদানের কথাও।

তিনি ছিলেন স্বল্পবাক কিন্তু তাঁর মানসিক দৃঢ়তা স্বল্প ছিল না, স্বল্প ছিল না তাঁর স্নিগ্ধ সম্ভ্রান্ত ভালবাসার ক্ষমতা। জীবিতকালে তাঁর অনুরক্তের সংখ্যা ছিল অগণিত, কিন্তু দীর্ঘ comatose অবস্থাতেও তাঁর যে-অনুরাগীদের সেবাপরায়ণতা অনেকের বিস্ময়ের কারণ হয়েছে, তাঁরা হলেন, প্রায় কুড়ি বছরের ছোট পুত্রসম ভাই নির্মাল্য ছাড়া আরও চারজন 'অনাত্মীয়'—যাযাবরের সুহৃদ ও 'ম্যানফ্রাইডে' পৃথ্বীশ রায়, যিনি চব্বিশ ঘন্টা যাযাবরের বাড়ি থেকেছেন, তাঁর কোমাটোজ অবস্থার প্রায় এক বছর রাত্রে ভাল করে ঘুমোননি, যদি attend করতে হয়! যাযাবরের পড়শি চিকিৎসক তপন দাশ, যাঁর সোৎসাহ সহায়তা সময়ে অসময়ে সব সময় পাওয়া যেত। তা ছাড়া তাঁর দুই শুশ্রূষাকারিণী মীনা দাস ও তাঁর দিদি রীণা সরকার;—ভাবা যায়, যাযাবরকে যখন মাঝখানে আবার হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় তখন ঘটনাচক্রে বিনয়বাবুর জন্মদিন পড়লে এ দু'জন নিজ ব্যয়ে ফুল কিনে তাঁর জন্মদিন পালন করেন! মানুষের এ ধরনের পরিবর্তনে বা মানবায়নে হয়ত যাযাবরের পবিত্র সান্নিধ্যের কিছুটা ভূমিকা আছে, তবু এঁদের সঙ্গে অনেকেই হয়ত যোগাযোগ করতে চাইবেন—শুভেচ্ছা জানাতে বা যাযাবরের সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে। এঁদের ঠিকানা পৃথ্বীশ রায়, 525 যোধপুর পার্ক, কলকাতা 68; ডা. তপন দাশ, ইলোরা অ্যাপার্টমেন্টস, 2 গড়িয়াহাট রোড (দক্ষিণ), কলকাতা 68; মীনা দাস, খ্রিস্টান পাড়া, পোঃ গুমা, অশোকনগর, উত্তর 24 পরগণা; রীণা সরকার, (কলকাতার) রুবি হাসপাতাল, ফোন নং 2442-6091 Extn. 913.

বিজিতকুমার দত্ত (১৯৩২-২০০২)

বন্ধুর চোখে

বিজিতকুমার দত্ত সম্পর্কে একজন শিক্ষাব্রতীর মন্তব্য : 'he is a name in Bengali literature' — এতটাই শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে বিদ্যাভূমিতে তিনি প্রতিষ্ঠিত।

একজন মানুষ বিনা যোগ্যতায় তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছুতে পারেন না। বিজিতকুমার দত্ত ছাত্রাবস্থা থেকে নিজের পথ কেটেছিলেন। বাংলা ভাষায় স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় পঠনরত ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হওয়ার পর আর তাঁকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। পুরস্কারের তকমা এঁটে এঁটে অলস জীবনের ছত্রছায়ায় নিশ্চিন্ত আরামে সুখের দিন কাটাননি তিনি। পূর্ণ রজঃগুণী মানুষটি কর্মজীবনে বীরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। একের পর এক গবেষণামূলক গ্রন্থ—বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, চৈতন্য-কথা, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল ইত্যাদি, সম্পাদনামূলক কাজ—স্নাতক শ্রেণীর জন্য সাহিত্য সম্পুট, ইদানীং কালে সবুজ পত্র পর্যন্ত। এ ছাড়াও আছে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে অভিধান তৈরির কাজ।

ভাবতে অবাক লাগে এই পেটরোগা মানুষটি কীভাবে নিজেকে সবরকম খাদ্য-লোভের বাইরে রাখতে পারতেন। এ ক্ষেত্রে কোনও রকম অনুনয় বিনয়, আন্তরিক উপরোধ কোনও কিছুর সঙ্গে আপোস ছিল না তাঁর। যারা কাছে থেকে এই সংযম দেখেছে, তাদের কেউ কেউ মনে মনে শ্রদ্ধাবনত হয়েছে, আবার কেউ হয়ত মনের মতো করে খাওয়াতে না পেরে ক্ষুণ্ণও হয়েছে। ক্লিষ্ট স্বাস্থ্যের পরোয়া না করে মানুষটি অর্জুনের মতো পাখির চোখের দিকে সমস্ত সত্তাকে স্থির রেখেছিলেন যেখানে, সেখানটা তাঁর বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্র। লেখাপড়াকে কত নিবিড় করে ভালবাসলে একটি লোকের অন্য রিপুর তাড়না কমে যায় বিজিত কুমার দত্ত তার দৃষ্টান্ত। বিজিত কুমার দত্তের প্রশস্ত হৃদয়ের কাছাকাছি যাঁরা আসতে পেরেছেন, তাঁরা জানেন, কী অদ্ভুতভাবে তাঁর নিকটজনকে আগলাতেন তিনি। কী গভীর protectiveness তাঁর প্রতিটি আচরণে ফুটে উঠত। কিসে তাঁর আপনজনটির মঙ্গল হবে, অন্যের

কাছে তার যথার্থ মূল্য বেরিয়ে আসবে, কী করলে ওই প্রিয়জনটিও অন্যের কাছে যোগ্য সম্মানের অধিকারী হবে, সেসব দিকে তাঁর পুরোপুরি লক্ষ ছিল। যারা তাঁর এই প্রীতি ফল্গুর সন্ধান পেয়েছিল তারাই তাঁর আসল রূপটি ঠিকঠাক জেনেছিল।

আর ছিল তাঁর অতি সাধারণ সরল জীবন-যাপন। বাইরের প্রসাধনে নয়, পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের দ্যুতি প্রকাশ পেয়েছিল তার সাহিত্যকীর্তিতে। আনন্দবাজার পত্রিকায় সাহিত্যিক আলোচনা ও সমালোচনা বিভাগটিও তাঁর লেখনীর গুণে যথেষ্ট সমৃদ্ধ।

আবার শুধু নিজের জন্যও নয় ভবিষ্যতে ছাত্ররাও যাতে প্রেরণা পায় তার জন্যও তাঁর পক্ষ থেকে আর্থিক ও নানা সারস্বতসেবা স্মরণযোগ্য। এই সরস্বতীর পুত্রটি কণ্ঠে হয়ত সুর পাননি, কিন্তু আওয়াজটি পেয়েছিলেন 'দিল্লি থেকে বর্মা'। তাই হয়ত তাঁর নিকটজনেরা নিভৃতে বসে ভাববে, 'তুমি এসো, ফিরে এসো, তোমার গগন-বিদারী ধ্বনিতে আবার আমার নাম ধরে ডাক দাও।'

পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় আমি এই আওয়াজে অভ্যস্ত, এই দুনিয়ার এক পথ ছেড়ে আর এক পথে হাত ধরাধরি করে দু'জনে চলেছিলাম। চলার পথ বদলেছে বহুবার, কখনও রুজি-রোজগারের দায়ে আমাদের দুজনের কাউকে হয়ত দূরে যেতে হয়েছে। কিন্তু যে সম্পর্কের শক্তি আমাদের এক করে রেখেছিল বরাবর, তা একটা ছোট্ট নস্যির ডিবে মাত্র। নস্যির ডিবে কোনও নিবিড় দ্বিবাচনিক আড্ডার নিশ্চিন্ত প্রতীক চিহ্ন—আমরা দুজনেই বিশ্বাস করেছিলুম। কালের আরও পঞ্চাশটা বছর পার-করা সেই চিহ্ন, বিজিতের হাতে শেষ দিন পর্যন্ত স্মৃতির আদরে ধরা ছিল।

বিজিত আমার বন্ধু, আমি বিজিতের। সে বন্ধুত্ব সভায় সমিতিতে, অধিবেশনের বড় আসরে চমক-জাগানো কোনও সম্পর্কের সমীহ দিয়ে গড়া নয়। আগেই বলেছি, বিজিতের প্রিয়জনকে আগলে রাখার স্বভাবের কথা। একটা ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দিই ঃ সে দিন সেমিনারে আমার বলার তারিখ। একটা ঝলমলে ফোলডারে Seminer Papers ভরে নিয়ে যথারীতি একসঙ্গে চলেছি। হঠাৎ বিজিত বলল, ওই ফোলডার নিতে হবে না। কাগজগুলো একটা সাধারণ Cover File -এর মধ্যে নিয়ে নে। লেখাপড়ার সভানুষ্ঠানে কোনও বাড়তি জৌলুস যদি বেমানান লাগে। ওর আশংকা সেদিন মেনেছিলুম। আখেরে কিছু উপরি লাভও মিলে গেল। সাজে-গোজে চালে-চলনে একটু নরম, একটু সাধারণ হতে পারলে ভেতরের জোরটা বেজায় বেড়ে যায়— এই সূক্ষ্ম অথচ আড়ালের খবরটা সেদিন বিজিতই আমাকে দিয়েছিল।

পুরুষোত্তম জগন্নাথের প্রতি সুনন্দা এবং বিজিতের অনুরাগ চমকপ্রদভাবে পরস্পরের থেকে আলাদা। ভক্তির প্রতীক হিসাবে পুরুষোত্তম ছিলেন সুনন্দার অপার্থিব আবেগের বিগ্রহ। বিজিত কিন্তু জগন্নাথদেবকে বীরযোদ্ধার মূর্তিতেই মনে মনে বরেণ্য বলে মানত। বেশ মনে পড়ে, বছর চল্লিশ আগে একবার আমরা অনেকে জুটে পুরী গিয়েছিলাম। কোনও বিশেষ একটা তিথিতে পুরীর মন্দিরের জগন্নাথদেবকে পাণ্ডা-পুরোহিতেরা সন্ধ্যার পর রাজবেশে সাজায়। প্রতিটি বিগ্রহের কলেবরে সোনার হাত লাগায়, নানা অলংকারে মূল্যবান বসনে ভূষণে অস্ত্র-শস্ত্রে মহাযোদ্ধার ভয়জাগানো আবহ তৈরি হয়ে যায় মন্দিরের ভেতরে। এই বিপুল আবির্ভাব বিজিতকে একেবারে বিহ্বল করে দিয়েছিল। যিনি জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের নাথ, তাঁর কলেবরে হাতের কোনও চিহ্ন পর্যন্ত নেই— এই বিরোধটা একটা খটকার মতো ওর মনকে নারাজ করত বারেবারেই। কিছুতেই যেন মানতে পারত না। কিন্তু আমাদের সেবারের সেই পুরুষোত্তম দর্শনের পর বন্ধুবর যেন অনেকটা উদ্দীপ্ত হয়েছিল। জগন্নাথের বীরোচিত যুদ্ধউদ্যম ওর ভেতরেও যেন সংগ্রামের সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। ওই যে চাকা ঘুরছে রে ঝন্‌ঝনি/বুকের মাঝে শুনছ কি সেই ধ্বনি/... হয়ত বিজিত সেই ধ্বনি শুনতে পেয়েছিল। তখন থেকেই জগন্নাথ-অনুরাগে দত্ত-দম্পত্তির ঘর-গেরস্থালি উদভাসিত।

একদিকে পুরনো সংস্কার পেরিয়ে যাবার চেষ্টা, অন্যদিকে শুদ্ধ মনুষ্যত্বে সামিল হবার উৎসাহ— এ দুটো দিকই বিজিতের মধ্যবয়স থেকে জেগে উঠতে দেখেছি। বয়সে বা মর্যাদায় ছোট হোক অথবা বড়, কাউকে কিছুতেই পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দেবে না। বলত মাঝে মাঝে— সংসার জুড়ে মানুষকে মানুষের নুইয়ে রাখার দাপট কতই তো দেখা গেল। এর পর কি শরীর-বাঁকানো ব্যায়ামটার ওই বীভৎস ছবি দেখতে চোখ সরে? পা ছুঁয়ে প্রণাম নেওয়া-দেওয়ার সংস্কারটা তাই তো ছাড়তে চেষ্টা করা রে ভাই। এতে তার কখনই মনে হয়নি যে কেউ হয়ত ভাবতে পারে, এটা ভারতীয় শিষ্টাচারকে পীড়িত করবে।

এখন আমার বুকখালি-করা জায়গাটা কেবল স্মৃতি-রোমন্থনের। প্রতি মুহূর্তের কত আলাপচারিতা, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে, কত লেনদেন, কত পরামর্শ—সব থেমে গেল। শুধু নিভৃতে বসে মন বলে চলেছে, 'বন্ধু রহো রহো সাথে...কথা কও মোর হৃদয়ে, হাত রাখো হাতে'।

শিবচন্দ্র লাহিড়ি

পুত্রের চোখে

অধ্যাপনাজীবনের গোড়ার দিকে তাঁর ট্রেডমার্ক বেশ ছিল ধবধবে সাদা পাট ভাঙা আদ্দির পাঞ্জাবি, ধাক্কা দেওয়া ধুতি আর পা ঢাকা কাবলি জুতো। উল্টো করে চুল আঁচড়ে, কাঁধে শান্তিনিকেতনি ঝোলা নিয়ে যখন গোলাপবাগের (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রাঙ্গণ) দিকে যেতেন তখন মন জুড়ে থাকত একটাই চিন্তা—কী করে ভাল পড়াব। শিক্ষক হিসাবে সফল হবার অদম্য বাসনা তাঁকে তাড়া করত। পরের দিকে অবশ্য একটু আফসোস করতেন, বলতেন, দূর ভাল মাস্টার হবার চেষ্টায় জীবনটা কাটিয়ে দিলাম, নিজের লেখাপড়াটা হল না।

মজার কথা হল, ছাত্র দরদি এই অধ্যাপকের একলব্যের মতো শিষ্যের সংখ্যা কম। 'পাইয়ে দেওয়ার' তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না, চেষ্টা করতেন impartial থাকার। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে ভুল বোঝাবুঝির। ঘনিষ্ঠ হয়েও তাই কেউ কেউ দূরে সরে গেছেন। দুঃখ পেয়েছেন এই বিচ্ছেদে কিন্তু মনের কোণে সরে যাওয়া মানুষদের জন্য দরদ ছিল অটুট। কখনও কখনও এই হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের সঙ্গে যোগাযোগ হলে অকারণেই খুশি হয়ে উঠতেন।

শৌখিন মানুষ কোনও দিনই ছিলেন না, কিন্তু ছিল বাগান করা ও মাছ ধরার নেশা। প্রায় নাওয়া খাওয়া ভুলে বর্ধমানের বাড়িতে করতেন বাগানের পরিচর্যা। ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা গাছের গোড়ায় ড্রেনের জল ঢালার উপযোগিতা নিয়ে যখন চিন্তা করতেন, তখন মনে হত বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারার কোনও সূত্র খোঁজার চেষ্টা করছেন। ঠিক এই রকমই তন্ময়তা লক্ষ করা যেত যখন ছিপ ফেলে চুরুট হাতে পুকুর-পাড়ে মাছ ধরতে বসতেন।

বড় নেশা কিছু ছিল না। কিন্তু নস্যি, চুরুট, সিগারেট, হুঁকো এবং শেষে আবার নস্যি ধরে নেশার বৃত্তটাকে নিজেই একটা সম্পূর্ণতা দিয়েছিলেন। যখন ১২ই নভেম্বর আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখনও হাতে ধরা ছিল এক টিপ্ নস্যি।

মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। তাই বর্ধমানের সহজ সরল জীবন ছেড়ে যখন সাংসারিক সমীকরণে কলকাতাবাসী হলেন তখন হাসিমুখেই তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। চুলে তেল মাখা ছেড়ে দিয়েছিলেন সত্তরের দশকের মাঝামাঝি। ট্রেন জার্নির ধকলে বেশভূষার পরিপাট্যও কমেছিল। কিন্তু এলোমেলো চুলে, ঈষৎ মলিন ধুতি পাঞ্জাবিতেও নিজের লেখাপড়ার জীবনকে নতুন করে সাজাবার চেষ্টা করেছিলেন কলকাতায় আসার পর। উপলব্ধি করেছিলেন যে কলকাতায় তাঁর অনেক আগেই চলে আসা উচিত ছিল।

নোয়াখালির বাঙাল, তাই গুরুকন্যার সঙ্গে যখন প্রণয় হল তখন ভাবী শ্বশুরমশাই কিছুটা দ্বিধায় ছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর নিজের বাঙাল সারল্যে শ্বশুরকুলের অনেকেরই মন জয় করে নিয়েছিলেন। বর্ধমানে তাঁর এক পিসিশাশুড়ি একবার বলেছিলেনঃ 'দেখলে বিজিত কেমন লক্ষ্মীমন্ত ছেলে। মুড়ি খেয়ে তেলটা পায়ে মেখে নিল।'

প্রণয়-বিবাহ, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীতে খুব একটা লেগে লেগে থাকতে দেখা যেত না। দু'জনেরই গলা বড় ছিল। তাই অনেক সময়ই দাম্পত্য-দ্বন্দ্ব বেশ চড়া সুরেই বাঁধা থাকত। কিন্তু বহু বই-এর প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা 'সু কে বি' বলে দেয় স্ত্রীর সাহচর্যের কতটা কাঙাল ছিলেন তিনি। নিজে খুব দৃঢ় চিত্তের মানুষ ছিলেন না। স্ত্রী জোগাতেন সেই প্রয়োজনীয় মনোবল।

লেখাপড়া জীবনের মূল ব্রত হলেও, ঘোরতর সংসারী ছিলেন তিনি। কোন বাজারে মাছ ভাল, কোন তরকারিওয়ালা টাটকা সবজি আনছে, কে দিশি হাঁসের ডিম রাখে এ ব্যাপারে quality সচেতন মানুষটির ছিল তীক্ষ্ণ নজর। লোটে মাছের ভক্ত মানুষটি শীত পড়লেই ভাল নতুন গুড়ের সন্ধান শুরু করে দিতেন। নিজে বেশি খেতে পারতেন না, কিন্তু খাওয়াতে ভালবাসতেন।

ন্যায়নিষ্ঠ বিদ্যানুরাগী মানুষটি ছাত্রাবস্থা থেকেই বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। সাম্যবাদে বিশ্বাসী তাই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা পছন্দ করতেন না। অথচ সক্রিয় রাজনীতি করার মানসিকতা তাঁর ছিল না। পৌত্তলিকতার প্রবল বিরোধী হলেও, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে বসিয়ে ছিলেন দেবতার আসনে। স্ত্রীর ইষ্টদেবতা শ্রীজগন্নাথদেবকে দেখতেন শুভশক্তির প্রতীক হিসাবে।

পাঁচ বছর আগে স্ত্রী গত হবার পর খুবই কাতর হয়েছিলেন। পৌত্রের সাহচর্যে ধীরে ধীরে সেই কাতরতা কাটিয়ে ওঠারও চেষ্টা করছিলেন। অসুস্থ হয়ে পড়ার আগের দিন অবধি তিনি যথার্থই ছিলেন তাঁর পৌত্রের ধাত্রীমাতা।

সংসার এবং লেখাপড়ার জগতের মধ্যে এক সুন্দর সামঞ্জস্য তৈরি করে স্ত্রীবিয়োগের বেদনা ভোলার চেষ্টা করতেন। হয়ত সব সময় পারতেন না। না হলে হঠাৎই কেন নতুন প্যাড-এর শেষ পৃষ্ঠায় লিখে রাখবেন ঃ —

'এইভাবে শুরু আর এইভাবে শেষ
ধর্মরাজ নিয়ে নাও বিধান তোমার
কারসাজি কারচুপি করো না করো না
শেষ থেকে শুরু করো জ্বলে ওঠো তুমি
জন্মদিনে মৃত্যুদিনে জলের ফোয়ারা

জাগাও আমার প্রেম আমি ভেসে যাই
নিশ্চেতন সচেতন হোক একাকার'।

অভিজিৎকুমার দত্ত

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস,বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জীবনী), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (জীবনী), নোবেল পুরস্কার ও রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন বাংলা মৈথিলী নাটক, চৈতন্য জীবনকথা;

সম্পাদিত গ্রন্থ :

মাণিকরামের ধর্মমঙ্গল, বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, সাহিত্য সম্পুট, সেরা সবুজপত্র, পঞ্চতন্ত্র

স্মিত প্রত্যয়ী সতীর্থ : পরিমল চক্রবর্তী

কোনও কবির পক্ষে আমিত্বটিই তো কবিত্বের বিষয়বস্তু, বিশাল বিশ্বের পৃষ্ঠপটে আমিত্বের ক্ষুদ্র বিশ্বটির চেতনার অহংকারেই রেখায় রঙে, সুখে দুঃখে, আলো-আঁধারের সংগমে জেগে ওঠে রস, অথচ কবি হয়েও সদ্যপ্রয়াত পরিমল চক্রবর্তীর বাহ্য-আমিত্বে ছিল না কোনও সমারোহভার। কেমন অনায়াসে তিনি সাহিত্যপথের যাত্রীদলের সকলের পিছে, সবার নীচে স্থান নিতে পারতেন, সাহিত্যপ্রসাদের জন্য ধাবিত সতীর্থদের আকুলতার মধ্যে কেমন স্মিত প্রত্যয়ে সবার শেষে যা-বাকি-রয় সেটুকুই পেয়ে সাহিত্যতীর্থের চরণধুলায় অমরত্বের সাধনা করে গেলেন।

অপঘাতে মৃত্যুর আগের দিন সন্ধ্যায় তিনি এসে বলেছিলেন মাস-দেড়েক বাদে, জানুয়ারিতে, বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃত্তি থেকে অবসর মেলার পর, উনিশ ও বিশ শতকের লেখিকাদের জীবন ও কাব্যসাধনা বিষয়ে যে-কাজ তিনি অনেকটাই করে ফেলেছেন, স্বল্পখ্যাত অথচ প্রকৃত প্রতিভাধর কবিদের সৃজনকর্ম বিষয়ে তিনি আরও সন্ধানকর্মের মধ্যে আরও আরও অভিনিবেশে যে-ইতিবৃত্ত রচনায় ব্যাপৃত সেই-কাজে তিনি আমার সাহচর্য আরও বেশি করে পেতে চান। সেই কারণে, সোয়া দু-ঘন্টা আলোচনার শেষে বিদায়কালে তিনি আমার দুই হাত ধরে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন আমি যেন রাস্তাঘাটে বেপরোয়া চলাফেরা না করি কেননা 'বয়সে ছোট হয়েও একটা উপদেশ দিচ্ছি, মনটা নবীন থাকলেও মনে রাখবেন আপনার শরীরটা পুরনো হয়েছে, তাই সত্যদা, রাস্তাঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন।'

অন্যের চলাফেরায় আশঙ্কা যাঁর এত, তিনি পরের দিনই চতুরঙ্গ পত্রিকা কার্যালয়ে যাওয়ার পথে ধাবমান একটা ট্যাক্সির তলায় চলে গেলেন গণেশ অ্যাভেনিউতে। শরীরটি টেনে বার করার পরেও তাঁর মন তখনও সাহিত্যকর্তব্যে অবিচল, হস্তধৃত একটি বইয়ের মধ্যে ছিল প্রয়াত অন্নদাশঙ্কর রায় বিষয়ে স্বরচিত একটি প্রবন্ধ, চতুরঙ্গে প্রকাশের জন্য। পথচারীদের আনুকূল্যে উঠতে পারলেন একটি রিকশায়, চতুরঙ্গ কার্যালয়ের সামনে নামতেই চতুরঙ্গ-এর এক কর্মীর সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁরই সহায়তায় তিনি নীত হলেন মেডিকেল কলেজে। চারদিন বাদে তাঁর স্মরণসভায় তাঁর হতভাগ্য কন্যা সোমা বলল, 'বাবার সবচেয়ে বেশি ভয় ছিল রক্তপাতে, খবর পেয়ে হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে পৌঁছে দেখি বাবার মুখ দিয়ে গলগলিয়ে রক্ত পড়ছে...'।

মরণের এতটাই চুপি চুপি আগমনের এই ধরনটির কথা উনি কি শুনতে পাচ্ছিলেন নতুবা এবারকার একটি শারদ-সংখ্যায় (কালপ্রতিমা সাহিত্যপত্র) কেন তিনি মৃত্যুর ধ্রুব সত্যের কথা এইভাবে লিখলেন, 'শ্রান্ত চেতনার নদী পার হলে অখণ্ড বিশ্রাম পাবে তুমি...', কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে নিঃসীম আকাশে যে তিনটি নিঃসঙ্গ মেঘের উড়ে যাওয়ার দৃশ্য তিনি দেখেন সে কি তাঁর সঙ্গে মৃত্যুবিচ্ছেদবশত তাঁর স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্রটি?

৬৫ বছর পূর্ণ হল তাঁর এ-বছর ৬ জানুয়ারি, জীবনের সেটুকু পূর্ণতাও ঘটল না এমনিই অপঘাত-মৃত্যুতে, ২০০২ সালের ২৫ নভেম্বর অপরাহ্নে রাজপথের যানবাহনের যথেচ্ছ চলাচলের উন্মাদ গ্রাসে।

পরিমল চক্রবর্তীর কবিতাই শুধু নয়, গদ্যেও নিয়মিতভাবে আমরা পেতাম ওঁর সাহিত্যবীক্ষণ, নানা গ্রন্থপরিক্রমা বিশেষত কবিতা ও কবিদের বিষয়ে। তাই ওঁর অকালপ্রয়াণে চতুরঙ্গ ঋদ্ধ মননে ও সত্যনিষ্ঠায় শক্তিশালী এক সাহিত্যসাধককে হারাল। আমরা তো ওঁর পরিবারভুক্তই। চতুরঙ্গ পত্রের পক্ষে এই শূন্যতা অপূরণীয়।

সত্যপ্রিয় ঘোষ

জন্ম : ৬ই জানুয়ারি ১৯৩৮/ ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ

মৃত্যু : ২৫শে নভেম্বর ২০০২/কলকাতা

প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা

কাব্যগ্রন্থ — নির্বাসন, ঝর্ণা মন, রঞ্জিত ফাল্গুন, স্মৃতি-বিস্মৃতির গান, পরিস্রুত অন্ধকার

প্রবন্ধ — সাহিত্যের স্বাধিকার ও অন্যান্য প্রবন্ধ। পুস্তক বিপণি

সমালোচনা — আধুনিক বাংলা কবিতার কালপুরুষ। প্রতিভাস, ভক্তিবাদী বাঙালী কবি: কাব্যকৃতি। প্রতিভাস, তিরিশ পরবর্তী বাংলা কবিতার দিক্‌চিহ্ন। পাণ্ডুলিপি, তিরিশের স্বল্পালোচিত বাঙালী কবি। পুস্তক বিপণি, বিচিত্র প্রসঙ্গ : বিচিত্র ভাবনা। কালেকটিভ পাব,

গল্প ও সমালোচনা : রূপান্তর। পুস্তক বিপণি।

Don't Let Your Plans Come Apart

When you start to give shape to your plans, don't compromise on the quality of the products you use. Vam Organic Chemicals Ltd. brings you the Vamicol range of adhesives that are superior in every respect. Insist on Vamicol CSA, Vamicol LDB and Vamicol RB1001 to make your plans come alive.

Vamicol CSA

A white poly-vinyl acetate based adhesive, it offers 20% additional coverage over the leading competitor. For furniture assembly, wood to wood, wood to decorative laminates, ply to mica and numerous other applications.

Vamicol LDB

A synthetic resin based additive for lime and distemper binding. Actually reduces peeling, chalking and cracking. Gives a superior finish and longer life to paints.

Ensure Success With VAMICOL

Vamicol RB 1001

A rubber based adhesive, it has wide ranging applications in surface bonding of wood, leather, rubber, rexin, canvas, linoleum, etc. Its higher strength of bond, 20% extra coverage over the leading competitor and more open tack time give it the winning edge.

Marketed by

Vam Organic Chemicals Ltd
85, Skyline House, Nehru Place,
New Delhi-110 019

React/1988/90

March 2003 Registered with the Registrar প্রতি সংখ্যা পনেরো টাকা
of Newspaper for India under R. N. No. 5480/57

ENJOY

Arambagh's chicken

SERVED **FRESH-N-CHILLED**
WITHIN MINUTES OF YOUR ORDER
FROM ANY OF OUR EXCLUSIVE
COUNTERS AT CALCUTTA

ARAMBAGH HATCHERIES LIMITED

59B, CHOWRINGHEE ROAD, CALCUTTA-700 020
DIAL : 240-2179/2760/1930/0873. FAX : 91-332474137
Sales Offies. 351 5037/350 3089

PSL UniMcCann

চতুরঙ্গ

হুমায়ুন কবির এবং
আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

বর্ষ ৬২ সংখ্যা ৩-৪ ১৪১০

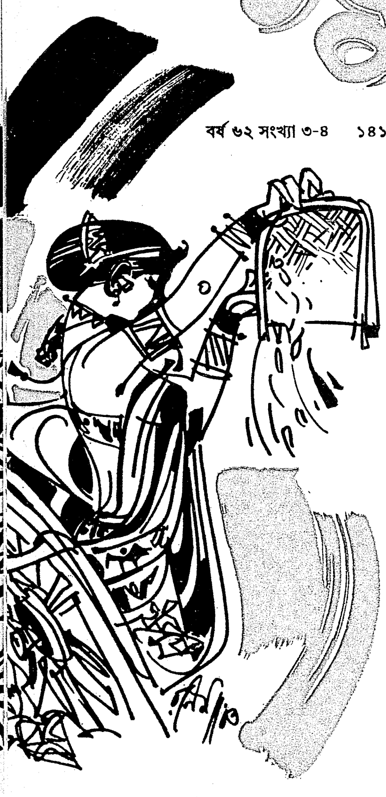

জসীমউদ্দীনের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' অবলম্বনে বাংলা কবিতায় আধুনিকতা ও তার দেশজ বিবর্তনে কবির অনন্য ভূমিকাটি চিহ্নিত করেছেন শিবনারায়ণ রায়।

লোকসংস্কৃতির ধারায় 'আত্ম-অপর' মানসিকতার অস্তিত্ব ও তার বহুমাত্রিকতা নিয়ে ড. সৌমেন সেনের তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধ।

যাযাবরের জনপ্রিয় লিখনশৈলির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি- উইট হিউমার ও স্যাটায়ার ব্যবহারের ঈর্ষণীয় নান্দনিকতা নিয়ে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা।

ধারাবাহিক 'ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়'-এ এবার দুই প্রবাদপ্রতিম সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাহিনি।

'খণ্ডিত বিজ্ঞানে'র বিধ্বংসী দাপট নিয়ে পরিবেশবিদ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের সন্দর্ভ।

শিল্পের নান্দনিক আবেদন সাধারণের দৈনন্দিন জীবনকে আদৌ প্রভাবিত করতে পারে কী? — উৎপল চক্রবর্তীর আলোচনা।

With Best Compliments From

RAJPATH

CONTRACTORS AND ENGINEERS PVT. LTD.
BL 195 SALT LAKE CITY KOLKATA - 700 091
Phone - 2359 - 1688, 2359 - 0975

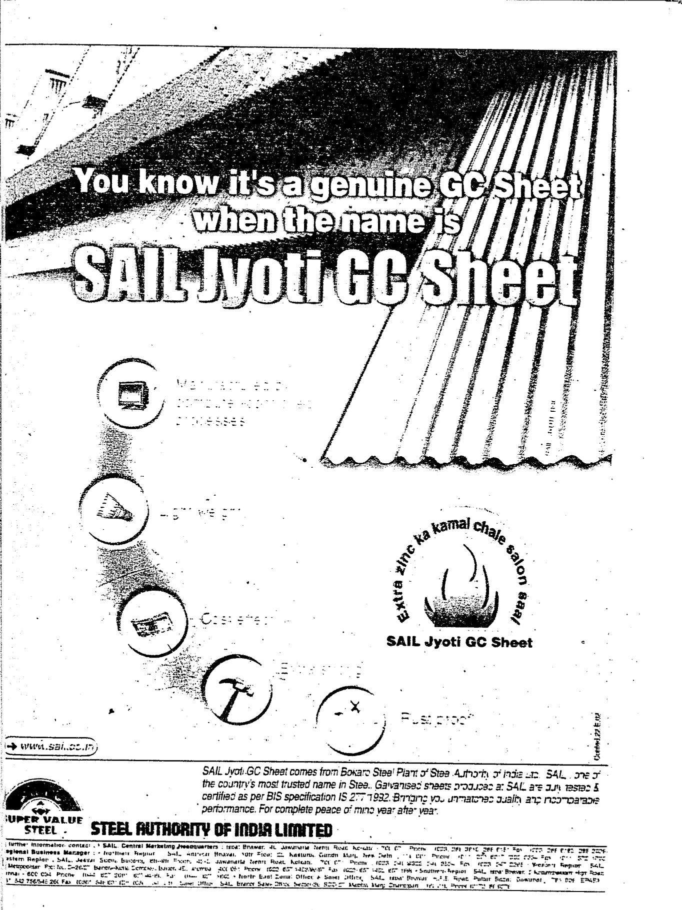

You know it's a genuine GC Sheet
when the name is
SAIL Jyoti GC Sheet
Extra zinc ka kamal chale salon saal
SAIL Jyoti GC Sheet
Rust proof
www.sail.co.in
SAIL Jyoti GC Sheet comes from Bokaro Steel Plant of Steel Authority of India Ltd. SAIL, one of the country's most trusted name in Steel. Galvanised sheets produced at SAIL are duly tested & certified as per BIS specification IS 277 1992. Bringing you unmatched quality and incomparable performance. For complete peace of mind year after year.
SUPER VALUE STEEL
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সারস্বত কেন্দ্র **পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি**

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড ❑ কলকাতা ৭০০ ০২

শুদ্ধ বাংলা
শিখতে গেলে পাশে রাখুন
আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান ১৬০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র
১০ম খণ্ড প্রকাশিত

**কা
নজরু
ইসল
রচনাসম**
তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে
৫ খণ্ডে গ্রাহকমূল্য ৬০

আরও অভিধান

আকাদেমি বানান অভিধান ৭০
পরিভাষা প্রশাসন (৩য় সং) ২৫
বাংলা বানানবিধি (৩য় সং) ৫

সাঁওতালি-বাংলা সমশব্দ অভিধান ১০০ ক্ষুদিরাম দাস
সাহিত্যের শব্দার্থকোশ ৪০ সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়
ভাষাতত্ত্বের পরিভাষা ১৮ সুভাষ ভট্টাচার্য

২০০৩ কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত গ্রন্থ

শ্রদ্ধালেখমালা : সুকুমার সেন শতবর্ষ স্মারক সংকলন ১৫০ পবিত্র সরকার সম্পাদিত ◯ সুকুমার সেন ৩০ অলোক রায় ◯ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৫০ বুধদেব দাস ◯ বাংলায় ভারতছাড়ো আন্দোলন ১৩০ অমলেন্দু দে ◯ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ৩০ অরুণ মুখোপাধ্যায় ◯ বসন্তরঞ্জন রায় ৪০ শান্তি সিংহ ◯ পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সং ১৮০ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ◯ সম্পর্ক : সম্প্রীতি বিষয়ক সংকলন ১৫০ বিষ্ণু বসু অশোককুমার মিত্র সম্পাদিত ◯ হরি মুখোপাধ্যায় ও হিন্দু পেট্রিয়ট ৯০ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ◯ গ কবিতাগুচ্ছ (বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়) ৫০ শঙ্খ ঘোষ

যোগাযোগ : দূরভাষ ২২২৩-৯৯৭৮ ২৩৫৩-০৪০৭ ফ্যাক্স (০৩৩)২২২৩-০৯৪৬ ই-মেল bakademi@vsnl.com

স্মারক নং ৬০৫৮/২০০৩ / তথ্য ও সংস্কৃতি বি

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৬২ সংখ্যা ৩-৪
বৈশাখ-আশ্বিন ১৪১০

■ সোজন বাদিয়ার ঘাট ও প্রভাববঞ্চিত প্রতিভা জসীমউদ্‌দীন - শিবনারায়ণ রায় ২০৩
■ লোকসংস্কৃতির আত্ম-অপর - সৌমেন সেন ২১১

কবিতা ২১৯

■ নির্জন প্রেমিক - শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ■ আমার কবিতা - কবিরুল ইসলাম
■ স্থিতপ্রজ্ঞ - অনন্ত দাশ ■ ছুটি-ছুটি - মিহির সরকার
■ প্রণয়রাত্রির পর - সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ■ পাগল তোমার জন্য - রূপা দাশগুপ্ত
■ সূর্যস্নান - ঋত্বিক ঠাকুর ■ ছোঁবে নাকি বুকে হেঁটে মাথা - অরুণ সেন

ধারাবাহিক স্মৃতিচারণ

■ ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় - সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত ২২৭
■ বৃহৎ ব্যবসায় ও অপবিজ্ঞানের সংযোগে অস্তিত্বের সংকট - শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৩৫
■ গল্প : বন্দিনি - জাহানআরা সিদ্দিকী ২৪০
■ যাযাবরের সাহিত্যকৃতি - অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ২৪৫

সাহিত্য সমাজসংস্কৃতি

■ সাহিত্য শিল্প বনাম ছুরি তলোয়ার : কিছু প্রশ্ন - উৎপল চক্রবর্তী ২৫২

গ্রন্থসমালোচনা ২৫৬

■ শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ■ সৌমেন সেন ■ গৌরী সেন ■ সূর্যাংশু ভট্টাচার্য
■ বর্ণালী ঘোষ দস্তিদার ■ উৎপল চক্রবর্তী ■ অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়
■ মেঘ মুখোপাধ্যায়

নাট্যসমালোচনা

■ শচীনশঙ্করের নবতম প্রযোজনা : গান্ধী - শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭১
■ স্বপ্নসন্ধানীর দুশমন নাম্বার ওয়ান - মেঘ মুখোপাধ্যায় ২৭২
■ ধ্বস্ত বিবেক যখন উচ্চকিত - সুশীল সাহা ২৭৫

স্মরণ

■ সুভাষ মুখোপাধ্যায় : অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি - পবিত্র মুখোপাধ্যায় ২৭৭
■ সংযোগের মানুষ - শঙ্খ ঘোষ ২৭৯

চিঠিপত্র ২৮৩

শিল্প পরিকল্পনা : রণেন আয়ন দত্ত

সম্পাদক : আবদুর রাউফ

উপদেষ্টামণ্ডলী

শঙ্খ ঘোষ
দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত
রণেন আয়ন দত্ত
তুষার তালুকদার

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ইম্প্রেশন হাউস, ৬৪ সীতারাম ঘোষস্ট্রিট, কলকাতা-৯
থেকে মুদ্রিত এবং গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা — ১৩ থেকে প্রকাশিত
অক্ষর বিন্যাসে - নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা - ৬
দূরভাষ : ২২৩৭-৩৭৭০

মূল্য : ১৫
ডাকে : ১৮

WITH BEST COMPLIMENTS

"TO BUILD A BETTER TOMORROW D.T.M. OFFERS
A WIDE RANGE OF CIVIL ENGINEERING AND
MANUFACTURING SERVICES UNDER ONE ROOF"

SPECIALISED IN THE CONSTRUCTION AND ERECTION OF :—

- MATERIAL HANDLING PLANTS
- LPG BOTTLING PLANTS
- 400 KV SUBSTATION & SWITCHYARD FOUNDATION
- MULTISTORIED BUILDING
- HOUSING COMPLEXES
- BRIDGE & ROADS
- FACTORY BUILDING & SHEDS
- GAS TURBINE PROJECTS
- MANUFACTURING OF PRE-STRESSED CONCRETE POLES
- DREDGING OF LAKES, CANALS, WATER RESERVOIR & RIVER BEDS
- HEAVY EQUIPMENTS FOUNDATION
- AND GOVERNMENT PROJECTS

D. T. M. CONSTRUCTION (INDIA) LIMITED

CIVIL/STRUCTURAL ENGINEERS CONTRACTORS
MASTER DREDGERS & PROMOTERS

Registered Office :
59B, CHOWRINGHEE ROAD (3RD FLOOR)
CALCUTTA – 700 020
PHONE : 240-3165, 240-3093
TELE FAX : 240-4810

35 Years' Dedicated Service to the Nation

প্রথম পছন্দ !

সেরা কেটারার বলতেই বিজলী গ্রীল।
যে-কোনও সামাজিক বা পারিবারিক উপলক্ষে কেটারিং-এর প্রয়োজনে সকলের প্রথম পছন্দ বিজলী গ্রীল। কারণ সকলেই জানেন সেরা খাবার আর সেরা আপ্যায়নে বিজলী গ্রীলের জুড়ি নেই।

Bijoli Grill

কেটারিং-এ শেষ কথা

কলিকাতা : ৯ই, রূপচাঁদ মুখার্জি লেন, কলিকাতা-৭০০ ০২৫
ফোন : ৪৫৫-২৩৬০/৩৯২২/৫৫৪১, ফ্যাক্স : ৯১-৩৩-৪৫৫ ২৭৬৬

দিল্লি : সি/১৯৫, গ্রেটার কৈলাস, পার্ট-১, নিউ দিল্লি-১১০ ০৪৮
ফোন : ৬৪৮-০৫০২, ৬২৮-৭৩৭১, ৬৮৮-১৮৫৫, ফ্যাক্স : ৬২৩-৪৯৩৯

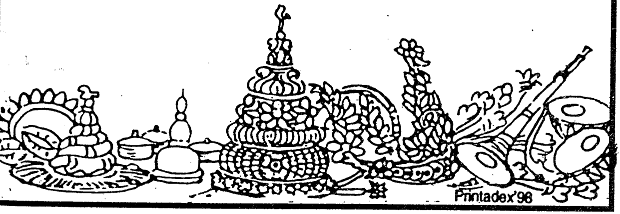

Rasoi

RASOI LIMITED

বিদ্যুৎ চুরি ঃ

জনগণের অবগতির জন্য

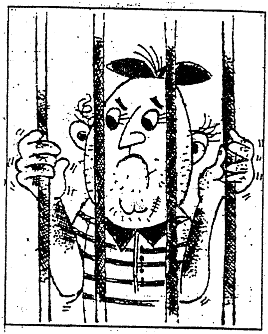

বিদ্যুৎ চোরেরা সাবধান!

- বিদ্যুৎ চুরির সাজা এখন আরও কঠোর
- বিদ্যুৎ চোরেদের জন্য গঠিত হয়েছে বিশেষ আদালত এবং ইলেকট্রিসিটি প্রোটেকশন ফোর্স
- বিদ্যুৎ চুরি জামিন-অযোগ্য অপরাধ
- বিদ্যুৎচুরির শাস্তি ৫ হাজার টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং ৫ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা'

পর্যটন শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ

বরফে ঢাকা পাহাড় থেকে সোনালি সমুদ্র, বন্য প্রাণীতে ঘেরা ঘন জঙ্গল থেকে সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন, কী নেই পশ্চিমবংগে! পশ্চিমবঙ্গ মানেই এক সম্পূর্ণ ভ্রমণ কাহিনী।

রাজ্য পর্যটন বিভাগের কয়েকটি প্রধান পরিকল্পনা হল, সরকারি টুরিস্ট লজগুলোর পরিকাঠামোগত ও পরিষেবার উন্নতিসাধন, আরও নতুন সরকারি টুরিস্ট লজ এবং তারকাখচিত হোটেলের নির্মাণ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তার পর্যটন বিভাগের কয়েকটি প্রধান পর্যটন প্রকল্পগুলি হল :

➢ ঐতিহাসিক পর্যটন ➢ তীর্থ ভ্রমণ ➢ সাংস্কৃতিক সাংস্কৃতিক পর্যটন ➢ক্রীড়া পর্যটন ➢ প্রমোদ উদ্যানের নির্মাণ ➢ অ্যাডভেঞ্চার ভ্রমণ ➢ বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণী পর্যটন ➢ হিল রিসর্ট ➢ নদী ভ্রমণ ➢ সৈকত পর্যটন ➢ রেল পর্যটন এবং অবশ্যই প্রকৃতি পর্যটন।

আসুন ঘুরে বেড়াই পশ্চিমবঙ্গে উপভোগ করুন পৃথিবীর এক আশ্চর্য রূপ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
স্মারক নং ৩০৮৮/২০০৩ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

প্রবন্ধ

সোজন বাদিয়ার ঘাট ও প্রভাব-বঞ্চিত প্রতিভা জসীমউদ্‌দীন

শিবনারায়ণ রায়

।। এক ।।

নক্সী কাঁথার মাঠ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৯ সালে, সোজন বাদিয়ার ঘাট ১৯৩৩-এ। দু'টি কাব্যকাহিনিরই বিষয় সরলমতি দু'টি তরুণতরুণীর প্রেম, দু'টিরই সমাপ্তি ট্র্যাজেডিতে। কিন্তু সোজন বাদিয়া আকারে নক্সী কাঁথার দ্বিগুণ। ছাপা চেহারায় নক্সী কাঁথা কাব্যগ্রন্থটি ৮০ পৃষ্ঠা, অপরটি ১৬০ পৃষ্ঠা। তা ছাড়া প্রথম কাহিনির তুলনায় পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে ছন্দ এবং ঘটনাবিন্যাস নিয়েও বেশ কিছু বৈচিত্র আছে। তবে এই দুটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে মূল পার্থক্য ট্র্যাজেডির উৎস নির্দেশে। রূপাই আর সোনা-সাজুর বড় মধুর সংসার ভেঙে গেল চরের জমির ধান দখল নিয়ে বন গেঁয়োদের সঙ্গে কাইজা বাধার ফলে। এই কাহিনিতে ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক বিরোধের সামান্যতম ইঙ্গিত ছিল না। গ্রামের যে আবহাওয়ায় জসীমউদ্‌দীনের কৈশোর কেটেছিল তার মনকাড়া বিবরণ আছে তাঁর শেষ জীবনের অসমাপ্ত রচনা "জীবন কথা"-তে। জসীমউদ্‌দীনের বাবা জমিজমার তদারকির চাইতে অতি সামান্য মাইনেয় স্কুলে পড়াতেই ভালবাসতেন। সেখানে তাঁর প্রাণের বন্ধু ছিলেন হেডমাস্টার সুরেশচন্দ্র বসু। জসীমউদ্‌দীন এই দু'জনকে তাঁদের সেই ছোট স্কুলের "দুই পূজারী" বলে উল্লেখ করেছেন। জসীমউদ্‌দীনের বাজান এই স্কুলে পাঁচ টাকা বেতনে শিক্ষকতার কাজ নিয়েছিলেন তাঁর "শ্রদ্ধেয় শিক্ষক" রাজমোহন পণ্ডিত মশায়ের আহ্বানে। বিশ শতাব্দীর সেই সূচনা পর্বে অবিভক্ত বাংলার অন্তত গ্রামগুলিতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সহজ এক ধরনের আত্মীয়তা বজায় ছিল। জসীমউদ্‌দীন সেই বিগত দিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন :

> গ্রাম দেশে পাকা মুসলমান খুব কমই দেখা যাইত। লক্ষ্মীপূজা, হাওই সিন্নি ও গাম্বীর উৎসবে সমস্ত গ্রাম মাতিয়া উঠিত। .... খুব সম্ভব লক্ষ্মী পূর্ণিমায় হাওয়া সিন্নির উৎসব হইত। ..... আমাদের পূর্বপুরুষরা এই সব উৎসবে কোরাণশরিফ পড়িয়া আসিতেন। তাঁহারা বলিতেন লোকে ত এসব উৎসব করিবেই। আমরা ইহার মধ্যে কোরাণ শরিফ পড়িয়া কিছুটা মুসলমানীত্ব বজায় রাখি। (পৃ: ১৪)

তাতে তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসে কোনও হেরফের ঘটত না। সে যুগে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সব শিক্ষকের মতোই জসীমের বাজানের নিত্য পরিধেয় ছিল ধুতিপাঞ্জাবি, কাঁধে একপাটা পাতলা চাদর এবং হাতে ছাতি। মুখভরা সুন্দর দাড়ি, মাথায় টুপি। পাঠশালায় জসীমের বন্ধু ছিল বিনোদ। তার বাড়িতে ছিল একটি কালো তুলসীর গাছ।

> এই তুলসী গাছটির পানে চাহিয়া থাকিতাম। লাল কালোতে মিশানো পাতাগুলি কতই সুন্দর। কাছে যাইয়া গন্ধ শুকিতে প্রাণ ভরিয়া যাইত। .....বহু অনুনয় বিনয় করিয়া তাহার নিকট হইতে একটি কালো তুলসীর চারা বাড়িতে আনিয়া লাগাইলাম। মুসলমান বাড়িতে তুলসী গাছ লাগাইয়া অনেকের কাছে সমালোচনার পাত্র হইলাম, কিন্তু আমার তুলসীগাছটি যখন বড় হইল তখন ওষধি হিসাবে ইহার পাতা লইতে এ বাড়ি ও বাড়ি হইতে যখন লোক আসিত, আমার বুক গর্বে ভরিয়া যাইত। (পৃ: ২৯)

এই ছিল গ্রামবাংলার সেই জগৎ যেখানে জসীমউদ্‌দীনের ধ্যানধারণা, কল্পনা-অনুভূতি পুষ্ট হয়েছিল, যেখানে পরস্পরের ধর্মবিশ্বাস এবং আচার-আচরণ বজায় রেখেই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটা স্বাভাবিক পারস্পরিক সহযোগ ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। জসীমউদ্‌দীনের লেখা পড়ে এবং তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার পরও আমি নিশ্চিত জানতাম ধর্মীয় গোঁড়ামি, অসহিষ্ণুতা বা সাম্প্রদায়িক বিরোধের বিষ কোনও সময়েই তাঁর মনে সঞ্চারিত হয়নি।

কিন্তু বাইরের জগতে, বিশেষ করে অবিভক্ত বঙ্গদেশের আবহাওয়াতে তখনই দুর্যোগ ঘনিয়ে উঠেছিল। প্রথমে তা আবদ্ধ ছিল শহরের রাজনীতি-অর্থনীতির জগতে, কিন্তু ক্রমে তা গ্রামাঞ্চলেও বিস্তার লাভ করল। গান্ধীর বিরুদ্ধে কংগ্রেসে পূর্ণ

স্বাধীনতার প্রস্তাব প্রথম আনেন হসরৎ মোহানি ১৯২১ সালে। মস্কো-বার্লিনবাসী কমিউনিস্ট মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। মোতিলাল প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা যখন তাঁদের নেহরু রিপোর্টে মুসলমানদের তরফ থেকে তোলা সব প্রস্তাব বাতিল করে তাঁদের রাজনৈতিক আত্মম্ভরিতার পরিচয় দিলেন, দেশপ্রেমিক হসরৎ মোহানি গভীর ক্ষোভে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্, যিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দু'টি দশক হিন্দু মুসলমান মৈত্রী এবং জাতীয় ঐক্যবোধ গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত করেছিলেন, তিনিও সর্বদলীয় সম্মেলনের প্রস্তাবে এবং কংগ্রেসি মাতব্বরদের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে কিছু কালের জন্য রাজনীতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। পরে যখন তিনি রাজনীতিতে আবার ফিরে এলেন, তখন তাঁর মন থেকে হিন্দুমুসলমান মিলনের প্রতীতি অবলুপ্ত। তার আগেই অন্য যে মহম্মদ আলি—যিনি খিলাফৎ এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনে এক সময়ে ছিলেন গান্ধীর প্রায় ডান হাত,—১৯৩০ সালে এপ্রিল মাসে নিখিল ভারত মুসলিম সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করলেন : "আমরা আর মিস্টার গান্ধীর সঙ্গে আন্দোলনে নামতে রাজি নয়, কারণ গান্ধীর আন্দোলনের উদ্দেশ্য ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, এর উদ্দেশ্য হিন্দু নেতাদের হাতে সাত কোটি মুসলমানকে সঁপে দেওয়া।" পরে গোল টেবিল বৈঠকে তিনি স্পষ্ট করে বললেন, "আমি শুধু একটি জগতের অধিবাসী নই। আমি যেমন ভারতের অধিবাসী তেমনই সারা বিশ্বে বিস্তৃত মুসলিম জগতেরও অধিবাসী"। গোল টেবিলে নেতারা যতই নিষ্ফল দর কষাকষি চালালেন ততই তাঁরা এ দেশের ভিতরকার বিভিন্ন ফাটল এবং স্বার্থে স্বার্থে বিরোধকে স্পষ্টতর করে তুলতে লাগলেন। ক্রমে যা ছিল মুখ্যত শহরের উপরতলার দলাদলি তা গ্রামেও সঞ্চারিত হল।

ইতিমধ্যে মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা গড়ে উঠেছে। অন্য দিকে গড়ে উঠছে মুসলমানদের তানজিম আর তবলিগ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন ছড়াতে শুরু করেছে। সরকারি হিসাব অনুসারে ১৯২৩ থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে ১১২টি হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। লক্ষণীয় যে ভার র অন্য প্রায় সর্বত্র মুসলমানরা মুখ্যত নগরবাসী অথবা নগরে 'ত্যন্তনিবাসী। অপরপক্ষে বাংলাদেশে অধিকাংশ মুসলমান২ মবাসী, বেশির ভাগই কৃষিকাজে নিযুক্ত। আবার অবিভক্ত বঙ্গদেশে অধিকাংশ মুসলমান পূর্ববঙ্গেই বাস করেন। সেন আমলে হিন্দু সমাজকে যে তথাকথিত ছত্রিশ ভাগে পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছিল, তাদের ভিতরে নীচের তলার একটা বড় অংশ ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করেন। তার অবশ্য একটা কারণ হিন্দুদের মতো ইসলাম ধর্মে জাতিভেদের বালাই নেই; দ্বিতীয় এবং বিশেষ কারণ মুসলমানদের মধ্যে যারা পীর বা প্রচারক তাঁরা উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তাঁরা জমিহীন নিম্নবর্গের মানুষদের নেতৃত্ব দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান সেই সব অঞ্চলে যে সব অঞ্চল আগে বাসের অযোগ্য বলে উচ্চবর্গের হিন্দুদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছিল। বঙ্গদেশের গ্রামাঞ্চলে ইসলামের ব্যাপক প্রচার এবং পূর্বে পরিত্যক্ত জমিতে চাষ-আবাদ এবং উপনিবেশ স্থাপন, এ দুয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক আছে। এবং এ ব্যাপারে পীর-দরবেশদের ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে যে মুষ্টিমেয় মানুষ নিজেদের শরিফ বা আশরাফ ভাবতেন—তাঁদের পূর্বপুরুষরা নাকি বিজয়ী রূপে ইরানতুরান থেকে বঙ্গদেশে এসেছিলেন—আজলাফ বা নিম্নবর্গের বাঙালিদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল নিতান্ত ক্ষীণ। তাঁরা নয়, এই উদ্যোগী পীর দরবেশরাই নেতা হয়ে রূপ দিলেন একদিকে যেমন ধর্মান্তরিত দরিদ্র মুসলমানদের উপনিবেশগুলিকে, অন্য দিকে এঁদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে নিম্নবর্গের হিন্দুদের ধ্যান-ধারণা মিলেমিশে একটি বিশিষ্ট বঙ্গীয় ইসলামের রূপ গড়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়া পদ্ধতি নিয়ে কিছু মূল্যবান গবেষণা করেছেন ঐতিহাসিক অসীম রায়। এই মিশ্র, দেশজ বঙ্গীয় ইসলামের সঙ্গে জসীমউদ্দীনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং আত্মীয়তা ছিল।

কিন্তু বিশের দশকের শেষ ভাগ থেকে বাংলার সামাজিক ও মানসিক জগতে দ্রুত রদবদল চলতে থাকে। চাষিদের (মুখ্যত মুসলমান) আর্থিক এবং শিক্ষাগত উন্নতির জন্য যে সব সরকারি চেষ্টা শুরু হয় প্রতি ক্ষেত্রেই তাতে বাধা আসে হিন্দু নেতাদের কাছ থেকে। জমিতে রায়তের অধিকার কিছুটা প্রতিষ্ঠা হলে জমিদারদের শোষণে বাধা পড়ে; ঋণের ওপরে সুদ কমালে মহাজনের ক্ষতি হয়; এবং জমিদার ও মহাজন বেশির ভাগই হিন্দু। চাষিরা লেখাপড়া শিখলে হিন্দু জমিদার, আমলা বা মাতব্বরদের কি মানবে? শুরু হয়েছিল শহরে ভোটাভুটি, ক্রমে গ্রামে ছড়ায়। এবারে হিন্দুদের হঠবার পালা; মুসলমানদের সরব হবার সুযোগ। গ্রামে একদিকে সক্রিয় হয়ে উঠল জমিদারের নায়েব সেপাই, অন্য দিকে মোল্লা মৌলবি। সাময়িকভাবে বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে নিম্নবর্গের কিছু হিন্দুর আঁতাত ঘটেছিল। ১৯২৬ সালের ১৪ই জুলাই 'বরিশাল হিতৈষী' লেখে যে চারপাশে যে সব বড় বড় জনসভা হচ্ছে সেখানে দেখা যায় মুসলমান আর নমশূদ্ররা একত্র হয়ে উচ্চবর্গের হিন্দুদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছে। মুসলমানদের মতলব এক দিকে এই ঐক্য রচনা করে হিন্দু উচ্চশ্রেণীর পতন ঘটানো, অন্য দিকে নমশূদ্রদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিয়ে মুসলমানদের সংখ্যাগুরুত্ব বাড়ানো।

অর্থাৎ এবারে বেশ সচেতন ভাবেই চেষ্টা শুরু হয় যাতে গরিব মুসলমান আর বর্ণহিন্দু সমাজের অন্ত্যেবাসীরা না ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। বাংলার গ্রামে তাদের মধ্যে দাঙ্গা পাকানোর উদ্যোগ শুরু হয়ে যায়। এই উদ্যোগে একটা বড় ভূমিকা ছিল হিন্দু জমিদার, তাদের দেওয়ান-নায়েব-পাইক আর লেঠেলদের।

।। দুই।।

সোজন বাদিয়ার ঘাট পড়বার আগে এই পটভূমির সঙ্গে কিছুটা পরিচয় হয়ত সহায়ক। জসীমউদ্দীন নজরুল নন যে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর প্রবল প্রতিবাদ উচ্চকিত রূপ পাবে। তাঁর মনের গঠনে আগুন আর হাওয়ার চাইতে মাটি আর জলই ছিল পরিমাণে বেশি। আমাদের দুর্ভাগ্য, যা তিনি গভীর বেদনায় অনুভব করেন, তার বিবরণ রেখে যান, এবং আমাদের মধ্যে যারা অনুভূতিশীল তারা মিছিলে সরব না হলেও সেই বেদনায় অশ্রুপাত করে অপর পক্ষে ত্রিশের দশকের যাঁরা বিশিষ্ট এবং শক্তিসম্পন্ন কবি, যাঁদের মধ্যে অনেকেই সেকালে নিজেদের প্রগতিশীল বলে ঘোষণা করে বেড়াতেন, বাংলার গ্রামের ট্র্যাজেডি তাঁদের রাতের নিদ্রা হরণ করেনি। তাঁরা তখন ব্যস্ত ছিলেন ইয়োরোপে হিটলার-মুসোলিনিদের নাটকীয় ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে এ দেশে জনমত তৈরি করতে।

সোজন বাদিয়ার ঘাট-এর নায়িকা গদাই-নমুর কালো মেয়ে দুলী। তার সেই কালোয় এসে মিশেছে ধানের ছড়ার আর টিয়া পাখির রং—

দূর্বাদলে রাখলে তারে দূর্বাতে যায় মিশে
মেঘের ঘাটে শুইয়ে দিলে খুঁজে না পাই দিশে।

না সে রহস্যময়ী বনলতা সেন নয়, আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনি তোলা কঙ্কাবতী নয়, বালিগঞ্জি আর্টেমিস অথবা স্বর্ণকেশী নর্মসখীও নয়। শ্যামল তার তনু, হাতে কাঁচের চুড়ি, দুই পায়েতে কাঁসার খাড়ু, ছিপছিপে তার পাতলা গড়ন, তার দুটি পায় জড়ানো নানা সুরের ছড়ার নূপুর।

যে শিমুলতলী গাঁয়ে তার বাস সেখানে নমশূদ্র আর মুসলমান গলায় গলা ধরে বাস করে—'হিন্দুর পূজায় মুসলমানে বয়েত গাহেন গায়' আর মুসলমানের 'দরগাতলা'য় হিঁদুর মেয়ে প্রণাম করে 'ভালের সিঁদুর দিয়ে'। নমু পাড়ার প্রধান গদাই মোড়ল—মস্ত তার ধানের গোলা, সাতটি জোয়ান পোলা, আর তাদের সবার গরব গদাইয়ের মেয়ে দুলালী বা দুলী। সেই দুলীর আশৈশব প্রাণের বন্ধু মুসলমান ছেলে সোজন, 'ছমির শেখের ভাজন বেটা, বাবরী মাথায় ঘেরা'। তারা যেন দুটি গাঙ-শালিক, সারাটা গায়ে টহল দিয়ে দিয়ে বেড়ায়।

সেই শিমুলতলী গাঁয়ে সব উৎসবেই হিন্দু মুসলমান সমান আনন্দে অংশ নেয়, ছোঁয়াছুঁই যে একেবারে নেই এমন নয়, কিন্তু কেউ বিশেষ গ্রাহ্য করে না, সরস্বতী পুজোর নাড়ু খেতে যেমন মুসলমানের বাধে না নমুর পোলার পীড়ায় তেমনই পীরের পড়া জলই হয় শেষ আশ্রয়। এই চমৎকার প্রীতির আবহাওয়াতে সোজন আর দুলীর ভালবাসা বিনা উত্তেজনায় বিনা বাধায় বিনা শহুরে নানা ন্যাকামি ছাড়াই ক্রমে বিকশিত হয়ে ওঠে। জসীমউদ্দীন গ্রাম্য কাহিনির রীতি অনুসরণ করে ধীরে ধীরে তাদের সেই সহজ সুন্দর বিকচমান ভালবাসার রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তারা বালকবালিকা থেকে ধীরে ধীরে বয়ঃপ্রাপ্তির দিকে যাচ্ছে।

সোজন যেনবা তটিনীর কূল, দুলালী নদীর পানি
জোয়ারে ফুলিয়া ঢেউ আছড়িয়া কূল করে টানাটানি
নামেও সোজন, কামেও তেমনি, শান্ত স্বভাব তার
কূল ভেঙ্গে নদী যতই বহুক, সে তারি গলার হার।

দুলীর ইচ্ছে করে সোজনকে সে লুকিয়ে রাখে তার সিঁদুর কৌটো ভরে। আর সোজনের ইচ্ছে যখন সে খুব বড় হবে, কোন পাটের নায়ের ভাগী হয়ে দূর দেশে গিয়ে বহু টাকাকড়ি জমিয়ে ফিরে আসবে, তখন দুলীর জন্য নিয়ে আসবে মধুমালা শাড়ি। কিন্তু দুলী শাড়ির সঙ্গে চায় সিঁদুর কৌটো, শাঁখের চুড়ি আর ময়ূরের পাখা।

কিন্তু সেই নিষ্পাপ সরল দুটি ছেলেমেয়ে তো জানত না যে

গোরস্থানের কবর খুঁড়িয়া মৃতেরা বাহির হয়ে,
সাবধান পদে ঘুরিছে ফিরিছে ঘুমন্ত লোকালয়ে
....
রহিয়া রহিয়া মড়ার খুলিতে বাতাস দিতেছে শীস
সুরে সুরে তার শিহরি উঠিছে আঁধিয়ারা দশ দিশ।

এই প্রেতদের বাস তো শুধু কবরের মধ্যে নয়, আমাদের মগজের মধ্যেও। একদিন দুলীর মায়ের নজরে পড়ল দুলী এখন "ধাড়ী মেয়ে", তার বয়েস হয়েছে, পাড়ার ধাঙড় ছেলেদের সঙ্গে খেললে লোকেরা কী বলবে! দুলী বয়সের নিষেধ না মানায় সোজনের সামনেই তার পিঠে তিন চারটি কিল পড়ল। অসহায় সোজন এই দৃশ্য দেখে এলোমেলো পায় বনেবাদাড়ে ঘুরতে ঘুরতে শেষে এসে বসল নিম গাছটির ধারে। তখন পেছন থেকে তার দু'চোখ চেপে ধরল ঘর থেকে পালিয়ে আসা দুলী। তারা ভাবতে বসল বয়স কাকে বলে; কবে তাদের বয়স হল। আর যখন তারা সবে তার কিছুটা আভাস পেয়েছে, দুলী ঠোঁট খুলে দাঁড়িয়েছে সোজনের মুখভরা গান নিজের মুখে ভরে নেবে এই আকাঙ্ক্ষায়, রসভঙ্গের মতো দুলীর মা এসে হাজির, কিল থাপ্পড় মারতে

মারতে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল আপন বাড়ি। আর শাসিয়ে গেল সোজনের বাপকে ডেকে সব বলে তার বেহায়ামির শাস্তির ব্যবস্থা করতে।

কিন্তু আমাদের সমাজে গুরুজনদের তরফ থেকে এ ধরনের বাধা তো হামেশাই ঘটে। সোমত্ত মেয়েকে আর একটি ছেলেকে সম্ভবত চুম্বনের পূর্বমুহূর্তে আবিষ্কার করলে মায়েদের এমনতর প্রতিক্রিয়াই প্রত্যাশিত। তবে এ ধরনের ঘটনায় সাধারণত গ্রামের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বিশেষ ওলটপালট ঘটে না। বরং ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায় যখন মহরমের দিন শিমুলতলীতে বিরাট মহোৎসবে ছমুর পোলা সোজন মস্ত ভূমিকা নেয়। আজ আর ধনীগরিবে কোনও ফারাক নেই। সোজন ভাল গায়েন, লাল গামছা ঘুরিয়ে মাথায় নেচে নেচে সে মহরমের করুণ কাহিনি গায়। গাইতে গাইতে এল যুদ্ধের বিবরণ, কমবখ্‌ত্ এজিদের বিরুদ্ধেআক্রোশে ফুঁশে উঠল লোকেরা,

সেই আগুনে জ্বলছে আজি শিমুলতলীর গাঁয়ের সবে
এবার তারা মাতবে যেন বহ্নি-নাগের মহোৎসবে

আর সেই ভয়ঙ্কর নাচে শিমুলতলীর শুধু মুসলমানরা নয়, নমশূদ্ররাও এসে মহা উল্লাসে যোগ দিল। গদাই মোড়ল লাঠি ঘোরায়, নিতাই ধোপা খোলা কৃপাণ হাতে নাচে। উৎসবের শেষে লাঠি খেলা। লাঠির খেলায় সাতগেরামে প্রধান মদন মিঞা। তাক এসে সোজন বিনয় করে বলে, চাচা তোমার সঙ্গে পারব না জানি, তবু বড় ইচ্ছে এক হাত খেলি। প্রচণ্ড খেলা শুরু হল, চার বারের বার সোজনের লাঠির পালটা দিতে গিয়ে মদন মিঞার লাঠি চলে গেল সোজনের হাতে।

কাব্যকাহিনির এই অংশ (এবং এটি যদি মঞ্চে অভিনীত হয় এই দৃশ্য) পাঠক তথা দর্শককে অবশ্যই মুগ্ধ করবে। মাইকেলকে জসীমউদ্‌দীন পাহাড়ের চূড়া থেকে নামিয়ে এনেছেন গ্রামের সমতল জমিতে—এখানে অমিত্রাক্ষর চলে না—কিন্তু জসীমের ভাষা এখানে খুবই দ্রুতগতি এবং মানানসই। এমনিতর জমজমাট নাটকীয় ঘটনা এই কাহিনিতে আরও আছে।

মদন মিঞা সোজনকে সাবাস দিয়ে বলে, তিরিশ বছর এই লাঠি ছিল আমার প্রাণ, ভেবেছিলাম যখন গোরে যাব এ লাঠি ধুলোয় পড়ে থাকবে। সে লাঠি ধরবার যোগ্য লোক যে আজ পেলাম এ আনন্দ রাখার জায়গা নেই। এ লাঠি এখন তোমার।

আর ঠিক যখন এই কাহিনি রাজসিক বিজয়পর্ব থেকে সাত্ত্বিক ত্যাগ পর্বে উঠে এসেছে সেই মুহূর্তে তামস পর্ব এসে সব গ্রাস করে নিল। সামান্য কী কারণ নিয়ে হঠাৎ নমু-মুসলমানের মধ্যে কাজিয়া শুরু হয়ে গেল। বাইরে থেকে অনেকে এসেছিল কাজিয়া বাধাবার উদ্দেশ্যে, তাদের আক্রোশ শিমুলতলীর এ শান্ত অসাম্প্রদায়িক মেলামেশার ওপরে। সাউদ পাড়ার, ভাজনপুরের শেখরা দলে দলে এসে জমা হয়েছিল। নমুরা মহরম উৎসবে ছিল নিতান্তই সংখ্যালঘু। তারা সবাই বেদম মার খেল। কাহিনির এক-চতুর্থাংশে পৌঁছে কাহিনির মোড় পালটে গেল, লিরিক রূপ নিল নাটকে, প্রেমের কাহিনিতে প্রবেশ করল সমকালীন সাম্প্রদায়িক আখচা আখচির ইতিহাস।

।। তিন ।।

রামনগরের নায়েব মশায়—চাষির ভিটেয় ঘুঘু চরানো যার পেশা, চাষির রক্ত শুষে যার দালানকোঠা—তার কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গদাই আর নমশূদ্রর দল। নায়েব মশাই ঠিক করেছিলেন শিমুলতলী থেকে নমু আর নেড়ে দুই-এরই উচ্ছেদ করে সেখানে জমিদারের হাট বসাবেন, এতদিন নমশূদ্র আর মুসলমানদের সৌহার্দ্যের সামনে তাঁর প্যাঁচ খাটছিল না। যেই খবর পেলেন সে সৌহার্দ্য টুটে গেছে, অমনই তাঁর হিন্দুত্ব চাগিয়ে উঠল। রক্ষেকালীর মালা গলায় জড়িয়ে হুকুম দিলেন শিমুলতলীর গ্রাম থেকে মুসলমানদের একেবারে উচ্ছেদ করে দিতে। তিনি এবং তাঁর দলবল পেছনে থাকলে রক্ষাকালীর আশীর্বাদে ভয়টা কোথায়। উচ্ছেদের প্রস্তাবে ঘাবড়ে গিয়ে গদাই এবং আরও কিছু নমশূদ্র প্রবীণজন আপত্তি তুলল।

এক গেরামের গাছের তলায় ঘর বেঁধেছি সবাই মিলে
মাথার ওপর একই আকাশ হাসছে নানা রঙের নীলে
এক মাঠেতে লাঙল ঠেলি, বৃষ্টিতে নাই, রৌদ্রে পুড়ি
সুখের বেলায় দুখের বেলায় ওরাই মোদের জোড়ের জুড়ি।

যারা আমাদের মেরেছিল তারা ভিন্ন দশ গেরামের লোক। শিমুলতলীতে যে মুসলমানরা থাকে তারা সংখ্যায় অনেক কম। তারা ভাইয়ের মতো, তাদের কি করে উচ্ছেদ করব?

নায়েব মশায় তখন তাঁর চরম অস্ত্র ঝাড়লেন। মুসলমানদের যদি তোরা মেরে না তাড়াস, দু'চার দিনের মধ্যে ডিক্রিজারি করে তোদের সব কটাকে গ্রামছাড়া করব। নিরুপায় নমুরা নায়েবের নির্দেশ মেনে নেয়, বলে রক্তখাকির এই আদেশ।

শিমুলতলীর মুসলমানদের কাছে এ খবর পৌঁছতে দেরি হল না। মসজিদে যুবা-বুড়ো সকলের জমায়েত। প্রাচীন হাজি সাহেব শান্তিপ্রিয় মানুষ। তিনি বললেন কাজিয়া/লড়াই না করে, চল আমরা মুসলমানেরা সকলে শিমুলতলী ছেড়ে অন্যত্র চলে যাই, বসত করি। প্রশান্ত মুখ, মমতা জড়ানো আশি বছরের বৃদ্ধ মনির মুন্সির কথা উষ্ণরক্ত তরুণরা শুনবে কেন? তাদের মুখপাত্র হয়ে সোজন বলল, প্রাণ দেব কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে কিছুতেই পালাব না।

গাছেরা ইহার দোলায়েছে ছায়া, বাতাস করেছে মায়ের মত
মাটি দেছে তার সোনার ফসল লাঙলের ঘায়ে হইয়া ক্ষত।
বাপ ভাইদের কবর খুঁড়িয়া শোয়ায়েছি এর মাটির তলে,
ভিজায়েছি এর শুষ্ক ধূলিরে কত বিষাদের নয়ন জলে।
....
এ গাঁও ছাড়িয়া যাব না- যাব না, রক্ষা করিতে ইহার মাটি,
প্রাণ যদি যায় সে প্রাণ হইবে বাঁচার চাইতে অনেক খাঁটি।

মুন্সি কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা যুক্তি দিয়ে তাদের বোঝাতে পারলেন। মুন্সি সাহেবের পিছনে পিছনে দেশ ত্যাগ করে চলল শিমুলতলীর সর্বস্বান্ত মুসলমানরা। পিছনে পড়ে রইল পূর্বপুরুষের কবরস্থান যেখানে শবেবরাতের রাতে আর মোমেরবাতি জ্বলবে না। মুন্সি সাহেবের —

...পিছে পিছে শিমুলতলীর সকল মানুষ চলেছে কাঁদি,
পৃথিবীর যত অন্যায় আর বেদনার যেন হইয়া বাদী।

এদিকে নায়েবের কাছে কথা দিয়ে এসে নমশূদ্ররা মুসলমান প্রতিবেশীদের সমূলে উচ্ছেদের জন্য তৈরি হচ্ছে। অষ্টম সর্গে তারই বিবরণ। এ সর্গ-ও বেশ নাটকীয়, জমজমাট। মুসলমানদের গ্রামত্যাগের বার্তা তখনও এসে পৌঁছয়নি।

উল্লাস ভরে নাচে নমুদল মশালের পর মশাল জ্বালি
খড়গ ঘুরায়ে, সড়কী ঘুরায়ে ডাক ছেড়ে চলে হাজার ঢালী।
চলে আসে তারা বাঙড়ের পথে, চরণে মথিত মেদিনী মাটি
হাতে উলঙ্গ আগুন নাচিছে, কালো মশালের ধরিয়া ডাঁটি।

কিন্তু যেমন মুসলমানদের ক্ষেত্রে তখনও ঠাণ্ডা মাথা মিষ্টি স্বভাবের মুন্সি সাহেবের করুণ নির্দেশের প্রাধিকার ছিল, তেমনই নমশূদ্রদের ওপরেও তাদের বিচক্ষণ গদাই মোড়ল ভ্রাতৃহত্যার বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে তার ক্যারিজম্যাটিক প্রভাবকে সেদিন সপ্রতিষ্ঠ করতে পেরেছিল। মোদ্দা কথা মুসলমানরা গ্রাম থেকে বিতাড়িত হল বটে, কিন্তু যে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড ঘটতে চলেছিল দু'পক্ষেই বুঝদার নেতা থাকায় শিমুলতলীতে সেদিন তা ঘটল না। রক্তপাত না করেই নমুরা তাদের গাঁয়ে ফিরে গেল।

কিন্তু রাতের অন্ধকারে মুসলমানেরা শিমুলতলী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর যখন আবার সকাল এল, জল থই থই দিঘির ধারে কুমারী মেয়েরা যখন নীরবে মাঘ-মণ্ডল ব্রতের শোলক পাঠ করছে, শিশুদের কাকলীতে নমুদের বাড়িগুলি ভরে গিয়েছে, তখন আকস্মিক বজ্রাঘাতের মতো খবর এসে পৌঁছল সন্ত্রস্ত গোটা মুসলমান সমাজের স্বদেশ শিমুলতলী ত্যাগের। শূন্য পীরের দরগা, মসজিদে আজান নেই, মেহেদির গুচ্ছ গুচ্ছ তোলা পাতা পড়ে আছে, ছেঁচে কেউ তার রঙের রূপসজ্জা করেনি। পুরুষদের কথা আলাদা। কিন্তু "নমু মেয়েদের চোখ ভরে আসে জলে"। আর দুলালী? বীরপর্ব, ষড়যন্ত্র পর্ব, সম্ভাব্য যুদ্ধপর্ব এবং স্বভূমি থেকে নির্বাসন পর্ব পাঁচ থেকে আট পর্ব (পৃ: ২৬-৫৫)—পেরিয়ে আমরা ফিরে আসি আমাদের মূল কাহিনিতে। শিমুলতলী ত্যাগের সময় সোজন দুলালীকে কিছুই বলে যেতে পারেনি। দুলালীর সম্বল এখন বিগত দিনের নানা সুখস্মৃতি, আর বর্তমানের শূন্যতা আর অনিশ্চয়তা। কে আছে যার কাছে দুলী তার মনের কথা খুলে বলতে পারে? তার আশৈশব বন্ধু সোজন যে তার জীবনের কতখানি সে কথা কে জানে? এদিকে গদাই মোড়ল তার আদরিনি মেয়ের বিয়ের সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে। নতুন উৎসবের স্রোতে পড়শিদের দেশত্যাগের সকরুণ স্মৃতি সহজেই ভেসে যায়। নমুদের পাড়ায় বিয়ের গানে আকাশ-বাতাস ভরে উঠেছে। সবাই বিয়ের বিবিধ উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত। এদিকে অন্যেরা না শুনুক দুলী শুনেছে রাতের বেলা বাঁশির সেই মর্মভেদী উদাস সুর, দুলীর বুকের কান্দনখানি ধরা পড়েছে যে সুরে। সবাই যখন উৎসবে ব্যস্ত বিয়ের কনে হলুদে চান করে, লাল চেলি পরে, আলতায় পা রাঙিয়ে বিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে সেই বনের কিনারায় যেখানে পলাতক সোজনের বাঁশি বাজে। তারপর এই গাথার দশম পর্ব জুড়ে দুই প্রেমিক প্রেমিকার যে সকরুণ আলাপ নিরলংকার ভাষায় তার সরল গভীর অনুভূতি আমাদের আলোড়িত করে। দুলী নিশ্চিত জানে সোজনকে ছাড়া তার পক্ষে বাঁচা অসম্ভব, সে সাক্ষী মানে চন্দ্র সূর্য, বনের গাছপালা, বিশ্বজগৎকে যে সোজন ছাড়া ইহকালে পরকালে তার আর কেউ কোথাও নেই। সে সোজনকে বলে কোনও অজানা দূর দেশে তারা পালিয়ে গিয়ে বাসা বাঁধবে, যত বাধাবিপত্তিই আসুক তারা পরস্পরকে কখনও ছাড়বে না। কিন্তু সোজন পুরুষ, শুধু প্রেমিক এবং শক্তিশালী নয়, বিবেকবানও বটে। সে জানে, তারা যদি পালিয়ে যায় তার দাম দিতে হবে সেই মুসলমানদের যারা শিমুলতলী গাঁ থেকে পালিয়ে এসে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। নমশূদ্ররা দল বেঁধে তাদের আক্রমণ করে তাদের নতুন বসতি পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। জেনেশুনে এত বড় সর্বনাশের দায় সে কেমন করে নেবে? তা ছাড়া তাদের এই মিলন কোনও সমাজই তো মেনে নেবে না। তারা একদিন না একদিন ধরা পড়বে, ভয়াবহ শাস্তি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু দুলীর গভীর একান্ত আবেদনের স্রোতে সোজনের সব বিবেচনা বিবেকিতা ও আপত্তি ভেসে যায়। সোজন বলে :

সাক্ষী থাকিও আল্লা-রসুল, সাক্ষী থাকিও
যত পীর-আউলিয়া,
এই হতভাগী বালিকারে আমি বিপদের পথে
চলিলাম নিয়া।

সাক্ষী থাকিও চন্দ্র-সূর্য। সাক্ষী থাকিও
আকাশের যত তারা,
আজিকার এই গহন রাতের অন্ধকারেতে
হইলাম ঘর ছাড়া।

।। চার ।।

দুলী আর সোজন এসে পলাতক প্রেমের কুড়ে বাঁধে গড়াই নদীর তীরে। (আমার নিজের জীবনের আনন্দঘন একটি বছর কেটেছে এই নদীর ধারে, অধ্যাপনা, পুঁথিলেখা, ছাত্রদের নিয়ে নদীতে প্রত্যহ সাঁতার কাটা, তাদরে সঙ্গে মিলে বিসর্জন অভিনয়, সাহিত্য দর্শন সমাজতত্ত্ব নিয়ে কত আড্ড আলোচনা, কত কৌতুক, কত অ্যাডভেঞ্চর। হায় স্মৃতি! আঙুলের ফাঁক দিয়ে জলের মতো গলে যায়।) এই কাব্যকাহিনির ত্রয়োদশ পর্ব জুড়ে দুলী আর সোজনের সেই সরল অথচ অপরূপ, বর্ণিল ও বহমান, প্রাকৃতিক পটভূমির সঙ্গে রঙ্গিলা আত্মীয়তা গড়ে ওঠার বড় মধুর ছবি এঁকেছেন জসীমউদ্‌দীন। (অনেক বছর পরে ঢাকায় তখনকার তরুণ কবি আল মাহ্‌মুদের ''সোনালী কাবিন'' পড়ে জসীমউদ্‌দীনের কথা মনে পড়েছিল। হায়! সেই একদা প্রিয় কবি আল মাহ্‌মুদের সঙ্গে ভাবভাবনার ক্ষেত্রে এখন প্রায় অসেতুসম্ভব দূরত্ব।) জসীমের শব্দ দিয়ে আঁকা ছবির পর ছবি—চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে পড়ে আমার বড় ভালবাসার চিত্রকর মার্ক শাগালের লিরিকধর্মী ছবির কথা।

লঙ্কার রঙ, মসুরের রঙ, মটরের রঙ আর
জিরা ও ধানের রঙের পাশেতে আলপনা আঁকা কার।
যেন একখানি সুখের কাহিনী নানান আখরে ভরি
এ বাড়ির যত আনন্দ হাসি আঁকা জীবন্ত করি।

কুটিরের বেড়ার গায়ে দুলী এঁকেছে যেমন বেহুলা-লখাই, জন্মদুখিনী সীতার ছবি তেমনই তারই পাশাপাশি কারবালার করুণ কাহিনি। আর এঁকেছে ডালিম গাছের নীচে লায়লা মজনুর কবর, আর ছেড়ে আসা সেই শিমুলতলী গাঁয়ের মসজিদ।

কিন্তু প্রেমের এই লিরিকের পিছনে উঠছে ট্র্যাজিকের ঝড়। বিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে কনে, সারা গ্রাম বেরিয়ে পড়েছে তার খোঁজে। খোঁজ না পেয়ে অবশেষে আবার সেই নায়েবেরই কাছে প্রণিপাত। নায়েব তো এমনই একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। এবারে সে নমশূদ্রদের ক্ষেপিয়ে তুলল। এর শোধ তোলবার উপায় মুসলমানদের একেবারে কচুকাটা উচ্ছেদ। চাগিয়ে উঠল খুনে বৃত্তি। এদিকে মলুদ-শরিফ উপলক্ষে মোল্লা বাড়ির উঠানে সাত গেরামের ছেলেমেয়ে সাজগোজ করে উৎসব করতে একত্র হয়েছে। সেখানে শুভ্র কেশ শুভ্র শ্মশ্রু মনির মিঞা কোরাণ পাঠ করছেন, তাঁর দেহ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে লুবানের ধোঁয়ার মতো সুগন্ধ। সবাই একমনে নবীর কাহিনি শুনছে। এমন সময় উৎসবের সুর কেটে গেল। খবর এল নমুরা দল বেঁধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুসলমান নিধন করতে আসছে। এবারে লড়াই অনিবার্য, মুন্সি সাহেব যখন অনেক বলেও তাদের শান্ত করতে পারলেন না, শেষ পর্যন্ত হার মেনে বললেন তোমরা যদি সবাই লড়াই করেই মরতে চাও তবে আমাকেও সঙ্গে নাও। তারপর পঞ্চদশ সর্গে সেই ভয়ঙ্কর দাঙ্গার বিবরণ।

গ্রাম জ্বলিল, ঘর পুড়িল, দেশ হল ছারখার
কিবা নমু মুসলমানের হুঁস নাহিক কার।
সকল মানুষ হদ্দ বেহুঁশ পতঙ্গেরই মত,—
আপন হাতে জ্বালল আগুন, আপনি হতে হত।

সারাদেশে হাহাকার উঠল, ''শ্মশান ঘাটায় রাত্রিদিবায় চিতার পরে চিতা,'' আর গ্রাম জুড়ে কবরের পর কবর। ফায়দা ওঠালেন নায়েব মশায়। শিমুলতলীতে তাঁর আগের উদ্দেশ্য অনুযায়ী গ্রাম উচ্ছেদ করে জমিদারের হাট বসল। সোনার শিমুলতলীতে

নমু-মুসলমানের কেহ আর নাহি সে গাঁয়।
আজকে তারা চিতায় চিতায়, গহন মাটির গোরে,
ঘুমিয়ে আছে, হাজার ডাকেও শব্দ নাহি করে।

দুলালী-সোজন কিন্তু এই দাঙ্গার মধ্যে পড়েনি। বেশ সুখেই অজ্ঞাতবাসে ছিল তারা। কিন্তু সোজন তো পুরুষ, সে ঠিক করল অন্য গাঁয়ের এক পাটের ব্যাপারীর সঙ্গে ভাগে কাজ করবে, তাতে নাকি ''কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা''। ব্যাপারীর সঙ্গে কয়েক দিনের জন্য দূরে সফরে যাবে। ফেরবার সময় দুলীর জন্য আনবে ''জলে-ভাসা-শাড়ী'', ''ময়ূরের পাখা'', ''গলার হাঁসুলী'', ''দুটি পায়ের গোল খাড়ু''। দুলীর মিনতি নিষেধ সে মানল না, বেরিয়ে পড়ল ব্যাপারীর নাওয়ে। দিনের পর দিন যায়, দুলী তাদের জীবনের কাহিনি ঘরের দেয়ালে একটির পর একটি আঁকে, আর শেষে আঁকে গড়াই নদীতে দূরদেশি মাঝির নৌকো, আর

ঘাটের কেনারে প্রতীক্ষমানা দাঁড়ায়ে একটি মেয়ে
দুটি চোখ তার ভরিয়াছে জলে কাঁখের কলসী চেয়ে।

হায়রে প্রতীক্ষা! সোজন ফেরে বটে, তবে পুলিশের সঙ্গে, হাতে হাতকড়া পরে। নায়েব তার নামে নারী হরণের মামলা ঠুকে দিয়েছে। বিচারে তার সাত বছরের জেল হয়। কিন্তু মহা ঘোড়েল নায়েবও শেষ পর্যন্ত রক্ষা পায় না। দাঙ্গা করতে গিয়ে গদাই মোড়ল তার সাত সাতটি পোলা হারিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সে তার শোধ তুলল। একদিন বিলের ধারে খুঁড়ে পাওয়া গেল কবরের গর্তে নায়েব মশায়ের আধখানা শরীর।

।। পাঁচ ।।

কিন্তু না, কাহিনি এখানে শেষ হয়নি। আমি যে কিছুটা বিস্তারিতভাবে এই কাহিনির কথা লিখছি, তার একটা কারণ আমার এ লেখা যাঁরা পড়বেন তাঁদের ভিতরে অনেকেই হয়ত

সোজন বাদিয়ার ঘাট পড়েননি। তবে প্রধান কারণ অনেকদিন পরে পড়তে বসে এই কাহিনি আমাকে পেয়ে বসেছে। সোজন-দুলী ভিনাস-আডোনিস নয়, রোমিও-জুলিয়েট নয়, এমনকী মিরান্ডা-ফার্ডিনান্ডও নয়। বাংলাদেশের গ্রাম্যপ্রেমের কথা স্ট্র্যাটফোর্ড অন এভনের কবি জানবেন কোথা থেকে। আমাদের জোড়াসাঁকোর মহাকবিও জানতেন না। পদ্মার বোটে বসে কিছু দেখা যায়, অনেক ভাবা যায়, আশ্চর্য সব গল্প এবং কবিতা লেখাও সম্ভব, কিন্তু গ্রাম্য দুটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়ের প্রেমের নিরলঙ্কার ট্র্যাজেডি মহা প্রতিভাবান শহুরে কবিদের সম্ভবত অনুভব এবং প্রকাশের বাইরে। মোদ্দা রবীন্দ্রযুগে বাস করেও নজরুল যেমন তাঁর নিজস্ব জগৎ, ভাষা এবং ছন্দ নির্মাণ করেছিলেন, জসীমউদ্দীনও তেমনই একেবারে ভিন্ন এক জগতের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা গড়তে চেয়েছিলেন। আত্মীয়তা যে শেষ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি সে দোষ তাঁর নয়, সে দোষ উচ্চবর্গের অভিজাতরুচি শহুরে বাঙালি মুখ্যত হিন্দু পাঠক-পাঠিকাদের।

বাংলাদেশের গ্রাম ইথাকা নয়, সেখানে দুলীর পক্ষে পেনেলোপি হবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। সাত বছর দীর্ঘ সময়। দুলীর কথা কে শুনবে? তার "মনের অনল যে নেভে না" কবি ছাড়া সে কথা কে জানে? যে বিধি দুলীর কপালে এমন দুর্ভাগ্যের কথা লিখেছিল তার কি নিজের কখনও এই যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা হয়েছে? দুলীর আবার বিয়ে হয়—তার সিঁথেয় সিঁদুর, দু-হাতে কাঁকন, গোলাভরা ধান, "চন্দ্রের সম সোয়ামীর খ্যাতি"। এদিকে সাত বছর কেটে গেছে, সোজন ছাড়া পেয়ে যোগ দিয়েছে বেদের দলে। একদিন সেই দল ভাসতে ভাসতে এসে পৌঁছল দুলীদের গ্রামে। মেয়েদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল বেদে-বেদেনিদের কাছে হরেক রকম সৌখিন জিনিস কেনবার জন্য। দুলীও এল, আর এক বুঝি আচিন বেদে তাকে বলল ঃ

তোমার লাগিয়া এনেছি কন্যা,
রাম লক্ষণ দুগাছি হাতের শাঁখা,
চীন দেশ থেকে এনেছি সিঁদুর
তোমার রঙিন মুখের মমতা মাখা।

কী দাম শুধাতে বেদে বলল ঃ

আমার শাঁখার কোনো দাম নাই
ওই দু'টি হাতে পরাইয়া দিব বলে,
বাদিয়ার ঝুলি মাথায় লইয়া
দেশে দেশে ফিরি কাঁদিয়া নয়ন জলে।
সিঁদুর আমার ধন্য হইবে,
ঐ ভালে যদি পরাইয়া দিতে পারি,
বিগানা দেশের বাদিয়ার লাগি
এইটুকু দয়া কর তুমি ভিন-নারী।

এরপর কি আর বিগানা দেশের বাদিয়া আর ভিন দেশের নারীর মধ্যে কোনও আড়াল বজায় থাকতে পারে। কিন্তু দুলী যে তার নতুন সংসারে জড়িয়ে গেছে। স্বামী থাকতে প্রণয়ীকে গ্রহণ করবার মতো মেয়ে তো সে নয়।

কে তুমি? কে তুমি? সোজন! সোজন!
যাও-যাও-তুমি! এক্ষুনি চলে যাও!
আর কোনো দিন ভ্রমেও কখনো
উড়ানখালীতে বাড়াওনা তব পাও।
ভুলে গেছি আমি, সব ভুলে গেছি
সোজন বলিয়া কে ছিল কোথায় কবে,
ভ্রমেও কখনো মনের কিনারে
আনিনাক তারে আজিকার এই ভবে।

কিন্তু ভুলেছি বললেই কি ভোলা যায়? তবু দুলী বারবার সোজনের মনে আঘাত দিয়ে বলল, পুরোনো সব স্মৃতি মুছে ফেলতে। সাত বছর ধরে সোজন যে স্বপ্ন নিয়ে বেঁচেছিল তা দুলীর প্রত্যাখানের আঘাতে ভেঙে গেল। বুকে চিতার জ্বালা নিয়ে টলতে টলতে সোজন ফিরে চলল। কিন্তু দেবতারাই নাকি নারী চরিত্র বোঝেন না, সোজন তো নিতান্ত চাষির ঘরের ছেলে, এখন বেগানা দেশের বেদে। সে তার বুকের ব্যাথা উজাড় করে বাঁশি বাজাতেই জানে। সেইদিন রাতে দুলী খুব সাজল, পরনে জামদানি শাড়ি, পায়ে হাতে আলতার দাগ, সিঁথিতে পুরু করে সিঁদুর, নানা ফুলে সেজে যে স্বামীর সঙ্গে সে ছ'মাস কথা পর্যন্ত বলেনি, তাকে অনেক ভালবাসার কথা বলল। কিন্তু নিষ্ঠুর বাঁশি যে বেজেই চলেছে। দুলী সব ঘরদোর জানলা বন্ধ করল, কানে তুলো দিল, কিন্তু বাঁশি যে তাকে ডেকেই চলেছে। বাঁশির সুর শুনতে শুনতে তার স্বামী ঘুমিয়ে পড়ল। তখন অসহায় দুলী কী করে!

সাক্ষী থাকিও চন্দ্র সূর্য আর যত দেবগণ
তোমরা সকলে শুনিতেছ এই অভাগীর ক্রন্দন।
সাক্ষী থাকিও সিঁথার সিঁদুর, আমারে ডাকিছে বাঁশী,
কাঞ্চা বয়সে পরাইয়া মোর গলায় কঠিন ফাঁসী।....
সাক্ষী থাকিও রাতের আঁধার—তারার বসন ধরে,
সাক্ষী থাকিও বসুমতী মাতা, নাগের মাথার পরে;
এই হতভাগী চলিল আজিকে লয়ে তার ভাঙা বুক,
নিয়ে যাও সবে—নিয়ে যাও তার জীবনের সব সুখ।

স্বামীর পায়ে কপালখানি ঘসে শেষ বিদায় নিয়ে দুলী দুয়ার খুলে অন্ধকার পথে বেরিয়ে পড়ল। বাঁশি তখন চিরবিদায়ের সুরে বাজছে, দুলী তোমাকে অনেক ব্যথা দিয়েছি, এই ভেবে ক্ষমা করো আমি তার হাজার গুণ ব্যথা পেয়েছি। অবশেষে দুলী

এসে পৌঁছল সেই বাঁশিওয়ালার কাছে। কিন্তু তার আগেই গভীর হতাশায় সোজন বিষ-লক্ষের বড়ি খেয়েছে। এখন শুধু দুলীর রূপটুকু শেষবার দেখতে দেখতে সে চিরকালের মতো চোখ বুজতে চায়। আর যখন তার না আছে ফেরার পথ না মিলিত জীবনের সম্ভাবনা, তখন বড় বেদনায়, বড় অসহায় আত্মোৎঘাটনে দুলী ডুকরে উঠল :

তোমরা পুরুষ কি করে বুঝিবে একেরে পরাণ দিয়া,
নারীর জীবন কি করে বা কাটে আরেরে বক্ষে নিয়া।
নিজের সঙ্গে অনেক যুঝিয়া পারিলাম নাক আর,
বুঝিলাম আর সাধ্য নাহিক এ জীবন বহিবার।....
আজো দুলী তার সোজনেরে ছাড়া কাহারেও নাহি জানে,
সোজন তাহার ঘরে ও বাহিরে দেহে মনে আর প্রাণে।

কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। নতুন করে শুরুর আর সময় নেই। পরদিন গাঁয়ের লোকেরা এসে দেখল বালির চরে "একটি যুবক একটি যুবতী আছে গলাগলি করি"।আর তারপর থেকে নদীর সেই ঘাটটির নাম সোজন বাদিয়ার ঘাট।

।। ছয় ।।

জসীমউদ্দীনের এই কাব্যকাহিনি নিয়ে এই বিশদ রচনার প্রথম কারণ অবশ্যই এটির যথার্থ কাব্যগুণ। ভারতচন্দ্র নয়, মাইকেল নয়, রবীন্দ্রনাথ নয়, নজরুল নয়, তাঁর সমকালীন বিদগ্ধ অধ্যাপক কবিবৃন্দ নয়, জসীমের মডেল ছিল পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য গীতিকা। এবং এই বিশেষ প্রকৃতির কাব্য রচনায় তিনি তাঁর সমকালে এবং পরবর্তীকালে অপ্রতিম। আমার ধারণা এই ধারাটিকে অটুট রেখে সমৃদ্ধতর করার ক্ষমতা ছিল এক সময়ে আল মাহ্মুদের। কিন্তু সে পথে তিনি বেশি দূর এগোননি। ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত যে মনটি নিয়ে জসীমউদ্দীন নজরুলের পরই দেখা দিয়েছিলেন আল মাহ্মুদ সে পথ থেকে সরে গেলেন। বাংলাদেশের সমকালীন অন্য কবিরা তাঁদের দেশ স্বাধীন হবার পরও কলকাতার কড়া শহুরে নেশা ছাড়তে পারেননি।

কিন্তু আমার দ্বিতীয় কারণটি কবিতা-প্রীতি থেকে উৎসারিত নয়। আমরা অনেকে আজ বুঝতে পারছি প্রকৃতি থেকে সরে এসে, প্রকৃতিকে শুধুমাত্র আমাদের প্রয়োজন মেটানোর উপায় হিসাবে ব্যবহার করে, আমরা ক্রমেই নীরস, জীর্ণ, নিঃসঙ্গ, আত্মবিভক্ত, নির্বান্ধব হয়ে পড়ছি। টেকনোলজি এবং নগরায়ণের প্রবল শক্তিকে হয়ত রুদ্ধ করা যাবে না, কিন্তু , এখনও পৃথিবীর এবং অবশ্যই আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। বিশ্ব থেকে বিযুক্ত গ্রাম অচলায়তন হয়ে ওঠে, কিন্তু বিশ্বের দ্বারা গ্রাসিত গ্রাম আর গ্রাম থাকে না। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, শেষ জীবনে মানবেন্দ্রনাথ, অন্য দেশে শুমেকার, ইলিচ, লেভি স্ট্রাউসের মতো ভাবুকরা গাছপালা ঘেরা পারস্পরিক আত্মীয়তাবন্ধনে যুক্ত ছোট ছোট গ্রামের পুনরুজ্জীবনের কথা ভেবেছিলেন। একুশ শতকে "বিশ্বায়নে"র নামে যে "মার্কিনায়নে"-র প্রবল প্রচেষ্টা চলেছে— যা সফল হলে সব স্ত্রীপুরুষই হয়ে দাঁড়াবে মণ্ডাকৃতি নিঃসঙ্গ মানুষ — তার প্রতিরোধের জন্য ব্যাপক চেষ্টা কবে শুরু হবে? গ্রামকে আমরা আর কতদিন ভুলে থাকব? শহর থেকে শহরতলি, সেখান থেকে মফস্বলের সাহিত্য রচিত হচ্ছে। গ্রামের উজ্জীবনে কি কবিদের কিছু ভূমিকা নেই? তাঁর জন্মের শতবর্ষে জসীমউদ্দীনকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করার এটাই দ্বিতীয়, হয়ত বা মুখ্য কারণ।

প্রবন্ধ

লোকসংস্কৃতির আত্ম-অপর

সৌমেন সেন

A word is a bridge between myself and another. If one end of the bridge belongs to me then the other depends on my addresee. A word is a territory shared by both addresser and addresee, by the speaker and his interlocutor.

— Voloshinov.[১]

করিম রহিম রাধা কালী
এ-বুল্ সে-বুল্ যতই বলি
শব্দভেদে ঠেলাঠেলি
হইতেছে সংসারে।

— জালাল পাগলা।[২]

বিষয় : লোকসংস্কৃতির আত্ম-অপর। কিন্তু শুরু হল শব্দ আর শব্দভেদ নিয়ে। অকারণ নয়। শব্দ, শব্দভেদ, সংলাপ, প্রতীক, চিহ্নে তৈরি হয় বয়ান বা বাচনিকতা। আর বয়ানেই তো প্রকাশিত হয়, স্পষ্ট হয়, আত্ম-অপর সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব। এবং লোকসংস্কৃতি মূলত একটি সংলাপ, একটি বয়ান, একটি গোষ্ঠীর অন্তর্গত সংযোগ।

সংযোগের, সংলাপের, মধ্যবর্তী যে পরিসর, তার নাম শব্দ। দুই প্রান্তে দু'জন, কিংবা কয়েকজন— তাঁদের আলাপচারিতায় শব্দের সূত্রেই হয় বার্তাবিনিময়। আবার সাধারণ আলাপচারিতা ছাপিয়ে যে বার্তা গড়ে ওঠে, যাকে বলা হয় বয়ান, তারও মাধ্যম শব্দই। ব্যষ্টি ও সমষ্টির সংযোগের পরিসর। দু'জন মানুষের কথোপকথনে, একজন বলছেন, অন্যজন শুনছেন, যিনি বলছেন তিনি যে অর্থে বলছেন, আর যিনি শুনছেন তিনি সেই অর্থেই বার্তাটি পাচ্ছেন কি না, অনেক-সময় সে দ্বন্দ্ব থেকে যায়। বিশেষত, সাধারণ কথাবার্তা ছাপিয়ে যে সাংস্কৃতিক সংলাপ তৈরি হয়, যা সমষ্টিতে পৌঁছয়, যা অনেকের সংলাপ, তার অর্থোদ্ধারে এই জটিলতা ব্যাপক। ভলোশিনভের যে উক্তি উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করেছি, তার তাৎপর্য এই যে শব্দ ও শব্দাবলির অর্থ এক নয়, অনেক; অর্থটি কিংবা অর্থপুঞ্জ শুধু বক্তার অধিকারে থাকে না, শ্রোতার অধিকারেও চলে যায় কারণ তার নানা ব্যাখ্যা হতে পারে, হয়। যথার্থ অর্থোদ্ধার সম্ভব সংলাপের সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের নিরিখে, কারণ সংস্কৃতি একটি সংলাপবদ্ধ ক্রিয়া, প্রক্রিয়াও বটে। এ কথা বলা কি ভুল হবে যে আমার শব্দব্যবহার, আমার বাক্যবিন্যাস, আমার নিজস্ব বয়ান, সবসময় আমার একান্ত আপন নয়। তার উৎস ও বিকাশ সামাজিক-সাংস্কৃতিক বয়ানের তালে-লয়ে বাঁধা। নিরপেক্ষ উচ্চারণ হয় না। উচ্চারণ নির্দিষ্ট হয় ইতিহাস-উপলব্ধির বয়ানে। এবং ইতিহাস ও সংস্কৃতির নির্মাণ পরস্পর-নির্ভর। বিভিন্ন শব্দ, প্রতীক ও চিহ্নের আন্তঃসম্পর্কই অর্থ তৈরি করে, আর সেই আন্তঃসম্পর্ক তৈরি হয় বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিবেশে। একটা সাদামাটা উদাহরণ দিই — সংলাপের, বার্তাবিনিময়ের, সম্বোধনের উদাহরণ: বাংলার 'প্রাণনাথ' সম্বোধনে এবং সম্পর্কিত 'চরণাশ্রিতা পতিব্রতা' স্ত্রীর অভিধায় যে অর্থ প্রকাশিত হয় এবং সে অর্থে নারীত্বের যে অবলুপ্তি ঘটে, যা মান্যতা পায় একটি নির্দিষ্ট সামাজিক বয়ানে, তা অনুপস্থিত ভিন্ন কোনও সাংস্কৃতিক বলয়ে। সেখানে 'প্রাণনাথ স্বামী' কেউ নেই, আছেন একজন মানুষ; স্ত্রীও মাত্র পতিব্রতা নন, তিনিও একজন। বিবাহিত নারী-পুরুষের এই পরিচয় পাচ্ছি খাসি জনজাতি-সংস্কৃতিতে। সেই বলয়ের শব্দকোষে স্বামী শব্দটি থাকার কথা নয়, ভাষাই তো আলাদা, কিন্তু যা উল্লেখযোগ্য তা হল যে এমন কোনও শব্দই নেই যার অর্থ বাংলার স্বামীর সমান্তরাল। স্বামীর পরিচয় 'উ লোক', স্ত্রীর পরিচয় 'কা লোক'। 'লোক' মানে একজন, 'উ' পুংলিঙ্গবাচক ও 'কা' স্ত্রীলিঙ্গবাচক। অর্থাৎ, বিবাহিত নারীপুরুষের সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে 'একজন' ও 'আর একজনের' মধ্যে; প্রকৃতির নিয়মে একজন নারী, অন্যজন পুরুষ। বাংলায় সে সম্পর্ক ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, সাংস্কৃতিক পরম্পরা ও শব্দার্থে। যে পরম্পরায় স্বামী, শ্রীচরণেষু, প্রাণনাথ চরণাশ্রিতা, দাসীর অভ্যাস ছিল একসময়, যাতে ছিল প্রাণনাথদের আহ্লাদ, সেই সময়ই রবীন্দ্রনাথ পরম্পরা অগ্রাহ্য করে স্ত্রীকে সম্বোধন করলেন 'ভাই ছোটবউ', তাতে সখ্যতার অভিব্যক্তি।

শব্দার্থের ব্যঞ্জনায় তাই থেকে যাচ্ছে আত্ম-অপরের দ্বৈতী অভিধা। সম্বোধনের ক্ষেত্রে দেখছি 'শ্রীচরণেষু', 'প্রিয়' বা 'ভাই', এই তিন অভিব্যক্তিতে নির্দিষ্ট হয়ে যায় 'অপরের' প্রতি মনোভাব ও আচরণের পরিসর। অন্য আরও পাঁচটা সম্বোধনেও তা ঘটতে পারে - 'তুই', 'তুমি' 'আপনি'র অভিব্যক্তির সঙ্গে 'you'-র সর্বজনীনতা মেশে না। সম্বোধন তো স্থির হয় সম্পর্কে। বাংলার স্বামী-স্ত্রীর যে পরম্পরাগত অভিধা, তা রবীন্দ্রনাথ 'ভাই' সম্বোধনে কতটা ভাঙতে পেরেছিলেন, সে প্রশ্ন থাকুক গবেষকের জিম্মায়। কিন্তু বাংলার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের যে পরম্পরা তা যে খাসি জন-সংস্কৃতির 'কা লোক'- 'উ লোক'-এর সম্পর্কের পরম্পরা থেকে ভিন্ন তা স্পষ্টই বলা যায়। আত্ম-অপর-এর সম্পর্কের যে অভিধা তা দুই পরম্পরায় দু'রকম। শব্দ-ব্যবহারও তাই দু'রকম।

সংলাপ ও বয়ান তা হলে চরিত্রে দ্বৈতী— দ্বি-ভাব নির্মাণ ও গ্রহণে। আমি যে অর্থে বলছি, অন্যে সে ভাবে গ্রহণ করবেন তখনই যখন আমরা উভয়েই একই চিন্তাস্তরে অভ্যস্ত। একই সাংস্কৃতিক শিক্ষায় শিক্ষিত। প্রবাদের অর্থ পরিবেশ-নির্ভর। বাংলার দেহতত্ত্বের বয়ান শুধু বুঝবেন দেহতত্ত্ববাদীরাই, অন্যদের বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হবে। শব্দার্থ নির্দিষ্ট হয় সাংস্কৃতিক বিশ্ববীক্ষায়, মূল্যবোধে, দর্শনে, কর্তব্য-অকর্তব্যের পরিসরে, ভালমন্দের বিচারে, আনুগত্য-অঙ্গীকার-অস্বীকারের দ্বন্দ্বে এবং অর্থবাহী বার্তার গ্রহণ, বর্জন, পরিবর্তনে।

ব্যক্তিগত আত্ম-অপরের সীমা ছাড়িয়ে আমরা পৌছতে পারি বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে। সে সংসারে, জালাল পাগলা যেমন বলেন, শব্দভেদে বড়ই ঠেলাঠেলি। সর্বনামে এই ঠেলাঠেলি কেমন হয় তার একটি সরস বর্ণনা পাই রবীন্দ্র-রচনায়, প্রসঙ্গ বাংলা সর্বনাম : 'মুই' এক কালে উত্তমপুরুষ সর্বনামের সাধারণ ব্যবহারে প্রচলিত ছিল — প্রাচীন কাব্যগ্রন্থে তা দেখতে পাই। 'আমহি' ক্রমশ আমি রূপ ধরে ওকে করলে কোণঠাসা, ও রইল গ্রাম্য ভাষার আড়ালে। সে কালের সাহিত্যে ওকে দেখা গেছে দীনতা প্রকাশের কাজে, যেমন : মুঞি অতি অভাগিনী। নিজের প্রতি অবজ্ঞা স্বাভাবিক নয় তাই ওকে সংকোচে সরে দাঁড়াতে হল। কিন্তু মধ্যম পুরুষের বেলায় যথাস্থানে কুণ্ঠার কোনও কারণ নেই, তাই 'তুই' শব্দে বাধা ঘটেনি, নীচের বেঞ্চিতে ও রয়ে গেল। 'তুহি' 'তুমি' রূপে ভর্তি হয়েছে উপরের কোঠায়। এরও গৌরবার্থ অনেকখানি ক্ষয়ে গেল, বোধকরি নির্বিচার সৌজন্যের আতিশয্যে। তাই উপরওয়ালাদের জন্যে আরও একটা শব্দের আমদানি করতে হয়েছে, 'আপহি' থেকে 'আপনি'।[৩]

রবীন্দ্রনাথের এই বর্ণনা একটি সামাজিক প্রসঙ্গ বুঝতে আমাদের সাহায্য করে, সামাজিক স্তরবিন্যাস, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সীমার রদবদলে, যে আত্ম-অপর সম্পর্ক ও আচরণের হেরফের ঘটে যায়, তারই ইঙ্গিত পাই এই বর্ণনায়। শব্দ পালটে যাচ্ছে, পালটে যায় তার বার্তা, আধিপত্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দাপটে। 'আপনি' যাঁকে বলছি ও 'তুই' যাকে বলছি (লক্ষ করুন চন্দ্রবিন্দুর উপস্থিতি ও অভাব) তা নির্ভর করছে আধিপত্য ও আনুগত্যের ওঠানামায়। উপর-নিচওয়ালার অবস্থানে।

দুই

কেন এই শব্দ ও শব্দভেদের 'ঠেলাঠেলি', কেনই-বা শব্দ, সংলাপ, বয়ান ইত্যাদি নিয়ে সাতকাহন? পাঠক লক্ষ করুন, এই 'কাহনে' কিছু সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গের ইঙ্গিত আছে। বিশেষত আছে এক ও অপরের প্রসঙ্গ। আমি সে প্রসঙ্গেই যাব। তার আগে বলি যে শব্দ নিয়ে 'কাহন'-এর কারণ এই যে ইদানীং সমাজ বিজ্ঞানের চর্চায় শব্দ, ভাষাবয়ন, সংলাপ, প্রতীক, বয়ান, ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা মর্যাদা পাচ্ছে। এই বিচারে সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ইত্যাদি বস্তুত বয়ান আর সেই বয়ান ব্যক্ত হয় শব্দ-নির্ভর ভাষাবয়নে, সংলাপে, প্রতীকে, চিহ্নে। সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন যে সমাজগঠন প্রক্রিয়ায় সবটাই অর্থপূর্ণ। ফলে সমাজ বুঝতে হলে সামাজিক ভাষা বুঝতে হবে; সে ভাষা বুঝতে হলে শব্দের মাত্রা জানতে হবে কারণ তাই নির্দিষ্ট করে সংলাপ, আর সামাজিক সংলাপেই প্রকাশ পায় সমাজনির্মাণের অর্থবহতা এবং এ কথাও মনে রাখতে হবে যে সমাজনির্মাণ ও পরিবর্তন স্থির করে শব্দের মাত্রা, তার ভাঙচুর, অর্থবিপর্যয়, অর্থপূর্ণতা।

রবীন্দ্রনাথের সর্বনাম বিশ্লেষণে কি আমরা পেয়ে যাচ্ছি না সামাজিক প্রথা ও পরিবর্তনের হিসাব নিকাশ? যা ছিল এক কালে উত্তমপুরুষ সর্বনামের সাধারণ ব্যবহার, সেই 'মুই' এক সময় হল কোণঠাসা গ্রাম্যভাষার আওতায় আর সাহিত্যে ওকে দেখা গেল দীনতা প্রকাশের কাজে। তা হলে ভাষাতেও ধনী-নির্ধনের সামাজিক বিভাজন, শহর গ্রামের ফারাক ইত্যাদির নজির থেকে যাচ্ছে—উপরওয়ালার জন্য আমদানি করতে হয়েছে 'আপনি'। আবার 'মুঞি অতি অভাগিনী', এই অভিব্যক্তির নেপথ্যে যে দীনতা, তার কারণও নিশ্চয়ই কোনও সামাজিক দুর্ঘটনা— দারিদ্র বা কোনও আধিপত্যের নিষ্ঠুরতা বা কোনও সামাজিক প্রথার, যেমন বৈধব্য সম্পর্কিত সমাজ-শাসন, ইত্যাদি। 'মুঞি', 'অভাগিনী' ইত্যাদি শব্দ, একজন নারীর একটি উক্তি — 'মুঞি অতি অভাগিনী' — সংলাপের এক প্রান্ত থেকে আমাদের নিয়ে যায় অন্য প্রান্তে, হরেক সামাজিক সত্যের মুখোমুখি। একটি সত্য কিন্তু এক-অপরের বিরোধ; পুরুষপ্রধান সমাজব্যবস্থায় নারী 'অপর' বইকি। দীনতাই হোক, প্রতিবাদই হোক, একজন নারীর সামনেও তখন আছে এক 'অপর', পুরুষ, অথবা গোটা সমাজ-

সংসার। যে সংসার সেই 'অপর' (নারী) সম্পর্কে বলে, শব্দের বুনোটে, ভাষার বয়নে: 'হলুদ জব্দ শিলে, বউ (মাগ) জব্দ কিলে'।[৪] এবং এই সংসারেই নারীর উচ্চারণ, 'ওরে আমার তুমি, তোমার জন্যে চাল ভিজিয়ে চিবিয়ে মরি আমি।'[৫] আর, পুরুষ 'অপর'-এর প্রতি ধিক্কার : 'ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার (নাক কাটবার) গোঁসাই।'[৬]

কথা বলতে বলতে আমরা কিন্তু সরাসরি পৌঁছে গেলাম লোকসংস্কৃতিতে। প্রবাদের সূত্রে। প্রবাদের পরিচয় 'বাচনিক লোকসংস্কৃতি', 'স্পিকিং ফোকলোর'। আর ফোকলোর-এর একটি সংজ্ঞা: 'অ্যান আর্টিস্টিক কমিউনিকেশন ইন অ্যা গ্রুপ,' অর্থাৎ একটি গোষ্ঠীর অন্তর্গত একটি শিল্পিত সংযোগ। এই সংযোগ তো সংলাপেই ঘটে, যদিও সে সংলাপের পাঠ কখনও ভাষাবয়নে, কখনও মুদ্রা, প্রতীক ও চিহ্নে। সামাজিক বয়ান, সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি সেই পাঠ-এই প্রকাশিত, সম্প্রচারিত। প্রবাদে তা সরাসরি উচ্চারিত কারণ তা বাচনিক, অন্য উপাদানে তা হয়ত আকার পায় প্রতীকে, চিহ্নে। যেমন ঘটে বাংলার আলপনায় কিংবা আচার-এ। কিংবা দেহতত্ত্বের গানে ও দেহতত্ত্ববাদীর সাধনসূত্রে। সর্বত্রই একটি বাচনিকতা আছে, আছে কিছু বার্তা, যা অর্থপূর্ণ ও বোধগম্য হয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত সংযোগে। বহির্গত কেউ সেই অর্থসাম্রাজ্যে সহজে প্রবেশ করতে পারেন না।

এই অর্থে, অর্থাৎ বাচনিকতার হিসাবে, লোক-সংস্কৃতি ও তথাকথিত শিষ্ট-পরিশীলিত সংস্কৃতির ফারাক খুব বেশি নয়। আধুনিকতার যে অভিধা, তার সূত্রে অবশ্য লোকসংস্কৃতি একটু দূরে সরে যায়।

আবার আধুনিকতারও তো কত হেরফের। এই প্রসঙ্গে আলোচনার সুযোগ এখানে বেশি নেই। শুধু এইটুকু বলি যে সময়ের চাপে 'আধুনিক' যেমন বারবার দিক বদল করে, সংলাপ ও বয়ান ভিন্ন হয়, একটু শ্লথ হলেও তেমনটা ঘটে লোক সংস্কৃতিতে। আধুনিক সময়ে নানা কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণের বিভিন্নতা নেই, তা বলা যায় না। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে লোকসংস্কৃতিও নিরন্তর আধুনিক, সময়ের বিচারেই অবশ্য— এই সংস্কৃতি স্থিতিশীল নয়। তাকে যদি শুধু 'ঐতিহ্যমণ্ডিত' প্রাক্তন-প্রাচীন-প্রান্তিক সংস্কৃতি হিসাবে চিহ্নিত করি তা হলে সেই 'ঐতিহ্যে'র প্রাচীনতার সীমা কতদূর পেছনে টানব? একটি প্রবাদ (?) যদি শুনি: 'গাঙ দিয়া কাঠুয়া যাইন্ তক্কি মাথাত্ দিয়া, মোছলমানে দেখিয়া কইল্ আল্লা যাইত্রা গিয়া'[৭] তা হলে প্রশ্ন ওঠে এর বয়স কত? নিশ্চয়ই ইসলামের বঙ্গপ্রবেশের আগে নয়। এমনকী হয়ত সেই প্রবেশকালের সমসাময়িকও নয়। সময় লেগেছে বিধর্মী 'অপর'-এর প্রতি এই মনোভাব তৈরি হতে। আরও প্রশ্ন: ঐতিহ্যটি কার ও কীসের? প্রবাদটি না হয় একটি অঞ্চলের উপভাষায় গ্রাম্য উচ্চারণ, কিন্তু এই মনোভঙ্গি কি কখনও প্রকাশ পায়নি তখনকার কোনও 'আধুনিক' বয়ানে'?

দু'টি কথা স্পষ্ট করে নেওয়া ভাল। প্রথম: যেহেতু লোকসংস্কৃতি মানে গোষ্ঠীসংস্কৃতি, সেহেতু নানা গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা যে সমাজ, যেমন বাঙালি এবং তারও পরে ভারতীয় সমাজ, তার যে সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিরই অন্তর্গত। এবং তার যে প্রাক-আধুনিক, আধুনিক স্তর বিন্যাস, কালক্ষেপে, লোকসংস্কৃতিও সেই বিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়: তথাকথিত শিষ্ট, পরিশীলিত, উচ্চকোটির সংস্কৃতি যেমন বহুবাচনিক, নানা কণ্ঠস্বরের উদ্ভাস, লোকসংস্কৃতিও তেমনই বহুবাচনিক, তারও নানা কণ্ঠস্বর। আত্ম-অপর দ্বন্দ্ব লোক সংস্কৃতিতেও বর্তমান।

তিন

বাচনিকতার প্রসঙ্গে, কণ্ঠস্বরের বিভিন্নতার বাস্তবতায়, জেনে নেওয়া চাই যে এই বিভিন্নতা তৈরি হয় অনেকটাই আধিপত্য-আনুগত্য, আত্মপরিচয়-অহমিকা, আমি-তুমি, আমরা-তারা ইত্যাদি হরেক বাধ্যতায়। লোকসংস্কৃতিও এই বাধ্যতার জটিলতায়, তর্কে, বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। 'শব্দভেদের ঠেলাঠেলি'- তে 'জালাল পাগলার কথা ধরো..... দলাদলির ভাবটি ছাড়ো'[৮], এবং 'ফকির লালন বলে মিছে কলহ/ভবে শুনতে পাই।'[৯] তা হলে ঠেলাঠেলি, দলাদলি, কলহ, সবই আছে। এ সব থাকবে আর প্রতিপক্ষ থাকবে না, তা তো হয় না। ফকির, বাউল, 'পাগলা'দের প্রতিপক্ষ তাঁরাই চিহ্নিত করেন :

হায় গো তোমার পথ ঢাইক্যাছে
মন্দিরে মসজেদে
ও তোর ডাক শুইন্যা সাঁই
চলতে না পাই
আমারে রুইখ্যা দাঁড়ায়
গুরুতে মোরশেদে।[১০]

সমাজে, গ্রামসমাজ ও লোকবৃত্তেও, প্রধান-অপ্রধানের দ্বন্দ্ব থাকে। পুরোহিত বা মৌলবি ও বাউল বা ফকির এই দ্বন্দ্বে অবশ্যই পরস্পর প্রতিপক্ষ। জালাল পাগলা ও লালনের বয়ান তাই তৈরি হয় আত্মপরিচয়ের বাধ্যতায়, 'অপরে'র বয়ানের বিরোধিতায়।

কিন্তু তাঁদের যে বয়ান, যে বয়ানে 'দলাদলির ভাবটি' ও 'মিছে কলহ' এড়াবার আবেদন, তার বিপরীতে কলহের ভাবটি থেকে যায় অন্য কোনও বাচনিক লোকসংস্কৃতিতে। সে ক্ষেত্রে অবশ্য পক্ষ-বিপক্ষ ভিন্ন, কণ্ঠস্বরও অন্য। প্রধান-অপ্রধানের পরিচয়ও আলাদা। যদি একটি প্রবাদ শুনি, ও তাকে প্রবাদ বলে মানি, যা 'অপর'-এর প্রতি শ্লেষ— 'ধানের মধ্যে আগুনবাগ, মানুষের মধ্যে মোছলমান'[১১]— তা হলে দুটি প্রশ্ন আমাদের ভাবাতে পারে। এক, লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা,

অর্থাৎ তা গ্রামসমাজের একবাচনিক, একমাত্রিক, যৌথ, স্বতঃস্ফূর্ত নির্মাণ, তা কি ধোপে টেঁকে? এই 'প্রবাদে' তো আমরা শুনি সমাজের এক অংশের শ্লেষ ও তাচ্ছিল্য অন্য অংশের প্রতি। দুই. তা হলে তো একমাত্রিক লোকসমাজ (গ্রামসমাজ) বলে কিছু নেই; তা গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে দ্বিধা-কিংবা বহুধা-বিভক্ত। এবং গোষ্ঠী সংস্কৃতিই লোকসংস্কৃতি। তা কি এক বাচনিক না দ্বি- কিংবা বহু-বাচনিক? তার নির্মাণ কি যৌথ-স্বতঃস্ফূর্ত, না কৌশলী-পরিকল্পিত, কোনও বাধ্যতায়? যে বাধ্যতার খোঁজ পাওয়া যায় প্রধান-অপ্রধান দ্বন্দ্বে?

'আধুনিক' 'পরিশীলিত' সমাজ-সংস্কৃতিতে যেমন শুনি প্রধান-অপ্রধান কণ্ঠস্বর, আধিপত্যের মাপে, লোকসংস্কৃতির বলয়েও তেমন শোনা যায়। আধুনিক যে বাচনিকতা, তার সন্ধানে মিখাইল বাখতিনের দ্বিবাচনিকতার তত্ত্বের আলোচনার সূত্রে তপোধীর ভট্টাচার্য কিছু কথা বলেছেন; প্রয়োজনে তা ধার করি; পরে লক্ষ করব লোকসংস্কৃতিতে এমনটা ঘটে কিনা: 'ইতিহাসের প্রতিবেদন বা ভাষাবয়ন নিয়ে যখন কথা বলি, প্রতাপের প্রসঙ্গ এসেই যায়। কারণ সামাজিক প্রতাপ সময় ও পরিসরে দখলদারি না করে নিজের অস্তিত্বকে জিইয়ে রাখতে পারে না। আর, প্রতাপ মানেই আধিপত্যের পরিপোষক ভাবাদর্শ। তাই ইতিহাসের পাঠ এবং ভাষার বয়নে অন্তর্বয়নে প্রতাপের তাৎপর্য না খোঁজার মানে হলো নিরর্থক শূন্যের বিস্তার। প্রতাপের কৃৎকৌশল আমাদের ইতিহাসবোধ ও ভাষাবোধকে নানা ধরনের সূক্ষ্ম ও গ্রন্থিল জালে জড়িয়ে রেখেছে। মানুষের ভাষাটুকু শুধু যে অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে তাই নয়; নানা ধরনের গোপন ও প্রকাশ্য অভিপ্রায় ও স্বরন্যাস ভাষায় প্রতিফলিত হয় বলে তা শুধু জানাতে চায় না, ইসারাও করে। ফলে সমস্ত ধরনের মানবিক প্রতিবেদনই নিরন্তর সংগ্রামের ক্ষেত্র; প্রতাপের সহগামী ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে ও প্রান্তিকায়িত সত্তার পক্ষে না দাঁড়িয়ে কোনও পাঠকৃতি সত্যের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে না। উচ্চারণের প্রণেতা আসলে ভাবাদর্শ এবং স্বভাবত প্রতিবেদনের হৃৎস্পন্দন গড়ে ওঠে বিভিন্ন কণ্ঠস্বরের সংঘর্ষ থেকেই। কোন স্বর কখন প্রধান এবং কখন গৌণ হয়ে পড়বে, প্রতাপশাসিত ইতিহাস তার নির্ধারক হতে চায়। কিন্তু বাখতিন আমাদের শিখিয়েছেন, সত্য সর্বদা দ্বিবাচনিক। তাই প্রতাপের এই ঔদ্ধত্যও শেষ কথা হয় না, হতে পারে না।'[১২]

বাখতিন কথিত দ্বিবাচনিক সত্যের সন্ধান আমরা পাই লোকসংস্কৃতিতেও। আমরাও, বাখতিন অনুসরণে, বলতে পারি যে উচ্চারণের প্রণেতা আসলে ভাবাদর্শ এবং স্বভাবত প্রতিবেদনের হৃৎস্পন্দন গড়ে ওঠে বিভন্ন কণ্ঠস্বরের সংঘর্ষ থেকেই। লোকসংস্কৃতি নানা কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণের পুঞ্জ।

চার

এই সত্যের আলোকেই আত্ম-অপরের সন্ধান। প্রতিপাক্ষিক কণ্ঠস্বরের মাত্রাতে। এই কণ্ঠস্বর একটি দু'টি নয়, অনেক। আপাতত তিনটি পর্যায়ে দেখে নিই। সমাজ বনাম গোষ্ঠী, গোষ্ঠী বনাম গোষ্ঠী ও বর্গ বনাম বর্গ।

এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভাল যে গ্রামসমাজ ও লোকসমাজ সমার্থক নয়, যদিও লোকসংস্কৃতির অন্বেষণে এই ভুলটি হামেশাই করা হয়। বর্তমান কালখণ্ডে লোকসমাজ টিঁকে আছে, হয়ত, কোনও প্রত্যন্তে, যে-সমাজে ন্যূনতম স্তরবিন্যাসও নেই, নেই গোষ্ঠী-বিভাজন, যা আছে গ্রাম-শহর-নগরে। সেই সব পরিবেশে, গোষ্ঠীই, গোটা সমাজ নয়, 'লোক'। সামাজিক যে দ্বন্দ্ব সে দ্বন্দ্ব 'লোক'কেও ছুঁয়ে যায়, যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় মূলত প্রতাপ-প্রতিপত্তি-প্রাধান্যের অভিঘাতে। তৈরি হয় আত্মঅপরের অবস্থান ও পরিসর। সে পরিসরে যে সব সময় পরস্পর বৈরিতা বা পরস্পরের প্রতি উদাসীনতা তৈরি হয়, তা কিন্তু নয়। লোকসংস্কৃতি সহাবস্থানের সংস্কৃতি।

বাংলা লোকসংস্কৃতির 'লোক' বাঙালি; আবার এই সংস্কৃতিতে আছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর উচ্চারণ— নারী, পুরুষ, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও তথাকথিত 'গৌণ' ধর্মী, বাউল, ফকির, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, শূদ্র, আশরাফ, আতরাফ ইত্যাদি। লোকসংস্কৃতি তাই একমাত্রিক নয়, বহুমাত্রিক বহুবাচনিক। বাস্তব এই যে, মানুষের মনোভঙ্গি নানা বিভঙ্গে তৈরি হয়— একই সংস্কৃতির নানা গোষ্ঠীর চৈতন্য ও অভ্যাসের ভেদাভেদে, সংস্কারের চাপে। আলপনা শিল্পে লক্ষ্মীর পা যেমন বাংলার লোকসংস্কৃতি, তেমনই কোনও কুটিরে ৭৮৬ বা 'L^Y' চিহ্নের ইসলামি সংস্কারও লোকসংস্কৃতি[১৩], কাঁথাশিল্পেও হিন্দু বা মুসলমানি প্রতীক থাকে। এই দুই বা আরও পাঁচটি ভাবাদর্শের মিলমিশে বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি। সংস্কারবিহীন লোকসংস্কৃতি হয় না। ফলে একই সমাজ, এ ক্ষেত্রে বঙ্গসমাজের, বলয়ে, নানা লোকসংস্কৃতির অবস্থান, গ্রহণ-বর্জন-মিলন-বিরোধ-এর প্রক্রিয়ায়। এই অবস্থান যেমন ধর্মীয়, তেমনই পেশাগত কিংবা লিঙ্গ-বা-বর্ণ-ভিত্তিক।

বিরোধ-সমন্বয়, স্বীকৃতি-অস্বীকৃতি, প্রতিবাদ-ব্যঙ্গ ইত্যাদি হরেক মাত্রায় তৈরি হয় আত্ম-অপরের পরিচয় ও অবস্থান। প্রতাপের সূত্রে মুখ্য অথবা 'গৌণ'। বাংলায় যাকে আমরা 'গৌণ ধর্ম' বলছি, তা 'গৌণ' কেন, বিপরীতটাই বা 'মুখ্য' কেন? তা কি সংখ্যার হিসাবে, প্রভাবের নিরিখে, অথবা বর্গ-বিভাজনের সূত্রে? মুখ্য যাকে বলছি তা নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট হয় প্রভাব-প্রতিপত্তির মাপে। যে হিসাবেই ঘটুক, ধর্মের ক্ষেত্রে বাংলার গ্রামসমাজে এক সময় ছিল দু'টি তথাকথিত মুখ্যধর্ম: হিন্দু ও ইসলাম। তথাকথিত গৌণ

ধর্মগুলি ও তাদের অনুসারীরা, ওই দুই 'মুখ্য'ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের কাছে 'অপর', যেমন 'মুখ্য'রা তাঁদের কাছে 'অপর'। তাঁদের কাছে তাঁদের ধর্ম 'মুখ্য' অথবা 'গৌণ' কোনওটাই নয়, একমাত্র। 'শব্দভেদের ঠেলাঠেলি'-তে ধর্মের ভেদাভেদ ও কলহের বিরুদ্ধেই তাঁদের উচ্চারণ। এ ক্ষেত্রে একটি, গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে সমাজটাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে 'আর', যে-সমাজ তাঁদের বিচারে অহেতুক বিভাজিত। তাঁরা অন্য কোনও বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীর বিরোধিতা করছেন না, তাঁদের বিরোধের লক্ষ্য 'বিরোধ'-ই। এবং যে সমাজ এই বিরোধ জিইয়ে রাখে তার প্রতি:

১

হিন্দু কিংবা মুসলমান
শাক্ত বৌদ্ধ খিরিস্টান
বিধির কাছে সবাই সমান
পাপ পুণ্যের বিচারে।
জালাল পাগলার কথা ধরো
আত্মসমর্পণ করো
দলাদলির ভাবটি ছাড়ো
বলি বিনয় ক'রে।[১৪]

২

এক চাঁদে হয় জগৎ আলো
এক বীজে সব জন্ম হলো
ফকির লালন বলে মিছে কলহ
ভবে শুনতে পাই।[১৫]

৩

ডুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়ায়
তাতে যদি জগৎ পুড়ায়
বল্ তো গুরু কোথায় দাঁড়াই
অভেদ সাধন মরলো ভেদে।
তোর দুয়ারে নানান তালা
পুরাণ কোরাণ তসবী মালা
ভেদ পথই তো প্রধান জ্বালা
কেঁদে মদন মরে খেদে।[১৬]

অথচ, লড়াইটা তবু ছড়িয়ে যায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে। সমাজ-বিভাজনের বিরুদ্ধে যেমন তাঁদের বয়ান তৈরি হল, তেমনই আধিপত্য-নির্ভর সমাজের দৃষ্টিতে এই 'ব্রাত্যধর্মী'রা কিন্তু দাঁড়াচ্ছেন অন্য দুই ধর্মের মৌলবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই। 'ব্রাত্যধর্মী'দের কাছে 'বিভাজিত' সমাজ যেমন 'অপর', তেমনই 'অপর' ওই বিভাজনের জন্য দায়ী মৌলবাদীরা। 'কলহ করো না' এই কথা বললেও তাঁরা কিন্তু জড়িয়ে পড়ছেন কলহে। আঘাত করছেন প্রতিপক্ষের বিশ্বাস-সংস্কার-প্রতীকে; 'পুরাণ কোরাণ তসবী মালা'। অথচ, তাঁরাও তো তৈরি করেছিলেন তেমনই কোনও সংস্কার, আচার ও প্রতীক— যে কোনও ধর্মের এমনই বাধ্যতা; এই সব বিনা ধর্ম হয় না। প্রতিপক্ষও তাই নীরব থাকলেন না। তৈরি হল তাঁদের বয়ান :

১

ঠেঁটা গুরু ঝুটা পীর
বালা হাতে নেড়ার ফকীর
এরা আসল শয়তান, কাফের বেইমান
তা কি তোমরা জান?

২

যত সব নাড়াবুনে
সব হল কেত্তনে
কাস্তে ভেঙ্গে গড়ালো কত্তাল।[১৮]

উপরে উদ্ধৃত প্রথম বয়ানটি মীর মশার্‌রফ হোসেনের রচনা। কেউ কেউ অবাক হয়েছেন যে তাঁর মতো মানুষও এমনটা লিখেছিলেন।[১৯] ভেবেছিলেন বলেই তো লিখেছিলেন। কিন্তু কেন এই ভাবনা? তার উত্তরে যাবার আগে আর একটি প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া দরকার। এই বয়ানটি কি লোকসংস্কৃতির বয়ান? 'লোক' বলতে সাধারণত যা বোঝা হয়, মীর মশার্‌রফ তার আওতায় পড়েন কি? আমার দু' একটি প্রবন্ধে এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা আমি করেছি।[২০] সংক্ষেপে বলি যে উনিশ শতকের বাংলার গ্রামসমাজে যে সব গোষ্ঠীর অবস্থান দেখা যায়, তার একটি যদি হয় 'নেড়ার ফকির, ঠেঁটা গুরু ঝুটা পীর'-এর গোষ্ঠী, তা হলে অন্যগোষ্ঠী বা গোষ্ঠীগুলি, যাঁরা 'মুখ্য' নামে অভিহিত, তাঁদের বিরোধী, প্রতিপক্ষ। মীর মশার্‌রফের বয়ান তেমনই এক বিরোধী গোষ্ঠীর বয়ান, তাঁদের ভাবাদর্শ। অর্থাৎ, তথাকথিত 'গৌণ' ও 'মুখ্য' ধর্মের লড়াই – এক অপরের বিরুদ্ধে। 'গৌণ' ধর্ম, তার আচার, সংস্কার, দর্শন, গীত, যেমন লোকসংস্কৃতি, তেমনই 'মুখ্য' ধর্ম ও তার আচার , সংস্কার, গীত, কথকথা, ইত্যাদি লোকসংস্কৃতি। জালাল পাগলা, পাগলা কানাই, লালন, দুদ্দুশাহের গীত যেমন লোকগীতি, তেমনই লক্ষ্মীনারায়ণ, সত্যপীর ও ইমামের পাঁচালি[২১]-ও তো লোকসংস্কৃতি। 'ব্রাত্যধর্মী'রা যেমন ইমামদের, স্মার্তপণ্ডিতদের অস্বীকার করেন, তেমনই অন্য কোনও ধর্মাশ্রয়ী গোষ্ঠীতো তাঁদের মর্যাদা দেন, রচনা করেন পাঁচালি, কিস্যা, কিংবদন্তি। দ্বিতীয় গোষ্ঠীও 'লোক', 'ইমামের পাঁচালি'র মতো লোক-পাঠ তাঁরা তৈরি করেন। আর পীর ফকিররা তাঁদের বয়ানে বিরোধিতা করায়, তাঁরা তাঁদের প্রতিপক্ষ। এই সূত্রেই বলা যায়, আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তরে যে মীর মশার্‌রফের উক্তিকে এই গোষ্ঠীর উক্তি হিসাবেই মেনে নিতে হয়। এঁদের আক্রমণ কখনও হিংস্রও হয়ে ওঠে: যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন,

'এরা পাপী; লজ্জাকর জীবনযাপন করে। মানুষের সমাজে এদের জায়গা দেওয়া উচিত নয়,' আর জোনাবালির ফতোয়া: 'লাঠি মারো মাথে দাগাবাজ ফকীরের'।[২২] মীর মশার্‌রফ, ভট্টাচার্য ও জোনাবালি একা নন, তাঁদের কণ্ঠস্বর একটি গোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর, 'অপর' গোষ্ঠীর বিরোধিতায়। ভট্টাচার্য বা আলি একে অপরের প্রতিপক্ষ হলেও, ফকির-বাউলের প্রতিপক্ষে তাঁরা এক।

এই 'অপরের' 'অপর' যে গোষ্ঠী, নিজেদের অবস্থানে যাঁরা পরস্পর 'অপর', তাঁদের অন্দরমহলেও কিন্তু আর এক 'অপর' থাকে। মুসলমান সমাজ নিয়ে যখন আপাতত ব্যস্ত, সেই সমাজ নিয়েই কথা হোক প্রথম। প্রসঙ্গ বর্ণভেদ। হিন্দু সমাজে এই ভেদাভেদ প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত সত্য, ধর্মের অনুশাসনেই বর্তমান। মুসলমান সমাজে তা গড়ে উঠেছে প্রতাপ-প্রতিপত্তির আওতায়। একটি প্রতিবেদন থেকে বিশ্লেষণটি জেনে নিই: 'হিন্দু সমাজে যে ধরনের জাতিভেদ প্রথা আছে, মুসলমানদের মধ্যে তেমন নেই। একেবারেই নেই, একথাও বলা যাবে না। তত্ত্বগত মতপার্থক্যের বাইরেও আছে নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভেদাভেদ। শহরাঞ্চলে ততটা টের পাওয়া না গেলেও, গ্রামে আশরাফ-আতরাফ ভেদাভেদ মেনে চলা হয়। আশরাফ আরবি কথা, বহুবচন। এর অর্থ, ভদ্র বা অভিজাত সম্প্রদায়। আর তার বিপরীত শব্দ, আতরাফ, মানে ইতর শ্রেণী। যাঁরা বিদেশাগত মুসলমানের বংশধর, তাঁরাই নিজেদের আশরাফ বলে দাবি করেন। পক্ষান্তরে, স্থানীয় রক্তজাত ধর্মান্তরিত মুসলমানের বংশধর হলে তাঁকে মনে করা হয় আতরাফ। যদিও এই বিভেদ ইসলামসম্মত নয়। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা যা তা স্বীকার করতেই হবে।'[২৩] এই দ্বন্দ্বের বয়ানটিই কি পাওয়া যায় না ছড়ায় :

পীর বরাবর নেড়ে
সোনার খুরে এঁড়ে
ঘরের পাশে গেঁড়ে
যে বিশ্বাস করে
সে ভেড়ের ভেড়ে।[২৪]

'নেড়ে' শব্দটি কিন্তু একটি সমস্যা তৈরি করে। নেড়ে আর মুসলমান কি সমার্থক? হিন্দুরা সেই অর্থেই, তাচ্ছিল্যে, ব্যবহার করেন। আবার ওপরের ছড়া, যাকে প্রবাদ বলেও মানা হয়[২৫], কিংবা যখন উচ্চারিত হয়, 'গরুর মধ্যে এঁড়ে, জাতের মধ্যে নেড়ে'[২৬], এবং 'জলজঙ্গল, আঁধার রাত, এঁড়ে গরু, নেড়ে জাত'[২৭], ইত্যাদি, তখন ঠিক বোঝা যায় না এই উচ্চারণের লক্ষ্য 'ধর্মান্তরিত স্থানীয় মুসলমান' আর এতে আছে মুসলমান সমাজের আশরাফ-আতরাফ ভেদাভেদের জটিলতা, না কি এ সব হিন্দুদের কটাক্ষ, মুসলমানদের প্রতি। হয়ত দুটোই গ্রাহ্য। কোন গ্রহণ সঠিক তা নির্ভর করে সরেজমিন গবেষণার উপর, স্থানীয় ভাবে অর্থ ও ইঙ্গিতের তফাত হতে পারে। প্রসঙ্গত বলি, প্রবাদের ব্যাখ্যা তখনই সঠিক যখন তা যথার্থ পরিবেশ বা কনটেকস্টে বিচার হয়। এই দ্বিধা সত্ত্বেও বলা যায় যে মূল প্রতিপাদ্য থাকলই : 'অপর'-এর নিশানা।

আর, সেই 'অপর' 'নেড়ে'দের কণ্ঠস্বরও কিন্তু খুব মিনমিনে নয় :

১

আগে কাজী, পরে হাজী, শেষে পাজী।[২৮]

২

যত হাজী, তত পাজী।[২৯]

৩

কলিকালের মুন্সী মোল্লা, নামে হবে দড়।
না মানবে কোরাণ কেতাব, হুজ্জোত করবে বড়॥[৩০]

৪

এক হাটে পেঁয়াজ বেচলাম, চাচা, মোল্লা হলে কবে।[৩১]

হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ তো আরও স্পষ্ট, প্রকাশ্য। সেখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, শূদ্রের পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধার প্রকাশ খুব সামান্য নয়। একটি প্রবাদে শুনছি : 'উড়ে, নেড়ে, গলায়-দড়ে, কথা কইবে ও তিন ছেড়ে।'[৩২] অর্থাৎ একটি জাতি, একটি সম্প্রদায় ও একটি বর্ণের প্রতি অশ্রদ্ধা, শ্লেষ। আর বিভিন্ন বর্ণের, অন্য ধর্মের, বিশেষত তথাকথিত গৌণধর্মের 'অপর' দের সম্পর্কে যে বয়ান তা কখনও অশ্রদ্ধারও অতিরিক্ত, কিছু :

১

বামুন, গরু, ছাগল, তিনই দড়ির পাগল।[৩৩]

২

বামুন, গণক, কাউয়া, তিন পরের খাউয়া।[৩৪]

৩

কলির বামুন ঢোঁড়া সাপ, যে না মারে তার পাপ।[৩৫]

৪

চূর্ণ, চিন্তা, চালবাজি, তিন নিয়ে কবিরাজী।[৩৬]

৫

বেজ (= বৈদ্য), বানিয়া, বোড়া, তিন নষ্টের গোড়া।[৩৭]

৬

কাক ধূর্ত, আর কায়েত ধূর্ত।[৩৮]

৭

নাপিত, বদ্যি, ধোপা, চোর, যুগী বৈরেগীর নেইক ওর।[৩৯]

৮

কায়েত, কালসাপ, বেদোনারী, তিনজনকে পরিহারি।[৪০]

৯

যুবতীর কোল, শিঙিমাছের ঝোল, মুখে হরিবোল।[৪১]

১০

আগে বেশ্যে, পরে দাস্যে, মধ্যে মধ্যে কুটনী।
সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যজ্য, এখন বোষ্টমী।।[৪২]

১১

শান্তিপুর রসের সাগর এক এক ঘরে তিন তিন নাগর।[৪৩]

১২

রঘু, চৈতা, বলা, এ তিন কলির চেলা।[৪৪]

৪৫

নারী হিজড়ে, পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্তাভজা।[৪৫]

ভিন্ন বর্ণ ও ভিন্ন ধর্মের প্রতি ব্যঙ্গ, কটাক্ষ, অশ্রদ্ধা, ইত্যাদি বাংলা প্রবাদের একটি বড় অংশ। কয়েকটি উদাহরণ মাত্র স্মরণ করা গেল। লক্ষ করুন এই উদাহরণে কত 'অপর'— ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, ধোপা, নাপিত, বৈষ্ণব, কর্তাভজা, ইত্যাদি। হিন্দু-মুসলমান আত্ম-অপর, পরস্পরের, আগেই খানিকটা আলোচনা করেছি। আরও কয়েকটি প্রবাদ শোনাই এই কারণে যে এগুলি যথেষ্ট তীক্ষ্ণ— ব্যঙ্গের লক্ষ্য পরস্পরের আচার-উৎসব :

১

নেড়ে খোঁজে ঈদ্ পরব।[৪৬]

২

ডুব দিয়ে পানি খাই, সারাদিন রোজা যাই।[৪৭]

৩

এক একাদশী ছাড়াই, ত্রিশ রোজা বাড়াই।[৪৮]

৪

হিঁদুদের দুগগোপুজো, উপরে চিকণ চাকণ,
ভেতরে খড়ের বুজো।[৪৯]

সমাজ-সম্প্রদায়, গোষ্ঠী-ভিন্নগোষ্ঠী, বর্গ-ভিন্নবর্গ, এই তিনটি পর্যায়ে 'আত্ম-অপর' মনোভঙ্গি ও উচ্চারণ খানিকটা লক্ষ করা গেল। এর ভেতরেও ভগ্নাংশ আছে— যেমন নারী-পুরুষ, বৈষ্ণব-জাতবৈষ্ণব ইত্যাদি। তাদেরও গোষ্ঠী বলতে বাধা নেই। নারী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি আচরণ ও উচ্চারণ গোড়াতেই দেখে নিয়েছি। এই সব মিলিয়েই লোকসংস্কৃতির বহুবাচনিকতা।

পাঁচ

কিন্তু সবটাই কি বিরোধ, লড়াই? এই প্রশ্ন উঠতেই পারে। লোকসংস্কৃতি এই প্রশ্নেরই বিরোধিতা করে। সহাবস্থান লোকসংস্কৃতির একটি প্রধান চিহ্ন। লোকজীবনে পরস্পর নির্ভরতা বাস্তব বাধ্যতা। পরস্পর সান্নিধ্যে, জড়িয়ে-মড়িয়ে যে জীবনযাত্রা, তাতে সহাবস্থান এড়ানো যায় না। এক পুকুরের চারপাশে যাদের কোঠা-কুঁড়ে, তাদের পক্ষে জলবিবাদ কঠিন; তাই আপসে পাড়া ভাগ হয়। এক হাটে যাদের বেচাকেনা সেখানে বিবাদ সহজ নয়, কেউ ঘটি কেউ গাড়ু কিনলেও। খাদ্যাভ্যাস, আচার-সংস্কার আলাদা হলেও, সহাবস্থানের জন্য কিছু সমাধানসূত্র তাই খুঁজে নিতেই হয়।

আবার ভেদাভেদও বাস্তব। তার সঙ্গে যখন প্রতাপের, আধিপত্যের প্রশ্নের সংযোগ ঘটে যায় তখন অত্যাচারও হতে পারে। মুর্শিদাবাদ জেলায় একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেন শক্তিনাথ ঝা। সেই সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে মুসলমান বাউলদের ওপর মৌলবিদের নেতৃত্বে সংগঠিত অত্যাচারের নমুনা: 'সমীক্ষাভুক্ত ২১৮টি পরিবারের মধ্যে ১৩৪টি অর্থাৎ প্রায় ৬২% প্রত্যক্ষভাবে অত্যাচার ভোগ করেছে।'[৫০] আবার, 'মুক্ত বুদ্ধির বহুমানুষ জোর করে ধর্মাচার চাপানোর বিরোধিতা করে। ফলত বাউলেরা কিছু সমর্থন গ্রাম্য সমাজ ও পরিবেশ থেকে পায়। .... নিম্নবর্গের মুসলমান জনতার সংস্কারে, মূল্যবোধে সমন্বয়ী চেতনা বাউলদের প্রচার ও প্রসারের ভিত্তি নির্মাণ করে। অত্যাচারের ফলে বাউলমত ত্যাগ করেছে এমন একজনকেও মুর্শিদাবাদ জেলায় খুঁজে পাওয়া যায় না।'[৫১]

এই সমীক্ষা সাম্প্রতিক কিন্তু এমনটা তো অনেক কাল আগেই, সেই উনিশ শতকেই, ঘটেছে। লালনরা কি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই তাচ্ছিল্য, ঘৃণা, নিন্দা, শত্রুতা কুড়োননি? তাঁদেরও তো কুকুর বেড়ালের মতো সমাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার আওয়াজ উঠেছিল। কিন্তু তা কি সম্ভব হয়? হয়ত তাঁরা প্রান্তে সরে যান, কিন্তু থাকেন; থাকেন নিজেদের গৌরবে, স্ব-ধর্মাচারে।

তাই সহাবস্থান ছিল এবং আছে। সে সহাবস্থান আক্রান্ত হয় প্রতাপ ও আধিপত্য-স্পৃহার পরিসর ও সমীকরণে। খুব সহজ হয় না কারণ প্রতিরোধ প্রক্রিয়াও সমাজেই গড়ে ওঠে। তার নজির, বাংলা ভূখণ্ডে, খুব সামান্য নয়। বাখতিন অনুসরণে পুনরুক্তি করতে পারি যে প্রতাপের ঔদ্ধত্য শেষ কথা হয় না।

আর ভাবাদর্শের অবস্থান ও সংঘাত বহুবাচনিকতার পরিসর তৈরি করে। আত্ম-অপরের দ্বিবাচনিকতা যেমন সব সংস্কৃতির আন্তঃলক্ষণ, তেমনই লোকসংস্কৃতিরও। এই আত্ম-অপর সংবাদ কিন্তু সহাবস্থান অস্বীকার করে না; লোকজীবনের এমনই বাধ্যতা। তেমনই আর এক বাধ্যতায়, নানা গোষ্ঠীর অবস্থানে, নানা কণ্ঠস্বর শোনা যাবেই, পক্ষ-প্রতিপক্ষের সংলাপে, বয়ানে। লোকসংস্কৃতি সেই বয়ান।

আত্ম-অপরের, পক্ষ-প্রতিপক্ষের, বাস্তবের এই আসরেই আবার শোনা যায় সম্ভাষণ ও নিমন্ত্রণ :

আমার বাড়ি যাইও বন্ধু
দক্ষিণ বরাবর
উছা নিছা কলার বাগ
পুব দরিয়া ঘর

আমার বাড়ি গেলে বন্ধু
খালে বিলে পানি
জল গামছা ভিজাইয়া যাইও
ফিনতে দেব ধুতি
তুমি আমার আমি তোমার বন্ধুরে
আকাশেরি চাঁন।
কলাপাতা ছদর ভদর
কাঁঠাল পাতা লাল

তোমার আমার পিরিত বন্ধু
থাকবো চিরকাল।
কাঙাল কুদ্দুসে বলে
আসরে দাঁড়াইয়া
ভুল ত্রুটি হইলে
লইবান মাপ করিয়া।[৫২]

কাঙাল কুদ্দুসের উচ্চারণও একটি বয়ান, একার নয়, অনেকের এবং অনেক বয়ানের অন্যতম একটি।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. Voloshinov, V. N, *Marxism and the Phiilosophy of language*. New York : Seminar press. 1973 (1929) : 86

২. দিনেন্দ্র চৌধুরী, *গ্রামীণ গীতিসংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা : লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। ২০০১ : ৩১৩

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলাভাষা পরিচয়, রচনাবলি*, চর্তুদশ খণ্ড, শতবার্ষিক সংস্করণ। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৩৬৮ : ৪৮৩

৪. সুশীল কুমার দে, *বাংলা প্রবাদ*, তৃতীয় সংস্করণ। কলকাতা : এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং। ১৩৯২: ৩১

৫. শর্মিলা বসুদত্ত, 'বাংলায় মেয়েদের ভাষায় প্রবাদের ব্যবহার', *আকাদেমি পত্রিকা* ৮ ১৯৯৫ : ৯৪

৬. ঐ পৃ: ৯৫

৭. বাল্যকালে শোনা সিলেটি প্রবাদ, যদি একে প্রবাদ বলে মানি। দ্বিধা আছে।

৮. দিনেন্দ্র চৌধুরী, পূর্বোল্লিখিত। পৃ: ৩১৩

৯. ঐ পৃ: ৩১৫

১০. ঐ পৃ: ৩১৭

১১. সুশীল কুমার দে, পূর্বোল্লিখিত। পৃ: ৩৪

১২. তপোধীর ভট্টাচার্য, বাখতিন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ। কলকাতা : পুস্তক বিপণি। ১৯৯৬ : ৩০

১৩. অশোককুমার কুণ্ডু, 'ঘরের কথা', বাংলার কুটির। কলকাতা : সেন্টার ফর আর্কিয়োলজিক্যাল স্টাডিস অ্যান্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া। ২০০১ : ৪৯ 'মূল দক্ষিণ দুয়ারি ঘরের দেওয়ালে আঁকা লতাপাতা, পশ্চিমের দেওয়ালে ৭৮৬ (খোদাকে স্মরণ করে, এ সংখ্যা বাঙালি মুসলমানের বাড়িতে, দোকানে দেখা যায়) লেখা। সেখানে ফুল আঁকা। মাথার ওপর " L^Y" চিহ্ন যা ৭৮৬ সংখ্যার উর্দু-আরবি-ফারসি ভাষ্য, বিসমিল্লাহের রহমানের রহিম : অর্থ, আল্লার নামে শুভারম্ভ করছি।'

১৪. দিনেন্দ্র চৌধুরী, পূর্বোল্লিখিত পৃ : ৩১৩

১৫. ঐ পৃ: ৩১৫

১৬. ঐ পৃ: ৩১৭

১৭. মীর মশাররফ হোসেন। দ্র. সুধীর চক্রবর্তী, লালন। কলকাতা: প্যাপিরাস। ১৯৯৮ : ৫৫

১৮. অলোক মৈত্র, 'বাঙালি মুসলমান : ছড়া ও প্রবাদ', লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ১৫ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ১৪০৯ : ৮৪৩। এই ব্যঙ্গ চৈতন্যপন্থীদের প্রতি।

১৯. সুধীর চক্রবর্তী, পূর্বোল্লিখিত পৃ. ৫৫

২০. সৌমেন সেন, 'লোক-এর বিভাজন' *লোকশ্রুতি* ২০, ২০০২ : ১-১১ ; *মধ্যবিত্ত লোকসংস্কৃতি, চতুরঙ্গ*, বর্ষ ৬২, সংখ্যা ১ , ১৪০৯ : ৫ - ১৩

২১. মুহম্মদ আয়ুব হোসেন, 'বাঙালি মুসলমান ও লোকসংস্কৃতি', লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ১৫ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ১৪০৯ : ৮০০-০১

২২. সুধীর চক্রবর্তী, পূর্বোল্লিখিত। পৃ: ৫৪-৫৫

২৩. জাহিরুল হাসান, 'মুসলমান সমাজে বর্ণবৈচিত্র', লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ১৫বর্ষ, ৪ সংখ্যা ১৪০৯ : ৭২৪

২৪. অলোক মৈত্র, পূর্বোল্লিখিত, পৃ: ৮৪৪

২৫-৪৯. এই উদহরণগুলি নেওয়া হয়েছে সুশীল কুমার দে-র পূর্বোল্লিখিত বাংলা প্রবাদ গ্রন্থ থেকে। পৃ: ৩২-৩৪

৫০. শক্তিনাথ ঝা, বস্তুবাদী বাউল। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। ১৯৯৯ : ২৩৭

৫১. ঐ পৃ: ২৩৮

৫২. শফিকুর রহমান চৌধুরী, সম্পা. বাংলাদেশের লোকসংগীত। ঢাকা: বাংলা একাডেমী। ১৪০১ : ২২

নির্জন প্রেমিক

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

ভনভন করে উড়ে বেড়াচ্ছিল এক প্রেমিক
যখন ওর চোখ পড়ল বিষয়বস্তুর দিকে।
বিষয়বস্তু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অবয়ব
মুখের রেখা আর সাদা সিঁথি লক্ষ করছিল। ওর
চারদিকে ভনভন করছিল অদৃশ্য প্রেমিক। সেই প্রেমিক
তখন টের পায় যে বিষয়বস্তুর শরীর থেকে
সুঘ্রাণ বেরচ্ছে। এ সুঘ্রাণ মৃদু, এ কোনও
কৃত্রিম সুরভি নয় জানতে পেরে নির্জন প্রেমিক
বিষয়বস্তুর চুলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে।

স্বামী হয়ে ওঠার পর প্রেমিকের আর আনন্দ
ধরে না। সে বিষয়বস্তুর মুখের, বুকের, শরীরের
সর্বত্র বিচরণ করার অধিকার অর্জন করে। তার
বিষয়বস্তুর শরীরের এক এক জায়গায় এক এক রকম
সুগন্ধ সে উপলব্ধি করে। তবু কিছু গোপন জায়গা
থাকে যেখানকার উগ্রতায় সে পৌঁছতে পারে না।
তার রাগ হয়। সে কাচ ভাঙে। সে চায়ের কাপ
উল্টে দেয় বিষয়বস্তুর পায়ের ওপর।

এর পরই এক তীব্র যন্ত্রণার শব্দ শুনতে পাই
আমরা। এক হাহাকার। সেই প্রাক্তন প্রেমিক
এবং বর্তমান স্বামী তখন কুঁকড়ে মাছির মতো
ছোট হয়ে গেছে। কাতরভাবে বলছে, আমি
বাবা হতে চেয়েছিলাম। আমি কেন বাবা হতে
পারলাম না।

আমার কবিতা
কবিরুল ইসলাম

'I warmed both hands before the fire of Life'
— Landor

আমার কবিতা কেউ কী পড়তে পারো
জীবনানন্দে সপ্রতিভ-উজ্জ্বল ......
শীলমোহরের স্বাতন্ত্র টিপছাপে
আরও কিছু চাও — চাইবার পরিমাপে

ফাল্গুনে শীত জাঁকিয়ে বসছে আরও
কাঁথা - কম্বলে সঙ্গিনী শতদল

যা লিখেছি আর যা কিছু লিখতে চাই
দু'হাত সেঁকেছি জীবনের উত্তাপে
উপলব্ধি ও উক্তির পারাপার

স্মরণীয়তার সফল সারাৎসারে ॥

স্থিতপ্রজ্ঞ

অনন্ত দাশ

প্রতিটি সকাল এত সম্ভাবনাময়
প্রতিটি মুহূর্তে জমে এত কৌতূহল
একটা বিড়াল তবু কেঁদে কেঁদে সুরে
ডেকে আনে গৃহস্থের ঘোর অমঙ্গল

শৃঙ্গের নাগালে এসে
যেই হাত বাড়াই আকাশে
বায়ুমণ্ডলের ভাসমান কণা
ফুসফুসে কেঁপে ওঠে ভয়ংকর ত্রাসে

আশায় উদ্বেল হয়ে এসেছি অনেক হেঁটে
উঁচুনিচু পথ
বড় ব্যথা পাই তাতে যদি কেউ কথা দিয়ে
না রাখে শপথ

যেমন সকালে ছিল সন্ধ্যাতেও তাই
প্রত্যাশার নিত্য ভাঙাগড়া
মোবাইলে কি জানা যাবে
চৈত্রশেষে কেন এই চৈতন্যের খরা।

হতাশায় ভেঙে পড়ি ক্ষোভে দুঃখে জ্বলে উঠি
তীব্র বেদনায়
স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষের দেখা হয়ত পাওয়া যাবে
ভগবদ্‌গীতায়

ছুটি - ছুটি
মিহির সরকার

শুয়ে আছে কাতর জীবন, ছেঁড়া ফাটা মাঠ
কাদামাখা ধর্মনিরপেক্ষ নিরক্ষর পা
একটানা বৃষ্টির ভেতর লালন ফকির
খুঁজে বেড়ায়, কোথায় গেল মা।

ঘুমিয়ে পড়েছে পাশের ঘরে
নাটকের রঙিন পোশাক
জটিল সংলাপ —
সাম্রাজ্যবাদী আফিম দানা
সেলাম, তেমাকে সেলাম।

বুকের ভেতর ছুটির ঘন্টা
বেজে উঠল ট্রেন ছাড়ার বাদামি হুইসেল
হেঁটে যাচ্ছে পদাতিক দিগন্ত ডিঙিয়ে
অমরত্বহীন ছাই-রং ছায়ার দিকে।

দেখো মানুষ এভাবেই ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক ফেলে
বৃষ্টিতে দাঁড়ায় একা একা
বুকের ভেতর সূর্য ডোবে
কোন এক অলৌকিক দিগন্তে
নাটকহীন মঞ্চে তখন ছেঁড়া কাগজ, চড়ুই, কাক
ঘুমিয়ে পড়ে বেয়নেট ঝোপের আড়ালে।

প্রণয়রাত্রির পর
সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণয় রাত্রি পার হয়ে শস্য ছোঁয়া মাটি নিরুদ্দিষ্ট হবার আগে
শেষ বারের মতো আমাকে নত হতে বলে,
জলের কাছে জলবোধে নত হয়ে থাকি ঢেউ, কিংবা চোখ দৃষ্টির ভিতর যেমন।
এখান থেকেই শুরু হয় বৃষ্টির আবেগে মুগ্ধ হওয়া এবং খুঁত ধরা অহর্নিশ,
রাত্রি- পালিত মুখের রং বল্কলে কাটাকুটি খেলে
নিলীম শূন্যতা থেকে অরূপ সৌন্দর্য দুলে যায় পেন্ডুলামের মতো তালে তালে।

আমাকে দেখতে দিলে না
আমার সমস্ত ইচ্ছেগুলো একা একা প'রে নিচ্ছে অভিমানী পোশাক!

প্রণয়রাত্রির গহ্বর থেকে জন্ম নিচ্ছে আলুথালু পাহাড়ের ঢাল;
ঢালের গায়ে ঘাসের চারুলতা গায় জড়িয়ে বেজে যাচ্ছে বাঁশি
শাখা প্রশাখায় বাজছে কাড়া-নাকাড়া।
সিস্টারের রাতজাগা ক্লান্ত রেটিনা থেকে মুছে যাচ্ছে ক্ষতদৃশ্যাবলি
একাম্বর চাঁদের আন্দোলিত গ্রীবায় দুলছে আলোর রোশনাই,
আকাশের করিডোরে থই থই মেঘ,
ওয়েটিং রুমে কৃষ্ণচূড়ার সেই উদগ্রীব রাত জাগা চোখ!

আমাকে দেখতে দিলে না
আমার সমস্ত অভিমান একা একা পরে নিচ্ছে ক্রোধের পোশাক!

প্রণয় রাত্রির শেষ যামে এক মুঠো রোদ পুষে রাখা বুক;
স্পর্ধিত ইস্তাহারের মতো সমস্ত গোপন ঘিঞ্জিগলি ছুঁয়ে চলে গেল,
আর অর্ধদগ্ধ জীবন, জল - ঘাস - পাহাড় ডিঙোতে ডিঙোতে কবুতর।
শুভ্রতার তৃষ্ণা চেটে খাচ্ছে শিশু উদ্ভিদেরা
শিশির কুড়ানো কিশোরীদের উদ্ভিন্ন বুককথায় পাগল কিশোর,
শ্রেণীবিভাজনী মন্ত্রে পোড়ানো হচ্ছে যুবকের স্বপ্নের লাশ!

আমাকে দেখতে দিলে না
আমার সমস্ত ক্রোধ একা একা পরে নিচ্ছে যুদ্ধের পোশাক!

প্রণয়রাত্রি দাদরা বাজিয়ে যায় মীড় ও গমকে।

পাগল তোমার জন্য

রূপা দাশগুপ্ত

পাগল তোমার জন্য পথে পথে হন্যমান
কীভাবে ফেরাব ওই পাহাড়চূড়াকে
কুয়াশায় মুখ ঢেকে সে গেছে খাদের টানে তৃষা
ভুলেছি প্রত্যহ জাগা এলোমেলো ফুঁয়ো চুলে বিলি
রাত্রিজাগর সেই বারান্দার উদাস চিঠিটি
পোস্টম্যান দিকছায়া, আমাদের অবৈধ স্নান
ফুল আর মৃদু ধূপে কেড়ে নেয় শহর যৌবন
পাগল, তোমার সাথে কথা ছিল কত
কথাগুলি উড়োখই যাবৎ সমুদ্রে ভাসমান
কণ্ঠায় মালা দোলে হাত দুটি ভরসার দীপ
এক দিন পথ ছিল আঁকাবাঁকা কাঁটায় বিছানো
আজ তার হৃৎ খুলে জানালা ফুরুৎ অন্যমন
পাগল, বলো দুঃস্বপ্ন ভুল, স্বপ্ন দোপাট্টা ভীরুতার
আমাকে অবশ করো পুনর্বার দহনে তোমার।

সূর্যস্নান
ঋত্বিক ঠাকুর

অজগর গুহা ছেড়ে এই ফিরে আসা
লোকাঞ্চলে তোমাদের যুদ্ধপটে। জ্বালো
যত পোড়ো রাত পাতাদের ভালবাসা
হৃদয়ের বনস্থলী জুড়ে। জমকালো
হিংসার মুখ খোলশের খেলা থেকে
ছুটি নেবে শ্মশানের কবরের ঘাসে
শিশিরের বেদনার গানে ক্ষত ঢেকে
লড়াই মুখর আগুনের হা-উল্লাসে
জীবনডাঙায়। চাল ডাল তেল নুন
পান্তার পরব কাল ছিল আজও আছে
স্বপ্ন বসতিতে। হয়ত অনেক গুণ
বাকি আছে ধার দেনা। নদী তবু কাছে
ডাকে বৃষ্টি হতে বারবার। কুম্ভমেলা
ফিরে আসে জানি সূর্যস্নানে ভোরবেলা।।

ছোঁবে নাকি বুকে হেঁটে মাথা

অরুণ সেন

কী আশ্চর্য কী আশ্চর্য
সাপে কাটা রোগীও যে মেষে মেষে হয়ে যাচ্ছে সাপ
পিতলের পেট থেকে বারুদের গুপ্ত ফোঁড়
এ ভাবে কী, এ ভাবে কী, ভেঙে দেবে ঘিলু রক্ষা বাঁধ
কে কাকে এ বার দেবে
বল, কে দেবে এবার কাকে
নীল নীল অন্ধকারে ফুঁসে ফঁসে দু'দাঁতের ফুটো
কী ব্যাপার, কী ব্যাপার, ছোঁবে নাকি
ছোঁবে নাকি, বুকে হেঁটে মাথা
কার স্বপ্নে হাত দিয়ে ছিঁড়ে দিচ্ছে, ছিঁড়ে দিচ্ছে ছাতা
এ কী ছায়াও যে ছায়া খাচ্ছে
খেতে খেতে ছায়া ফাটছে
ছায়া ফেটে ধুলো হচ্ছে ছাই
কে আছে, কে আছে বলো গোপনে কোথায়
বার হয়ে ফের করবে শুধু খাই খাই

ধারাবাহিক স্মৃতিচারণ

ভাঙ্গা পথের রাঙ্গা ধুলায়

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সে সময় 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার যিনি সম্পাদক ছিলেন তিনি এক লম্বা ছুটি নিয়ে বিলেত গিয়েছিলেন। অস্থায়ী সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন প্রবীণতম সহকারী সম্পাদক এস কে র‍্যাটক্লিফ। র‍্যাটক্লিফ সাহেব ভাইসরয় লর্ড কার্জনের কাজকর্মের সমালোচক ছিলেন। ততদিনে ঢাকা শহর নতুন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হয়ে গিয়েছে। নতুন রাজধানী গড়ার ব্যাপারে কিছু একটা প্রসাশনিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। এস কে র‍্যাটক্লিফ সাহেব এই সুযোগে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এক কড়া সম্পাদকীয় লিখে ফেললেন। সে সময় এই রেওয়াজ ইংরেজি কাগজগুলোতে ছিল, যিনি সম্পাদকীয় লিখতেন, তাঁর নাম সম্পাদকীয় কলমের নীচে ছাপা হত। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এক বড় অস্ত্র হাতে পেয়ে গেলেন। এসপ্লানেড ইস্টে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করলেন। মিছিল চলে এল স্টেটসম্যান অফিসে। মিছিলের পুরোভাগে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং; মিছিলকারীরা এস কে র‍্যাটক্লিফকে অভিনন্দন জানাতে চায়। র‍্যাটক্লিফ সাহেব খবর পেয়ে দোতলার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথকে দেখে তিনি নীচে নেমে এলেন। তিনি নীচে দাঁড়াতেই এস কে র‍্যাটক্লিফের বাঙালি নামকরণ হয়ে গেল 'শরৎকুমার' র‍্যাটক্লিফ।

স্লোগান উঠল 'লং লিভ শরৎকুমার র‍্যাটক্লিফ'। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ একেবারে সামনে সুরেন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথকে বললেন, সাহেবকে কিছুক্ষণ কাঁধে তুলে নিয়ে ঘোরাব। প্রচণ্ড বলশালী হেমেন্দ্রপ্রসাদ এক লহমায় র‍্যাটক্লিফ সাহেবকে কাঁধে তুলে ফেললেন, উৎফুল্ল জনতার হর্ষধ্বনি 'লং লিভ শরৎকুমার র‍্যাটক্লিফ।' প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত বাংলার রাজনীতি যখন সুরেন্দ্রনাথের করায়ত্ত সে সময় বাংলার সাহিত্য ও সংবাদপত্র জগতে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ নামে একজন হাস্যরসাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক রচনায় বাংলাকে মাতিয়ে রেখেছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করতেন। কাব্য বিশারদ সুরেন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহধন্য ছিলেন। ওই সময় কলকাতা পুরসংস্থার নির্বাচন ঘটেছিল। তাতে সুরেন্দ্রনাথের প্রবল প্রতিপক্ষ ছিলেন শহরের বিখ্যাত সর্বাধিকারী পরিবারের একজন। ভোটের হাওয়া দেখে সুরেন্দ্রনাথ একটু চিন্তিত হলেন। ডেকে পাঠালেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদকে। তাঁকে এমন একটা ছড়া বানাতে বললেন যাতে এক ধাক্কায় প্রতিপক্ষ ঘায়েল হয়ে যায়।

কাব্যবিশারদ জানতে চেয়েছিলেন ভোটের প্রতিপক্ষের শরীরের গড়ন, চলাফেরার ধরন এবং চোখে পড়ার মতো কোনও ক্ষতচিহ্ন তাঁর দেহে আছে কি না। সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে জানান যে বাল্যকালে সর্বাধিকারী সিঁড়ি বা খাট থেকে পড়ে গিয়ে নাকের হাড় ভেঙে ফেলেছিলেন। ওখানে একটা ক্ষতচিহ্ন রয়ে গিয়েছে। বাস তাতেই হল। কাব্যবিশারদ সর্বাধিকারীর চেহারার ছবি এঁকে ভোটের ছড়া ছাপিয়ে দিলেন, 'ঐ ভোটের কাঙ্গাল নন্দদুলাল পথ বেয়ে সে যায়। যার নাকের অংশ উপদংশে খসে পড়ে হায়।' কাব্যবিশারদের এই ভোট ছড়াই সর্বাধিকারীকে নির্বাচনে হারিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ খুবই ফ্যাসাদে পড়েছিলেন সে সময়কার ব্রাহ্মসমাজের মস্ত বড় নেতা হেরম্ব মৈত্র মশাইকে নিয়ে। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেছিলেন, তাঁদের যৌবনকালে উত্তর কলকাতার এই অঞ্চলটা অর্থাৎ পশ্চিমে জোড়াসাঁকো পুবে গড়পাড় উত্তরে গোয়াবাগান ও দক্ষিণে ঠনঠনের বাসিন্দাদের মধ্যে ব্রাহ্মদের খুব দাপট ছিল। এই এলাকার রক্ষণশীল হিন্দুরা ব্রাহ্মদের দাপট ঠেকাতে প্রায়শই কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদকে ব্যবহার করতেন। হেরম্ব মৈত্রমশাই ঠনঠনে অঞ্চলের বাসিন্দা, তিনি নারীস্বাধীনতায় খুব বিশ্বাসী ছিলেন এবং মেয়েদের রান্নাঘর থেকে বের করে এনে স্কুল কলেজে ভর্তি করার জন্য বক্তৃতা করতেন। এই নিয়ে রক্ষণশীল হিন্দুদের সঙ্গে তাঁর ভয়ানক সংঘাত চলছিল। হেরম্ব মৈত্রমশাইয়ের পত্নী কুসুমকুমারী অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন। শোনা যায় তৎকালীন কলকাতায় কুসমকুমারীর মতো রূপ ও যৌবনদৃপ্ত মহিলা বাঙালি সমাজে নাকি আর ছিল না। হেরম্ব মৈত্রকে জব্দ করার জন্য কাব্যবিশারদ এক ছড়াপুস্তিকা ছাপিয়ে ফেললেন। ওই ছড়াপুস্তিকার নাম ছিল 'কুসুমেকীট'। ছড় টিতে কুসুমকুমারীর অঙ্গসৌষ্ঠবের বিশদ বর্ণনা ছিল। ক্ষুব্ধ হেরম্ব মৈত্র সরাসরি হাইকোর্টে চলে গেলেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করলেন।

কাব্যবিশারদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন তখনকার আইন জগতের প্রবাদপুরুষ লালমোহন ঘোষ। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি। মানহানির দায়ে কাব্যবিশারদের এক মোটা পরিমাণের অর্থদণ্ড হল। অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে কারাদণ্ডের আদেশ দিল হাইকোর্ট। অর্থদণ্ডের পরিমাণ বেশি হওয়ায় কাব্যবিশারদ মশাইকে দু'একদিনের জন্য জেলে যেতে হয়েছিল। হাইকোর্টের রায়ে উৎফুল্ল হয়ে হেরম্ব মৈত্র কালীপ্রসন্নকে বলেছিলেন 'যা কালী, এবার গিয়ে জেলের ঘানি টান', হাইকোর্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাব্যবিশারদ সহাস্যে বলেছিলেন, 'এ কালী তো আর মুছবে নারে.....'।

আবার 'লোকসেবক'-এর কথা বলছি। এই খবরের কাগজের শুরু থেকে প্রকাশিত সংবাদ রাজ্যের রাজনৈতিক জগতে আলোড়ন তুলেছিল। নিশ্চিতভাবে এসব খবর সংগ্রহের কৃতিত্বের দাবিদার ছিলেন তিনজন। এঁরা হলেন স্বদেশ দে সরকার, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত ও রাধিকা নন্দী। স্বদেশবাবু ওই কাগজের চিফ রিপোর্টার ছিলেন। দারুণ সুন্দর দেখতে এবং দারুণ স্মার্ট ছিলেন। ড. প্রফুল্ল ঘোষ ও অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরীদের সঙ্গে স্বদেশবাবুর খুব খাতির ছিল। খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল সাধনা বিশ্বাসের (ড. ঘোষের পালিত কন্যা) সঙ্গে। আমরা অনেকে ভাবতাম স্বদেশদা সম্ভবত সাধনাকে বিয়ে করবে। শুনেছি ড. ঘোষের মনেও ওই রকম এক অভিপ্রায় ছিল। অনেক বড় খবর 'স্কুপ' করার পর আনন্দবাজার পত্রিকা স্বদেশ দে সরকারকে নিয়ে যায়। এই পত্রিকায় যোগ দিয়েই স্বদেশবাবু ঢাকায় আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর বিশেষ সংবাদদাতার পদে নিযুক্ত হলেন। কিন্তু এই পত্রিকায় তিনি বেশিদিন কাজ করতে পারলেন না। ১৯৫০ এর শেষে বা ১৯৫১ এর গোড়ায় ঢাকা ক্লাবে একটি বিদেশি দূতাবাসের ককটেল পার্টিতে একটু বেশি মদ্যপান করে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। তখন শুনেছিলাম, নূরুল আমিন সাহেব ব্যক্তিগতভাবে ঘটনাটি 'আনন্দবাজার'-এর কর্ণধার সুরেশ মজুমদারকে জানিয়েছিলেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' স্বদেশবাবুকে শো কজ করে। স্বদেশবাবু এর প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন এবং কিছুদিন পরেই পিটিআইতে যোগ দেন। তাঁর পিটিআইতে চলে যাওয়ায় নিঃসন্দেহে বাংলা খবরের কাগজের জন্য সংবাদ সংগ্রহের যে নতুন ধারার সূচনা করেছিল তার ক্ষতি হল। পিটি আইয়ের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংবাদদাতা হিসাবে স্বদেশবাবু খুব নাম করেছিলেন। প্রায় দু'টি যুগ তিনি জাপানে পিটিআইর বিশেষ সংবাদদাতা ছিলেন।

ভাল সংবাদ সংগ্রহের জন্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা' যেমন স্বদেশ দে সরকারকে নিয়ে গেল ঠিক তেমন ভাবে 'যুগান্তর' পত্রিকাগোষ্ঠী নিয়ে গেল নিরঞ্জন সেনগুপ্তকে। 'লোকসেবক' পত্রিকায় এক বড় শূন্যতা দেখা দিল। নিরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রসঙ্গে পরে কিছু বলব। তবে আমার দীর্ঘ সাংবাদিক জীবনে এমন একজন দক্ষ পরিচ্ছন্ন এবং ন্যায় অন্যায়ের সুক্ষ্ম বিচারবোধ সম্পন্ন মানুষ কলকাতার সংবাদপত্র জগতে বেশি আমি দেখিনি। রাধিকা নন্দী সেই অর্থে বাংলা সাংবাদিকতার লোক ছিলেন না, যে অর্থে নিরঞ্জন সেনগুপ্ত বা স্বদেশ দে সরকারকে চিহ্নিত করা যায়। রাধিকাবাবু দেশের প্রথম জাতীয় নিউজ এজেন্সি 'ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া'র (ইউ পি আই) রিপোর্টার ছিলেন। জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে বহু বিশিষ্ট জাতীয় নেতা ও সংগ্রামীদের সংস্পর্শে আসেন, ফলে জীবন ধারাটাও ওই ছাঁচে গড়ে উঠেছিল। ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট যেদিন পশ্চিমবাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন, সেদিনই রাধিকা নন্দী নিযুক্ত হন মুখ্যমন্ত্রীর প্রেস সেক্রেটারি হিসাবে। কিন্তু এই পদের কোনও মাইনে ছিল না। এটা ছিল ড. ঘোষের নিজস্ব ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। 'লোকসেবক' পত্রিকা প্রকাশের পর রাধিকাবাবু বস্তুত পক্ষে ছিলেন ওই পত্রিকার সংবাদ বিভাগের উপদেষ্টা। রাধিকাবাবুর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের খুব সখ্যতা ছিল। বাংলার সংবাদ জগতের বিস্মৃত এই ব্যক্তির দেশ ছিল বরিশাল জেলায়। খুব ভাল ইংরেজি লিখতেন ও বলতেন। ইউ পি আই পত্তনের সময় থেকেই ওই নিউজ এজেন্সিতে যোগ দেন। তিনি ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশন রিপোর্ট করতে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে শুনেছি রিপোর্ট না করা এক ঘটনা। হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি পদে মনোনীত সুভাষচন্দ্র হাওড়া থেকে যে ট্রেনে হরিপুরা গেলেন, ওই ট্রেনের এক কামরায় রাধিকাবাবু ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এক কামরায় ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনি তখন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক। সত্যেনবাবু সুভাষচন্দ্রকে খুব ভালবাসতেন। সত্যেনবাবু সাংবাদিক হিসাবে যেমন এক কিংবদন্তি তেমন তাঁর মদ্যপান ছিল আর এক কিংবদন্তি। হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়ার আগেই তিনি প্রচুর মদ্যপান করে নিয়েছিলেন। ট্রেন ভোরে হরিপুরায় পৌছল। রাধিকাবাবু তাঁর কামরা থেকে নেমে সুভাষচন্দ্রের কামরার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও কংগ্রেস নেতারা নির্দিষ্ট কামরার দিকে ছুটে আসছেন। রাধিকাবাবু কামরার জানালা দিয়ে দেখলেন, সত্যেনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন অর্ধনিমীলিত চোখে। সুভাষচন্দ্র তাঁর জামা কাপড় ঠিকঠাক করে ঝেড়ে দিচ্ছেন এবং নিম্নস্বরে সত্যেনবাবুকে কিছু বলছেন।

তখনকার দিনে কংগ্রেস অধিবেশন এমন জায়গায় হত যেখান থেকে দশ পনেরো মাইলের মধ্যে হাট বাজার, বিশেষ করে মদের দোকান থাকত না। হরিপুরাও তার ব্যতিক্রম ছিল না। এর ফলে সত্যেন মজুমদারের খুবই অসুবিধা। যেদিন অধিবেশন শুরু হল, সেদিন রাতে তাঁর নিজের তাঁবু থেকে বেরিয়ে 'প্রেস' তাঁবুতে

এলেন রাধিকাবাবুর খোঁজে। রাধিকাবাবুর কাছে জানতে চাইলেন মৌলানা আজাদ ও ভুলাভাই দেশাই কত নম্বর তাঁবুতে আছেন। ওই তাঁবুর নম্বর জেনে সত্যেনবাবু চলে গেলেন। প্রেস তাঁবু থেকে বেরিয়ে সত্যেনবাবু খুঁজে নিলন মৌলানা আজাদের তাঁবু। তাঁবুর পর্দা ঠেলে ঢুকে দেখেন মৌলানা খাটিয়ায় শুয়ে হোল্ডারে করে চমৎকার গন্ধযুক্ত সিগারেট টানছেন। অর ভুলাভাই দেশাই তাঁর খাটিয়ার নীচ থেকে স্কচ হুইস্কির পেটি খুলছেন। আজাদ সাহেব বলতে গেলে কলকাতার ছেলে। সত্যেনবাবুকে চিনতেন। কিন্তু রাতে ওই সময়ে ওই অবস্থায় সত্যেন মজুমদারের উপস্থিতি তাঁকে অপ্রস্তুত ও কিছুটা বিব্রত করল। সত্যেনবাবু সেটা বুঝতে পেরে ভুলাভাই দেশাইকে দেখিয়ে বললেন যে তিনি ওই একই ব্যাপারে এসেছেন। ভুলাভাই সঙ্গে সঙ্গে সত্যেনবাবুর কাছে জানতে চাইলেন যে তাঁকে কতদিন হরিপুরায় থাকতে হবে। সত্যেনবাবু চারদিনের কথা বলাতে ভুলাভাই চারটি বোতল একটা খদ্দরের জামা দিয়ে জড়িয়ে সত্যেনবাবুকে দিলেন। সত্যেনবাবু চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই মৌলানা তাঁকে বললেন, জামাগুলো তোমাকে ফেরত দিতে আবার আসতে হবে না। ভুলাভাই জোরে হেসে উঠলেন।

তুষারকান্তি ঘোষ ১৯৩৭ সালে যখন 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ করেন, তখন সত্যেন মজুমদারকে নিয়ে একটি ঘটনা ঘটেছিল। ঠিক ছিল, সত্যেন মজুমদারই যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক হবেন। তুষারবাবুর সঙ্গে সত্যেনবাবুর কথাবার্তা পাকা। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র মালিককে তা জানিয়ে দিলেন। কলকাতার ভ্যান্সিটার্ট রো (Vansitart Row) থেকে 'যুগান্তর' প্রকাশের বন্দোবস্ত চূড়ান্ত। কথা ছিল প্রকাশের আগের দিন রাত নটা নাগাদ সত্যেনবাবু ভ্যান্সিটার্ট রোতে আসবেন এবং প্রথম সম্পাদকীয় লিখবেন। তুষারবাবু অপেক্ষা করে আছেন। রাত দুটো বেজে গেল সত্যেনবাবুর দেখা নেই। শিয়ালদার টাওয়ার হোটেলের বার-এ সত্যেনবাবু নেই। তাঁর টেমার লেনের বাড়িতেও তিনি ফেরেননি। কোথায় গেলেন? শেষ রাতে তুষারবাবু রমেশবাবু (পদবিটা মনে নেই) নামের একজন সাংবাদিকের নাম 'যুগান্তর' এর সম্পাদক হিসাবে মুদ্রণের ব্যবস্থা করে বাড়ি চলে গেলেন। ওই রমেশবাবুই 'যুগান্তর' এর প্রথম সম্পাদক। কিন্তু সত্যেন মজুমদারের কী হল? পরদিন সকালে অর্থাৎ যে প্রভাতে 'যুগান্তর' প্রকাশিত হল সেদিন সত্যেনবাবু নিজেকে দেখতে পেলেন এক অতিকায় স্টিমারের প্রথম শ্রেণীর ডেকে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। এক বিস্তীর্ণ জলরাশির উপর দিয়ে স্টিমার তখন চলছে। সত্যেনবাবু বুঝবার চেষ্টা করলেন এখানে তিনি কী করে এলেন? বুক পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন শিয়ালদা থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট। টিকিটের সঙ্গে শ'পাঁচেক টাকাও রয়েছে। তিনি ভাবতে লাগলেন কী হয়েছিল? তিনি কেবল এটুকু মনে করতে পারছেন যে টাওয়ার হোটেলের বার-এ তাঁর নির্দিষ্ট টেবিলে তিনি বসেছিলেন। রাত ন'টায় তাঁর ভ্যান্সিটার্ট রো'তে যুগান্তর অফিসে যাওয়ার কথা। কিন্তু কী হল?

পরে সত্যেনবাবু জানতে পারেন যে তিনি যাতে যুগান্তর কাগজে যোগ দিতে না পারেন সে জন্য তাঁর ড্রিংকসে এমন ককটেল করে দেওয়া হয়েছিল যে রাত আটটার পর তাঁর কোনও হুঁস ছিল না। দু'জন লোক টাওয়ার হোটেল থেকে শিয়ালদা স্টেশনে আসে। রাত নটায় শিয়ালদা থেকে গোয়ালন্দগামী ঢাকা মেল ছাড়ে। তাঁকে নিয়ে ওই দুটি লোক ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাশের কামরায় ওঠে। ট্রেনটি গোয়ালন্দঘাটে পৌঁছায় ভোরে। স্টেশন থেকে নারায়ণগঞ্জগামী স্টিমার ছাড়ে। ওই লোকেরা তাঁকে ট্রেন থেকে নামিয়ে স্টিমারে তুলে দেয়। লোকদুটি তাঁর উপর নজর রাখার জন্য স্টিমারের যাত্রী হিসাবে থাকতেও পারে। আবার গোয়ালন্দ থেকে তারা ফিরে যেতে পারে কলকাতায়। এই ঘটনার প্রায় ৫৬ বছর পরে মালদার ধীরেন ঠাকুর সম্পাদিত একটি প্রাচীন সাপ্তাহিক কাগজে সত্যেন মজুমদারকে কিডন্যাপ করার অভুতপূর্ব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল (১৯৯২-৯৩)। এই বিবরণের লেখক ছিলেন নিরঞ্জন সেনগুপ্ত। ধীরেন ঠাকুরমশাই সম্প্রতি পরলোক গমন করেছেন। তাঁর ওই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির নাম ভুলে গিয়েছি তবে ধীরেনবাবুকে ভুলিনি। প্রথম জীবনে স্বাধীনতাসংগ্রামী ছিলেন। পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং মালদা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে তাঁর অবদান কম নয়। অনেক আর্থিক অসুবিধা সত্ত্বেও একটি সংবাদ সাপ্তাহিকী প্রকাশ করেছেন আমৃত্যু। প্রায় ৪০ বছর তিনি যুগান্তরে মালদার সংবাদদাতা ছিলেন।

সত্যেন মজুমদার আনন্দবাজার পত্রিকায় ছদ্মনামে এক অসাধারণ রাজনৈতিক স্যাটায়ার লিখতেন। যতদূর মনে পড়ে তাঁর ওই ছদ্মনাম ছিল 'বজ্রানন্দ শর্মা'। ১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে বাংলার গভর্নর স্যার জন হার্বার্ট ফজলুল হক সাহেবের মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন এবং তার জায়গায় খাজা নাজিমুদ্দিনকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসান। এই মন্ত্রীসভায় কংগ্রেস থেকে ফরোয়ার্ড ব্লকে চলে যাওয়া এম এল এ নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী যোগ দেন। তিনি খাদ্যমন্ত্রী শাহিদ সুরাবর্দি সাহেবের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারির পদ পান। এই রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে সত্যেনবাবু "ঝাউতলার লাউঅলা" নামে এক অনবদ্য স্যাটায়ার লেখেন। ঝাউতলা রোডে ছিল হক সাহেবের বাড়ি। লেখাটি ছিল নাটক আকারে। নাটকের দৃশ্যগুলির মধ্যে একটি ছিল ক্ষমতাচ্যুত ফজলুল হক সাহেব হাঁটু সমান লুঙ্গি পরে ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে ঝাঁকা ভর্তি লাউ নিয়ে পার্ক সার্কাস অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মুসলিম অধ্যুষিত পার্ক সার্কাস অঞ্চলে মুসলিম লিগ বিরোধী ফজলুলের লাউ তারা কিনছে না। বিমর্ষ হক সাহেব

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই সময় উদ্ধতযৌবনা এক যুবতীর বেশে নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর আবির্ভাব। এর কিয়ৎক্ষণ পরে ঝকমকে পোশাকে সুরাবর্দির উপস্থিতি। সুরাবর্দি যুবতী নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীকে চোখ মারছেন। সুরাবর্দির চোখের ইশারায় নরেন্দ্রনারায়ণ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। এটা দেখে হক সাহেবের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল। তিনি লাউয়ের ঝাঁকা মাথায় নিয়ে সুরাবর্দিকে তাড়া করলেন। সুরাবর্দি তখন তড়াক করে নরেন্দ্রনারায়ণকে জাপটে ধরে কোলে তুলে দে দৌড়। পিছনে ছুটছেন হক সাহেব আর ওদিক থেকে খাজা নাজিমুদ্দিন 'মার হাব্বা-মার হাব্বা' বলে ঢোলক বাজিয়ে দৌড়চ্ছেন। নাটকের আবহসংগীত ছিল নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীকে নিয়ে

'কংগ্রেসের ঘরে জন্ম মোর
ফরোয়ার্ড ব্লকে মানুষ করে
এখন মোছলমানে বের করেছে
মরি হায় হায় রে।'

সত্যেনবাবুর এই স্যাটায়ারের কথা খুব সামান্যই আমি স্মৃতি থেকে বলতে পারলাম। পরে প্রবীণদের কাছে শুনেছি সত্যেনবাবু প্রায়শই আইন পরিষদে প্রেস কর্নারে গিয়ে বসতেন। 'ঝাউতলার লাউআলা'এই স্যাটায়ার প্রকাশের পরদিন সত্যেন মজুমদারকে প্রেস লবিতে দেখে হক সাহেব ছুটে এসে বলেছিলেন, 'আয় সত্যেন তোরে বুকে জড়াইয়া ধরি, খাসা লেখছস....।' সম্ভবত ১৯৪৪ সালে সত্যেনবাবু 'আনন্দবাজার' ছেড়ে 'গ্লোব নিউজ এজেন্সি'তে (Globe News Agencies) প্রধান হিসাবে যোগ দেন। এটা আমেরিকানদের সংবাদ সংস্থা ছিল। ১৯৪৫ সালে জাপানের আত্মসমর্পণের পর আমেরিকার সামরিক কর্তৃপক্ষ Near and Far East News সংক্ষেপে NAFEN নামের আর একটি সংবাদ সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থারও উপদেষ্টা হিসাবে সত্যেনবাবু কাজ করেন। এরপর 'স্বরাজ' ও সাবেক 'সত্যযুগ' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করার পর ১৯৫২ সালের গোড়ায় কর্মহীন হয়ে পড়েন। সম্ভবত ওই বছরের কোনও এক সময়ে সুরেশ মজুমদার মহাশয় তাঁকে 'আনন্দবাজার' -এ ফিরিয়ে নিতে চাইলে তিনি রাজি হন। 'আনন্দবাজার'-এ ফিরে গিয়ে আবার রাজনৈতিক স্যাটায়ার লিখতে আরম্ভ করেন। এ সময়ে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য স্যাটায়ার ছিল বিধানসভার লবিতে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের 'হোলিখেলা'। এ ছাড়া ১৯৫৩ সালে ট্রাম ভাড়া প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় রিপোর্টারদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের বিরুদ্ধে তাঁর লেখা বিখ্যাত সম্পাদকীয়। ওই সম্পাদকীয়তে তিনি পুলিশকে 'ব্রিটিশের জারজ সন্তান' এবং 'জননীর গর্ভের লজ্জা' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। সম্ভবত ১৯৫৫ সালে লিভার সিরোসিস রোগে এই পুরুষোত্তম সাংবাদিকের জীবনাবসান ঘটে নীলরতন সরকার হাসপাতালে।

খাওয়ার সময় হেমেন্দ্রপ্রসাদ কথা বলতে খুবই পছন্দ করতেন। একদিন সুযোগ বুঝে জানতে চাইলাম, অমৃতবাজার ও আনন্দবাজার পত্রিকার মালিকদের কী উপকার করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ? তিনি জবাব দিলেন, প্রদীপের তলায় যে অন্ধকার থাকে সে তো জানই। তা ছাড়া ওদের হাউসের কোনও একটাতে তোমাকে কাজ করতে হতেও পারে। এমনকী দুটোতেই জীবনের কোনও না কোনও সময়ে কাজ করতে হতে পারে। এই বলে হেমেন্দ্রপ্রসাদ চুপ করলেন। আমিও নাছোড়বান্দা। আমি একটু জোর দিয়ে বললাম, আমি যদি অন্ধকার থেকে আলোয় যেতে চাই? আমার কথা শুনে হেসে ফেললেন। বললেন না শুনেই ছাড়বে না দেখছি? আমরা যাঁরা খবরের জগতে ছিলাম, তাঁরা ১৯৪৩ সালের গোড়াতেই বুঝতে পারছিলাম যে দেশের অবস্থা দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছে। বঙ্গোপসাগরে জাপান আধিপত্য বিস্তার করছে। সুভাষ ঘরের কাছে এসে পড়েছে। জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে। এই অবস্থার মধ্যে লাটসাহেব ফজলুল হককে দিয়ে জোর করে পদত্যাগ লিখিয়ে নিল। তখনই বুঝে নিলাম দুর্ভিক্ষ এসে যাচ্ছে। তুষারকান্তি ঘোষ তাঁর দুটো কাগজের এবং সুরেশ মজুমদার তাঁর দুটো কাগজের নিউজপ্রিন্টের গুদামে চাল চিনি ও কেরোসিন মজুত করতে লাগলেন। চাল থেকে ওরা দু'জনে বেশি মুনাফা করতে পারেনি। কারণ চাল নিজেদের কর্মচারীদের দিতে হয়েছিল। কিন্তু কেরোসিন, চিনি ও টেকসটাইল পরবর্তী দু'বছরে বাজারে ছেড়ে প্রচুর মুনাফা করেছিল ওরা।

ইনকাম ট্যাকস ও সেন্ট্রাল এনফোর্সমেন্ট এই খবরগুলি রাখত। স্বাধীনতার পরপরই ইনকাম ট্যাকস অমৃতবাজার-যুগান্তর এবং আনন্দবাজার হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড এর মালিকের ওই মুনাফালব্ধ আয়ের এক বড় অংশের অতিরিক্ত আয়কর ধার্য করে বসল। তুষার ও সুরেশ মাথায় হাত দিল। ওরা দু'জন তখন শ্যামাপ্রসাদের কাছে গিয়ে সব বলল এবং শ্যামাপ্রসাদকে অনুরোধ করল যাতে তিনি সর্দার প্যাটেলকে বুঝিয়ে এই সংকট থেকে তাদের উদ্ধার করেন। শ্যামাপ্রসাদ সর্দার প্যাটেলকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছিলেন, এই দুই বাঙালি খবরের কাগজের মালিক বিড়লা বা ডালমিয়া কিংবা ব্রিটিশ বণিকসভা পরিচালিত ধনাঢ্য পত্রিকা গোষ্ঠী নয়। তুষারবাবু ও সুরেশবাবুদের খবরের কাগজের ব্যবসা ছাড়া অন্য কোনও শিল্পকারখানা নেই। এটা ওই দুই বাঙালির বৈশিষ্ট্য ও ব্যতিক্রম। ওদের দু'জনের এই খবরের কাগজগুলি নষ্ট হয়ে গেলে বাঙালির অপূরণীয় ক্ষতি হবে। শ্যামাপ্রসাদের এই যুক্তি সর্দার প্যাটেলের মনে ধরল। সর্দার শ্যামাপ্রসাদকে বলেছিলেন, তুষার ও সুরেশকে কিছু টাকা তো ইনকাম ট্যাক্স দিতে হবে। শ্যামাপ্রসাদ আর একটা বৈঠকের দিন ঠিক করে তুষারবাবু ও সুরেশবাবুকে সর্দার প্যাটেলের কাছে নিয়ে গেলেন। সর্দার এদের দু'জনকেই বিলক্ষণ চিনতেন। তুষারবাবু সর্দার

প্যাটেলের ঘরে ঢুকেই তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বললেন, Sardar, you better kill us here.... । সর্দার প্যাটেল হেসে ফেললেন। তিনি আগেই ইনকাম ট্যাক্স ও এনফোর্সমেন্টের অফিসারদের কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিলেন। তুষারবাবু ও সুরেশবাবুর সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি ওই অফিসারদের ডেকে পাঠালেন। এরপর তুষারকান্তি ঘোষ ও সুরেশ মজুমদার যে পরিমাণ অর্থ ইনকাম ট্যাক্সকে দিতে সক্ষম তার ভিত্তিতেই এর ফয়সালা হয়েছিল। এক সঙ্গে এত কথা বলার পর হেমেন্দ্রপ্রসাদ একটু থামলেন তারপর আবার বললেন, খুব কম বাঙালিই বাঙালির উপকার করে। শ্যামাপ্রসাদ সেই কম বাঙালিরই একজন।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বাড়িতে একদিন আর একটি অনন্য সাধারণ ব্যক্তিকে দেখেছিলাম। স্যার আশুতোষের মতো বড় গোল মুখ। গোঁফও যেন মনে হল আশুতোষের কাছ থেকে নেওয়া। হাতে একটা সুদৃশ্য লাঠি। বয়স হেমেন্দ্রপ্রসাদের কাছাকাছি এমনকী একটু বেশি হতে পারে। বড় বড় দুটো চোখ দিয়ে আমাকে দেখলেন। বললেন, হেমেন্দ্রপ্রসাদ কোথায়? বললাম এক্ষুনি একটা ফোন ধরতে গিয়েছেন। ততক্ষণে তিনি সোফায় বসে পড়েছেন। বসেই বললেন, ফোন ধরতে, সেটা তো আবার বাড়ির শেষ প্রান্তে। বুঝে নিলাম বাড়ির অবস্থান সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল। অল্পক্ষণ পরেই হেমেন্দ্রপ্রসাদ ফিরে এলেন। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়াতেই হেমেন্দ্রপ্রসাদ তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, কেমন আছ নরেন্দ্রকৃষ্ণ?

নরেন্দ্রকৃষ্ণবাবু একটা বিয়ের নিমন্ত্রণ চিঠি হেমেন্দ্রপ্রসাদের হাতে দিলেন। ভদ্রলোক চলে যাওয়ার সময় হেমেন্দ্রপ্রসাদ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলেন এবং ওঁকে গাড়িতে তুলে দিলেন। এবার তিনি লেখার টেবিলে বসে আমাকে লক্ষ করে বললেন, কে এসেছিল বলো তো? আমি না চিনতে পারার মতো মাথা নাড়লাম। হেমেন্দ্রপ্রসাদ জানালেন, ওঁর নাম নরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ভবানীপুরে আশু বিশ্বাস রোডে থাকেন। এই ঠিকানায় কলকাতার অর্ধেক লোক ওঁকে চিনে নেয়। যশোর জেলায় যে গ্রামে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বাড়ি ছিল, নরেন্দ্রকৃষ্ণ বসুরা তার পাশের গ্রামের লোক। তাঁদের পারিবারিক যোগসূত্র দীর্ঘ দিনের। ১৯০৩ সালে নরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু কলকাতা হাইকোর্টের 'ভকিল' (Vakil) হন। এখন যাদের অ্যাডভোকেট বলা হয় তাঁদেরই সেই 'ভকিল' বলা হত। ত্রিশের যুগে সশস্ত্র বিপ্লবে সারা বাংলা যখন উত্তাল, তখন নরেন্দ্রকৃষ্ণ বঙ্গীয় আইন পরিষদে রিপাবলিকান গোষ্ঠীর নেতা।

১৯৩৪ সালে দার্জিলিঙের লেবং রেসকোর্সে লাটসাহেব স্যার জন এন্ডারসনের ওপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়। অল্পের জন্য লাটসাহেব রেহাই পান। ওই ঘটনার পর বাঙালি হিন্দু যুবক-যুবতীদের দার্জিলিং ভ্রমণ একরূপ নিষিদ্ধ করে দিল ব্রিটিশ সরকার। শিলিগুড়ি স্টেশনে পুলিশ তল্লাশি চৌকি স্থাপন করল। শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনে দার্জিলিংগামী ছোট ট্রেনে ওঠার সময় যুবক-যুবতী যাত্রীদের প্রথম আটকানো হত। যদি কোনও যুবক নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দিত, তা হলে ওই পরিচয় যথার্থ কিনা তা যাচাই করার জন্য লিঙ্গ পরীক্ষা করা হত, লিঙ্গদেশে Circumcision-এর চিহ্ন থাকলে সেই যুবক মুসলমান বলে তাকে দার্জিলিংগামী গাড়িতে উঠতে দেওয়া হত। হিন্দু যুবতীদের নাম জিজ্ঞাসা করে তাদেরও গাড়িতে উঠতে দেওয়া হত না। কিন্তু বোরখা পরা পর্দানশীন মুসলিম যুবতীদের যেতে দেওয়া হত। ব্রিটিশ রাজের এই আচরণ নিয়ে তখন খবরের কাগজগুলিতে খুব তোলপাড় চলছে। এই ব্যাপারে নরেন্দ্রকৃষ্ণবাবু আইন পরিষদে প্রশ্ন রাখলেন হিন্দু ছেলেদের লিঙ্গ পরীক্ষা করা হচ্ছে, কিন্তু কোনও হিন্দু যুবতী যদি বোরখা পরে পর্দানশীন হয়ে মুসলমান সেজে শিলিগুড়ি স্টেশনে দার্জিলিংগামী গাড়িতে ওঠে, তা হলে কীভাবে হিন্দু মুসলমান যাচাই করা হবে? সরকার পক্ষ নরেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না দেখে তিনি বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন, I am determined to get the answer, otherwise I shall not leave the House.... । সরকার পক্ষ খুব অসুবিধায় পড়ল। নরেন্দ্র বাবুও জবাব না পেয়ে ছাড়বেন না। অবশেষে সরকার পক্ষকে আইন পরিষদে এই আশ্বাস দিতে হয়েছিল যে শিলিগুড়ি স্টেশনে হিন্দু যুবক যুবতীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ সংক্রান্ত বিষয়টি সরকার দ্রুত পুনর্বিবেচনা করবেন। তুষারকান্তি ঘোষমশাই নরেন্দ্র কৃষ্ণ বসুকে 'কাকাবাবু' বলে ডাকতেন। এই দুই পরিবারের মধ্যেও যশোর জেলা ভিত্তিক একটু আত্মীয়তা ছিল। একবার অমৃতবাজার পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর এই 'কাকাবাবুর' কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর এক আশীর্বাদী (Message) চাইতে। নরেন্দ্রবাবু তুষারবাবুকে বলেছিলেন, 'যা বলব, তাই লিখে নিবি তো?' তুষারবাবু রাজি হলে বললেন, ''আমি তুষারকান্তি সবংশে নির্বংশ হতে চাই।'' তুষারবাবু লিখতে পারলেন না ওই ''বাণী''। নরেন্দ্রকৃষ্ণবাবু উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। তারপর নিজের হাতে তুষারকান্তির পত্রিকার জন্য আশীর্বাণী লিখে দিলেন। এর অনেক বছর পর সম্ভবত ১৯৬৩-৬৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের আলমুনি অ্যাসোসিয়েশন কলেজের সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ প্রাক্তন ছাত্র নরেন্দ্রকৃষ্ণকে এক সংবর্ধনা দিয়েছিল। তখন তার বয়স ৮৬-৮৭ হবে। আমি তখন ''যুগান্তর'' পত্রিকার রিপোর্টার। ওই সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজের একতলার লাইব্রেরি হলে তাঁর ওই সংবর্ধনা হয়েছিল। সংবর্ধনার উত্তরে নরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু যা বলেছিলেন তা আজও আমার কানে সংগীতের মতো বাজে। তিনি বলেছিলেন, জানালা দিয়ে কলেজের সামনের মাঠ তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই মাঠ আমাদের আমলে আরও বড় ছিল। পুজোর পর কলেজ খুললে আমরা খুব ধুমধাম করে ক্রিকেট খেলতাম। আমি স্ট্রেট

ব্যাটে খেলতাম। কখনও ৬০-৭০ রান করেছি আবার কখনও বা ৩-৪ রান করে আউট হয়ে গেছি। হই হই করে সেই যে কলেজের মাঠ থেকে স্ট্রেট ব্যাটে খেলা শিখেছি, সেই একই খেলা জীবনের খেলাতেও খেলেছি সারাজীবন। পরাস্ত হয়েছি বহুবার, কিন্তু তার জন্য কোনও খেদ নেই এবং কাউকে আমার জন্য সে খেদোক্তি করতেও দিইনি। আজ জীবন সন্ধ্যায়, তোমাদের কেবল এটুকু বলতে চাই যে তোমরা জীবনের খেলা বরাবর স্ট্রেট ব্যাটে খেলে যেও। পরাস্ত হবে অনেক বার। বাঞ্ছিত সুখ হয়ত পাবে না। কিন্তু দেখে নিও জীবনে শান্তির ব্যাঘাত ঘটবে না। আমি যুগান্তর পত্রিকায় তাঁর এই বক্তৃতাটি রিপোর্ট করেছিলাম। তুষারকান্তি ঘোষ আমার চিফ রিপোর্টার অনিল ভট্টাচার্যের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তাঁর কাকাবাবুর ওই বক্তৃতা কে রিপোর্ট করেছে। রিপোর্ট প্রকাশের পরদিন রিপোর্টারদের টেবিলে, এসে আমার থুতনি ধরে আদর করেছিলেন। ১৯৬৬ কিংবা ৬৭ সালে নরেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু সংবাদটি দেবার কাজও আমার ওপর ন্যস্ত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যু সংবাদের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর শেষ বক্তৃতার ওই একটু অংশ আমি সংযোজন করে দিয়েছিলাম।

১৯৫১ সালের মার্চ থেকে মে পশ্চিম বাংলায় দুটি বড় রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে। এর একটি হল ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ও ডা. সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জির কৃষক মজদুর প্রজা পার্টির (কে এম পি পি) জাতীয় গুরুত্ব লাভ এবং অন্যটি হল কোচবিহারে খাদ্য আন্দোলনের মিছিলের ওপর পুলিশের গুলি বর্ষণে দু'জন তরুণীসহ তিনজনের মৃত্যুর ঘটনা। দ্বিতীয় ঘটনাটি পশ্চিমবাংলার রাজনীতিকে উত্তাল করে রেখেছিল পরবর্তী দু'মাস। কনিষ্ঠতম রিপোর্টার হলেও ওই দুটি ঘটনার কোনও কোনও পর্যায়ে রিপোর্ট করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এ কাজে আমি এমন কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি যা খুব কম রিপোর্টারের ভাগ্যে ঘটে। ১৯৫০ সালের শেষে কে এম পি পি গঠিত হওয়ার পর পরবর্তী তিন মাসে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম সারির অন্যতম নেতা আচার্য কৃপালনি কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে এলেন রফি আহমেদ কিদোয়াই ও অজিত প্রসাদ জৈন। কিদোয়াই ও জৈনের কংগ্রেস ত্যাগে জওহরলাল স্তম্ভিত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। কারণ এঁরা দু'জন জাতীয় ও উত্তর প্রদেশের রাজনীতিতে জওহরলালের ঘনিষ্ঠতম স্তম্ভ। এঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনের (বর্তমানে যার নাম কেরল) পত্তম থানু পিল্লাই, মাদ্রাজের টি প্রকাশম, গুজরাটের খান্দুভাই দোহাই, বিহারের মহামায়া প্রসাদ সিং, সুচেতা কৃপালনি প্রমুখ নেতারা। রফি আমেদ কিদোয়াই ও অজিত প্রসাদ জৈন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলেন। বিচলিত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু আচার্য কৃপালনিকে ব্যক্তিগত পত্রে লিখলেন 'তুমি কংগ্রেস ছেড়ে যাচ্ছ যাও। তোমাকে আমি আটকাব না। কিন্তু রফি ও অজিতকে নিয়ে যেও না। তুমি তো জানো রফি ও অজিত আমার কত কাছের লোক। আমার এই একটি অনুরোধ তুমি রেখো.....।' আচার্য কৃপালনি নেহরুকে জবাব দিলেন, 'আমি কাউকে আমার সঙ্গে জোর করে নিয়ে যাচ্ছি না। রফি ও অজিত যদি কংগ্রেসে ফিরে যেতে চায় তাহলে আমি আটকাব না.....।' আচার্য কৃপালনি ও নেহরুর মধ্যে এই যে পত্রালাপ হয়েছিল আচার্য কৃপালনি খবরের কাগজে প্রকাশের জন্য তা দিয়ে দিলেন। এই সময় আচার্য নরেন্দ্রদেব, জয়প্রকাশ নারায়ণ ও ড. রাম মনোহর লোহিয়া কৃপালনির পাশে এসে দাঁড়ালেন। এপ্রিল কিংবা মে মাসে আচার্য কৃপালনি কলকাতায় পার্টির জাতীয় নেতৃত্বের বৈঠক ডাকলেন। ওই বৈঠকে রফি আহমেদ কিদোয়াই ও অজিত প্রসাদ জৈন তাঁদের স্বাধীন ইচ্ছা ব্যক্ত করবেন। অর্থাৎ নেতৃত্বের ডাকে তাঁরা আবার কংগ্রেস ফিরে যাবেন কিনা তা স্থির হবে ওই বৈঠকে। কলকাতায় পার্টির তিন দিনের বৈঠক বসল। একদিন বৈঠক বসল সুরেন ঠাকুর রোডের বাড়িতে, যে বাড়িতে ড. প্রফুল্ল ঘোষ থাকতেন। (খুব সম্প্রতি আমার মাতৃসমা বিশিষ্ট সমাজসেবী অশোকা গুপ্তার কাছে জানতে পারি যে ড: ঘোষের পালিতা কন্যা সাধনার বাবা সুরেন ঠাকুর রোডের এই বাড়িটির এক অংশ কিনে নিয়েছিলেন এবং ড. ঘোষ ও অপর গান্ধীবাদী ডা. নৃপেন বসু ওই বাড়িতেই থাকতেন।) যাই হোক নির্দিষ্ট দিনে সেখানে মিটিং চলছে। দরজা বন্ধ, কিন্তু জানালা খোলা। বাইরে অন্য রিপোর্টারদের মধ্যে আমিও দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ ডা. প্রফুল্ল ঘোষের কানফাটানো ক্রুদ্ধ চিৎকার। ইংরাজিতে তিনি রফি আহমেদ কিদোয়াইকে চিৎকার করে বলেছিলেন,—'কে তোমাকে কংগ্রেস ছেড়ে আসতে বলেছে? কে তোমাকে আমাদের দলে আসতে বলেছে? আমার সন্দেহ ছিল তুমি জওহরলালের প্রেম থেকে মুক্ত হতে পারবে কি-না।' এ ছাড়া ডা. ঘোষ আরও কিছু বিদ্রূপাত্মক বিশেষণ ব্যবহার করেছিলেন এবং রফি আহমেদ কিদোয়াই গলা চড়িয়ে ড. ঘোষের মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন। এই সময় এক সঙ্গে বহু নেতার কণ্ঠ শোনা যেতে লাগল। তারপর দেখতে পেলাম দেবেন সেন, সুচেতা কৃপালনি ও সাধনা ড.ঘোষকে মিটিং এর ঘর থেকে জাপটে ধরে বের করে অন্য ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন। ওই তিন জনকে ড: ঘোষের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি করতে হয়েছিল। সুচেতা ডা: ঘোষকে বলে যাচ্ছিলেন, 'প্রফুল্লদা এত উত্তেজিত হবেন না। শরীর খারাপ হয়ে পড়বে।' সুচেতার গলা ছাপিয়ে ড. ঘোষের চড়া গলা ভেসে এল, 'কে রফিকে এই ছিনালিপনা করতে বলেছিল?' ড. প্রফুল্ল ঘোষকে অন্য ঘরে সরিয়ে দেওয়ার পর সাধনা গম্ভীরভাব সব জানালাগুলি বন্ধ করতে আরম্ভ করল। রিপোর্টারদের মধ্যে স্বদেশ দে সরকারও ছিলেন। স্বদেশদা'র সঙ্গে সাধনার একটা সম্পর্কের কথা আমি

আগেই বলেছি। সাধনার জানলা বন্ধের বহর দেখে স্বদেশদা গান গেয়ে উঠল—যদি না দুয়ার খুলিতে চাও, খুলে রেখো বাতায়ন। সাধনা অর্ধেক চোখ দিয়ে স্বদেশদাকে দেখে বলল '....এখন দুটোই বন্ধ.....'।

এর পরের দিন কিংবা তার পরের দিনের ঘটনা আমার স্মৃতিতে এখনও জ্বলজ্বল করছে। বৈঠকে যারা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে আচার্য কৃপালনি, সুচেতা কৃপালনি এবং রফি আহমেদ কিদোয়াই-এর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল চৌরঙ্গি রোডের বিখ্যাত লয়েড ব্যাংক বিল্ডিং- এর বাড়িতে। ওই সুবৃহৎ অট্টালিকার মালিক ছিলেন নেপালের রানা বংশের কোনও এক শরিক। তাদের কলকাতায় অন্য ব্যবসাবাণিজ্য ছিল। এই রানাদের সঙ্গে প্রথম দিকে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ঠিক হয়েছিল পার্টির তিনদিনের বৈঠক শেষে সকালে আচার্য কৃপালনি সাংবাদিক সম্মেলনে রফি আমেদ কিদোয়াই ও অজিতপ্রসাদ জৈনের কংগ্রেসে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানাবেন। আমাকে আগেরদিন রাতে বলে দেওয়া হল পরের দিন সকাল আটটায় চৌরঙ্গির ওই বাড়িতে যেতে। 'সিনিয়ার' অন্য কেউ একজনও উপস্থিত থাকবেন।

অত বড় বিল্ডিং, কীভাবে ভিতরে যাব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। হতচকিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। এই সময় নেপালি চেহারার এক ভদ্রলোককে খুঁজে পেলাম। তাঁকে আচার্য কৃপালনির কথা বলতে তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে আসতে বললেন। তাঁর সঙ্গে দোতলায় উঠছি। উঠছি তো উঠছিই। সিঁড়ি আর শেষ হতে চায় না। দোতলায় উঠে তিনি একজন লোককে পেলেন। তাঁকে হিন্দিতে ব্যাপারটা বলতে তিনি জানিয়ে দিলেন, এখানে সাংবাদিক সম্মেলন হবে না। যা হবার বিকালে সুরেন ঠাকুর রোডের বাড়িতেই হবে। কী হয়রানি। আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি। এই সময় দেখলাম সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার বিজয়েন্দ্র নারায়ণ রায়। আমাকে নেমে আসতে দেখে বিজয়বাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, কী হল? কী হয়েছে আমি তাঁকে বললাম। বিজয়বাবু আমাকে বললেন তোমার কি এখন আর কোনও কাজ আছে? আমি 'না' বলাতে তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে বললেন। আবার দোতলায় সেই লোকটির সঙ্গে দেখা। বিজয়বাবু ইংরাজি কাগজের রিপোর্টার হিসাবে নিখুঁতভাবে স্যুট টাই পরতেন। বিজয়বাবুকে দেখে ওই লোকটা সমীহের সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। বিজয়বাবু তাঁর পরিচয়বহনকারী কার্ড ওই লোকটির হাতে দিয়ে বললেন এটা কৃপালনিজিকে দিতে। লোকটি কার্ড হাতে করে করিডর দিয়ে চলে গেল।

মিনিট দু'য়েকের মধ্যে সুচেতা কৃপালনি দ্রুত বেরিয়ে এলেন। সুন্দর হেসে বললেন, 'আসুন বিজয়বাবু' বলে আমাদের ভিতরে একটা চওড়া হলঘরে নিয়ে বসালেন। সেখানে মেঝেতে গদি পাতা এবং বড় বড় তাকিয়া বালিশ ছড়ানো। বিজয়বাবু তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসলেন। ওঁর প্রায় গা ঘেঁসে আমি বসে পড়েছি। একটু পরে আচার্য কৃপালনি এলেন। খদ্দরের ধুতি হাঁটু থেকে সামান্য নীচে নামানো, গায়ে ফতুয়া। বিজয়বাবুর সঙ্গে আমিও উঠে দাঁড়ালাম। বিজয়বাবুর কাঁধে হাত রেখে ইংরাজিতে বললেন, 'তোমাকে অনেক দিন পরে দেখলাম। কেমন আছ?' একটু থেমে আমার দিকে চোখ রেখে কৃপালনি বিজয়দাকে প্রশ্ন করলেন, 'এই ছেলেটা কে?' বিজয়বাবু আমার কাগজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'ও তো আপনাদেরই কাগজ।' কৃপালনি হেসে বললেন, 'কিন্তু এই ছোকরা যে একেবারেই ছেলেমানুষ'। বিজয়বাবুকে হেসে হেসে বললেন, 'তোমার মতো একজন ব্রাদার ইন ল'র সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলা গেল এই যা।' এই সময় সুচেতা কৃপালনি একটা ট্রেতে করে তিন কাপ চা ও এক থালা বিস্কুট নিয়ে এলেন। বিজয়বাবুর হাতে চায়ের কাপ দিয়ে বললেন, খুব সামান্য চিনি দিয়েছি।' বুঝে নিলাম বিজয়দা'র 'সুগার' সম্পর্কেও সুচেতা জানেন। এই সময় আচার্য টিপ্পনি কাটলেন, 'বাপের বাড়ির লোকদের একটু বেশি মিষ্টি খাওয়াবে তাও খাওয়ালে না।' এবার সুচেতা এক সাধারণ গৃহিণীর মতো বললেন, 'থাক অনেক হয়েছে, আমার বাপের বাড়ির লোকদের আর বেশি ভালবাসতে হবে না।' এই বলে তিন আসন পিঁড়ি হয়ে আচার্যের পাশে বসলেন। সুচেতার মন্তব্যে বিজয়বাবু হেসে উঠলেন। ফস করে আচার্যকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা এই বাঙালি মেয়েটিকে আপনি কখন থেকে ভালবাসতে আরম্ভ করলেন?' আমি ওই মহীয়সী মহিলাকে লক্ষ করছিলাম। বিজয়দার প্রশ্ন শুনে ওই বয়সেও সুচেতার মুখে সলজ্জ রক্তিমভাব ফুটে উঠল। সুচেতা একটা ইংরাজি খবরের কাগজে তাঁর চোখ নিবদ্ধ করলেন। কৃপালনি তড়াক করে সোজা হয়ে বসলেন, বললেন, 'বিজয়, এটা তুমি সুচেতাকে জিজ্ঞেস করো। ওই আমাকে আগে ভালবেসে ফেলেছিল।' এবার সুচেতা মুখ খুললেন। আমাকে দেখিয়ে স্বামীকে বললেন, 'এই ছেলেটা আমাদের সন্তানের মতো, ...'আচার্য তাঁর জীবনসঙ্গিনীর কথা শেষ করতে দিলেন না। লম্বা হাত বাড়িয়ে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে সেই বিখ্যাত সংস্কৃত প্রবাদটি উচ্চারণ করলেন। যার অর্থ পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হলে সে পিতার বন্ধু হয়। সুচেতা হেসে উঠে ভিতরে চলে গেলেন। এবার কৃপালনি বলতে আরম্ভ করলেন কীভাবে সুচেতা মজুমদার অধ্যাপক জে বি কৃপালনিকে ভালবেসেছিলেন। কৃপালনি তখন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের কাশী বিদ্যাপীঠে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে বারাণসী এসেছেন। বারাণসীতে মজুমদার নামের এক বাঙালি পরিবারে বাড়ির একতলার একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন কৃপালনি। দুপুরের খাওয়া

বিদ্যাপীঠেই সেরে নিতেন। বিকাল ক্লাস শেষ হয়ে গেলে কংগ্রেসের কাজে, বিশেষ করে খাদি ও চরকাকে জনপ্রিয় করার কাজে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলে যেতেন। ফিরতে রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত হয়ে যেত। তারপর তোলা উনুন ধরিয়ে কয়েকখানা রুটি সেঁকে নিতেন। ডালের মধ্যে সবজি ফেলে দিয়ে সিদ্ধ করতেন। ওই ছিল রাতের আহার।

আচার্য কথা বলতেন আস্তে ধীরে। কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণতা ছিল। ইংরাজিতে শব্দ চয়ন খুব সহজ। অল্প ইংরাজি জানা লোকের বুঝতে অসুবিধা হয় না। ভাড়াটে হওয়ার বেশ কিছুদিন পরে তিনি জানতে পারেন যে তাঁর বাড়িওয়ালা বারাণসীর খুব পরিচিত বাঙালি ব্রাহ্মণ পরিবার। পরিবারে উচ্চশিক্ষার প্রসার যথেষ্ট এবং পরিবারের বড় ছেলে আই সি এস। পরিবারের যে মেয়েটি কলেজে পড়ে তাঁকে তিনি দেখেননি। তবে ফ্রক পরা একটি ছোট মেয়েকে মাঝে মাঝে নজরে পড়েছে। এ ভাবেই অধ্যাপক কৃপালনির জীবন চলছিল। হঠাৎ একদিন বেশি রাতে তিনি ফিরে দেখলেন যে এক বয়স্কা ভদ্রমহিলা তাঁর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে এবং তার তোলা উনুন ধরানো। আচার্য কিছু বলার আগেই ওই ভদ্রমহিলা বললেন, 'তোমাকে এর পর থেকে আর উনুন ধরিয়ে রান্না করতে হবে না। তোমার রাতের নিরামিষ খাবার আমি পাঠিয়ে দেব।' কৃপালনি আপত্তি জানাতে চাইছিলেন, কিন্তু আপত্তি জানিয়ে ফল হবে না বুঝে চুপ করে গেলেন। ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সেদিনকার মতো কৃপালনির রান্নার ব্যবস্থা দেখলেন। ওই ভদ্রমহিলা সুচেতার মা। এ ভাবেই আচার্য কৃপালনি ওই বাঙালি পরিবারের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তিনি কাশীর কাছাকাছি যে গ্রামগুলিতে কংগ্রেস ও খাদির কাজ করতে যেতেন, সেই গ্রামগুলিতে মুসলমানদের বসতি ছিল বেশি। ওই মুসলমানরা মেয়েদের শাড়ি ও অন্যান্য পোশাকে খুব চমৎকার সুচিশিল্পের কাজ করত। কৃপালনি ওই শিল্পীদের খদ্দরের কাপড়ের ওপর ওই ধরনের শিল্পকার্য করতে উৎসাহিত করতেন। মাঝে মাঝে সুচেতা আচার্যকে জিজ্ঞেস করতেন যে ওই দিন তিনি কোন গ্রামে যাবেন। একদিন কোনও একটি গ্রামের নাম শুনে সুচেতা কৃপালনিজিকে বললেন, ওই গ্রামে খুব সুন্দর চিকনের কাজ করা মেয়েদের জামার কাপড় পাওয়া যায়, তিনি যেন সুচেতার জন্য ওই রকম একটা কাপড়ের টুকরো নিয়ে আসেন। কিন্তু কৃপলানি ওটাই আনতে ভুলে যেতেন। একদিন সুচেতা খুব হাসি মুখ করে এসে খুব বিশ্বাস নিয়ে বলল 'আজ নিশ্চয়ই ওটা এনেছেন'। কিন্তু সেদিনও কৃপালনি ওটা আনতে ভুলে গিয়েছিলেন। কৃপালনি বিজয়বাবুকে নাম ধরে ডেকে বললেন, 'বুঝলে বিজয়বাবু একটা ব্লাউজ পিসের জন্য সুচেতা সেদিন কেঁদে ফেলেছিল। সেদিনই সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম যে তোমাদের এই বাঙ্গালি মেয়েটা সিন্ধি কৃপালনিকে ভালবেসে ফেলেছে। বুঝলে বিজয়, ভালবাসাই বুঝি মেয়েদের চোখে জল এনে দেয়'—এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কৃপালনি, সুচেতা এবং বিজয়বাবু জোরে হেসে উঠলেন। আমার বয়সের দূরত্বের জন্য আমি শব্দ করে হাসতে পারছিলাম না। কিন্তু আমার খুব ভাল লাগছিল আচার্যের ওই কথাগুলো শুনতে। এ যেন এক অন্য কৃপালনি। যিনি একাদিক্রমে পনেরো থেকে ষোল বছর জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় দেশ বিভাগের সকল দলিলে স্বাক্ষর করেছিলেন কৃপালনিরা। এ যেন এক গভীর অনুভূতিপ্রবণ কবি ও প্রেমিক আচার্য কৃপালনি।

রাজনৈতিক মতাদর্শের বহু সংঘাত সত্ত্বেও জওহরলাল নেহরু কিন্তু আচার্য কৃপালনির অন্তর্নিহিত কবি, দার্শনিক ও অনুভূতিপ্রবণ মনটি চিনে নিয়েছিলেন। তাই নেহরু A bunch of old letters (নেহরু সম্পাদিত গ্রন্থ)-এ সুচেতাকে বিয়ে করার ব্যাপারে তাঁদের দুজনের (নেহরু-কৃপালনি) পত্রগুলি ছাপিয়ে দিয়েছেন। একটি পত্রে কৃপালনি জওহরলালকে লিখছেনঃ 'এবার তুমি জেল থেকে বেরলেই বিয়ে রেজিস্ট্রি সেরে ফেলতে হবে। সুচেতা বলছে বিয়ের কাগজে তোমার স্বাক্ষর থাকতেই হবে।''—নেহরু জবাবে লিখলেনঃ- 'অত তাড়া কিসের ? আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারছ না ?' কৃপালনি জবাব দিলেনঃ 'আমি অপেক্ষা করতে পারি। কিন্তু সুচেতা আর অপেক্ষা করতে চাইছে না।' আজ এরা সকলেই পরপারের শরিক। কিন্তু কেবল রাজনৈতিক নয়, সামাজিক পারিবারিক এবং নারী পুরুষের একান্ত জীবন সম্পর্কে আচার্য কৃপালনির চিন্তার গভীরতা ধরা পড়ে ১৯৫৮/১৯৫৯ সালের হিন্দু কোড বিলের বিতর্কে। কৃপালনি তখন রাজ্যসভার সদস্য। সমাজে ও পরিবারে নারীর সমান অধিকার এবং বিবাহ বিচ্ছেদে তার একতরফা অধিকার আদায়ের জন্য ওই বিষয়ে ভারতের পার্লামেন্টে যে আলোচনা হয়েছিল তা আচার্য কৃপালনির অবদানে ছিল সমুজ্জ্বল। তিনি ওই সময় একবার বলেছিলেন ঃ......every love does not culminate into marriage. If every love culminates into marriage, I do not know for how many times we shall have to marry। বিবাহিত জীবনে কোনও পুরুষ অন্য নারীকে এবং নারী অন্য পুরুষকে ভালবাসতেই পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সেই পুরুষ বা নারীর আগেকার সংসার ভেঙে দেওয়ার অধিকার জন্মাবে। কৃপালনির ওই চিত্তাকর্ষক বক্তৃতার পর জওহরলাল প্রধানমন্ত্রীর আসন ছেড়ে সোজা কৃপালনির পাশ থেকে সুচেতাকে হাত ধরে তুলে এনে নিজের পাশে বসিয়ে কৃপালনিকে লক্ষ করে সুচেতাকে বলেছিলেন, 'তুমি নজর রেখো ওই বুড়োটা আবার কাউকে ভালবেসে ফেলল কিনা।'

ক্রমশ

বৃহৎ ব্যবসায় ও অপবিজ্ঞানের সংযোগে অস্তিত্বের সঙ্কট

শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ

চতুরঙ্গের গত সংখ্যায় লিখেছিলাম যে নিউটনের mechanics, ডারউইনের বিবর্তনবাদ (বিশেষ করে তাঁর "survival of the fittest" থিওরি) এবং মেন্ডেলের genetics —এই ত্রয়ীর সংযোগে "খণ্ডিত বিজ্ঞানের" জন্ম হয়েছে। "খণ্ডিত বিজ্ঞান", "fragmented science", "reductionist science" বলতে ঠিক কি বোঝায়, তা অনেকের কাছে স্পষ্ট নয়। এর বিপরীতে আছে সামগ্রিকতা-অভিমুখী বিজ্ঞান, "science with a holistic approach", সুবিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী Alfred North Whitehead যাকে বলেছেন "organismic science"। বেশ বিবেচনা করেই "holistic science" কথাটি এড়িয়ে চলছি। পূর্ণব্রহ্মে যেমন পৌঁছানো যায় না, তেমনই holistic science-এ পৌঁছানো অসাধ্য। সব সময় সামগ্রিকতার দিকে খেয়াল রাখলেই হল। তাকেই বলা হয় "organismic science".

বাংলার রাজনীতি ও শিক্ষাজগতের এক জ্যোতিষ্ক এবং পরম শ্রদ্ধেয় এক অধ্যাপক চিঠিতে লিখেছেন, "বিজ্ঞানসম্মত জনকল্যাণ সংঘটনের প্রস্তাব নিয়ে বিতণ্ডা ও বিসংবাদ বুঝি না। বিজ্ঞানসম্মত ও জনকল্যাণমূলক সিদ্ধান্ত কেন গ্রহণ করা কঠিন তাও বুঝি না।" তাঁর অতি আন্তরিক ও সংশয়-কণ্টকিত এই প্রশ্ন বর্তমান জগতের জীবন-মৃত্যুর মূল প্রশ্নটিকেই আলোচনার কেন্দ্রস্থলে এনে দিয়েছে।

বিগত শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে বিজ্ঞানের নামে যা কিছু প্রাধান্য পেয়ে চলেছে, তার সব কিছুই "big science" আর "big business"-এর মেলবন্ধনের ফল। "Big science" বলতে কিন্তু "great science" বোঝায় না। "Big science" বলতে বোঝায় সেই বিজ্ঞান যার ঝোঁক জটিল gadgets তৈরির দিকে, যার ফলে big money-র প্রয়োজন হয়। জগতের সব কিছু মেশিনের ধরণে চলে, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে বিজ্ঞানের যাত্রা, তার পরিণতি ঘটে জটিল প্রযুক্তিতে (complex technology তে)। একে "scientific technicalism" বলা উচিত। যাঁরাই এর মোহে মুগ্ধ, তাঁরাই একে "high-tech" বলেন। সমাজবিজ্ঞানীর বিচারে একে "low social-efficiency tech" বলাই সমীচীন। প্রয়াত অর্থনীতিবিদ Dr. V. K. R. V. Rao ন্যায়সঙ্গত ভাবেই "hi-tech"-এর এই সংজ্ঞা চালু করেছিলেন।

বিজ্ঞানের এই পরিণতি অবধারিত ছিল না। বিজ্ঞানের মূল কাজ প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করা যাতে প্রাণীর কল্যাণ ঘটে। প্রকৃতির নিয়ম যত গভীরভাবে বোঝা যাবে, ততই ক্ষমতা জন্মাবে অতি সরল আঙ্গিকে/পন্থায় সমস্যার সমাধান করতে— যে আঙ্গিক/প্রকরণ সাধারণ মানুষের জীবনের ছন্দের সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে (imperceptibly) মিশে যায়, যাতে দুঃসাধ্য সাধনার ব্যঞ্জনা থাকবে না, সাধারণ মানুষের অনধিগম্য প্রযুক্তির প্রয়োজন হবে না। বিজ্ঞানকে সে পথ থেকে বিচ্যুত করা হয়েছে। শুধু আইনষ্টাইন, Max Planek, Niels Bohr, হাইসেনবার্গ, জগদীশচন্দ্র বসু, ডিরাক প্রমুখ দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক এই বিচ্যুতি এড়াতে পেরেছেন। কিন্তু কেন এই বিচ্যুতি ঘটতে পারল?

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে বিশ্বজুড়ে মেশিন চেতনায় সমাচ্ছন্ন, মেশিন-সৃজন-অভিমুখী বিজ্ঞানচর্চার অতি প্রাবল্য ঘটেছে সত্য; কিন্তু তার মূল ছিল ষোড়শ শতাব্দীর দুই দার্শনিকের চিন্তায়, যাঁরা জ্ঞানচর্চায় নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক Francis Bacon ও ফরাসি দার্শনিক Rene Descartes-এর কাল ছিল নিউটনের-ও আগে। মধ্যযুগের কেতাবদুরস্ত, কল্পনানির্ভর, অপ্রামাণিক বিদ্যার ভিত কাঁপিয়ে দিয়ে তাঁরা পরীক্ষানিরীক্ষা ও প্রমাণ-ভিত্তিক বিজ্ঞানচর্চার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন কিন্তু উভয়ের বক্তব্যে এমন কিছু নির্দেশ ছিল যা' অন্য এক প্রকার বিকৃতির বীজ বপন করেছিল। Bacon বললেন, "Knowledge is power"। জ্ঞান যে এক সারভূত সহজাত শক্তি—এক intrinsic strength, সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু যখন তাকে 'power' হিসাবে বর্ণনা করা হয়, তখন তার পিছে, মনের অগোচরে বা গোচরে, অনেক আশা জেগে ওঠে। প্রথমত আসে প্রকৃতিকে জয় করার শক্তি আকাঙ্ক্ষা; দ্বিতীয়ত, অন্য মানুষের উপরেও শক্তি খাটানোর কামনা। তা ছাড়া, বেকন তো নিজেই খোলাখুলিভাবে প্রকৃতিকে বাঁদিগিরির কাজে জুড়ে দেবার কথা বলেছিলেন, জুলুম করে তাঁর রহস্য

বার করে নেওয়ার কথাও বলেছিলেন ("torture her secrets out of her")। অবশ্য তিনি একথাও বলেছিলেন যে প্রকৃতিকে জয় করতে হলে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলতে হবে। পরের যুগে তাঁর শেষোক্ত পরামর্শ বিস্মৃতির তলায় তলিয়ে গিয়েছিল—শুধু প্রকৃতি জয়ের নেশাই বিজ্ঞান সাধকদের পেয়ে বসল।

বেকনের সমসাময়িক ফরাসি দার্শনিক Rene Descartes জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রকে অঙ্কশাস্ত্রের বিধানের (mathematical method) আওতায় আনতে চাইলেন। ভৌতিক জগতের রূপ ও কর্মপ্রক্রিয়া সবই মেশিন সদৃশ, এই ধারণা তিনি চালু করলেন। এই ধারণার উপসিদ্ধান্ত হিসাবে "mathematical equation-এর বাহিরে, quantification ব্যতিরেকে কিছুই বিজ্ঞানের মর্যাদার অধিকারী হবে না", এই নীতিবাক্যও তিনি চালু করলেন। মানুষের আবেগকেও পরিমাপ (quantity) করা যায়, এ ধারণাও তিনি প্রচার করেন। এই তত্ত্বকথার প্রভাব এখনও প্রবল। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, Descartian ভাবধারায় প্রভাবিত এক Psychology শিক্ষককে যখন (১৯৮০ সালে) আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "Can you quantify mother's love?" মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে-ই তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "Yes, it can be done". স্তম্ভিত, বাকহারা হয়ে গিয়েছিলাম।

Descartes-এর বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ : "মেশিনের বিভিন্ন অংশের আন্তঃক্রিয়া মেশিনের স্বভাব ও কর্মধারা নির্ধারণ করে। বস্তু ও প্রাণীজগতের সব কিছুই ওই মেশিনের মতোই। তাদের উপাদানসমূহের খর্বীকৃত (reduced) রূপগুলির আন্তঃক্রিয়া (interaction) অধ্যয়ন করলেই জগতের সব কিছুই সম্যকভাবে জানা যাবে।" The material universe, including the organisms, can be understood by reducing them to the simplest constituents and by studying their interactions—এই ছিল তাঁর শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার। মেশিনরূপে সব কিছুকেই দেখা—যাকে সংক্ষেপে বলা হয় mechanomorphic world view—গত চার শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানকে পরিচালিত করে আসছে। যদিও জীববিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে Descartes-এর বক্তব্য একটু আধটু বদল করে নিয়েছেন, ভৌতবিজ্ঞান চর্চায় এর প্রভাব অপ্রতিহত আছে—এবং সে ক্ষেত্রে থাকার কারণ-ও আছে। অবশ্য সম্প্রতিকালে ভৌতিক জগতেও অতি ক্ষুদ্রের ক্ষেত্রে এবং অতি বৃহতের ক্ষেত্রে—in atomic and subatomic physics and in astrophysics and cosmology—এই mechanistic paradigm পরিত্যক্ত হয়েছে।

Mechanistic ধাঁচে বিজ্ঞানচর্চার এক সুবিধা আছে। এই ধরনের চর্চায় চাপ, তাপ, গতিবেগ, কম্পন, টানপ্রতিরোধ ক্ষমতা (pressure, temperature, velocity, vibrancy, tensile strength) প্রভৃতি মুষ্টিমেয় মাপকাঠির (parameter) প্রয়োজন হয়। অচেতন জগতের অর্থাৎ প্রাণহীন বর্গের Systems চর্চায়—মায় গ্রহ-নক্ষত্রের পর্যালোচনায়, ভূলোকেও মহাশূন্যে বার্তা আদান-প্রদানে, এবং প্রাণবিনাশী অস্ত্র উদ্ভাবন ও উৎপাদনে—in all non-life and life-destruction-oriented systems—এই reductionist পদ্ধতি ও quantification approach অতি ফলপ্রসূ। এমনকী জীববিজ্ঞানের কিছু ক্ষেত্রেও—যথা gene-এর রাসায়নিক প্রকৃতি, বংশগত বৈশিষ্ট্যের (heredity) মূল উপাদান সন্ধানে এবং অনুরূপ কতিপয় খোঁজে এই paradigm মহৎ অবদান রেখেছে। তবুও জীববিজ্ঞানের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই reductionist পদ্ধতি ও quantification guideline দুস্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তদুপরি জীবনের ধারক (life support) system-এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে—যেখানে আছে বহু উৎপাদক (factors), যেখানে ভূমি, জল, বনসম্পদ জাতীয় resource systems এবং জীবমণ্ডলের পরিবেশ সতত আন্তঃক্রিয়ায় রত—reductionist বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করতে গেলেই তার ফল হয় বিষময়, জীবনবিধ্বংসী।

Machines ও organisms-এর মধ্যে আছে বিস্তর প্রভেদ। Machine তৈরি হয় গোনাগাথা parts-এর সুষ্ঠু সংযোজনে। নিশ্চল উদ্ভিদ ও চলমান প্রাণী নিয়ে যে চেতন জগৎ, সেখানে দেখা যায় পরিস্থিতি অনুযায়ী আপন দেহের ভিতরে বেশ কিছু অদল-বদলের ক্ষমতা (flexibility and plasticity). দ্বিতীয়ত, প্রাণবন্তের জগতে আছে চক্রাকারে আবর্তনশীল সংবাদপ্রবাহ (cyclical patterns of information flows) যাকে বলা হয়, feedback loop. তৃতীয়ত, চেতন জগতে কাজ করে আত্মসংগঠনের নিয়ম (principle of self-organization)। এই আত্মসংগঠনের মধ্যে আবার আছে দুই প্রকার শক্তি—একটি হচ্ছে আত্ম-নবীকরণ; অপরটি, আপন জাগতিক শক্তির সীমানা ছাপিয়ে উত্তরণ (self-renewal and self-transcendence), এই আত্ম-নবীকরণ ঘটে মূল চেহারায় পরিবর্তন না ঘটিয়ে। মস্তিষ্ক বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত দেহের জীবকোষ প্রতিনিয়ত ভেঙে যাচ্ছে আবার নতুন কোষ গড়ে উঠছে অথচ বাহিরে থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আর প্রাণময় জগতের শীর্ষে যে মানুষ, তার মধ্যে আছে জ্ঞান ও বুদ্ধির ঊর্ধ্বে উঠে অতীন্দ্রিয় জগতে বিচরণ করার ক্ষমতা। চতুর্থত, organisms নিজেরাই কোনও না কোনও ecosystem-এর মধ্যে বাস করে, আবার তাদের অভ্যন্তরেও আছে এক একটি ecosystem আর তার (শেষোক্তের) মধ্যে রয়েছে ছোট ছোট organism যারা যথেষ্ট autonomy ভোগ করে ও host প্রাণীর

সমগ্র কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে গ্রথিত করে নেয়। পঞ্চমত, প্রাণবন্তদের মধ্যে আছে প্রধানত সংযোগ। প্রতিযোগিতা সেখানে যা কিছু আছে, তা শুধু বৃহত্তর ক্ষেত্রে (system) ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য। তদুপরি, organisms-এর জগতে প্রতিনিয়ত variety সৃষ্টি হচ্ছে; আবার সেই variety-র মধ্যেও individuality (স্বাতন্ত্র) আছে। উপরি উক্ত বিবরণ থেকে বোঝা যাবে, জীব বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারে mechanomorphic world view কত বিভ্রান্তিকর ও "গবেষণার ফল পরিমাণাত্মক রূপে প্রকাশ করতেই হবে," এই নির্দেশিকা (quantification guideline) কত অসঙ্গত। বহির্জগতের সঙ্গে প্রতিটি organism-এর নিরন্তর বহুমাত্রিক ঘাতপ্রতিঘাতজনিত যে আন্তঃক্রিয়া চলেছে এবং প্রতি organism-এর দেহাভ্যন্তরে তার আপন বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেও অন্তঃস্থিত ক্ষুদ্র organism-দের সঙ্গে—এবং শেষোক্তদের মধ্যেও—যে অজস্র আন্তঃক্রিয়া চলছে, তার পরিমাপ অসম্ভব।

জীববিজ্ঞানের গবেষকরা যে সাধারণত organism-এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনও অংশ নিয়ে অনুশীলন করে চলেন, তার কারণ সে ক্ষেত্রে গবেষণার ফল পরিমাণাত্মক রূপে (অঙ্কের ভাষায়) প্রকাশ করা সম্ভব হবে। কিন্তু যেখানে জীবনের পরিচয়-ই হচ্ছে প্রতি তন্তুর সঙ্গে প্রতি তন্তুর, প্রতি কোষের সঙ্গে প্রতি কোষের সংযোগে (linkage), বাঁধনের মধ্যে বাঁধনে, সেখানে সংযুক্তির বৃহত্তম ও উচ্চতর ক্ষেত্রগুলি বাদ দিয়ে অতি ক্ষুদ্র স্তরের আন্তঃক্রিয়াতে সীমিত থাকা তো জীববিজ্ঞান থেকেই পলায়ন। তাতেও দোষ না-ই বা দিলাম। কিন্তু যখন এই সব বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে এই স্তরে চর্চা করেই তাঁরা জীবনের রহস্য উদঘাটন করবেন, তখন তা হয়ে দাঁড়ায় আত্মপ্রতারণা। জীবন যেখানে বহুস্তরীয় (multi-level) সংগঠন, সেখানে নিম্ন স্তরে গবেষণা করেই life force -এর বিভিন্ন দিক উন্মোচন করার আশা তো মরীচিকার পিছনে ধাওয়া।

নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানীদের সমাজে যিনি সম্মানের উচ্চ আসন পেয়েছিলেন, সেই Albert Szent Gyorgi তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে ও অনবদ্য ভাষায় Relationship between the Biological and the Physical Sciences ব্যাখ্যা করেছিলেন ১৯৫৪ সালে এক বক্তৃতায়। রঙ্গ করে তিনি বক্তৃতার শিরোনামা দিয়েছিলেন "Fifty Years of Poaching in Science." বিজ্ঞানের বহু বিভাগে কাজ করে বহু বিভাগ থেকে idea ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছিলেন বলে তিনি নিজেকে poacher বলেছেন। জীববিজ্ঞানের বৃহত্তর ক্ষেত্র থেকে শুরু করে bacteriology, molecular biology, subatomic physics-এ তিনি ডুব দিয়েছেন আবার জীবনের অখণ্ডতায় ও multi-level synergy পর্যালোচনায় ফিরে এসেছেন।

প্রথমে তিনি দেখান যে অচেতন ও চেতন উভয়ের জগতেই সংগঠন ব্যবস্থা আছে কারণ সংগঠন হচ্ছে প্রকৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তবে অচেতন জগতে এই সংগঠন কিছু দূর গিয়ে থেমে যায়; আর চেতন জগতে এই সংগঠন প্রক্রিয়া চলতে থাকে বহুদূর। তদুপরি সংগঠনের প্রতি ধাপেই নতুন জটিল, সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর গুণের (properties) আবির্ভাব ঘটে যার কোনও তুলনা অচেতন জগতে নেই। এখানেই শুরু হয় জীববিজ্ঞানীর উভয়-সঙ্কট। Quantification চাইলে জীবসংগঠনের নিম্নস্তরে আবদ্ধ থাকতে হয়; তাতে জীবনের প্রক্রিয়া-বোধে অগ্রগতি হয় না। পক্ষান্তরে পর্যবেক্ষণের কেন্দ্র যদি উচ্চতর কোনও স্তরে নিবদ্ধ করা হয় বা সমগ্র organism-ই যদি পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু হয়, তা হলে পরিমাপ সম্ভব হয় না, ফলে দ্যা-কর্তা (Descartes) মার্কা বিজ্ঞানীর পংক্তিতে স্থান লাভ ঘটে না। জীবজগতে বিভিন্ন প্রকার সমস্যার নির্দোষ সমাধানসন্ধানী বিজ্ঞানী যে কী নিদারুণ দোটানার মধ্যে পড়েন, তার বিবরণ দিয়েছেন Szent Gyorgi তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে। যেহেতু প্রতি জীববিজ্ঞানীর কাছে এই অতি প্রাঞ্জল বিবরণ ও ব্যাখ্যা আলোকবর্তিকার মতো কাজ করবে, সেজন্য বিশদ উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না।

"Putting things together in a meaningful way is called "organization". It is one of the basic features of nature. If elementary particles are put together to form an atomic nucleus, something new is created which can no longer be described in terms of elementary particles. The same thing happens again if we surround this nucleus by electrons and build an atom, when we put atoms together to form a molecule, and so on. *Inanimate nature stops at the low level of organization of simple molecules. But living systems go further and combine* molecules to form macromolecules, macromolecules to form organelles such as....... and eventually put all these together to form the greatest wonder of creation, a cell with its astounding inner regulations. Then it goes on putting cells together to form "higher organisms" and increasingly more complex individuals, of which we are examples. *At every step, new, more complex, and subtle qualities are created.* In the end we are faced with properties which have no paralled in the inanimate world, although the basic rules remain unchanged.

"It is most important for the biologist to give himself an account of the relationships when he asks himself on which level of organisation to work when embarking on research with the desire to understand life. *Those who like to express themselves in the language of mathematics do well to keep to lower levels.* Any level of organisation is fascinating and offers new vistas and horizons, but we must not lose our bearings *lest we fall victim to the simple idea that any level of organization can best be understood by putting it to pieces, by a study of its components, that is, to study of the next lower level. This may make us dive to lower and lower levels in the hope of finding the secret of life there. It made my own life a wild-goose chase.* I started my experiments with rabbits, but finding rabbits too complex, I shifted to a lower life and studied bacteria; I became a bacteriologist. Soon I found bacteria too complex, and shifted to molecules and became a biochemist. So I have spent my life in the hunt for the secret of life.....

"For twenty years I studied energy transformations by going to the source of vital energies and worked on biogical oxidation on the molecular level. *These shedies netted me a Nobel Prize but left me without a better undertanding.... The more I knew, the less I understood; and I feared that I would end my life knowing everything and understanding nothing. Evidently something very basic was missing.* I thought that in order to understand I had to go one level lower, to electronics, and I began to dabble in quantum mechanics. So I finished up with electrons. But electrons are just electrons and have no life at all. Evidently on the way I lost life......

"I do not regret the wild goose chase, because it made me wiser. *I know now that all levels of organization are equally important and we must know something about all of them if we want to approach life......Even if we limit our work to a single level, we have to keep the whole in mind.* Naturally, the higher we climb on the ladder of organization and complexity, the less our material becomes accessible to mathematical analysis but *we must not think of ourselves as scientists only when we speak in equations.*"

এই ভাষণের পর প্রায় অর্ধশতাব্দী কেটে গেল। জীব বিজ্ঞানীরাই আত্মানুসন্ধান করে বলুন, তাঁরা বিভিন্ন স্তরের ফলাফল কীভাবে আন্তঃসম্পর্কের মধ্যে আনেন (correlate) ও কীভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেন।

আগেই বলেছি, শুধু যে নিশ্চল বা সচল organisms-এর উপর reductionist বিজ্ঞান প্রয়োগ ক্ষতিকর হয় তা নয়, জীবনের ধারক (life-support) system-এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে—ভূমি, জল, বনসম্পদ জাতীয় resource systems-এর উপর reductionist বিজ্ঞান ওরফে fragmented science প্রয়োগ করতে গেলেই তার ফল হয় বিষময়, জীবনধ্বংসী। আসলে খণ্ডিত বিজ্ঞান হচ্ছে অ-বিজ্ঞান, যদিও প্রকৃতি-জয়-অভিলাষী সেচবিজ্ঞানী, কৃষিবিজ্ঞানী ও মেডিক্যাল বিজ্ঞানীরা একেই "আধুনিক বিজ্ঞান" বলে চালাচ্ছেন।

তাই নদীর বুকে আড়াআড়িভাবে বাঁধ তৈরির পরামর্শ আসে। তাতে যে নদীকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া হয়, ব-দ্বীপ এলাকার ভূগর্ভে লোনাজলের অবাধ প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়, সে কথা মনে থাকে না। রাজস্থানের মতো স্বল্পবৃষ্টি, তাপদগ্ধ অঞ্চলে সুবৃহৎ জলপথ নির্মাণ করে সুপ্রচুর সেচের ব্যবস্থা করা হয়। খেয়াল থাকে না যে তার ফলে কয়েক দশকের মধ্যেই অতীতের শুষ্ক কিন্তু যথেষ্ট উর্বর শস্যভূমিকে বিস্তৃত লবণাকীর্ণ চির-অনুর্বর জমিতে পরিণত করার ব্যবস্থা হয়। রাসায়নিক সার প্রয়োগে ভূমি-মাতৃকার বলাৎকারের ব্যবস্থা করে আপন ধ্বংসের ব্যবস্থা পাকা করা হয়। জমিতে বিষ, জলে বিষ, বাতাসে দূষণ, খাদ্যে কীটনাশকের বিষাংশ (যা মানুষের পক্ষে ধীর সঞ্চারী বিষ "slow poison"), পুরুষও নারীর জননেন্দ্রিয়ে ক্যান্সারের পত্তন, এ সবই "Green Revolution" অন্তর্ভুক্ত chemicalisation-এর আশ্চর্য মহিমা।

রোগনিরাময়ের ক্ষেত্রে এসেছে সংশ্লিষ্ট রোগজীবাণুর সম্পূর্ণ বিলোপের আয়োজন। খেয়াল থাকে না যে এহেন কঠোর দাওয়াই প্রয়োগের ফলে প্রাকৃতিক নিয়মেই দেহাভ্যন্তরে রোগজীবাণুর বিকারগ্রস্ত রূপান্তর (mutation) ঘটে, যাতে পরের ধাপে ওষুধও নিষ্কাম হয় আবার অধিকতর মারাত্মক রোগের উদ্ভব ঘটে। আধুনিক medicare অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্রুত আপাত নিরাময় (seeming cure) ঘটিয়ে তাক লাগাবার

সাথে সাথে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা খতম করে। তাতে যদি ক্রমবর্ধমানহারে ক্যান্সার সৃষ্টি হয় এবং সব নিরাময় (curative) চিকিৎসার বাহিরে যে শল্য চিকিৎসা, তার জন্য কাতারে কাতারে প্রার্থী তৈরি করে, তবে সে বাহাদুরি তো reductionist medical বিজ্ঞানের। আজ যে চারিদিকে নূতন নূতন superweed গজিয়ে উঠছে, নতুন নতুন virus-এর আবির্ভাব দ্রুত বিস্তারে ত্রাসের সঞ্চার করছে, সেও তো "প্রকৃতিজয়ী" বিজ্ঞানের মহৎ অবদান!

তবুও কি রাজনীতি ও সাহিত্য জগতের নেতারা, ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকরা প্রশ্ন ওঠান, "এ কোন বিজ্ঞান?" বিজ্ঞানের নামে সকলেই এত অভিভূত যে তাঁরা ভুলে যান, বিজ্ঞানের প্রকারভেদ আছে—এক আছে reductionist বিজ্ঞান, অপরটি organismic বিজ্ঞান; একটি প্রকৃতি-বিজয় অভিলাষী, অন্যটি প্রকৃতি-অনুসারী। প্রকৃতি অনুসারী যে বিজ্ঞান, তা প্রকৃতির নীতিগুলি আত্মস্থ করে তার সার্থক প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়। এর বহু উদাহরণ আছে, যার জন্য পৃথক প্রবন্ধের প্রয়োজন। ব্যক্তিগত জীবনে সৎ এমন বহু বিজ্ঞানী আজও মনে করেন, "প্রযুক্তি দু'রকমের আছে—একটি elite-পন্থী, অন্যটি গরীব-সহায়ক; কিন্তু বিজ্ঞান তো শুদ্ধ জ্ঞান, তা কি করে হবে দু'রকমের?" এ এক অন্ধতা। Reductionist বিজ্ঞান আর organismic বিজ্ঞানের প্রভেদ এত দুস্তর যে চার শতাব্দীর সঞ্চিত চোখের ঠুলি আজ খসে যাচ্ছে। জীবনের অস্তিত্ব সঙ্কটে উটপাখি সাজার কোনও উপায় আজ যে আর নেই।

কার্ল মার্কস একদা রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাসের দর্শন চ্যালেঞ্জ করে জগতকে বদলে দিতে চেয়েছিলেন। প্রযুক্তির ঘরাণা (genre) নিয়েও তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছিলেন যে প্রশ্নের গুরুত্ব তাঁর শিষ্যদের কাছে যথেষ্ট স্বীকৃতি পায়নি। তিনি বলেছিলেন handmill-এর প্রযুক্তির জমানায় স্বাধীন artisan সৃষ্ট হয়; steam-mill-এর জমানায় বৃহৎ উৎপাদনের কারবারী সৃষ্ট হয়—সভ্যতার বনিয়াদ সম্বন্ধে এ হচ্ছে বুনিয়াদি কথা। বিজ্ঞানের দর্শন ও প্রযুক্তির ঘরাণার মূল প্রশ্নে—তা কি প্রকৃতির উপর টেক্কা দিতে চাইবে, না কি প্রকৃতি অনুসারী হবে, এই প্রশ্নে—মানুষের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে পৃথিবী গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব থাকবে, না বিলুপ্ত হবে। ফাটকা পুঁজির বিশ্বগ্রাস—যার বাহারি নাম globalisation—দিকেদিগন্তরে যুদ্ধ সৃষ্টি করছে; আর সেই বৃহৎ ব্যবসায়ী আর অপবিজ্ঞানের সংযোগ সহস্রাব্দের সন্ধিকালে ডেকে আনছে reductionist বিজ্ঞানের চরম ভয়ঙ্করী রূপ, যাকে "রাক্ষসী বিদ্যা" না বললে কর্তব্যহানি হয়। এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পোশাকি নাম transgenic engineering, যার মোহিনী মায়া বহু গবেষককে আকৃষ্ট করছে কিন্তু যার অনিবার্য পরিণতি ধ্বংসকাণ্ডে, চেনা-জানা জীবজন্তুর, কীটপতঙ্গের—ও মানুষের নিজের—দানবিক রূপান্তরে, শত লক্ষ বৎসর ধরে গড়ে ওঠা জীবনের মহাজালের (web of life) ছিন্নভিন্নতায়।

Reductionist বিজ্ঞানের এই পরিণতির আভাষ পেয়েই Principle of Indeterminacy-র জনক বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী Werner Heisenberg ১৯৪৬ সালে Gottingen বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেছিলেন, বিজ্ঞান যে পথে চলেছে, তাতে জীবন বিপন্ন হতে চলেছে। বিজ্ঞানীদের তিনি ডাক দিয়েছিলেন প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রহস্য উদঘাটন করতে, প্রকৃতির পথে বাধা সৃষ্টি না করতে।

"New possibilites of interfering with Nature are threatening us in many fields ..... It has become a practical possibility to produce infectious diseases and perhaps worse; even the biological development of man may be influenced in the direction of some predetermined selective breeding. Finally, the mental and spiritual state of people could be influenced and, if this were carried out from a scientific point of view, it could lead to terrible mental deformations of great masses of people. One has the impression that science approaches on a broad front of a region in which life and death of humanity can become dependent on the actions of a few, very small groups of people .....people have not realized the terrible danger which threatens them as a result of further scientific developments." পরিশেষে তিনি বল্লেন, "The core of science is formed, to my mind, by the pure sciences, which are ...... the branches in which pure thought attempts to discover the hidden harmonies of Nature."

সুতরাং বিজ্ঞানকে ফিরিয়ে আনতে হবে তার কল্যাণময় কর্মে। ক্ষমতার দাপট মানুষকে নিয়ে এসেছে আত্মবিলুপ্তির কিনারায়। যত বড় বিজ্ঞানী হোন না কেন, প্রকৃতি যেমন বিভিন্ন species-এর মধ্যে co-evolution-এর ব্যবস্থা করেছে, সে ব্যবস্থা করার ক্ষমতা মানুষের কোনও দিনই আসবে না। প্রকৃতিকে যতই জানব, ততই ক্রমবর্ধমানহারে অজানা জগতের প্রশ্নপট হাজির হতে থাকবে। তার inexhaustible intelligibility-র কথা বুঝলেই কল্যাণময়তার পথে দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব হবে।

ছোটগল্প

বন্দিনি

জাহান আরা সিদ্দিকী

তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের আর্তনাদে রাতের স্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন শবনম বেগম। শব্দটা কোন দিক থেকে আসছে সদ্য ঘুম ভেঙে ঠিক অনুমান করতে পারলেন না। তারপরই তার কানে এল উচ্চ নারীকণ্ঠের বিলাপধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলেন কার কণ্ঠস্বর এটা। পাশের বাড়ির নাসিমা কাঁদছে। তাহলে কি ওর স্বামী ওকে আবার মারধোর করছে?

নাসিমার স্বামী সাবের রাগি আর বদমেজাজি। সে ছোটখাট একটা বেসরকারি অফিসে কেরানির চাকরি করে। সারাদিন বাইরে বাইরে থাকে, বাড়িতে এলেই শুরু হয় যত রকম উৎপাত। সাংসারিক সব ব্যাপারেই তার নাক গলানো চাই। নাসিমা যদিও তার স্ত্রী, কিন্তু সাবের তার সঙ্গে এমন আচরণ করে যেন নাসিমা তার বাঁদি।

নাসিমারা থাকত শবনম বেগমের বাড়ির পাশে একটা টিনের ঘরে। খুলনা শহরের অভিজাত এলাকায় চমৎকার সব দালানকোঠার মাঝে এই শ্রীহীন বাড়িটাকে বড্ড বেমানান দেখাত। সে বাড়ির মালিক দেশের বাইরে থাকায় জমিটাকে বেদখল হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য স্রেফ টিনের দু'কামরার একটা বাড়ি বানিয়ে ভাড়া দিয়ে রেখেছিলেন।

শবনম আর তার স্বামী দু'জনেই কলেজে অধ্যাপনার কাজে সকাল সকাল ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেন। ঘরে ফেরার পর, একটা সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকায় সন্ধ্যার দিকে ক্লাবে চলে যেতেন। এই আসা যাওয়ার ফাঁকে শবনম প্রায়ই নাসিমাকে লক্ষ করতেন। দেখতেন ঘরের পাশের খালি জায়গাটায় হয় সে সবজির বাগান করছে, নয় লাউগাছের ডগাটাকে টিনের চালে উঠিয়ে দিচ্ছে। কখনও কখনও পড়ন্ত রোদের আলোয় মোড়া পেতে রোদে চুল শুকাত সে। রিক্সা করে ঘর থেকে বেরনর সময় দু'জনের চোখাচোখি হত। বেঁটেখাটো, কালো, লালচে বিবর্ণ চুলের অধিকারিণী নাসিমার মধ্যে সৌন্দর্যের তেমন কিছু ছিল না। তবু বিশ বাইশ বছরের দেহে যৌবনের লাবণ্য খেলা করত। সৌন্দর্য না থাকলেও পুরুষকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা ছিল, আর বড় বড় চোখ দুটো যেন কথা বলত।

একটা ছোট্ট ঘটনার মধ্য দিয়ে ওর সঙ্গে শবনমের কথোপকথন হয়েছিল। এক দিন তিনি দুপুরে কলেজ থেকে বাসায় ফিরছেন। হঠাৎ মৃদু কান্নার ধ্বনি কানে গেল। তার বেডরুমের পাঁচিলের অপর প্রান্তেই নাসিমার শোবার ঘর। তিনি বুঝলেন মেয়েটি কাঁদছে। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রবাসী মেয়ের কথা মনে পড়ল। মেয়েটি বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে চলে গেছে। বয়সে সে নাসিমার সমানই হবে। তা ছাড়া প্রায়ই দেখতে দেখতে অজান্তে তার মনে নাসিমার প্রতি খানিকটা অনুভূতিরও জন্ম নিয়েছিল। প্রথমে ইতস্তত করলেও একটু পর দ্বিধা সংকোচ বিসর্জন দিয়ে তিনি ওর বাড়ির গেট পেরিয়ে ভেতরে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। পুরো বাড়িটাতেই নাসিমার যত্নের ছাপ। এক পাশে লালশাকের খেত, কয়েকটা বেগুন আর কাঁচালঙ্কার গাছ। দড়ির ওপর ওর স্বামীর লুঙ্গি, শার্ট আর শাড়ি শুকোতে দেওয়া হয়েছে। কী করবেন না বুঝে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। ভেতর থেকে তখনও কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। তবে আগের মতো অতটা জোরালো নয়। ততক্ষণে ক্ষীণ হয়ে এসেছে কান্নার শব্দ।

একটু ইতস্তত করে শবনম ডাকলেন, ভেতরে আসতে পারি?

মুহূর্তে কান্নার শব্দ থেমে গেল। চারদিকে নিস্তব্ধতা। কিন্তু নাসিমার চেহারা দেখতে পেলেন না তিনি। আবার স্বর উঁচিয়ে ডাকতে যাবেন তার আগেই লক্ষ করলেন বেড়ার ফুটোর মাঝে দুটো কালো চোখ। ভেতর থেকে নাসিমা তাকে দেখছে। পর মুহূর্তে সে বেরিয়ে এল। ওর শরীরের পরিবর্তনটা দূর থেকে ততটা বুঝতে পারেননি। শবনম কাছে আসতেই তা ধরা পড়ল। পেটটা বেশ উঁচু হয়ে আছে। কম হলেও সে মাস ছ'য়েকের অন্তঃসত্ত্বা। নাসিমা ততক্ষণে ঘোমটা টেনে তার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। ওর চোখে অশ্রুর চিহ্ন নেই বটে তবে আরক্ত ফোলা ফোলা চোখের দিকে তাকিয়ে শবনম বুঝলেন এতক্ষণ ধরে সে-ই কাঁদছিল। পরিচয় দিয়ে বললেন,

— আমি তোমাদের পাশের বাড়ি —

তার কথাটা শেষ হবার আগেই নাসিমা বলে উঠল, আমি আপনাকে চিনি। শবনম বুঝলেন, তিনি যেমন ওকে দেখতেন সেও তেমনই তাকে লক্ষ্য করত। জিজ্ঞেস করলেন, কী নাম তোমার?

নাসিমা তার নামটা জানাল।

— কাঁদছিলে কেন?

— কই না তো।

মুখে অস্বীকার করল বটে সে কিন্তু ওর চোখের কোলে আবার জল চলে এসেছে। সস্নেহে বললেন, শবনম, তুমি বয়সে আমার মেয়ের চাইতেও ছোট। আমার কাছে সংকোচ করো না। কী হয়েছে খুলে বল।

নাসিমার গাল বেয়ে ইতিমধ্যে জলের ধারা নেমে এসেছিল। হাত দিয়ে মুছতে মুছতে সে বলল, শুনে কী করবেন?

— দেখি তোমাকে কোনও ভাবে সাহায্য করতে পারি কি না।

— কেউ আমাকে কোনও সাহায্য করতে পারবে না।

— চেষ্টা তো করতে পারি।

নাসিমা শাড়ির আঁচলটা ডান হাতের উপর থেকে সরিয়ে নিল। তার বাহুর কাছের এক অংশে ফোস্কা পড়ে গেছে। ওর দিকে জিজ্ঞাসু চোখ মেলে চাইতেই সে নিজে থেকেই উত্তর দিল, গরম চা ছুঁড়ে মেরেছিল।

— কে?

প্রশ্নটা করেই শবনম বুঝলেন এ রকম নির্বোধের মতো কথাটা জানতে চাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তিনি নাসিমার কাছ থেকে কোনও উত্তর পেলেন না। নিজে থেকে অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, তোমার স্বামী? নাসিমা মাথাটা নিচু করে রইল। শবনম আবার বললেন, ইচ্ছে করে করেনি, হঠাৎ হাত লেগে—

নাসিমা এবার মুখ তুলে বলল, হঠাৎ করে হাত লেগে পুড়ে গেলে কি এইখানে পোড়ে?

যদিও হাতের বাহুতে অমনভাবে পোড়ার কথা নয় সেটা বুঝতে পারছিলেন শবনম, তবু যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। নিজে থেকে কেউ তার স্ত্রীর উপর এ ভাবে গরম চা ছুঁড়ে মারতে পারে কীভাবে? জিজ্ঞেস করলেন,

— কেন ও রকম করল তোমার স্বামী?

— চায়ে চিনি দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই সে খেপে উঠল।

— সব সময়ে সে অমন করে?

— মাঝেমধ্যে। আমি যদি মুখে মুখে তর্ক করি তখনই বেশি খেপে ওঠে।

— তুমি চুপ করে থাকলেই পার।

— সব সময়ে কি এ ভাবে মুখ বুজে সহ্য করে থাকা যায় বলুন?

মেয়েটির অসহায় চেহারাটার দিকে তাকিয়ে শুধু সহানুভূতি নয় সে সঙ্গে আক্রোশও জেগে উঠলো শবনমের মনে। বললেন, তোমার স্বামী ফিরে এলে আমি তার সঙ্গে কথা বলব।

সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে উঠল নাসিমার চোখের দৃষ্টি। সভয়ে জিজ্ঞেস করল, কী কথা বলবেন?

— ওকে জানিয়ে দেব আর এক দিন যদি সে তোমার উপর এ রকম অত্যাচার করে তা হলে তাকে আমি জেলে পাঠাব। এখানকার এস. পি. আমার ভার্সিটি জীবনের সহপাঠী— শবনম তার ক্ষমতা সম্পর্কে নাসিমাকে নিশ্চিত করার জন্য আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই নাসিমার চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি ফুটে উঠল। ব্যাকুলভাবে হাত নেড়ে সে বলল, ওর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলবেন না। এবার শবনমের অবাক হবার পালা। জিজ্ঞেস করল,— কেন?

— ও তো তা হলে আমাকে তালাক দিয়ে দেবে। আর এক বার আমাকে যখন সে পেটাচ্ছিল প্রতিবেশীরাও সে সময়ে তাকে পুলিশের ভয় দেখিয়েছিল। সে উত্তরে জানিয়ে দিয়েছিল সে জেলে যাবে ঠিকই কিন্তু তার আগে আমাকেও তালাকনামা পাঠিয়ে দেবে।

স্তব্ধ হয়ে গেলেন শবনম। নাসিমার জীবনের ওপর ওই স্বল্পশিক্ষিত কেরানির যে প্রবল ক্ষমতা রয়েছে সেটা তিনি উপলব্ধি করলেন। সেই সঙ্গে এও বুঝতে পারলেন নাসিমা আশ্রয় হারাতে রাজি নয়। অত্যাচার সহ্য করে এখানেই তার থাকতে হবে। তবে কি এর বাবা মা বা এমন কোনও আত্মীয়-স্বজন নেই যে তাকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারে?

— তোমার বাবা মা কি জানেন তুমি এ অবস্থায় আছ?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল নাসিমা, আমার জন্মের সময় মা মারা যান। বাবা বিয়ে করে সৎ মায়ের দেশের বাড়ি নোয়াখালিতে চলে গেছেন। কখনও আমার খোঁজ খবর করেননি।

— তোমাকে তা হলে কে মানুষ করল?

— আমার চাচা চাচি।

— তারা কি জানেন তোমার স্বামী এ ভাবে অত্যাচার করে?

নাসিমা হাতে একটা অসহায় ভঙ্গি করে উত্তর দিল, একদিন তো চাচি নিজ চোখেই দেখেছেন ও আমাকে কীভাবে পেটাচ্ছে।

— উনি প্রতিবাদ করেননি?

— করে কী লাভ। উল্টো আরও অত্যাচার বাড়বে। আমাকে বলেছেন, সবই তোর কপাল। এখানেই স্বামীর সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলতে চেষ্টা কর।

— তারা তোমার খোঁজ খবর নেয়?

— ওনার নিজেদের স্বামী ও ছেলেমেয়ের সংসার আছে।

নাসিমা আর কথা বাড়াল না। শবনম বুঝলেন নাসিমার খবর নেওয়ার সময় বা ইচ্ছে তাদের নেই। ছেলেবেলায় বাধ্য হয়ে মানুষ করতে হয়েছে বটে তবে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে দায়দায়িত্ব মুক্ত হয়েছেন তারা।

রাতে বিছানায় শুয়ে স্বামীর সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলেন শবনম। তার স্বামী বললেন,

— সমস্যাটা কোথায় জান? নাসিমা যদি খুবই দরিদ্র ঘরের মেয়ে হত তা হলে হয়ত কোনও বাড়িতে বা কারখানায় কাজে লাগিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু ও এসেছে এমন একটি পরিবার থেকে যারা খুব সচ্ছলও নয় কিন্তু আত্ম-সম্মানবোধটুকু এখনও টিকিয়ে রাখতে চাচ্ছে। এরা না পারছে মানুষের বাড়িতে গিয়ে ঝিগিরি করতে না পারছে স্বাধীনভাবে জীবন কাটাতে।

শবনম ভেবে দেখলেন কথাটা ঠিক। তবু মনটাকে যেন মানাতে পারলেন না। স্বামীকে বললেন, তবু ওকে ওর অধিকার সম্পর্কে বুঝিয়ে বলব।

তিনি বললেন, এতে করে তুমি ওর আরও ক্ষতি করে বসবে। অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ও হয়ত বিদ্রোহ করতে চাইবে। তখন ওর স্বামী যদি ওকে ছেড়ে দেয় তখন?

— ওকে সেলাই টেলাই শিখেয়ে —

— তা তো বুঝলাম। কিন্তু ও থাকবে কোথায়?

এবার মহা বিপদে পড়ে গেলেন শবনম। সত্যিই তো, ও থাকবে কোথায়? হোমে চেষ্টা করলে হয়ত পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু নাসিমা কি হোমের জীবনের চাইতে এ জীবনই বেশি পছন্দ করবে না? এখানে তবু তার একটা নিজস্ব সংসার আছে যেটা নিয়ে সে সারা দিন ব্যস্ত থাকতে পারে। আর তার চাইতেও বড় কথা ওর সামনে আশার আলোও আছে। সন্তানকে ঘিরে হয়ত ওদের দু'জনের সম্পর্কটা সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। এ সব ভেবে তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন।

এর কিছুদিনের মধ্যে নাসিমার একটা ছেলে হল। নতুন জামা কাপড় কিনে ছেলেটাকে দেখতে গিয়েছিলেন শবনম। নাসিমার চোখ মুখ আনন্দে ঝলমল করছিল। সেটা একমাস আগের কথা। এর মধ্যে আবার এমন কী ঘটনা ঘটল যে এই গভীর রাতে নাসিমা থেকে থেকে আর্তনাদ করে উঠছে। শুধু আর্তনাদ নয় উচ্চস্বরে সে যে বিলাপ শুরু করেছে সেটা কিছুতেই থামছে না। চেঁচামেচিতে শবনমের স্বামীর ঘুমও ভেঙে গিয়েছিল।

শবনম বললেন, তুমি কি উঠে একটু হাঁক ডাক করে দেখবে?

তিনি উত্তর দিলেন, কী লাভ তাতে?

— নাসিমাকে যদি তার স্বামী মারধোর করে তা হলে হয়ত তোমার গলার আওয়াজ পেয়ে সে নিজেকে সংবরণ করবে।

— কান্নার শব্দটা শুনে মনে হচ্ছে না কেউ কাউকে পেটাচ্ছে।

কান পেতে শবনম ভাল করে শুনলেন। বুক ভাঙা করুণ কণ্ঠের বিলাপ। গভীর দুঃখবোধ থেকে কেউ হৃদয় নিংড়িয়ে কাঁদছে। একটু পরই ভোরের আজান পড়ল। কিন্তু কান্নাটা তবু থামল না। আকাশটা ফরসা হয়ে উঠতেই তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। নাসিমার বাসায় তার যেতেই হবে। সন্দেহ নেই ওর কিছু একটা বিপদ হয়েছে, এবং সে বিপদটা ঘোরতর। হাত পুড়ে গেলেও ওকে কখনও এত আর্তস্বরে কাঁদতে দেখেননি শবনম। ওর সহ্য ক্ষমতা অনেক।

পুবের আকাশটা ফরসা হয়ে উঠেছিল। নাসিমাদের বাড়িতে ঢুকতেই তিনি ওর স্বামীর মুখোমুখি হলেন। তাকে দেখেই লোকটা অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে বাড়ির গেট পেরিয়ে বাইরে চলে গেল। ওর আচরণে তিনি অবাক হলেন। সাধারণত দেখা হলে লোকটা রূঢ়ভাবে চোখ ফিরিয়ে নেয়। আজ সে হঠাৎ এত ভয় ভয় ভাব নিয়ে কেটে পড়ল কেন বুঝতে পারলেন না। বাড়ির ভেতর থেকে তেমনই একটানা নাসিমার বুকভাঙা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে।

ছোট্ট বারান্দাটা পেরিয়ে তিনি নাসিমার শয়নকক্ষের দরজায় ঢোকার মুখে একটু দাঁড়ালেন। এ ভাবে হুট করে ঘরে ঢোকাটা ঠিক নয়। দরজায় মৃদু টোকা দিলেন ক'য়েক বার কিন্তু নাসিমা ভেজানো দরজাটা খুলে দিল না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে দরজা ঠেলা দিতেই দরজার পাল্লা দুটো খুলে গেল। তখন ভোরের ম্লান আলো খোলা জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরটাকে অল্প আলোকিত করে তুলেছে। সেই আবছা আলোতে শবনম দেখলেন নাসিমা মেঝের উপর আছড়ে পড়ে সমানে কেঁদে চলেছে। তিনি যে ঘরে প্রবেশ করেছেন সেটাও সে বুঝতে পারেনি।

নাসিমার সামনে মেঝেতে তার বাচ্চার নিথর দেহটা পড়ে আছে। এক নজর তিনি তাকিয়েই চমকে উঠলেন। শরীরে যে প্রাণের চিহ্ন নেই সেটা বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকিয়েই বোঝা গেল। দৃশ্যটা এত করুণ আর শোকাবহ যে তিনি কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু পর নিজেকে সামলে নিয়ে নাসিমার মাথাটা দু'হাত দিয়ে ধরে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, শান্ত হও নাসিমা।

নাসিমা যেন তার কথাগুলো শুনতে পেল না। ও পাগলের মতো তাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে বলতে থাকল, আমার বাচ্চাটাকে ও মেরে ফেলেছে। আর্ত চিৎকারে ভেঙে পড়ল সে।

শবনমের মাথায় বিদ্যুতের মতো কয়েকটা শব্দ ঝলসে উঠল 'মেরে ফেলেছে'। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাচ্চাটার দিকে তাকালেন তিনি। কীভাবে মারা গেছে বাচ্চাটা? ওর স্বামীর যে রকম ভয়ঙ্কর উন্মত্ত রাগ, তবে কী সে — না, না, এ কী করে সম্ভব। শত হলেও এটা তার নিজের বাচ্চা। নাসিমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছিল বাচ্চার?

নাসিমা কী বলছে সে নিজেই যেন জানে না। উন্মাদিনীর মতো বলল, ও আমার উপর রাগ করে ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে মেঝের উপর আছড়ে ফেলে দিল। মাগো.......।

আবার বুকভাঙা আর্তনাদ করে উঠল সে। শবনম দৃঢ়ভাবে ওকে ধরে বললেন, নাসিমা, তাকাও আমার দিকে। কী বলছ তুমি ? বাবা হয়ে সে নিজের .....

— হ্যাঁ আমি রাগের মাথায় ওর সঙ্গে তর্ক করছিলাম। ও আমাকে শাস্তি দেয়ার জন্য বাচ্চাটাকে শেষ করে দিল। কথাগুলো বলে নাসিমা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে শবনমের সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। কল্পনাতেও এমন ভয়াবহ দৃশ্য তিনি চোখের সামনে আনতে পারলেন না। কিন্তু এখন কিছু একটা করা দরকার। এটা তো তা হলে একটা হত্যাকাণ্ড - পুলিশকে খবর দিতে হবে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ঠিক তখনই পেছনে পায়ের শব্দ পেলেন। দু'একজন গরিব মেয়েছেলে বারান্দায় ভিড় করেছে। এদের দু'চারজনের মুখ তার চেনা। আশেপাশের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে এরা। কান্নাকাটির শব্দে ওরাও কৌতূহলবশে ছুটে এসেছে। বারান্দা থেকে বেরনর সময় তিনি দেখলেন বারান্দার পাশে খাঁচায় নাসিমার পোষা মুরগিগুলো অবরুদ্ধ অবস্থায় ডানা ঝাপটাচ্ছে। আজ আর কেউ তাদের ঘরের ঝাপি খুলে দেয়নি।

গেট থেকে বেরবার মুখে চোখে পড়ল নাসিমার স্বামীকে। রিক্সা থেকে নামছে সে। পাশে সবুজ শাড়ি পরিহিতা বৃদ্ধা গোছের একজন মহিলা। চেহারার সাদৃশ্য দেখে মনে হল তার মা। নাসিমার মুখে তিনি শুনেছিলেন তার শ্বশুর-শাশুড়ি কাছাকাছি কোথাও থাকে। লোকটার মতলব তিনি বুঝতে পারলেন না। এত সব কাণ্ডকীর্তির পর সে কেন মাকে ডেকে আনল ? পরমুহূর্তে মনে হল সাবেরও এখন মহাবিপদে পড়েছে। এবার আর জেলের হাত থেকে বাঁচার উপায় নেই। পোস্টমর্টেম রিপোর্টেই ধরা পড়বে বাচ্চাটা কীভাবে মারা গেছে। আর এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বাচ্চার মা স্বয়ং। কথাটা ভেবে তিনি মনের মধ্যে এক ধরনের স্বস্তি বোধ করলেন। সাবের তার এত দিনের পাপের শাস্তি ভোগ করবে। মাকে যতই ডেকে আনুক না কেন বাঁচার কোনও পথ তার সামনে আর খোলা নেই।

বাড়িতে ঢুকতে যাবেন ঠিক সে মুহূর্তে মর্নিং ওয়াকের পোশাক পরে তার স্বামী বেরিয়ে এলেন। শবনম উত্তেজিত মুখে তাঁকে সব ঘটনা খুলে বললেন। উনি শান্ত মুখে সব শুনলেন কিন্তু কোনও মন্তব্য করলেন না। শবনম যখন দেখলেন এত কিছু শোনার পরও তিনি যথারীতি হাঁটতে বের হচ্ছেন তখন খেপে গিয়ে বললেন, আশ্চর্য মানুষ তো তুমি। এত বড় ঘটনার পরও কী করে পারছ মর্নিং ওয়াকে বের হতে।

তিনি তেমনই ভাবলেশহীন নির্লিপ্ত মুখে বললেন, আমাদের করার কী আছে বল ?

— পুলিশকে তো অন্তত একটা খবর দিতে পার।

— পুলিশ এলে তুমি সাক্ষী দেবে ?

— অবশ্যই।

— মনে রেখো কোর্টে যতবার ডেট পড়বে ততবার তোমাকে সেখানে সাক্ষী দিতে হাজির হতে হবে।

হঠাৎ থমকে গেলেন শবনম। এ ব্যাপারটা তো আগে তার মাথায় আসেনি। এ কেসের সাক্ষী হতে যাওয়ার অর্থ একটা প্যাচালো মামলায় জড়িয়ে পড়া। কিন্তু তারপরও মনকে বোঝাতে পারলেন না। অসহায়ভাবে বললেন, আমরা কি কিছুই করতে পারব না ?

— প্রয়োজন তো নেই। দেখ না লোকজন হাজির হতে শুরু করেছে। একটু পর এমনিতেই এ সব অত্যুৎসাহী লোকজনের কাছে খবর পেয়ে পুলিশ এসে হাজির হবে।

শবনম ভেবে দেখলেন কথাটা ঠিক। ইতিমধ্যে নাসিমার কান্নার আওয়াজ থেমে গেছে। তার ঘরসংলগ্ন জানালা দিয়ে ওদের বাড়ির দিকে তাকালেন। বেশ কিছু লোকজনের জটলা বেধে গেছে। কিন্তু অনেক ক্ষণ পেরিয়ে যাবার পরও পুলিশকে আসতে দেখলেন না। দুপুরে কলেজ থেকে ফিরে বাড়ির ঝিকে জিজ্ঞেস করলেন, পুলিশ এসেছিল ?

ঝিটা ইতিমধ্যে বার কয়েক কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছুটে গেছে ওদের বাড়ি। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে এ নিয়ে সে ক'জন কাজের মেয়ের সঙ্গে তুমুল উত্তেজনার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। শবনম ভাবলেন সে নিশ্চয় সর্বশেষ খবরাখবর দিতে পারবে। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে সে উল্টো জিজ্ঞেস করল,

— পুলিশ আসবে কেন ?

— বাচ্চাটা এভাবে মারা গেল।

— খাট থেকে পড়ে মরে গেলে কার কি করার থাকে বলুন।

ওর উত্তর শুনে শবনম এত তাজ্জব হয়ে গেলেন যে অনেকক্ষণ মুখ দিয়ে কোনও কথা বের হল না। একটু পর বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে যেতে জিজ্ঞেস করলেন,

— কীভাবে মারা গেছে বললে ?

ঝি পরম উৎসাহে বলতে থাকল, বাবা মা দু'জনের মাঝখানে শুয়েছিল বাচ্চাটা। ওর বাবা ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গিয়েছিল। সে সময় বাচ্চাটা গড়িয়ে নীচে মেঝেতে পড়ে যায়। মাথায় বড্ড আঘাত পেয়েছিল। এক বার কেঁদে ওঠার সময় পর্যন্ত পায়নি। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে।

শবনম হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। নিজের কানকে তিনি যেন বিশ্বাস করাতে পারছিলেন না। এ কী বলছে সে। এ সব

কথা কে রটিয়েছে? নিশ্চয় সাবের। কিন্তু নাসিমা কি জানতেও পারছে না এতবড় একটা মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে নিজেকে সে বাঁচাচ্ছে। ও জানতে পারলে নিশ্চয় তার সন্তান হত্যাকারীকে সে ছেড়ে দেবে না। শবনমের পক্ষে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হল না। এক বার মনে হল কী প্রয়োজন এসব অহেতুক ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ে। কিন্তু তারপরও তিনি নিজেকে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন ওদের বাড়ির দোরগোড়ায়। কক্ষের ভেতর অজস্র মানুষের ভিড়ে সাবের বা নাসিমা কাউকে চোখে পড়ল না। একজনকে জিজ্ঞেস করতে হাতের ইশারায় নাসিমাকে দেখিয়ে দিল।

ভিড়ের আড়ালে মেঝেতে পাটি বিছিয়ে শুইয়ে রাখা হয়েছে তাকে। চারিদিকে মেয়েরা ঘিরে ধরে বসে আছে। সোজা গিয়ে নাসিমার পাশে উপস্থিত হয়ে শবনম ডাকলেন, নাসিমা।

নাসিমা শ্রান্তির ভারে চোখ বন্ধ করে ছিল। তার ডাকে চোখ মেলে তাকাল। সে দৃষ্টিতে কোনও প্রাণের চিহ্ন নেই। মরা মাছের মতো নিষ্প্রাণ সে চোখ।

– সবাই বলছে খাট থেকে পড়ে মারা গেছে তোমার বাচ্চা কিন্তু......

ঠিক তখন সবুজ শাড়ি পরা সকালে দেখা সেই মহিলা শবনমের কথার মধ্যে বলে উঠলেন, হ্যাঁ খাট থেকে পড়ে গিয়েই তো মারা গেছে।

–আপনি কে?

–আমি সাবেরের মা।

শবনমের অনুমান তা হলে সঠিক। গল্প সাবের তৈরি করেছে, না তার মা সে বিষয়ে সন্দেহ জাগল তার । সম্ভবত তার মা। মহিলার চোখে সতর্ক ধূর্ত চাহনি।

– বাচ্চা ওভাবে পড়ে মারা গেছে কে বলল?

– কেন, নাসিমার চোখের সামনেই ঘটনাটা ঘটেছে। সাবের বাথরুমে ছিল, নাসিমা পাশে শুয়ে। বাচ্চা খাট থেকে পড়ে যাবার শব্দে নাসিমা.....

শবনম তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি চুপ করুন, নাসিমাকে বলতে দিন। নাসিমা, তোমার বাচ্চা এ ভাবে মারা গেছে?

নাসিমা শবনমের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিন্তু ওর দৃষ্টি তার উপর নেই। তাকে ছাড়িয়ে জানালা ভেদ করে বহুদূরে শূন্যের উপর। শবনমের দিকে না তাকিয়ে তেমনই প্রাণহীন চোখে সে মাথা নাড়ল। শবনম বুঝতে পারলেন না সে তার কথাটা ঠিকমত বুঝতে পেরেছে কি না। আবার জিজ্ঞেস করলেন, নাসিমা, তোমার বাচ্চাটা কি খাট থেকে পড়ে মারা গেছে?

আবারও আগের মতো মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল সে। সাবেরের মা বিরক্ত মুখে গজগজ করে বলতে লাগলেন, এমনিতে মেয়েটির শোকে দুঃখে মাথার ঠিক নেই, এমন সময় এসব কী অদ্ভুত কথাবার্তা। কথাগুলো বলতে বলতে তিনি নাসিমার চুলে হাত বোলাতে থাকলেন। শবনম বুঝলেন এখানে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ সময় অপচয় করা। এমনিতেই সবাই কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকিয়ে দেখছে। এক ছুটে বাড়ি ফিরে এলেন তিনি। তার স্বামী বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিলেন। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে তাকে সব জানাতে উনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমি এ রকম কিছুই আশঙ্কা করেছিলাম, তুমি অযথা সেন্টিমেন্টাল হচ্ছিলে।

– নিজের মা এ ভাবে সত্য গোপন করল?

– এ ছাড়া ওর আর কী উপায়ই বা ছিল বল? স্বামী জেলে গেলে ও কোথায় দাঁড়াত?

সবকিছু বুঝেও শবনমের মনকে প্রবোধ দেওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়াল। নাসিমাকে মন থেকে ক্ষমা করতে পারলেন না। এর পর থেকে ওর বাসায় আর তিনি গেলেন না। কলেজে যাবার পথে আড়চোখে তাকিয়ে দেখতেন তবে ওকে আর বাইরে দেখতে পেতেন না। বেশ কিছু দিন পর আবার নাসিমাকে দেখা গেল। তিনি অবশ্য আর তাকাতেন না, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। এ ঘটনার মাস দুয়েক পর একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে বাড়ির গেটে রিক্সা থেকে নামছেন হঠাৎ দেখেন নাসিমা তার বাড়ির সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে। মনের ভেতর রাগ থাকলেও বাইরে ভদ্রতা দেখিয়ে বললেন, কেমন আছ তুমি ?

– ভাল।

ওর 'ভাল' উত্তর শুনে শবনমের ভেতরের অবরুদ্ধ চাপা ক্ষোভ বেরিয়ে এল। কটাক্ষ করে বলে উঠলেন, ভাল তো থাকবেই। আমি তোমার কাছ থেকে এটা আশা করিনি। ভেবেছিলাম তোমার ছেলেকে কে মেরে ফেলেছে সে সত্য কথাটা তুমি বলবে।

হঠাৎ নাসিমা আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। সে চিৎকারটা ছিল এতটা বেদনাভরা এতটা হৃদয় নিঙড়ানো যে, শবনম একদৃষ্টিতে ওর যন্ত্রণাকাতর মুখটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। নাসিমা উন্মাদের মতো কাঁদছে। ওর বাচ্চাটার মৃত্যুর সময় ওর কান্না দেখেছিলেন তিনি কিন্তু এ কান্নাটা যেন আরও ভয়াবহ, আরও হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে উৎসারিত।

কাঁদতে কাঁদতে ও সিঁড়িতে বসে পড়ল। এ মুহূর্তে ওর সামনে শবনমের অস্তিত্বও যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ও কাঁদছে। সে কান্নাটা যেন বাচ্চাটার জন্য নয়— ওর নিজের জন্য।

যন্ত্রণায় শরবিদ্ধ ওর দেহটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন তিনি। নাসিমার জন্য বড্ড মায়া হচ্ছে তার। সারাটা জীবন বেচারিকে তার সন্তানহত্যাকারীর সঙ্গে একই ছাদের নীচে কাটাতে হবে।

যাযাবরের সাহিত্যকৃতি

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

যাযাবর ওরফে বিনয় মুখোপাধ্যায় আটতিরিশ বছরে (১৯৪৬-১৯৮৩) কুল্লে ছয়খানি বই লিখেছিলেন। এখনকার লেখকদের মতো অতিপ্রজ লেখক হবার বাসনা তাঁর আদৌ ছিল না। তাঁকে আমি কখনও চোখে দেখিনি, কিন্তু তাঁর বই পড়েছি গত পঞ্চাশ বছর ধরে। যখনই হাতের কাছে পেয়েছি, পড়েছি। এর প্রধান কারণ সুখপাঠ্যতা, শেষ কারণ সুখপাঠ্যতা। তাঁর প্রথম বই 'দৃষ্টিপাত' (১৯৪৬, জানুয়ারি/১৩৫৩ আশ্বিন) অবিশ্বাস্য পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সেদিনের এই আশ্চর্য পাঠকপ্রিয়তার কারণ কী ছিল একথা আজ শান্ত চিত্তে ভেবে দেখলে স্বীকার করতে হয় ১৯৪২-৪৩-এর দিল্লি শহরের সর্বস্তরের মানুষ ও দিল্লির পুরনো তথা নতুন কালের ইতিহাস এত রম্যভাবে কখনও আর কোনও বইতে উপস্থাপিত হয়নি।

তিনটি আয়ুধ যাযাবরের হাতে সম্যক নৈপুণ্যে ব্যবহৃত হত—উইট, স্যাটায়ার, হিউমার। সেই সঙ্গে সব রচনারই পৃষ্ঠপটে ছিল বিষয় সম্পর্কে প্রভূত অধ্যয়ন। সঞ্চিত তথ্যের নিপুণ বিশ্লেষণ আর উপস্থাপনার কুশলতা। সতর্ক সজাগ অধ্যয়নশীল মনের মধ্যে মিশে ছিল সমবেদনা, সহমর্মিতা আর সহানুভূতি। তার ফলে যাযাবর ওরফে বিনয় মুখোপাধ্যায়ের রচনা হয়ে উঠেছিল পদে পদে স্বাদু।

যাযাবরের অপর বৈশিষ্ট্য সাফল্যের পুনরাবৃত্তি না করা। প্রথম বই (দৃষ্টিপাত)-এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে সেই পথেই পরপর চার-পাঁচখানা বই লিখতে তাঁর ছিল না আগ্রহ। দৃষ্টিপাত বইটি দিল্লির সমাজ ও রাজনীতিনিয়ে রম্যপত্রাবলির সংকলন (বেল্-লেতর্স্)। দ্বিতীয় বইটি উপন্যাস 'জনান্তিক' (১৯৫১)। ১৯৫০ সালে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে 'দৃষ্টিপাত' দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে এবং লেখক বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা নরসিংহ দাস পুরস্কারে সম্মানিত হন। সুতরাং 'জনান্তিক' প্রকাশকালে তাঁর আসল নাম পাঠকসমাজ জেনে যায় এবং অনুধাবন করে 'দৃষ্টিপাত'-এর সূচনায় 'সংকলয়িতার নিবেদন' একটি কুশলী চাতুর্য। 'জনান্তিক' প্রকাশের পর লেখক উপন্যাস রচনা থেকেই সরে যান। তৃতীয় বই 'ঝিলম নদীর তীর' (১৯৫৫), প্রথমে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় কিশোর পত্রিকা 'মৌচাক'-এ। কিন্তু এটি কিশোরপাঠ্য বই বলে সরিয়ে রাখা যায় না। এ বই সকল ভারতীয়ের পাঠ্য। কাশ্মীর নিয়ে যে রাজনীতি ও হানাদারি আজও চলছে তার সূচনাকাহিনি এ বইটি। চতুর্থ বইটি প্রবন্ধসংকলন 'লঘুকরণ' (১৯৬৪)। এখানে পাই পদে পদে স্বাদুতা। যাযাবরের গল্প যেমন সুখপাঠ্য, প্রবন্ধও তেমন। এরপর পঞ্চম ও ষষ্ঠ বই দুটি গল্পসংকলন 'হ্রস্ব ও দীর্ঘ' (১৯৭৩), 'যখন বৃষ্টি নামল' (১৯৮৯)।

লেখকের প্রার্থনীয় সৌভাগ্য বিনয় মুখোপাধ্যায় পেয়েছিলেন — তাঁর পাঠকপ্রিয়তা ঈর্ষাযোগ্য। 'যাযাবর অমনিবাস' (দে'জ) প্রথম প্রকাশিত ১৯৮৩ সালে, পরবর্তী ছয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯৫, ১৯৯৭, ১৯৯৯, ২০০২ সালে। 'দৃষ্টিপাত'-এর বিক্রয় ঈর্ষাযোগ্য। তবু অবহেলে তা তিনি সরিয়ে দিয়েছিলেন। অর্জিত সাফল্যের পথ ছেড়ে অন্য পথে গিয়েছেন। আসলে, এই সাহিত্যচর্চা বিনয় মুখোপাধ্যায়ের গভীর জীবন-অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের সুচারু প্রকাশ। ঈর্ষণীয় সাফল্যে তাঁর মাথা ঘুরে যায়নি, পাঠকের সাগ্রহ কৌতূহল নিবৃত্তির বাসনা থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেছেন।

দুটি গুণের জন্য যাযাবরের রচনা সেদিন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, আজও করে। ধাবৎশক্তি সম্পন্ন ভাষা আর তীক্ষ্ণপর্যবেক্ষণ।

প্রথম বই 'দৃষ্টিপাত'-এই তার উদাহরণ প্রচুর পরিমাণে লভ্য। উইট, হিউমার, স্যাটায়ারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্যারাডক্স, এপিগ্রাম, বেথজ, অক্সিমোরন, অ্যালিগোরেশন। তার ফলে তাঁর কিছু কিছু বাক্য প্রবাদপ্রতিম হয়ে উঠেছে। কোনও গদ্যলেখকের পক্ষে এটা সামান্য কৃতিত্ব নয়।

'আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। তাতে আছে গতির আনন্দ, নেই যতির আয়েশ।'

'সাড়ে দশটার মধ্যে গোটা শহরটার সমস্ত পুরুষ নিষ্ক্রান্ত হলো পথে। সব পথের একই লক্ষ্য— সেক্রেটারিয়েট। বাবু পালাল পাড়া জুড়ালো, গিন্নি এল পাটে।'

'বিবাহ সে পরিপূর্ণতার লাইফ ইনসিওরেন্স নয়, গ্যারান্টি তো নয়ই। সে শুধু মীনস, সে এণ্ড নয়।....আগে প্রেম ও পরে বিবাহকে যাঁরা সমস্ত দাম্পত্য সমস্যার সমাধান জ্ঞান করবেন,

তাঁরা এখন ঠেকে শিখেছেন যে কোর্টশিপ করে বিয়েও ফুল প্রুফ নয়, যেমন নয় ইন্টারভিউ দিয়ে কর্মচারী নিয়োগ।'

এই ক'টি উদাহরণই যথেষ্ট। এইসব বাক্য হয়ে উঠেছে প্রবাদপ্রতিম। এই হয়ে ওঠার পিছনে ক্রিয়াশীল তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ আর কুশলী বাক্যনির্মাণ।

বস্তুত এই দুটি গুণেই সেদিন 'দৃষ্টিপাত' বাঙালি পাঠকের মনোহরণ করেছিল।

'দৃষ্টিপাত' বইটির সূচনায় আছে 'সংকলয়িতার নিবেদন'। এটা কেবল বিক্রয়ের জন্য চমকপ্রদ সূচনা নয়, এর পিছনে আছে সাবধানতা। বইটি যখন বের হয় তখনও ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেনি। লেখক ভারত সরকারের কর্মচারী, সুচনা দপ্তরের উচ্চপদস্থ অফিসার। ইংরেজ জাত সম্পর্কে নয়, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সম্পর্কে যেসব ক্ষুরধার মন্তব্য করেছেন সেগুলি রাজদ্রোহী মন্তব্য বলে বিবেচিত হতে পারত। তাই প্রকাশকালে লেখক ও প্রকাশককে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও স্বীকার্য, 'সংকলয়িতার নিবেদনের' অন্তরালে সক্রিয় কুশলী চাতুর্য, এবং আমার বিশ্বাস তা লেখকেরই রচনা। তা এখানে উদ্ধার করি।—

'এই রচনাটির একটু ভূমিকা আবশ্যক। ১৯৩৬ সালে একটি বাঙালী যুবক লন্ডনে ব্যারিস্টরি পড়িতে যায়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে গাওয়ার স্ট্রীটের ভারতীয় আবাসটি জার্মান বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হইলে আত্মীয়বর্গের নির্বন্ধাতিশয্যে যুবকটি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসে। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের আলোচনার প্রাক্কালে বিলাতের একটি প্রাদেশিক পত্রিকা তাহাকে তাঁহাদের নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে পাঠান। লন্ডনে অবস্থানকালে ঐ পত্রিকায় সে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখিত। দিল্লীতে যাইয়া যুবকটি তাহার এক বান্ধবীকে কতকগুলি পত্র লেখে। বর্তমান রচনাটি সেই পত্রগুলি হইতে সংকলিত। পত্রলেখক ও পত্রাধিকারিণীর একমাত্র একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রসঙ্গ ব্যতীত পত্রগুলির আর কিছুই বাদ দেওয়া হয় নাই, যদিও পত্রে বর্ণিত পাত্র-পাত্রীদের যথার্থ পরিচয় গোপনের উদ্দেশ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে নাম-ধামের পরিবর্তন অপরিহার্য হইয়াছে! এই স্বল্পপরিসর পত্ররচনার মধ্যে লেখকের যে সাহিত্যিক প্রতিভার আভাস আছে, হয়তো উত্তরকালে বিস্তৃততর সাহিত্যচর্চার মধ্যে একদা তাহা যথার্থ পরিণতি লাভ করিতে পারিত। গভীর পরিতাপের বিষয়, কিছুকাল পূর্বে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাহার অকালমৃত্যু সেই সম্ভাবনার উপরে নিশ্চিত যবনিকা টানিয়া দিয়াছে।'

'দৃষ্টিপাত' পত্রাবলির সংকলন। 'খণ্ডিতাকারে এই রচনাটি মাসিক বসুমতীতে বেরিয়েছিল। ১৩৫২ সালের আষাঢ় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকরূপে এবং ১৩৫৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম এগারটি পরিচ্ছেদ এবং ১৩০৩ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় তেরো ও চৌদ্দ পরিচ্ছেদ দুটি ছাপা হয়। দ্বাদশ পরিচ্ছেদটি এ বইতে নতুন যোগ করা হয়েছে।'

প্রকাশকের এই বিজ্ঞপ্তি থেকে বোঝা যায় তখন ভারতে ব্রিটিশরাজের পূর্ণ প্রতাপ ছিল। বইয়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সার স্টাফোর্ড ক্রিপসের দিল্লিতে আগমন ও প্রস্থানের উল্লেখ ও বিবরণ আছে। ক্রিপস্ দিল্লি এসেছিলেন ১৯৪১ সালের ২৩ মার্চ, চলে যান ১৯৪২ সালের ১২ এপ্রিল।

স্বাধীনতালাভের পূর্বেকার দিল্লিতে ক্রিপ্স ও ভাইসরয় বড়লাট লিনলিথগোর মধ্যে সম্পর্কটি মধুর ছিল না এবং বড়লাট তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। যাযাবর ইঙ্গিত করেছেন ক্রিপসের দৌত্য অসফল। পরবর্তীকালে Transfer of Power, Volume I-এ তার বিশদ বিবরণ আছে। 'লর্ড লিনলিথগো ক্রীপ্স দৌত্যের সাফল্য কামনা করেননি।' (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ)। এই মন্তব্য অভ্রান্ত বলে পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে। এতে লেখকের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু 'দৃষ্টিপাত'-এর পাঠকপ্রিয়তা সে কারণে ঘটেনি।

দিল্লির শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌র পরাজয় কীভাবে ঘটল, আক্রমণকারী ব্রিটিশের পরাক্রম ও নিষ্ঠুরতা কতদূর পর্যন্ত গিয়েছিল তা যেমন বর্ণিত, তেমনই পিছিয়ে গিয়ে সম্রাট শাহজাহান ও তার কন্যার শেষজীবনের কাহিনিও উপস্থাপিত। নয়া দিল্লির পত্তন, পরিকল্পনা ও নির্মাণের বিবরণ যেমন আছে তেমনই আছে ১৯৪২ সালে রাজধানী দিল্লির সমাজজীবনের আলেখ্য। এইসব কিছুর পিছনে সক্রিয় লেখকের ইতিহাস ও স্থাপত্য সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান, শাসক ও শাসিতের মানসিকতার উন্মোচন, এবং দিল্লিবাসী ভারতীয় তথা বাঙালি সমাজের নিপুণ আলেখ্যচিত্রণ। সর্বোপরি আছে মানবচরিত্রের নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ও তার কুশলী উপস্থাপন। সবের নিটফল পাঠকপ্রিয়তা।

'দৃষ্টিপাত' প্রকাশিত হয়েছে আজ থেকে ছাপ্পান্ন বছর পূর্বে। তবু আজও তার পঠনে পাঠকের ক্লান্তি ঘটে না। তার কারণ লেখকের গভীর অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ আর নিপুণ বিশ্লেষণ। তা সপ্রতিভ গদ্যে ব্যক্ত। এই সপ্রতিভতাই পাঠককে মজায়। কয়েকটি উদাহরণে তার পরিচয় পাই। সেক্রেটারিয়েটের বর্ণনা:

'ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়েটটি নবনির্মিত। শুধু সেক্রেটারিয়েট নয় এখানকার বাড়িঘর, পথঘাট, হাটবাজার সবই নতুন। নয়াদিল্লি শহরটা আপস্টার্ট, বারাণসী প্রয়াগ এমনকি কলকাতা মুর্শিদাবাদের মতোও ওর পশ্চাতে কোন ট্র্যাডিশন নেই। সে হঠাৎ টাকা-করা ওয়ার কন্ট্রাক্টর, সাত পুরুষের বনেদি জমিদার নয়। কিন্তু যুগটাই যে ভুঁইফোড়দের। এ যুগে জুড়ি গাড়ির চাইতে বেবী-অস্টিন, সাত লহরীর চাইতে মফ্‌চেন এবং খেয়াল গান অপেক্ষা গজলের আদর বেশী। বিত্ত হলেই হলো, নাই বা রইল বৈভব। মাঝখান দিয়ে প্রশস্ত পথ কিংসওয়ে, ভাইসরয়'স হাউসের লৌহদ্বার অবধি

প্রসারিত। তারই দু'পাশে সেক্রেটারিয়েটের দুই মহল, — নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লক। আকৃতি, রং, রেখা, গঠনভঙ্গি হুবহু এক। যেন ময়রার দোকানে 'আবার খাবো' বা জলতরঙ্গ ছাঁচে গড়া এক জোড়া সন্দেশ। নর্থ ব্লকের সিঁড়ির মাথায় প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ পরিকল্পনাকার এডুইন লুটীনস এবং তাঁর সহযোগী সার হার্বার্ট বেকারের নাম।........

সেক্রেটারিয়েট দালানে হিন্দু পদ্ধতিরও চিহ্ন আছে,— সারনাথে দৃষ্ট অশোকস্তম্ভের অনুকরণে গঠিত স্তম্ভগুলিতে। আছে প্রবেশ-তোরণ ও অন্যান্য অংশে হস্তী ঘন্টা প্রভৃতি অলংকরণের। তারই সঙ্গে আছে মুসলিম স্থাপত্যরীতির পাথরের জালি, ফতেপুর সিক্রিতে চিস্তির কবরে যার বহুল নিদর্শন। রাজমিস্ত্রিরা বেশীরভাগই এসেছে জয়পুর, রাজপুতানার অন্যান্য স্থান এবং আগ্রা থেকে। জনশ্রুতি এই যে, তাদের মধ্যে অনেকে ছিল তাজ নির্মাতাদের উত্তরপুরুষ। নর্থ এবং সাউথ, দু'ব্লকেরই মাথায় বিরাট গম্বুজ, অনেকটা রোমের সেন্ট পল গির্জার অনুরূপ, যদিও এতে কিছুটা মুসলিম স্থাপত্যের ছাপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। চোখে দেখে মনে হয় না যে, গম্বুজ দুটির উচ্চতা কুতুবশীর্ষ থেকে মাত্র একুশ ফুট কম। দুটি ব্লকে মিলিয়ে সেক্রেটারিয়েটে কক্ষ আছে প্রায় এক হাজার, সব ক'টি মিলিয়ে বারান্দার দৈর্ঘ্য হবে প্রায় আট মাইল। ইলাহী কাণ্ডই বটে।'

নয়া দিল্লির রাজপথ-পার্ক ও পুষ্পশোভার বর্ণনা :

'এ শহরে ফুলের অভাব নেই। পথের দু'পাশে সরকারী বাংলোগুলির বিস্তৃত অঙ্গন পুষ্পসম্ভার সমৃদ্ধ, পথচারণে দৃষ্টি মুগ্ধ হয়। রাস্তার চৌমাথায় বৃত্তাকৃতি পার্কগুলিতে আছে ফুলের কেয়ারী। ডাকঘরের গায়ে, হাসপাতালের মাঠে, ফুটে রয়েছে প্রচুর মরসুমী ফুল। কনট প্লেসে আছে 'ক্যানা' ফুলের ঝাড়। শীতের দিনে পুষ্পাভরণের অজস্রতা কল্পনা করা যায় গ্রীষ্মের ভগ্নাবশেষ দেখেই। নয়াদিল্লীর আকাশে আছে বৈরাগীর দৃষ্টি, বাতাসে আছে নিঃস্বের হতাশ্বাস, মাটিতে আছে তপস্বিনীর কাঠিন্য। কিন্তু তার পথপার্শ্বে সযত্নরোপিত তরুশ্রেণী পথচারীর জন্য প্রসারিত করেছে ছত্রছায়া, তার শ্যামল তৃণাবৃত পার্ক বিছিয়ে দিয়েছে হরিৎ অঞ্চল, তার বহু বিচিত্র কুসুমের দল রচনা করেছে বর্ণাঢ্য ইন্দ্রজাল। প্রণয়ীযুগলের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল আবেষ্টন আছে নয়াদিল্লীতে। সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকারে তার জনবিরল, ধ্বনিবিরহিত গন্ধ-আমোদিত পথে পাশাপাশি চলতে গিয়ে সদ্যবিবাহিত তরুণ-তরুণীর হৃদয় হয় উদ্বেল, কণ্ঠ হয় ক্ষীণ, চুপি চুপি বলতে অভিলাষ হয় অত্যন্ত তুচ্ছ কোনো কথা, যার না আছে অর্থ, না আছে সঙ্গতি, না আছে প্রয়োজন। এবং সেই স্তব্ধ সায়াহ্নে একজনের ঝুমকা-দোলানো কানের অত নিকটে আর একজনের মুখ আনতে গেলে তা' দু'-একবার লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়াও একেবারে বিচিত্র নয়।'

বাঙালি মেয়ের অগ্নিপরীক্ষার (পাত্রীনির্বাচনকালে) বর্ণনা :

এদেশে সর্বগুণান্বিতা হবার দাবী মেয়েদের উপরে। বিবাহযোগ্যা কন্যাকে হতে হবে বিদুষী, কলাবতী, সুধীরা ও গৃহকর্মনিপুণা। যে মেয়ে ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি.এস.সি. পাশ করেছে তাকেও কার্পেটে ফুল তোলা শিখতে হয়, বড়ির ফোড়ন দিয়ে মোচার ঘন্ট রাঁধতে জানতে হয় এবং সম্ভবপর বরের বন্ধুদের সামনে কনে বাছনির সময় মহাত্মা গান্ধীর একটি অতি পরিচিত ফটোর ভঙ্গিতে মাদুরে বসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরতে হয়— 'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী তারে' ইত্যাদি। বিবাহের দরবারে পুরুষের কাছে প্রত্যাশা সামান্য। ডাক্তার বরের মাসিক আয়ের খোঁজ নিয়েই মেয়ের মায়েরা খুশি থাকেন, তার ক্রীড়া-দক্ষতা, অভিনয় পারদর্শিতা কিংবা বক্তৃতা শক্তি নিয়ে মাথা ঘামান না। ছেলেরা করবে শুধু একটা। হয় লেখাপড়া, নয় ফুটবল, নয়তো ইনকেলাব জিন্দাবাদ। মেয়েদের বিচার কোনো একটা মাত্র কৃতিত্বে নয়, সব কিছু মিলিয়ে। তাদের দাম প্রথমতঃ রূপে, তারপর তাদের বিদ্যায়, তাদের সঙ্গীতে, তাদের নৃত্যে, তাদের সূচীশিল্পে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের পিতৃকুলের ব্যাঙ্কব্যালেন্সের পরিমাপে।'

দিল্লির বর্ণনা আর বাঙালিসমাজে পাত্রীনির্বাচন পরীক্ষার বিবরণদানে লেখকের নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ও তার সপ্রতিভ উপস্থাপনা পাঠককে টানে। পঞ্চাশ বছর বাদে এইসব ছবি খুব-একটা বদলায়নি। দিল্লিনগরী এখন আরও জনবহুল হয়েছে, কিন্তু রাজপথের শোভা বদলায়নি। আর বাঙালি পাত্রীনির্বাচনের কৌশলটা ঈষৎ বদলেছে, মূল ব্যাপারটা বদলায়নি।

এখানেই দৃষ্টিপাত-এর লেখকের জিত।

১৮৫৭ সালে ব্রিটিশের দিল্লি অভিযান ('দৃষ্টিপাত') আর ১৯৪৭ সালে কাশ্মীর থেকে হানাদার বিতাড়নে ভারতীয় সেনার অভিযান ('ঝিলম নদীর তীর') : এ দুটি ছবি পাশাপাশি রাখলে যাযাবরের গভীর ইতিহাসনিষ্ঠা আর সেই ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলার শিল্পসামর্থ্য, এ দুই গুণের পরিচয় পাই।

লেখকের তৃতীয় গ্রন্থ 'ঝিলম নদীর তীর' বইটি, পূর্বেই লিখেছি, কেবল কিশোর পাঠ্য নয়, সব বয়সের সব ভাষাভাষী ভারতীয়মাত্রেরই পাঠ্য। এ বই আজও প্রাসঙ্গিক, কারণ কাশ্মীর নিয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রনায়কদের মূঢ়তার দাম আজও আমাদের দিতে হচ্ছে। অথচ সেদিন ভারতীয় সৈন্যরা কী অসমসাহসে কী অবিশ্বাস্য অভিযান চালিয়ে কাশ্মীরকে করেছিল হানাদার মুক্ত।

লেখক গ্রন্থসূচনায় দুটি কাজ করেছেন। তথ্যসংগ্রহ কাজে যেসব বই পুরনো দলিল ও সরকারি মুদ্রিত বিবরণীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে তার একটি অবশ্য উল্লেখ্য তালিকা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী সমকালীন ব্যক্তিদের প্রতি। তালিকাটি এই রকম :

'হোয়ার থ্রি এম্পায়ার্স মিট (ই.এফ.নাইট); জম্মু অ্যাণ্ড কাশ্মীর টেরিটরিস (ফ্রেডরিক ড্রু); গোলাব সিং (কে. এম. পানিকর), রেমনিসেন্স অব এ বেঙ্গল সিভিলিয়ান (উইলিয়ম এডোয়ার্ডস); ডিফেন্ডিং কাশ্মীর (পাবলিকেশন্স ডিভিশন); কনডেমড আনহার্ড (অজ্ঞাত); ডেসপাচেস টু দি সেক্রেটারি অব স্টেটস (এইচ.এম.ডুরান্ড); হিস্টরি অব দি শিখস (কানিংহাম) : ইউ. এন কমিশন্স রিপোর্ট ; মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন (এ. ক্যাম্পবেল জনসন); হোয়াইট পেপার অন কাশ্মীর (গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া); শেখ মহম্মদ আবদুল্লা; মাননীয় জি.এম. সাদেক ও মিসেস রাজেন্দ্র সিং।

লক্ষণীয় কত গভীর অধ্যয়ন ও বিচারের মধ্য দিয়ে লেখককে যেতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর শ্রমজনিত ঘর্মের বিন্দু রচনায় কোনও ছাপ ফেলেনি, উল্টে লেখক পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন এক রোমাঞ্চকর রুদ্ধশ্বাস দ্রুতগতি কাহিনি। রাজনৈতিক ও সামরিক অভিযানের সারাৎসার নিয়ে গড়ে তুলেছেন 'ঝিলম নদীর তীর'।

কাহিনি শুরু হবার পূর্বমুহূর্তে উদ্ধার করেছেন 'মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন' গ্রন্থের লেখক অ্যালান ক্যাম্পবেল জনসন-এর একটি উক্তি :

Mountbattan says, as a military operation, the speed of the fly in on the 27th October left our SEAC efforts standing.

দ্বিতীয় বিশ্বসমরে মিত্রশক্তির দক্ষিণপূর্ব এশিয়া কম্যান্ডের সর্বাধিনায়ক লর্ড মাউন্টব্যাটেন এখানে স্বীকার করেছেন, হানাদারদল এগিয়ে আসছে, শ্রীনগরের বিমানপত্তন তখন সরু এক ফালি পিচ্, সেখানেই অসম্ভব সাহসে নেমেছেন ভারতীয় সৈন্যদের তিনটি ডাকোটা (সাতাশে অক্টোবর ১৯৪৭-র ভোরবেলা)।

এবার ভারতীয় সেনার হানাদার বিতাড়ন অভিযানের বর্ণনার অংশবিশেষ:

১৯৪৭-এর ৭ই নভেম্বর। রাত তখনও শেষ হয়নি। ব্রিগেডিয়ার এল.জি. সেন (জন্মসূত্রে বাঙালি) হুকুম দিলেন 'ফরোয়ার্ড মার্চ'। এতদিন ছিল আত্মরক্ষার লড়াই। এবার আক্রমণের পালা। শ্রীনগরের অদূরবর্তী বাদগামে থানা গেড়ে বসে আছে হানাদার বাহিনী। তাদের মেজাজ খুশ, কারণ বাদগামের যুদ্ধের পরে এ পর্যন্ত ভারতীয় সৈন্যদের আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। 'এমন সময় হারে রে রে রে'—

এই ভূমিকার পরেই ভারতীয় সৈন্যদের প্রথম আক্রমণের বিবরণ : 'বিনা বাধায়-ই হানাদারেরা ক্রমশ: এগিয়ে এসেছে বারমূলা থেকে পাটান। পাটান থেকে সেলাটাং। শ্রীনগর শহরের প্রায় দোরগোড়ায়। এখন রাজধানী শ্রীনগর তাদের নাগালে। ঠিক যেন গাছের নীচু ডালে ঝুলছে লাল টুকটুকে পাকা আপেলটি। শুধু হাত পাড়িয়ে তুলে নেওয়ার অপেক্ষা। অনেক রাত জেগে সর্দার তাই ইয়ার-দোস্ত নিয়ে আমোদ ফুর্তি করেন। কখনও মনের সুখে গোঁফে লাগান চাড়া। কখনও বা গন্ধ-ভরা রুমাল হাতে নিয়ে সহস্রবার দাড়িতে দেন ঝাড়া। শেষ রাত্রির দিকে সর্দারের ঘুমটা জাঁকিয়ে এসেছিল। স্বপ্ন দেখছিলেন।— যেন শ্রীনগর দখল করে মহারাজকে কোতল করেছেন। মহারাণীকে করেছেন বাঁদী। তাকিয়া ঠেস দিয়ে সোনার গড়গড়ায় রুপোর নলে অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া খাচ্ছেন আরামে। হঠাৎ শোনেন "হারে রে রে রে—।"

ভারতীয় বাহিনী আক্রমণ করেছে ভীষণ বেগে। চমকে উঠে বসে বললেন, " অ্যাঁ, যুদ্ধ? সে কী?"

চোখ রগড়ে চারদিকে তাকিয়ে শেষটায় হাঁক দিলেন, "বন্দুক লাও।" লাও তো বটে! কিন্তু আনে কে? হট্টগোলের মধ্যে হানাদারেরা কেউ খুঁজছে হাতিয়ার, কেউ খুঁজছে পোশাক কেউ বা দিশেহারা হয়ে অনর্থক ছুটোছুটি করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যেই কপালে খেল ঠোক্কর, মাথায় পেল চোট। ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে পারার আগেই কচুকাটা হয়ে গেল অনেকে। ব্রিগেডিয়র সেন আগেভাগে একদল সৈন্যকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন উত্তরে, আর একদলকে দক্ষিণে। মাঝখানে ছিল মূল পদাতিক বাহিনী। ত্রিভুজের তিনটি বাহুর মতো তিন দল সৈন্য একসঙ্গে আক্রমণ করল হানাদারদের। তিনদিক দিয়ে ঘেরাও হয়ে লড়াই করা চলে কতক্ষণ? কয়েক ঘন্টার মধ্যেই হানাদরেরা কাবু হয়ে পড়ল। তার উপরে—।

এ কী, মেশিনগানের আওয়াজ শোনায় যেন! হানাদারেরা তখন দিল সোজা চম্পট। দৌড়, দৌড়, চোঁচা দৌড়। কমান্ডার দেখলেন মহা বিপদ। দলের লোকেরা এভাবে পালাতে শুরু করলে যুদ্ধ করবেন কাকে নিয়ে? তিনি তাদের ফেরাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "ভাইজান, তোমরা পিছু হটছ কেন? মনে হিম্মৎ রাখ, হিন্দুস্থানী কাফেরগুলি এখুনি ঘায়েল হবে। একটু পরেই শ্রীনগর আমাদের কব্জায়। জিহাদ হাসিল কর—"

কে শোনে কার কথা । হানাদারেরা বলে, "আরে রাখো মিঞা, তোমার শ্রীনগর। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। জান যায়, তায় জিহাদ!" তাড়াতাড়ি পালাতে লাগল তারা যার যে দিকে দু'চোখ যায়। কিন্তু যেদিকে সেদিকে যাওয়ার কি জো আছে? ভারতীয় সৈন্যরা আছে যে তিন দিকেই। খোলা একমাত্র পিছনের পথ। যে পথে হানাদারেরা হানা দিয়েছিল শ্রীনগরের পানে। উল্টে সে পথেই ঊর্ধ্বশ্বাসে পিছু হটল তারা। পিছনে মরে পড়ে রইল তাদের শ'তিনেক সঙ্গী। কিছু রেখে গেল লুঠের মাল, কিছু ফেলে গেল যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম। প্রাণের মায়ায় ছোটা,—বড় বিষম ছোটা। পড়ি তো-মরি করে ছুটতে ছুটতে হানাদারেরা সেলাটাং থেকে পালালো পাটানে। পাটান থেকে বারমূলায়। উল্লাসে

ভারতীয় বাহিনী পিছনে ধাওয়া করল তাদের। কিন্তু শহরে যাত্রীচলার মোটর বাসগুলি কত আর জোরে চলতে পারে? তবুও সৈন্যদলের ড্রাইভারেরা চেষ্টা করল প্রাণপণ। গাড়ির এক্সিলারেটরটা ডান পায়ে চেপে ধরল পুরোপুরি। স্পিডোমিটারের কাঁটাটা, চল্লিশ থেকে লাফিয়ে উঠল পঞ্চাশে। পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন। সৈন্য বোঝাই জানলা খড়খড়িগুলি কাঁপতে লাগলো সশব্দে। স্টিয়ারিংটা ধরতে হলো শক্ত মুঠোয়। 'চালাও, চালাও জোরসে।'' হাঁকতে লাগল ভারতীয় সৈন্যদলের সেনানায়ক।' ('ঝিলম নদীর তীর')

ব্রিটিশ সেনার দিল্লিদুর্গ আক্রমণ (দৃষ্টিপাত) আর ভারতীয় সেনার বারমূলা-পাটান-সেলাটং-এ পাকিস্থানি হানাদারের বিরুদ্ধে অভিযান ('ঝিলমনদীর তীর')—দুই সামরিক অভিযানের বিবরণে অবলম্বিত হয়েছে একই চিত্রময় দ্রুতগতি রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা-কৌতূহল মিশ্রিত গদ্যরীতি। যাযাবরের এই গদ্যরীতির পরিচয় ঈষৎ পূর্বেই দিয়েছি। তফাত কেবল একটি জায়গায়- পরিবেশ রচনায়। বৃদ্ধ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌র বিরুদ্ধে ইংরেজ-অভিযান আর কাশ্মীরে পাকিস্থানি হানাদার- বিতাড়নে ভারতীয় অভিযান-এ দুয়ের বাতাবরণ এক নয়। প্রথমটিতে ছেয়ে আছে এক ধরনের বিষণ্ণতা, তার মূলে আছে ভারতীয়দের দেশপ্রেম আর ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ। দ্বিতীয়টিতে আছে এক ধরনের উৎসাহ (উল্লাস), তার মূলে সক্রিয় ভারতীয়দের দেশপ্রেম ও পাকিস্তানি হানাদারদলের ঘৃণা। দুটি ক্ষেত্রেই লেখক সফল।

লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'জনান্তিক' একমাত্র উপন্যাস। এর পূর্বে ও পরে যাযাবর আর উপন্যাসরচনায় আগ্রহ দেখাননি। হয়ত তাঁর মনে হয়েছে উপন্যাস তাঁর স্বক্ষেত্র নয়। 'বেল-লেতর্স') রম্য পত্রাবলি 'দৃষ্টিপাত' আর প্রবন্ধ ও ছোটগল্পই তাঁর স্বক্ষেত্র। বস্তুত তাঁর প্রবন্ধ ও ছোটগল্পে ভেদ বিশেষ নেই। ছোটগল্প রচনায় যে তাঁর হাত আছে তা তিনি অনুধাবন করেছিলেন সুনন্দা ও চারুদত্ত আধারকার কাহিনিতে ('দৃষ্টিপাত' গ্রন্থভুক্ত), কিন্তু তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করেননি। আমার মনে হয়, যাযাবর ওরফে বিনয় মুখোপাধ্যায় যে মানসিকতার অধিকারী, তার সঙ্গে শরৎচন্দ্রীয় মানসিকতা খাপ খায় না। সুনন্দা-চারুদত্ত আধারকার কাহিনিটি রোমান্টিকতা ভাবাবেগ সর্বস্ব ''দেবদাস'' কাহিনিতে পর্যবসিত করার অভিপ্রায় লেখকের ছিল না। আধারকার কাহিনির শেষে ('দৃষ্টিপাত-এর শেষাংশ) লেখক আধারকারকে দ্বিতীয় দেবদাস বানাননি, এটা পাঠকের পরম সৌভাগ্য। সুনন্দার সঙ্গে আধারকারের প্রেমবিনিময় (যা সুনন্দার পক্ষে খেলা বা অভিনয় মাত্র) কাহিনি আধারকার লেখককে বলেছেন এবং আত্মকাহিনি শেষ হওয়ামাত্রই উঠে চলে গেছেন। অবশ্য আধারকার সকরুণ স্বীকারোক্তি করেছেন—''মিসি সাহেব আমি ইডিয়টই বটে। পরিহাসকে মনে করেছি প্রেম, খেলাকে ভেবেছি সত্য।'' আধারকারের শেষ কৈফিয়তকে লেখক বলেছেন, 'অতি দুর্বল সান্ত্বনা'। পাঠকের সৌভাগ্য, আধারকার যতই ককটেল-বিশেষজ্ঞ হোন না কেন লেখক তাকে দেবদাসের মতো মদ খেয়ে বিলাপ করার অবকাশ দেননি। তাই বিনয় মুখোপাধ্যায় নন শরৎ চাটুজ্জে; সে কারণেই কাহিনি শেষে লিখতে পেরেছেন: ''আধারকার হচ্ছেন সেই শ্রেণীর পুরুষ, যাঁরা কিছুই হাতে রাখতে জানেন না। এঁদের কপালে দুঃখ অনিবার্য। পলিটিক্সের মতো মানুষের জীবনও হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট আর কম্প্রমাইজ। এ দারুণ ইনফ্লেশনের বাজারেও সংসারে শুধু হৃদয়ের দাম খুব বেশি নয়।'' প্রেমিক আধারকারকে লেখক বলেছেন, 'কাণ্ডজ্ঞানহীন হতভাগ্য।' এর বেশি কিছু লেখক তাকে দেননি।

তাই একমাত্র উপন্যাস 'জনান্তিকে' লেখক পাঠককে পথের শেষে কোনও সান্ত্বনা-মরূদ্যানে পৌঁছে যাবার আশ্বাস দেননি। এ উপন্যাসের নায়িকা মলী সেন। তার জীবনআলেখ্য তার আপন উক্তি, আচরণ ও কর্মের মধ্য দিয়েই উদঘাটিত হবে বলে লেখক আশ্বাস দিয়েছেন পাঠককে। তার বেশি কিছু করতে চাননি, কারণ তাঁর কথায়, 'সবাক চিত্রের তো কমেন্টারী প্রয়োজন হয় না'

মহানগরীর এক ক্লাবে লেখক যোগ দিয়েছিলেন শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ এবং অনুরাগী পাঠকদের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রেরণায়। সেখানেই দেখা পেয়েছিলেন 'জনান্তিক' উপন্যাসের নায়িকা মিসেস মলী সেনের। এই ক্লাবটিতে নানা ধরনের নরনারীর অভাব ছিল না। বিপত্নীক অফিসার, স্বামীপরিত্যক্তা রমণী, বিগতযৌবনা কুমারী, রূপহীনা তরুণী এবং অবিবাহিত প্রৌঢ় ব্যক্তিরা ক্লাবে আসর জাঁকান। আর ছিল বিলাত-প্রত্যাগত তরুণ ব্যারিস্টার, নতুন বিত্তশালী ব্যবসায়ী, সদ্য আলোকপ্রাপ্ত মারোয়াড়ি নন্দন ইত্যাদি।

মলী সেনের হৃদয় আছে, আশা আছে, আসক্তি আছে, এবং সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ভালবাসা আছে। ভালবাসায় তিনি আপন স্বামীকে জয় করতে পারেননি, অন্যকে আকর্ষণ করেছেন। এখানেই তাঁর ট্র্যাজেডি— তাঁর প্রবল আসক্তি ঝঞ্ঝার মতো আসে, আবার চলেও যায়। তাই তিনি রিক্ত, নিঃসঙ্গ, বুভুক্ষু। অপরিমেয় গ্লানি বহন করে বেঁচে রইলেন মলী সেন। এটাই তাঁর ট্র্যাজেডি।

যাযাবরের 'লঘুকরণ' (সেপ্টেম্বর ১৯৬৪) আটটি নিবন্ধের সমাহার— 'রামগরুড়ের ছানা', 'খাপছাড়া', 'স্ত্রীষু', 'রাজকুলেষু চ', তির্যক অক্ষি', 'কালকের পোষাক', 'মীমাংসা', 'নাম্নী'।

এগুলিকে প্রবন্ধ বলা যাবে না। কারণ প্রকৃষ্ট বন্ধনের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি আনুগত্য, পূর্বপক্ষ উত্তরপক্ষের বক্তব্যের উপস্থাপনা ও তাদের বিচার, এবং শেষে বক্তব্যকে গুছিয়ে এনে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রবণতা এই নিবন্ধগুলিতে নেই। বস্তুত এগুলিকে 'loose sally of the mind' বলা যায়, এবং রম্যরচনার পথেই লেখকের পদচারণা।

সেনর মিশেল দ্য মঁতেন যে-ধরনের নতুন সাহিত্যপ্রয়াস (essay) করেছিলেন তা থেকে তৈরি হয় 'Essay' কিন্তু এখন আমরা essay বলতে যা বুঝি তা মঁতেন লেখেননি। বাংলায় এ ধরনের লেখায় প্রথম সাফল্য অর্জন করেছিলেন বীরবল ওরফে প্রমথ চৌধুরী। তারপর অনেকে তা লিখেছিলেন যেমন বুদ্ধদেব বসু। তা ছাড়া আরও অনেকের নাম উল্লেখ করা যায়। যাযাবর ওরফে বিনয় মুখোপাধ্যায় এই ধরনের রম্যনিবন্ধ লিখেছেন যার উৎস **'wisdom in a smiling mood'**, সস্মিত প্রজ্ঞা। এ ধরনের রম্য নিবন্ধের সংকলন প্রমথ চৌধুরীর 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৭), 'নানা কথা' (১৯১৯), 'বীরবলের টিপ্পনি (১৯২৯)। বীরবলের একটি বইয়ের নাম 'খেয়াল খাতা' (১৯০৫)। এর সূচনায় প্রমথ চৌধুরী লেখেন, 'করুণরসে ভারতবর্ষ স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে; আমাদের সুখের জন্য না হোক স্বাস্থ্যের জন্যও হাস্যরসের আলোক দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক।" এ হাস্যরসের উৎস প্রাণের স্ফূর্তি, তা কখনও তির্যক কটাক্ষ, কখনও বিদ্রূপের ঝলক, কখনও বা অম্লমধুর দৃষ্টিক্ষেপ। যাযাবর 'লঘুকরণ'-এ সে কাজই করেছেন। ভূমিকাচ্ছলে লিখেছেন, "স্বর্গীয় সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোলের কৈফিয়ৎ শীর্ষক ভূমিকাটি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে বর্তমান পক্ষে প্রযোজ্য। যদিও পুরোপুরি 'যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব তাহা লইয়াই এ পুস্তকের কারবার' নয়, তবু এই গ্রন্থটিও খেয়াল রসের বই। সুতরাং সে-রস যাঁহারা উপভোগ করতে পারেন না এ পুস্তক তাহাদের জন্য নহে।'

প্রমথ চৌধুরী ও সুকুমার রায় খেয়াল রসের কারবারী, যাযাবরও সেই রসেরই কারবারী বলে নিজেকে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। 'লঘুকরণ'-এর আটটি রম্য-নিবন্ধ আমাদের সমাজ, ব্যক্তি, প্রশাসন ও নানা প্রতিষ্ঠান নিয়ে তির্যক বক্রকটাক্ষসমন্বিত অম্লমধুর টিপ্পনি। প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে হাসির আলো ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, সুকুমার রায়ও তা-ই করেছিলেন। যাযাবর তাঁদের পথেই চলতে চেয়েছেন।

প্রথম নিবন্ধের ('রামগরুড়ের ছানা') অংশবিশেষে এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

"বাংলাদেশে সাংবাদিক আছেন, সাহিত্যিক আছেন, কবি ও শিল্পী আছেন একাধিক। নেই কার্টুনিস্ট। কলকাতায় বাজারে ল্যাংড়া আম, হেঁসেলে রাঁধুনি এবং রাস্তায় ট্যাক্সি ড্রাইভারের মতো দৈনিক কাগজের সার্থক কার্টুনও বাংলার বাইরে থেকে আসে। প্রতিবাদের যুক্তি অনুমান করা কঠিন নয়। 'বাঙালীর অভাব, অনটন, বেকার সমস্যা, অবাঙালীদের বাঙালী বিদ্বেষ, দিল্লী সরকারের উপেক্ষা ইত্যাদি'— বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধের নিত্যকার অবলম্বন। অভাব, অনটন আছে। হয়তো বেশী পরিমাণেই আছে। কিন্তু পাটালি গুড় বা জামদানী শাড়ির মতো দুঃখ দৈন্য তো একমাত্র বাংলাদেশেরই নিজস্ব বিশেষত্ব নয়। দারিদ্র্যের তো কোনো সোল এজেন্সি নেই। উত্তর ভারতে দেখা যায়, মজুর মেয়েরা দিন শেষে গোধূলি বেলায় কর্মান্তে গৃহে ফিরছে। কেউ সারাদিন রাজমিস্ত্রীর কাজে ইট যোগান দিয়েছে, কেউবা মাটি কেটে পি-ডব্লিউ-ডির রাস্তা বানিয়েছে। কারো কাঁকালে শিশু কারো মাথায় পুঁটুলি বাঁধা বাজরা, কারো বা কাঁধে পথের পাশে কুড়িয়ে পাওয়া জ্বালানি কাঠের আঁটি। ঘাগরা দুলিয়ে বা আঁচল উড়িয়ে দল বেঁধে চলেছে। তাদের হাস্য পরিহাস এবং সম্মিলিত সঙ্গীতে পথঘাট আলোড়িত বললেই চলে। তাদের একটি সন্ধ্যার কাকলি কলরব দেখে বাঙালী পথিকের মুখব্যাদান দীর্ঘ হয়। বাজি রেখে বলা যায়, বল্লাল সেনের রাজত্ব কাল থেকে প্রফুল্ল সেনের আমল পর্যন্ত বাংলা দেশের মুটে মজুরেরা একযোগে এতখানি হাসেনি। অথচ অনাহার ও অনটন সেদেশে কিছু অশ্রুতপূর্ব নয়। রাজপুতনার অনেক অঞ্চলে ওজন করে জল কিনতে হয়। এবং সেটা জলের দরে নয়।

বাঙালি কেবল নিত্য অনটন দুঃখদুর্দশার কারণেই রামগরুড়ের ছানা- লেখক এ যুক্তি মানেন না। সচ্ছল শ্রেণীভুক্ত লোকেরাও তা-ই, একথা তিনি মনে করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর সরস অথচ সিরিয়াস উক্তি—

"আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় আনন্দের অভাব সম্পর্কে অনেকেই সচেতন নন। তাঁরা তিরস্কারের যোগ্য নন, কৃপার পাত্র। কিন্তু ও নীরস, নিরানন্দ জীবনযাপনকে যাঁরা আমাদের সারবত্তার অর্থাৎ সিরিয়াসনেসের পরিচয় জ্ঞান করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন তাঁরা হয় আত্মপ্রতারক, নয়তো কাণ্ডজ্ঞানহীন। আলো জিনিষটা হাল্কা। কিন্তু সে তৃণলতায় যোগায় প্রাণ; জলে, স্থলে, অসীম নভোমণ্ডলে মাখায় রং। অন্ধকার গুরুভার। তাতে আছে কেবল ভয়। সে শুধু নীরস নয়, নিরেটও বটে। বসন্তে পীচের শাখায় অকারণ শিহরণ জাগিয়ে যে অজস্র ফুল ফোটে সেটা হিসেবী লোকের কাছে অনাবশ্যক চপলতা মনে হতে পারে। কিন্তু তারই পরিণতি ফল। বাবলার ডালে থাকে অসংখ্য কাঁটা। তাতে ফলের আশ্বাস নেই। আছে পট করে গায়ে বিঁধবার আশঙ্কা। সেটা যথেষ্ট সিরিয়াস সন্দেহ নেই, যদিও ভিন্ন অর্থে। বাস্তবিক, বিরসবদন মাত্রই বিদগ্ধ মনের প্রতীক নয়, ঠিক যেমন গেরুয়া বসন মাত্রই নয় সাধুত্বের গ্যারান্টি। সংসারে বেশীর ভাগ মুখই গোমড়া হয় বিজ্ঞতায় নয়, অজ্ঞতায়।"

যাযাবরের গল্পগ্রন্থ দুটি। 'হ্রস্ব ও দীর্ঘ' সাতটি গল্পের সংকলন। 'যখন বৃষ্টি নামল'- আটটি গল্পের সংকলন। স্বীকার্য, যাযাবরের রম্যনিবন্ধ পাঠে পাঠকের যে আনন্দ, তাঁর গল্পপাঠে একই আনন্দ, এবং পত্রাবলিমূলক 'দৃষ্টিপাত' পাঠেও সেই আনন্দ। সে কারণে গল্পগুলির মেজাজ বোঝার জন্য স্বতন্ত্র আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। পনেরোটি গল্পই সুখপাঠ্য। কেবল পাঠকের হৃদয়ের প্রতি, মননের প্রতিও তাদের আবেদন। কড়া, মিঠা, কড়ামিঠা, ঝাল, নোনতা, লবণাক্ত, অম্লতা— সবই পাওয়া যাবে। যাযাবরের গল্পে আছে **whip-crack ending**, চাবুকমারা সমাপ্তি, আর অম্লমধুর ভাষায়

উপস্থাপনা।

এগুলির মধ্যে একটি গল্প 'সরীসৃপ' স্বতন্ত্র। এমন গল্প যিনি লিখতে পারেন তাঁর শিল্পসামর্থ্য স্বীকার না করে উপায় নেই।

গল্পের মধ্যে শিল্প। গল্পকথক যে 'আমি', সে বিলাত প্রবাসী বাঙালি ছাত্র ছুটি কাটাতে ব্রিটেন থেকে ফ্রান্সে যাচ্ছে জলপথে। সেই বাঙালি ছাত্রের সঙ্গে জাহাজের 'ডেকে' আলাপ হল এক প্রবীণ মিশুক ইংরেজের সঙ্গে, যিনি একদা পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ রাজপুরুষ হিসাবে চাকুরি করেছেন অর্থাৎ ভারতীয় প্রজাকুলকে শাসন করেছেন। তাঁর কর্মজীবনের এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা এই গল্পটি। গল্পের সূচনায় সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার আভাস নেই। যাযাবর সুলভ উপস্থাপনায় স্টিমারের সঙ্গে গল্পও চলতে শুরু করেছে। যাত্রা সূচনাটি মনোরম। তা বাদ দিয়ে গল্পটি উপভোগ করা যায় না। এ গল্পের মূলে আছে anti-climax। মনোরম সূচনায় তার আভাসমাত্র নেই।

প্রাক্তন ব্রিটিশ রাজপুরুষ তাঁর বাঙালি শ্রোতাকে নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ারে চাকুরিকালীন একটি গল্প শোনালেন। সে গল্প অসাধারণ, তাঁর অভিজ্ঞতাও অসাধারণ। মিস্টার জন পার্সিভেল ফেয়ারওয়েদার সি.আই.ই., আই.সি.এস. (রিটায়ার্ড)-এর অলিখিত অটোবায়োগ্রাফির একটি অধ্যায়।

সংক্ষেপে লিখি। যে বছর ফেয়ারওয়েদার নর্থ ওয়েস্টার্ন ফ্রান্টিয়ারে উপজাতি এলাকায় তাঁর কাজে যোগ দিলেন কিছুদিন আগে থেকেই উপজাতীয় একটা বিদ্রোহী দলের সঙ্গে গভর্নমেন্টের সংঘর্ষ চলছিল। বিদ্রোহী উপজাতি দলের প্রধানকে সবাই বলে সুপীনের ফকির। সে গরিবের বন্ধু, ধর্মপরায়ণ, ব্রিটিশবিরোধী। খুন, লুঠতরাজ লড়াইয়ে তার জুড়ি নেই। পেশোয়ারে বসে থাকলে তাকে ধরা যাবে না। দুদিকে উঁচু পাহাড়ের মাঝখানে সংকীর্ণ গিরিপথে যে সওদাগরেরা আসা যাওয়া করে তারা সুপীন ফকিরকে সেলাম এবং সেলামি না দিয়ে পার পায় না। পর পর দুজন ব্রিগেডিয়ার খতম হলেন। তখন তরুণ আই.সি.এস. ফেয়ারওয়েদার যেচে এই দায়িত্ব নিয়ে লন্ডিকোটালে পৌঁছলেন। বুঝতে পারলেন উপজাতীদের ভাষা না শিখলে তাদের সঙ্গে মিত্রতা বা বৈরিতা কোনওটাই সম্ভব নয়। সাহেবের নৌকর বলতে দু'জন- বাবুর্চি ডিসুজা গোয়ানিজ। দ্বিতীয় জন, দীন মহম্মদ, এক কিশোর, তিন কুলে কেউ নেই। ফেয়ারওয়েদারের খুব পছন্দ দীন মহম্মদ। বয়স বারো বা তেরো। সে রান্না ছাড়া সাহেবের বাকি সব কাজই করে। কাজে ও বুদ্ধিতে হুঁশিয়ার। ফেয়ারওয়েদার সাহেবের মোটর বাইকটার প্রতি ছোকরার সব চেয়ে বেশি যত্ন ও মনোযোগ। ফেয়ারওয়েদার কঠোর হাতে বিদ্রোহী নির্মূল করতে শুরু করলেন। এদিকে দীন মহম্মদ লুকিয়ে লুকিয়ে ফটফটিয়া (মোটর সাইকেল) চড়ে। গভীর রাতে সাহেবের মোটর বাইক নিয়ে চড়ে। হঠাৎ একদিন সাহেব দীন মহম্মদের এই নৈশবিহার টের পেলেন। পরদিন সকালে সাহেব তার নৌকরি খতম করে দিলেন। আপিস ঘরে এসে শুনলেন দীন মহম্মদ চলে গেছে। সাহেব যার কাছে পস্তভাষা শিখতেন, সেই মুন্শিও বাড়ি চলে গেল। সে সাহেবকে দুদিন দুটি প্রবাদ বলে গেছে: 'দুনিয়ায় ঘটনার সীমা নেই; সীমা আছে শুধু ধারণার।' এবং 'স্ত্রীলোক এবং বালক দুই-ই সরল; কিন্তু প্রলোভনে পড়ে যদি পা পিছলোয় তবে তাদের হঠকারিতার সীমা থাকে না।' শুনে ফেয়ারওয়েদার সাহেব শুধু হেসেছিলেন। ছোকরা দীন মহম্মদকে বিদায় দিয়ে ফেয়ারওয়েদার সাহেবের মনটা খারাপ হল।

লান্ডিকোটালের টার্ম শেষ হয়েছে, এবার সাহেব পেশোয়ার বা দিল্লি ফিরে যেতেই পারেন। সব অশান্তি দমন করেছেন, কিন্তু সুপীন ফকিরকে জীবিত বা মৃত ধরা যায়নি। তাকে ধরার জন্য সরকার ঘোষণা করলেন ইনাম (পুরস্কার)।

অনেক দিন পরে হঠাৎই একদিন দীন মহম্মদ এসে হাজির। সে সাহেবের বাবুর্চি ডি-সুজার কাছে শুনে গেল বিদ্রোহী ফকিরকে ধরতে বা মারতে পারলে মিলবে দু'হাজার টাকা ইনাম। দু'দিন পরে খবর এল, লান্ডিকোটালের দু'মাইল উত্তরে পাহাড়ের ওপারে ফকীরকে কে একজন গুলির আঘাতে ঘায়েল করেছে।

টাকা নিতে যে এল তাকে দেখে ফেয়ারওয়েদারের দু'চোখে পাতা পড়ে না। সেই ছেলেটা— দীন মহম্মদ। সাহেব তাকে গুনে গেঁথে দু'হাজার টাকা দিলেন। সে গুনে এগারশো টাকা রেখে বাকিটা ফিরিয়ে দিল। সে জানাল, পেশোয়ারে একটা ফট্‌ফটিয়া (মোটর সাইকেল) দেখে রেখেছে। দাম এগারশো টাকা। কালই তা কিনতে রওনা হবে। দু'হাজার টাকাই তার প্রাপ্য—ভূতপূর্ব মনিব ফেয়ারওয়েদার তাকে বোঝালেন। দীন মহম্মদের তার দরকার নেই। মেহনত করে রোজগার করবে। বেশি টাকা দিয়ে হবে কী?

সাহেব কৌতূহল দমন করতে না পেরে শুধালেন - কেউ যা পারেনি, তুই তা পারলি কেমন করে?

দীন মহম্মদের মিনতি মাখা উত্তর - আমি মিথ্যা বলিনি, হুজুর। প্রমাণ চান তো —

সাহেব বাধা দিলেন, না তোকে আমি অবিশ্বাস করিনি। আমি শুধু জানতে চাই, তুই এমন অব্যর্থ নিশানা করলি কেমন করে? ফকিরের গতিবিধি কেউ সঠিক জানতে পারে না। সে যে ওই পাহাড়ের ঘাঁটিতে ছিল সে খবর তুই পেয়েছিলি কোথা থেকে?

দীন মহম্মদের উত্তর — বাঃ রে, সে তো খুব সহজ। সে যে আমার বাবা।

ফেয়ারওয়েদার সাহেবের মনে হল, তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে, বোধ হয় পড়ে যাবেন; পাছে পড়ে যান, দু'হাত দিয়ে চেয়ারের হাতল দুটো শক্ত করে ধরে ফেললেন।

পাঠক, বাংলাভাষায় এমন গল্প পড়েছেন? আমি তো পড়িনি। আপনি যদি পড়ে থাকেন আমায় জানাবেন।

সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি

সাহিত্যশিল্প বনাম ছুরি তলোয়ার : কিছু প্রশ্ন

উৎপল চক্রবর্তী

দুর্গাপুর থেকে বাঁকুড়া যেতে পথের ধারে নবনির্মিত ঝকঝকে চক্ষু চিকিৎসালয় আপনার চোখ টানবে। ডান হাতি রাস্তা দিয়ে কিছু দূর - বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণযজ্ঞ। অকাতরে অর্থদান করছেন সজ্জনেরা। আর বাঁকুড়াকে পেছনে রেখে সোনামুখির দিকে ছান্দারের দৃষ্টিনন্দন শিল্পসম্ভারে সমৃদ্ধ অভিব্যক্তি, শিল্পচর্চাকেন্দ্রের ভগ্নপ্রায় ঘরবাড়ি। আপনাকে কি হতাশ করবে? আমাকে করে না। এতদিনে আমি জেনে গেছি, সমাজে একটি চিকিৎসালয় একটি বৃদ্ধাশ্রম যতটা জরুরি, একটি শিল্পচর্চাকেন্দ্র ততটা নয়। অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে তাই সমাজচাহিদায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানেই অকাতরে অর্থদানেই অকুণ্ঠিত বিত্তবানেরা। আর সাধারণ মানুষ, এই মহান ভারতে, অর্থব্যয়ে প্রাণিত মাত্র দুটি ক্ষেত্রে, ধর্ম এবং রাজনীতি। ভক্তিতে এবং পরলোকের ভয়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে, আর ভয়ে ও ইহলোকের নিরাপত্তার খাতিরে রাজনৈতিক দলে।

এবং এই পরিপ্রেক্ষিত এই মুহূর্তে অত্যন্ত নির্মম আপাত-অবিশ্বাস্য গভীর বেদনাদায়ক একটি সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করছে আমাকে – সমাজে শিল্প যার বিস্তৃত অভিধায় অন্তর্লীন সাহিত্য সঙ্গীত ছবি নাটক ইত্যাদির প্রয়োজন শুধুমাত্র অবসর বিনোদনের জন্য। দৈনন্দিন জীবনযাপনে, কোনও সংকট মুহূর্তে, দেশের দুর্দিনে এর প্রয়োজন প্রায় শূন্য।

জানি, বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে গেছে ইনটেলেকচুয়ালদের। লিখেছে এই অর্বাচীন! আরে, সংকটমুহূর্তেই তো দরকার কবি শিল্পীদের। তাদের লেখনিতেই তো উচ্চারিত হয় শুভচেতনা, প্রাণিত হবে জনগণ। যুগে যুগে দেশে দেশে তাই তো হয়েছে। হচ্ছে। এ সব প্রতিক্রিয়াশীল কথাবার্তার মানে কি? এসব কি কোনও কূট গোপনচারী ষড়যন্ত্রের আভাস, কায়েমি স্বার্থান্বেষী হিংস্রতার পতাকাবাহী নাৎসি বীভৎসতার নির্লজ্জ ঘোষণা!

আমার সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তিগুলো পেশ করি। বিবেচনা করুন। একজন কৃষক যখন শ্রমে ঘামে ফসল বোনেন, তখন গান গেয়ে গেয়ে সে কাজটি করেন, এ ঘটনা অশ্রুতপূর্ব। 'আমরা চাষ করি আনন্দে' এই উচ্ছ্বাস শান্তিনিকেতনের 'কালচারড' বাবুবিবিরা গান, যাঁরা হলকর্ষণ উৎসব ছাড়া লাঙল ধরেন না জীবনেও। এমনকী 'হেই সামালো ধান সামালো' ও গান না চাষিরা দুঃসময়ে। যদিও এ-এক অসামান্য প্রেরণারই গান। কিন্তু অন্তর্নিহিত মানবিক আবেদন সত্ত্বেও তা রচিত মধ্যবিত্ত রোমান্টিক আবেগ থেকেই। কৃষকের রচনা নয়। আবার সেই কৃষকেরাই যখন পৌষ অঘ্রাণে ঘরে ফসল তোলেন তখন সে বড় সুখের সময়। তখন গৃহশ্রীরা সেই শস্যলক্ষ্মীকে বরণ করে নেন তুষু গানে। সে গান অবসর বিনোদনের গান, সফলতার গান, মাঠ ও শস্যের অকৃপণ দানের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদনের স্তোত্র। ভাটির টানে যখন নৌকো ভাসে, প্রিয়জন পরিজন ছেড়ে মাঝি যখন অকূল দরিয়ায়, তখন ভাটিয়ালি। কিন্তু হিংস্র ঝড়ের থাবার নীচে যখন পদ্মা মেঘনার মুখ উথাল পাথাল তখন গান আসে না মনে।

হ্যাঁ, ছাদ পেটানোর সময় এক ধরনের সুরেলা কথা শ্রমিকদের কণ্ঠনিঃসৃত হয় বটে। কিন্তু সেটা ঠিক গান নয়। ভারি কোনও বস্তু ঠেলে তোলার শ্রম লাঘবের উদ্দেশ্যে 'মারো জোয়ান হেঁইয়া' ধরনের প্রেরণাসঞ্চারী শব্দরাজি এর তুলনীয়।

ঠিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে সব ধরনের লোকসঙ্গীতই দেখা যাবে ওই শ্রম অবসানে অবসর বিনোদনের গান। তুষু, ভাদু, মনসামঙ্গল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি - সবই এই শান্তিপর্বের গান, কোনটা বা সংকটত্রাণের উদ্দেশ্যেও রচিত। কিন্তু ঘোর সংকটকালে অবশ্যকর্তব্য অন্যবিধ।

বাউল বা কীর্তনের ক্ষেত্রটি ভিন্ন। একটি সাধনসঙ্গীত, অপরটি উচ্চাঙ্গসঙ্গীত-প্রতিম। এখানে একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণের অনুল্লেখ সত্য গোপনের প্রয়াস হিসাবে গণ্য হবে, আমার সর্বশেষ সিদ্ধান্তের সাক্ষী হিসাবে অনুপস্থিতও থাকবে। চৈতন্যদেব কীর্তনকে হাতিয়ার করেছিলেন এক সংকটকালেই। এ সংঘটন কেন এবং কীভাবে তা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয় এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ গভীর বোধের স্বতস্ফূর্ত প্রেরণায় উৎসারিত হয়েছিল সেই প্রয়োগপদ্ধতি, সেই নিখাদ অন্তর্জাত প্রয়োজন থেকে আর ক'টা গানই বা গাওয়া হয়, ক'টা কবিতা, ক'টা ছবি! কীর্তনের যে লীলাবিলাস পরবর্তী সুখীসমাজে প্রচলিত, প্রায় সব শিল্পেরই অন্তিম লীলার মতো সেই ফসলবিলাসী হাওয়াই শূন্যে ভাসে। রক্তে তুফান তোলে না।

নির্মম নিপীড়ন নির্যাতনের অসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হবার জন্য, প্রেরণা লাভের তীব্র বাসনায় বিপ্লবীদের কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের গান বা কবিতা কণ্ঠে নিয়েছেন ঠিকই। রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই ব্যতিক্রম এবং বিপ্লবীরা কেউ তেমন গান বা কবিতা লেখেননি। 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'-ক্ষুদিরামের লেখা

নয়, পীতাম্বর দাসের। পীতাম্বর বিপ্লবের ধারে কাছেও ছিলেন না। 'এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিষায়'– এ গান অবশ্যই লেখা যায় বা গাওয়া যায় যখন লেখকের বা গায়কের মাথার উপরের ছাদ ভেদ করে জল ভিজিয়ে দেয় না তার খাতা বা গানের গলা। তানসেন দীপক রাগে দিয়া জ্বালাও গেয়ে আগুন জ্বেলেছিলেন বা মল্লারে বৃষ্টি – গানের এই অতি আশ্চর্যজনক শক্তির কথা আমি ঠিক জানি না। সে সময় সেখানে আমি ছিলাম না। কিন্তু উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের কলাবিস্তার বা কলা-কলাপের প্রকাশে যে প্রকৃতির রূপ উদ্ভাসিত হয় তা সেই মনেই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ যে মন শিক্ষিত। মনে রাখতে হবে এ সব গানের পরিপোষক রাজতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্র। 'সুখীগৃহকোণ শোভে গ্রামাফোন' — বিজ্ঞাপনের আড়ালে এই সত্যেরই অমোঘ অস্তিত্ব।

'কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট' — জেলে বসেই নাকি লিখেছিলেন নজরুল। কিন্তু তিনি জেল ভাঙেননি। পরবর্তী কালে যাঁরা ভেঙেছেন, তাঁদের জবানবন্দিতেও এমন উল্লেখ নেই যে ওই গান তাঁদের প্ররোচিত করেছিল। অপর পক্ষে পৃথিবীর অসংখ্য দেবদাস পার্বতীর বিরহে 'জীবনে যদি দীপ জ্বালাতে নাহি পারো সমাধি পরে মোর জ্বেলে দিও'— এই মর্মস্পর্শী গান না গেয়ে মদ খাওয়াই শ্রেয় মনে করেছেন।

ছবির প্রসঙ্গে আসি। যুদ্ধের ভয়াবহতা গোয়েনির্কায় বিধৃত করেছিলেন পিকাসো। কোথায় পড়েছি, একদল জার্মান সৈন্য তাঁর স্টুডিওতে হুঙ্কার দিয়েছিল, এ ছবি কার আঁকা? পিকাসো উত্তরে বলেছিলে, তোমাদের আঁকা! কথাটা সত্য। কথাটা মিথ্যেও। পিকাসো যুদ্ধে যাননি। স্টুডিওর নিভৃতে অবিরাম রক্তক্ষরণের নির্যাস ওই ছবি। আবার এ-ও পড়েছি, টার্নার সমুদ্রঝড়ের সময় নিজেকে মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অশান্ত টালমাটাল ব্রাশে এঁকেছিলেন অবিস্মরণীয় সেই সামুদ্রিক ঝড়ের ছবি। তাহিতি দ্বীপে গিয়ে গঁগা, বা আর্লের জ্বলন্ত রোদ মস্তিষ্কের কোষে কোষে সঞ্চিত করে ভ্যান গগ, জীবনকে ছুঁয়েছেন, রামকিঙ্করের ভাস্কর্য - ব্যতিক্রমমাত্র এই উদাহরণ গুলো।

অপরপক্ষে দেখা যাচ্ছে, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই দেখতে হচ্ছে, সাধারণ মানুষ সব ছবি থেকেই শতহস্ত দূরে। যদিও দাঙ্গার বিরুদ্ধে ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে অবিরাম শিবির, অজস্র ক্যানভাস, তবু সাধারণ মানুষ অচৈতন্য। বড় জোর দু একটা ছবি কিনে ড্রইংরুমে। মনে মনে 'নেড়ে বিনাশ' বা 'কাফের বধ' অবশ্যকর্তব্য এই অভিলাষ।

আমি দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী। তখন বাণীপুরে। ষাটের দশক। আমাদের প্রিয় মুসলমান ছাত্রদের সব রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও তারা নিশ্চিন্ত ছিল না। মুহুর্মুহু শান্তিমিছিল তবু হিন্দুগ্রামে আগুনের লকলকে জিভ, মসজিদের সামনে নিহত হাজি সাহেব। ভয়ংকর এক আতঙ্ক প্রতি পদক্ষেপে। রাতের অন্ধকারে প্রতিটি গাছের আড়ালে মনে হয় আততায়ীর ছুরি গা ঢাকা দিয়ে শিকারের প্রতীক্ষায়। সে বড় সুখের সময় নয়। বাণীপুরের শিক্ষাচর্চা, সংস্কৃতির বানডাকা কর্মসূচি কবিতা গান ছবি সব উধাও। রুদ্ধশ্বাস জীবনযাপন। তারপর ঝড় থামে একদিন। আবার ফিরে আসে গান কবিতা। সবই হাস্যকর লাগে অতঃপর।

শুনেছি ম্যাকিসম গোর্কি নাকি তাঁর দুঃসময়ের অস্থির মনস্কতা শান্ত করতেন গ্রন্থপাঠ করে। কিন্তু তিনি ম্যাকসিম গোর্কি। আমাদের মতো ম্যাকসিমাম লোকই তো লেখাপড়া জানে না। জানলেও বই পড়ে না। পড়লেও সেই বই কোনও মানসিক পরিবর্তন আনে না। সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি' বা বুদ্ধদেব বসুর 'রাতভোর বৃষ্টি'র মামলায় এ প্রসঙ্গ উঠেছিল। যদি অশ্লীল সাহিত্য পাঠে মানুষ খারাপই হবে তবে সৎসাহিত্য পাঠে নিশ্চয় ভাল হয়ে উঠবে। তা তো হয় না। সাহিত্যপাঠ সচরাচর কোনও প্রভাবই ফেলে না। আনন্দমঠ বা পথের দাবী পড়ে কেউ বিপ্লবী হয়নি, বিপ্লবী হয়ে অবশ্য অনেকেই পড়েছেন। ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত থাকতেই পারে। প্রমোদকুমারের তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ পড়ে কেউ কেউ নাকি সন্ন্যাসী হয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ নেই। সত্যাসত্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

আসলে কথাটা হল, আশা করছি এতক্ষণে বোঝানো গেছে, সাহিত্য শিল্প ইত্যাদি সুখের সময়, অবসরের প্রয়োজনে— দৈনন্দিন জীবনযাপনের নয়। কারও কারও কখনওই নয়। যেমন দাঙ্গাবাজ বা ধর্মান্ধদের ক্ষেত্রে। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি। যে কুকুর ডাকে সে কামড়ায় না তা আমরা জানি, কুকুর জানে না। ছবি কবিতা গান শুভবুদ্ধি উদ্দীপনের সহায়ক আমরা জানি, দাঙ্গাবাজরা কি জানে?

কিন্তু বিষয়টা তো এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের প্রয়োজনের অগ্রাধিকার কোন কোন ক্ষেত্রে এবং সে তালিকায় সাহিত্য শিল্প ইত্যাদির অবস্থান কোথায় এটাই বিবেচ্য। যে-কথা প্রথমে লিখেছিলাম, সেই সব প্রতিষ্ঠানের কথা যা আমাদের জীবন মরণের সঙ্গে জড়িত, স্বাভাবিক কারণেই, তাদের প্রয়োজনীয়তা বেশি। একজন কৃষক সারা জীবনে কবিতার প্রয়োজন না-ও অনুভব করতে পারেন, ছবিরও। গানকে ঠেলে সরানো যায় না, কান বন্ধ করা যায় না বলে। ফলে স্বভাবতই গান ভাল লাগে, লাগতে থাকে। কিন্তু সে-ও শ্রম অবসানে। একজন কৃষকের মনুষ্যত্বও কিছুমাত্র বিঘ্নিত হয় না কবিতা না পড়েও। আবার প্রভূত পরিমাণে কবিতাপায়ী ও অমানুষোচিত কাজে অটল থাকতে পারেন। শুধু কৃষক কেন, সাধারণভাবে কোনও উচ্চবিত্ত মানুষই কি সাহিত্যপাঠে আগ্রহী? তাঁরা বাংলা সাহিত্যের হালহকিকত জানেন? বড়জোর অরুন্ধতী রায়, বা বিক্রম শেঠ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা সুবোধ ঘোষ, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বা সতীনাথ ভাদুড়ি নৈব নৈব চ। আর কবিতা? কবি বা কবিতার কোনও সামাজিক মূল্য আছে বলে তাঁদের কি প্রকৃত বিশ্বাস আছে? এই

দুই চূড়াবাসীদের মধ্যবর্তী স্তরে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, তাঁদের ক্রমহ্রাসমান একটি অংশ এখনও বইটা ই পড়েন। সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বৈদ্যুতিন মাধ্যমের চুম্বকে লৌহপ্রায়। কথাসাহিত্য উৎসব বা চারুকলা উৎসব, সঙ্গীত মেলা বা লিটল ম্যাগাজিন মেলায় দর্শক শ্রোতার সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ বাদ দিন, কলকাতার জনসংখ্যার অনুপাতে কত? অংশগ্রহণকারী এবং তাঁর আত্মীয় বা বন্ধুবর্গ, নিয়মিত দাঁড়ে বসা আড্ডাধারী, প্রেমের রুটিন ওয়ার্ক করতে আসা যুবকযুবতী, কোনও কাজ নেই-কী করি-যাই-কীহচ্ছে-দেখে -আসি- পন্থী কিছু মানুষ, উদ্যোক্তা, সুযোগসন্ধানী সংস্কৃতি কর্মী এবং শিল্পের বিভিন্ন শাখার অবতারদের স্তাবকেরা। প্রকৃত রসজ্ঞ ক'জন আসেন? এ প্রজন্মের ক'জন? তাঁদের কাছে এসব অর্থহীন নানা অর্থেই, সময় অপচয়মাত্র। কিছু প্রমাণাদি দাখিল করি।

এই প্রজন্মের এক নাট্যব্যক্তিত্ব ব্রাত্য বসু লিখছেন,

...'থিয়েটার নামক এই বেচারা মাধ্যমটি এখনও, হ্যাঁ, এখনও তার নিজস্ব উদ্দেশ্যের কারণে আবেদন জানাতে চায় মাথার কাছে, বড় জোর একটু নীচে হৃদয়ের কাছে –তার আর নীচে নয়। একেবারেই নয়। থিয়েটার.... চোখকে জাগানোর পাশাপাশি মনকে জাগাতে চায়, চিন্তাকে উসকে দিতে চায়....। ফলে যে কারণে কবিতা বা সিরিয়াস গদ্যরচনার পাঠক কম, যে কারণে তথ্যচিত্র বা প্যারালাল ছবির দর্শক কম, মার্গসঙ্গীতের দর্শক কম, ঠিক সেই কারণেই থিয়েটারের দর্শক কম। কি কলকাতায় কি কন্যানীতে কি ক্যালিফোর্নিয়ায়।' ড. বিজিত ঘোষ লিখছেন, ...'ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড ম্যাগাজিন বা গ্রন্থই এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মূল চাহিদা। ...সবে মাধ্যমিক দিয়ে ওঠা এক ১৬+ বললে, এখন আর বইটই ভাল লাগে না। মেনলি ক্রিকেট পাতাটা দেখি, কিছু পাড়ি না। ...প্রথম বর্ষের সাহিত্যে অনার্সের ছেলে, বেসিক্যালি গল্প উপন্যাস পড়তে ভালো লাগে না। প্রায় সর্বক্ষণই টিভি দেখতে ভালো লাগে...। ....এরা কঠিন প্রতিযোগিতার সামনে দাঁড়িয়ে।... কেরিয়ার গড়ার ইঁদুর দৌড়ের ব্যস্ততায় পাঠ্যের বাইরে অন্য কোনও বইয়ের দিকে তাকাবার অবকাশই নেই।'

এ সব সমীক্ষা একটি পত্রিকার ২০০২ এর বার্ষিক সংখ্যায়। এতদ্বারা এই সাক্ষ্যপ্রমাণাদি সেই অনিবার্য সিদ্ধান্তেই স্থিত হতে সাহসী করে – সাহিত্য শিল্পের তেমন মূল্য নেই। বিনোদনের প্রয়োজনেও তার চাহিদা ক্রমক্ষীয়মাণ। তা হলে?

তা হলে কি শার্লক হোমসের মতো অনুসন্ধানরত আমি প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ের শেষে অতল খাদের কিনারে। নাকি পাঠক দাবিতে কোনান ডয়েল যেমন হোমসের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন তেমনই সাহিত্যশিল্পের অমোঘ প্রভাবের দাবিতে তার স্বীকৃতিদানই কর্তব্য। আমি জানি, অন্তত এ কথা স্বীকার করতে অকুণ্ঠিত, ব্যক্তিজীবনে সাহিত্যশিল্পের কথঞ্চিৎ প্রভাব আছে।

উইলফ্রেড আওয়েন যুদ্ধের সময় ট্রেঞ্চে বসে কবিতা লিখেছেন। ব্যক্তিগত বিষাদ সঙ্কটে রবীন্দ্রসঙ্গীত অনেকের মনে প্রশান্তি এনেছে। ফাঁসির সেলে বন্দি বিপ্লবী শুকুল, সম্ভবত তিনিই, রবীন্দ্রগান শুনতে চেয়েছেন। গান্ধীজিও প্রাণিত হতেন বিশেষ একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতে। ঠিক আছে। এ রকম হয়। ব্যক্তিজীবনে এ সবের প্রভাব আছে। কিন্তু সমষ্টিজীবনে? গুজরাটে এত কবি শিল্পী বিখ্যাত গরবা নৃত্য- কিছুই কিছু নয়। সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রশক্তির কাছে ব্যক্তি পুতুল মাত্র। এবং রাষ্ট্রশক্তির চালকরা পরোয়া করেন না নন্দনতত্ত্বের। প্লেটো রাষ্ট্র থেকে কবিদের নির্বাসনও চেয়েছিলেন। অতএব—

অতএব যে শিল্পসাহিত্য সমাজের প্রাথমিক চাহিদাই নয়, তার চর্চা, তাকে মহৎ অভিধায় গৌরবান্বিত করা তার চারপাশে আলোকবৃত্ত রচনা নিতান্তই খোয়াবনামা। অতীতে রাজতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্র নিজস্ব প্রয়োজনে এক ধরনের মদত জোগাত। সভাকবি বা ভাট, ভূস্বামীর গুণকীর্তনকারী চারণ বা ধর্মীয় প্রয়োজনে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ মন্দির মসজিদ অলংকরণ এক সময় শিল্পীর অবশ্যকৃত্য ছিল। লক্ষণীয় শুধু এই যে মনিবের অঙ্গুলিহেলনে সেই সৃজনকর্ম সাধিত হলেও শিল্পীর আঙুল নান্দনিক ধর্মকে অস্বীকার করেনি। উপনিবেশবাদ নির্মমভাবে সেই আঙুল কেটেছিল ব্যবসায়িক প্রয়োজনে। পর্বান্তরে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কবি শিল্পীদের স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছিল বটে, কিন্তু এক ধরনের কট্টর অনুশাসন নান্দনিক শর্তপূরণের প্রতিবন্ধকও ছিল।

রাষ্ট্রশক্তি ও প্রাতিস্বিকতার দ্বন্দ্ব একবিংশ শতাব্দীর সংকট। এই দুইয়ের লড়াই তীব্র হয়ে উঠছে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের হৃদয়হীন নিষ্পেষণে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ভোগবাদের বিপুল বন্যা ভাসিয়ে দিচ্ছে সযত্ন লালিত এতাবৎ পালিত প্রতিষ্ঠিত ধ্যানধারণা, মূল্যবোধ। এটা ভাল না মন্দ, এই কূট তর্কের চেয়ে জরুরি ঘটনার অনিবার্য পরিণতি বিষয়ে সতর্ক থাকা। কেন নতুন প্রজন্ম কবিতা পড়ে না, সিরিয়াস গদ্যে এত অনীহা, কেন কুইজ আর কেরিয়ার গাইড বেস্ট সেলার, কেন টিভিতে চব্বিশ প্রহর, কেন বিজ্ঞাপনে শুধুই ভোগ্যপণ্য, কেন শিশু কিশোরদের মডেল করে অবিরত বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়ে ভোগসর্বস্ব প্রজন্ম তৈরি, কেন টিন-এজারদের মনে শুধু প্রেম প্রেম এবং প্রেমকেই সঞ্চারিত করে দেওয়া, কেন যৌন পর্যটন শিল্প গড়ে ওঠা, কেন অর্থ এবং অর্থ অর্জনের জন্য যে কোনও অসামাজিক কাজকেই সামাজিক স্বীকৃতি দেবার সর্বাত্মক প্রয়াস, কেন চোর জোচ্চর ঘুষখোর খুনি রাজনৈতিক নেতা, দুর্বৃত্ত সিনেমাস্টার কাগজের হেডলাইন - এত 'কেন'র একটিই উত্তর। দাসপ্রথার পুনঃপ্রবর্তন। আমি কিনে নিচ্ছি তোমাকে। যা বলব তা করতে বাধ্য থাকবে তুমি। স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়— রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ উপলব্ধি আজ নিতান্তই রঙ্গকথা। নিজেদের অপদার্থতায় তৃতীয়

বিশ্বের বহুদেশ আজ দাসত্বশৃংখল গ্রহণে প্রস্তুত। 'গিও জিও মস্তি মানাও, যা খুশি কর না পারলে মর। বাদবাকি সবই অর্থহীন। খাদ্যবস্ত্র বাসস্থান-জীবনের এই প্রাথমিক চাহিদার সঙ্গে মনের যে ভূমিকা ছিল তা নিঁখুত অস্ত্রোপচারে বাদ দেওয়া হচ্ছে।

সুতরাং মনই যেখানে থাকছে না, মনের খোরাকের জন্য সাহিত্যশিল্পের আর কী প্রয়োজন? ফলত ঐহিক ও দৈহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দিকে দিকে আয়োজন। আর যেহেতু এখনও মানুষ বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত। তাই শিল্প সাহিত্যও পাশাপাশি। ফলে কবিরা ছাড়া কবিতা পাঠক নেই, কবিরাও অন্যের কবিতা পড়ে কিনা সন্দেহ, গল্পপাঠ শুনতে শ্রোতার সংখ্যা দু'হাতের মোট আঙুলের চেয়ে কম, নাটকের দর্শক নেই .... ইত্যাদি।

তা এই হল প্রতিপাদ্য বিষয়। সাহিত্য শিল্প সমষ্টিজীবনে মূল্যহীন। ইদানীং আরও। না, ভুল লিখলাম। শুধু এটুকু যদি হত তা হলে নিশ্চিন্ত হতাশায় নীরব থাকাই শ্রেয় ছিল। তা যখন নয়, তখন বিরুদ্ধশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ধরনটা পাল্টালে কি সমক্ষমতাবান হয়ে উঠবে শিল্পসাহিত্য– এ প্রশ্ন এ সংকটকালে। মানুষের ক্রমঅগ্রগমন একটি আশ্চর্যজনক ইতিবাচক প্রবণতার সাক্ষ্য দেয়। দেখতে পাই, একান্তভাবে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত সামগ্রীতে শিল্পের স্পষ্ট মাধুর্যের ছোঁয়া, নান্দনিক শোভনতার আভাস। ঘটিবাটি,-ঘরের চালের ছাউনি, খাবার ঝোলানর শিকে, মাদুর, জাঁতি, পানের বাটা, কাঁথা – সর্বত্রই শিল্পসুষমার ঐশ্বর্য। শিল্পকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জড়িয়ে নেওয়া, অনায়াস নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো আন্তরিক করে নেওয়ার পরম্পরা মানুষের রক্তে। আদিবাসী সমাজে এই অভ্যাস আজও অব্যাহত। সে সমাজে যামিনী রায় নেই, কিন্তু সকলেই শিল্পী। তাদের ঝকঝকে অলংকৃত ঘরবাড়ি, দেওয়ালচিত্র - এ উক্তির সাক্ষী।

প্রয়োগধর্মিতা যদি অনুপস্থিত থাকে তবে তা সমাজ-বিবিক্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির চর্চামাত্র। সাধক বামাক্ষ্যাপা বা শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন কিনা তা নিয়ে আমি ভাবিত নই। মানব কল্যাণে ওই দর্শন কতটা কার্যকর তাই বিবেচ্য বিষয়। মার্ক্সীয় দর্শনের প্রয়োগকৌশলেই যেমন তার সারবত্তার পরিচয়, বিজ্ঞানের ব্যবহারেই যেমন বিজ্ঞানমনস্কতার জন্ম, তেমনই শিল্পসাহিত্যের প্রয়োগধর্মিতাতেই নিহিত থাকে সমাজে তার প্রভাবের উৎস। এটা আগে ছিল। পটের গান, কবিগান, পাঁচালি, কথকতা, সঙ্গীত শিল্প সাহিত্যকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। এখন বেতার দূরদর্শন ইন্টারনেট ইত্যাদি। এগুলোর ব্যবহার জরুরি। দুর্ভাগ্য এই, শক্তিশালী তথাকথিত অর্থবান মানুষদেরই দখলে এই অস্ত্রগুলো। তাদের দর্শনই দূরদর্শনে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে শিল্পসাহিত্যের স্থান সেখানে কতটুকু? বই পড়ার অভ্যাস আছে বলেই জেনেছি গুয়ের্নিকা বনাম জার্মান সৈন্যের ঘটনা, বিপ্লবী শুকুলের রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রীতির পরিচয়।

এ প্রজন্মের কাছে সে অভ্যাস ক্রমঅস্তগামী। যেটুকু করার আছে তা হল সর্বাধুনিক বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলো দখল করা। সে গুলোকে ব্যবহার করা। ভয় পায়, হ্যাঁ, বিরুদ্ধশক্তিগুলো সাহিত্যে শিল্পের অন্তর্নিহিত শক্তিকে, কথঞ্চিৎ হলেও, ভয় পায়। নইলে সাফদার হাসমি বা প্রবীর দত্ত খুন হন কেন? উৎপল দত্তের কল্লোল স্তব্ধ করার জন্য চক্রান্ত হয় কেন? পথের দাবী বাজেয়াপ্ত হয় কেন? নজরুলকে জেলে পোরা হয় কেন?

আসলে সাহিত্য শিল্পের অন্তর্গত বক্তব্য যদি জনমানসের প্রতিটি স্তরে না পৌঁছয়, ফলিত বিজ্ঞানের মতো যদি তা সাক্ষর নিরক্ষর নির্বিশেষে সকলের কাছে না পৌঁছয়, চৈতন্য জাগ্রত না করে, চৈতন্যদেবের মতো কোনও একটি মাধ্যমকে আশ্রয় করে, যেমন তিনি কীর্তনকে করেছিলেন, যদি তা সর্বচেতনায় ছড়িয়ে দেওয়া না হয় তবে সাহিত্যশিল্প সঙ্গীত সুখী গৃহকোণেই শোভা পাবে। এখন যেমন। সকলের চৈতন্য হোক—এ ছিল তথাকথিত মূর্খ এক গৃহীদার্শনিক শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধির কথা। এটা তিনি অর্জন করেছিলেন তাঁর চতুষ্পার্শের ঘটনা এবং দেশজ নানা কাহিনি এবং আচারআচরণ জেনে, রূপসাগরে ডুব দিয়ে। শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব—পরিচিত এই ঘোষণাটিরও মর্মকথা তাই। তা সেই চেতনা জাগ্রত হবে যদি সাহিত্যশিক্ষা ইত্যাদির মর্মবাণী, শুভবুদ্ধি-সঞ্চারী শক্তি, যদি তা থাকে আদৌ, ছড়িয়ে দেওয়া যায় নানাবিধ প্রয়োগকৌশলে। অর্থাৎ সেই প্রয়োগধর্মিতা। বাজার দখল। ভিন্নার্থে। এটা করার দায়িত্ব কবি শিল্পীদের। কীভাবে? প্রশ্নের সংকট এখানেই। বোধ হয়, সেই পথ খোঁজাটাই লড়াইয়ের প্রথম ধাপ। একগাল দাড়ি শোভিত দুঃখী কাতর মুখে কবিতা পাঠ নয়, নয় সুটকোট শোভিত হয়ে গল্পপাঠ, নয় আজানুলম্বিত পাঞ্জাবি কবলিত হয়ে সঙ্গীত পরিবেশনের ছলে কর্ণধর্ষণ।

নামতে হবে মানুষের মাঝখানে। মানুষের কাছে পৌঁছনোর সর্বাধুনিক যন্ত্রবাহনগুলো ব্যবহার করতে হবে সঠিকভাবে। কীভাবে? এটাও প্রশ্নের সংকট। তবে এটা হবে দ্বিতীয় ধাপ।

শুধু কাগজে কলমে সাহিত্য শিল্পকে মহান প্রতিপন্ন করে কোনও লাভ নেই। এ প্রজন্ম যেমন এসব পড়েটড়েনা, দাঙ্গাবাজরাও পড়ে না। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। হয়েছে। হবে। অথচ সত্যিই যদি কলম, আমি প্রতীক হিসেবে লিখছি, তলোয়ারের চেয়ে শক্তিশালী বলে বিশ্বাস করি, তবে লড়াই শুরু করাটা এই মুহূর্তেই জরুরি। কবি ছাড়া জয় বৃথা—ভিন্নতর অর্থে এই মানিক-প্রতিম উপলব্ধি দীপ্ততর হবে শেষ জয়ে। পৃথিবীতে সেই শুভদিন আসবে এমন আশাতেই তো মানুষের পথ হাঁটা। কিন্তু আদৌ কি সেদিন আসবে? সংকটে প্রশ্ন এটাই। যদি আসে, সেই দিন, হ্যাঁ সেই দিন, একটি চক্ষুচিকিৎসালয়, একটি বৃদ্ধাশ্রমের মতো চিত্রচর্চার প্রতিষ্ঠানও সমাজে জরুরি হয়ে উঠবে।

গ্রন্থসমালোচনা

ব্যতিক্রমী লেখক, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

জনপ্রিয় লেখক ছিলেন না জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যদিও দেশ পত্রিকায় তাঁর অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ছিলেন যথার্থ স্রোতের বিপরীতে যাওয়া লেখক, যে কারণে 'বারো ঘর এক উঠোন' নামক দীর্ঘ উপন্যাস বহুদিন ধরে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হওয়ার পরও সাধারণ পাঠকের মন জয় করতে পারেনি। এই উপন্যাসে ভারত স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী কালের বাড়বাড়ন্ত সমাজ আর মূল্যবোধের অবক্ষয় কিছু নিম্নমধ্যবিত্ত চরিত্রের মাধ্যমে আস্তে আস্তে ফুটে উঠেছে। ঘটনার তেমন ঘনঘটা নেই কোথাও। লেখক যেন চাল বাছার মতো করে গভীরভাবে অনুসন্ধান করছেন পরিবর্তিত জীবনযাত্রার সূত্র ও গঠনপ্রণালী, মূল স্রোত থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর মানুষের বেঁচে থাকার নিঃশব্দ লড়াই।

জন্ম ১৯১২ সালে, মৃত্যু একাত্তর বছর বয়সে ১৯৮৩ সালে। মোটামুটি দীর্ঘজীবনই পেয়েছেন। লেখালেখি ছাড়া অন্য কোনও কাজ করেননি সুতরাং লেখকজীবনে দারিদ্র তাঁর প্রিয় সঙ্গী ছিল যদিও বাল্যকাল কেটেছে সচ্ছলতার মধ্যে। এই স্বেচ্ছা নির্বাচিত কষ্টকর জীবন একজন সাধকের প্রাপ্য। সদর্থে সাহিত্যসাধক ছিলেন জোতিরিন্দ্র নন্দী তাই তাঁর ওপর গবেষণা করার জন্য শ্রীমতী রঞ্জনা দত্তকে এবং তাঁর পরামর্শদাতা অধ্যাপক অলোক রায়কে ধন্যবাদ জানাই।

জনপ্রিয় না হলেও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছিলেন কনিষ্ঠ লেখকদের প্রিয় লেখক। নেপথ্যের নায়ক কিন্তু মঞ্চের কোনও চরিত্র নন। তাঁদের কিছু উক্তি গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন গ্রন্থের প্রথম দিকে।

যেমন একবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁর কখনও প্রচুর লিখতে ইচ্ছে করে কি-না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, না, না, একদম না। চিরকালই খুব যত্ন করে লিখেছি। পরিশ্রম না করে একটা লেখাও লিখিনি। প্রচুর লিখব কী করে। কাটাকুটি মাজাঘষার তো আর শেষ নেই। একটা গল্প তো প্রায় কয়েক মাস ধরে লিখেছি।

গৌরাঙ্গ ভৌমিকের এক প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতিরিন্দ্র জানান, ওই তো আমার এক দোষ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না দেখে পারি না। বাইরের ঘটনার সঙ্গে ভেতরের সত্যের মিল খোঁজার চেষ্টা করি। কখনও বা একটা ভাবনা থেকে গল্পের বীজ খুঁজে পাই। কখনও বা একটা ঘটনা থেকে অন্য ঘটনার আভাস। মানুষের ভেতরে বাইরে কত কী না ঘটছে অহরহ। কত ঘটনা, কত দুর্ঘটনা।

প্রিয় লেখকের মৃত্যুর পর সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ উল্লেখ করেছিলেন, এ তো সেই মানুষ—সেই নিসর্গের টুকরো, টবের মাটিতে সংবিদ্ধ ক্যাকটাস। তার কাঁটায় বসে আছে নিশ্চুপ প্রজাপতি। তার ধূসর শরীরে নিরুপদ্রবে ঘুরে বেড়ায় লালপোকা নীলপোকারা। যে মানুষ প্রকৃতির বিস্ময়কর উজ্জ্বল সন্তান।

বাইরে তো নানান ঘটনা ঘটে। তার মধ্যে যারা নাটকীয়তা খোঁজে, উল্লেখযোগ্যতা হাতড়ায়, তারা সাংবাদিক বা ছোট মাপের লেখক। ভেতরের ঘটনার সঙ্গে তার মিল খোঁজেন যথার্থ সাহিত্যিক। ভেতরের ঘটনায় সব চরিত্ররা আবার সজীব নয়, তারা নানাভাবে মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে। যেমন চোর গল্পের পেঁপেগাছ বা সমুদ্র গল্পের চেতনাগ্রাসী প্রকৃতি। ভেতরের ঘটনা দাম্পত্যপ্রেমের অন্তরালেও থাকে তাই জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের ওপর নির্ভরতা প্রবল এবং নারীপুরুষের ভূমিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রে খাদ্য-খাদকের।

গ্রন্থকার ধরতে পেরেছেন যে প্রকৃতি এবং মানবমন অঙ্গাঙ্গী ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে তাঁর গল্পে। কেবল প্রকৃতিকে চরিত্র করেই একাধিক গল্প লিখেছেন তিনি। যদিও আত্মপরিচয়ে জ্যোতিরিন্দ্র জানিয়েছেন যে তাঁর রচনার বিষয় মানুষ। মানুষের সুখ দুঃখ নৈরাশ্য। নিঃসঙ্গ আত্মার কান্না, পাপ-পুণ্যের টানাপোড়েন স্থান পেয়েছে তাঁর রচনায়। সে ক্ষেত্রে নিছক বহির্জগৎ নয়। অন্তর্লোক বা চেতন অচেতন অন্তর্বর্তী অবচেতন মনের গোপন রহস্য উদ্ধার করেছে তাঁর লেখনী।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গ্রন্থপঞ্জি থেকে জানতে পারি যে মূলত ছোটগল্পকার হলেও তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা বাহান্ন। দশটি গল্পগ্রন্থ জুড়ে রয়েছে তাঁর সমসংখ্যক ছোটগল্প। এক জীবনে এতখানি কাজ তিনি করে গেছেন। তাঁর প্রত্যেকটি কাজে গভীর অভিনিবেশ আমরা লক্ষ করি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি আর বিশ্লেষণ--যা কখনও কখনও রচনাকে তত্ত্বের স্তরে নিয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে লেখক এক জায়গায় বলছেন, অনেকে বলে শুনেছি, ঘোরাফেরা না বাড়ালে অভিজ্ঞতা হয় না। লেখালেখির

অসুবিধা হয়। আমি বুঝিনি। অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই দরকার, ওটা একটা 'বেস'। কিন্তু মূল ব্যাপার হল কল্পনা—ইমাজিনেশন। ইমাজিনেশন না থাকলে শুধু অভিজ্ঞতা দিয়ে কিস্সু হয় না।

এই কল্পনাশক্তি, বাঘের লাফের মতো কল্পনাশক্তি ছিল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আয়ত্তে আর সেই সঙ্গে ছিল, যাকে জীবনানন্দ বলেছেন লিপিকুশলতা। প্রাক্কথন পর্বে গ্রন্থকার বলছেন, সৃষ্টিপর্বে কোনও অগ্রজের প্রভাব জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী স্বীকার না করলেও প্রায় মায়াবী দৈত্যের মতো যিনি তাঁকে তাড়িত করেছেন অবিরত, তিনি হলেন জীবনানন্দ দাশ। এই কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি পাঁচটি পরিচ্ছেদ শুরু করেছেন জীবনানন্দের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে। জীবনানন্দ বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্র এক জায়গায় বলেছেন, তাঁর প্রতিটি কবিতা বিশেষ করে তাঁর - শব্দচয়ন আমাকে এমন নাড়া দিত যে এক-একটি কবিতা পড়ে এক একটা গল্প লেখার প্রেরণা পেতাম। আমারও ইচ্ছা হত ঠিক ঐরকম শব্দ সাজিয়ে একটি করে গল্প লিখি।

রবীন্দ্রনাথের রচনাশৈলীর প্রভাব থেকে সরে আসার জন্য জীবনানন্দ একটি নিজস্ব রচনাশৈলী গঠন করে নিয়েছিলেন তাঁর কবিতার ক্ষেত্রে। তা শুধু যে চিত্ররূপময় ছিল না, শব্দরূপময়ও ছিল, আমরা ক্রমে ক্রমে সে খবর জেনেছি। তার চেয়ে বড় কথা, প্রযুক্ত উপমা ও শব্দরূপগুলি তাঁর বিপন্ন বিষণ্ণ মনোভাবের যথার্থ বাহন। জীবনানন্দ তো গল্প-উপন্যাসও লিখেছেন যদিও সেগুলি তাঁর জীবিত অবস্থায় প্রকাশ করেননি। সেই সব গল্প-উপন্যাসে তাঁর মনের তিক্ততা ও অবসাদ যতখানি ধরা পড়ে, রচনাশৈলীর উজ্জ্বলতা ততখানি প্রস্ফুটিত হয় না। এর একটা কারণ হতে পারে এই যে লেখক কাহিনিগুলি দ্রুত লিখেছিলেন গদ্যমাধ্যমে মনের ওপর চাপ লাঘব করতে। অথচ জ্যোতিরিন্দ্র, কবি স্বভাবের মানুষ, লিখলেন কবিতা নয়, গদ্যকাহিনি—গল্প ও উপন্যাস- সেখানে অনেক বেশি কথা বলতে হয়। জীবনানন্দের বীজ সেখানে খুঁজে পাওয়া গেলেও জীবনানন্দের কবিতার রস সেখানে কিছুটা তরল। দু'জনের মিল সম্ভবত একটি ব্যাপারে খুব স্পষ্ট, তা হল এক ধরনের নারীবিদ্বেষ, নারীকে যথেষ্টভাবে না পাওয়া থেকে যে বিদ্বেষের জন্ম। জ্যোতিরিন্দ্রের প্রকৃতিপ্রেমও খানিকটা জান্তব, বিভূতিভূষণের থেকে আলাদা রকমের। বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে দেখেন শিশুর দৃষ্টিতে, সহজ ও সাবলীলভাবে, খানিকটা আধ্যাত্মিকভাবেও। জ্যোতিরিন্দ্রের প্রকৃতি জটিল মর্মযন্ত্রণার ধারক। নারী ও প্রকৃতি তাঁর কাছে একই সত্তার দুটি রূপ।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে বরং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবশিষ্য বলা যায়। দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে, রচনার ক্ষেত্র নির্বাচনের দিক থেকেও কিন্তু বিস্তার ও বিশ্লেষণে তিনি মানিকের মতো তথ্যনিষ্ঠ নন। তাঁর সাহিত্য ভাবপ্রধান। একটি গোলাকার ভাবনার বীজকে ঠেলতে ঠেলতে তিনি কাহিনির স্তরে উন্নীত করেন। যে-কাহিনি পড়ে ওঠার পর কাউকে মুখের ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এই মুহূর্তে আমার 'গিরগিটি' গল্পটি মনে পড়ছে।

সস্তা টিনের ঘর। লোকজন এক রকম নেই বললেই চলে। মায়া আর প্রণব স্বামী স্ত্রী আর উঠোন পার হয়ে বাঁ দিকের ভাঙা জিরজিরে একটা দেওয়াল ঘেঁষে ডুমুর আর পেঁপে জঙ্গলের আড়াল করা নিচু একচালার একটা খুপরি নিয়ে পড়ে থাকে ভুবন নামে এক বুড়ো। ভুবন সরকার সারাদিন কী করে, কী খায়, দেখবার তিলমাত্র কৌতূহল নেই মায়ার। সে একটা বড় আরসির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে। এর পর মায়ার রূপের বর্ণনা আছে। আর ওর মনের কষ্ট যে ওই রূপ আর যৌবন একা প্রণব ছাড়া কেউ দেখল না। সারা দিন ও একা থাকে পুরুষহীন বাড়িটার মধ্যে। আর যখন হাজার পাতার চোখ মেলে নিম গাছটা, পেঁপে গাছগুলো, ভাঙা পাঁচিল আর কাক শালিক-বুলবুলির ঝাঁক মায়ার হাত, পা, হাঁটু দেখে, পিঠ কোমর ভুরু চোখ চুল নখ— সব দেখে নেয়, ওর রাগ হয় না, ওর মনে হয় এই তো বেঁচে থাকা।

পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী এই গল্পে ক্রমশ এই রহস্যময়ী যুবতী মায়ার সঙ্গে বৃদ্ধ ভুবন সরকারের হৃদ্যতা হয়। তখন ও টের পায় বিপত্নীক ভুবন সরকার এই বয়সে আবার, চতুর্থবার, বিবাহের চেষ্টা করছে। ও বলে ওঠে, আপনি সাহস পান? না, না, পারবেন না। সাহস করবেন না। এই বয়সে আর ওসব হয় না। তখন সেই বৃদ্ধ ওর মুখের কাছে মুখ সরিয়ে এনে আবেগে হিসহিস করে ওঠে। বলে, তা কি আর বুঝি না দিদি, কিন্তু পিপাসা যে মেটে না, পিপাসার যে নিরবিত্তি নেই।

এক মুহূর্ত পাথরের মতো স্থির শক্ত হয়ে থাকে মায়া। তারপর সহজ ভঙ্গিতে মরা গাছের জীর্ণ ডালের বেড় থেকে নিজেকে মুক্ত করে।

বেশ কয়েকটি গল্প ও উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ করে রঞ্জনা দত্ত গ্রন্থের শেষে বলতে চেয়েছেন যে তাঁর মনস্তত্ত্ব নির্ভর কাহিনিগুলিতে মানব-মানবীর সংগুপ্ত যৌবনবাসনা বা যৌনতা চিত্রণ পাঠকের কাছে স্মরণীয় উদ্ধার। তাঁর মতে, লেখক বিশ্বাস করেন, মানবমনের অন্যান্য প্রবৃত্তিগুলির মতো যৌন প্রবৃত্তিও এক স্বাভাবিক ক্রিয়া। কিন্তু সচেতন শিক্ষার অভাবে নৈতিক মূল্যবোধের অভাবে অসংযত চিত্তের বিকার যখন দেখা দেয়, যৌনতা তখনই পার্ভার্শন-এ পর্যবসিত। তিনি এই বিষয়ের গভীর চর্চা করলেও কখনওই শৃঙ্গার রসের অনর্থক বর্ণনা বিস্তারে মুখর হননি। তিনি বিশ্বাস করতেন সুস্থ যৌনজীবন দীর্ঘতর করে মানুষের আয়ু।

কাজেই, গ্রন্থকার লেখকের উদ্দেশে বলছেন, আপনার নারীনির্মাণ নারীর প্রতি বিদ্বেষপুষ্ট নয়। বরং ব্যাপক অর্থে একে নারীবাদ বলা যেতে পারে। এই নারীদের কাছে যৌনশিক্ষার জটিল ব্যাকরণ পাঠ নেওয়া যেতে পারে। অর্জন করা যেতে পারে অপ্রেমের হতাশা থেকে উত্তরণের গোপন চাবিকাঠিও।

এই বই থেকে জানতে পারি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কোনও গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়নি। বাঙালি পাঠক তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাঁর অনেক বই এখন দুষ্প্রাপ্য। তাঁর কোনও গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। তবু একজন উচ্চাশাহীন ব্যতিক্রমী লেখক হিসাবে তিনি আমাদের কয়েকজনের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বাঙালি পাঠক নিজে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। সে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখককে পছন্দ করবে সেটাই স্বাভাবিক। সেই সব কাহিনি সে পাঠ করে তৃপ্তি পাবে যাতে তার শ্রেণীর সুখ দুঃখের ও সংগ্রামের কথা বিধৃত থাকে। কিন্তু বাঙালি পাঠক এখন উপভোগ ও সচ্ছলতার স্বপ্নে বিভোর। সে নিরন্তর উৎসবের মধ্যে থাকতে চায়। সে জীবনে যা পায় না, সাহিত্যের মধ্যে তাই খুঁজে বেড়ায়। এখনকার লেখকরাও তাই পরিবেশণ করে যাচ্ছেন। আজ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কোনও উওরাধিকারী নেই হয়ত। কিন্তু মন্ত্রশিষ্য আছে।

এই সুযোগে বলে নিই যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। আমি তাঁর ভক্ত পাঠক। তাঁর একখানি উপন্যাস 'সাঁকোর ওপরে নীরা' তিনি আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন, এ আমার সৌভাগ্য। আজ তাঁর ওপর লেখা বইটি নিয়ে আলোচনা করতে পারলাম, সে আর এক সৌভাগ্য।

স্রোতের বিপরীতে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী—রঞ্জনা দত্ত/বাণীশিল্প, কলকাতা - ৯ / ১০০.০০

তেভাগার স্মৃতি ও ইতিহাস

সৌমেন সেন

আমি ইতিহাসবিদ নই। তেভাগার ইতিহাসও ধারাবাহিক পড়া হয়নি কখনও, ইতস্তত কৌতূহলী পাঠ ছাড়া। আমাদের বয়সী, ইতিহাসের ছাত্র নয় অথচ আগ্রহী পাঠকের পক্ষে বোধহয় তা স্বাভাবিক। তা ছাড়া, পারিবারিক সূত্রে তেভাগা ও সেই সময়ের সমাজ-রাজনীতির কিছু সংবাদ আমার বাল্যস্মৃতির অংশ। তাই চতুরঙ্গ-সম্পাদক যখন তেভাগা-সম্পর্কিত দু'টি বই, একটি ইতিহাস আর অন্যটি দু'জন তেভাগা-নেতা ও নেত্রীর স্মৃতিনির্ভর, আমাকে দিলেন রিভিউ-র জন্য, আমি রাজি হয়ে গেলাম, যদিও জানা ছিল, এই কাজে আমি তেমন যোগ্য নই। আমার কৌতূহলী পাঠ-ই হবে এই রিভিউ-র ভিত্তি— কোনও বিশেষ মতামত নয়।

সুস্নাত দাশ-এর অবিভক্ত বাংলার কৃষক সংগ্রামের ইতিহাস, তাঁর ঘোষণায় 'তেভাগা আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে-পর্যালোচনা-পুনর্বিচার।' আমার ইতিহাস-পাঠের সীমাবদ্ধতায় আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় তাঁর এই দাবি সঙ্গত কি না, কিন্তু বলতেই হয় যে তিনি যে-ভাবে, যে-পদ্ধতিতে এই পর্যালোচনা-পুনর্বিচার করেছেন, তাতে তাঁর একটি প্রত্যয় : 'সাধারণ ইতিহাস অনুরাগী বৃহত্তর পাঠক সমাজ যেন এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের বৃত্তান্ত নিজের চোখে পাঠ করে এবং মস্তিষ্ক দিয়ে বিচার করতে পারেন'— সঙ্গত ও সার্থক। সেই সাধারণ পাঠকগোষ্ঠীর একজন হিসাবে বলতে পারি যে পর্যালোচনার, বা তেভাগা আন্দোলনকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার পক্ষে তিনি যে তিনটি যুক্তি দিয়েছেন তার সব ক'টিই গ্রহণযোগ্য যেমন : তেভাগা আন্দোলনের ষাট বছর পর আমরা নিশ্চয়ই মানতে পারি না, যেমন কেউ কেউ বলেছেন যে তেভাগা সংগ্রাম আদৌ কোনও বড় আন্দোলন ছিল না, অথবা ওই আন্দোলনে কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিল নেতিবাচক কিংবা ''যুদ্ধপরবর্তী ভারতীয় জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী গণঅভ্যুত্থান ছিল 'উপকথা' মাত্র এবং তাতে কমিউনিস্ট আন্দোলন অপেক্ষাও মূল ধারার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাব ছিল সর্বাধিক'' ইত্যাদি সিদ্ধান্ত অবশ্যই পর্যালোচনাযোগ্য। তা ছাড়া, তাঁর উক্তি যদি সত্য হয় যে 'আন্দোলনে অদিবাসী সমাজের ভূমিকা, মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেস সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনের অবস্থান' প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আগের আলোচনাগুলিতে তেমন গুরুত্ব পায়নি তা হলে তো অবশ্যই বলতে হয় যে এই ত্রুটি শুধুই দুর্ভাগ্যজনক নয়, প্রায় অপরাধ। কোনও আন্দোলন তো আলাদা ভাবে বিচার করা যায় না, দেখতে হয় একটি পূর্ণাঙ্গ প্রেক্ষিতে।

এই প্রেক্ষিতটি খুবই স্পষ্ট হয়েছে। বইটির অধ্যায়-বিন্যাস লক্ষ করলে তা বোঝা যায়। প্রথম অধ্যায়ে আছে তেভাগা কৃষক সংগ্রামের প্রেক্ষাপট হিসাবে বাংলার কৃষিব্যবস্থার রূপরেখা। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রসঙ্গ এই প্রেক্ষিতের অনুসন্ধান—বিনির্মাণ ও বিতর্কের আলোকে। তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয় ঔপনিবেশিক যুগের রাজনীতি : জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লিগ ও প্রশাসনের ভূমিকা। চতুর্থ অধ্যায়ের লক্ষ প্রান্তিক সমাজ অর্থাৎ তথাকথিত আদিবাসী ও জনজাতি সমাজ ও নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়। পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনা কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সাফল্য ও ব্যর্থতার পুনর্বিচার এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে তেভাগার সংগ্রামের তাৎপর্য ও মূল্যায়ন।

সব শেষের যেমন একটা শুরু থাকে, সব শুরুরই থাকে একটি প্রারম্ভিক পরিস্থিতি। তেভাগা আন্দোলন তো হঠাৎ ঘটে যায়নি— দীর্ঘকালীন আর্থ-সামাজিক সংকট ও রাজনৈতিক উদ্যোগের ফলেই তা ঘটেছে। সুস্নাত দাশ এই দু'টি প্রক্রিয়াই তথ্য, দলিল ও পূর্ববর্তী আলোচনার নির্ভরে ব্যাখ্যা করেছেন। দীর্ঘকাল ধরেই, বলা যায় যে প্রায় দেড়শতাধিক বছর, বাংলার কৃষিব্যবস্থা ও সম্পর্কের নানা সংকট, প্রায় অরাজকতাই তেভাগার বাস্তব প্রেক্ষাপট; রাজনৈতিক শক্তি অনুঘটকের কাজ করেছে মাত্র। এই ব্যাখ্যা মানলে মানতে হয় যে এই আন্দোলন ভুঁইফোঁড় নয়, কোনও দলই রাজনৈতিক কোনও স্বার্থে আন্দোলনটি কৃষকদের ওপর চাপিয়ে দেয়নি। কৃষিব্যবস্থা ও কৃষিসম্পর্কের দীর্ঘকালীন অরাজকতাই এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট। এই প্রেক্ষাপট আলোচনা করে গ্রন্থকার প্রাক-তেভাগা অনেক ছোট বড় আন্দোলনের সংবাদও জানিয়েছেন যা তেভাগার একটি পটভূমিকাও তৈরি করে। এই সব কারণে নিশ্চয়ই কৃষক-অসন্তোষ ক্রমশ পুঞ্জিভূত হয় ও কৃষকদের সংগঠন এক সময় শক্তিশালী হয় আর তেভাগা সংগ্রামের ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। এই ঘটনা ঐতিহাসিক বলেই তো দেশি-বিদেশি ইতিহাসবিদদের আগ্রহের সূত্রপাত। বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই সব ইতিহাসচর্চার সংবাদ জানা যায়, শোনা যায় সব বিতর্ক। সুস্নাত দাশ সেই বিতর্কের আলোকে তাঁর নিজস্ব অনুসন্ধান-ভিত্তিক যুক্তি স্থাপনা করেছেন, সেই ভিত্তিতেই খণ্ডন করেছেন অন্য অনেক ইতিহাসবিদের মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত। তাঁর একান্ত সিদ্ধান্ত এই রকম : 'ঔপনিবেশিক যুগে অবিভক্ত বাঙলায় তেভাগা আন্দোলনের মতো সংগঠিত ও শ্রেণীসচেতন কৃষক আন্দোলন ইতোপূর্বে ঘটেনি' (পৃ: ৮৯) এবং 'একটা স্বতঃস্ফূর্ততা বা অটোনমি তেভাগা আন্দোলনে বরাবরই ছিল। কৃষকসভা বা কমিউনিস্টরা অনুঘটকের কাজ করেছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করেছিল' (পৃ: ৮৪)। এর পাশাপাশি সমসাময়িক নানা তথ্য বিচার করে তাঁর আর একটি সিদ্ধান্ত হল: 'রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে যতই সংঘাত ও মতপার্থক্য থাকুক না কেন তেভাগা আন্দোলনের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে বাঙলার এই দুটি পরস্পর বিরোধী সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল হিন্দু ও মুসলিম জোতদারদের সংগঠিত ও সমবেত করে একত্রে জোতদার সমিতি গঠন করে এবং তেভাগা অধ্যুষিত এলাকায় সভাসমিতি সংগঠিত করে' (পৃ: ১২৭)। এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে। যেমন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা, সাফল্য ও ব্যর্থতার পুনর্বিচার করা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে। এবং তা করা হয়েছে অবশ্যই বিস্তৃত তথ্যের ভিত্তিতে এবং নানা বিতর্কের আলোকে। এই ভূমিকা, সাফল্য ও ব্যর্থতার হিসাবনিকাশের পর অবশ্য লেখকের বক্তব্য: 'তেভাগা কৃষক আন্দোলন যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির নেতৃত্বেই সংগঠিত হয়েছিল তা এখন প্রশ্নাতীত' (পৃ: ২০৯)। আবার এ কথাও তিনি বলছেন, চতুর্থ অধ্যায়ে, তেভাগায় আদিবাসী জনজাতির ভূমিকার আলোচনায় 'তেভাগা আন্দোলনের জঙ্গী চরিত্র অর্জিত হয়েছিল আদিবাসী ও উপজাতীয় কৃষকদের সংগ্রামী চেতনা ও ভূমিকা গ্রহণের ফলে। কিন্তু সন্দেহ নেই যে এই বলিষ্ঠসাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী যূথবদ্ধ সংগ্রামী মানসিকতা তৎকালীন কমিউনিস্ট ও কৃষক নেতৃত্বের মধ্যে অনুপস্থিত ছিল' (পৃ: ১৭৩)

এবার যাই স্মৃতিতে। তেভাগা আন্দোলনের সময় আমার বাল্যকাল। তখন বুঝিনি এখন বুঝতে পারি কেন তখন তেভাগার সূত্রে কংসারি হালদারদের চাইতেও মণিকুন্তলা সেন, ইলা মিত্র, অপর্ণা পালচৌধুরীদের নাম বেশি শুনতাম। এঁরা সব কমিউনিস্ট নেত্রী আর তেভাগার সময় কৃষক রমণীদের চেতনার যে জাগরণ তাতে তাঁদের ভূমিকা ঐতিহাসিক। আর সেই সময়, আমার সেই বালক বয়সের, একটি হাতে লেখা পত্রিকার একটি ছবি, বলা যায় 'নারী শক্তির মুক্তির' ছবি এখনও স্মৃতিতে উজ্জ্বল। ছবিটির ক্যাপশন ছিল 'ঝাঁটা বাহিনী', শিল্পী হেমন্ত দাস — কৃষক মহিলারা ঝাঁটা হাতে বন্দুকধারী পুলিশকে আক্রমণ করছেন। এই ছবির সঙ্গে মিলে যায় সুস্নাত দাশের উক্তি : তেভাগা আন্দোলনের সব থেকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল শ্রমজীবী নারী-চেতনার জাগরণ এবং নারীশক্তির মুক্তি। বাংলা তথা ভারতের গণআন্দোলনের ইতিহাসে নারীদের বিশেষতঃ শ্রমজীবী নারীসমাজের এত ব্যাপক অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগ অন্য কোন গণ আন্দোলনে ঘটেনি' (পৃ: ১৭৩)।

হেমন্ত দাসের ছবি 'ঝাঁটাবাহিনী'র একটি আক্ষরিক প্রতিচ্ছবি পাই বিপ্লব মাজীর 'তেভাগায় বাবা-মা' বইতে : ' কেন্দেমারীতে ধানকাটা ও মাঠ থেকে ধান তোলার সময় সেখ নেজিমুদ্দিন গ্রেপ্তার হন। নেজিমুদ্দিন গ্রেপ্তার হওয়ায় জোতদারের ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনী পুলিশ সঙ্গে নিয়ে মহম্মদপুর গ্রামে তাঁর খামারে

ধান লুঠ করতে গেলে লড়াই বাধে। খামারে ঢুকে তারা প্রথমে খড়ের গাদা ভাঙতে শুরু করে। আর ঠিক সেই সময় মার নেতৃত্বে শত শত কৃষক বউ ধুলো-বালি-লঙ্কাগুড়ো ছুঁড়তে ছুঁড়তে খামারের মধ্যে ঢুকে পড়েন। একদল মেয়ে পুলিশের বন্দুক ধরে টানাটানি শুরু করে দেয়। অন্য দল ঝাঁটা ও বঁটি নিয়ে আক্রমণ শানায়। ঘটনার আকস্মিকতায় পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনী বিমূঢ় হয়ে যায়। কী করবে ভেবে পায় না। মেয়েদের সংগঠিত আক্রমণে তারা প্রাণভয়ে বন্দুক ফেলে রেখে পালাতে থাকে' (পৃ:৯৮-৯৫)।

বিপ্লব মাজীর বই শুধুই ছবি নয়, স্মৃতির সূত্রে শুধুই তাঁর মা-বাবার বিপ্লবী জীবনের কর্মকাণ্ডের বিবরণ মাত্র নয়। সেই সূত্র ধরে বইটি ইতিহাসও বটে। মেদিনীপুর জেলায় কীভাবে কম্যুনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভা গড়ে উঠল তার বৃত্তান্ত যেমন আছে তেমনই আছে ওই জেলায় তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস। এবং এই আন্দোলনের একটি প্রেক্ষাপটও তিনি রচনা করেছেন। বিচক্ষণ ইতিহাসবিদের মতো তিনিও বলছেন 'তেভাগার পটভূমি একদিনে তৈরি হয়নি' (পৃ:৫১)। ঔপনিবেশিক যুগের কৃষিব্যবস্থা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, সামন্তপ্রথা, শোষণ প্রণালীর আলোচনা যেমন আছে, তেমনই আছে কৃষক-অসন্তোষ, তেভাগা আন্দোলন শুরু হওয়ার সময়ে তাদের অসহায় অবস্থান ও জোতদারদের দাপটের কাহিনি এবং কৃষক সভার সংগঠন, তার আগে ও পরে ইতস্তত বিক্ষোভ- আন্দোলনের সংবাদ - যেমন খাজনাবন্ধ আন্দোলন, তারকাটা আন্দোলন ইত্যাদির খবর। বিপ্লব মাজীর বইটিতে তাই ইতিহাস ও স্মৃতি চমৎকার মিশেছে।

যে 'সাধারণ ইতিহাস অনুরাগী বৃহত্তর পাঠক'দের জন্য সুস্নাত দাশ তাঁর ইতিহাস- গ্রন্থ রচনা করেছেন, এবং বিপ্লব মাজীর স্মৃতিচারণা যে ইতিহাসকে আরও সহজে পৌঁছে দেয় তাঁদের কাছে, সেই পাঠক-সাধারণের পক্ষে উভয়কেই সাধুবাদ জানাই।

অবিভক্ত বাঙলার কৃষক সংগ্রাম : তেভাগা আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত-পর্যালোচনা-পুনর্বিচার— সুস্নাত দাশ/ নক্ষত্র প্রকাশন, কলকাতা /১৫০.০০

তেভাগায় বাবা-মা — বিপ্লব মাজী/ প্রকাশনা, মেদিনীপুর/৫০.০০

আত্মহনন ও আত্ম উন্মোচনের কবি

গৌরী সেন

পবিত্র মুখোপাধ্যায় দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে কবিতাচর্চা করেছেন। 'একটি সাক্ষাৎকার'- এ (সত্তার সাম্রাজ্য ও কবিতা) কবিতার জগতে তিনি কখন এলেন ও কী প্রেরণায় এলেন সে সম্বন্ধে বলছেন, 'কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম স্কুল ম্যাগাজিন হাতে পেয়ে।' ১৯৪৯ - এ উদ্বাস্তু-শরণার্থী হয়ে এসেছিলেন কলকাতায়। 'কবিতা লেখার আগ্রহ এবং অনুপ্রেরণা আমি আমার স্কুল থেকেই পেয়েছি।' হাজরা পার্কের কোণে সেই সময়ের তরুণ লেখক কবি উৎপল বসু,সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের সঙ্গে পরিচয়। সহপাঠী মৃণাল দত্তের সঙ্গে ও কয়েকজন কবিতা প্রেমিকের সাহায্যে 'কবিপত্র' বের করেন ১৯৫৭-র ২৫শে বৈশাখ। প্রচণ্ড অর্থাভাব ও কষ্টকর জীবনযাত্রার মধ্যে কবিতাতেই তিনি আশ্রয় খুঁজে পান।তারপর দীর্ঘ ষাট বছরের জীবনে তাঁর কবিতা লেখা থেমে থাকেনি কখনও। 'দর্পণে অনেক মুখ'(১৯৬০) থেকে 'আমি এখন'(১৯৯৪) এই তিন দশক ধরে তাঁর কবিতাভাবনার বিবর্তন চোখে পড়ে। দীর্ঘ কবিতা 'শবযাত্রা' '৬১ সালে একটানা ছ'মাস ধরে লিখেছেন। 'আমার জীবনটাই পাথর ভাঙতে ভাঙতে পথ চলার, মসৃণতা জীবনের অভিজ্ঞতাতেই নেই'। সে কারণেই কবি প্রথম দিকের কবিতায় 'এক অন্ধকার পরাজগতে' বাস করছিলেন মানসিকভাবে। আবার ওই সময় '৬১-'৬২ তে প্রেমের কবিতা লিখছেন- 'অসীমের প্রতি সনেটগুচ্ছ'। '৬৪-'৬৫ সালে ঐতিহ্য ও বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে চাইলেন কবিতার মধ্যে। তিনি নিজের কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে বলেছেন -'' 'শবযাত্রা' ব্যক্তিগত শোক বা এলিজি, 'হেমন্তের সনেট'ও কবিতা-প্রেম-বিষাদ-মৃত্যু-এই ব্যক্তিগত বোধ ও অনুভব নির্ভর। 'আগুনের বাসিন্দায়' আমি ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে ব্যক্তবিশ্বের পথে প্রথম যাবার চেষ্টা করি''। এই পর্যায়ের কবিতার যুগকে তিনি 'বিষাদ যুগ' বলেছেন। তাঁর নিজস্ব স্বীকারোক্তি — ' অন্তত আমার কবিতা লেখার তিরিশ বছর ধরে এই বিষাদ একদিনের জন্যেও আমায় ছেড়ে যায়নি।'(সত্তার সাম্রাজ্য ও কবিতা,পৃ: ৯) এই প্রবন্ধে কবিতাচর্চা পর্বের সামান্য ইংগিত দিয়ে বলেছেন, 'এ এক ক্লান্ত পরিব্রাজকের পরিভ্রমণ।' নিজের অক্ষমতা ও সামর্থের সংগ্রামে নিরন্তর করেছেন আত্মানুসন্ধান। বামপন্থী কবিতার ছকবাঁধা নীরস চাতুরিতেও তিনি বিশ্বাসী নন। 'রাজনৈতিক কোনো ঘটনা যা আমাকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছে, যার বিরুদ্ধে আমি সচেতন

মনে প্রতিবাদ করেছি, তা নিয়ে সেই মুহূর্তে কবিতা লিখতে পারিনি।'(সত্তার সাম্রাজ্য ও কবিতা) তিনি বিশ্বাস করেন না কোনও প্রতিষ্ঠান কোনও কবিকে স্বীকৃতি দিতে পারে। অনিয়মিত 'কবিপত্র' প্রকাশের কালেও কবিতার জন্য স্বাধীন রাজ্য তৈরির স্বপ্নে কবির ক্ষান্তি নেই— তখনই কবিপত্রের 'পিকাশো সংখ্যা', ছোটগল্প সংখ্যা বা আধুনিক চিত্রকলা সংখ্যা প্রকাশিত হয়। দেশকাল সম্বন্ধে পূর্ণসচেতন থেকেও, কবিতায় দেশকালকে তিনি কীভাবে প্রকাশ করেছেন বা করবেন সেটি স্পষ্ট করে বলেছেন, "দেশকাল সন্ততি সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নবোধ কবিকে প্রাজ্ঞ করে তোলে; ইতিহাসবোধ খুব পরিষ্কার ভাবেই থাকা চাই কবির; চাই অতি সূক্ষ্ম আহ্বানেই সাড়া দেবার যোগ্য সংবেদনশীলতা; অর্থাৎ দারুণভাবে জীবনাসক্ত, জীবনপ্রেমিক; আবার তারই মধ্যে সন্ন্যাসীর উদাসীনতা, যে জীবন ও মৃত্যুকে গ্রহণ করবে অতি স্বাভাবিক ভাবে; স্বার্থ ও স্বার্থহীনতা, গরিমাবোধ যার আছে, সে বহুর জন্যে নিজের স্বত্ব ছেড়ে দেয় মুহূর্তের মধ্যে। অর্থাৎ কবির কাছে "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"। দীর্ঘ ষাট বছরের জীবনে ও চল্লিশ বছরের কাব্যজীবনে কবি এই ধারণাগুলিই তাঁর কবিতায় প্রকাশ করে চলেছেন। পবিত্র মুখোপাধ্যায় নিজেকে নিরন্তর খুঁড়ে খুঁড়ে দেখে মানুষের ব্যথা বেদনা আনন্দকে মানবিক আবেগে ধরতে চেয়েছেন তাঁর কবিতায়। তাই তিনি আত্মসচেতনতার কবি ও মানুষের কবি। মানুষের হৃদয়ের কাছে পৌঁছতে পেরেছেন বলেই তিনি পেয়েছেন যশ ও প্রতিষ্ঠা। বাণিজ্যিক কোনও সংস্থা তাঁকে যশ এনে দিতে পারে না। স্বকৃতি ও স্বআদর্শে যুগের সঙ্গে দু' হাতে কবি তাঁর কবিতায় কালের মন্দিরা বাজিয়ে চলেছেন। এখানেই তাঁর কবিকৃতির মহত্ত্ব ও গরিমা। 'সত্তার সাম্রাজ্য ও কবিতা',(কবিরই সম্পাদনা) এই গ্রন্থটির প্রতিটি প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকারে কবি তাঁর কবিতার যাত্রাপথ, উদ্দেশ্য ও উত্তরণের সংবাদ দিয়েছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বিদ্যানগর মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত শ্রীমতী ডলি দাশগুপ্ত কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্ম, কবিজীবন ও মনন, কাব্য ভাবনার রীতি প্রকৃতি খুবই বিশ্বস্ত ভাবে তুলে ধরেছেন'কবিতার কালপুরুষ'-এ। তিনি 'আমার কথা' বইটির ভূমিকাতে স্পষ্ট সরল ভাষায় বলেছেন, "আধুনিক কবিতার প্রতি তেমন কোনো আকর্ষণ আমি অনুভব করিনি। কারণ বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও সমর সেন প্রভৃতি তিরিশের দশকের ক'য়েকজনের কবিতার দুর্বোধ্যতা স্বাভাবিক ভাবেই আমাকে আধুনিক কবিতার প্রতি বিমুখ করে তুলেছিল। কিন্তু পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতা আমাকে টানলো। তাঁর মতো আমারও মনে হল, "আমি এখন কিছু একটা করতে চাই"। আর সেই কিছু একটা করার ইচ্ছাই আমাকে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসংসারের ঐশ্বর্য সকল কাব্যরসিকদের দরবারে হাজির করার তাগিদ জোগাল।" লেখিকার এই অকপট স্বীকারোক্তি আমাদের কপট হৃদয়কে আন্দোলিত করে একটি প্রশ্নে - তিনি কি সত্যিই উল্লিখিত কবিদের আরও গভীরে গিয়ে অনুধাবন করতে পারতেন না। মনে হয় পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতার অনুধাবন তাঁর পূর্বসূরী কবিদের অনুধাবনেই সম্পূর্ণ উপলব্ধির চেতনায় আন্দোলিত করা সম্ভব। তবু পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কাব্যজীবন ও কবিতার গতিপ্রকৃতি ও অন্বেষা খুবই গভীরভাবে অনুধাবন করে এই আলোচনা গ্রন্থটি লিখেছেন। চোদ্দটি পরিচ্ছেদে খুব তন্নিষ্ঠভাবে লেখিকা অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ করেছেন কবির মনন চিন্তার রীতি প্রকৃতি, কবির কাব্যজগতে উত্তরণ ও সাফল্যের সীমা। এই কাজটি তিনি করেছেন একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। তাঁর আলোচনা-বইটির জন্য তিনি নিশ্চয়ই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘ ষাট বৎসরের জীবনে ও চল্লিশ বছরের কাব্যজীবনের একেবারে শেষের দিকের ফসল 'সন্ধিক্ষণে আছি' কাব্যগ্রন্থটি। বহু সময়কে অতিক্রম করে এই বইটিতে তিনি নতুন ও পুরাতন শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছেন। সন্ধিক্ষণের সময়কে তিনি ধরেছেন অতীতের অভিজ্ঞতা ও মননের আলোকে। চল্লিশ বছরের কাব্যজীবনে অভিজ্ঞতা ও সঞ্চয় তো কম নয়। কাব্যগ্রন্থের সংখ্যাও তো ঈর্ষণীয়। 'দর্পণে অনেক মুখ' (১৯৬০), 'শবযাত্রা'(১৯৬১), 'হেমন্তের সনেট' (১৯৬১), 'আগুনের বাসিন্দা'(১৯৬৭), 'ইবলিশের আত্মদর্শন'(১৯৬৯), 'অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সংক্রান্ত'(১৯৭০), 'বিযুক্তির স্বেদ ও রক্ত'(১৯৭২), 'দ্রোহহীন আমার দিনগুলি' (১৯৮২), 'পশুপক্ষী সিরিজ'(১৯৮২), 'অলর্কের উপাখ্যান'(১৯৮২), 'ভারবাহীদের গান'(১৯৮৩), 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি'(১৯৮৫), 'আমি প্রেমে বিষাদে বিপ্লবে(১৯৮৭), 'আমি এখন'(১৯৯৪), 'আরোগ্যভূমির দিকে'(১৯৯৪), 'পরশুরাম পর্ব'(১৯৯৭), 'বিষ নয় উঠেছে অমৃত'(১৯৯৯), 'সন্ধিক্ষণে আছি'(২০০১), 'দুই শতকের আমি'(২০০১)। পবিত্র মুখোপাধ্যায় কবিতায় নিজেকে বারবার ভেঙেছেন, বারবার গড়েছেন। আত্মতৃপ্তি কবিদের জন্য নয়। তাই এই কবিও এক ধরনের অতৃপ্তিতে ভোগেন। ষাটের দশকের 'ধ্বংসকালীন কবিতা আন্দোলন, আশির দশকে থার্ড লিটারেচার আন্দোলন, এবং প্রয়োগবাদী কবিতা আন্দোলনের তিনি অন্যতম পথিকৃৎ।' সুদীর্ঘ কাব্যজীবনে তিনি কখনও পুরনো হন না; বারবার নিজেকে ভেঙে, নিজেকে মাঝে মাঝে বদলে তিনি তাঁর কবিতায় নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে ওঠেন। সত্তর দশকের রক্তঝরা দিনগুলিতে তাঁর মানসিক বিক্রিয়ার ফসল 'ইবলিশের আত্মদর্শন', আবার থার্ড

লিটারেচোরের পক্ষে তাঁর স্পষ্ট উক্তি- 'আমরা তক্‌মা মেরে লেখক হতে চাই না। আমাদের সাহিত্য থাকবে বনে বাদাড়ে, কলে কারখানায় জনতায় এবং নির্জনতায়।'

'সন্ধিক্ষণে আছি' কবিতার বইটি কবির দীর্ঘ কাব্যজীবনের পরিণত ফসল— ফেব্রুয়ারির (২০০১) বইমেলায় প্রকাশিত। এই বইটির ভূমিকা প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'সর্বস্ব দানের সাধনা, দিতে হবে সমগ্র জীবন, জীবনের কাজ ও চিন্তা, বর্তমান ও ভবিষ্যতের তাবৎ স্বপ্ন ও সাধনা।' সর্বস্ব দানের শেষে তিনি শূন্যহাতে ফেরেননি। তিনি বলেছেন,— "শুধু কবিতা নয়; যে কোন শিল্পের দাবী নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। প্রতি মুহূর্তের চিন্তা, উপলব্ধির ঘূর্ণিতে পাক খেতে খেতে তলিয়ে যায় 'জীবন যৌবন ধন মান'। আর উঠে আসে মন্থন শেষের ভয়ংকর বিষ; আর তা ধারণ করেই কবি হন নীলকণ্ঠ।" কবিতায় কবি অর্ধেক জীবনকে দেখেননি, দেখেছেন পূর্ণ জীবনের অভিজ্ঞতায়। 'সন্ধিক্ষণে আছি' কাব্যগ্রন্থটির কবিতাগুলি পুরনো নতুন শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে লেখা। ষাটের দশকের কবি সমকালীন হয়েও চিরকালীন। ষাট বছরের পরিণত বয়সে তাঁর সদর্পিত ঘোষণা, 'কখনও আমি থামিনি কোন বাঁকে।' জীবনে প্রত্যেকটি বাঁককে অতিক্রম করে তিনি একবিংশ শতাব্দীর আঙিনায় দাঁড়িয়ে যুগ-সন্ধিক্ষণের ক্রান্তিকালকে চিনে নিচ্ছেন। তাই তাঁর উচ্চকিত ঘোষণা —

চাঁদ ফুল তারা নিয়ে লেখার সময়
শেষ হয়ে গেছে — মনে হয়।
(জীবন দেখিনি যত দেখা প্রয়োজন)

'কবিতার দিন' কবিতায় তিনি বলেন, এই সন্ধিক্ষণই কবিতার শুভক্ষণ —

আমি বলি : কবিতার এমন সুন্দর শুভক্ষণ
আগে তো আসে নি। আজ স্বপ্ন দেখা বেশি প্রয়োজন।

কেননা এই সময় 'স্বপ্নজীবীর আকাল'। আবাল্য কবিতাপ্রেমী কবি জীবনের সমগ্রতাকে ধরতে চেয়েছেন কিন্তু তিনি জানেন মাঝে মাঝে পেয়েও হারাতে হয়। এই হারা না-হারার খেলায় কবিতা কবির কাছে চায় পূর্ণাহুতি, কিন্তু কাব্যসুন্দরী তাঁকে অপূর্ণ করে রাখে; তিনি জানেন এই দীর্ঘ জীবনের শেষের অধ্যায়ে কাব্যসুন্দরী 'তাঁর কাছে পেতে চায় পূর্ণতার স্বাদ, বুকে জুড়ে রাখো 'লাখো চিতা', — কবিচেতনার সেই আগুনের ফুলকি[illegible]য় কবি লেখেন নতুন শতাব্দীর কবিতা। কবি এই ক্লান্তিকর [illegible]নের শেষে — কবিতাপাঠের সভাগৃহে, আমন্ত্রিত স্তাবক পাঠককুলকে তাঁর কবিতার শরিক করতে চান না। রিরংসা, বিকৃতি, অবক্ষয়ের বিশ্বকুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়েও, তিনি কবিতাকে জানতে চেয়েছেন 'প্রার্থিত শান্তির আকাঙ্ক্ষায়'।

তিনি জানেন অসীম হয়েও সীমিত তাঁর ক্ষমতা, — 'কতটুকু পারি আমি'? তাঁর নিজের কাছেই এই প্রশ্ন রেখেছেন তিনি। কবি কোনও 'প্রভুর বান্দা' হতে চান না, কাব্য জগতে, তাঁর স্বচ্ছন্দ মুক্তি; যদিও সে মুক্তি জীবনযন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত। তবুও মাঠ ভেঙে হেঁটে পৌঁছেছেন সন্ধিক্ষণের সময়ে, অতীতের দিকে মুখ রেখেও তাঁকে সময়োচিত হতে হবেই, এ কথা কবি জানেন। তিনি সাধারণ হয়ে সাধারণ মানুষের কথাই বলতে চান কবিতায়, তবু তিনি জানেন এই সময় সন্ধিক্ষণের সময়, আগামী দিনের রণক্ষেত্রে-কুরুক্ষেত্রে এক পা বাড়িয়ে রাখতেই হবে। বড় কঠিন এই সন্ধিক্ষণে থাকা, — 'মানুষ অথচ কী দূরে সরে যায়', 'শিশুও সন্দিগ্ধ আজ সন্তের আশ্বাসে' এবং 'তুমিই বাঁচবে শুধু' এই আশ্বাস এই প্রতিশ্রুতি কোনও পাঠকই দেবে না কোনও কবিকে। কেননা 'তুমি তো ঈশ্বর নও, এমন কি প্রভুও নও, প্রভুর স্তাবক।' কবির স্বীকারোক্তি 'শুধুই নিয়েছো তুমি হাত ভরে, পরিবর্তে এই পৃথিবীকে কতোটুকু দিলে'? কিন্তু তাঁর নিঃশ্বাসে বাংলা, বাংলাভাষা। এই যুগসন্ধিক্ষণে 'কে আমার মুখ থেকে মাতৃভাষা কেড়ে নিতে চায়' — কবি এ বিষয়ে যেমন সচেতন তেমনই জানেন, শত প্রতিরোধের মধ্যেও 'দুঃখ হলেও অশেষ, ফিরে পাবো মাতৃভাষা, কেড়ে নেব স্বপ্রেমে স্ববলে'। (আমার নিঃশ্বাসে বাংলা)। কবি জানেন সন্ধিক্ষণের এই সময়ে 'সাফল্য নেই, স্বপ্ন পূরণের কোন কবচ তাবিজ নেই। 'তবুও কবি আছেন 'সন্ত্রস্ত, আতুর' মানুষের পাশে। এদের পাশে থাকতে থাকতেই মানবতাবাদী কবি অনিত্যে বাসা বেঁধে, 'যৌবনেই হয়ে যাই স্বপ্নহীন, ত্রিকালজ্ঞ বুড়ো।' ত্রিকালজ্ঞ কবি মানুষের মাঝে সাধারণ হয়েই আছেন, 'আজো আছি সাধারণ সকলের মতো'। কিন্তু 'কবির পৃথিবী বড় সংবেদনময়', 'কবি তো সর্বস্বত্যাগী যোগী নয় সে তো ভোগবাদী'। যুগসন্ধিক্ষণের এই কঠিন সময়েও কবি প্রতিযোগিতার মুখোমুখী হতে চান, হতে পারেন; এই খানেই মানবপ্রেমী,দেশপ্রেমী, বাংলাপ্রেমী কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কবিমনস্কতার জোর। তিনি জানেন সন্ধিক্ষণের এই সময় বড় উদ্দেশ্যবিহীন অস্থির। তবুও 'শিল্পে কোন স্থান নেই প্রতিযোগিতার', তাই নিজশিল্পকর্ম কবিতার কাছেই একান্ত প্রার্থনা —

নাও, ধরো, নিঃস্ব ক'রে নাও
সর্বস্ব আমার।

সত্তার সাম্রাজ্য ও কবিতা—পবিত্র মুখোপাধ্যায়/ইশক্রা, কলকাতা ৫৮/৬০.০০
কবিতার কালপুরুষ: পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও কবিতা—ডলি দাশগুপ্ত/সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা ৩৪/৬০.০০
সন্ধিক্ষণে আছি—পবিত্র মুখোপাধ্যায়/বিন্দুবিসর্গ, কলকাতা ৫৫/৩০.০০

বড়দের অভিধান বনাম ছোটদের অভিধান

সূর্যাংশু ভট্টাচার্য

যে কোনও ভাষাশিক্ষায় সে ভাষার অভিধানের গুরুত্ব সমধিক। ভাষা ব্যবহারে সিদ্ধিলাভ করতে হলে শুদ্ধ ভাষার ঋদ্ধি প্রাথমিক শর্ত। শুদ্ধ ভাষার নানা দিক রয়েছে। তার মধ্যে বানানের শুদ্ধতা হচ্ছে একেবারে গোড়ার কথা।

১২৯২ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধে বাংলা বানানের সমস্যার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। অবশ্য বিদেশিদের বাংলা শেখার প্রয়োজনে অনেক পূর্বেই বাংলা অভিধান রচনার সূত্রপাত হয়েছিল। ১৭৪৩ সালে আস্-সুম্পসাঁওয়ের 'পর্তুগীজ বাংলা অভিধান', ১৭৮৮ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'The Indian Vocabulary', ১৭৯৩ সালে ক্রনিকল প্রেস থেকে প্রকাশিত অভিধান এবং ১৭৯৯ সালে প্রকাশিত Foster এর অভিধানের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ১৩২২ সালে যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির 'বাঙ্গলা শব্দকোষ' একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এ ভাবে কালক্রমে বাংলা বানান এবং তার উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা-গবেষণা একটি গ্রাহ্য রূপ লাভ করে। ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'বাংলা বানানের নিয়ম' তৈরি করে তা প্রচলন করতে উদ্যোগ নেয়। ফলে বিতণ্ডা দেখা দেয়। ১৩৩২ সালে বিশ্বভারতী প্রণয়ন করে 'চলিত ভাষার বানান'। ১৯৯২ সালে ঢাকার বাংলা একাডেমি প্রকাশ করে 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম'। তারপরে ১৯৯৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশ করে 'আকাদেমি বানান অভিধান'। এপারের আকাদেমি ওপারের বানানে দাঁড়ায় 'একাডেমি'। এই বানান পার্থক্য বাংলা বানানের মতবৈষম্যকে লুপ্ত হতে দিচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি যেমন বাংলা বানানের রীতি 'এপারে' বেঁধে দিতে চাইছেন, তেমনই ঢাকার বাংলা একাডেমি তার 'প্রমিত বাংলা বানান'এর নিয়ম 'ওপারে' চালাতে চান। তাই একটা যৌথ প্রচেষ্টা ছাড়া, মনে হয়, বাংলা বানানের সমস্যা মেটার নয়।

সে যাই হোক, অমিতাভ মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির রীতি অনুসরণ করে রচনা করেছেন 'সহজ বাংলা অভিধান'। প্রথম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা শিখতে গিয়ে যাতে শুদ্ধ বানান শেখে তার জন্য তাঁর ওই প্রচেষ্টা। সাধারণ পাঠকদের প্রয়োজন মেটানোর কথা তিনি মনে রেখেছেন। ফলে দুই নৌকায় পা দিতে গিয়ে কোথাও কোথাও তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি কিঞ্চিৎ অবিচার করে ফেলেছেন।

প্রথম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের শব্দভাণ্ডারের কথা যদি শ্রীমুখোপাধ্যায় স্মরণ রাখতেন, তবে তাঁর অভিধানের আয়তন আরও কৃশ হতে পারত। শিশুদের শব্দভাণ্ডার নিয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে। $১\frac{১}{২}$ বছর বয়সে শিশুর শব্দভাণ্ডারে থাকে ২২ টি শব্দ। তিন বছর বয়সের মধ্যে শিশুর সংগ্রহ ২৭২-৮৯৬ টি শব্দ। ৪ বছর বয়সে শিশুর আয়ত্তে ১৫৪০ টি শব্দ। $৪\frac{১}{২}$ বছর বয়সে শিশু জানে ১৮৭০ টি শব্দ। পাঁচ বছর পূর্ণ হতে শিশুর শব্দভাণ্ডারে আসে ২০৭২ টি শব্দ। শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশের এই ধারার কথা মাথায় রেখে অভিধান রচিত হলে তা শিশুদের কাছে বেশি উপযোগী হবে। আসলে শিশুদের আমরা 'ছোট বয়স্ক মানুষ' মনে করি বলেই শিশুদের প্রায়ই শিশু বলে মনে করতে ভুলে যাই। বয়স্কদের অভিধান এবং শিশুদের অভিধান এক হতে পারে না। শব্দসংখ্যা কমালেই বড়দের অভিধান ছোটদের অভিধান হয়ে যায় না। বাংলায় এখনও শিশুদের জন্য ভাল অভিধান তৈরি হয়নি। ইংরাজি ভাষায় শিশুদের জন্য রকমারি অভিধান তৈরি হয়েছে, তৈরি হচ্ছেও শিশুরা 'আনন্দের সঙ্গে' সেই সব অভিধান ব্যবহার করে। Oxford Children's Colour Dictionary একটি শিশুদের অভিধান। এই অভিধানে রয়েছে ৫০০০ টি শব্দ এবং ৩০০ টি রঙিন ছবি। ছয় বছরের বেশি যে শিশুদের বয়স তাদের উদ্দেশ্য করেই রঙচঙে এই আকর্ষণীয় অভিধান। ম্যাকমিলানের 'ডিক্‌সেনারি ফর চিলড্রেন' অভিধানটি একটি উল্লেখযোগ্য ইংরাজি অভিধান। ছোটদের এই অভিধানের ভূমিকায় বলা হয়েছে, 'It is different from the dictionaries that adults use, and also from the word book for younger children who have not really learned to read.' ছোটদের কাছে অভিধানকে আকর্ষণীয় করার জন্য, দেওয়া হয়েছে 'Picture in full colour' এবং বড় টাইপে বইটি ছাপানো হয়েছে। বলা হয়েছে অভিধানটি 'is also a book you (children) will want to read just for fun' অভিধানটিতে 'Abdomen' শব্দটির অর্থ যে পেট তা বোঝাবার জন্যে একটা মৌমাছির ছবি দেওয়া হয়েছে। 'Anchor' শব্দের

অর্থ বোঝাতে একটি চার রঙের ছবি দেওয়া হয়েছে। 'cherry অর্থ ছোট গোলাকার লাল মসৃণ ত্বকের ফল। তিন রঙের ছবিতে পাতাসুদ্ধ চেরিফল দেখানো হয়েছে। Orient Longman এর Junior English Dictionary-র ভূমিকাতে বলা হয়েছে 'A fixed list of words is used in explaining the meanings of the 5,500 main words' দুই অর্থে অভিধানটি ছাত্রদের উপযোগী। '...... it is a learning dictionary, and it uses a fixed list of words......''A' দিয়ে শব্দগুলোর মধ্যে ২৩ টি ছবি রয়েছে, আগের অভিধানটিতে A পর্যায়ে রয়েছে ৬৫ টি নানা রঙের ছবি। Charlie Brown Dictionary আর একটি ছোটদের অভিধান। এই অভিধানে রয়েছে মোট ৫৮০ টি নানা রঙের বড় বড় ছবি। মোট শব্দের সংখ্যা ২৪০০ টি। এই অভিধানটি তৈরির মূলে রয়েছে একটি তত্ত্ব। সে তত্ত্ব হচ্ছে — আনন্দের সঙ্গে শেখো। শিশুরা আনন্দ পেলে ভাল করে শিখবে। বলা হয়েছে, 'They should find it a source of pleasure so that, as they grow, they will easily turn to more advance dictionaries as a source of knowledge.' এই অভিধানের শব্দভাণ্ডার তৈরি হয়েছে দুটি সূত্র থেকে। প্রথম সূত্র, ছোটরা যে সব বই পড়ে তা থেকে, দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে দৈনিক সংবাদপত্রের ছোটদের পাতা থেকে। A পর্যায়ে এই অভিধানে রয়েছে বহু রঙের ২৮ টি ছবি। দুর্ভাগ্যের বিষয় এ সব বিষয়ে অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ভেবেছেন বলে কোনও চিহ্ন পুস্তকটিতে নেই। তবে অভিধানটির মলাট শিশুদের আকর্ষণ করবে। অভিধানটির অ-পর্যায়ে রয়েছে মাত্র ৬টি ছবি। ছোটদের অভিধানে আরও বেশি ছবি থাকা ভাল। অভিধানটি ছোটদের আরও বেশি প্রয়োজন মেটাতে পারত যদি শব্দার্থগুলো সাজানোতে সহজ অর্থ থেকে কঠিন অর্থ - এই পরম্পরায় অর্থগুলোকে সর্বত্র সাজানো হত। কিন্তু সর্বদা তা নেই। যেমন (ক) 'অখণ্ড' শব্দের অর্থ এ ভাবে সাজালে ভালো হয় — পুরো/পূর্ণ/গোটা..... (খ) অকস্মাৎ - হঠাৎ/সহসা/আচমকা...... (গ) অকর্মা - কুঁড়ে/অলস (এই শব্দার্থ দুটোর উল্লেখ পর্যন্ত নেই)...... (ঘ)। অকর্মা এবং অকর্মণ্য শব্দদুটির অর্থ দেওয়া হয়েছে 'কোন কাজের নয়'। তা হলে অকর্মা শব্দের অর্থ অকর্মণ্য এবং অকর্মণ্য শব্দের অর্থ অকর্মা। কিন্তু, তা উল্লেখ করা হয়নি। এ রকম আরও আছে। ছোটদের অপ্রয়োজনীয় বহু শব্দ নেওয়া হয়েছে অভিধানে। যেমন - অলজ্জ, অলজ্জিত, অলবড্ডে, অর্থী, আণ্ডিল, আম্বা, আলবাল, ইরম্মদ, ইরাবান, ইল্লাদ, ইশাদি, উঁচুকপালি, ইতু, উত্তান, উর্বী, ঋষভ, কাদম্বিনী, কলোর, কাবিল, কম্ভালিক, শমসের, সদস্য, সমাধা, সৌভিক, হস্তবুদ, রম্ভা মন্দন। এ ধরনের শতাধিক শব্দ সহজেই বাদ দেওয়া যেত। এ ছাড়াও বাদ দেওয়া যেত বহু বিদেশি শব্দ। এই শব্দগুলো ৫ বছর থেকে ১২ বছরের শিশুদের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। এই অপ্রয়োজনীয় মেদ ঝেড়ে ফেললে এবং ছবির পরিমাণ (দু/তিন রঙের ছবি হলে আরও ভাল) বাড়ালে এ অভিধান শিশুদের আনন্দ দেবে। বাংলাভাষায় ছোটদের অভিধান দুর্লভ। তাই এই অভিধানটি স্কুলপড়ুয়াদের বিশেষ কাজে লাগবে।

সহজ বাংলা অভিধান— অমিতাভ মুখোপাধ্যায়/মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লি, কলকাতা - ৯ / ৬০.০০

তৃষ্ণা রয়ে গেল

উৎপল চক্রবর্তী

কোনও গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক যখন কবুল করেন, 'অবশ্যস্বীকার্য, এই নির্বাচন ব্যক্তিগত নির্বাচন (লেখক আর উপন্যাস. নির্বাচন)। এবং সে কারণেই তা সর্বজন অনুমোদন না-ও পেতে পারে' — তখন, গ্রন্থপাঠে পাঠকের অসুবিধা হয় না, সমালোচক হয় দ্বিধাগ্রস্ত। কারও ব্যক্তিগত মতের সপক্ষে বা বিপক্ষে কী-ই বা বলার থাকতে পারে! অপিচ, নির্বাচিত ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যদি কেউ বন্ধুস্থানীয় হন, তা হলে তাঁর উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা পাঠকের রসগ্রহণে বিঘ্ন না ঘটালেও, সমালোচক বিভ্রান্ত হন অন্য লেখকের ক্ষেত্রে এ রকমটা না ঘটতে দেখলে। এবংবিধ দ্বিধা এবং বিভ্রান্তি নিয়ে তবু এই আলোচনা, কারণ, লেখক ভূমিকায় এ কথাও কবুল করেছেন, 'এটি কোন অ্যাকাডেমিক বই নয়'।

'মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে' এই কাব্যময় নামের আড়ালে উপোভোক্তার গদ্যে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় আলোচনা করেছেন এমন ক'য়েকজনের কৃতকর্মের যাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে ব্যতিক্রম বিবেচনা করলে, তারাশংকর, বিভূতিভূষণ, মানিক সমরেশ, সতীনাথ, নারায়ণ, সন্তোষ, ধূর্জটিপ্রসাদ, শরদিন্দু,

অদ্বৈত মল্লবর্মন, বিমল মিত্র এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায় — অবশ্যই উপন্যাসকার হিসাবে স্মরণীয়। কিন্তু সৈয়দ মুজতবা আলি, বুদ্ধদেব বসু, সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর খ্যাতি মূলত ছোটগল্পে। এঁদের নির্বাচন কেন—এই প্রশ্নের আড়ালে আরও প্রশ্ন যেমন তা হলে অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র, প্রবোধ সান্যাল ইত্যাদিরা নেই কেন? শরৎচন্দ্রই বা অনুপস্থিত কেন? এই সামান্য কৌতূহলের উত্তর যদি হয় 'ব্যক্তিগত নির্বাচন' — তা হলে আরও একটি কৌতূহলী প্রশ্ন, এই নির্বাচনের যুক্তিগুলি কী? নিছক ভাললাগার স্বেচ্ছাচার নিশ্চয় নয়। কেননা, 'এই গ্রন্থে বিংশ শতাব্দের মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বাংলা উপন্যাসের একটি সামগ্রিক ছবি দেবার প্রয়াস করা হয়েছে।'— এ ঘোষণা লেখকেরই। কিন্তু 'সামগ্রিক ছবি'র শিল্পী তাঁর ব্যক্তিগত নির্বাচিত' ওই ক'জন। 'শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা'য় কাতর লেখক জীবিতদের বাদ দিয়েছেন, তা হলে মৃত অমরেন্দ্র ঘোষ (চরকাশেম), অন্নদাশংকর (সত্যাসত্য), মনোজ বসু (নিশিকুটুম্ব), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (নীলাঙ্গুরীয়), গোপাল হালদার (একদা), প্রমথ বিশী (লালকেল্লা), বনফুল (স্থাবর), সরোজকুমার রায়চৌধুরী (কালো ঘোড়া), ইত্যাদিরা এবং আরও অনেকে বাদ কেন? এঁদের বাদ দিয়ে 'সামগ্রিক ছবি'! ভৌতিক উপদ্রবের আশঙ্কা না'ও যদি থাকে পাঠক সমালোচকদের উপদ্রবী প্রশ্ন এড়াবেন কী করে?

এ কথা থাক। কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি। বরং এ কথা উচ্চারণেই তৃপ্তি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই। অতএব তৃপ্ত হওয়া যায় কি না তার জন্য পাতা উল্টে যাই।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই রবীন্দ্রনাথ, তারাশংকর প্রমুখ যাঁদের উপন্যাস বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক, প্রতিটি রচনাতেই তাঁর মননশীলতা, সংবেদনশীলতা, রসজ্ঞ মনের আন্তরিকতা, সর্বোপরি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পারদর্শিতা সুপরিস্ফুট। সব চেয়ে দীর্ঘ রচনাটি সুবোধ ঘোষের উপন্যাস সম্পর্কে। সংক্ষিপ্ত বিমল মিত্র প্রসঙ্গ। এর অর্থ এই নয় যে সর্বক্ষেত্রে মূল্যায়নে অতিরেক বা অসম্পূর্ণতা ঘটেছে এ কারণে। পাঠকপ্রত্যাশাও তৃপ্ত হয় না। বিশেষত যদি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তারাশংকরদের সঙ্গে উপন্যাস লিখিয়ের তালিকাভুক্ত হতে পারেন, তবে তার জন্য যে বিস্তারিত বিশ্লেষণের গভীরতা প্রত্যাশিত ছিল তা পাওয়া যায়নি। বিমল মিত্রও বোধহয় আর একটু পরিসর দাবি করেন। সতীনাথ ভাদুড়ির মাত্র দুটি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা, যথাযথ। কিন্তু অচিনরাগিণী? লেখকের কি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস বলে মনে হয়নি? নরেন্দ্রনাথের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে তাঁর ছোটগল্পে সিদ্ধির কথাও। কিন্তু সুবোধ ঘোষ সম্পর্কে বিস্তারিত লেখায় তাঁর হীরক-প্রভ ছোটগল্প প্রসঙ্গ নেই দেখে একটু অবাকই লাগে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে লেখাটিও সংক্ষিপ্ত এবং আশ্চর্য এই যে মাত্র একটি উপন্যাস নিয়েই আলোচনা। ছোটগল্প প্রসঙ্গটিও অনুপস্থিত। জ্যোতিরিন্দ্র প্রসঙ্গেও এই অপ্রাপ্তির বেদনা। অথচ বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস নিয়ে তাঁর বক্তব্য যথার্থই সুবিবেচিত। এই রসময় বিশ্লেষণ মুজতবা বা সন্তোষ ঘোষের রচনা বিষয়েও। অপ্রধান ঔপন্যাসিক ধূর্জটিপ্রসাদের রচনাটিও সুরচিত। শরদিন্দুর উপন্যাস ও ছোটগল্প দুই-ই আলোচিত এবং তা যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণসহ। অদ্বৈত মল্লবর্মন বিষয়ক আলোচনাটিও অন্তরঙ্গ, সংবেদনময়,আন্তরিক।

সমগ্র গ্রন্থটির পাতা ওলটানোর পর আপশোস জাগে, প্রশ্ন ওঠে মনে। আবার বিমুগ্ধতাও লেখকের রচনাসৌকর্যে। আপশোস এই যে এমন সহৃদয় প্রকৃত রসজ্ঞ আলোচক তাঁর ব্যক্তিগত নির্বাচনেও যাঁদের অগ্রাধিকার দিয়েছেন, সবার প্রতি সমযত্নবান বিশ্লেষণে যেন কুণ্ঠিত। প্রশ্ন এই যে, আগেই লিখেছি, অনেক প্রধান ঔপন্যাসিক বাদ পড়লেন কেন? আর বিমুগ্ধতার কারণ গ্রন্থটির নামকরণের কাব্যময়তায়, লেখকের ভাষাশৈলীর চমৎকারিত্বে, বিশ্লেষণের স্বীয় অনুভবের অকপট উদঘাটনে। তবু তৃষ্ণা রয়ে গেল। তাই 'এখানেই উপন্যাস সম্পর্কে আমার সব কথা বলা শেষ হয়ে যায় নি। এরপরে অন্য পরিকল্পনায় এ ধরনের বই লেখার ইচ্ছে আছে।' লেখকের এই শুভবাসনা তাঁর লেখা গ্রন্থপাঠে আমাদের আরও মনোযোগী করে তোলে। আশান্বিতও। নিশ্চয় তৃষ্ণা মেটাবেন তিনি।

মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়/ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩/ ১৫০.০০

সমাজ সংস্কারধর্মী গল্প সংকলন

অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়

হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত "মুক্তিযুদ্ধের শতগল্প" প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড মিলিয়ে মোট একশো জন লেখক লেখিকার একশোটি গল্পের সংকলন। পাকিস্তান তৈরি হবার পর থেকেই পূর্ব বাংলার মানুষ বাংলা ভাষার স্বীকৃতির জন্য সোচ্চার। ৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। ভাষা আন্দোলনের পথ দিয়ে বাঙালির যে যাত্রা শুরু, ১৯৭১ সালে সেই পথ দিয়েই এসে পড়ে একটা আলাদা দেশের জন্মলগ্ন। স্বাধীন বাংলাদেশ। পূর্ব পাকিস্তানের লড়াকু বাঙালির জন্য একটা আলাদা ভৌগোলিক পরিচয়। স্বাধীন বাংলাদেশ গড়তে বাঙালিকে কতটা ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে সেই ইতিহাস বড় বেদনার সঙ্গে এই সংকলনের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতার নির্মম হত্যা, খান সেনাদের হাতে বাঙালি মেয়েদের নিষ্ঠুর অত্যাচার, ধর্ষণ, রাজাকার সম্প্রদায়ের স্তাবকতা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ধরিয়ে দেওয়ার বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে লেখা গল্পগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেবার আগে বীর দেশপ্রেমিকরা স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার অনেকটাই যে বাস্তবে অনুপস্থিত বহু গল্পে সেই বোধ জাগিয়ে তোলার সার্থক চেষ্টা করা হয়েছে। বহু গল্পে নায়ক-নায়িকা এবং অন্যান্য চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কোথাও বা নারীশক্তির অমরত্ব শ্রদ্ধাসহ প্রচার করা হয়েছে। এমনকী প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়েছে—তেমন গল্পও এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। বক্তব্যর ভাগ অনুযায়ী কয়েকটি গল্পের বিশ্লেষণে বিষয়টা পরিষ্কার হবে।

আবু রুশদের "খালাস" অথবা আমিনুর রহমান সুলতানের "ধলপহরের আগে" গল্প দু'টিতে দুই অত্যাচারিতা নারীর কাহিনি বলা হয়েছে। "খালাস" গল্পের ধর্ষিতা শাহানা আপা রাগে ফেটে পড়ে বরকতের উপর। বলে– " বলেছিলাম টাকা পাঠিয়ে দিতে। এখন এসেছিস যখন, এ পেটে লাথি মার। মার মার মার।" শাহানা আপা আসলে তো মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ধর্ষিতা সব নারীরই প্রতিনিধিরূপ। কাজেই তার এই যন্ত্রণার অভিব্যক্তি তার মতো অত্যাচারিত আর-সকলের মুখের কোরাসধ্বনি। "ধলপহরের আগে" গল্পের সুপর্ণার যন্ত্রণার সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাজাকারের অত্যাচার, হাসেম ডাক্তারের ধর্মান্তরকরণের প্রক্রিয়া, স্ত্রী রহিমাবিবি থাকা সত্ত্বেও তালুকদারের সুপর্ণাকে বিবাহে আগ্রহ এবং অবশ্যই পাক সৈন্যদের বর্বরতা। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তালুকদারকে বধ করিয়ে লেখক গায়ের ঝাল খানিকটা মিটিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবকে বিস্মৃত হতে পারেননি। তাই সুপর্ণা নিজেকে পাতা ঝরা গাছ ভাবতে বাধ্য হয় আর অসংখ্য লাল পিঁপড়ে তাকে চেটেপুটে খায়। মিলিটারির লাথি খেয়ে তালুকদারের লাশের সামনে পড়ে ফুলে ফেঁপে ওঠা লাশ দেখে তার মনে হয় বিশাল বিশ্বকে আড়াল করে দিয়েছে লাশটা।

কাজি ফজলুর রহমানের "মুখোমুখি" গল্পে ক্যাপ্টেন আজম একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র। "পাকিস্তানী ক্যাপ্টেনের চেহারায় ক্রোধ, বিদ্বেষ বা জিঘাংসা নেই। সুন্দর চেহারার এই যুবকের চোখে বরং সে দেখতে পেল ক্লান্তির ছায়া।" নিতান্ত পেশার কারণেই ক্যাপ্টেন আজম এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে সন্দেহ নেই। গল্পকার বর্বরতার মধ্যে থেকে মানুষের সুকুমার বৃত্তি খুঁজে পেতে চেয়েছেন এবং রক্তের স্বাদ কতটা ভয়ংকর বোঝানোর জন্য ক্যাপ্টেনকে দিয়ে বলিয়েছেন "রক্তের স্বাদ পেয়েছে আমাদের সৈন্যরাও। তারা সেটা ভুলতে পারবে না। নিজের দেশে ফিরে গিয়েও সুযোগ খুঁজবে এই তৃষ্ণা মেটানোর। সেই হবে তোমাদের প্রতিশোধ।"

জাহানারা আরজুর "বারুদের ঘ্রাণ" এবং জুবাইদা গুলশান আরার "কোথায় গেরিলা তুমি" গল্প দু'টির মূলসূত্র প্রিয়জন হারানোর ব্যথা থেকে উঠে আসা হতাশা। "বারুদের ঘ্রাণ" গল্পের বছিরউদ্দীন মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্বান্ত হয়েছে। ফিরে এসে সে দেখে "খালি ভিটা খাঁ-খাঁ করছে। উঠানের জোড়া চুলো দুটো হাঁ করে আছে। উঠানের মাটির আস্তরণের মধ্যে এখনও উঁকি দিচ্ছে মেয়েটার গলার পুঁতির মালা, পেয়ারাবানুর হাতের ভাঙা রেশমি চুড়ির টুকরা। ডালিম গাছের ডালে ঝুলে আছে ছেলোটার লাটাই আর ছেঁড়া ঘুড্ডির কিছু অংশ।" সব হারিয়ে শুধুমাত্র একটা পোষা গরু নিয়ে কাটায়। সেই গরু চুরি যায়। "বছিরউদ্দীনের বুক ঠেলে প্রশ্ন ওঠে — এই কি সেই সোনার দেশ?" বছিরউদ্দীন নতুন করে আবার বারুদের ঘ্রাণ পায়। স্বাধীনতা অর্জনের পরে বছিরউদ্দীনের মনে যে হতাশা সঞ্চারিত

হয় তার প্রতিকারের উপায় শান্তিপূর্ণ পথে নয়। অন্য দিকে "কোথায় গেরিলা তুমি" গল্পের নায়ক রঞ্জু বছিরউদ্দীনের মতো বেপরোয়া নয়। কিন্তু সংস্কারের পথে পা বাড়াতে সেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই তার শারীরিক সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন থেকেও সে নতুন শক্তপোক্ত ক্রাচে ভর দিয়ে কল্পনায় তার এক সময়ের ভালবাসার জন চৈতীর সঙ্গে চলতে শুরু করে। দুটি গল্পেই স্বাধীনতা অর্জনের পর পোক্ত শাসনব্যবস্থার জন্য সংস্কারপর্বের অপরিসীম গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতা যদি সুস্থ নাগরিকজীবন দান করতে অক্ষম হয় তবে সে স্বাধীনতায় লাভ কী? দু'টি গল্পেই এই চিন্তার খোরাক আছে।

দিলারা হাসেমের "পরিচয়" গল্পের পশ্চাৎপটে মুক্তিযুদ্ধ থাকলেও গল্পের মূলসুরে গুরুত্ব পেয়েছে অন্য কথা।গল্পের নায়ক মোমিন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। যুদ্ধের সময় তার বাবা নিহত হয়েছিলেন এবং বোন ধর্ষিতা হয়েছিল — অনেক বাবা, অনের বোনের ভাগ্যেই যেমন জুটেছিল। মোমিন এখন আমেরিকাবাসী। কিন্তু তার মনে দগদগে ক্ষত। একমাত্র মা ছিলেন কিন্তু হঠাৎই তিনিও চলে গেলেন। মার শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী পাত্রী নির্বাচন করতে হয় তাকে, কারণ মা তাকে বিয়ে করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু পাক সেনাদের উচ্ছিষ্ট এবং বর্তমানে বহু পুরুষসঙ্গ করা শরমিনকে কেন তার পছন্দ হয়? প্রশ্নটা মোমিনকে শরমিনই সরাসরি করে, "আমার মধ্যে দিয়ে কি নিজের বোনটিকে রক্ষা করতে না পারার বিবেক দংশন উপশম করতে চাইছেন?" এ গল্পে লুকিয়ে আছে আরও একটা সত্য। বাবা ও মেয়ের মাঝে স্নেহের অস্তিত্বরূপী চিরকালীন সত্য। ফয়েজুদ্দিনের কৈফিয়ত — " ওই ছবিটা বহুৎ আগে কখন জানি আসছিল আমার কাছে। ক্যামনে জানি না— ওই নতুন ছবিগুলির মধ্যে আইস্যা পড়ছে" সেই কারণেই বিশ্বাসযোগ্য শোনায় না। ঘটক ফয়েজুদ্দিন পুরুষসঙ্গ করে জীবিকা নির্বাহ করা তার মেয়ের ছবিটা অন্য পাত্রীদের সঙ্গে সতর্কভাবে নাকি অসতর্কভাবে রেখেছিল?গল্পের শেষাংশে শরমিনের আসল নাম শিরিন এবং সে ফয়েজুদ্দিনের মেয়ে, জানার পর মোমিনের হৃদস্পন্দন সহজ গতিতে চলতে থাকে। মোমিনের সিদ্ধান্তে একটা স্পষ্ট বার্তা আছে — শিরিনদের সরিয়ে রাখা অসম্ভব, শিরিনরাই তার স্বাধীন দেশ, তাই শিরিনদের জড়িয়ে নিয়েই তাদের ভবিষ্যৎ।

মঞ্জু সরকারের "শান্তি ও স্বাধীনতা বিষয়ক দীর্ঘশ্বাস" গল্পের 'শান্তি' একটি হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে। তার সঙ্গে কুদ্দরত 'নামের' মুসলমান যুবকের ঘনিষ্ঠতা হয়। কুদ্দরত স্বপ্ন দেখে দেশ স্বাধীন হলে জাত, ধর্মের ভেদ কেটে যাবে। ভালবাসার সম্পর্কই হবে চূড়ান্ত মিলনের ভিত্তি। দেশ স্বাধীন হল, ঘরছাড়া মানুষ ঘরে ফিরে এল। ঘরে ফিরে এল বামুন বাড়ির সকলেই শুধু 'শান্তি' ফিরল না। শান্তির কি বিয়ে হয়ে গেল? এপারে এসে সে কি অন্য জীবিকার সন্ধান পেল? শান্তি কি আদৌ বেঁচে রইল আর? লেখিকা ইঙ্গিত দেননি। আসলে এ গল্পে শান্তি শুধু একটা রক্ত-মাংসের মেয়ে নয়, স্বাধীনতা পরবর্তী যুগের বাংলাদেশের সামগ্রিক অবস্থার প্রতীক।

রাহাত খানের "মুক্তিযোদ্ধার দিন" এবং সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর "ভয় নেই" দু'টি গল্পেই রাজাকার এবং যুদ্ধের সময় পাক আর্মির সহায়তা করা মানুষদের স্বাধীন বাংলাদেশে কতটা দাপট সেই কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। "ভয় নেই" গল্পের নিজাম এখন গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক। "ওর বাবা — নাসিম সওদাগর — একাত্তর সালে পাক আর্মিকে মেয়ে সাপ্লাই দিত।" সওদাগরের ইশারাতে আনোয়ার হোসেনের বাপ আর বড় ভাইকে এক সঙ্গে মেরেছে পাঞ্জাবিরা। কারণ আনোয়ারের বোন পাঞ্জাবি মেজরের হাতে কামড়ে দিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে, ফলে নাসিম সওদাগরের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়নি। সওদাগরকে খুন না করে পরবর্তীকালে আনোয়াররা ছেড়ে দেয় আর সওদাগর রাজনৈতিক নেতাদের ঘুষ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে পাকিস্তানি আমলের চেয়েও বেশি লাভবান হয়। অথচ গল্পের নায়ককে সেই নিজামের ধামা ধরেই জীবনে প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজতে হয়। "মুক্তিযোদ্ধার দিন" গল্পে রাজাকার আলিমউদ্দিন এখন চেয়ারম্যান আলিমউদ্দিন। তার আশেপাশে এখন কৃপাপ্রার্থীর দল, সঙ্গে পুলিশ প্রহরা। তার বক্তৃতার ভাষায় পাকিস্তানের জয়গান। "পাকিস্তান কায়েম হয়েছিল বলেই তো বাংলাদেশ সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান যেন একই মায়ের দুই সন্তান। পাকিস্তান আদবে একটু বড়, বাংলাদেশ একটু ছোট। তবে দুই ভাই যখন ইসলামি আদর্শে মিলে যায় তখন বাংলাদেশ পাকিস্তান মিলেমিশে এক হয়ে যায়।" সে আরও বলে, "মুক্তিযোদ্ধাদের কথা কেউ আর বলে না। বরং ইতিহাসে কবর হয়ে যাওয়া সেই খাজা সলিমুল্লাহ, গোলাম আজম, নুরুল আমিন, মোনেম খানরা আবার ভেসে উঠে রোশনি ছড়াতে শুরু করেছে।" এহেন চেয়ারম্যান আলিমউদ্দিনকে, বলাই বাহুল্য, গল্পকার ক্ষমা করেননি। তাই গল্পের শেষে "মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস আলির পোলা মুক্তিযোদ্ধা ইকবাল আলি" পিতৃঋণ তথা রাজাকারের প্রতি ঘৃণার হিসাব মেটাতে আলিমউদ্দিনকে হাতের মুঠোয় পেয়ে যায়।

সরদার জয়েনউদ্দিনের "কারফিউ" গল্পে মুনির আর একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র। বড় ভাই মফিজ সাধারণ সংসারী মানুষ। মা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রোজা, আর নাতি-নাতনিদের নিয়ে থাকেন। মুনির বাংলাদেশে নতুন সমাজ, নতুন অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশের স্বপ্ন দেখে। মুনিরের আশে পাশে "সুফী মোত্তাকিন, পাঁচ ওয়াক্ত আজান দিয়ে নামাজ পড়েন,

রোজা রাখেন নিয়মিত, ধর্মের নামে উৎসর্গিতপ্রাণ। সব সময়ে মসলা-মাসায়েল নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করেন। কি কথায় বিবি তালাক হল, কি আচরণে মুসলিমানিত্ব থেকে খারিজ হল এ সব হুকুম দেন। প্রয়োজনবোধে বড় বড় আলেম-ফাজেল থেকে ফতোয়া পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারেন, তবু ধর্মের খেলাপ হতে দেন না। আবার ঠিক মতো অফিসে যান, অফিসে বসে বসে তবলিগ করেন, খুশী হয়ে দিলেন তো' বলে ফাইল আটকে রেখে দুটো উপরি পয়সাও নেন।"

মুনির মৌলবী সাহেবদের আলোচনায় যোগ দেয়। সেখানে একটি মাত্র বিবাহের আইনের বিরুদ্ধে বিষোদগার চলছিল। চারটে বিয়ের ব্যাপারে মন্তব্য করতে মুনির পবিত্র গ্রন্থের নাম উচ্চারণ করলে ঘোর বিপত্তি দেখা দেয়। ধর্মপ্রাণদের মাথায় তখন পাশবিক নেশা। তাঁরা গাজি হবেন। ওদিকে তসবি-তেলাওয়াত করতে করতে মুনিরের মার চোখে বিভীষিকা — " প্রতি তসবির দানার সঙ্গে একটা ফ্যাকাশে মৃত মুখ বার বার ঘুরে আসছে এবং তার পিছনে অনেক শোকার্ত মিছিল।" ধর্মপ্রাণা নারীর চোখে এই দৃশ্য ভাসিয়ে গল্পকার একই সঙ্গে স্নেহ মায়া ভালবাসার সুউচ্চ অবস্থানের কথা ঘোষণা করেছেন,অন্য দিকে আনুষ্ঠানিক ধর্মের সাধনায় বাস্তবকে অস্বীকার করার বা বিস্মৃত হবার উপায় নেই এ কথাও বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। এই ধরনের গল্প যত বেশি লেখা হয় ততই মঙ্গল।

সেলিনা হোসেনের "দু'রকম যুদ্ধ" গল্পে নূরজানের চরিত্রে সুইসাইড স্কোয়াডের মেয়েদের পরিচিত রূপের সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায়। গল্পের লক্ষণীয় অংশ গল্পের শেষ ভাগ যেখানে "বকর দেখতে পায় লোহার রডের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে উলঙ্গ নূরজানকে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে।" অসহায় "আবু বকরের মনে হয় ওকে একটু পানি খাইয়ে আসতে পারলে ও মরবে না। এটা করার জন্য ও রাতের অপেক্ষা করে।" নূরজানের আত্মত্যাগ যে নারীশক্তির প্রতীক আবু সেই শক্তিকে মরতে দিতে চায় না। প্রকাশ্যে বীরাঙ্গনার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের সুযোগ নেই তাই অন্ধকার পর্যন্ত তার অপেক্ষা। এখানে রাত বা অন্ধকারের কথা আসে কারণ নারীশক্তির অমরত্ব প্রচারের তোয়াক্কা রাখে না। কোনও যুদ্ধেই নারীর ভূমিকা খাটো করে দেখার নয়।

এই গল্প সংবকলন পড়তে পড়তে বারেবারেই মনে হয়েছে, স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশে সমাজ সংস্কারের যে বিপুল প্রয়োজন দেখা দিয়েছে প্রতিটি স্বাধীনতাকামী নাগরিকের সে বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। নিচতা, অসাধুতা, ভীরুতা, বর্বরতা, ধর্ম আর জাতের চোরাবালি থেকে নিজেদের সার্থকভাবে উদ্ধার করতে যারা সক্ষম, তেমন একটা জাত বাঙালি। তাই এই সব বিকারের আবর্তে বাঙালির পরিচয় হারিয়ে যায় না। যেতে পারে না। এই বোধ খুঁচিয়ে তুলতে হোসেন আরা শাহেদ সম্পাদিত "মুক্তিযুদ্ধের শতগল্প" একটি সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন। তাঁকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ এই সংকলনে অংশ গ্রহনকারী একশো গল্পকার অথবা তাঁদের আত্মীয়দের যাঁরা গল্পগুলি সরবরাহ করেছেন। বীরেন সোমের প্রচ্ছদটি যথাযথ। তাঁকেও ধন্যবাদ।

মুক্তিযুদ্ধের শতগল্প (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) — সম্পাদনা - হোসেন আরা শাহেদ / গ্লোব লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেড, ঢাকা/ প্রথম খণ্ড ২৮০ (US $১৫.০০), দ্বিতীয় খণ্ড ৩২০(US $ ১৫.০০)

সমতটের সেরা গল্প

বর্ণালী ঘোষ দস্তিদার

তেত্রিশ বছরের পত্রিকা 'সমতট'। সময়টা লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পক্ষে শুধু গর্বের নয়, গৌরবেরও। আর সেই শ্লাঘার পথ বেয়েই 'সমতট'পত্রিকার উত্তরণ ঘটেছে প্রকাশনা শিল্পের জগতে। চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত, সাধন দাশগুপ্ত, অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত - সম্পাদকত্রয়ের উদ্যোগে এই প্রকাশনা থেকেই প্রকাশিত 'সমতট শতক ঃ গল্প'। সমতট পত্রিকার প্রথম একশোটি সংখ্যা থেকে নির্বাচিত কিছু সেরা গল্পের সংকলন। মোট ৪৪০ পাতার বই। গল্পের সংখ্যা ৩২ অবশ্য গল্প সংখ্যা বলে নির্দিষ্ট হলেও এতে সংকলিত হয়েছে তিনটি নাটক। 'সমতট' পত্রিকার জন্ম ১৯৬৯-এ। জন্মকাল থেকে পঁচিশ বছর অর্থাৎ ১৯৯৪ পর্যন্ত প্রকাশিত গল্পগুলির মধ্যে পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনাগুলিই এতে স্থান পেয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের বয়স খুব বেশি না হলেও তার ছোটগল্পের পরিসর খুবই বৈচিত্রের। বিশেষ করে গত বিশ-পঁচিশ বছরে দ্রুত পাল্টে যাওয়া পৃথিবী ও সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলা ছোটগল্প তার বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, ভাষা বা গড়নে এমন সব অভূতপূর্ব নতুনত্বের আমদানি করেছে যা সত্যিই বিস্ময়কর। এমনকী গোটা বিশ্বসাহিত্যের দরবারেও সে অনায়াসেই করে

নিয়েছে নিজের জায়গা। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বিশ শতকের শেষ তিরিশ বছরের গল্প সম্পর্কে আলাদা কৌতূহল জাগাটা বিচিত্র নয়। 'সমতট' পত্রিকার গল্পগুলি সম্পর্কে সম্পাদকেরা 'না-ভূমিকা' অংশে জবানি দিয়েছেন - 'সমসাময়িক ছোটগল্পের মান ও উৎকর্ষতাকে উন্নততর করার অভিপ্রায়ে এবং নবীন গল্পকারদের উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্ত।' উদ্দেশ্য মহতী, সন্দেহ নেই। যদিও অসীম রায় (ঈষিতা, ফুলখেলা) বা মহাশ্বেতা দেবী (এইচ. এফ. ৩৭ : রিপোর্টাজ) সম্বন্ধে এ ধরনের মন্তব্য খাটে না। অবশ্য দুটি বিশিষ্ট নামের বাইরে যাঁরা গল্পকারের তালিকায় আছেন তাদের কাউকে কাউকে এ মহৎ উদ্দেশ্যের অংশীদার করা যেতেও পারে। যেমন চন্দ্রিমা সেন। লিখেছেন ছোট্ট গল্প 'স্বপ্ন নিয়ে'। লেখিকা অনামী। কিন্তু লেখাটি হৃদয় স্পর্শ করার মতো। সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে গোটা বিশ্বজুড়ে সমীক্ষা ও সমীকরণ শুরু হয়েছে প্রায় চল্লিশ বছর। আর সেই সুবাদে বাংলা কবিতা-গল্প-প্রবন্ধে 'নারীবাদ' যে তার বিশেষ জায়গাটি নিয়ে নিয়েছে তার বয়স প্রায় কুড়ি বছর হয়ে গেছে। এই সময়ের মধ্যে মেয়েদের কথা নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন অনেকেই। কারুর ভঙ্গি ঝাঁঝালো, কেউ বা স্বভাবজ সহানুভূতি নিয়ে কোমলা। চন্দ্রিমার গল্পে সেই নিম্নবিত্ত পরিবারের উপেক্ষিতা মেয়ে। আর্থিক স্বাধীনতা নেই যার, নেই পরিবারেরও উপযুক্ত সংস্থান। বিধবা মা, দাদা-বৌদির গলগ্রহ আর পরিবারের বোঝা হয়ে দিন কাটে যার। এই রূঢ় প্রখর বাস্তবের প্রহারেও স্বপ্ন-কল্পনার রং তাকে ছেড়ে যায় না। কৃষ্ণচূড়ার রক্তিমাভার মধ্যে নিঃসঙ্গ মেয়েটির দিকে ভালবাসার হাত বাড়িয়ে দেয় প্রকৃতির নাম না জানা নানা রূপ। রবি ঠাকুরের অন্ধ মেয়ে সুভার মতো একলা মেয়েটির বন্ধু হয় ভোরের নরম সূর্য, বৃষ্টির জল, কচি পাতা, বসন্তের হাওয়া আর নীল আকাশ। শেষে এই রঙিন স্বপ্নগুলোও ফিকে হয়ে যেতে চায়, বিদায় নিতে চাওয়া রূপকথাদের মধ্যে অসহায় বিধবা মায়ের নিষ্ঠুর অভিশাপের মধ্যে বেঁচে থাকতে হয় মেয়েটিকে। ভাল লাগে 'ভুতির স্বপ্ন'। লেখক অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। গাঁয়ের গরিব চাষাভুসোর বাড়ির মেয়ে ভুতির ভাঙা-ফাটা অদৃষ্টের গল্প। উদাসীন শ্বশুরবাড়ি, অত্যাচারী শাশুড়ি ও মদ্যপ স্বামীর তাড়নায় তিল তিল করে শুকিয়ে যায় ভুতির প্রাণ। অথচ এই ভুতিই ছিল গাঁয়ের ছেলের দলের মধ্যমণি। রবি ঠাকুরের মৃন্ময়ীর মতো ডানপিটে ভুতি শাশুড়ির লাঞ্ছনা- গঞ্জনার বিরুদ্ধে রুখেও দাঁড়াতে চেয়েছিল ক'য়েকবার - কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিরুপমাদের মতোই শেষ হয়ে যেতে হল তাকে। সহজ ভাবে লেখা, সরল গল্প। এই রকমই সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামবিলাসবাবুর শেষকৃত্য', কল্পবিজ্ঞান জাতীয় রচনা সুনেত্রা গুপ্তের 'এব্রাহামের স্বপ্নভঙ্গ', জোর ঝাঁকুনি দিয়ে মনে স্থায়ী রেখার দাগ কেটে যায় এ. মান্নাত-এর 'নিষিদ্ধ গণ্ডী'(সম্ভবত এটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত)। বিপ্লব বিশ্বাসের 'ডানা কাটা জটাই', প্রশান্ত পাঠকের 'ধূসর পাহাড়, নীল সমুদ্র, সবুজ অরণ্য' প্রভৃতি গল্পও পড়ে এক ধরনের সুক্ষ্ম আনন্দমাধুরীর সন্ধান পাওয়া যায়।

সামান্য কিছু ছাপার ভুল থাকলেও বইটি পরিচ্ছন্ন। প্রচ্ছদ ও বাঁধাই সুন্দর। কাগজ খুবই উৎকৃষ্ট মানের। অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে উৎসর্গ করা হয়েছে সেই সমস্ত পাঠককে যাঁরা 'গত তেত্রিশ বছর ধরে শ্রম, অর্থ, রচনা ও ভালোবাসা দিয়ে সমতটকে লালন করে চলেছেন।' সম্পাদকেরা অবশ্য কৈফিয়তদিয়েছেন যে 'গল্প-নাটককে একাকার করার বিশেষ কোনো তাৎপর্য হয়তো নেই, তবে অজুহাত আছে —' কৈফিয়তসত্ত্বেও বেশ কিছু ভাল গল্পের মেজাজের মধ্যে একটি হিন্দি থেকে তর্জমাসমেত মোট তিনটি নাটক ঢুকে যাওয়াটা খুব রসবোধ বা শিল্পমনের পরিচয় বলে মনে হল না। বইটির মধ্যে পাতা সংখ্যা, সংকেতচিহ্ন, পত্রিকা সংখ্যা প্রকাশের বর্ষসংখ্যা জাতীয় সমস্ত রকম সংখ্যাই ইংরেজি হরফে লেখা কেন বোঝা গেল না। বাংলা প্রকাশনা শিল্প যখন নব্য প্রযুক্তির দৌলতে বেশ বিস্ফোরক জায়গায় পৌঁছে গেছে তখন একটি সুমুদ্রিত সফল বাংলা প্রকাশনাকে সম্পাদকেরা জায়গায় জায়গায় ইংরেজি সংখ্যায় দৃষ্টিকটু ভাবে ভরিয়ে তুললেন কেন? ছাপাখানায় কি বাংলা সংখ্যা লেখার একান্ত অভাব ছিল? সম্পাদকেরা একটু ভেবে দেখলে পারতেন।

সমতট শতক : গল্প — সম্পাদনা চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত, সাধন দাশগুপ্ত ও অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত / সমতট প্রকাশন, কলকাতা-২৯ / ১৫০.০০

প্লাতেরো, তুমি ধন্য

মেঘ মুখোপাধ্যায়

কবিতা আর আমি। আস্ত এক গাধাকে নিয়ে গোটা একটা কবিতার বই। গদ্যে। জানি না, রবীন্দ্রমুগ্ধ-রবীন্দ্রনাথের অনুবাদক স্পেনের কবি হুয়ান রামোন হিমেনেথের এই কাব্যগ্রন্থটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ আদৌ একে কবিতার বই বলে মেনে নিতে পারতেন কি না। কবিতার কত রকমের ধরন, কত বিচিত্র গড়ন, বিষয় আর আঙ্গিক নিয়ে কত রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে

উনিশ শতক থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের পৃথিবীতে ফ্রান্সে, ইংল্যান্ডে, জার্মানিতে, ইতালিতে, স্পেনে, রাশিয়ায় ....। নানা যুগের কয়েকজন কবি বা কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ মাইলস্টোনের মতো দাঁড়িয়ে আছে কবিতার অনন্তপ্রসারিত পথের এক একটি অপ্রত্যাশিত বাঁকের মুখে। হিমেনেথের প্লাতেরো আর আমি বিশ্বকবিতার রাজপথে সেই রকম একটি মাইলস্টোন। বইটি কবিতা সম্বন্ধে এক অপ্রত্যাশিত ধারণা দেয় আমাদের। কবিতাপাঠের অন্যতর অভিজ্ঞতার স্বাদ পাঠককে বিস্ময়ে আপ্লুত করে।

বইটি আর কিছুই নয় — কবির পোষা অতিপ্রিয় নিত্যসঙ্গী এক গাধা প্লাতেরোর জীবনকাহিনি; প্লাতেরোকে জড়িয়ে মড়িয়ে কবিরও জীবনকাহিনি। স্পেনের আন্দালুসিয়ায় মোগের নামে এক গ্রামের নিরীহ এক গর্দভের বেঁচে থাকার বৃত্তান্ত ছোট ছোট কবিতায় লেখা। এমন উপহাসাস্পদ ইতরজন কেমন করে ছুঁয়েছে এক মহৎ কবির আত্মা! প্লাতেরো যা দেখে, শোনে, যে গ্রাম্য রাস্তায়, প্রান্তরে হাটেবাটেঘাটে বনেজঙ্গলে কবির সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, সে যা অনুভব করে কিংবা ওকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কবি যেমন করে তাঁর বর্ণ-গন্ধ-শব্দ-রসে ভরপুর বিচিত্র জগৎটিকে অনুভব করেন,— দুঃখ-ক্লেশ পান, আহ্লাদিত-উল্লসিত হয়ে পড়েন, বিষাদে ডুবে যান, ক্লান্ত বা উদ্দীপিত হন — ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামযুক্ত ছোট ছোট গদ্যে সে সবের বিবরণ জড়ো হতে হতে আস্ত একটা কবিতার বই হয়ে যায়। কখনও নৈর্ব্যক্তিকভাবে আবার কখনও সরাসরি প্লাতেরোকে সম্বোধন করে লেখা এই কবিতাগুলি কবির আর প্লাতেরোর উত্তেজনা-রোমাঞ্চ-পাগলামি আর আনন্দ-বিহ্বলতায় টইটম্বুর। এত খুঁটিনাটি ডিটেল্‌স্ উঠে আসে এই বর্ণনাগুলিতে যে চমকে উঠতে হয় — দিবারাত্রির নানা মুহূর্তের, নানা ঋতু পরিবর্তনের, আলোর আর প্রকৃতির বর্ণ বদলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ডিটেল্‌স্ তাজা ঝরঝরে কাটা কাটা গদ্যে কবি ধরে রেখেছেন। আর মুগ্ধ হয়ে যেতে হয় তাঁর নিজের গ্রাম দেশকে আপ্লুত হয়ে ভালবাসার কাব্যে। এই গ্রামটিই তাঁর প্রাণ আর গাধাটি তাঁর প্রাণভোমরা। গ্রামটিকে কেন্দ্র করে কত রকমের চরিত্রের আনাগোনা ঘটে এই গ্রন্থে। কত কম তুলির আঁচড়ে, কম রে[illegible] গ্রামদেশের এক একটি চরিত্র জ্যান্ত হয়ে উঠেছে — এদের বাদ [illegible] এই বইটিকে ভাবা যায় না একদম — যেমন এই শিরোন[illegible] কবিতাগুলির চরিত্ররা — তিন বৃদ্ধা, বায়োস্কোপের বাক্স, ডারব[illegible] (প্লাতেরোর বিশালদেহী ষাঁড়ের মতো মুগুের ডাক্তার), জিপসি, পিনিতো, মেষপালক, যাজক যোসে (মুখে মধুর বাক্য ঝরানো কপট ধার্মিক), যক্ষ্মাক্রান্ত মেয়েটি, বোকা ছেলে (হাবা ছেলে), ঘুমপাড়ানি গান।

মোগের আর প্লাতেরোকে নিয়ে কবি একটি জগৎ গড়ে তুলেছেন। শেষ পর্যন্ত প্লাতেরোর মৃত্যু ঘটে। কবির মতো আমরাও বিষাদে, বিবর্ণতায় আক্রান্ত হই।

শিশু আর বালক-বালিকাদের জন্য কবির অন্তহীন স্নেহের ধারায় সিক্ত অনেকগুলি কবিতা — যেমন ছোট মেয়েটি, ভয়, স্যারিটো, উল্লাস, বুলফাইট। শিশু-কিশোরদের দারুণ ভালবাসে প্লাতেরো, ওর প্রতি তাদেরও অনুরাগের সীমা নেই। প্লাতেরোকে ঘিরে মোগেরের বালক-বালিকাদের উল্লাস ছড়িয়ে আছে অনেক কবিতায়। আর আছে আরও অনেক পশুপাখির কথা — প্রজাপতি, চড়ুই-বাবুই, মোরগ, ঝিঁ ঝিঁ, সবুজ রঙের ক্যানারি, ঘেয়ো কুকুর, কুকুর জননী, কচ্ছপ।

ঋতুচক্রের পরিবর্তনে আকাশ-আলো-গাছপালার মাধুর্যের ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মুডের বদলকে কবি যে-দৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন, চরাচরের এত তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়কে, বস্তুকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করেছেন, হৃদয় দিয়ে স্পর্শ করেছেন আর শেষমেস শব্দবন্ধনে ধরে রেখেছেন যে আমাদের ছোটগল্পের বা ছিন্নপত্রাবলির রবীন্দ্রনাথকে কিংবা বিভূতিভূষণকে মনে পড়ে যায়। দৃষ্টান্ত দিতে গেলে উদ্ধৃতির ভার বেড়ে যাবে।

বারবার ঘুরেফিরে পড়া যায় সমস্ত বইটিকেই, তবুও এই কবিতাগুলি যেন আরও বেশি করে টানে — বন্ধু, বিকেলের ঘুম, ভয়, পাতকুয়ো, জলাধার, স্মৃতি। গভীর জলতলের ভেতরের রহস্যময়তা আর অপার্থিব আনন্দ-বিষাদ জড়িয়ে রয়েছে এই কবিতাগুলির গায়ে।

নোবেলজয়ী কবির এমন অসাধারণ একটি কাব্যগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করার জন্য কল্যাণ চৌধুরীকে অসংখ্য সাধুবাদ। তিনি যথাসম্ভব ঝরঝরে সতেজ ভাষায় ছন্দমাধুর্য বজায় রেখে অনুবাদ করেছেন। কিছু কিছু জায়গায় কোনও কোনও শব্দ ভারিক্কি হয়ে গিয়েছে। আর একটু চলতি দৈনন্দিন শব্দ প্রয়োগ করলে মাধুর্য বাড়ত বলে মনে হয়। যেমন — যেই আমরা তৃণক্ষেত্রে এসে পৌঁছলাম (১০৯), ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ (৮২), গ্রীষ্মের সুস্পষ্ট পথরেখা, সতেজ মধুলতিকার ঘ্রাণে আবিষ্ট (৬৬), কুয়োতলায় জল রাখার কাঠের ভাণ্ড (৪৯)। গ্রন্থটির মূদ্রণসৌকর্য, স্কেচ, প্রচ্ছদ-এর জন্য 'সুবর্ণরেখা'র প্রশংসা প্রাপ্য। স্কেচগুলি বইটির সৌন্দর্য বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। অনুবাদক একটি স্বল্প ভূমিকা করেছেন। কাব্যগ্রন্থটি বিষয়ে তথ্যসম্বলিত মূল্যবান মূল ভূমিকাটি লিখেছেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতাপ্রেমীদের কাছে অবশ্যসংগ্রহযোগ্য একটি কাব্যগ্রন্থ।

প্লাতেরো আর আমি — হুয়ান রামোন হিমেনেথ — ভাষান্তর : কল্যাণ চৌধুরী/ সুবর্ণরেখা, কলকাতা - ৯/ ৬০.০০

নৃত্যসমালোচনা

শচীনশঙ্করের নবতম প্রযোজনা : গান্ধী

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মুম্বাইবাসী শচীনশঙ্করের ব্যালে ইউনিটের আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই স্বর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা। এই প্রবীণ নৃত্য-পরিচালকের ছন্দ ও মুদ্রা-জগতের সঙ্গে পরিচয় আরও অনেক পূর্বে প্রথম যৌবন থেকেই। খুল্লতাত জেষ্ঠ্যাগ্রজ উদয়শঙ্কর ও তাঁর প্রথম যুগের নৃত্যসঙ্গী সিমকি-জোহরা-অমলা অথবা বাবা আলাউদ্দিন খাঁর স্নেহধন্য আলি আকবর, রবিশঙ্কর কিংবা বিষ্ণুদাস সিরলি, তিমিরবরণ প্রমুখ ভারতের সঙ্গীত জগতের দিকপালদের সঙ্গে তাঁর যে সাধনার সূত্রপাত হয়েছিল, বয়স আশি ছোঁয়ার উপক্রম হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সেই অনুশীলন অব্যাহত আছে। কালপ্রভাবে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে তিনি নিজের স্বতন্ত্র ব্যালের দল গঠন করে এ যাবত ভারত ও বিশ্বের শিল্পরসিক দর্শকদের কাছে অগণিত মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান উপস্থাপিত করেছেন। একদা জওহরলাল নেহরু তাঁর 'ভারত আবিষ্কার'(Discovery of India) অবলম্বনে শচীনশঙ্করের দলের নৃত্যনাট্য দেখে অভিভূত হয়ে মন্তব্য করেন যে তাঁর বক্তব্যকে ব্যালের পরিচালক ও প্রযোজক মূলগ্রন্থের চেয়েও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

শচীনশঙ্করের ব্যালে দলের নবীনতম প্রযোজনা 'গান্ধী'র সম্প্রতি প্রথম মঞ্চায়নের সৌভাগ্য লাভ করল কলকাতা। স্থান 'সঙ্গীত কলামন্দির'।

হিমালয়সদৃশ ব্যক্তিত্ব গান্ধী অনাগত বহু যুগের মানুষের কাছে মানদণ্ডস্বরূপ। আইনস্টাইন যথার্থই বলেছিলেন যে ভবিষ্যতে কেউ এ কথা বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে রক্ত-মাংসের শরীরধারী এ রকম কোনও মানুষ সত্য সত্যই কোনও দিন এই ধরাতলে বিচরণ করতেন। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে উপরের স্তরের মানুষের ক্রমাগত অবক্ষয় দেখে বেদনাহত শচীনশঙ্কর নতুন করে গান্ধীকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। মানুষ গান্ধী — যিনি সুখে-দুঃখে সমভাবে অবিচল থেকে ঈশ্বরের এই সৃষ্টি ও তার সার্থকতম ফসল মানুষের নিষ্কাম সেবাকেই জীবনের একমেব ব্রত করেছিলেন। শচীনশঙ্করের প্রতি গান্ধীর দেশের মানুষ হিসাবে আমরা বিশেষভাবে আরও কৃতজ্ঞ এই জন্য যে অ্যাটেনবরোর মতো একজন বিদেশি প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে যে শিল্পীর দায়িত্ব পালন করে আমাদের তৃপ্তি দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী হিসাবে কিঞ্চিৎ লজ্জিতও করেছিলেন, এত দিনে শচীনশঙ্কর ও তাঁর ত্রিশজন শিল্পীর এই প্রয়াসে সেই গ্লানি দূর করার একটা উপায়, একটা মুখরক্ষার পন্থা অন্তত হল।

ভারতে দেহী গান্ধীর জন্ম হলেও প্রকৃত অর্থে গান্ধীর জন্মস্থান দক্ষিণ আফ্রিকা। ঘটনাস্থল সেই পিটার মরিৎসবার্গ রেল স্টেশন যেখানে একজন ২৩ বৎসর বয়স্ক যুবক শীতের রাতে কাঁপতে কাঁপতে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে ব্যক্তিগত অপমান এড়াতে তিনি সেই দেশ ছাড়বেন না। ওখানে থেকেই হাজার হাজার স্বদেশবাসীর মানমর্যাদার জন্য তাঁদের সঙ্গে নিয়ে সংগ্রাম করবেন। সঙ্গত কারণেই শচীনশঙ্করের নৃত্যনাট্যের সূচনা ওই দৃশ্য থেকেই। আর তারপর থেকেই গান্ধী-জীবনের নাটকীয়তার প্রবল আকর্ষণ পরবর্তী দু'ঘন্টা দর্শকদের অন্যমনস্ক হবার সুযোগ দেয় না, যতক্ষণ না গান্ধী ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ শে জানুয়ারি তাঁর জীবনের গৌরবোজ্জ্বলতম দিনটিতে উপনীত হন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ভারতের সংহতির জন্য এক মতিভ্রান্তের গুলি বক্ষে নিয়ে নিত্য-ইষ্ট রামনাম উচ্চারণ করে দেহ-বন্ধন ছিন্ন করেন।

গান্ধীজীবন সর্বজনবিদিত বলে নৃত্যনাট্যটির দৃশ্যবিশেষের কথা আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। আমাদের আলোচ্য এর উপস্থাপনা। সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় এঁদের 'টিম ওয়ার্ক' বা যৌথকৃতি। নৃত্য, সঙ্গীত, বাদ্য, ধারাভাষ্য, আলোকসম্পাত অথবা মঞ্চনিয়ন্ত্রণের অপর সব কৃত্যে— কুত্রাপি পলমাত্রের জন্যও যতিভঙ্গ হয়নি। নিঃসন্দেহে এর কৃতিত্ব নৃত্যনির্দেশক তথা অনুষ্ঠানের প্রযোজিকা শ্রীমতী কুমুদিনীশঙ্করের। সমগ্র নৃত্যনাট্যের পরিকল্পনা ও গান্ধী চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্য চিত্রণের জন্য শচীনশঙ্করের নাম সর্বাগ্রে নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ওই শ্রুতকীর্তি অগ্রণী শিল্পীকে এই প্রতিবেদকের তরফ থেকে নতুন করে স্বীকৃতি দেবার কিছু নেই। অধিকন্তু হিসাবে কেবল একটি কথা বলব — তাঁর নৃত্য-পরিকল্পনার একটানা বৈচিত্র। দক্ষিণ আফ্রিকার রেল গাড়িতে উপবিষ্ট (তরুণ) গান্ধী ও সহযাত্রীদের গাড়ি চলার দুলুনিটিকে দিয়ে নৃত্যের যে অভিনব সূত্রপাত, বিদ্রোহী জুলুদের রঙ্গে-বেশে-ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত আফ্রিকার

বিশেষ নৃত্যশৈলী হয়ে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে শুধু নব নব নয়, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নৃত্যবৈচিত্র শচীনশঙ্করের উদ্ভাবনী প্রতিভার অনন্য স্বাক্ষর। কি একক, কি সম্মিলিত নৃত্য (অসহযোগ,ডান্ডি যাত্রা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি) কম্পোজিশনে তিনি পূর্ণ সার্থকতা দেখিয়েছেন।

তেমনই সহযোগীগোষ্ঠীর সহায়তা জুটিয়েছেন তিনি অন্যান্য ক্ষেত্রে। তাপস সেনের আলোক-সম্পাতের কৃতিত্ব প্রবাদ প্রতিম। তাঁর সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলার না থাকলেও বিদেশি বস্ত্রের বহ্ণুৎসব ও শেষ অর্থাৎ গান্ধীর মহাপরিনির্বাণের দৃশ্যের আলোকসম্পাত তাঁর কৃতিত্বে একটি নতুন দিগন্ত যুক্ত করল। দৃশ্য ও ধারাভাষ্য রচনাকার শশাঙ্কশঙ্কর অত্যন্ত কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন মাত্র দু' ঘন্টার সময়সীমার মধ্যে এমন দক্ষতা সহকারে এক মহাজীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলিকে পরিবেশন করে। সঙ্গীতে আর. নারায়ণ, মঞ্চে কেশব টন্ডেলসহ পরিচ্ছদ নির্মাণ ও সাজসজ্জায় অ্যাটেনবরোর 'গান্ধী'- খ্যাত শিল্পী উচ্চাঙ্গের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। ভারতে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে পুনরাগত গান্ধী চরিত্রে স্বয়ং শচীনশঙ্করের হৃদয়স্পর্শী নৃত্যাভিনয়ের প্রতি পূর্বেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার গান্ধী রূপে সন্তোষ পেটকর এবং কস্তুরবারূপী হনসা বোরিচার নাম বিশেষরূপে উল্লেখ করলেও গোড়াতেই যেমন বলা হয়েছে, প্রতিটি নৃত্যশিল্পী ও কলাকুশলী অত্যন্ত যোগ্যতা সহকারে স্ব স্ব ভূমিকা পালন করেছেন।

প্রথম থেকে শেষাবধি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শচীনশঙ্করের এই নবীনতম ব্যালের মাধ্যমে ভারত তথা বিশ্বের এক মহামানব গান্ধীর জীবনভাষ্য উপভোগ করতে হয়। না, কেবল উপভোগ নয় সেই মহাজীবনের বাণী ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে হয়। এই খানেই শচীনশঙ্কর ও তাঁর দলের সার্থকতা। বলাবাহুল্য শিল্পী-অগ্রগণ্যের নবতম কৃতির প্রাসঙ্গিকতাও এইখানে। অবিশ্বাস ও হতাশা যখন আমাদের স্বদেশবাসীকে বিষাদ-খিন্ন করে রেখেছে, তখন তাদের ভিতর বিশ্বাস-আশ্বাসের স্বর্গীয় বাণীবাহক রূপে পরিগণিত হবে প্রবীণ শিল্পীর এই নতুন নৃত্যনাট্য 'গান্ধী'। কেবল সরকারই নয়, স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর কল্যাণকামী প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর এখন দায়িত্ব বর্তেছে শচীনশঙ্করের এই নতুন সৃষ্টিকে জনসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার।

কলকাতায় এর প্রথম দুটি অভিনয়ের মঞ্চায়ণ করে এ ব্যাপারে অগ্রণী হবার জন্য সঙ্গীত কলামন্দিরের কর্তৃপক্ষরা অবশ্যই সবার কাছ থেকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন পাওয়ার অধিকারী। তাঁদের সাধুবাদ দেবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তত প্রথম সন্ধ্যার (১১ই জানুয়ারি) অনুষ্ঠান সম্বন্ধে একটি অভিযোগ না করে পারছি না। সঙ্গীত কলামন্দিরই প্রথম রজনীর আয়োজক হিসাবে অনুষ্ঠানটি আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু আমন্ত্রণে তাঁদের উদারতার অভাবে এত উচ্চাঙ্গের এমন একটি প্রযোজনা দেখার অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হলেন অনেক দর্শক। সম্ভবত আমন্ত্রণসূচি তৈরি করার ব্যাপারে আয়োজকদের কার্পণ্যের ফলেই কলকাতার সাংবাদিক ও নৃত্যনাট্য রসিকদের ভিতরও তেমন কেউ আমন্ত্রিত হননি। এর পরিণামে আমাদের শহরে এত বড় একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও পত্র-পত্রিকাতে সে সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হল না, সাধারণ শিল্পরসিক ও সমঝদার নর-নারী এ ব্যাপারে বিশেষ জানতেও পারলেন না।

নাট্যসমালোচনা

স্বপ্নসন্ধানীর দুশমন নাম্বার ওয়ান

মেঘ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে আবার ব্রেখট। ব্রেখটের প্রসিদ্ধ নাটক আর্তুরোউইয়ের প্রতিরোধযোগ্য অভ্যুত্থান (১৯৪১)-এর রূপান্তর ঘটিয়েছেন সুমন মুখোপাধ্যায় আর তার প্রযোজনা করেছে কৌশিক সেনের নির্দেশনায় স্বপ্নসন্ধানী। এবার বেখটের নাটকটির নতুন বঙ্গীয় নামকরণ হয়েছে দুশমন নাম্বার ওয়ান। বেশ চটকদার একখানা নাম। খবরের কাগজে নাটকটির বিজ্ঞাপন আর তার নামাঙ্কনের ডিজাইন চোখ টানে। স্বপ্নসন্ধানী এযাবৎ নানা ধরনের নাটক আমাদের উপহার দিয়েছে। নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটা উঁচু ঘরানা তারা গড়ে তুলেছে — মহৎ কাব্য, বিশ্বনাট্যসাহিত্য থেকে উজ্জ্বল বাছাই, তা ছাড়া সাম্প্রতিক কালের তরুণ নাট্যকারের আধুনিক চিন্তার গড়নটিও তারা মঞ্চে তুলে এনেছে — কিন্তু ব্রেখটকে না ধরলে বাংলার কোনও যোগ্য গ্রুপের

নাট্যচর্চা যেন সম্পূর্ণ হতে চায় না - কিংবা দলটির শক্তিমত্তার পূর্ণ পরিচয়ও যেন ফুটে বেরয় না। এক সময় তো বাংলার গ্রুপ থিয়েটার ব্রেখটে ডুবে ছিল। গত কয়েক বছরে কয়েকটি মৌলিক নাটকের সাফল্য দেখে মনে হচ্ছিল আমাদের গ্রুপ থিয়েটার যেন অন্য একটা ধারা তৈরি করতে চাইছে বা তৈরি করে ফেলেছে। গৌতম হালদারকৃত মেঘনাদবধ কাব্য, সুমন মুখোপাধ্যায়ের তিস্তাপারের বৃত্তান্তের প্রযোজনা কিংবা উইঙ্কল টুইঙ্কল-এর মতো তাজা নাটক লেখা আর তার সাড়া জাগানো অভিনয়ের মধ্যে একটা সদর্থক দিকনির্দেশ দেখতে পাচ্ছি সবাই। অতি সম্প্রতি সোজন বাদিয়ার ঘাটও বিদগ্ধ ও সাধারণ দর্শকমহলে সাড়া জাগিয়ে তুলে অভিনীত হচ্ছে। চেতনা চেষ্টা করেছে রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনী অবলম্বনে একটা নাট্য সৃষ্টির। গৌতম-সুমন- ব্রাত্য- দেবেশ এবং তাঁদের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের আরও কেউ কেউ নতুন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন। এই উৎসাহজনক নতুন উদ্দীপক পরিবেশে স্বপ্নসন্ধানী কেন ব্রেখটে ফিরে গেল? এই নাটকের নির্বাচন এই সময়ের নতুন ধারার নাট্যচর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে কি — বিশেষ করে তাদের মতো এলেমদার দলের কাছে? এবং বিশেষ করে কৌশিক সেনের মতো কব্জির জোরওলা, কল্পনার স্পর্ধায় স্পন্দিত এক নির্দেশকের পক্ষে? বাংলার থিয়েটারে ব্রেখট হয়েছে, হচ্ছে, হবে। এবং হোক। অত বড় নাট্যকারের নাটক ঘুরে ফিরে নানা দলের হাতে মাঝে মধ্যে হলে আপত্তি কিসের। কৌশিকও যে তাঁর নাট্যচর্চার শুরু থেকে আমাদের থিয়েটারে নতুন রক্ত সঞ্চার করতে প্রয়াসী হয়েছেন প্রথম পার্থ কিংবা অনান্নী অঙ্গনার প্রযোজনা তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কাজেই কৌশিকের আন্তরিকতায় সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি প্রশ্ন তুলছি আমাদের (গ্রুপ) থিয়েটারের নতুন পরিবেশে নতুন আবহে তাঁর এই ব্রেখটের রূপান্তর প্রযোজনার যথার্থতা নিয়ে। এই সময়ে তিনিও একটা নতুন মৌলিক নাটক অবলম্বনে নাট্য সৃষ্টি করলে সাম্প্রতিক থিয়েটারের ধারা আরও বেগবান হত বই কি।

গত শতকের সত্তরের প্রথম দিকে (১৯৭২) শেখর চট্টোপাধ্যায় 'আর্তুরো উই' নামেই এ নাটকটির অভিনয় শুরু করেছিলেন। তারপর নব্বইয়ের দ্বিতীয়ার্ধে (১৯৯৬) বহরমপুর রেপার্টারি থিয়েটার ওই অনুবাদটিই আবার প্রযোজনা করেছিল। সাত বছর বাদে আবার করছে স্বপ্নসন্ধানী। বিশ শতকের তিরিশের দশকে জার্মানিতে হিটলারের অভ্যুত্থানকে ব্রেখট তাঁর মতো করে ধরতে চেয়েছিলেন এই নাটকে। তখনকার আর্থ-রাজনৈতিক সংকট, বুর্জোয়াদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, পারস্পরিক খেয়োখেয়ি, নীতিহীন সুবিধাবাদী রাজনীতি, ক্ষমতাবানদের ভ্রষ্টাচার কীভাবে একটা সমাজব্যবস্থাকে ক্রমে ক্রমে কলুষিত করে দ্রুত তার ধ্বংস ডেকে আনে, স্বৈরাচারীর জন্ম দেয়, সমস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থাটাই তার সাধারণ নাগরিকদের জীবনযাপনসহ স্বৈরাচারী শাসক তথা তাদের পার্টির কবলে চলে যায়; জনসাধারণের ঘটে সমূহ অপমান-লাঞ্ছনা-নির্যাতন— বিশ্ব-ইতিহাসের এই বিপর্যয়সৃষ্টিকারী পর্বটিকে আর্তুরো উই নামে এক মাফিয়া সর্দারের অভ্যুত্থানের রূপকে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন ব্রেখট সেই ১৯৪১ সালেই। নাটকটি বেশ ঘটনাবহুল, অনেক চরিত্র। ঘটনাবিন্যাসে, দ্বন্দ্বসৃষ্টিতে, চরিত্র সমাবেশে বেশ চমকপ্রদ। মজা-কৌতুকেরও খামতি নেই। তবে আসলে এ নাটকের উপজীব্য হল বীভৎস রস। ব্রেখট তাঁর অতুলনীয় নৈপুণ্যে, চিত্তাকর্ষক ঢঙে চরম বীভৎসতাকে ধরেছেন। যুগে যুগে নানা ভাষা, নানা দেশের মঞ্চে এই ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত নাটকের অভিনয় হয়ে চলেছে। শেখর চট্টোপাধ্যায়ের মতো ক্ষমতাবান নির্দেশক অভিনেতার একতিরিশ বছর পর কৌশিক সেনও এ নাটক প্রযোজনায় উৎসাহ পেলেন। তবে কি কৌশিক সেন বা স্বপ্নসন্ধানী কোনও যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়ের সেই অভিনয়কালের সঙ্গে তিরিশ বছর পরের এই সাম্প্রতিকের ? ১৯৭২- য়ে শেখর চট্টোপাধ্যায় 'আর্তুরো উই' করার যে প্রেরণা পেয়েছিলেন তৎকালীন বাংলার সর্বনাশা রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে, কৌশিক সেন কি তেমন এক ঘুলিয়ে-ওঠা সমাজপরিমণ্ডলের আঁচ পেয়েছেন তিরিশ বছর পরে? তাই তিনি সতর্ক করে দেবার তাগিদে ব্রেখটের এই নাটকটিকেই বেছে নিয়েছেন এই সময়ে? আজকের বাংলায় তবে কি আর্তুরো উইয়ের অভ্যুত্থানের কথা বলার প্রয়োজন বোধ করেছেন তিনি? যেমন করে সরাসরিভাবে তর্জনী তুলে, কোনও রকম আড়াল আবডাল না নিয়ে, ব্রাত্য বসু দেবেশ চট্টোপাধ্যায় সজোরে মঞ্চে তুলে এনেছেন আজকের সময়টাকে, দীর্ঘকাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বামপন্থী পার্টির বিচ্যুতি-স্খলনের কথা বলেছেন ধারালো ভাষায়, আরও কোনও কোনও লেখক-শিল্পী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দোর্দণ্ডপ্রতাপ পার্টির নির্মম সমালোচনা করেছেন প্রকাশ্যে নিজস্ব ধরনে, — স্বপ্নসন্ধানীর দুশমন নাম্বার 1-ও কি তেমনই একটি ইঙ্গিতপূর্ণ প্রযোজনা? নাটকটির শেষ দৃশ্যে কেশব ঠাকুর-রূপী (আর্তুরো উই) কৌশিক সেন যখন নির্জন মঞ্চে একা নানা ভঙ্গিতে ঘুরতে ঘুরতে অনেক ক্ষণ কথা বলে যায় — রাষ্ট্রশক্তির, পার্টির, জনসাধারণের সম্বন্ধে — সেই শেষ দৃশ্যের একক সংলাপ এ নাট্য অভিনয়ের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে তোলে। নাটকটিতে কয়েক জায়গায় প্রোটেকশন দেওয়ার কথা আছে। মাফিয়ারা চাইছে পুঁজিপতি-ব্যবসায়ীদের প্রোটেকশন দিতে, তাদের বলছে প্রোটেকশন কিনতে। ব্যবসায়ী থেকে জনসাধারণ যেই হোক না কেন তাদের কাছ থেকে প্রোটেকশন নিতেই/কিনতেই হবে; তোমরা যদি মনে করো যে প্রোটেকশনের আবার কী দরকার,

কই কোনও গোলমাল তো নেই — আচ্ছা, তবে ঠিক আছে, আমরা তোমার পরিপার্শ্বে এমন কিছু সৃষ্টি করে তুলছি যাতে তখন তোমাকে আমাদের কাছে প্রোটেকশন চাইতে আসতে হয়।

যদিও ব্রেখটের নাটকের বাংলা ভাষায় রূপান্তর ঘটানো হয়েছে কিন্তু পটভূমি হল মুম্বাই। মুম্বাইয়ের বিখ্যাত শিল্প-কারখানার পরিমণ্ডল আর গুন্ডারাজকে কাজে লাগানো হয়েছে। কলকাতায় ঠিক যুতসই হত না। তাই চরিত্রগুলিও মারাঠি নাম গ্রহণ করেছে। গুন্ডাসর্দার আর্তুরো উই হয়েছে কেশব ঠাকুর, তার দুই প্রধান শাগরেদ নাম নিয়েছে ভোলাজি আর ওমর আলি, টেক্সটাইল মিলমালিক তামাকুওয়ালা, শ্রমমন্ত্রী গোড়বলে — এই রকম। নাট্যের প্রথম অর্ধে মিলমালিকদের অভিনয়ের জায়গাগুলো ঠিক জমেনি। অভিনেতাদের চেহারার, হাঁটাচলার সঙ্গে 'মিলমালিক' চরিত্রের 'টাইপ' মেলেনি। মঞ্চে কেশব ঠাকুর তার সাঙ্গোপাঙ্গ সহ আবির্ভূত হলে নাটক জমে যায়। জোকারের পোশাক পরা, কৌতুকপূর্ণ আচরণ-বাচনভঙ্গি-হাবভাবের গুন্ডাসর্দারের ভূমিকায় এবং ঘটনাধারার প্রয়োজন অনুযায়ী যথাস্থানে চরিত্রটির ধূর্ততা ক্রূরতা হিংস্রতা ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে কৌশিক সেন অনবদ্য। তাঁর স্টাইলাইজড অভিনয় অভিঘাত সৃষ্টিতে সক্ষম। এক অসাধারণ চরিত্রের দ্বৈতমাত্রা রূপ দেওয়ায় তাঁর সামর্থ নাটকটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কৌতুকপূর্ণ আচরণ-কথাবার্তা চলতে চলতে যখন চরিত্রটি সিরিয়াস হয়ে উঠতে থাকে - কণ্ঠস্বর দৃঢ় হয়ে যায়, উদ্দেশ্য অর্জনে একাগ্রতা প্রকাশ পেতে থাকে উচ্চারণে, দাঁড়ানোর আর মুখভঙ্গিমার ধরনে — মনে হয় এই জটিল চরিত্রটি রূপ দেওয়ার তাগিদ এড়ানো কোনও প্রতিভাবান অভিনেতার পক্ষেই সম্ভব নয়। কেশব ঠাকুরের দুই প্রধান শাগরেদ ওমর আলির চরিত্রে গৌতম আর ভোলাজির ভূমিকায় অশোক ঘোষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। মিলমালিকদের চরিত্রগুলি বাস্তব মনে হতে কিছু অসুবিধা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু গুন্ডাদলের চরিত্রগুলি বিশ্বস্ততার সঙ্গে অভিনীত। মন্ত্রীর বাড়িতে গুন্ডাদলের হানা, তদন্ত কমিশন লন্ডভন্ড, কেশব ঠাকুরের হাতে ওমর আলির নিধন, এ রকম কয়েকটি দৃশ্য মনে রাখার মতো। নাটক দলের মাস্টারের কাছে কেশবের চলাবলা হাবভাব শিক্ষালাভের দৃশ্যটির কথা বিশেষ ভাবে না বললে খামতি থেকে যায়। নাটকদলের মাস্টারের চরিত্রে ঝলমলে যাত্রা দলের রাজার জোব্বা পরা কাঞ্চন মল্লিকের অভিনয় অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কী দাপটে আর অবলীলায় তিনি এই চরিত্রটিকে মঞ্চে জলজ্যান্ত করে তুলেছেন তা চোখ ভরে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এই দৃশ্যে শিক্ষার্থী কৌশিক এবং শিক্ষক কাঞ্চন মল্লিকের অভিনয় তীব্র নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করেছে এবং আর্তুরো উই চরিত্রটির উদ্দেশ্যকে প্রকটিত করেছে। একজন হেঁজিপেঁজি মাস্তান সমাজ ও রাষ্ট্রের নিয়ন্তা হয়ে উঠতে চাইছে। শেষ দৃশ্যের কথা তো আগেই বলেছি।

মঞ্চের পশ্চাদভাগে স্থির বিশাল রঙিন সেট ডিজাইন আর তার ওপর নাট্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আলোক প্রক্ষেপণ আকর্ষণীয়। এই বিশাল সেটের মাঝখানের ঘষা কাঁচের দরজাকে নানা সময়ে নানা ভাবে মূল মঞ্চে প্রবেশের প্রয়োজনে ব্যবহার করার কৌশল দেখতে ভাল লাগে। মঞ্চের সম্মুখভাগের আলো আঁধারির পিছনে কাঁচের দরজার ওপর কড়া সাদা আলোর ঝলক কখনও কখনও নাটকটির নির্মম বীভৎসতা প্রকাশ করেছে।

নাটকটিকে সাম্প্রতিক কালের সঙ্গে যুক্ত করার তাগিদে এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে নিকট অতীতে সংঘটিত কয়েকটি মর্মন্তুদ ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে — যেমন বাসযাত্রী বরযাত্রীদের ওপর উৎপীড়ন, তাদের মধ্যেকার তরুণীদের ওপর অবর্ণনীয় বলাৎকার — এবং সেই সূত্রে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সংবাদমাধ্যমে দেওয়া বিবৃতির বিবরণ তাঁর গলাতেই শোনানো হয়। মুম্বাইয়ের পটভূমিকায় সাজানো নাট্যঘটনার সঙ্গে এই বিবরণ কি প্রক্ষিপ্ত নয়? তা ছাড়া মুম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী কি এমন ঘটনার পরে এ রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর মতো বিব্রত হয়ে পড়তেন? আমতা আমতা করে প্রশাসনের দোষ বা তাঁর ক্ষমতাসীন পার্টির জড়িত হয়ে পড়ার ভয়াবহতা স্বীকার করে নিতেন? মনে তো হয় না। তাঁর পূর্বসূরিও হয়ত এ ভাবে বিব্রত হতেন না। দাপটের সঙ্গে কিছু একটা 'যুক্তি' দিয়ে দিতেন, সাংবাদিকদের ধমকে দিতেন। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আচরণে, বাচনভঙ্গিতে যে তাঁর অসহায়তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে — এমনটা আজকের ভারতে ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের মধ্যে পাওয়া দুর্লভ বলেই মনে হয়। যা হোক মুখ্যমন্ত্রীর গলার অনুকারী প্রয়োগ, তাঁর উচ্চারণরীতি — নিঃসন্দেহে মনে রাখার মতো এক অভিজ্ঞতা।

ধ্বস্ত বিবেক যখন উচ্চকিত

সুশীল সাহা

"হিন্দু মুসলমান একই পিণ্ডের দড়ি
কেহ বলে আল্লাহ্ রসুল, কেহ বলে হরি।
বিসমিল্লাহ আর ছিরি বিষ্টু একই দেওয়ান
দু'ফাক করি দাও রাম ও রহিমান"

এই গানটি ধাতব বিদীর্ণ কণ্ঠে গীত কুন্তল মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত 'সংলাপ কলকাতার' সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'হায় রাম'-এর টাইটেল সং। সুর বিস্তারের প্রাচীনত্বে, যন্ত্রানুষঙ্গের ঢঙে হঠাৎ শুনে মনে হতেই পারে 'নবান্ন'- পূর্ব শচীন্দ্র সেনগুপ্ত বা অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের ভালবাসা বিগলিত নাটকের গান। কিন্তু না, এ নাটকের প্রসঙ্গ সাম্প্রতিক, প্রবলভাবে সাম্প্রতিক; যে- ক্ষতের ঔষধি সন্ধানে একটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। ধ্বংসস্তূপে আলোর বদলে অন্ধকারের উৎস থেকে জমাট অন্ধকার;অতলান্ত পতনের অন্ধকারে আমরা যখন, তখন সামাজিক দায়বদ্ধ নাট্যদল বিবেকবাণীর স্বতোৎসারিত আহ্বানে বহমান সমাজের কথা বলতে চায়। কোনও সময় রেখায় না বেঁধে নাট্যকার সমাজ ও সময়ের চিরকালীন সংকটকে চিহ্নিত করে সম্প্রীতির স্পর্শধন্য এক মানবিক উত্তরণের গল্প বলতে চেয়েছেন। আজ যখন বিশ্বব্যাপী যুদ্ধদামামার ধ্বনি উচ্চনাদে শোনা যাচ্ছে তখন নাট্যকার সভ্যতার তরীকে নির্দিষ্ট সময়সীমায় আটকে না রেখে এক উজ্জ্বল উদ্ধারে নিয়ে যেতে চান আমাদের। সত্যমূল্যে উদ্ভাসিত সামাজিক দায়বদ্ধ নাট্যকার শুভবুদ্ধির উদ্বোধন চেয়েছেন, অন্তত তাঁর চরিত্রগুলির অধিকাংশই সভ্যতার তরীকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষেই কথা বলেছে। বাস্তবে যাই-ই ঘটুক না কেন সমসাময়িক ঘটনাপরম্পরার মধ্যে নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন মূল্যবোধ ও সত্যনিষ্ঠার উদ্বোধন।

'হায় রাম' শব্দবন্ধটি কি 'হে রাম' এর আক্ষরিক অনুবাদ! বোধহয় কেউই সহমত পোষণ করবেন না। দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে পরমপূজ্যকে সম্বোধিত সংলাপ, যাকে আক্ষেপোক্তির মতো শোনাচ্ছে, তা কিন্তু আসলে সারা জীবন লালিত এক বিশ্বাসের স্তবগান। জানি না নাট্যকারের এই নামকরণে ইচ্ছাকৃত এক আক্ষেপ জড়ান কি না! বিশেষত তিনি 'হিংসার ধর্ম ও ধর্মীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে' যখন এক 'সম্প্রীতির দলিল' রচনায় ব্রতী হয়েছেন।

অতএব ধরেই নেওয়া যায় নাট্যকার প্রথম থেকেই এক আরোপিত বদ্ধ-সংস্কারে নাটকটির কাঠামো রচনা করেছেন তারপর স্বসৃষ্ট কিছু চরিত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের বজ্র নির্ঘোষ।

'হায় রাম' নাটকটির কেন্দ্রে রয়েছে সাম্প্রতিক গুজরাট গণহত্যার ঘটনা। একজন প্রকৃত গান্ধীবাদী মানুষের আজীবন লালিত বিশ্বাসের পতনজনিত মনোবিকলন নাটকটিতে যেমন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে তেমনই দুর্বৃত্তায়নের একটি স্পষ্ট চেহারা নাট্যকার-পরিচালক বিন্যস্ত করেছেন অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে। পটভূমি গুজরাট স্পষ্টভাবে বলা না হলেও ধরে নিতে কষ্ট হয় না। আজীবন অহিংসার পূজারি গান্ধীজির খোদ নিজের জায়গাতেই যে হিংসার মাতন আমরা দেখলাম তাকে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া আর কী বলা যায়! নাটকের প্রধান চরিত্র অলোকপ্রসাদের চোখের সামনেই ঘটে যাচ্ছে হিংসাশ্রয়ী এক একটি ঘটনা; তিনি বোবা বিস্ময়ে একই সঙ্গে বাপুজির উপস্থিতির প্রত্যাশা ও অবলোকন করেছেন। কিন্তু স্বাধীনতার ৫৬ বছর পরেও সভ্য ভারতের মাটি থেকে যে বিদায় নেয়নি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে রইল ২০০২ সালের গুজরাট রাজ্য। এমন পরিকল্পিত গণহত্যা নির্বিচারে যে এতদিন ধরে ঘটানো যেতে পারে তা আমাদের ধারণারও অতীত ছিল। বলাবাহুল্য প্রশাসনের নীরব প্রশ্রয়ে এ রকম প্রচণ্ড মারণযজ্ঞ ঘটে গেল প্রকাশ্য দিবালোকে। এরই পটভূমিতে উন্মাদপ্রায় অলোকপ্রসাদ ক্রোধে ফেটে পড়ছেন, "আমি ওদের শাস্তি দাবি করছি। রক্তমাখা হাতের স্পর্শে যারা কলুষিত করছে সভ্যতা আমি তাদের বিচার চাইছি। এখানে এই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। সর্বজন সমক্ষে, আমি ওদের বিচার চাইছি।"

কিন্তু বিচারের বাণী যে নীরবে নিভৃতে কাঁদে। অহিংস পন্থায় স্বরাজ প্রতিষ্ঠার যে তত্ত্ব ও কর্মপদ্ধতি গান্ধীজি প্রবর্তন করেছিলেন সে সব অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে ব্রিটিশ শাসনের অবসানে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি গান্ধীজির উদ্দিষ্ট স্বরাজ তা নয়। ফলে হিংসার বীজ উপ্ত রয়েছে যে মাটিতে সেখানে যে মৃত্যু দাঙ্গা হানাহানির মহোৎসবে মেতে উঠবে অবোধ জনগণ এতে আর অবাক হবার কী আছে।

দুর্বলের ওপর সবলের এই যে আস্ফালন সারা জীবন গান্ধীজি তার বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছেন। তাঁর অহিংসা শুধু সশস্ত্র অভিযানের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র আত্মসমর্পণই নয়, তাঁর অহিংসা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। দৈহিক আঘাত হিংসার একটি অভিব্যক্তি মাত্র। শুধুমাত্র ওটাই হিংসা নয়। পীড়ন নানা ভাবেই মানুষকে করা যায় — দৈহিক, মানসিক, ঐহিক। একই সঙ্গে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক। গান্ধীজির মতে বিজ্ঞাপন-সংস্থাও এক ধরনের হিংসাত্মক প্রতিষ্ঠান। ঝকমকে বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে আকর্ষণ করাও এক ধরনের হিংসাত্মক কাজ। এই রকম উচ্চমার্গের মানবিক চেতনা যার মধ্যে বিরাজ করত তিনি যে ভোগবিলাসে ভেসে যাওয়া বিপথগামী মনুষ্য সমাজের কাছে হাস্যকর ব্যক্তিত্বে পরিণত হবেন এতে আর অবাক হবার কী আছে! কার্যত বাস্তবে তাই-ই হয়েছে। তবে এ কথাও ঠিক গান্ধীজিকে তাঁর জীবৎকালেই অধর্মনাশের ও ধর্মস্থাপনের প্রতীক হিসাবে ভাবা হয়েছে। ১৯২১ থেকে অনেক জায়গায় তাঁকে পুজো করা হত। তিনি কোনও গ্রামে গেলে তাঁর বসার জায়গাটা ঠাকুরের থান হয়ে উঠত। তাঁর ছবিতে অর্ঘ্য দিয়ে আরতি করা হত। অনেকে ভাবত তাঁর নাম জপ করলে অনেক রোগভোগ সেরে যাবে। এতে বোঝা যায় যে বহু লোক গান্ধীজিকে রক্তমাংসের মানুষের চেয়ে পরিত্রাতা বা অবতার ভাবত। যেমন ভাবতেন 'হায় রাম' নাটকের প্রধান চরিত্র অলোকপ্রসাদ। তাই চারদিকে যখন অন্ধতমসা; অবিশ্বাস আর বিশ্বাসভঙ্গের নিরন্তর মহড়া তখন তিনি পরিত্রাতা রূপে দেখতে পান গান্ধীজিকে। কিন্তু দুর্জন সবল যেখানে ক্ষমতাসীন, সেখানে শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসের মতোই শোনায়। তাই এই নাটকের কাহিনি-কাঠামোতে যে মানবিক বোধের আভাস আছে তা আর উত্তরণের উজ্জ্বল উদ্ধার হয়ে ধরা দেয় না। পরাজিত, অপমানিত অসহায় মানুষগুলো তাই অতি সহজেই অশুভ শক্তির কাছে বিনত হয়। 'হায় রাম' সেই করুণ পরিণতিরই নির্মম আলেখ্য।

এই নাটকে যে পরিবারের গল্প বলা হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই আমাদের অতি পরিচিত। নাটকের শুরুতে কন্যার জন্য অপেক্ষমাণ বাবা-মায়ের উদ্বেগ, সাংবাদিক কন্যার ঘরে ফেরা; ভিনদেশি এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে আসা; তাকে আশ্রয় দেওয়া নিয়ে যে কাহিনির বিস্তার সেখানেই নিহিত মূল গল্পের বীজ। যে নাটকের জন্য সাংবাদিক রানুর হলে যাওয়া সেই নাটকের দলটি আক্রান্ত হয়েছিল নাটক চলাকালীনই। চারদিকে যখন ধুন্ধুমার চলছে তখন ফোটোসাংবাদিক রানুর কাছে আশ্রয় ভিক্ষাকরে ভিনদেশি ওই যুবক — নাট্যকর্মী নাসিন বোখারি। আমরা যে পোশাকে তাকে দেখি — ধরে নিতে পারি তার অভিনীত চরিত্রেরই পোশাক ওটি। দুর্ভাগ্যক্রমে এই পোশাক দিয়েই তার জাতধর্ম চিহ্নিত হয়ে যায়। এ রকম কাকতালীয় ঘটনাসূত্রেই 'হায় রামে'র কাহিনির ভিত্তি। ভাবতে কষ্ট হয় অলোকপ্রসাদের মতো একজন নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদীর স্ত্রী মালার কেন দ্বিধা হয় একজন ভিনদেশি যুবককে আশ্রয় দিতে। তাঁর চালচলন আর দশটা দ্বিধাগ্রস্ত মধ্যবিত্ত ঘরনির মতো। কিন্তু তা তো হবার কথা ছিল না! তিনি যে অলোকপ্রসাদের স্ত্রী। পরিবারের অন্য সদস্য অলোকপ্রসাদের ভাই মদ্যপ, শেয়ার বাজারের দালাল। ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে। 'হায় রাম' নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র টিমনভাই। এই ধরনের ক্ষমতালোভী, বিবেকহীন, ধর্মদ্বেষী মানুষই দাঙ্গার স্রষ্টা ও রূপকার। বস্তুত এই চরিত্রটি চেহারায়, অভিনয়ক্ষমতায় সবার মন ছুঁয়ে যায়। তাঁর এই মন ছুঁয়ে যাওয়া অর্থদ্যোতক। তিনি বোধহয় ঘৃণার বদলে এক ধরনের নীরব সমর্থন পেয়ে যান দর্শকদের বৃহদাংশের। এই প্রবণতা ভয়ঙ্কর ও অসুন্দর। যখন বহু প্রগতিবাদীরাও বুকের মধ্যে পদ্মফুলের বিস্তার টের পান তখন টিমনভাইরা তো দাপিয়ে বেড়াবেনই।

সব চরিত্রগুলোই সরল বাংলা ভাষায় কথা বলেছে অথচ নামের শেষে পদবি বিভিন্ন রাজ্যের। এই ভাবেই কি নাট্যকার দেশ কালের ঊর্ধ্বে উঠতে চেয়েছেন। তাও কি সম্ভব? অন্তত এ রকম কাহিনি-বিন্যাসের মোড়কে। নাটকের চরিত্ররা মাঝে মাঝেই কবিতার ভাষায় কথা বলেছেন। কারণ কিছু অনুধাবন করা গেল না। সঞ্চয়ন ঘোষের মঞ্চস্থাপত্য কাট-আউটের ভিড় বলে বিভ্রম হয়। বিশেষ করে ছোট মঞ্চে। তা ছাড়া গান্ধীমূর্তিতে আলোর প্রতিবিম্ব দর্শকদের চোখকে পীড়িত করে। আলোক সম্পাতে তাপস সেনের নাম থাকাটাও বিস্ময়কর। শেষ দৃশ্যের রঙিন আলোকের চমকের জন্য তিনি আর কত ব্যবহৃত হবেন!

শিশির মঞ্চে আমি 'হায় রাম' এর যে অভিনয়টি দেখি তার আয়োজক ছিলেন গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ। প্রবেশপত্রে অভিনয়ের সময় বিকেল পাঁচটা মুদ্রিত দেখে একটু বিস্মিত হই। যা হোক যথা সময়ে অকুস্থলে পৌঁছলেও হলের দ্বারপাল আমাদের ঢুকতে দেন সোয়া পাঁচটায়। সাড়ে পাঁচটায় শুরু হয় লেখক শিল্পী সংঘের বক্তৃতা। ঘন্টাখানেক ওঁদের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শোনার পর নাটক দেখার সৌভাগ্য হয়। অভিনয় শুরু হয় ঠিক সাড়ে ছ'টায়। দেরিতে শুরু করার জন্য নাট্যদল বা আয়োজক সংস্থা কারও পক্ষেই কোনও দুঃখপ্রকাশ করা হয় না। হায় রাম!

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি

কোনও একচেটিয়া বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠানের নিরন্তর প্রচারের সামগ্রী নয়, কোনও প্রচারমাধ্যমের পণ্যবিক্রির উদ্দেশ্যমূলক ঢক্কা নিনাদে নয়, কবিতা নিয়ে, শুধুই কবিতা নিয়ে, কবিতার অন্তর্গত শক্তি দিয়ে কাব্যাদর্শে বিরোধী, এমন কবিকেও প্রতিভার মৌলিকতায় আবিষ্ট করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, এবং তা প্রথম আবির্ভাবেই, প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই।

এ একটা বহু আলোচিত ঘটনা, কবিতার পাঠকমাত্রই জানেন, গত ষাট সত্তর বছর ধরে একটি নাম ও যাঁর কবিতার বিভিন্ন পংক্তি বা স্তবক মুখে মুখে ফিরেছে, ব্যবহৃত হয়ে এসেছে সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষ ও দলের কর্মী বা নেতাদের মুখে, পোস্টারে, মিছিলে; সেই কবির নাম সুভাষ মুখোপাধ্যায়। জনপ্রিয়তায় প্রথম থেকেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী; যাঁর কবিপ্রতিভা নিয়ে বিতর্ক জাগেনি কখনও, বিরূপ সমালোচনা শুনতে হয়েছে কদাচিৎ; যে কোনও দিন কবিতা পড়ে না, সেও কবি হিসাবেই সুকান্ত-সুভাষের নাম জানে, যেমন জানে রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের নাম; যিনি বেঁচে থাকতে বাংলা ও ভারতীয় সাহিত্যে অনেক অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। অনেক কবিতা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে যাঁর, তিনি একমাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

একজন কবির পথ কখনও কুসুমাস্তীর্ণ হয় না; সাধারণত উপেক্ষা, অবহেলা, নানা সমালোচনা, তা প্রায়শই বিরূপ হয়ে থাকে; বই প্রকাশ থেকে পাঠকের কাছে পৌঁছানো, তার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় কবিকে; সারা জীবন বোদলেয়র থাকেন উপেক্ষিত, মৃত্যুর পর তরুণ প্রতিভা তাকে কবিদের কবি সত্যদ্রষ্টা বলে শ্রদ্ধা জানান। একজন ব্লেক থাকেন, প্রখ্যাত সংকলনের বাইরে দীর্ঘকাল তেমন-একজন-কবি নন বলে, আবার তিনিই সম্মানিত হন একজন প্রধান রোমান্টিক, মিস্টিক চেতনার গভীর কবি রূপে, যা প্রায় আবিষ্কারের সমতুল। সমকালে অনাদৃত জন ডানকে এলিয়ট বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে খুঁজে বের করেন। কবিদের ভাগ্য সাধারণত এ রকমই; এটাই স্বাভাবিক যেন।

সুভাষ আবির্ভাবমাত্র প্রতিভা বলে সম্মানিত হতে লাগলেন। আমাদের দেশে নজরুল ইসলাম এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় আবির্ভাবমাত্র গৃহীত, সম্মানিত হয়েছেন; এবং ক্রমশই তা বেড়েছে বই কমেনি। এর কারণ অবশ্যই, নজরুল সুভাষ সুকান্তর কবিতায় তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক- সমস্যা ও সংকট সম্বন্ধে সচেতনতা ও তার সোচ্চার প্রকাশক।

১৯১৯ সালে কবির জন্ম, প্রথম বই 'পদাতিক' বেরুল ১৯৪০-এ। তাতে পেলাম প্রায় প্রচলিত কাব্যিক ব্যঞ্জনাধর্মী উচ্চারণের পরিবর্তে স্পষ্ট ঋজু বক্তব্য এবং তা ছন্দের স্পন্দিত ধ্বনিমাধুর্যে শ্রুতিসুখকর —

> প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
> ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
> চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল-মদ্য
> কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া। (মে-দিনের কবিতা)

আধুনিক কবিতা ও কবির মুখপাত্র রূপেই যেন বুদ্ধদেব বসু 'পদাতিক'- এর কবি সম্বন্ধে লিখেছিলেন - "অভিনন্দন তাঁকে আমরা জানাবো, কিন্তু তা শুধু এই কারণে নয় যে তিনি এখন কবিকনিষ্ঠ। কিংবা নিছক এই কারণে নয় যে তাঁর কবিতা অভিনব, যদিও তাঁর অভিনবত্ব পদে পদেই চমক লাগায়। তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে মাত্র কয়েকটি কবিতা লিখে তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে তিনি শক্তিমান; যে কোনো আদর্শেই না বিচার করি, মন দিয়ে পড়লে তাঁর কাব্যের সার্থকতা স্বীকার করতেই হয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' আমার এ কথার সাক্ষ্য দেবে।" আধুনিক কবিতা আন্দোলনের পুরোধাব্যক্তিত্ব বুদ্ধদেব বসু শিল্পবিশ্বাসে ভিন্ন পথের পথিক হলেও, 'পদাতিক'- এর কবিতায় তরুণ কবির শক্তিমত্তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন প্রথমেই। শক্তিমত্তা শুধু প্রকাশের লক্ষ্যমুখিনতা ও দৃঢ়তাতেই প্রকাশ পায়নি, তা ছিল নতুনত্বে, চিন্তার অভিনবত্বে।

আমাদের সাহিত্যে, বিশেষ করে কবিতায় ব্যক্তিবাদ একটা প্রধান চরিত্র। রোমান্টিক কবিচরিত্রই হল ব্যক্তিত্বের উন্মোচন ও প্রতিষ্ঠা। সেখানে 'আমি'ই প্রধান। রবীন্দ্রনাথের মতো জন্ম রোমান্টিক কবি বলেন "আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনী উঠলো রাঙা হয়ে।" বস্তু বা বিষয়ের নিজস্ব কোনও ব্যক্তিত্ব থাকতেই পারে, তাকে কবি কোন চোখে দেখছেন সেটাই তার প্রকৃত রূপ রোমান্টিক কবির কাছে। রবীন্দ্রনাথের গানে তাই এরই নানা প্রতি-উচ্চারণ "চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে"।

সমর সেন বাংলা কবিতায় গদ্য ভাষার ব্যবহারে কবিতাকে একটা অন্য চেহারা দিলেন, আর ব্যক্তিকে নয়, বিষয়কে গুরুত্ব দিলেন, যদিও তাঁর কবিতাতেও রোমান্টিকতা ফিরে ফিরে এসেছে। আর সুভাষ? "আরো প্রবল ও স্পষ্টভাবে, তিনি ব্যক্তিবাদের বিরোধী; তাঁর মুক্তিকামনা একলার জন্য নয়, কোনো বিধাতা নির্বাচিত মনীষী সম্প্রদায়ের জন্যও নয়, সমগ্র মনুষ্য সমাজের জন্য। সাম্য ও সংহতি ছাড়া মুক্তির অন্য কোনো সংজ্ঞার্থ তাঁর মনে নেই" (কালের পুতুল/ বুদ্ধদেব বসু।)

অবশ্য আজ এতকাল পরে বোঝা যায়, এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার আজীবন প্রচেষ্টা সুভাষের কবিতাকে একমুখীও করে তুলেছে; মানুষ একদিকে যেমন সামাজিক নানা বন্ধনে অজস্রের সঙ্গে জড়িত, তেমনই কখনও কখনও সে একা, ভাবুক, একান্ত ও মন্ময়। কবিতায় শুধু ভবিষ্যতের আশা ও স্বপ্ন উচ্চরোলে উচ্চারিত হয় না, মানুষ এই জগৎ এই জীবনের মধ্যে কখনও কখনও একান্তে একা হয়ে সমগ্রকে অনুভব করতে চায়, অস্তিত্বের সারবত্তাকে অনুভব করতে চায়, কবিতা পায় বহুমাত্রিকতা।

আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি;
একাকী চলতে চাই না এরোপ্লেনে;
আপাতত চোখ থাক পৃথিবীর প্রতি;
শেষে নেওয়া যাবে শেষকার পথ জেনে।

'পদাতিকে'র দ্বিতীয় কবিতাটির শিরোনাম 'সকলের গান' খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সেই বহুবিখ্যাত পংক্তি, কমরেডদের উদ্দেশ্যে উদাত্ত আহ্বান — 'কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না' যেখানে বলা হল 'লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা-/দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে' — এই হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কু, যে সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে না, তাকে দলে টানতে হবে; আর নবযুগ আনবার জন্য রোমান্টিক স্বপ্ন বা সৌন্দর্যের মায়ার টান ছিঁড়ে ফেলতে হবে -

আকাশের চাঁদ দেয় বুঝি হাতছানি
ওসব কেবল বুর্জোয়াদের মায়া -
আমরা তো নই প্রজাপতি-সন্ধানী
অন্তত, আজ মাড়াই না তার ছায়া।

বোঝা যায়, একেবারে সাম্যবাদে দীক্ষিত এক কমরেড মিলিত অগ্রগতির ডাক দিয়ে রোমান্টিক যা কিছু, তাকে বর্জনের আহ্বান জানাচ্ছেন। এই নৈর্ব্যক্তিকতা বাংলা কবিতায় খুব নতুন নয়, কিন্তু পরিবেশনে নতুন, অর্থাৎ উচ্চারণে।

সাম্যবাদে দীক্ষিত কবির স্বপ্ন সমগ্রকে নিয়ে। একার অস্তিত্ব সেখানে নেই; ব্যক্তিক-অনুভূতি সেখানে প্রাধান্য পায় না। অথচ সব দেখাই তো ব্যক্তির দেখা; 'সালেমনের মা' কবিতায় 'পাগল বাবরালির চোখের মত আকাশ' এ তো ব্যক্তির দেখা; 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।' এও তো ব্যক্তিগত দেখা বা অনুভব করা। 'ছেলে গেছে বনে'- কবিতায় - 'ঝরাতে ঝরাতে যাব সারা রা মাঠের শিশির'- ব্যক্তি উঁকি দিচ্ছে না?

বড় বড় ঢেউ তুলে যতই দেখাক ভয়
পাড় ভাঙা নদী
ফিরে পেতে চাই সেই বাল্যের বিস্ময়

সবাই বাল্যের বিস্ময়ে ফিরে যেতে চায় কোনও না কোনও সময়ে। সব মানুষই বহুজনতার মাঝে একা হয়ে যায় কখনও কখনও, আর তখনই 'অনুভূতি দেশ থেকে আলো' এসে পড়ে কবিতায়, যে কোনও সৃষ্টিতে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাতেও স্বাভাবিক ভাবে অন্তত উপমায় চিত্রকল্পে তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে। ১৯৩৯-এ 'পদাতিক' ১৯৫০-এ 'চিরকুট'; 'অগ্নিকোণ' (১৩৫৫?) জিজ্ঞাসাচিহ্ন রয়েছে; 'ফুলফুটুক' (৫৭); 'যত দূরেই যাই' ('৬২); 'কালমধুমাস' ('৬৬); 'এই ভাই' ('৮১); 'ছেলে গেছে বনে' (১৯৭২) 'একটু পা চালিয়ে ভাই'; 'জল সইতে ধর্মের কল' ইত্যাদি কবিতার বই একজন প্রকৃত, অনুপ্রাণিত শক্তিমান কবিকে মেলে ধরেছে।

শুধু কবিতা নয়, উপন্যাস লিখেছেন কুষ্ঠরোগীদের নিয়ে। হাংরাস ইয়াসিনের কলকাতা, প্রভৃতি উপন্যাস; ভাষায়, রচনারীতিতেও তা যেমন স্বতন্ত্র তেমনই অনুবাদকর্মে, ভ্রমণ কাহিনিতে, ছোটদের জন্য লেখায় তিনি অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন।

ব্যক্তিমানুষ হিসাবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনুকরণীয় আদর্শ ব্যক্তিত্ব। সারা জীবন, যত দিন শরীর অশক্ত হয়ে পড়েনি, হেঁটে বেড়িয়েছেন কলকাতায়, নানা গ্রামগঞ্জের পথে। প্রকৃত অর্থেই 'পদাতিক' কবি তিনি। আমরা অনেকেই দেখেছি, এলোমেলো এক রাশ চুল উড়ছে সাদামাটা পোশাক পরে হাতের বাদাম মুড়ির ঠোঙা থেকে খেতে খেতে হেঁটে চলেছেন ফুটপাথ ধরে; কোনও আভিজাত্যের গুমোর নেই, নেই যশ-সচেতনতা; অথচ পেয়েছেন ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারগুলো, পেয়েছেন জ্ঞানপীঠ, অকাদেমি, রবীন্দ্র পুরস্কার, পেয়েছেন কালিদাস সম্মান, কুমারণ পুরস্কার, আফ্রো-এশিয় সাহিত্য পুরস্কার; পেয়েছেন মধ্যপ্রদেশ সরকারের কবির সম্মান।

শরীর ভাল থাকলে জনসংযোগ রেখেছেন সর্বক্ষণ। নাজিম হিকমতের কবিতা অনুবাদ করেছেন, তা এত স্বাভাবিক, মনে হয়, আমাদের বাংলা ভাষার কবিতাই পড়ছি; অনুবাদে দক্ষতা তাঁর সত্যিই অসামান্য ছিল। অমরুশতক, পাবলো নেরুদার কবিতা, অ্যান ফ্রাঙ্কের ডায়েরি, চে গুয়েভারার ডায়েরি, রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ, হাফিজের কবিতা, সবই স্বচ্ছন্দ আর সুন্দর অনুবাদের নিদর্শন। তিনি কোনও নিয়মিত চাকুরি করেননি, তবে সাংবাদিকতা করেছেন, পরিচয় পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। লেখাই ছিল কবির আয়ের উৎস।

তাঁর আত্মচরিত 'ঢোলগোবিন্দের আত্মদর্শন' সত্যনিষ্ঠ স্বপ্নদর্শী কবির অসাধারণ আত্মজীবনী। বদলাচ্ছিলেন নিজেকে। যে সমষ্টিবাদ দিয়ে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির সূচনা, ক্রমশ তাতে ব্যক্তির স্বাধীন সত্তার প্রকাশ দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। অন্যায় মনে হলে প্রতিবাদ করেছিলেন, আর এই প্রতিবাদ তো শৃঙ্খলাবদ্ধ পার্টিতে চলবে না; ক্রমশ হয়ে পড়ছিলেন নিঃসঙ্গ, আর নড়বড়ে আর্থিক অবস্থা সামাল দিতে গিয়ে প্রায় বেসামাল। আমাদের ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রোগে ভুগে, দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে মারা গেলেন ৮ জুলাই, ভোরবেলায়।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

স্মরণ

সংযোগের মানুষ

শিশির এসে পৌঁছবে দিল্লি থেকে, থাকবে কয়েকদিন আমাদের সঙ্গে, মনটা ভরে আছে খুশিতে। খুশিতে ভরে আছে, কেননা এই কয়েকটা দিন কেটে যাবে শুধু রঙ্গমুখর কথাবার্তায়, কলকাতায় আমাদের ছোট-একটা বন্ধুবৃত্তের প্রাণোচ্ছল গল্পগুজবে, অল্পবয়সীদের উন্মুখ যাওয়া-আসায়, আর সেইসঙ্গে নতুন আর সতেজ অনেক পরিকল্পনার আঁচে। শিশির এসেছে মানেই হল কোনও-না-কোনও সেমিনারের বা কনফারেন্সের জন্য নতুন কোনও প্রবন্ধ আছে সঙ্গে, কিংবা যাদবপুরে অল্পদিনের অতিথি-অধ্যাপক হিসেবে উদ্দীপক কোনও ভাবনা আছে মনে, কিংবা হয়ত কোনও নির্বাচন-সমিতির সদস্য হিসেবে দুরূহ দায়িত্ব নিয়ে চিন্তায় আছে সে। এই কয়েকটা দিনে সেইসব চিন্তা বা কল্পনার ছোঁয়া পাওয়া যাবে অনেকখানি, আমাদেরও নতুন খানিকটা শেখা হয়ে যাবে। শেখা হয়ে যাবে কীভাবে একটা আনন্দময় - এমনকী হুল্লোড়ভরা - দিনযাপনের মধ্য দিয়েও আনাগোনা করা যায় চিন্তাভাবনার চর্চায়। আমাদের কারও কারও অভ্যস্ত শিথিলতায় কিছুটা শৃঙ্খলা দিয়ে, আমাদের কোনও কোনও নিষ্ক্রিয়তায় খানিকটা উজ্জীবনের আভাস দিয়ে, ফিরে যাবে সে দিল্লিতে।

তার এই আসা আর কয়েক দিনের থাকা আমাদের নিয়মিত প্রত্যাশার অন্তর্গত হয়ে গিয়েছিল। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে তার এই চলে আসা খুব স্বাভাবিক ভাবেই ঘটতে থাকবে। ঘটছিলও তা। বছরে কয়েক বার, কখনও বা প্রতিমাসেই একবার তার দেখা পাওয়া যায় এই শহরে। তেমন ভাবেই দেখা পাওয়া গিয়েছিল এই কয়েক মাস আগেও, এই মার্চেও, এই এপ্রিলেও। কোনও-না-কোনও কারণে ডাক দিলেই তাকে পাওয়া যাবে এটা অনেকেরই বেশ জানা হয়ে গিয়েছিল। জানা হয়ে গিয়েছিল যে প্রথমে অল্প একটু আপত্তি করবে সে, শারীরিক কারণে ঈষৎ অনিচ্ছা জানাবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তবু ছাড়তে পারবে না কলকাতার অরোধ্য টান। ছাত্রবয়স পেরিয়ে যাবার অল্প পরেই কাজের সুবাদে তাকে চলে যেতে হয়েছিল লন্ডনে, স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এর অধ্যাপনায়। কিন্তু সেখান থেকে ফিরবার পর তার নিজের শহর কলকাতায় স্থায়ী বাসের আর সুযোগ ঘটে না কখনও। তাই অস্থায়ী এই অবস্থানগুলি তার কাছে হয়ে ওঠে অনেকখানি, এসব অবস্থানের প্রত্যেকটা মুহূর্তকে সে পান করতে চায় অপার তৃষ্ণায়, প্রায় কিশোরোচিত আবেগে। সাময়িক একটা তৃপ্তি নিয়ে (কিন্তু অনেকসময়েই চোখের কোণে জলের আভাস নিয়ে) সে ফিরে যায় তার কর্মভূমি দিল্লিতে।

শরীরে যে একটা অসুখ জমা ছিল সেকথা সে গোপন করত না কখনওই, জানত আমরা সকলেই জানতাম হৃদ্‌গত সেই অসুখের খবর। কিন্তু তার চলাফেরার সাবলীলতায় আমরা ভুলে থাকতাম সেই অসুস্থতার গুরুত্ব, দেশেবিদেশে অবিরত দৌড়ঝাঁপ থেকে তাকে বিরত করার কোনও চেষ্টাও করতাম না আমরা। কেননা এই দৌড়ঝাঁপে সে তো কেবলই আমাদের সাহিত্যের কথা আমাদের সংস্কৃতির কথা আমাদের ঐতিহ্যের কথা বলে বেড়াচ্ছে গোটা পৃথিবী জুড়ে। এক হিসেবে, সে যেন আমাদের সত্যিকারের এক সাংস্কৃতিক দূত হয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে এদেশ-ওদেশ। নিজের জীবনের অবস্থানকে সে ঠাট্টা করে অনেকসময় বলত 'এ টেল অব টু সিটিজ'; কিন্তু শুধু তো দিল্লি আর কলকাতার মতো দুই শহরের হাইফেন হয়েই নয়, শুধু তো সমগ্র ভারতের সঙ্গে বাংলার এক সেতুপথ হয়েই নয়, পৃথিবীর নানা অঞ্চলের সঙ্গেই ওই সেতুপথ সে তৈরি করতে চাইছিল তার দেশবিদেশের আনাগোনার মধ্য দিয়ে। তাই অসুস্থতার মধ্যেও দূর দেশে পাড়ি দিতে দেখলেও বিচলিত হতাম না আমরা, ভাবতাম তার প্রাণশক্তিতে সহজেই সে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে তার শারীরিক সব বাধা। ৭মে রাত্রিবেলা তার আকস্মিক মৃত্যুর খবরে হতচকিত থাকবার খানিকক্ষণ পরে মনে পড়ে যায় যে এর জন্য তৈরি থাকাই আমাদের পক্ষে সংগত হতো, কেননা তার শারীরিক ক্ষয়ের কথা তো একেবারে অজানা ছিল না আমাদের। কিন্তু তৈরি থাকতে পারিনি আমরা; আমরা ভুলে ছিলাম তার কথার লাবণ্যে, ভুলে ছিলাম চারপাশের সঙ্গে তার চির-উৎসুক সম্পর্করচনার আগ্রহের তীব্রতায়।

সেই তীব্রতায়, এই মার্চেও, কলকাতায় কয়েক দিনের অবিরল ব্যস্ততার মধ্যেও সে সময় করে নেয় একবার শান্তিনিকেতন ঘুরে আসবার। কেননা কয়েকদিন আগে মৃত্যু হয়েছে তার অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীর। এই অধ্যাপকের কাছে দু'বছরের জন্য পাঠ নিয়েছিল সে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, অনেকেই যেমন নেয়। কিন্তু অন্য অনেকের মতো সে ভুলে থাকেনি সেই সময়টাকে। সেই পাঠস্মৃতি কৃতজ্ঞ মনে সে বয়ে চলেছে আজীবন। যত কষ্টই হোক, শ্রদ্ধা-ভালবাসা জানাবার জন্য সেই মানুষটির

স্মরণ-কাজে একবার না পৌঁছলেই নয়। কিংবা সে মনে রেখেছে তার স্কুলশিক্ষক পরিমলবাবুর কথা, ভবানীপুর সাউথ সাবার্বন স্কুলের পরিমলকুমার দত্ত। এই শিক্ষকেরও মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে অব্যাহত যোগ রেখে যায় শিশির, কেননা মনে মনে তাঁকে আদর্শ করে নিয়েছিল সে, নিজের জীবনে গভীরভাবে অনুভব করেছে তাঁর প্রভাব। কিংবা কলকাতায় এসে পৌঁছলেই তাঁর প্রথম কৃত্য ছিল রবীন্দ্র- কুমার দাশগুপ্তর সঙ্গে কথা বলে নেওয়া, তাঁর কুশল জেনে নেওয়া, কেননা তাঁরই স্নেহে আর তত্ত্বাবধানে সে শুরু করেছিল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনার কাজ। সে কাজ তো কেবল অধ্যাপনারই নয়, প্রসারিত একটি কল্পনা দিয়ে কোনও একটা বিভাগকে নির্মাণ করে তোলাই ছিল সেই কাজ। ও-রকম বিভাগের কোনও পূর্বনির্ধারিত আদর্শ কোথাও নেই বলেই কাজটা ছিল দুরূহ। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত সব সময়েই বলবেন যে এরকম একটা বিভাগের নির্মাণ সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে উঠত যদি না শিশির হত তার প্রধান স্থপতি, আর শিশির অনেকসময়ই বলবে এ-কাজ করাই যেত না যদি রবীন্দ্রকুমার না থাকতেন এর প্রধান অবলম্বন। রবীন্দ্রকুমার সে-বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আসবার পর কেটে গেছে পঁচিশ বছরেরও বেশি সময়, কিন্তু অচ্ছিন্ন থেকে গেছে পরস্পরনির্ভরতার আর পারস্পরিক শ্রদ্ধার সমুজ্জ্বল এক মমতাময় সংযোগ।

এইসব যোগ থেকে বোঝা যেত শিশিরের মানসিকতার বড় একটা দিক। প্রবহমাণতার সঙ্গে, দেশীয় চরিত্রের সঙ্গে, ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেকে নিবিড়ভাবে যুক্ত করে রাখবার একটা প্রবণতায় ভরাট ছিল তার মন। সেই মন নিয়েই তার রচনার পরিচয় হিসেবে সে বলতে পারত বাংলা ভাষা নিয়ে তার 'অভিমান, উদ্বিগ্নতা ও আশা'র কথা। সেই মন নিয়েই হঠাৎ হঠাৎ সে প্রশ্ন করতে পারত : 'আচ্ছা, এটা কি মনে হয় না যে আধুনিকতার একটা তকমার দিকে বড় বেশি মন দিতে গিয়ে আমরা প্রায়ই অন্যায়ভাবে ভুলে থাকি এমন অনেক কবিকে, বেশ কিছু মনোযোগ যাঁদের প্রাপ্য ছিল, যাঁরা অনেকটা বেশি আমাদের মাটির সঙ্গে জড়ানো?' এ-রকম প্রশ্নসূত্র থেকেই সে রবীন্দ্র-সমকালীন বা রবীন্দ্র-উত্তরকালীন অনেক কবির বিষয়ে লিখতে শুরু করে, ভিন্ন এক বিচারমান দিয়ে, আধুনিকতার গণ্ডিবদ্ধ একটা ধারণাকে একেবারে তুচ্ছ করে দিয়ে। সেই মন নিয়েই সে খুঁজতে থাকে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা আর সাহিত্যগুলির অন্তর্বর্তী যোগ, খুঁজতে থাকে 'ভারতীয় সাহিত্য' কথাটার বাস্তবিক তাৎপর্য কোথায় বা কতখানি। স্বপ্নে কল্পনায় অস্থির মন নিয়ে সে স্থিরভাবে তৈরি করে নেয় এক ছক, চারপাশের বিদ্বজ্জনের একটা পরিমণ্ডল গড়ে নিয়ে ভেবে দেখতে চায় পথিকৃৎ এক বিরাট কাজের সম্ভাবনা, আট খণ্ডে সম্পূর্ণ কোনও এক ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, যার শেষ খণ্ডটির দায় নেবে সে নিজেই। দুই পর্বে পূর্ণ সেই পরিব্যাপ্ত খণ্ডের — কার্যত যা হয়ে দাঁড়িয়েছে অষ্টম আর নবম — প্রকাশ ঘটে যাওয়ার বহু বছর পরেও যে অন্য কোনও খণ্ডের কাজ শুরু করতেই পারলেন না ভারপ্রাপ্ত অন্য পণ্ডিতজনেরা, এর থেকে অনুমান করা যায় ও-কাজের জটিলতা আর শ্রমসাধ্যতা। অথচ শিশির সে কাজ করে তোলে শুধু যে অল্প সময়ের মধ্যে তা নয়—প্রায় যেন খেলাচ্ছলে। অন্তর্বর্তী সেই সময়টুকুর মধ্যে বিচিত্রপ্রাসঙ্গিক সেমিনারেরও বিরতি থাকে না তার, বিরতি থাকে না ঝরনার বেগে কবিতা-নাটক রচনার, বিরতি থাকে না সংখ্যাতীত চিঠি লেখার, যেসব চিঠির কোনও-কোনওটা হয়ে দাঁড়ায় সাহিত্যবিচার, কোনও-কোনওটা অফুরন্ত হাস্যমুখরতায় ভরাট কোনও সাহিত্যরচনা যেন। কবিতা বা নাটক বা এই সব সৃষ্টিকাজ যেন তার অবসরযাপন, অন্যসব কাজের চারপাশে কেবলই তা উপচে উপচে পড়ছে।

তার মতো আদ্যন্ত বাঙালি স্বভাবের মানুষকে আমরা পরিহাস করে কখনও কখনও বলতাম খাঁটি ইংরেজ। সেটা এজন্য নয় যে বিলেতে কয়েকবছর কাটিয়ে এসেছে সে। সমস্ত আনন্দ-আহ্লাদের মধ্যে থেকেও, আপাত-বিশৃঙ্খলার মধ্যে থেকেও, ওর চালচলনে আর দিনযাপনে ছিল এক অভ্যন্তরীণ ছন্দ আর শৃঙ্খলা, যাকে প্রায় সাহেবি শৃঙ্খলা বলে মনে হতে পারত। তা ছাড়া, ঐতিহ্যটানের সূত্রেই, ব্রিটিশ ভারতের বিষয়েও ওর ছিল এক স্বীকৃতিমূলক শ্রদ্ধা। প্রায় তিরিশ বছর আগে, দিল্লির পথে পথে পায়ে হেঁটে ঘুরতে ঘুরতে, পথবিন্যাস গৃহবিন্যাস আর ইতিহাসবিন্যাস বোঝাতে বোঝাতে এক সরল আবেগ নিয়ে বলে উঠেছিল শিশির : এসবও কিন্তু অগ্রাহ্য করা যায় না। 'ইংলন্ডের এবং ইউরোপের একটা প্রচণ্ড প্রভাব মনের মধ্যে যে পড়েছিল, এখনও যে সেই প্রভাব জেগে আছে আমার সত্তায় তা অকপটে স্বীকার করব'— বছর দুয়েক আগে এক সাক্ষাৎকারে এটা বলেওছিল শিশির। উপনিবেশের কুফলগুলি অন্য কারও চেয়ে সে কম জানত বা কম ভাবত তা নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে সে মনে রাখত মিশ্রণের কথা সমন্বয়ের কথা, প্রাচ্যপ্রতীচ্যের অতীত অথবা আজও জায়মান সম্পর্কজটিলতার কথা, গ্রহিষ্ণুতার কথা। প্রত্যাখ্যানে বা উদাসীনতায়, অভ্যর্থনায় বা আকর্ষণে, মন্থর গ্রহণে বা বেদনাতুর সমর্পণে কীভাবে প্রতীচ্যের সঙ্গে বিচিত্র সেই সম্পর্ক তৈরি করেছে উপনিবেশের ভারত, এইটেই ছিল তার প্রধান এক ভাবনার বিষয়। আর, সেইসব ভাবনা বা কৌতূহল থেকেই — এক দিকে যেমন সে গড়ে তুলতে চেয়েছে সম্পূর্ণ নতুন এক ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস কিংবা গোটা ভারতের সামনে সাজিয়ে তুলতে চেয়েছে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ ইংরেজি- রচনাবলি — অন্য দিকে সে খোঁজ নিতে চেয়েছে ভারত আর পশ্চিমজগতের মুখোমুখি হবার নানা ইতিহাস। বহু গবেষণার কাজকে অতিক্রম করে সে-ইতিহাস শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে কোন্ অন্তঃসারের সন্ধানে আর সৃষ্টিতে, 'অলৌকিক সংলাপ' নামে তার দোসরহীন বইখানির মধ্যে তার

পরিচয় ধরা আছে। তার মনের মধ্যে অবিরতই ঘুরে বেড়াত প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সংস্কৃতির সম্পর্কজাতএমনই এক সংলাপমালা।

এগারো বছর আগেকার এক বক্তৃতায় শিশির প্রশ্ন তুলেছিল : বিদ্যায়তনে সাহিত্য আমরা পড়ব কেন? কিংবা, পড়ব কীভাবে? শুধু বক্তৃতা নয়, যে-কোনও বৈঠকে অল্পবয়সীদের সঙ্গে যে-কোনও আলাপমুহূর্তে, এই প্রশ্নটা সে তুলতে চাইত। এটা যে একটা ভাববার মতো কথা, এই বোধটা সে জাগিয়ে তুলতে চাইত অন্যদের মনে। তার নিজের মনে হয়েছিল, সাহিত্য পড়বার একটা তাৎপর্য পাওয়া যায় তখনই, যখন তার পাঠ আমাদের আরও একটু মানবিক করে তোলে, প্রতিমুহূর্তে আমাকে যুক্ত করে দেয় বিশ্বের সঙ্গে। 'মানুষে মানুষে যে সামাজিক ঐক্য আমাদের সমস্ত কর্মকে তাৎপর্য দেয়' সেইখানেই আমাদের পৌঁছে দিতে পারে সাহিত্যের পাঠ। অনেক অনেক সাহিত্য পড়বার পরেও সেখানে যে অনেকে আমরা পৌঁছতে পারি তা নয়, অনেক সময় বরং গণ্ডিবদ্ধ হতে হতে ভীতিপ্রদ এক সংযোগহীনতার শুকনো হাওয়ায় জড়ো হতে থাকে আমাদের সাহিত্যপাঠের পাণ্ডিত্য। কিন্তু শিশির তার অশেষ বিদ্যাবত্তা আর বিদ্যাচর্চা নিয়েও থাকতে পেরেছিল সেই গণ্ডির বাইরে সজীবএক মানুষ হিসেবে, তার পক্ষে সত্যি হয়ে উঠেছিল বিশ্বের সঙ্গে প্রতিমুহূর্তের সংযোগ। যে কোনও নতুন মানুষকে তাই সে অনায়াসে নিজের করে তুলতে পারত, তারাও তাকে মনে করতে পারত নিবিড় আত্মীয়। আত্মপরিচয়ের ছলে সে লিখেছিল একবার যে 'সে এমন একজন মানুষ যে জ্ঞানের জগতের সঙ্গে কর্মের জগৎ এবং আত্মজগতের সঙ্গে বিশ্বজগতের সমন্বয়ে বিশ্বাসী এবং প্রত্যাশী'। সে হয়ত জানত না,কিন্তু আমরা অনেকে জানতাম, সেই বিশ্বাস আর প্রত্যাশা সফল ছিল তার জীবনে, তার লেখনে; সে ছিল আদ্যন্ত এক সংযোগের মানুষ।

শঙ্খ ঘোষ

শিশিরকুমার দাশ : গ্রন্থপঞ্জি

প্রবন্ধগ্রন্থ:

১. মধুসূদনের কবিমানস, বুকল্যান্ড, ১৯৫৯;
দ্বিতীয় সং: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৯

২. বাংলা ছোটগল্প, বুকল্যান্ড, ১৯৬৩;
দ্বিতীয় সং: দে'জ পাবলিশিং,১৯৮৩

৩. গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব, দে'জ পাবলিশিং,১৯৮৫

৪. বিতর্কিত অতিথি (তান ওয়েনের সঙ্গে), প্রমা,১৯৮৫

৫. শাশ্বত মৌচাক (শ্যামাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে),
প্যাপিরাস, ১৯৮৭

৬. কবিতার মিল ও অমিল, দে'জ পাবলিশিং ১৯৮৭

৭. ভাষাজিজ্ঞাসা, প্যাপিরাস, ১৯৯২

৮. পাঠ্যক্রম ও সাহিত্য, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউন্ডেশন,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,১৯৯২

৯. ফুলের ফসল : সংকলনের রাজনীতি,
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি,১৯৯৮

১০. মোদের গরব মোদের আশা, চিরায়ত, ১৯৯৯

১১. ভারতসাহিত্যকথা, বিশ্বভারতী,১৯৯৯

কাব্যগ্রন্থ :

১. জন্মলগ্ন, পূর্বমেঘ,১৯৫৬

২. হয়তো দরোজা আছে অন্যদিকে, মন্দাক্রান্তা,
দিল্লি,১৯৮৬

৩. অবলুপ্ত চতুর্থ চরণ, মন্দাক্রান্তা, দিল্লি, ১৯৮৬
দ্বিতীয় সং, আই. এম. এইচ.,
নতুন দিল্লি, ১৯৮৯

৪. বাজপাখির সঙ্গে কিছুক্ষণ, সীমন্তিনী,১৯৯২

নাটক :

১. সক্রেটিসের জবানবন্দি (একাঙ্ক),
আই. এম. এইচ, নতুন দিল্লি,১৯৮৯ দ্বি. সং ১৯৯২,
তৃ. সং ১৯৯৭

২. মুচিরাম গুড়, আই. এম. এইচ, নতুন দিল্লি, ১৯৯১ দ্বি.সং.

৩. আকবর বীরবল, প্যাপিরাস,১৯৯৫

৪. বাঘ, প্যাপিরাস,১৯৯৬

৫. অলৌকিক সংলাপ (১০টি একাঙ্ক সংকলন),
প্রমা,১৯৯৬

৬. আদিম অন্ধকার, আই. এম. এইচ, নতুন দিল্লি,১৯৯৭

৭. সিন্দুক, প্যাপিরাস, ১৯৯৮

৮. পুরস্কার প্রহসনম্, (একাঙ্ক), প্রমা, ১৯৯৯

অনুবাদ :

ক. নাটক :

১. বন্দিনী, Euripides' Trojan Women, প্রমা,১৯৮৩

২. রাজা ওইদিপৌস, Sophocles' King Oedipus,
প্রমা, ১৯৮৮

৩. আন্তিগোনে, Sophocles' Antigone, প্রমা, ১৯৮৯

খ. কবিতা :

১. বহুযুগের ওপার হতে, প্রাচীন গ্রিক কবিতার অনুবাদ, প্যাপিরাস,১৯৮৯

২. নির্বাচিত কবিতা, আই ছিং, প্রমা, ১৯৯১

৩. নির্বাচিত কবিতা,জর্জ সেফেরিস, সাহিত্য অকাদেমি,১৯৯২

৪. ঠাম্মার উলবোনা, উরি ওরলেভ, এন.বি.টি,১৯৯৯

গ. গদ্য :

১. আকবর, লরেন্স বিনিয়ন, এন.বি.টি, ১৯৬৮

২. বিদ্যুৎগতি অভিযান, ডি.কে. পালিত
মূল গ্রন্থ: The Lightening Campaign
থমসন প্রেস, নতুন দিল্লি, ১৯৭২

৩. কাব্যতত্ত্ব , Aristotle's Poetics
প্রথম প্রকাশ: আশা প্রকাশনী, ১৯৭৭
দ্বি. সং : প্যাপিরাস, ১৯৮৬

কিশোরপাঠ্য :

১. সোনার পাখি (কবিতা), নবারুণ প্রকাশন, ১৯৫৯
দ্বি. সং: ১৯৬০,তৃ. সং: ১৯৬১

২. তারায় তারায় (নক্ষত্রকথা), অভ্যুদয়, ১৯৬০
দ্বি. সং: আই.এম.এইচ,নতুন দিল্লি,১৯৯১

৩. আর্গোস (গল্প), দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩

৪. মাইকেল (জীবনী), প্যাপিরাস, ১৯৯৪
দ্বি. সং: ১৯৯৭, তৃ. সং: ২০০১

৫. চিংড়ি (গল্প), শিশু সাহিত্য সংসদ,১৯৯৬

সম্পাদিত গ্রন্থ :

১. চতুর্দশী, সম্বোধি পাবলিকেশনস্, ১৯৬৬

২. শশিভূষণ দাশগুপ্ত স্মারকগ্রন্থ (বাংলা ও ইংরেজি প্রবন্ধগুচ্ছ), অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের সঙ্গে, নিউ এজ,১৯৬৭

৩. শতায়ু সুকুমার,বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন,নতুনদিল্লি,১৯৮৮

৪. মাইকেল মধুসূদন দত্ত (নির্বাচিত রচনা), সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৫

৫. সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, সাহিত্যসংসদ, ২০০৩

ইংরেজি বই :

1. *Early Bengali Prose : Carey to Vidyasagar,* Bookland Pvt., 1996
2. *Western Sailors : Eastern Seas, German Response to Indian Culture*
Thomson Press (India) Ltd., New Delhi, 1971
3. *Structure of Malto: A Study of One of the Dravidian Language Spoken in Bihar ,*
Annamalia University, Publication No. 32
Annamalianagar,1973
4. *The Shadow of the Cross: Christianity and Hinduism in a Colonial Situation,*
Munshiram Monoharlal, 1974.
5. *Sahibs and Munshis: An Account of the College of Fort William,*
Orion Publications, 1978, Papyrus,2001
6. *The Artist in Chains: The Life of Bankimchandra Chaterji*, New Statesman Publishing Company, New Delhi ,1984
Papyrus , 1996 (এই সংস্করণে গ্রন্থনামের বানান পরিবর্তিত : Chatterji হয়েছে Chatterjee)
7. *The Mad Lover: Essays on Medieval Indian Poetry*, Papyrus, 1984
8. *A History of Indian Literature* : Vol. viii
1800 - 1910 Western Impact : Indian Response
Sahitya Akademy, New Delhi,1991
9. *A History of Indian Literature* : 1911- 1956
The Struggle for Freedom : Triumph and Tragedy
Sahitya Academy , New Delhi 1995
10. *The Polyphony of Bhakti* , Forum for Sankardev Studies,Guwahati,1998
11. *Indian Ode to the West Wind : Studies in Literary Encounters,*
Pencraft International , Delhi , 2001
12. *Comparative Literature : Theory and Practice*
ed. with Amiya Dev
Indian Institute of Advanced Study, Shimla,1989
13. *The English Writings of Rabindranath Tagore*
vol. I : Poems, 1994
vol. II : Plays, Stories, Essays, 1996
vol. III : Miscellany, 1996
Sahitya Academy,New Delhi
14. *Talks in China* ,Rsbindranath Tagore, Visva - Bharati , 1999

মানসকুমার কুন্ডু সংকলিত

লোকসংস্কৃতি মধ্যবিত্তের কাছে ঋণী নয়

১৪০৯ এর প্রথম সংখ্যা চতুরঙ্গে সৌমেন সেন "মধ্যবিত্ত লোক-সংস্কৃতি' নিয়ে যে সংকটে পড়েছেন তার নিরসন সহজেই হতে পারে যদি বিষয়টিকে সমাসবদ্ধ আকারে উপস্থিত করা যায়। "মধ্যবিত্ত লোক-সংস্কৃতি" একটি বিশেষ সংস্কৃতি যা মধ্যবিত্ত লোকবলয়ের আবেষ্টনে চলমান; কিন্তু তার উৎস লোকসংস্কৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। "লোকসংস্কৃতি" থেকে রসদ আহরণ মধ্যবিত্তের পক্ষে সহজতর। নিম্নবিত্তদের মধ্যে তার গতি অভিনন্দিত, কিন্তু উচ্চবিত্তদের মধ্যে সে নিন্দিত, অনভিপ্রেত। Sinclaire- এর বিখ্যাত উপন্যাস Babbit - এ সেই কাহিনি মানসপটে সচিত্র হয়ে উঠেছে। সমাজক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ "উদগ্রীব" কিছু চরিত্র আছে যারা কেবল ঝুলে ঝুলে ছায়াপথে উচ্চমার্গে উপস্থিত হতে চায়। তাঁরা সৃজনশীল নয় কোনও অর্থেই। এরা উচ্চবিত্ত বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে তার গৃহে নিমন্ত্রিত হওয়ার অভিপ্রায়ে। কিন্তু নিমন্ত্রণ পায় না কোনওদিনও। উচ্চবিত্ত বন্ধু সাতবার ঘুরিয়ে একবার অনুগ্রহ দান করেন। বন্ধুপত্নীকে দ্বিতীয়বার দৃষ্টিদান করার অযোগ্য মনে করে। প্লেট ভর্তি মিষ্টিতে নখভেদ করে অনীহায় সামান্য মুখে দেয়। কিছু পরে হাই তোলে। মধ্যবিত্তশ্রেণী এদের কাছে ঋণী নয় তার সৃজনতাগাদায়।

এই পত্রের অবতারণা কিন্তু ভিন্ন কারণে। লোক-সংস্কৃতির মতো একটি ধৃতিশীল (enduring), মানুষের অন্তরে ও সমাজের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট গভীরত্ব দানকারী ঐতিহ্যের তাৎপর্য বহনে অদ্বিতীয় মহান বিষয়কে ড. সেন যেমন, তুচ্ছতায় তাচ্ছিল্যে না হলেও, অবিমৃষ্যকারিতায় ঘরছাড়া করতে চেয়েছেন, তাতে বিমর্ষ হয়েছি। প্রমাদে লেখক বিপথে ভ্রমণ করেছেন।

লোক-সংস্কৃতির জনক সাধারণ লোক। এই সাধারণ লোক সভ্যতার তলানি নয়। এই সাধারণ লোক সৃজনশীলতায় মহান। এরাই নৈসর্গিক সৃষ্টিকে নামসৌষ্ঠবে সুমধুর করেছেন। "গঙ্গা যমুনা গোদাবরী" — এই নাম-মাহাত্ম্য - এঁদের সৃষ্টি। পাখির কূজনে, বহমান নদীর কল-প্রবাহে সাধারণ লোক আপনার সুর মিশিয়েছে।প্রকৃতির ম্যাজিকে (ref- Magic Mountain) এঁরা ম্যাজিসিয়ান হয়েছেন। নৈসর্গিক গীত, নৃত্যের, রহস্যময় সরসতায় এরা রসিক। মধ্যবিত্তরা চাঁদের আলোককে বস্তাবন্দি করে, ভগ্ন পোড়া চাঁদকে আধখানা ঝলসানো কালো রুটি বানিয়ে সৃষ্টির কৃতিত্ব চাইতে পারেন কিন্তু সাধারণ মানুষ মুক্ত পথের পথিক। চাঁদের কিরণে তাঁরা শবের গন্ধ পায় না। লুফে নেয় সেই কিরণকে দুই হাতে আত্মহারা হয়ে। লোকগীতি, লোকনৃত্য, লোকাচার, লোকের পূজা-প্রেরণা সামষ্টিক গতিবেগে সৃষ্ট জীবনধারা লোক-সংস্কৃতির অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে বিধৃত।

লোক-সংস্কৃতি মধ্যবিত্তের কাছে ঋণী নয়। কিন্তু মধ্যবিত্তের সৃষ্টি লোক-সংস্কৃতির কাছে ঋণী। মঙ্গলকাব্যের সৃজন লোক-সংস্কৃতির ভিত্তির উপর অবস্থিত। বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের কাহিনি, চাঁদ সদাগর, ধনপতির কাহিনি, বাউল গান, সারি গান, জারি গান ইত্যাদির উত্থান ও বিস্তার গ্রামগঞ্জের পথে প্রবহমাণ হয়ে শহরের রাজপথে বিতানিত হয়েছে। নারায়ণ দেব, রাম বসু প্রভৃতির আবির্ভাব লোক-সংস্কৃতির বিবর্তনের পথে সম্ভূত। ভোলা ময়রার দল Specis হিসাবে পৃথক। এরা লোক কাব্যের ফিরিওলা; বাবুদের দুয়ারে আপনার রচনার ফসল বিক্রির মানসে "মোসাহেবি" এদের করতেই হবে। এছাড়া করবে কী? ক্রেতা পাওয়া যাবে না যে! যে-বাউল আপন মনে গ্রামের পথে গান করে চলে, সে সন্ধ্যায় নিজের আখড়ায় নিজের গান নিজে শোনে ও অশ্রুসিক্ত হয়। সে অন্তর্দেবতায় নিবেদিতপ্রাণ। তাঁর সাথে কথা কয়। তাঁর কাছে আপনার দুঃখ বেদনা একতারার তানে নিবেদন করে। তার সমজদার গ্রামের উঠ্‌কো ছেলের দল ছিলিম খায় তার সঙ্গে; তারা অন্তরের বেসুরো তাল তোলে, যোগ দেয় গানে। গলা সাধে — সে এক ভিন্ন বিগত যুগে স্বয়ম্ভূত লোক-সংস্কৃতির বলয় সৃষ্টি করে, যখন রাম বসু, হরু ঠাকুরের জন্ম হয়নি। কিন্তু কবিগানের, বাউল গানের সৃষ্টি হয়ে গেছে। গ্রামবাংলার পথপ্রান্তর তার তানে তানে নাচছে।

মধ্যবিত্তের মাথার মণি আব্বাসউদ্দিন সারিগান গায়, ভাটিয়ালের ছন্দ-ভাঙা মূর্ছনায় জোছনার লহর তোলে। কিন্তু তিনি সারিগানের জনক নন। তিনি উৎকর্ষক (Sublimator) মাত্র। গ্রাম্য কৃষ্ণ-কীর্তনে, ত্রিনাথের মেলায়, শিবের গাজনে শনির প্রীতি গানে যে কাসর-ঘন্টা-ঢাক-ঢোল বাজে তাতে মধ্যবিত্তের রুচি নেই। রাধারানির গান তাদের মন মাতায়। তেমনই আব্বাসউদ্দিন বাংলার মনকে নাচিয়ে তোলে।

এক কর্তার, এক ক্রিয়া। লোকসংস্কৃতির, লোকগীতির বিশিষ্ট মূর্তিমান জনক নেই। জনসাধারনের মধ্যে সেই জনক বিলীন হয়ে গেছে। আব্বাসউদ্দিন জনসাধারণের উপরে নিজস্ব মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছেন।

পিকাসো আপনার প্রেয়সীর শুধু সামগ্রিক শারীর রূপ সৃষ্টি করেননি। তার সঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যৌনাঙ্গ বিচ্ছিন্নভাবেও সৃষ্টি করেছেন। এ লোকসংস্কৃতির আখ্যান বা উপাখ্যান নয়। সৃজনকারীর সৃষ্টি লালসা! কিন্তু লোক-সংস্কৃতির উপাখ্যানে দেহত্যাগের পর শিব সতীর সকল দেহ বিচ্ছিন্ন করেছেন উন্মত্ত প্রেমের অদম্য তাড়নায়। নারীহত্যা, স্ত্রীহত্যা বীভৎস প্রেমের এক্ বিফল অভিব্যক্তি; বিশ্বাসভঙ্গের কারণে তাঁর পত্নী হীরার (Hera) অনন্ত শাস্তি বিধান করেছিলেন যিউস: অন্তরীক্ষে নিরালম্ব হীরা আজও উদ্বন্ধনে আনত।

সতীর উৎক্ষিপ্ত দেহাংশ যেখানেই নিপাতিত হয়েছে সেখানেই গড়ে উঠেছে সতী মন্দির। মানুষের ঢল নামে মন্দিরের মোহে নয়, ওদের আসতেই হবে। তারা যে লোকসংস্কৃতির আবেষ্টনে আবিষ্ট, নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। এরা কেবল তীর্থ যাত্রী নয়, এরা লোকসংস্কৃতির পরশ-স্পর্শে ধন্য হওয়ার অভিযাত্রী। চিরকালের মানবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ।

ড. সেন বুদ্ধিজীবী মধ্য-বিত্ত। শ্রেণী "তাচ্ছীল্য" (তৎ + শীল + য্যন্) অজ্ঞাতে তাঁকে উদ্ধত করেছে যে ঔদ্ধত্য পরিশীলনের মৃদু আবরণে তাঁর চরিত্রের (শীলের) রূপান্তর ঘটিয়েছে। এই বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত লোকসংস্কৃতিকে লুটপাট করে নিজের ঘর ভরেছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধনিক শ্রেণী যেমন শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করে তাদের সমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠায় উপস্থিত হয়েছে, তেমনই সংস্কৃতিমন্য অহংপ্রিয় মধ্যবিত্ত লোক-সংস্কৃতিকে শোষণ করে রক্তশূন্য করেছে, তাকে স্মৃতি-সত্তা-মহত্ত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে (Gramsci)। লোকসংস্কৃতির অবহেলা তাই সভ্যতার অপহারক হয়ে দাঁড়ায়। মধ্যবিত্তের, বুদ্ধিজীবীর শিল্প-সাহিত্য-সৃষ্টির পশরা পঁচে নষ্ট হয় তখন, যখন সে লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। উচ্চবিত্ত শুধু সাহিত্যকে নয়, অক্ষরকেও ঘৃণা করে। ইংল্যান্ডের রাজবংশ প্রাকমধ্যযুগে ঘৃণায় বিরক্তিতে অক্ষরকে স্পর্শও করেনি। তাই সিল (Seal) তৈরির প্রয়োজন হয়েছিল স্বাক্ষর রাখার প্রয়োজনে। তাই শিক্ষকশ্রেণী গ্রিকসমাজে ছিল একশ্রেণীর গৃহভৃত্য। ক্রীতদাসের সামান্য ওপরে। ফিউডালি সমাজেও তার হেরফের হয়নি। জমিদারের মূর্খ পুত্র পণ্ডিতের মাথায় লাথি মারতে দ্বিধা বোধ করেনি। ছোটলোকের ছেলেরাই লেখাপড়া করে, জমিদারপুত্রের ওসব দরকার হয় না।

আজকের উচ্চবিত্ত (ধনিকশ্রেনী) ফিউডালি কায়দায় তার শয়নকক্ষের রুয়েলে (ruelle), বসার ঘরের দেওয়ালে, প্রবেশ দ্বারে, বিস্তির্ণ করিডরে (corridor) পিকাসো-লিওনার্দ-মাইকেল্ল অ্যাঞ্জেলো প্রভৃতির শিল্পসৃষ্টি, ভাস্কর্য দিয়ে সাজিয়ে গরীয়ান হয়ে ওঠে না; সে গর্বিত হয় বুদ্ধিজীবীকে পদানত করে। ওগুলি তার কাছে বাজারের পণ্যসামগ্রী (commodity) মাত্র। সে কেনে, তাই বাজারে ওগুলি বিকোয়। অনুকরণপ্রিয়তায় কখনও কখনও মধ্যবিত্ত উপরের দিকে হাত বাড়ায়। সমাজের ফিউডালাইজেসন ঘটে ধাপে ধাপে। উপরিওয়ালার অনুকরণস্পৃহা এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে নিচতলার মানুষকে উর্ধ্বমুখী করে। এ যেন শূদ্রের ব্রাহ্মণ হওয়ার তাগাদা (sanskritisation) যা প্রকৃতপক্ষে বর্বরায়নের সমতুল্য। লোকসংস্কৃতিতেও এই ভাবে ভাটা পড়ে। সভ্যতা হয় নিঃস্ব, শিকড় ছাড়া সন্তাহীন।

ড. সেনের শ্রেণীসৃষ্টির ধারণা অদ্ভুত। তিনি রসদ যোগার করেছেন অনেক। কিন্তু ওগুলি সৃষ্টির কাজে লাগাতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছেন নিজে। সৃষ্টির মশলা গেছে উড়ে। তিনি ভুলে গেছেন লোকসংস্কৃতি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে গড়ে ওঠেনি। গড়ে উঠেছে শ্রেণীহীন সমাজে। শ্রেণীহীন সমাজেও শোষণপ্রক্রিয়া আছে। সেই প্রক্রিয়া শ্রেণী তৈরি করে না। খাসি সমাজের "সিয়েম"(শাসনপ্রধান) "বর্খরাও"(অভিজাতকুল), মন্ত্রী, পুরোহিত, "পাইদবা-পাইদকার" (জনসাধারণ) — সবাই জাতীয় উৎসবের অংশীদার। কিন্তু সব অংশীদার তো নিয়ন্ত্রক হয় না। কাজেই "দলুই" (শাসনপ্রধান) ও "লিংডোর" (পুরোহিত) প্রয়োজন। এই নিয়ন্ত্রকেরা শ্রেণী তৈরি করেনি। বংশপরম্পরায় এরা "পেশাদারি" হয়নি। এরা জাতিবিভেদ ব্যবস্থাও সৃষ্টি করেনি। শ্রেনী সৃষ্টির সাথেসাথে খাসিদের সমাজচরিত্রের শুধু ব্যত্যয় ঘটবে না। ঘটবে খাসিসমাজের অনিবার্য অত্যয়, বিনাশ।

হিন্দুসমাজের বৈদিক পর্বেই লোকসংস্কৃতি সৃষ্টি হয়। "শ্রুতি" "স্মৃতি"তে পরিণত হয়। অর্থাৎ শ্রুতিনির্ভর লোকসংস্কৃতি অপসৃত হয়ে স্মৃতির যুগে পুরোহিততন্ত্র তৈরি হয়। তার ফলে উদিত হ'ল ক্ষত্রিয়শ্রেণী, পুরোহিততন্ত্রের ত্রাণকারী শ্রেণী। জাত অর্থাৎ বংশগত শ্রেণী — শস্ত্র আর শাস্ত্র যুক্ত হ'ল। যে বৈশ্যসমাজ (অর্থাৎ গ্রামবাসী কৃষিজীবী সমাজ) বৈদিক "গান" (সূক্ত/মন্ত্র) তৈরি করত, তার অধিকার বিলুপ্ত হল। বেদের সূক্ত সৃষ্টিকারী কতখানি সৃষ্টিকর্তা, না সংকলন কর্তা, সে প্রশ্ন থেকে যায়। এখানে বোধ করি শ্রুতিধর ও স্মৃতিধরের মিলন ঘটেছে। স্মৃতিধরই "লেখনীধর" হয়ে গেছেন। বংশপারম্পর্য আসায় "জাত-সৃষ্টি" হয়েছে। কিন্তু শ্রেণী সৃষ্টির প্রক্রিয়া পৃথক।

"জাত" পবিত্র অর্থাৎ "শাস্ত্রগত " ধারণা। শ্রেণী বিত্তগত ধারণা। বিত্তভিত্তিক বর্গীকরণ (classification) মধ্যযুগোত্তর ধারণা। ফিউডালি সমাজ ভূমিভিত্তিক, মধ্যযুগীয় সমাজ। বৈভব (wealth) এখানে বড় কথা নয়। "বিভূতি" (Shining quality/ splendour) যে "সম্ভ্রম" (Status) সৃষ্টি করে, তাই-ই এর মৌল বৈশিষ্ট্য। "রাজন" কথাটির মূল অর্থ, এই গুণে ভূষিত। The King pleases as he shines। পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের (mutual obligation) মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে ফিউডালি সমাজ। কাজেই শ্রেণী"বিভক্তির" প্রশ্ন অবান্তর (ref.- Marc Bloch)।

সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতাব্দীর যান্ত্রিক আবিষ্কারের ফলে যে শিল্পবিপ্লব সম্ভব হয়েছিল তারই উৎপাদনক্ষেত্রে প্রয়োগ প্রসারণে সৃষ্ট হল বিপুল বৈভব (Wealth)। ফিউডাল যুগে ভূমির উপর নির্ভরশীল উৎপাদনব্যবস্থা শিল্পবিপ্লবের যুগে হয়ে গেল গৌণ। ফলে (১) ফিউডাল সমাজের গতিশীল অংশ, (২) প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক সম্প্রদায় (Trading Community) যাদের অস্তিত্ব ও কার্যকলাপ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ইতালিতে প্রজাতন্ত্র (Republic) তৈরি করেছে, (৩) গিল্ড্ (Guild) পরিচালিত উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থায় গিল্ড্ (Guild-master) — ইত্যাদি শহর ও বন্দরের কাছাকাছি ভূসম্পত্তি কিনে নিতে লাগল চড়াদামে। (৪) আবার অধিক দামে বিক্রিত সম্পত্তির মূল্যের একাংশ ফিরে আসতে লাগল শহরে সামন্ত প্রভুদের গতিশীল (Dynamic) অংশ থেকে। বাকি অংশ দ্রুততর ধারায় ঢেলে দিল শিল্পোত্থিত সদামৃতে তাদেরই পশ্চাদপদ (Conservative) অংশ। যুগোত্তরণের পথে উত্থান-পতনের অসমতা থাকলেও এইটিই ছিল সামগ্রিক ধারা।

শহর-বন্দরের কাছাকাছি নতুন কেনা সম্পত্তিই বার্জেস (Burgess) এবং এর থেকে burghese কথাটার উৎপত্তি। Bourgeoise কথাটির মূল এই burgess কথাটি র মধ্যে নিহিত। এরাই ধনতন্ত্রের জন্মদাতা, সৃষ্টিকর্তা। Communist Manisfesto তে মার্কস ও এঙ্গেলস্ সাবলীল ভাষায় এই শ্রেণীর মানুষের সৃজনশীল (Progressive) ভূমিকার কথা বর্ণনা করেছেন। এই বুর্জোয়া শ্রেণীর সামাজিক অবস্থিতি সাবেক ফিউডালি সমাজের সামন্ত-প্রভুদের নীচে ও প্রলেতারিয়েট শ্রেণীর উপরে অর্থাৎ দুই শ্রেণীর মধ্যবর্তী স্থানে। কাজেই এরা Middle class — মধ্যবিত্তশ্রেণী। Maurice Dobb তাঁর Development of Capitalism গ্রন্থে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে "প্রলেতারিয়েট" (মূলগত অর্থে a man with many children) শ্রেণীর উৎপত্তি হয়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার (Capitalism) উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে "স্বাধীনতা" (Freedom) ও "স্বাধীন পেশার" (Liberty) ধারণার সৃষ্টি হয়। Freedom অর্থাৎ বন্ধন থেকে মুক্ত জীব তার জীবিকা ও জীবন গঠনের পথে আপন পছন্দের তাগাদায় মুক্ত পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা পেল। "ভূমিদাস" (Serf) থেকে মুক্তি মানুষের স্বাধীনতার প্রথম পর্ব সূচিত করে। সামন্ত প্রভুর অধীন দাসের সন্তান উৎপাদনেরও স্বাধীনতা নেই। এই কাজে সে প্রভুর পছন্দের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। মুক্ত শ্রমিক তাই অনেক সন্তানের মালিক।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার সূচনা তার এই দশার (Status) অবসান ঘটায়। সে এখন শ্রম বিক্রির বাজারে তার শ্রমের মূল্য নিজেই নির্ধারণ করবে — ক্রেতার সংগে দর কষাকষির মাধ্যমে; ভূমিদাস তো আজ মুক্ত। ধনতান্ত্রিক বাজারে শ্রমমূল্য নির্ধারণে সে এক পক্ষ। অন্যপক্ষ ক্রেতার সংগে তার চুক্তি (Contract) হয়। "স্টেটাস্"(Status) থেকে "কন্ট্রাক্ট" (Contract) যুগে উত্তরণ ঘটে। ফিউডালি যুগে ভূমিদাসেরা কিন্তু একটি পৃথক শ্রেণী তৈরি করেনি। এরা ভূমিরই একটি অঙ্গ। ভূমিতে আবদ্ধ একটি উপাদান (attribute)। ড. সেনের নিবন্ধের দিগ্‌ভ্রষ্টতা তাঁকে অন্ধ গলিতে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। লোকসংস্কৃতির একটি মূল্যবান অংশ অধিকার করে আছে হাস্যকৌতুক (Fun) সৃষ্টি। Humour ভিন্ন। Humour এর বিভিন্ন আস্তরণ ভেদ করে গভীরে প্রবেশ করলে বিয়োগান্তক (Tragedy) তিক্ততার সন্ধান পাওয়া যায়। এর ব্যপ্তি উচ্চমার্গের সৃজনপ্রতিভায়। ড. সেনের দেওয়া হাস্যকৌতুকের দুটি উদাহরণ বুশের কাছে হোটেলকর্মীর "বিল লা দেঁ" বলামাত্র ত্রাসিত বুশের হোটেল ছেড়ে পলায়ন এবং "মমতার" নাম শুনে জ্যোতিবাবুর মধ্যে যে শিহরণ সৃষ্টি করে তাতে তাঁর চুল খাড়া হয়ে ওঠে ও নাপিতের সুবিধা হয়। লোকসংস্কৃতি ধৃত গোপাল ভাঁড়ের গল্পের মতো। এই দুটি উদাহরণই মিডিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এই রকম ব্যতিক্রম লোক সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে শূন্য করে না।

ডিঙি-ডোঙা বেয়ে জোছনা রাতে যারা সারিগান গেয়ে চলে তারা গ্রামের মানুষ। তারা গীতিকার ও তারাই গীত গায়।

সুকুমার সিংহ চৌধুরি
দানেশ শেখ লেন, হাওড়া - ৯

দেশে নয়, মোহাম্মদীতে

চতুরঙ্গ ৬২ / ২-তে সুখরঞ্জন সেনগুপ্তের ধারাবাহিক "ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়" পড়ে একটি তথ্যগত বিচ্যুতি নজরে আসায় এই পত্র। তিনি লিখেছেন, অদ্বৈত মল্লবর্মনের অনন্যসাধারণ উপন্যাস "তিতাস একটি নদীর নাম" ধারাবাহিকভাবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই তথ্যটি ঠিক নয়। অদ্বৈত মল্লবর্মনের "তিতাস একটি নদীর নাম" মাসিক "মোহাম্মদী" পত্রিকায় ১৩৫২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ থেকে মাঘ পর্যন্ত (১৯৪৪-৪৫) ধারাবাহিক প্রকাশ হয় এবং ওই পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় উপন্যাসের ধারাবাহিক অংশের শেষে "ক্রমশ:" লেখা ছিল। কিন্তু উপন্যাসের বাকি অংশের প্রকাশ মোহাম্মদী পত্রিকায় ঘটেনি। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন অদ্বৈত মল্লবর্মন তখন মোহাম্মদী পত্রিকায় চাকরি করতেন। এই উপন্যাস প্রকাশের সময়ে মোহাম্মদীতে তিনি "রক্ত নিশান" শিরোনামে চারটি ব্রিটিশ বিরোধী কবিতা লেখেন এবং পত্রিকাটি রাজরোষে পড়ে। অদ্বৈত মল্লবর্মন নিজের দায় স্বীকার করে চাকরি ছেড়ে দেন। আনন্দবাজার পত্রিকার কর্মী থাকাকালীন দেশ পত্রিকায় তাঁর নানা বিষয়ে লেখা প্রকাশ হয়। Vincent Van Gogh-এর জীবন বিষয়ক Irving Stone লিখিত বিখ্যাত উপন্যাস "Lust for Life" অদ্বৈত মল্লবর্মনের অনুবাদে "জীবন তৃষ্ণা" নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় দেশ পত্রিকায় (১৯শে মার্চ,১৯৪৯ থেকে ২০শে মে ১৯৫০)। তবে "তিতাস একটি নদীর নাম" দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হয়নি। এই উপন্যাসটি লেখকের মৃত্যুর পরে সুবোধ চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে "পুঁথিঘর" থেকে প্রথম গ্রন্থাকারে বের হয়। বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন রণেন আয়ন দত্ত। উপন্যাসটির মোহাম্মদীতে প্রকাশিত অংশের সঙ্গে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত অংশের পাঠান্তর লক্ষ করা যায়। বইয়ের ভূমিকায় জানান হয়ে ছিল যে সম্পূর্ণ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি মোহাম্মদী পত্রিকায় জমা দেওয়া হয়েছিল এবং কোনও কারণে তা হারিয়ে যায়। এ বিষয়ে কেউ কেউ রহস্যের আভাস দেখতে পেয়েছেন।

নমস্কারান্তে,

বুলবুল আহমেদ
মন্ডলপাড়া লেন, কলকাতা-৫০

পরবাসী অস্তিত্বের কথা

শ্রীমতী মীনাক্ষী ঘোষের 'এ পরবাসে' গল্পটি (বর্ষ ৬২ সংখ্যা ২) মনকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে; গল্পটি সুলিখিত এবং শেষাংশ অনবদ্য — বাস্তবতার জলছবি। গল্পটি সম্পর্কে দু-এক কথা না বলে পারছি না। আশা করি গল্পটি লেখিকা বাস্তব থেকেই কুড়িয়ে নিয়েছেন এবং অন্যান্য লেখক/লেখিকার মতোই সামান্য কল্পনার মিশেল দিয়েছেন। বিয়ের আগে 'মেয়ে হল গে পরের বাড়ির ধন'— এ কথাটি আজ থেকে কুড়ি পঁচিশ বছর পূর্বে বিবাহিত প্রায় প্রত্যেক মেয়েকেই শুনতে হয়েছে। কেউ কথাগুলো সত্য বলে মেনেছে, কেউ বা কথাটিতে চেতনার মতো ভাবিত হয়েছে। এই গল্পে চেতনার নিশ্চিন্তির জায়গাটিতে শৈলেশ যখন সজোরে ধাক্কা মেরে বলে ওঠে — "তুমি চুপ করো। আমরা মা ছেলে কথা বলছি। এর মধ্যে তুমি পরের বাড়ির মেয়ে ......"। তখন যেন আমাদের অনেকের জীবনের ব্যথা-বেদনা প্রতিধ্বনিত হয় চেতনার মনের মধ্যে! "নিজের বাড়ি মানে কী বলত?" চেতনার এই প্রশ্নেও বহু সচেতন রমনী-কণ্ঠের প্রতিবাদ ঝরে পড়ে — অতি জীবন্ত মনে হয় প্রশ্নটি। কিন্তু যখন দেখি দাদুর দেওয়া বাড়িটি চেতনার মতো চেতনাময়ী নারী নিজের বাড়ি বলে ভাবছে, তখন সেটা কতটা স্বাভাবিক এটি আমার কাছে একটি প্রশ্ন। এই বাড়িটি দাদুর না হয়ে বাবার দেওয়া হলেও চেতনার মতো সচেতন মহিলা সম্ভবত নিজের বাড়ি বলে ভাববে না।

আমাদের দেশের বেশিরভাগ মেয়েই (বুদ্ধিমতি কিংবা নির্বোধ) স্বামী কিংবা শ্বশুরমশাইয়ের বাড়িটিকেই নিজের বাড়ি ভেবে নেয়। আজকের শাশুড়ি-মা গতকাল 'পরের বাড়ির মেয়ে ছিলেন' — কোন মন্ত্র বলে যে তিনিই আজ এই বাড়ির হয়ে গেছেন তা কে বলতে পারে! আমার মনে হয় চেতনার মতো মহিলারা দাদুর দেওয়া বাড়ি কিংবা বিয়ের আগের বাপের বাড়িকেও বিয়ের পরে নিজের বাড়ি বলে ভাবে না। গল্পের শেষাংশ অপূর্ব। সংসারের রীতি মেনে লালির পরিবর্তন এবং লালি ও সুকান্তর বাক্যালাপ চেতনার মধ্যে যে চেতনার উন্মেষ ঘটায় তা অপূর্ব। 'আমার ঘর-আমার বাড়ি' করে দৌড়পাগল সব নারী-পুরুষই ভুলে থাকে তাদের এই পরবাসী অস্তিত্বের কথা। গল্পের প্রথম অংশে শৈলেশ 'শৈলেন' হয়েছে। আশা করি এটি ছাপার ভুল।

আল্পনা ভট্টাচার্য

With Best Compliments
From

EXIDE INDUSTRIES LIMITED

INDIA'S NO. 1

STORAGE BATTERY COMPANY

* * *

INDIA MOVES ON EXIDE

September 2003 Registered with the Registrar of Newspaper for India under R. N. No. 5480/57

প্রতি সংখ্যা ১৫ টাব
ডাকযোগে ১৮ টাব

ENJOY

Arambagh's chicken

SERVED **FRESH-N-CHILLED**
WITHIN MINUTES OF YOUR ORDER
FROM ANY OF OUR EXCLUSIVE
COUNTERS AT CALCUTTA

ARAMBAGH HATCHERIES LIMITED

59B, CHOWRINGHEE ROAD, CALCUTTA-700 020
DIAL : 240-2179/2760/1930/0873. FAX : 91-332474137
Sales Offies.351 5037/350 3089

PSL UniMcCann